১

সহজ ভাষায় ভাঙ্গো





সহজ এক ভাষায় রজনী

মৌসুমী

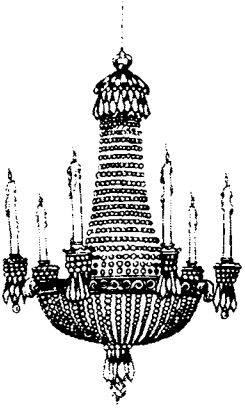

সহস্র একক আরব্য রজনী

কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য



মৌসুমী প্রকাশনী ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

ডঃ জে. সি. মারদ্রুস

সহস্র এক আরব রজনী

অসংক্ষেপিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

প্রথম খণ্ড



ভাষান্তর : ক্ষিতীশ সরকার

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্য চক্রবর্তী

ভূমিকা

'সহস্র এক আরব্য রজনী' বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ। পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে রস পিপাসু পাঠকের সমাদর লাভ করে আসছে। কালে আর জলে ধুয়ে এ-গ্রন্থ আজও চির অম্লান। শাশ্বত সাহিত্যের এই-ই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অদ্যাবধি অগণিত প্রকাশক 'আরব্য রজনী'র কিছু কিছু অংশ অতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে আসছেন। কিন্তু সেগুলি সবই ছোটদের জন্য লেখা কিছু কিছু গল্পাংশ মাত্র। সে-সব 'গল্প' পড়ে 'সহস্র এক আরব্য রজনী'র অপার সাহিত্য-সৌন্দর্য অনুমান করা সম্ভব নয়। আরবী ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ 'আলিফ লায়লা' কিন্তু আদৌ ছোটদের জন্য রচিত নয়।

সারা পৃথিবীতে এ-গ্রন্থ যত ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে ড: জে. সি. মারদ্রুস-এর অনুবাদই শ্রেষ্ঠ। স্পেক্‌টেটর পত্রিকার মতে : The Nursury version of the 'Arabian Nights' serve their purpose, but very pale shades of their originals; prudery Prevented Lane's version for adults form being substantially better, and Burton's was still far from being a complete success. Dr. Mardrus's translation into French was the first European rendering which faithfully reflected its original.

ভাষান্তর করার জন্য আমি ড: মারদ্রুসের অনুবাদই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি। এই প্রথম 'সহস্র এক আরব্য রজনী'র পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় আমরা আরবী ফার্সী হিব্রু প্রভৃতি বিদেশী বহু শব্দ আকছার ব্যবহার করি। বহুকালের ব্যবহারে সেগুলো আজ আর বিদেশী বলেও মনে হয় না। এই গ্রন্থে আমি সেইসব শব্দের যথাযোগ্য ব্যবহার করে তৎকালীন আরবীয় সৌরভে পরিবেশ গড়ে তোলার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

বিনীত

ক্ষিতীশ সরকার

১৫/৯/১৯৮২

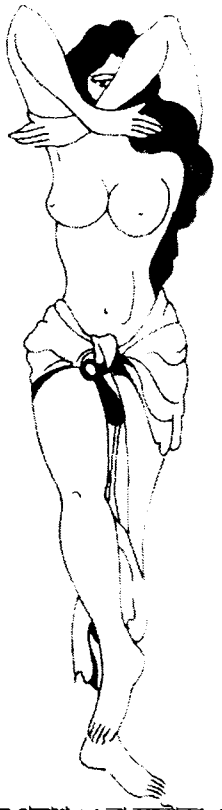

প্রথম প্রকাশ : ১লা অক্টোবর, ১৯৮২

পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ

জুন, ২০১১

প্রকাশক

দেবকুমার বসু

মৌসুমী প্রকাশনী

১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

কম্পোজ

বর্ণায়ন

৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রক

পপুলার এন্টারপ্রাইজ

৩৫এ/৩ বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কল-৬৭

দাম : ২০০ টাকা



বাদশাহ শারিয়ার ও তার ভাই বাদশাহ শাহজামানের কাহিনী
গাধা, বলদ আর গৃহস্বামীর উপাখ্যান
সওদাগর আর আফ্রিদি দৈত্য
প্রথম শেখের কাহিনী
দ্বিতীয় শেখের কাহিনী
তৃতীয় শেখের কাহিনী
ধীবর আর আফ্রিদি দৈত্য
উজির, সুলতান য়ুনান হেকিম রায়ান
সিনবাদ আর বাজপাখি
শাহজাদা আর রাক্ষসী
শাহজাদা আর রঙিন মাছ
কুলি-ছেলে আর তিন কন্যা
প্রথম কালান্দর ফকিরের কাহিনী
দ্বিতীয় কালান্দর ফকিরের কাহিনী
তৃতীয় কালান্দর ফকিরের কাহিনী
বড় বোন জুবেদার কাহিনী
মেজো বোন আমিনার কাহিনী
একটি স্ত্রীলোকের খণ্ডিত দেহ, তিনটি আপেল ও নিগ্রো রাইহান
উজির সামস অল-দিন তার ভাই নূর অল-দিন ও হাসান বদর অল-দিন
দর্জি, কুঁজো, ইহুদী হেকিম, বাবুর্চি, খ্রীস্টান দালাল
খ্রীস্টান দালালের কাহিনী
বাবুর্চির কাহিনী
ইহুদী হেকিমের কাহিনী
দর্জির কাহিনী
খোঁড়া যুবক আর নাপিতের কাহিনী
বাগদাদের নাপিতের কাহিনী
নাপিতের প্রথম ভাই বাকবুক
নাপিতের দ্বিতীয় ভাই অল হাদ্দার
নাপিতের তৃতীয় ভাই বাকবক
নাপিতের চতুর্থ ভাই অল-কুজ
নাপিতের পঞ্চম ভাই অল-আসার
নাপিতের ষষ্ঠ ভাই শাক্কাশিক
কুঁজোর কাহিনীর শেষাংশ
মধুমিতা আর আলী নূর-এর কাহিনী
ঘানিম আইয়ুব আর কুৎ-অল-এর কাহিনী
প্রথম সুদানী নিগ্রো খোজা
দ্বিতীয় সুদানী নিগ্রো খোজা
ঘানিমের কাহিনীর শেষাংশ
উমর অল নুমান, তার পুত্র সারকান ও দু-অল মাকানের কাহিনী
আজিজ আর আজিজার কাহিনী
শাহজাদা তাজ অল-মুলক ও শাহজাদী দুনিয়া
দু-অল মাকানের পুত্র কান মা-কানা
হাসিস খোরের কাহিনী

পশু-পাখিদের উপাখ্যান ঃ

রাজহাঁস ও ময়ূর-ময়ূরী
মেষ-পালক ও মেয়ে
কচ্ছপ ও বক
নেকড়ে ও খেঁক শিয়াল
ইঁদুর আর নেউল
কাক ও কাঠবিড়ালী

আলী ইবন বকর ও সুন্দরী সামস অল-নাহারের কাহিনী
কামার-অল জামান ও শাহজাদী বদর-এর কাহিনী
খুশ বাহার ও খুশ নাহারের কাহিনী
আলা অল-দিন আবু সামাতের কাহিনী



বিদুষী হাফিজার কাহিনী
কবি আবু নবাসের দুঃসাহসিক কীর্তি

সিন্দবাদের কাহিনী ঃ

সিন্দবাদের প্রথম সমুদ্র-যাত্রা
সিন্দবাদের দ্বিতীয় সমুদ্র-যাত্রা
সিন্দবাদের তৃতীয় সমুদ্র-যাত্রা
সিন্দবাদের চতুর্থ সমুদ্র-যাত্রা
সিন্দবাদের পঞ্চম সমুদ্র-যাত্রা
সিন্দবাদের ষষ্ঠ সমুদ্র-যাত্রা
সিন্দবাদের সপ্তম ও শেষ সমুদ্র-যাত্রা

সুন্দরী জুমুরুদ এবং আলী শার-এর কাহিনী
নানা রঙের ছয় কন্যার কাহিনী
তাম্র নগরীর কাহিনী
ইবন অল-মনসুর এবং দুই নারীর কাহিনী
কসাই ওয়ার্দার ও উজির-কন্যার কাহিনী
জামালিকার কাহিনী
(বুলুকিয়ার কাহিনী
খুব সুরৎ নওজোয়ান সাদ-এর কাহিনী)

কয়েকটি মজার মজার চুটকী গল্প ঃ

হাসি-তামাশায় হারুন অল-রসিদ
ছাত্র ও শিক্ষক
আজব বটুয়া
মহব্বতের বিচারক হারুন অল-রসিদ
কে ভালো—উঠতি বয়সের ছোকরা,
না—মাঝ-বয়সী মরদ?
শসা-শাহজাদা
পলিত-কেশ
সমস্যা-সমাধান

আবু নবাস এবং জুবেদার জলকেলী
আবু নবাসের কবির লড়াই
গর্দভ
আইনের প্যাঁচে জুবেদা
স্ত্রী না পুরুষ?
বখরা
মাদ্রাসার মৌলভী
শেমিজের কারুকর্ম
পেয়ালার বাণী
বাক্সের মধ্যে খলিফা
মুদ্যোফরাশ
সুর্মার কাহিনী
ছেলে অথবা মেয়ে
আজব খলিফা
গুলাবীর কাহিনী
কালো ঘোড়ার আশ্চর্য যাদু কাহিনী
ধূর্ত ডিলাইলাহ ও তার জালিয়াৎ কন্যা
জাইনাবের কাহিনী
যুদর এবং তার আশ্চর্য থলের কাহিনী
আবু কাইর ও আবু শাইর-এর কাহিনী
আবদাল্লার কাহিনী
পীত যুবকের কাহিনী
আনারকলি ও বদর বাসিমের কাহিনী
মিশরের ফাল্লাহ্ এবং তার ফর্সা ছেলেমেয়েরা
খলিফা ও জেলের কাহিনী
বসরাহর হাসানের দুঃসাহসিক অভিযান

স্ত্রীলোকের চাতুরী
আবু অল হাসানের কাহিনী
জাইন মাওয়াসিফের কাহিনী
কুঁড়ের বাদশার কাহিনী
নওজোয়ান নূর ও বীরাঙ্গনা মিরিয়ামের কাহিনী
সপ্তম হীরক-কন্যার কাহিনী
আলা অল-দিন ও আশ্চর্য চিরাগ বাতি
জ্ঞানের সন্ধানে
গোলাপ-সুন্দরী ফরিজাদের কাহিনী
কামর ও হালিমার কাহিনী
হারাম-আকিলের কাহিনী
সুলতান মহম্মদের ন্যায় বিচার
শেখ হাসান আবদাল্লার কাহিনী
আবু কাশেমের অঙ্গবাস
চরসের নেশায়
ভ্রষ্টা নারী এবং তার নওজোয়ান নাগর
বৃদ্ধ কাজীর তরুণী বিবি

সুন্দরী নূরের পাণিপ্রার্থীরা
মুতাবাকিল আল্লাহর বিত্ত বৈভব
সুলতান মামুদের কাহিনী
বসরাহর আবু কাশেম
তিন কুলজী-বিদ্যা-বিশারদের কাহিনী
সুলতান মামুদের বাঁদর
তিন পাগলের কাহিনী ঃ
প্রথম পাগল
দ্বিতীয় পাগল
তৃতীয় পাগল
আলিবাবা ও চল্লিশ চোর
বাগদাদের বড় সেতুর উপরে অল-রসিদ
সিদিনুমানের কাহিনী
কাঠুরিয়া যুবরাজ
বৃদ্ধ শেখের কাহিনী
খঞ্জ মাদ্রাসা শিক্ষকের কাহিনী
অন্ধ ভিখারীর কাহিনী
গবেটচন্দরের কাহিনী
তিন বোনের কাহিনী
তিন কন্যার কাহিনী
ফেরিওলার তিন কন্যা
দামাসকাসের রূপবান সওদাগর
হাবিব হাবিবার কাহিনী
সর্দারের নষ্টচরিত্রা বিবি
নফর ফিরুজের বিবি ও সুলতান
অপরিণামদর্শী সিরিয়া সওদাগরের শিক্ষা
হারুন অল রসিদের গ্রন্থপাঠ
শাহজাদা হীরার কাহিনী
গোহা ও তার ইয়ার-বন্ধুরা
তুফা অল কুল্‌বের কাহিনী
অল মালিক বাইবারসের দরবারে ঃ
প্রথম সর্দারের কাহিনী
দ্বিতীয় সর্দারের কাহিনী
তৃতীয় সর্দারের কাহিনী
চতুর্থ সর্দারের কাহিনী
পঞ্চম সর্দারের কাহিনী
ষষ্ঠ সর্দারের কাহিনী
সপ্তম সর্দারের কাহিনী
অষ্টম সর্দারের কাহিনী
নবম সর্দারের কাহিনী
দশম সর্দারের কাহিনী
একাদশ সর্দারের কাহিনী
দ্বাদশ সর্দারের কাহিনী
চীন শাহজাদীর বাগানের সমুদ্র-গোলাপ
দজ্জাল বিবির অত্যাচারে দেশত্যাগী
মারুফ-মুচির ভাগ্য-বিবর্তন
আলেকজান্দ্রা শহরের ধনী যুবকের কাহিনী
ফিন্দের দুই বীরাঙ্গনা কন্যা
ফতিমার কাহিনী
সম্রাট হজ্‌র-এর কাহিনী
আয়েশা কথিত কাহিনী
খলিফা ওমর ইবন অল খাতাবের কাহিনী
কুফার কবি মহম্মদ কথিত কাহিনী
পরান্নভোজী তুফেনের কাহিনী
খলিফা অল হাদীর অন্তিম দশা
অভিশপ্ত কণ্ঠহার
মশুলের গায়ক ইশাকের রোজনামচা
অল মামুন ও জুবেদা বেগমের কাহিনী
জাফরের অন্তিম দশা
শাহজাদা জুঁই আর শাহজাদী বাদামের
প্রেম উপাখ্যান



'সহস্র এক আরব্য রজনী' সম্পর্কে

আনন্দবাজার পত্রিকা (২১.৩.১৯৮৩)

বাংলায় ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্ত বা আংশিক আকারে আরব্য রজনী পড়েছি। এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বইটি পড়লাম। পড়ে যৎপরোনাস্তি আনন্দবিহ্বল হয়েছি। শ্রীসরকার যে এত চমৎকার সুললিত ফিক্‌শনি বাংলা গদ্য লিখতে পারেন, জানার সুযোগ এতদিন দেন নি। কেন দেন নি?

তার চেয়ে অবাক হওয়ার মতো ঘটনা, এই অতিকায় বইটির পেছনে তাঁর নিষ্ঠা, শ্রম এবং প্রযত্ন। কোথাও তাড়াহুড়া নেই, ফাঁকি নেই। পাতার পর পাতা দিলরুবা নামক পারসিক বীণার স্বপ্নাচ্ছন্ন ঝংকার। অনুবাদ মুলানুগ কিনা এ প্রশ্ন আদৌ ওঠে না এ ক্ষেত্রে। শ্রীসরকার অনবদ্য ভঙ্গিতে মায়াদণ্ডের মতো তাঁর কতকথাসুলভ গদ্য থেকে মায়াবিস্তার করেছেন। সেই সঙ্গে চিত্রশিল্পী শ্রীসত্য চক্রবর্তীর প্রশংসা না করলে অপরাধ হবে। শ্রীক্ষিতীশ সরকারের যাদুকর গদ্যকে এই প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী আশ্চর্য দক্ষতায় ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন।



SAHASRA-EK-ARABYA-RAJANI

Rendered into Bengali
By
Kshitish Sarkar

সহস্র একক আরব্য রজনী



এক সময়ে শসন বংশের এক প্রবল পরাক্রান্ত শাহেনশা প্রাচ্যের এক বিশাল সল্‌তানিয়তের শাসক ছিলেন। তাঁর ছিলো বিরাট সৈন্যবাহিনী, অগণিত ক্রীতদাস, আর ছিলো পেয়ারা প্রজাবৃন্দ। তাঁর দুই পুত্র।

বড়টি দীর্ঘকায়, সুঠামদেহী, যোদ্ধা। আর ছোটটি ছিলো বেঁটে-খাটো, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় জাঁদরেল। দু'জনেই দুর্ধর্ষ ঘোড়সোয়ার। বড়টির তাগদ আর বুদ্ধি ছোটর তুলনায় কিছু বেশী। হুকুমতে তার জুড়ি ছিলো না কেউ। প্রজাদের সুখ-দুঃখ, অভাব অভিযোগ দরদ দিয়ে বুঝতো। সেই কারণে, প্রজারাও তাকে জান প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। তার নাম ছিলো বাদশাহ শারিয়ার। আর ছোট ভাইয়ের নাম বাদশাহ শাহজামান। সে শাসন করতো সমরখন্দের আল্-আজম প্রদেশ। সেও ভারি পাক্কা শাসক—প্রজারা খুব ভালোবাসতো তাকে।

এই ভাবে বছর কুড়ি কেটে গেছে। খ্যাতি প্রতিপত্তিতে দু'জনেই তখন শীর্ষে। অনেককাল ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা নাই। বাদশাহ শারিয়ারের মন উতলা হয়ে উঠলো ভাইকে দেখার জন্য। উজিরকে ডেকে ফরমাশ করলো, একবার শাহজামানের কাছে যাও। গিয়ে বলো, আমি একবার দেখতে চাই তাকে। কেন জানি না, মনটা আমার অস্থির হয়ে উঠেছে, তাকে দেখার জন্যে। তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে —নিয়ে এসো তাকে।

উজির করজোড়ে বললো, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

লোকলস্কর নিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে রওনা হয়ে গেলো উজির। দু'দিনের পথ। আল্লাহর দোয়ায় নিরাপদে শাহজামানের দরবারে পৌঁছে বাদশাহ শারিয়ারের অভিপ্রায় পেশ করলো।

শাহজামান বললো; আমি আজই সব ব্যবস্থা করে রওনা হচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বাদশাহের প্রাসাদে সাজো সাজো রব পড়ে গেলো। ভালো ভালো তাঁবু, দামি দামি উট, গাধা, খচ্চর নেওয়া হলো। বাছাই করা হলো ক্রীতদাস, পালোয়ান। তারপর উজিরকে শাসকের ক্ষমতায় বসিয়ে রওনা হলো দাদার দেশে।

বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে এসেছে। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। শাহজামানের হঠাৎ মনে পড়লো, দাদাকে যে জিনিসটা উপহার দেবে ভেবেছিলো, সেইটেই সঙ্গে নিতে ভুল হয়ে গেছে। তাই আবার ফিরতে হলো প্রাসাদে। হারেমে ঢুকেই সোজা চলে এলো খাস বেগমের ঘরে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই থমকে গেলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। সারা দুনিয়া আঁধার হয়ে গেলো তার সামনে। তার খাস বেগম একেবারে বিবস্ত্রা, একটা আবলুস-কালো নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে জড়াজড়ি করে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। হায় খোদা, একী দেখালে আমাকে? আমার এতোদিনের এতো ভালোবাসা, সব কি মিথ্যে? মাত্র কয়েকঘণ্টা, প্রাসাদ ছেড়ে গেছি আমি, তার মধ্যে এই কাণ্ড! না জানি, বড়ভাইয়ের কাছে থাকার কালে, আরও কত কী ঘটতো! খাপ থেকে তলোয়ার খুলে, প্রচণ্ড এক কোপে দু'জনকেই দু'খানা করে ফেললো শাহজামান।

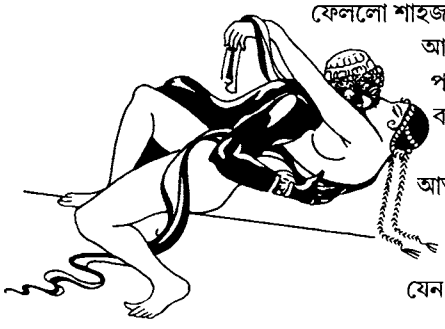

আর কালবিলম্ব না করে আবার দাদার উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়লো। দু'দিন দু'রাত্রি চলার পর বড়ভাইয়ের শহরে পৌঁছলো সে।

ভাইকে পেয়ে বাদশাহ শারিয়ার আনন্দে আত্মহারা। সারা প্রাসাদে হৈচৈ পড়ে গেলো। ভাইকে বুকে জড়িয়ে আদর করলো। কতকাল পরে দেখা। কত কথা জমা হয়ে আছে। সব যেন একনাগাড়ে বলতে চায় শারিয়ার।

কিন্তু শাহজামানের মুখে কোনও হাসি নাই। বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে তার দেহে, মনে। বড় ভাইয়ের আনন্দে তাল দিতে পারলো না সে। কোনরকমে হুঁ, না বলে কথার জবাব দিতে থাকলো। তার মনে তখন সেই একই প্রশ্ন। এতো প্রেম, ভালোবাসা পায়ে দলে, কী করে সে পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করতে পারলো? দুনিয়ায় কি ভালোবাসা , বিশ্বাসের কোনও দাম নাই?

চিন্তায় চিন্তায় চোয়াল দু'টো তুবড়ে ঝুলে পড়েছে। সারা দেহটা যেন বৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত এক শাল গাছ। শাহজামানকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে শারিয়ার ভাবে, নিজের দেশ ছেড়ে এসে ভাই বোধ হয় স্বস্তি পাচ্ছে না। নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সেদিন আর কথা না বাড়িয়ে বিশ্রাম করতে বলে চলে গেলো। পরদিন সকালে আবার এলো ভাইকে দেখতে। দেখলো, সেই একই অবস্থা। খানাপিনা প্রায় করেনি বললেই চলে। শারিয়ার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে তোমার, ভাই? কাল থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি ভীষণ চিন্তিত। তোমার মুখে হাসি দেখিনি একবারও। কী ব্যাপার, খুলে বলো তো।

শাহজামান বললো, বুকের ভেতরটা হু হু করে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন, সেকথা বলতে পারবো না এখন।

বেগমের সেই জঘন্য ব্যভিচারের কথা বলবেই বা কী করে?

শারিয়ার বুঝলো, নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে প্রসঙ্গে আর না গিয়ে বললো, চলো, শিকারে যাই। দেখবে দেহমন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

শাহজামান বললো, তুমি একাই যাও, দাদা। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। শিকারে গেলেও ভালো লাগবে না। বরং তোমার আনন্দ মাটি করে দেবো।

শারিয়ার আর ঘাঁটাঘাঁটি করলো না তাকে। একাই বেরিয়ে পড়লো শিকার সন্ধানে। সঙ্গে গেলো লটবহর, লোক-লস্কর। এলাহি ব্যাপার।

প্রাসাদের যে ঘরে শাহজামানকে থাকতে দেওয়া হয়েছিলো, সে-ঘরের জানালা দিয়ে ওপাশের বাগিচা দেখা যায়। নানা ফুলের গাছে ভরা। মাঝখানে সান বাঁধানো বিরাট এক চৌবাচ্চা। তার মাঝখানে এক জলের ফোয়ারা। অবিরাম ধারা-বর্ষণ করে চলেছে। বড় সুন্দর, বড় মনোরম।

প্রাসাদের পিছনের দরজা খুলে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কিলবিল করে বেরিয়ে এলো কুড়িটা ক্রীতদাসী আর কুড়িটা ক্রীতদাস। আর তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলো স্বয়ং বেগম সাহেবা। সবাই বিবস্ত্র, নগ্ন হয়ে জোড়ায় জোড়ায় গিয়ে বসলো—বাগিচার নানা জায়গায়। হঠাৎ কঁকিয়ে উঠলো বেগম, মাসুদ ও মাসুদ।

একটা দৈত্যের মতো নিগ্রো ছুটে গেলো বেগমের দিকে। দু'হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এসে আলতোভাবে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিলো বেগমকে। তারপর নিগ্রোটার ওই বিশাল বপুর উথাল পাথাল পেষণে পিষ্ট হতে থাকলো বেগমের কুসুম-কোমল দেহটা। এইভাবে চলতে থাকে সুরত সারা রাত ধরে। বেগমের ইঙ্গিতে তার দাসদাসীরাও একই রঙ্গে মেতে ওঠে।

এই দৃশ্য দেখে নিজের মনে খানিকটা সান্ত্বনা পায় শাহজামান। হায় খোদা, দাদার দুর্ভাগ্য তো দেখছি আমার চেয়েও বেশী। বুকটা ঈষৎ হাল্কা বোধ করলো। একটু সরাব নিলো, একটু খানা খেলো। ধীরে-ধীরে চাঙ্গা হতে লাগলো দেহ-মন।

এদিকে বাদশাহ শারিয়ার শিকার শেষে, প্রাসাদে ফিরে ভাইয়ের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে গেলো। দেখে খুশি হলো, ভাই তার বিষণ্ণদশা কাটিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

পরদিন সকালে এসে শারিয়ার প্রশ্ন করে, কেমন করে আবার খুশ মেজাজ ফিরে পেলে, ভাই?

শাহজামান বললো, তবে বলি শোনো, কেন আমি অমন বিষাদে ডুবে গিয়েছিলাম। যখন তুমি তোমার উজিরকে পাঠালে আমার কাছে, আনন্দে নেচে উঠলো আমার মন। কতকাল বাদে তোমার সাথে মিলবো, খুশি না হয়ে পারি! লোকলস্কর সঙ্গে করে তোমার শহরের পথে পা বাড়ালাম। কিন্তু কিছু দূর আসার পর মনে পড়লো, একটা দরকারি জিনিস সঙ্গে নিতে ভুলে গেছি। আবার ফিরতে হলো প্রাসাদে। কিন্তু প্রাসাদে এসে, হারেমে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে তামাম দুনিয়া বরবাদ হয়ে গেলো আমার কাছে। আমার খাস বেগম, আমাকে ছেড়ে একটা দিন সে থাকতে পারতো না। আমার অদর্শন সইতে পারতো না একদম। সেই বেগমকে দেখলাম, বিবস্ত্রা, উলঙ্গ হয়ে এক নিগ্রো ক্রীতদাসকে জড়িয়ে ধরে আমারই পালঙ্কে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মাথায় খুন চেপে গেলো। তলোয়ারের এক কোপে দু'জনকে দু'খানা করে দিয়ে এসেছি।

কেন এতো ভেঙে পড়েছিলাম আমি, সেকথা শুনলে। কিন্তু কী করে সব শোক তাপ ভুলে আবার খোশ-মেজাজ ফিরে পেলাম সেকথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, দাদা। বলতে পারবো না।

শাহজামানের এ কথা শুনে অধৈর্য হয়ে পড়লো শারিয়ার। হায় আল্লাহ, তোমাকে এতো করে বলছি, তবু কেন বলতে চাইছো না? সঙ্কোচ করার কোনো কারণ নাই, তুমি খুলে বলো, দেখি।

শাহজামান খুলে বললো সব। শুনে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো শারিয়ার। তারপর বললো, নিজের চোখে দেখতে চাই আমি। তুমি হয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোয়াব দেখেছো, ভাই।

শাহজামান হেসে বলে, না দাদা, ঘুম আমার ছিলো না চোখে। ওই ঘটনার পর, নাওয়া খাওয়া ঘুম কিছুই করিনি আমি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে নিজের চোখে একদিন দেখো। আবার তুমি ঢ্যাড়া দিয়ে দাও, তুমি আবার শিকারে যাবে। আসলে কিন্তু যাবে না। আমার ঘরে এসে লুকিয়ে থাকবে। দেখো, যেন কেউ টের না পায়। তারপর নিজের চোখেই দেখতে পাবে, ওদের সব কাণ্ডকারখানা।

তিল মাত্র দেরী না করে তখুনি ঢ্যাড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো। বাদশাহ যাবেন শিকারে। আবার সাজো সাজো রব। লটবহর, লোকলস্কর নিয়ে রওনা হলো বাদশাহ শারিয়ার। বাদশাহর খাস নোকর ছিলো দু'টি। খুব বিশ্বাসী। ওদের বললো, আজ রাতে আমি তাঁবুর বাইরে যাবো। কিন্তু সাবধান, কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে। যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, স্রেফ ভাগিয়ে দিবি। বলবি, বাদশাহর তবিয়ৎ আচ্ছা নাই, দেখা হবে না। তার বারণ আছে। তা সে স্বয়ং উজিরও যদি আসে, তাকেও এই একই কথা বলে ফিরিয়ে দিবি, বুঝলি?

রাত যখন ঘনিয়ে এলো, এক ফকিরের ছদ্মবেশে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো শারিয়ার। হন হন করে হেঁটে চলে এলো প্রাসাদের খিড়কীর দরজার কাছে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে, টুক করে ঢুকে পড়লো। তারপর সোজা শাহজামানের ঘরে। সেই জানালার পাশে বসে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো বাগিচার দিকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে হারেমের পিছনের দরজা খুলে গেলো। আর হুড়মুড় করে বেড়িয়ে এলো কুড়ি জোড়া দাসদাসী। আর এলো বেগম। আবার সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হুবহু এক। শারিয়ার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এই ব্যভিচারিণীকে সে এতোকাল বিশ্বাস করেছে, ভালোবেসেছে! ঘৃণায় রিরি করে ওঠে সারা শরীর।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে, ওরা আবার ঢুকে পড়ে হারেমে। ইত্যাকার দৃশ্য দেখে শারিয়ারের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে থাকে। শাহজামানকে বললো, ঢের হয়েছে, চলো ভাই

এই নরক থেকে, এই পাপপুরী থেকে আমরা কেটে পড়ি। এমন দেশে যেতে চাই, যেখানে এই সব অনাচার, ব্যভিচার নাই, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা নাই। আমাদের মতো আর কোন হতভাগ্যের সন্ধান মেলে কিনা তাও একবার খুঁজে পেতে দেখি।



শাহজামানেরও সেই কথা। এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই প্রতারণার দুনিয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো।

সেই রাতেই প্রাসাদের খিড়কীর দরজা দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লো তারা। দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলতে থাকে। অবশেষে একদিন এক সমুদ্রের উপকূলে এসে হাজির হলো। নির্জন সৈকত। কাছের এক বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে থাকে তারা।

ঘন্টাখানেক কেটেছে। হঠাৎ নজরে পড়লো, দূরে সমুদ্রের মাঝখানে এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ঐ কুণ্ডলীটা এক বিকটাকার আফ্রিদি দৈত্যের রূপ ধারণ করলো। এই না দেখে দু'ভাইয়ের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। দৈত্যটা কূলের দিকে এগিয়ে আসছে। উপায়ন্তর না দেখে গুঁড়ি বেয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসলো দু'জনে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ওদের গাছের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো আফ্রিদি। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেলো। আরো কাছে আসতেই নজরে পড়লো, তার মাথায় বিরাট একটা বাক্স। গাছের তলায় এসে বাক্সটা নামিয়ে বসে পড়লো সে। বাক্সটার ভেতর থেকে একটা লোহার সিন্দুক বের করলো। সিন্দুকটা খুললো। কী আশ্চর্য! তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো বেহেস্তের পরীর মতো পরমা সুন্দরী এক যুবতী। কী তার রূপের ছটা! গাছের তলাটা আলোয় ঝলমল করে উঠলো। কাব্য করে বলতে গেলে বলা যায় :

তার রূপের আলো সকালবেলার সূর্য ওঠার মতো।
আঁধার রাতেও আসে যদি, দিনের আলো দেখি।
দেহটা কি সূর্যকণায় গড়া?
মরি মরি, ধার করা রহস্যের ওড়নায় ঢাকা,
তার চোখের হাসির ঝিলিকে,
নিরন্তর বন্দী হয়ে আছে বুঝি চাঁদ।
তামাম দুনিয়ার যত পৌরুষপ্রেম পায়ে থাকে তার!

মুগ্ধ নয়নে, অনেকক্ষণ ধরে, দৈত্যটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো তার রূপ, যৌবন। তারপর আদর করে বলতে লাগলো, বুকের কলিজা, তোমার শাদীর দিনে তোমাকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছি। সেই দিন থেকে আমার চোখে ঘুম নাই। দুস্তর সাহারা সমুদ্র ঘুরে বেড়িয়েছি তোমাকে মাথায় করে। আজ আমি বড় ক্লান্ত। ঘুমে চোখ আমার বুজে আসছে। একটু ঘুমুতে চাই।

এই বলে মেয়েটির কোলে মাথা রেখেই নাক ডাকাতে লাগলো।

একা একা বসে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে, মাথার ওপরে গাছের ডালে শাহজামানদের দু'জনকে দেখতে পায় মেয়েটি। আফ্রিদির মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। ইশারা করলো ওদের, হাতছানি দিয়ে ডাকলো। নিচে নেমে আসতে বললো। আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো, দৈত্যের ঘুম এখন ভাঙবে না, তোমরা নির্ভয়ে নিচে নামতে পারো।

গাছের ওপর থেকে ওরাও ইশারাতেই জানালো, খোদা তোমার ভালো করবেন। কিন্তু তুমি আমাদের মাফ করো। না হলে আমরা মরে যাবো।

যুবতী ভরসা দিলো। খোদার নামে হলফ করে জানালো, তাদের কোন ক্ষতি হবে না। তড়িঘড়ি নেমে আসার জন্যে হুকুম করলো। আর জানালো, তার হুকুম যদি তামিল না করে তারা, তবে আখেরে ভালো হবে না। আফ্রিদিকে জাগিয়ে শায়েস্তা করা হবে। গলা টিপে মেরে ফেলবে সে। এখনো সময় আছে, ওরা নেমে এসে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুক। না হলে সে দৈত্যকে জাগাতে বাধ্য হবে। আর তার পরিণাম অবধারিত মৃত্যু।

গাছের ডালে বসে, অসহায়ের মতো এ ওর দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে দুই ভাই। শারিয়ার জানায়, তুমি আমার ছোট ভাই, তুমি আগে নামো। শাহজামান জানায়, না, তা হয় না। চলো দু'জনে একসঙ্গেই নামবো। মরতে হয় দু'জনে এক সঙ্গেই মরবো। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না।

ওরা ভয়ে ভয়ে নেমে এসে দাঁড়ালো মেয়েটির পাশে। আর তৎক্ষণাৎ মেয়েটি মাটির উপর শুয়ে পড়ে ডাকলো, তোমরা এক এক করে এসে আমার দেহের জ্বালা জুড়িয়ে দাও। তোমাদের একজন চলে এসো এখুনি। আর দেরি করো না। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। সইতে পারছি না এই যন্ত্রণা। এসো। চটপট।

কিন্তু কে আগে যাবে! এ ওকে ঠেলে। বড় বলে, তুমি ছোট, তুমি আগে যাও। ছোট বলে, তা হয় না। তুমি বড়, তোমার পর আমার পালা।

কারো মুখে ভাষা নাই। চোখের ইশারাতেই বলাবলি করতে থাকে তারা। মেয়েটি বিরক্ত হয়। ক্রুদ্ধ হয়। তর্জনী নাচিয়ে জানায়, চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে কী কথা হচ্ছে তোমাদের? আমি আর এক লহমা দেরি করবো না কিন্তু! এক্ষুনি আসবে তো এসো, না হলে আফ্রিদিকে ডাকছি।

দৈত্যের হাতে প্রাণে মারা যাবার ভয়ে দু'ভাই-ই পর পর যুবতীর সম্ভোগের শিকার হলো। যে ভাবে চাইলো সেই ভাবে খুশি করতে হলো তাকে।

ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো মেয়েটির। বললো, তোমরা দু'জনেই জব্বর কায়দা-কানুন জানো, দেখছি!

সেমিজের পকেট থেকে একটা ছোট্ট থলে বের করলো মেয়েটি। থলেটার ভেতর থেকে তুলে ধরলো একটা আংটির ছড়া। বললো, জানো, এগুলো কী? এই চেনে একশো সত্তরটি আংটি রয়েছে। এই মুখপোড়া আফ্রিদিটার চোখে ধুলো দিয়ে যাদের দিয়ে আমার কাম হাসিল করিয়েছি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা করে আংটি নিয়ে এই চেনে গেঁথে রেখেছি। এগুলো আমার স্মৃতি চিহ্ন। তোমাদের কাছেও চাইছি দু'টো আংটি। দাও, এর সঙ্গে গেঁথে রাখবো। পরে যখন দেখবো, তোমাদের সঙ্গে আজকের এই সুখ-সম্ভোগের কথা মনে পড়বে আমার।

এ কথা শুনে স্তম্ভিত হলো ওরা। দু'জনেই একটা করে আংটি খুলে দিলো রূপসীর হাতে। মেয়েটি বললো, জানো, এই শয়তান দৈত্যটা আমার শাদীর রাতে চুরি করে নিয়ে এসেছে আমাকে। এই লোহার সিন্দুকে কয়েদ করে, সিন্দুকটাকে আবার ঐ বাক্সটায় ভরে, লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে, মাথায় করে ঘুরেছে নির্জন মরুপ্রান্তরে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে। কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। শেষে, ঐ সমুদ্রের তলায় নেমে গিয়ে অন্য পুরুষের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে আমাকে। কিন্তু ও ব্যাটা জানে না, আমরা—মেয়েরা যা চাইবো, যেন-তেন-প্রকারেণ তা পূরণ করবোই। কেউ কখনো তা রোধ করতে পারেনি, পারবে না। তাহলে কবির ভাষায় শোনো ঃ

ওগো বন্ধু, বিশ্বাস করো না তাকে।
মুচকি হেসে উপেক্ষা করো তার ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা।
দয়িতের জন্যে ছলাকলা,

আর প্রতারণা—কিছুই অসাধ্য নয় তার।
গাল ভরা মিথ্যা বলে ভালোবাসার অভিনয়ে পটিয়সী সে।
একান্ত নিবিষ্ট মনে যখন সে পশমের কারুকার্যে রত,
তখনো আচ্ছন্ন থাকে পরকীয়া প্রেমে
মনে রেখো সেই কথা—ইউসুফের,
কান পেতে শোনো সেই আদমের মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন—
আজও শোনা যায়.....

শাহজাদাদের চৈতন্য উদয় হয়। এই ভয়ঙ্কর দৈত্যের এমন দুর্ভেদ্য সুরক্ষাকে কলা দেখিয়ে এই সুন্দরী কলাবতী যেভাবে তার কাম হাসিল করে চলেছে তা কল্পনাতীত! এর তুলনায় তাদের বেগমদের প্রহরা কিছুই নয়। এই ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পেলো ওরা। আর কালবিলম্ব না করে তক্ষুনি নিজের নিজের শহরে ফিরে গেলো।

প্রাসাদে পা দিয়েই বাদশাহ শারিয়ার নিজের হাতে বেগমের গর্দান নিলো। হারেমে যত দাসদাসী ছিলো সবাইকে কোতল করার হুকুম দিলো। তারপর উজিরকে ডেকে বললো, আজ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় একটি কুমারী মেয়ে চাই আমার শোবার ঘরে। সারা রাত ধরে তাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করবো আমি। আর ভোর বেলায় নিজের হাতে হত্যা করবো তাকে। যাতে সে অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িনী না হতে পারে। উজির, এখন তোমার কাজ হলো—প্রতি রাত্রে একটি করে কুমারী মেয়ে জোগাড় করে আনা।

বাদশাহর হুকুমে তিনটি বছর ধরে প্রতি রাত্রে একটি করে মেয়ে জোগাড় করে আনতে থাকে উজির। দেশব্যাপী নিদারুণ আতঙ্ক। যাদের ঘরে ডাগর মেয়ে ছিলো তারা প্রাণ ভয়ে দেশান্তরী হতে লাগলো। যারা পালাতে পারলো না—তাদের মেয়েরা বাদশাহর এই নারকীয় নৃশংস খেয়ালের শিকার হতে লাগলো। আদরের দুলালীকে বুকে আড়াল করে খানা খন্দে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে প্রান্তরে পালিয়ে বেড়াতে থাকে প্রজারা। যে বাদশাহকে একদিন আল্লাহর পয়গম্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা জানাতো সেই বাদশাহর নাম শুনে আজ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা। তার সর্বনাশ, তার মৃত্যু কামনা করতে থাকে নিয়ত।

কিন্তু বাদশাহর রোষ থেকে রক্ষা পাওয়া শক্ত। পাহাড় পর্বত প্রান্তরে পালিয়ে থাকা মানুষের বুক থেকেও ছিনিয়ে নিয়ে আসে তাদের আদরের কন্যা। এইভাবে তামাম দেশের কুমারী কন্যা নিঃশেষ হয়ে গেলো।

অবশেষে একদিন সারা দেশ চষে বেড়িয়েও একটি ডাগর কুমারী মেয়ে জোগাড় হলো না। সারাদিন পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শূন্য হাতে ফিরে এলো উজির। বাড়ি ফিরে বিষণ্ণ মনে বসে বসে নিজের নসীবের কথা চিন্তা করতে থাকে। খালি হাতে বাদশাহর সামনে দাঁড়ানো মানেই গর্দান বাড়িয়ে দেওয়া।

উজিরের দুই কন্যা। দু'টিই পরমা সুন্দরী। রূপের চেয়ে গুণ আরও অনেক বেশী। রুচি, প্রকৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, বিচক্ষণতায় তাদের জুড়ি নাই। বড় কন্যার নাম শাহরাজাদ। আর ছোটটির নাম দুনিয়াজাদ। শাহরাজাদ ইতিহাসে পণ্ডিত। সেকালের নবাব-বাদশাহদের কাহিনী, নানা দেশের বিচিত্র কিংবদন্তী তার ঠোঁটস্থ। হাজার হাজার গল্প-গাথা পড়েছে সে। তার বিনম্র ব্যবহার, আর সুললিত কণ্ঠের গানে মুগ্ধ হয় সবাই।

বাবাকে ওইভাবে বিষণ্ণ, চিন্তিত দেখে বড় মেয়ে শাহরাজাদ জিজ্ঞেস করে, আব্বাজান, তোমাকে আজ এমন চিন্তায় উদ্বিগ্ন দেখছি কেন? কী হয়েছে? কোন বিপদ আপদ ঘটেছে কি?

তুমি তো জানো, আব্বাজান, কবি বলেছেন : কোন কিছুর জন্যেই শোকে দুঃখে কাতর

হয়ে ভেঙে পড়া উচিত নয়। কারণ, সুখ যেমন চিরদিন থাকে না তেমনি দুঃখও চিরস্থায়ী নয়।

মেয়ের কথা শুনে একটু ভালো লাগে। বাদশাহর নৃশংস খামখেয়ালীপনার আদ্যোপান্ত সব কাহিনী বললো উজির।



শাহরাজাদ বললো, খোদা ভরসা, আব্বাজান, আজ রাতেই তুমি আমার শাদী করিয়ে দাও বাদশাহ শারিয়ারের সঙ্গে। আমি যদি সাচ্চা মুসলমানের মেয়ে হয়ে থাকি তবে বেঁচে থাকবো। আর যদি মরতেই হয় তবে এমন কাজ করে মরবো যাতে বাদশাহর ভয়ে কোন মানুষকে দেশ ছেড়ে পালাতে না হয়।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলো উজির, আল্লাহ্ তোমার ভালো করবেন, মা। এই বিপদের দিনে একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমার আসল পরিচয় কখনও ফাঁস করো না তার কাছে।

শাহরাজাদ বললো, তা আমি খুব ভালো করেই জানি, আব্বাজান।

উজির বললো, সেই গাধা, বলদ আর গৃহস্বামীর উপাখ্যান শুনেছো? তা হলে বলি, শোনো।

অনেকদিন আগে এক ধনী পশুপালক বাস করতো বিস্তীর্ণ উর্বর শস্যক্ষেত্রের পাশে, এক নদীর ধারে। একটা গাধা আর একটা বলদ ছিলো তার খামারে। একদিন বলদটা গোয়ালে ঢুকে দেখে, গাধাটা যবের ভূষি মাখানো জাবনা খেয়ে, পেটটা ডাঁই করে, বিচালি পাতা গদির ওপর শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে।

রোজ গাধাটার পিঠে চড়ে খামারের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসে মনিব। তারপরই গাধার ছুটি। খেয়ে দেয়ে ঘুমানো ছাড়া আর কোন কাজ করতে হয় না।

বলদের প্রবেশে গাধার নিদ্রাভঙ্গ হয়। দুঃখ করে বলদটা বলে, তোমার কী সুখ ভায়া। দিব্যি খাচ্ছো-দাচ্ছো আর ঘুমোচ্ছ। এরকম সুস্বাদু দানাপানি আমরা চোখেও দেখিনা।

এই সময় ওদের মনিব গোয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। বলদের কথা শুনে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলো। বলদ বলতে লাগলো, আমার মতো তো তোমাকে খেটে খেতে হয় না ভাই। এই দ্যাখো, খেটে খেটে শরীরটা আমার কেমন হাড় জির-জিরে হয়ে গেছে। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার দেহটা কেমন নাদুস-নুদুস হচ্ছে। কখনো-সখনো তোমার পিঠে চেপে একটু আধটু ঘুরে আসে মনিব। তারপর সারাদিন তোমার ছুটি। খেয়ে দেয়ে নাক ডাকাও। আর আমার দ্যাখো, সেই যে সাত সকালে ঘাড়ে জোয়াল চাপায়, সন্ধ্যার আগে আর রেহাই নাই।

বলদের কথা শুনে গাধার বড় দুঃখ হলো। বললো, শোনো, তোমাকে আমি একটা ফন্দি শিখিয়ে দিই। কাল সকালে চাকরটা যখন তোমাকে হালে নিয়ে যেতে আসবে তখন তুমি কিছুতেই উঠবে না। কিন্তু চাকরটা খুব মারবে। তা মারুক। তুমি সহজে যেতে চাইবে না। কিন্তু চাকর ব্যাটা তোমাকে ছাড়বে না। মেরে ধরে মাঠে নিয়ে যাবেই। তুমি কিন্তু জোয়াল ঘাড়ে নেবে না। জোর করে চাপাবে চাকরটা। কিন্তু দু-এক পা টেনেই ধপাস করে মাটিতে শুয়ে পড়বে। আবার খুব মারবে। কিন্তু তুমি উঠবে না। তখন ওরা ভাববে, তোমার কোন অসুখ-বিসুখ করেছে। দেখবে, তখন তুমি রেহাই পেয়ে যাবে।

ওদের সব কথাই শুনে নিলো মনিব। তার পরদিন লক্ষ্য করলো, গাধা যে সব ফিকির শিখিয়ে দিয়েছিলো, বলদটা ঠিক ঠিক সেই ভাবেই অভিনয় করে যেতে থাকলো। দানাপানি খেলো না। লাঠিপেটা করেও মাঠে নেওয়া যায় না। জোয়াল কাঁধে চাপাতেই মাটিতে শুয়ে পড়ে। মনিব তখন নোকরটাকে বললো, মনে হচ্ছে, বলদটার কোন অসুখ-বিসুখ করেছে। তুই এক কাজ কর, বলদটাকে গোয়ালে রেখে গাধাটাকে নিয়ে এসে জোড়।

মনিবের কথা মতো, গাধাটাকে এনে হালে জুড়ে সারাদিন ঠাঠা রোদে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটালো চাকরটা। দিনের শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে যখন গোয়ালে ফিরে এলো, তখন বলদ

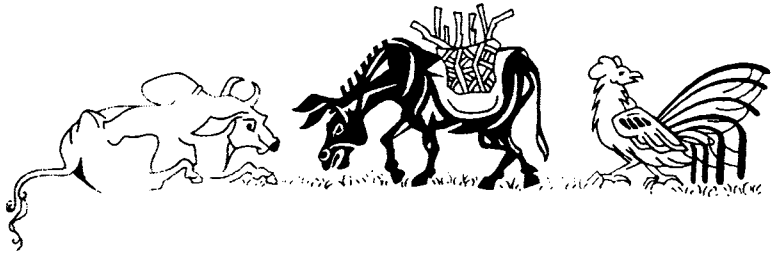

তাকে দু-হাত তুলে দোয়া জানাতে থাকে। খোদা, তোমার ভালো করবেন, ভাই। তোমার বুদ্ধিতে আজ একটু আরাম পেয়েছি।

গাধা কিন্তু গম্ভীর। কোনও জবাব দিলো না। নিজের বোকামির জন্যে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো।

পরদিন নোকর এসে আবার গাধাকে নিয়ে গিয়ে হালে জুড়লো। সারাদিন ধরে আবার সেই হাড়ভাঙা খাটুনি। জোয়ালের ঘষায় অনভ্যস্ত ঘাড়ের ছালচামড়া উঠে ঘা হয়ে গেলো। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা টনটন করতে থাকে। হালের জোয়াল টানতে টানতে চোখে জল আসে। ভাবে তার সুখের দিনগুলো সব ফুরিয়ে গেলো। এখন কি সারাটা জীবন এই জোয়াল টানতে হবে তাকে?

সন্ধ্যাবেলায় গোয়ালে ফিরে গাধাটা কোনও কথাবার্তা না বলে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। বলদ কাছে মুখ বাড়িয়ে বলে, কি ভায়া, অমন মন-মরা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন? একটু এসো, গল্প-সল্প করি।

গাধা বললো, কী আর বলবো ভাই। তোমার দুঃখে আমি মুষড়ে পড়েছি। এতোকাল একসাথে আছি আমরা, কিন্তু আজ যা শুনলাম.... মনিব আর রাখবে না তোমাকে—

—সেকি! রাখবে না মানে? বলদটা আঁৎকে ওঠে। তবে কী করবে আমাকে? মেরে-টেরে ফেলবে না তো? কী শুনেছো, বলো না, ভাই—

—কষাই-এর কাছে বেচে দেবে। লোকটাকে বলছিলো, মনিব, বলদটা বোধহয় বাঁচবে নারে। ওটা যদি মরে যায়, আমার অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে। তার চেয়ে কষাই-এর কাছে বেচেই দিই, কী বলো? তবু যাহোক মোটামুটি ভালোই দাম পাওয়া যাবে। মনিবের এই কথা শুনাতক আমি কাঁদছি ভাই। কী করে এতো বড় দুঃসংবাদ দেবো তোমাকে, তাই ভেবে আমি কূল পাচ্ছিলাম না। এতোকাল আমরা একসাথে আছি, এতোদিনের প্রাণের ভালোবাসা আমাদের। আজ যদি তোমাকে ওরা কষাই-এর হাতে তুলে দেয় তা হলে আমি বাঁচবো কী নিয়ে? এবার বাঁচার একটা উপায় বের করো ভাই।

বলদ কৃতজ্ঞ হয়ে বললো, খবরটা জানিয়ে তুমি আমার জান বাঁচালে ভাই। কী বলে তোমাকে সুক্রিয়া জানাবো, ভেবে পাচ্ছি না। কাল সকালেই আমি টগবগিয়ে উঠে দাঁড়াবো। আজ থেকেই আমি পেটপুরে দানাপানি খাবো। ফুর্তিসে হাল টেনে মনিবকে বুঝিয়ে দেবো, অসুখ-ফসুক আমার সেরে গেছে।

এই বলে বলদটা উঠে গিয়ে জাবনা খেতে শুরু করলো। এদিকে গোয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে মালিক বলদ আর গাধার সব কথাবার্তা শুনে নিলো।

পরদিন সকালে নোকরটা গোয়ালে ঢুকে অবাক। বলদটা উঠে দাঁড়িয়ে চনমন করছে। গাধাকে রেখে আজ আবার সে বলদটাকে নিয়ে রওনা হলো। গাধা হাসলো।

মালিক তার বৌকে বললো, চলো, আজ মাঠে যাই। তোমাকে একটা মজা দেখাবো।

ওরা দু'জনে মাঠে এসে একপাশে বসলো। চাকরটা বলদটাকে নিয়ে হালে জুড়তেই টগবগিয়ে উঠলো। অন্যদিনের চেয়ে আরও জোরে হুড় হুড় করে টানতে লাগলো হাল। এই না দেখে মালিক তো হেসে খুন। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। কী ব্যাপার কিছুই ঠাওর করতে পারে না বৌটা। জিজ্ঞেস করে, ওগো, কী হলো তোমার? অমন হাসছো কেন?

—হাসছি কেন? মালিক বললো, সে তোমাকে আমি বলতে পারবো না, বৌ। শুনলে তুমি হাসতে হাসতে মরে যাবে।

বৌটি কিন্তু সে কথায় আমল দিলো না। রেগে গিয়ে বললো, ওসব বাজে কথা রাখো। তুমি আমাকে দেখে হাসছো। ঠাট্টা করছো। আমি এমন কিছু করেছি, যা দেখে আমাকে নিয়ে তামাশা করছো তুমি।

মালিক তখন মেয়ের নামে হলফ করে বলে, তুমি বিশ্বাস করো, বিবিজান, তোমাকে দেখে না। হাসির অন্য কারণ আছে। গোড়া থেকে সব বলতে গেলে হাসতে হাসতে আমি মরে যাবো। আমার বয়স এখন কত জানি না। একশো কুড়ি বছর ধরে তোমার সঙ্গে ঘর করছি আমি। বুড়ো হয়েছি। একদিকে তুমি যেমন আমার চাচার মেয়ে, আর একদিকে তুমি আমার আদরের বিবিজান। আমার ছেলেমেয়েদের তুমি মা। তোমাকে আমি জান দিয়ে ভালোবাসি। তুমি আমার কলিজা। তোমার মনে যখন সন্দেহ জেগেছে, আমি তোমাকে তামাশা করে হাসছি, তখন সব কথাই বলবো। শুনলে বুঝবে, কেন হাসছি আমি। তাতে যদি হাসতে হাসতে দম ফেটে আমি মরে যাই সে ভি আচ্ছা! ঠিক আছে, ছেলেমেয়েদের ডাকো, পাড়াপড়শীদের খবর দাও, মাতব্বর মৌলভীদের সালাম জানাও। তারা সবাই আসুক। তাদের সাক্ষী রেখে আমার বিষয় সম্পত্তি উইল করি আগে। তারপর তোমাকে সব বলবো।

এরপর ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শী, মোড়ল-মৌলভী সবাই এসে জমায়েত হলো। সব বৃত্তান্ত শুনে সবাই মিলে বৌটাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, এমন একগুঁয়েমির ফল ভালো হয় না। তোমার স্বামী বুড়ো হয়েছে। এখন যদি আল্লা না করুন, কোন একটা কিছু ঘটেই যায় তাহলে কি তোমার আনন্দ হবে? তোমার একপাল ছেলেমেয়ের বাবা সে। এতোকাল ধরে একসাথে ঘর করছো। হাজার হলেও সে তো তোমার স্বামী। আজ যদি এই তুচ্ছ কারণে সে বেচারী মারা যায় তোমার কী দশা হবে, ভাবো।

কিন্তু ভোবি ভুলবার নয়। বৌটা তার গোঁ ধরেই বসে রইলো। না না, তোমরা জানো না, ও আমাকে ঠাট্টাতামাশা করে হেসেছে। কেন হেসেছে বলতেই হবে। না শুনে আমি ছাড়বো না; ছাড়বো না। এই আমার শেষ কথা।

অগত্যা মালিক গোয়ালের ওপাশে বাগানের মধ্যে একটা কবর খোঁড়ালো। মরার পরে এই কবরে তাকে সমাহিত করা হবে। উদ্দেশ্য এই রকম। তারপর তার হাসার গুপ্ত রহস্য বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলো।

একটা জবরদস্ত তাগড়াই মোরগ ছিলো মালিকের। আর ছিলো একটা মাদি কুকুর। পঞ্চাশটা মুরগীর সঙ্গে বাস করতো ঐ একটা মোরগ। সবাইকেই খুশি রাখতো ঐ একটা মোরগ। তার পরিবারের সবাই বেশ হাসি-খুশি। কারো কোন অভিযোগ ছিলো না।

হঠাৎ মালিকের কানে এলো, কুকুরটা খুব বকাবকি করছে মোরগটাকে। আমাদের

মালিক যখন মরতে বসেছে সেই সময় তোমার নাচনকোদনটা একটু থামাও না। লজ্জাশরম বলেও তো কিছু একটা থাকা দরকার।

মোরগটা হৈহল্লা করে দিন কাটায়। কারো সাতে পাঁচে নাই। কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে না। সে এসবের কোনই খোঁজ রাখে না। কুকুরটার কাছে মালিক আর তার বিবির কাহিনী শুনলো সব। তারপর দুঃখ করে বললো, হায় আল্লাহ্, আমাদের মালিক সাদামাটা মানুষ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু নাই। দ্যাখো, আমার পঞ্চাশটা বিবি। এতোগুলো মুরগী নিয়ে আমি ঘর করি। কত ভালোভাবে খুশি করে রেখেছি সবাইকে, কোন ঝগড়া বিবাদ দেখেছো কখনও? সবগুলোকে এক খাঁচায়, কেমন কব্জায় রেখেছি বলো? আর আমার মালিকের একটা মাত্র বিবি। সেই একটাকেই বাগ মানাতে পারে না? খুব সোজা পথে সব ঠাণ্ডা করা যায়। একটা জামের ডালের ছড়ি দিয়ে ঘা কতক দিলেই আপ্‌সে সব ঠিক হয়ে যেতো।

মোরগের কথা শুনে মালিকের চৈতন্য হয়। কথাটা তো মন্দ বলেনি মোরগটা। মালিক উঠে গিয়ে বিবিকে বললো, তুমি আমার শোবার ঘরে এসো। তোমাকে সেই গুপ্ত রহস্য বলবো।

এই বলে বাগানের দিকে চলে গেলো মালিক। একটু বাদে একটা জামের ডালের লাঠি হাতে নিয়ে ফিরে এলো। বিবি তখন শোবার ঘরে। লাঠিটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজার ছিটকিনি তুলে দিলো। কাছে এসে এক ঘুসিতে মাটিতে ফেলে দিলো বৌটাকে। তারপর এলোপাথাড়ি পেটাতে শুরু করলো সেই জামের লাঠিটা দিয়ে।

—ও বাবাগো, মলাম গো। বলে ছটফট করতে থাকে বৌটা। কিন্তু মালিক পিটিয়ে চলে সমানে। বৌটা ওর পা-দু'টো জড়িয়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে, আর মেরো না আমাকে, আর মেরো না, গো। আমি জানতে চাই না তোমার গুপ্ত কথা। আমাকে ছেড়ে দাও, বাঁচাও। আর তোমার কথার অবাধ্য হবো না। বেয়াড়াপনা করবো না। আমাকে আর মেরো না।

জামের ডালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলো ওর স্বামী।

একটুক্ষণ পরে স্বামীর সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজন সবাইকে জানালো বৌটা, আমি খুব খুশি, আমার আর কিছু জানার নাই। কোন সন্দেহ নাই।

সবাই খুশি হয়ে ফিরে গেলো। এরপর তারা আরও বহুকাল সুখে সচ্ছন্দে ঘর সংসার করেছিলো।

এই বলে উজির থামলো। শাহরাজাদ বললো, আব্বাজান, আমার ইচ্ছার কথা তোমাকে বলেছি। এবার তোমার অভিপ্রায় কী, বলো।

আর কালক্ষেপ না করে কন্যাকে শাদীর সজ্জায় সাজতে বললো তার বাবা। বাদশাহকে গিয়ে জানালো, আজকের রাতের পাত্রী পাওয়া গেছে। এখুনি হাজির করছি হুজুরের খাস মহলে।

এদিকে শাহরাজাদ তার ছোট বোন দুনিয়াজাদকে সব বুঝিয়ে বললো, আমি বাদশাহর কাছে এক রাতের বেগম হতে যাচ্ছি। তোকে আমি ডেকে পাঠাবো। যাবি। বাদশাহর সঙ্গে আমার শাদী হবে। তারপর তার যা খেয়াল হয় করবে। সব কাজ কারবার শেষ হয়ে গেলে ঘুমুতে যাবার মুখে তুই আমার কাছে আব্দার ধরবি, দিদি গল্প শোনাও। না হলে আমার ঘুম আসবে না। তখন আমি শুরু করবো কিস্‌সা। এই চালেই মাৎ করতে হবে বাদশাহকে। আর যদি না পারি তো খোদার যা ইচ্ছা, তাই হবে।

একটু বাদে উজির এসে শাহরাজাদকে নিয়ে গেলো বাদশাহ শারিয়ারের খাস মহলে। শাদীর সাজে অপরূপ দেখাচ্ছিলো তাকে। কিন্তু শারিয়ার তার মুখের দিকে চেয়েও দেখলো না একবার। পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়লো। উজিরের দিকে চোখ রেখে বললো, , হুম্, তা হলে আজকের রাতের খোরাকটা এসে গেছে দেখছি।

শাহরাজাদের বুকটা কেঁপে উঠলো।

নিজেকে শক্ত রেখে মাথা নুইয়ে গলায় বিনয় ঢেলে বললো উজির, জি, হুজুর।

বাদশাহ যখন শাহরাজাদকে শয্যাকক্ষে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। বাদশাহ সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করে, আহা কাঁদছো কেন সুন্দরী? ভয় কী? কিছু ভয় নাই। তুমি আমার বেগম হয়েছো। ভয় কী তোমার? বলো কী চাই তোমার?

—জাঁহাপনা, শাহরাজাদ অনুরোধ করে, আমার ছোট একটি বোন আছে। নেহাতই ছেলেমানুষ। ছোট থেকে একসঙ্গে আমাদের দিন কেটেছে। দিন রাত্রের কোনও সময়েই আমরা ছেড়ে থাকিনি। তাই খুব মন খারাপ লাগছে। আমাকে ছাড়া সে রাতে ঘুমুবে কী করে? খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তাকে।

—এই কথা। এ আর এমন কি, আমি এখুনি হুকুম করছি। তোমার বোনকে নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুনিয়াজাদ এলো। দিদিকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলো। শাহরাজাদ তাকে শান্ত করলো—আদর দিয়ে, চুমু দিয়ে। শয্যার এক পাশে শুইয়ে দিলো। শারিয়ার শুয়েছিলো এতক্ষণ। তন্দ্রা এসেছিলো বোধহয়। দুনিয়াজাদের কান্নায় কেটে গেলো তন্দ্রা। উঠে বসলো। শাহরাজাদকে কাছে টেনে নিলো। তার অপাপবিদ্ধ কুমারী দেহটা আজ এই ভালুকের থাবায় ছিন্নভিন্ন হতে থাকলো। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইলো শাহরাজাদ। শুধু আল্লার কাছে আর্জি জানায় মনে মনে—এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করার শক্তি যেন আমার থাকে খোদা।

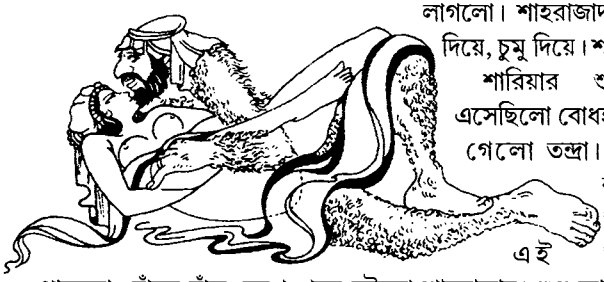

কিছুক্ষণ বাদে জানোয়ারটার কবল থেকে দেহটা মুক্ত করে বোন দুনিয়াজাদের পাশে গিয়ে ধুঁকতে লাগলো শাহরাজাদ। দিদিকে জড়িয়ে ধরে দুনিয়াজাদ আব্দার করে, এবার তোমার গল্প শোনাও দিদি, তোমার ঐ মজার মজার গল্পগুলো শুনে আমি কী যে আনন্দ পাই—সত্যি, এমন সুন্দর সুন্দর গল্প তুমি কী করে বলতে পারো, দিদি। তোমার গল্প একবার যে শুনেছে সে জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না। বলো না, দিদি। রোজ রাতে তোমার গল্প শুনেছি, আজ বলবে না?

শাহরাজাদ বললো, কিন্তু বোন, রোজ রাতের সঙ্গে আজকের রাতটা যে আলাদা। আজ আমি বাদশাহের বেগম। এখন তার হুকুম, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ছাড়া তো কিছুই করা সম্ভব নারে পাগ্‌লি। তবে জাঁহাপনা যদি শুনতে চান, আমি শোনাতে পারি।

একথা শুনে শারিয়ারের কৌতূহল বাড়ে। কী এমন মজার কিস্‌সা! শোনাই যাক। বলে, ঠিক আছে শোনাও দেখি তোমার গল্প। আমিও শুনি। কিন্তু সকাল হবার আগে গল্প থামাবে। আমাকে ঘুমুতে হবে।

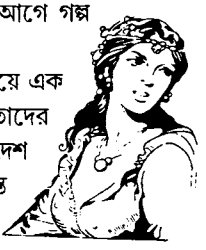

—তাহলে শুনুন, জাঁহাপনা। শাহরাজাদ শুরু করে। কোন এক সময়ে এক কোটিপতি ধনী ব্যবসায়ী ছিলো। তামাম দুনিয়ায় যতো ধনী ছিলো তাদের সকলের সেরা সে। এক সময়ে বাণিজ্যের অন্বেষণে ঘোড়ায় চেপে নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে থাকে সে। একদিন মধ্যাহ্ন সূর্যের খরতাপে দগ্ধ হয়ে শ্রান্ত হয়ে এক বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে বসলো সেই সওদাগর।

খাবারের ডিবেটা বের করে খান কয়েক চাপাটি একটু শব্জী আর একটা ফল নিয়ে খানা শেষ করলো। হাত মুখ ধুয়ে মুখ তুলতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে

এক বিশাল আফ্রিদি দৈত্য। হাতে তার শাণিত খাঁড়া। বলে, উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাকে খুন করবো।

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বণিক বললো, আমার কী গুনাহ্?

—তুমি আমার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছো।

—আমি? কী করে?

—হ্যাঁ তুমি। হুঙ্কার ছাড়ে আফ্রিদি। খাওয়ার সময় একটা ফল খেয়ে আঁটিটা ছুঁড়ে দিয়েছিলে। সেই আঁটির ঘায়ে আমার প্রাণের বাছা প্রাণ হারিয়েছে। আমি তোমাকে রেহাই দেবো না। জানের বদলে জান নেবো।

সওদাগর তখন জোড় হাতে আবেদন করে, তুমি দানব শ্রেষ্ঠ। আমি জীবনে কখনও মিথ্যাচার করিনি। সজ্ঞানে কোন পাপ করিনি। যাই হোক, আমার অজ্ঞাতসারেই যদি তোমার পুত্রের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকি তবে যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেবো। কিন্তু তার আগে আমার আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। তুমি সেই অনুমতি আমাকে দাও, এই আমার মিনতি। অগাধ বিষয় সম্পত্তি আমার। আমার মৃত্যুর আগে তার একটা বিলি ব্যবস্থা করা দরকার। সেজন্যেও একবার দেশে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমার জাত ব্যবসা বাণিজ্য করা। সেই হেতু কিছু দেনা পাওনা থেকে যায়। সেগুলো মিটিয়ে আসাও আমার কর্তব্য। কোন ঋণ রেখে আমি মরতে চাই না। মরতে আমি আদৌ ভয় পাই না। কারণ এক সময় না এক সময় মৌত আসবেই জীবনে। কেউ তা এড়াতে পারবে না। সে চাই—দু'দিন আগে হোক আর পিছে হোক। তাই মৌত-এ আমার কোন ভয় নাই। আমাকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দাও কিছুদিনের' জন্য। আমি দেশে যাই। সেখানকার কাজকাম সমাধা করে আবার এখানে ফিরে আসবো। তখন তোমার যা বিধান হয় সেই শাস্তি আমাকে দিও, মাথা পেতে নেবো। আল্লার নামে হলফ করে বলছি, আমি ফিরে আসবো—আসবো—আসবো।



দৈত্য বিশ্বাস করে ছেড়ে দিলো বণিককে। দেশে ফিরে এসে যা যা দায়দায়িত্ব ছিলো, এক এক করে সমাধা করতে লাগলো। বিবি আর বাচ্চাদের কাছে সব খুলে বললো নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো তারা। বিষয় সম্পত্তি যাকে যা দেবার সাধ ছিলো সেইভাবে দানপত্র তৈরি করে দিলো। এই সব করতে করতে বছরের প্রায় তিনভাগই কেটে গেলো। বাকী ক'টা দিন বৌ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটিয়ে আবার একদিন সেই দৈত্য-সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। তার শোকে ছেলেমেয়ে বৌ, পাড়াপড়শী সবাই আকুলভাবে কাঁদতে লাগলো।

চলতে চলতে একদিন সেই বিশাল বৃক্ষটার নিচে এসে দাঁড়ালো বণিক। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলো। এমন সময় দেখলো, শিকল বাঁধা একটা বুনো রামছাগলকে সামনে করে এক জোয়ান শেখ এগিয়ে আসছে তার দিকে।

বণিকের সামনে পৌঁছে সালাম জানালো শেখ। জিজ্ঞেস করলো, এই দৈত্যদানবের রাজ্যে বসে কী করছেন সওদাগর সাহেব?

বণিক তখন তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বললো তাকে। সব শুনে শেখ তো অবাক। বললো, খোদা মেহেরবান, কিন্তু সত্য রক্ষার জন্যে আপনার এই কাহিনী বিশ্বাস করবে না দুনিয়ার মানুষ।

শেখ নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকে বণিককে। খোদা ভরসা, তিনিই রক্ষা করবেন। দুশ্চিন্তা, ভয় মুছে ফেলুন মন থেকে।

এই সময় আর এক শেখের আগমন হলো সেখানে। তার সঙ্গে ছিলো দুটি

গ্রে-হাউন্ড জাতের কুকুর। তারও সেই একই প্রশ্ন। এই দৈত্যদানবের আস্তানায় কেন এসেছে সে? বণিকের দুর্ভাগ্যের কাহিনী সেও শুনলো। এই সময়ে আরও এক শেখ এসে হাজির হলো সেখানে। তার সঙ্গে ছিলো ছাই রঙের এক মাদি খচ্চর। যথারীতি একই প্রশ্ন তারও। সব শুনে তো তাজ্জব সবাই।

এমন সময়ে সামনের তপ্ত বালুকায় ঘূর্ণী ঝড় উঠলো। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এলো। একটা বালির স্তম্ভ খাড়াই উঠে যেতে থাকলো ঊর্ধ্ব মুখে। ক্রমশ বৃক্ষটার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে সেটা। ধীরে ধীরে সেই বিশাল বালুকারাশির গগনচুম্বী স্তম্ভটা এক বিকটাকৃতি আফ্রিদি দৈত্যের রূপ ধারণ করে দাঁড়ালো ওদের সামনে। শাণিত তলোয়ার উঁচিয়ে গর্জে উঠলো, উঠে এসো সওদাগর। তোমাকে আমি কোতল করবো। তুমি আমার জানের কলজে—প্রাণের বাছাকে মেরেছো।

সওদাগর তখন কান্না, ভয়ে ভেঙে পড়লো। তার দুঃখে তিন শেখও মুহ্যমান। প্রথম শেখ বুকে সাহস বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। দৈত্যটার সামনে এসে একটা সালাম ঠুকে বললো, তুমি দানব-কুল শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি আমার এই বুনো রামছাগলের কাহিনী শোনাতে চাই। শুনে যদি ভালো লাগে তবে সওদাগরের গোস্তাকি মাফ করে দিও, এই আমার আর্জি।

আফ্রিদি তখন বললো, ঠিক আছে, আমার যদি ভালো লাগে তবে সওদাগরের তিন ভাগ অপরাধের এক ভাগ আমি রেহাই দিয়ে দেবো।

প্রথম শেখ তখন বলতে শুরু করে। শোনো, দৈত্য সম্রাট, এই যে বুনো রামছাগলটা দেখছো, আসলে কিন্তু এটা কোনও জন্তু জানোয়ার না। এ হচ্ছে আমার চাচার মেয়ে—আমার শাদী করা বিবি। তিরিশটা বছর এক সঙ্গে ঘর করেছি। ছোটবেলা থেকেই যাদুকরী ছিলো সে। নানা রকম যাদুবিদ্যা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতো আমাকে।

একে নিয়ে তিরিশ বছর ঘর করলাম, কিন্তু দুঃখ যে, একটা ছেলেপুলে হলো না আমাদের। তাই আমি আমার বাড়ির দাসীকে রক্ষিতা করে তার গর্ভে একটা ছেলে তৈরি করলাম। ছেলের বয়েস যখন পনেরো, তখন একদিন কাজের ধান্দায় ভিনদেশে যেতে হয়েছিলো আমাকে। আমার অবর্তমানে আমার এই বিবি, যাদু করে, ছেলেটাকে বাছুর, আর মাকে গাই গরু বানিয়ে রেখে দিলো। কিছুদিন বাদে ঘরে ফিরে বিবিকে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলে আর তার মা কোথায়। তখন সে আমাকে মিথ্যে করে বললো, দাসীটা মরে গেছে। আর ছেলেটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে বলতে পারে না।

বিবির কথা শুনে আমি শোকে দুঃখে ভেঙে পড়লাম। সারাটা বছর কেঁদে কেঁদে কাটালাম। তারপর আমাদের পরবের দিন বক্‌রি-ঈদ এসে গেলো। এই দিনটা আমরা কোরবানী করি গরু, ছাগল, মোষ যার যা ইচ্ছে। পছন্দসই একটা গরু নিয়ে আসতে বললাম আমার নোকরটাকে। নিয়ে এলো সে একটা গাই। জবাই করার জন্য ছুরি নিয়ে যখন এগিয়ে গেলাম তার কাছে, দেখি, তার চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে। আর অদ্ভুতভাবে গোঙাচ্ছে। আমার কেমন মায়া হলো। পারলাম না। নোকরটার হাতে ছুরি দিয়ে বললাম, নে, তুই কর। আমি পারবো না।

তখন কী জানতাম গাইটা আসলে গাই না। ও আমার দাসী—রক্ষিতা, আমার ছেলের মা। যাই হোক, নোকরটা জবাই করলো ওকে। আর কী আশ্চর্য, গরুটা আর গরু নাই, আমার সেই দাসী-রক্ষিতার ধড় আর মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে পড়ে আছে। দুঃখ হলো খুব। যাই হোক, নোকরটাকে বললাম, যা একটা তাগড়াই দেখে বাছুর নিয়ে আয়। নোকর আমার কথা মতো নিয়ে এলো একটা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর। কিন্তু বাছুরটাকে আনতেই সে লুটিয়ে পড়লো

আমার পায়ের কাছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, কী যেন সে বলতে চায়, পারছে না। মুখে ভাষা নাই, কি করে সে বলবে, আমাকে মেরো না, আমি তোমার একমাত্র ছেলে।

আমার মনের মধ্যে কী যে হলো, বোঝাতে পারবো না। নোকরটাকে বললাম, বাছুরটাকে আর মারবো না রে। তুই অন্য গরু নিয়ে আয়।

গল্পটা এই অবধি বলা হয়েছে, শাহরাজাদ দেখলো, রাতের আঁধার কেটে যাচ্ছে। চুপ করে গেলো সে।

ছোট বোন দুনিয়াজাদ প্রশংসা-গদগদ হয়ে বললো, কি মিষ্টি তোমার গল্প দিদি। আর কি সুন্দর করেই না বলতে পারো।

শাহরাজাদ বলে, তা ঠিক। কিন্তু আসল গল্প তো শুরুই হয়নি, বোন। শাহজাদার কৃপায় যদি বেঁচে থাকি, তবে কাল রাতে আবার বাকীটা শোনাবো। এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

দুনিয়াজাদ ঘুমিয়ে পড়লো। বাদশাহ শারিয়ার ভাবলো, ভারি মজার গল্প তো! শেষটুকু না শুনে তো মেয়েটাকে হত্যা করা যায় না।

এরপর শাহরাজাদ ঘুমে ঢলে পড়লো বাদশাহ শারিয়ারের কোলে। শারিয়ারেরও চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। শাহরাজাদকে বুকে জড়িয়ে সেও ঘুমিয়ে পড়ে তখুনি।

যখন ঘুম ভাঙে, বেলা তখন অনেক। নিজেকে তৈরি করে নিয়ে দরবারে গিয়ে ঢুকলো বাদশাহ্। উজির, আমির, ওমরাহ্ উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করলো বাদশাহকে। উজিরের পাশে এক ক্রীতদাস-এর হাতে একটা সোনার থালা। সেই থালার ওপরে তুলোট কাগজে জড়ানো একটা পান্না। সেটা তুলে নিয়ে বাদশাহর সামনে খুলে ধরলো উজির। এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সারারাত ধরে উপভোগ করে সকাল বেলায় নিজের হাতে মেয়েটার গর্দান নেয় বাদশাহ। প্রতিদিন। আজ তিন বছর ধরে এই একই নারকীয় কাণ্ড করে চলেছে বাদশাহ। আর প্রতিদিন দরবারে এসে সেই হত্যাকাণ্ডের, দরবারী কায়দায়, ঘোষণা করা হয়। ঐ পান্নায় সেই ফরমানই লেখা থাকে। বাদশাহর ইঙ্গিতে পাঠ করে শোনায় উজির।

উজির জানতো, রোজকার মতো আজ সকালেও হত্যা করেছে মেয়েটিকে। আর আজকের মেয়ে তারই নিজেরই মেয়ে। আদরের দুলালী। কান্নায় চোখ বুজে আসে। কিন্তু বাদশাহর মনে কোন সন্দেহ জাগে, এই আশঙ্কায় প্রাণ-পণে শক্ত করে রাখে নিজেকে। পান্নাটা তুলে নিয়ে খুলতে যায়। বাদশাহ হাতের ইশারায় থামিয়ে দেয় উজিরকে। দরকার নাই। আর যা যা আছে নিয়ে এসো।

অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকে উজির, একি অদ্ভুত কথা! সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। তবে কি তার নয়নের মণি, আদরের ধন, শাহরাজাদ এখনো বেঁচে আছে?

সারাদিন ধরে দরবারে নানা কাজ শেষ করে বাদশাহ ফিরে এলো খাসমহলে। নিজের শয়নকক্ষে। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে।

রাত্রে আবার আব্দার ধরলো দুনিয়াজাদ। দিদি, সেই সওদাগর আর আফ্রিদির কাহিনীটা শোনাও এবার।

নিশ্চয় শোনাবো, বোন। কিন্তু সবই নির্ভর করছে জাঁহাপনার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর।

শারিয়ার হাসলো। নাও, শুরু করো, আমারও শুনতে খুব ইচ্ছে।

—শাহরাজাদ বলতে আরম্ভ করে। যখন সেই প্রথম শেখ দেখলো, বাছুরটা কাঁদছে, তখন সে তার নোকরটাকে বললো, তুই এক কাজ কর। বাছুরটাকে খোঁয়াড়ে রেখে অন্য একটা গরু নিয়ে আয়।

এই অস্বাভাবিক কাহিনী শুনতে শুনতে আফ্রিদি দৈত্য তো অবাক!

প্রথম শেখ বলে চলে, আমার চাচার মেয়ে, আমার বিবি এই রামছাগলটা তখন দাঁড়িয়েছিলো পাশেই। বললো, না না, এই বাছুরটাকেই জবাই করো আজ। দেখছো না, কেমন মোটাসোটা, তাগড়াই। বেশ ভালো মাংস হবে।

কিন্তু আমার মন সায় দিলো না। বড় মায়া হলো। নোকরটাকে বললাম, যা, তুই আর একটা ভালো দেখে নিয়ে আয়।

পরদিন বাড়িতে বসে আছি, নোকরটা ছুটতে ছুটতে এসে বললো, একটা ভালো খবর আছে, মালিক। আমার লেড়কী যাদুবিদ্যা আর ঝাড়ফুঁকের মন্তর-তন্তর শিখেছিলো এক বুড়ির কাছে। সেই বুড়িটা এখন আমার বাড়িতেই থাকে। কাল যখন তুমি আমাকে বললে, বাছুরটাকে নিয়ে যা, তখন ওকে নিয়ে সোজা চলে গেলাম আমার লেড়কীর কাছে। বাছুরটাকে দেখা মাত্র মেয়ে আমার, নাকাব দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেললো। বুঝতে পারলাম না। আমি ছাড়া অন্য কোন পর-পুরুষ তো ছিলো না সেখানে! তবে কেন সে শরম করলো! বাছুরটাকে দেখতে দেখতে প্রথমে সে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো। কিন্তু তারপর কেঁদে ফেললো। আমাকে বললো, বাপজান, তুমি এই বাছুরটাকে নিয়ে এলে কেন আমার কাছে? তোমার মনে কি কোন সন্দেহ হয়েছে? ও যে আসলে একটা বাছুর না, মানুষের ছেলে, সে কথা কি জানতে?

—কী বলছিস তুই? কোথায় মানুষের ছেলে? আর ওকে দেখতে দেখতে কেনই বা কাঁদলি, আর হাসলিই বা কেন? কি ব্যাপার?

তখন মেয়ে বললো, এই বাছুরটা আমাদের মালিকের ছেলে। ওর সৎমা যাদু করে ওকে বাছুর বানিয়ে রেখেছে।শুধু ওকে না, ওর মাকেও গাই করে রেখেছিলো সে। তোমরা তাকে আজ জবাই করেছো? বাছুরটা যখন বললো, তার বিমাতা তাকে আর মাকে যাদু করে বাছুর আর গাই করে রেখেছে তখন আমি হেসেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম, তার মাকে তোমরা আজ জবাই করে মেরেছো তখন আমি কেঁদেছি।

আমার লেড়কীর কথা শুনে তো আমি থ। এ আবার কি ভুতুড়ে কাণ্ড। এমন আবার হয় নাকি! সারাটা রাত ঘুম নাই চোখে। কখন সকাল হবে, কখন তোমাকে জানাবো, সেই জন্যে ছটফট করছি।

নোকরের এই কথা শোনামাত্র তাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। আনন্দে তখন আমি এমনই আত্মহারা যে, এমন সুখবর যে এনে দিলো তাকে যে একটু দারুপানি খাওয়াবো, তাও বেমালুম ভুলে গেলাম। তখন আমার শুধু এক চিন্তা, কতক্ষণে আমার জানের কলিজা—প্রাণের বাছাকে দেখতে পাবো।

নোকরের বাড়ি পৌঁছতেই ওর সুন্দরী মেয়ে আমাকে আপ্যায়ন করে বসালো। আর বাছুরটা এসে আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়লো। মেয়েটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যা বলেছো মা তাকি সত্যি?

মেয়েটি অবাক হলো। বললো, ওমা, সত্যি হবে না কেন? ও আপনার ছেলে, মালিক।

আমি বললাম, তোমার কথাই যদি ঠিক হয় মা, আর তুমি যদি আমার ছেলেকে আবার ফিরিয়ে দিতে পারো, তবে তুমি যা চাও তাই দেবো আমি। তোমার বাবা আমার যে সব গরু ছাগল মোষ দেখাশোনা করে, সব তোমার হবে। আমার গোলায় দানা-শস্য যা মজুত আছে, সব দেবো তোমাকে।

মেয়েটি বললো, মালিক, আপনার এই সব মূল্যবান বিষয় সম্পত্তি আমি নিতে পারি দু'টো শর্তে। প্রথম শর্ত হলো, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার শাদী দিতে হবে। আর পরের

শর্ত হলো, আপনার ঐ ডাইনী বিবিকে যাদু মন্ত্র দিয়ে আমার ইচ্ছে মতো একটা জানোয়ার বানিয়ে রাখবো আমি। যাদুবিদ্যা বড় বিদ্যা। তা শিখে তার অপব্যবহার করা মস্ত পাপ। আর এই জন্যেই তাকে শাস্তি দিতে চাই আমি। আপনি যদি রাজি থাকেন, বলুন মালিক, আমি এখুনি আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

—শোনো, দৈত্য সম্রাট, তখন আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছো। নোকরের মেয়ের শর্তে রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, তুমি যা বলবে তাই হবে, মা। তুমি এখন আমার ছেলেকে মানুষ করে দাও। তার সঙ্গে আজই তোমার শাদী দিয়ে দেবো। তুমি আমার ঘরে যাবে। সব বিষয় সম্পত্তি তোমার হবে। তোমার কথা মতোই সব হবে। তুমি যা চাও তাই হবে। আমার বিবিকে তুমি যা বানাতে চাও তাই বানিয়ে রেখো। কোন আপত্তি করবো না। শুধু আমার ছেলেকে আবার মানুষ করে দাও।



আমার কথা শোনার পর, একটা ছোট্ট তামার বাসন নিয়ে এলো সে। পানিতে ভরা। বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগলো সেই পানির ওপর। তারপর সেই পানিটুকু হাতে নিয়ে বাছুরটার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকলো, খোদা যদি তোমায় বাছুর বানিয়ে থাকে তবে তুমি বাছুরই থাকবে। আর যদি কোন ডাইনী তোমাকে যাদু করে বাছুর বানিয়ে রাখে তবে, আল্লার দোয়ায়, তোমার আসল চেহারায় ফিরে এসো।

কি আশ্চর্য, বাছুরটা ধীরে ধীরে একটা মানুষের চেহারা ফিরে পেতে লাগলো। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, তোমার এই দশা কে করেছিলো, বাপজান?

তখন সে গোড়া থেকে সব বৃত্তান্ত বলতে লাগলো। এই বুনো রামছাগলটা—আমার চাচার মেয়ে—কি করে তাকে আর তার মাকে বাছুর আর গাই বানিয়ে রেখেছিলো তার বিস্তারিত কাহিনী শোনালো। আমি তাকে আদর করতে করতে বললাম, তোমার সৎমা এমন শয়তানী করেছিলো যে, না জেনে, হয়তো তোমাকে নিজের হাতেই কোরবানী করে ফেলতাম আমি। কিন্তু খোদা মেহেরবান, তিনিই তোমাকে বাঁচিয়েছেন। আর তোমাকে ফিরে পেলাম আজ। এই মা-জননীর দয়ায়। আমি তাকে কথা দিয়েছি, বাপজান, তোমার সঙ্গে তার আমি শাদী করিয়ে দেবো।

সেই দিনই শাদী দিলাম ছেলের। নোকরের মেয়েকে ছেলের বৌ করে ঘরে নিয়ে এলাম। তার যাদুমন্ত্রে আমার চাচার মেয়ে—আমার তিরিশ বছরের বিবি বুনো রামছাগল হয়ে গেলো। ছেলে বৌয়ের হাতে সংসার তুলে দিয়ে এখন আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। এখন আমার পথের সাথী আমার চাচার মেয়ে—আমার তিরিশ বছরের ঘর-করা বিবি—এই বুনো রামছাগল।

এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি, বটবৃক্ষের নিচে বসে কাঁদছে এই সওদাগর। মায়া হলো। কাছে এলাম। শুনলাম তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। তারপর অপেক্ষায় ছিলাম। কী ঘটে, দেখে যাই।

আফ্রিদি দৈত্য খুশিতে লাফিয়ে উঠলো। বড় মজাদার কিস্‌সা। যাও, তোমার জন্যে সওদাগরের একভাগ গুনাহ্ মাফ করে দিলাম আমি।

এরপর দ্বিতীয় শেখ—সেই দুই গ্রে-হাউন্ড কুকুরের মালিক—এগিয়ে এসে সালাম জানালো আফ্রিদিকে। আমার কাহিনী যদি শোনো, দৈত্য সম্রাট, থ হয়ে যাবে তুমি।

এতক্ষণ যে কাহিনী শুনলে, তার চেয়েও মজাদার। আমার গল্প শুনে যদি তোমার ভালো লাগে তবে বেচারী সওদাগরের আর একটু অপরাধ মাফ করে দিও।

আফ্রিদি ঘাড় নেড়ে বললো, তাই হবে, শেখ সাহেব, অবশ্য তোমার গল্প যদি সত্যই আমার ভালো লাগে।

এবার দ্বিতীয় শেখ তার কাহিনী শুরু করে ঃ

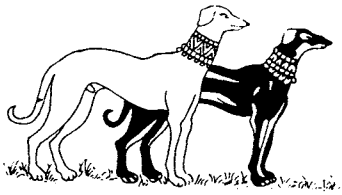

—এই যে দু'টি গ্রে-হাউন্ড কুকুর দেখছো, আফ্রিদি সম্রাট, আসলে কিন্তু এ দু'টো কুকুর না। আমার সহোদর বড় দুই ভাই। আমি সবার ছোট। আমাদের আব্বাজান মারা যাওয়ার সময় তিন ভাইয়ের জন্যে তিন হাজার সোনার মোহর রেখে যান। আমার অংশের মোহর নিয়ে আমি একটা দোকান করলাম। আমার দুই ভাই—এরাও দু'জনে দু'টো দোকান করলো। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আমার এক ভাই এক সওদাগর দলের সঙ্গে বছরখানেকের জন্য বিদেশে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে গেলো।

বছরখানেক বাদে ফিরে এলো সে শূন্য হাতে। বাণিজ্য করতে গিয়ে সব খুইয়ে এসেছে সে। আমি তাকে বললাম, বাণিজ্যে যাওয়ার আগে পইপই করে বারণ করেছিলাম তোমাকে। শুনলে না। আল্লাহর ইচ্ছে বোধ হয় এই ছিলো। তাই আজ তোমার ভাগ্যের এই হাল। আর সেই কারণেই আমার বারণও তোমার ভালো লাগেনি সেদিন।

যাই-হোক সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিয়ে আমার দোকানে নিয়ে এলাম তাকে। ভালো করে গা হাত-পা ধুয়ে ফ করে গোসল করলো সে। আমার দামী পোশাক দিলাম পরতে। তারপর সঙ্গে বসে খানাপিনা সারলাম দু'ভাই। অনেক কথার ফাঁকে তাকে বললাম, দেখ ভাই, এই এক বছরে বেচাকেনা করে মোটামুটি ভালোই লাভ দাঁড়িয়েছে। আসল যা ছিলো তাই আছে। উপরন্তু লাভ হয়েছে হাজার দিনার। এক কাজ কর। এই লাভের অর্ধেকটা তুমি নাও। আবার দোকান সাজাও। দেখবে, ওতেই বেশ চলে যাবে। কী দরকার বেশি লোভ বাড়িয়ে?

আমার কথা মতো আবার সে দোকান করে কেনা-বেচা করতে লাগলো। এই ভাবে দিন কাটে। একদিন আমার দুই ভাই আমার কাছে এলো। বললো, সওদাগরের একটা দল বাণিজ্যে যাচ্ছে। আমরাও যাবো ঠিক করেছি। দোকানের কেনা বেচায় খাওয়া-পরা চলে যাবে ঠিকই, কিন্তু বড়লোক হওয়া যাবে না। আমরা বড়লোক হতে চাই। দেশের কত লোক বাণিজ্যে গিয়ে ধনী হয়ে ফিরে এসেছে, আমরাও যাবো। আমাদের ইচ্ছে, তুমিও সঙ্গে চলো।

আমি তাদের কথায় 'না' করে দিয়ে বললাম, একবার গিয়েও আক্কেল হয়নি, সব খুইয়ে এলে, আবার যেতে চাও কোন্ লজ্জায়!

আমার ধমকানিতে সেদিন তারা ফিরে গেলো। কিন্তু মাঝে মাঝেই এসে নানা রকম গল্প বলে লোভ দেখাতে লাগলো। কত লোক পথের ভিখিরি থেকে বড়লোক হয়ে দেশে ফিরেছে, তার লম্বা ফিরিস্তি শোনাতে লাগলো আমাকে। কিন্তু বার বার নিষেধ করতে লাগলাম তাদের। ওসব শুনতে গেলে সোনার গাঁ, কাছে গেলে কিছুই না।

তবু ওরা হাল ছাড়ে না। সেদিন ফিরে যায়। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আবার ফিরে আসে। আবার আমি তাদের ফিরিয়ে দিই। এভাবে ছ'টা বছর পার হয়ে গেলো। অবশেষে তাদের প্রস্তাবে রাজি হলাম আমি। বললাম, এই ক'বছরে যার যা লাভ হয়েছে, নিয়ে এসো।

গুনে দেখা গেলো, ছয় হাজার দিনার লাভ দাঁড়িয়েছে। ঠিক হলো বাণিজ্যের জন্যে

তিন হাজার দিনার সঙ্গে নেবো। আর বাকী তিন হাজার মাটিতে পুঁতে রেখে যাবো। কে জানে, বিদেশ বিভুঁই, কিছু বলা যায় না। যদি দিনারগুলো খোয়া যায়, তবে দেশে ফিরে পথে বসতে হবে।

আমার কথায় দু'জনেই সায় দিলো। এর পরে প্রত্যেক ভাই এক হাজার দিনার সঙ্গে নিলাম। নানা ধরনের মনোহারী জিনিসপত্র সওদা করে বাক্স-প্যাটরা বোঝাই করলাম। তারপর নৌকায় বোঝাই করে, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পাল তুলে দিলাম।

মাসখানেক কেটে গেছে। একদিন এক বন্দরে নোঙর করলাম আমরা। একদিনের জন্যে। দশ দিনার লাভে একটা সওদা করে আবার ভাসিয়ে দিলাম নৌকো। অন্য কোনও বড় শহরে যাবো আমরা। আরও কয়েকদিন কেটে গেলো। এক বন্দরে ভেড়ালাম নৌকো। সেই বন্দরেই আলাপ হলো একটি রূপবতী নারীর সঙ্গে। যেমন তার রূপ তেমনি তার যৌবন। কিন্তু বড্ড গরীব। ছেঁড়া ময়লা পোশাকে লজ্জা ঢাকতে পারছে না সে। তার উদ্দাম যৌবন পথচারীর বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। মেয়েটিই এগিয়ে এলো, আমায় কিছু সাহায্য করবে, মালিক? আমি বড় গরীব। তার বদলে তোমরা যা বলবে, করে দেবো। আমি তোমাদের সওদা বয়ে নিয়ে যেতে পারি শহরে। কেনা-বেচাও করে দিতে পারি, যদি চাও। আমি খানা পাকাতে পারি।

আমি প্রশ্ন করলাম, কোথায় থাকো তুমি, আর কে আছে তোমার?

ও বললো, থাকি এই শহরেই। আর আপনজন বলতে কেউই নাই আমার। পথে পথে ঘুরি। যদি কেউ খেতে দেয় খাই। যদি কেউ আশ্রয় দেয়, রাত কাটাই। না হলে দীন দুনিয়ার মালিক আছেন ওপরে, তাঁর ইচ্ছায় দিন কেটে যায় কোন রকমে।

মেয়েটি গরীব হলে কি হয়, কথাবার্তা শুনে মনে হলো, ভালো বংশের মেয়ে। আমার দিকে আরও একটু এগিয়ে এসে বললে, আমাকে সাহায্য করলে তা ফেল্‌না যাবে না তোমার। কোনও-না-কোনও ভাবে আমি তোমার উপকারে আসবো। আমাকে একটু আশ্রয় দাও, দেখো, তোমার ভালো হবে।

মেয়েটির কথায়—বিশেষ করে ওর বলার ঢং-এ কেমন মায়া হলো আমার। বললাম, ঠিক আছে, তুমি আমার নৌকায় এসো। আমার কাছেই থাকবে। কাজকাম যা করতে ইচ্ছে হয় করবে, না হয় করবে না। সে জন্যে কিছু এসে যাবে না। আশ্রয় দিচ্ছি বলেই যে তোমাকে কিছু ফেরৎ দিতে হবে, সে কথা মনে রেখো না।



মেয়েটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো, এই যদি তোমার মনের কথা, তা হলে আমাকে শাদী করে নাও না কেন?

কেন জানি না, খুব ভালো লাগলো ওর কথাগুলো। তাছাড়া ওর দেহে আছে রূপ-যৌবন। এই নিঃসঙ্গ পরবাসে একটি সুন্দরী যুবতীর সঙ্গ কে না চায়! রাজি হয়ে গেলাম তার কথায়। নৌকায় তুলে নিলাম তাকে। ছেঁড়া-ময়লা পোশাক-আশাক ছুঁড়ে দিলাম জলে। গরম পানি করে ঘষে মেজে সাফ করলাম ওর সারা দেহ। আচ্ছা করে গোসল করালাম তাকে। তারপর দামী শাড়ি পরালাম, সুরমা এঁকে দিলাম চোখে। আতরের সুবাসে মদির হয়ে উঠলো ওর দেহ। মখমলের গদীর বিছানায় বসালাম তাকে। দু'জনে এক সঙ্গে বসে খানাপিনা করলাম। গল্প করলাম অনেক। ওর জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনী শোনালো আমাকে। আমিও শোনালাম আমার জীবনের কাহিনী। এইভাবে দু'জনে দু'জনার কাছাকাছি হয়ে এলাম আরও। সেই রাতে আমরা মধুযামিনী করলাম। আকাশে আধখানা চাঁদ।

নিচে নীল জল। চারদিক নিস্তব্ধ-নিশুতি। শুধু মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ তুলে উড়ে যাচ্ছে দু-একটা রাতচরা পাখি। আমরা দু'জনে নৌকার কিনারে বসে চাঁদনী রাতের এই মনমাতানো রূপে মুগ্ধ হতে থাকলাম। ওর হাতে আমার হাত। রাত্রির মুখে ভাষা নাই। আমরাও হারিয়ে ফেলেছি আমাদের ভাষা। রাত যখন গভীর হতে থাকে আমাদের দু'জনের অন্তরঙ্গতাও গভীরতর হতে থাকে আরও। দিনের তাপে উত্তপ্ত হাওয়ায় এখন হিমের আমেজ লাগছে। কেমন শীত শীত মনে হতে, ওর নরম উষ্ণ বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজে দিই। দু'হাতে জড়িয়ে ধরি ক্ষীণ কটি। তারপর কোন রকমে উঠে আসতে পারি শোবার ঘরে। মখমলের নরম গদি আর আমার বুকের চাপে হারিয়ে যেতে থাকে ওর থরথর নরম দেহ।

দিনে দিনে ভালোবাসা আরও গভীর হয়। শেষে এমন হলো, এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারি না তাকে। এই ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখলো না আর দুই ভাই। তাদের বয়েস হয়ে গেছে। কোন সুন্দরী রূপসী মেয়ে তাকায় না তাদের দিকে। আমার বয়েস কম। স্বাস্থ্য ভালো। যৌবনের জোয়ার আছে শরীরে। তাই তাদের হিংসে। আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না তারা। সদাসর্বদা এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আমাদের আড়ালে দু'ভাই শলাপরামর্শ করে। আমার সৌভাগ্যে—কাতর হয়ে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। শকুনীর মতো চোখ দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো আমাদের ঘরে। কী ভাবে আমি তাকে আদর করি, কী ভাবে আমাকে সে আদর করে, কী করে আমরা দু'জনে দু'জনের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকি—সেই সব একান্ত আপন, একান্ত গোপন দৃশ্য দেওয়ালের ফুটোয় চোখ রেখে দেখে দেখে বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করতো তারা। আর আমার নারী ভাগ্যের ঈর্ষায়, আক্রোশে ফেটে পড়তো। আমায় হত্যা করে আমার ধনদৌলত হাতিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো তারা। বুঝলাম, শয়তান ভর করেছে ওদের ওপর।

একদিন গভীর রাত্রে আমি আমার বিবিকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় চুপি চুপি ঘরে ঢুকে আমাদের দু'জনকে তুলে নিয়ে গিয়ে দরিয়ার মধ্যে ফেলে দিলো ওরা। তৎক্ষণাৎ আমার বিবি এক বিশাল জিনির রূপ ধারণ করলো। আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে কূলের দিকে চললো। একটা দ্বীপে গিয়ে নামালো আমাকে। তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো নিমেষে। যে দিকে তাকাই ঘন অন্ধকার। কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। সারারাত সেই নির্জন দ্বীপে, নিরন্ধ্র অন্ধকারে একা বসে রইলাম আমি। সে ফিরে এলো সকালে।



বললো, আমাকে চিনতে পারো? বলো তো, কে আমি?

আমি হতভম্ব হয়ে তার এই বিশাল রূপ দেখতে থাকি।

ও বললো, আমি তোমার বিবি। আমি তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছি আজ রাতে। আমি হচ্ছি এক জিনি-আহ্। প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে। আল্লাহরও সেইরূপ ইচ্ছে ছিলো। আল্লাহ্‌তে আমার গভীর বিশ্বাস। আর এও বিশ্বাস করি, তার ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়াতে কোন কিছুই করা সম্ভব না। আমি যখন এক ভিখারিণীর বেশ ধরে তোমার দয়া ভিক্ষা করেছিলাম তখন তুমি আমাকে তোমার বিবি করে নিয়েছিলে। আজ আমি তোমার জান বাঁচাতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কিন্তু তোমার শয়তান ভাই দু'টোকে আমি হত্যা করবো।

তার কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি। অন্তর দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম তাকে। কিন্তু আমার ভাইদের হত্যা করবে শুনে বিচলিত হয়ে পড়লাম। শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত ভাইদের সব বৃত্তান্ত খুলে বললাম তাকে। সব শুনে সে বললো, আজ রাতেই উড়ে গিয়ে ওদের নৌকোটা ডুবিয়ে দেবো আমি। নৌকো ডুবে গেলে তারাও মরে যাবে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, খোদা তোমার সহায়, তুমি তা নিশ্চয়ই করতে পারো। কিন্তু আমার অনুরোধ, আর যাই করো, জানে মেরো না ওদের। হাজার হলেও ওরা আমার ভাই। জানো তো একটা প্রবাদ আছে : মূর্খের উপকার করলে সে তার মর্ম বোঝে না। উল্টে সে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। দুষ্ট লোকেরা দুষ্টই থেকে যায়। চেষ্টা করেও সৎ হতে পারে না। সেইটেই তাদের বড় শাস্তি।

না, না, জিনি চিৎকার করে ওঠে, ওদের কোন রেহাই নাই। মৃত্যুই একমাত্র পাওনা।

এই বলে আমাকে কাঁধে তুলে আকাশপথে উড়তে থাকে। উড়তে উড়তে এক সময়ে এসে নামালো সে আমার বাড়ির দরজায়।

বাড়িতে ঢুকেই পুঁতে রাখা দিনারগুলো তুলে নিলাম। তারপর দোকানে গেলাম। দেখলাম, যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনটি রয়েছে সব। সন্ধ্যেবেলা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে দেখি, ঘরের দাওয়ায় দু'টো গ্রেহাউন্ড কুকুর শিকলে বাঁধা। কাছে যেতেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো তারা। আমার কামিজের খুঁট ধরে টানতে লাগলো। কিছুই বুঝতে পারছি না, কি ব্যাপার! এমন সময় আমার বিবি সেই জিনি এসে বললো, এই দুই রত্ন তোমার দুই ভাই।

জিজ্ঞেস করলাম, কি করে হলো এই দশা?

ও বললো, আমার ছোট বোন, যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত সে। বলেছে, দশ বছরের মধ্যে ওদের কেউ মানুষের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

দশ বছর পুরো হয়ে গেছে। এখন আমি আমার সেই শালীর সন্ধানে বেরিয়েছি। তার দেখা পেলে অনুরোধ জানাবো, আমার এই ভাই দু'টোকে যদি সে আবার মানুষ করে দেয়। এই আমার ইচ্ছে। আমার শালীর সন্ধানে যেতে যেতে এইখানে এই বটবৃক্ষের নিচে এদের সঙ্গে আমার দেখা। এদের মুখেই শুনলাম, এই সওদাগরের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। তাই অপেক্ষা করছিলাম। দেখে যাই, কী ঘটে!

দ্বিতীয় শেখ বললো, আমার কাহিনী তো শুনলে আফ্রিদি সম্রাট। এখন বলো কেমন লাগলো তোমার।

চমৎকার— চমৎকার, এমন চমৎকার কাহিনী আমি কখনও শুনিনি। সওদাগরের আরও একভাগ দোষ মাফ করে দিলাম আমি।

এবার সেই খচ্চরটার মালিক—তৃতীয় শেখ এগিয়ে এসে সালাম জানালো আফ্রিদিকে। আফ্রিদি বললো, তোমার আবার কি কাহিনী? শোনাও দেখি।

তৃতীয় শেখ বললো, শোনো, আফ্রিদি সম্রাট, আমার কাহিনী আরও মজাদার। এই যে খচ্চরটা দেখছো, এ হচ্ছে আমার বিবি। কাজের তাগিদে, এক সময়, বছরখানেকের জন্যে বিদেশে গিয়েছিলাম। কাজকাম শেষ করে ঘরে ফিরলাম একদিন। রাত তখন অনেক, বাড়িতে ঢুকেই বিবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে অন্দরে গেলাম। ঘরে ঢুকতে গিয়েই মাথাটা ঘুরে গেলো। দেখি, এক নিগ্রো নফরের কোলে মাথা দিয়ে আমার এই বিবিজান বেশ রসালাপে মত্ত। মুখে চলেছে হাসি মস্করা এবং আদি রসের খেউড়। আর হাতে চলেছে শৃঙ্গার। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হয়ে উঠছে দু'জনে। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার ওপর নজর পড়লো আমার বিবির। আর তখুনি তড়াৎ করে উঠে একটা জলের বাটি তুলে

নিয়ে ছুটে এলো আমার দিকে। আমাকে যে কখন দেখে নিয়েছে, বুঝতে পারিনি। জলের বাটিটার ওপর বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়ালো। আর সেই জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলো আমার গায়ে। আর কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা কুকুর হয়ে গেলাম। তখন সে আমাকে তাড়িয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলো।

সারা শহর ঘুরে ঘুরে শেষে এক কষাই-এর দোকানে এসে ফেলে দেওয়া কিছু মাংসের হাড়গোড় চিবুতে লাগলাম। দারুণ খিদে পেয়েছিলো আমার। কষাই-এর প্রাণে বোধহয় দয়া হলো। বাড়ি ফেরার সময় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো সে।



কষাই-এর কন্যা, আমাকে দেখামাত্র, নাকাব দিয়ে মুখখানা ঢেকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো বাবাকে। তুমি তো জানো বাপজান, পর-পুরুষের সামনে আমি কখনও বেরোই না, তবে একে নিয়ে অন্দরমহলে ঢুকেছো কেন? এতো আর সত্যি সত্যি কুকুর না। একজন পুরুষ মানুষ। একটা শয়তান মেয়েমানুষ ওকে যাদুমন্ত্র দিয়ে কুকুর বানিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি বলো, এখনি আমি ওকে আবার মানুষ করে দিতে পারি।

কষাই বললো, তা হলে মা, তুমি আর দেরি করো না। ওকে এখুনি মানুষ করে দাও। আহা, বেচারার কি কষ্ট!

তখন একটা বাটিতে খানিকটা জল নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়লো সে। তারপর জলটুকু হাতে নিয়ে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে আবার কি যেন সব বিড়বিড় করে আওড়ালো। ধীরে ধীরে আমার দেহ রূপান্তরিত হয়ে গেলো আমার আগের চেহারায়। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো আমার মন। মেয়েটির হাতে ছোট্ট একটা চুম্বন করে বললাম, আমাকে যে শয়তানী যাদু করে রাস্তার কুকুর বানিয়ে কষ্ট দিয়েছে তাকে আমি শায়েস্তা করতে চাই। মন্ত্র দিয়ে তুমি তাকে খচ্চর বানিয়ে দিতে পারো, সুন্দরী?

নিশ্চয়ই পারি। এ আর এমন কঠিন কি কাজ!

তখন কষাই-কন্যা ছোট্ট একটা পাত্রে খানিকটা জল এনে মন্ত্র পড়ে আমার হাতে দিয়ে বললো, যখন তোমার বিবি ঘুমিয়ে থাকবে তখন তার গায়ে এই পানি ছিটিয়ে দিয়ে মনে মনে যা কামনা করবে সে তাই হয়ে যাবে।

দৈত্য সম্রাট, এই যে খচ্চরটা দেখছো, এ আমার সেই যাদুকরী বিবি।

তখন আফ্রিদি রসিকতা করে জিজ্ঞেস করে, কি গো, তোমার স্বামী যা সব বললো, ঠিক?

তারপর তৃতীয় শেখের দিকে ফিরে বললো, তোমার কাহিনী শুনে খুব খুশি হলাম, শেখ। সওদাগরকে সব গুনাহ্ থেকে মাফ করে দিলাম। যাও সওদাগর, তোমার ছুটি, তোমাকে খালাস করে দিলাম।

এমন সময় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে। কনিষ্ঠা দুনিয়াজাদ আনন্দে গদগদ হয়ে বলে, কি সুন্দর গল্প, দিদি! আর কি মিষ্টি করেই না বলতে পারো তুমি!

এ আর এমন কি? শাহরাজাদ বললো, যদি বেঁচে থাকি তো কাল রাতে আরও মজার কাহিনী শোনাবো।

বাদশাহ ভাবে, বাকী গল্পগুলো না শুনে তো ওকে মারা যায় না!

এরপর শাহরাজাদ আর শারিয়ার আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। দরবারের

সময় সমাগত। শারিয়ার শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লো। নিজেকে তৈরি করে নিয়ে চলে গেলো দরবারে। সারাদিন নানা কাজের ব্যস্ততায় কাটে। রাত্রে আবার ফিরে আসে খাসমহলে। শাহরাজাদের শয্যাকক্ষে।

দুনিয়াজাদ আব্দার ধরে, এবার তোমার কাহিনী শুরু করো, দিদি!

শাহরাজাদ বলে, এখুনি শুরু করছি, বোন। তারপর শুনুন জাঁহাপনা, সেই তৃতীয় শেখ তার গল্প শেষ করতে আফ্রিদি খুশি হয়ে বললো, তোমার গল্প শুনে খুব ভালো লাগলো, শেখ। সওদাগরের সব অপরাধ মাফ করে দিলাম আমি।

নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে সওদাগর তখন কেঁদে ফেলেছে। তিন শেখকে বুকে জড়িয়ে ধরে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালো সে। পরে সবাই যে যার দেশের পথে পা বাড়ালো।

কিন্তু এ কাহিনী, শাহরাজাদ বলতে থাকে, সেই ধীবর আর আফ্রিদি দৈত্যের কাহিনীর কাছে কিছু না।

শারিয়ার কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে, শোনাও দেখি, কেমন সে কাহিনী?

শাহরাজাদ শুরু করে।



এক সময়ে এক বৃদ্ধ ধীবর তার স্ত্রী আর তিনটি পুত্র কন্যা নিয়ে এক নদীর ধারে বাস করতো। ফি দিনে মাত্র পাঁচবার জাল ফেলতো সে জলে। তার বেশি কোনদিন ফেলতো না। একদিন দুপুর বেলায় নদীর ধারে এসে জালের প্যাঁটরাটা নামিয়ে জলে ছড়িয়ে দিলো জাল। কিছুক্ষণ বাদে জালটা যখন গুটিয়ে তুলতে থাকে তখন মনে হলো, কি যেন একটা ভারী জিনিস জালে বেধেছে। আশায় আশায় কূলে তুললো জাল। হা আল্লাহ্, একটা গাছের গুঁড়ি। জালটা গুটিয়ে নিয়ে আবার ছত্রাকারে ছড়িয়ে ফেলে জলে। এবার তুলে দেখলো জালে জড়িয়ে গেছে একটা মরা গাধা। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আল্লাহ্‌র বোধহয় এই রকমই ইচ্ছা। তা না হলে এমনটা হবে কেন? গাধাটাকে জাল থেকে ছাড়িয়ে আবার জলে ফেলে জাল। এবার গুটাতে গিয়ে আর গুটাতে পারে না। পেল্লাই ভারী। টেনে তোলা দায়। যাই হোক, কায়দা কসরৎ করে তুললো। মনে আশা, এবার বুঝি বিরাট মাছ আটকেছে। কিন্তু তুলে দেখে, মস্ত বড় একটা মাটির জালা। কাদায় ভর্তি। বিরক্ত হয়ে জালটা দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার ফেললো জাল। এবার পেলো কিছু ভাঙা পাত্র আর কাচের টুক্‌রো।

তখন সে দু'হাত তুলে খোদাতালার কাছে ক্ষোভ জানাতে থাকে। হায় খোদা, আজ আমার বরাতে কিছুই জুটলো না! চারবার জাল ফেললাম। কিছুই পেলাম না। এবার শেষ বার। দেখি তোমার কি দয়া হয়!

এই বলে শেষবারের মতো ফেললো জালখানা। গুটাতে গিয়ে মনে হলো, কোন পাথরের চাই-এ আটকে গেছে। অনেক কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত তুলে আনলো ওপরে। ধীবর দেখলো, একটা তামার জালা। জালাটার মুখ সিলমোহর করা। মোহরের ছাপটা পড়ে দেখলো, দাউদের পুত্র শাহেনশাহ্ সুলেমানের নাম অঙ্কিত করা আছে!

ধীবরের মনে আশার সঞ্চার হলো। যাক্, এমন একটা জিনিস পাওয়া গেলো যা বিক্রি করে কিছু পয়সা হয়তো পাওয়া যাবে। অন্তত দশটা দিনার তো পাওয়া যাবেই। জালাটা একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চাইলো। কিন্তু বেজায় ভারী। নাড়ানো শক্ত। ধীবর ভাবে, আগে দেখতে হবে জালাটার মধ্যে কি জিনিস আছে। অনেক গল্প কাহিনীতে শুনেছে, সেকালের বাদশাহরা ঘড়াঘড়া সোনার মোহর মাটির তলায় পুঁতে রাখতো। সেরকম যদি কিছু হয়? আর ভাবতে পারে না সে। আঃ, তা হলে কি হবে! এক্কেবারে রাতারাতি বড়লোক।

যাই হোক, জালার মুখটা আগে খোলা দরকার। একটা ছুরি দিয়ে সীলমোহরটা খুলে ফেললো। কিন্তু মুখের ঢাকনাটা আর কিছুতেই খুলতে পারে না সে। অনেক চেষ্টা করে এক সময়ে খুলে ফেললো। ঢাকনাটা তুলতেই একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগলো ভিতর থেকে। আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকে। ক্রমশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো চারদিক। তারপর দেখলো, সেই বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা এক বিকটাকার আফ্রিদি দৈত্যের রূপ ধারণ করছে। তার পা দু'টো যেন জাহাজের মাস্তুল। আর হাত দু'টো বিশ্রী রকমের লম্বা-গাঁইতির মতো। মাথাটা আকাশ-ছোঁয়া একটা প্রকাণ্ড গোলক। আকর্ণ বিস্তৃত গুহাসদৃশ মুখের হাঁ। আর শ্বেত পাথরের নুড়ির মতো তার দাঁতগুলো। বাঁশের চোঙার মতো নাকের ফুটো। চোখ দু'টো জ্বলন্ত পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ। মাথা ভর্তি উলুখাগড়ার জঙ্গল।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ধীবরের দাঁতকপাটি লেগে গেলো। সারা দেহ অবশ, অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। চোখ খুলে দেখার সাহস হলো না আর।

ধীবরকে দেখেই চিৎকার করে ওঠে আফ্রিদি। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছু মানি না আমি। সুলেমান আল্লাহ্র পয়গম্বর।

এবার সে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলতে লাগলো, তুমি আল্লাহ্র পয়গম্বর, দুনিয়ার মালিক, মেহেরবান সুলেমান, তুমি আমাকে হত্যা করো না—এই আমার ভিক্ষা। আর কখনও তোমার অবাধ্য হবো না আমি। কখনও বিদ্রোহ করবো না।

এবার ধীবর বললো, আফ্রিদি সম্রাট, বাদশাহ সুলেমানের ভয়ে তুমি কাঁপছো কেন? সুলেমান তো সেই কবে আঠারোশো বছর আগে মারা গেছে। তারপর দুনিয়ায় কত কাণ্ড ঘটে গেছে; তা জানো? কিন্তু ব্যাপার কী? কি কারণে বাদশাহ্ সুলেমান তোমাকে ঐ জালার মধ্যে পুরে বন্দী করে রেখেছিলো? কী তোমার গোস্তাকি?

এ কথা শুনে আফ্রিদির ধড়ে প্রাণ এলো। এবার সে আশ্বস্ত হয়ে বললো, শোনো জেলের পো, আল্লাহ্ ছাড়া কিছুতে বিশ্বাস নাই আমার। তোমার জন্যে আমি একটা সুখবর এনেছি তার কাছ থেকে।

ধীবর বললো, কী সুখবর?

—তোমার মৃত্যু। আফ্রিদি হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, এবং সে মৃত্যু বিশ্রী রকমের বীভৎস!

ধীবর-এর বুক শুকিয়ে যায়। বলে, খবরটা জানাবার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু দৈত্য শিরোমণি, কী কারণে তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছো, কী আমার গোস্তাকী! বহুকালের বন্দী দশা থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করলাম আজ। এই কি আমার অপরাধ?

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে আফ্রিদি বললো, এখন বলো, কী ধরনের মৃত্যু তুমি চাও?

—কিন্তু আমার দোষ কী? কী আমার অপরাধ?

তখন দৈত্যটা বললো, তা হলে আগাগোড়া সব কাহিনী শোনো আমার। তাহলেই তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।

ধীবর বললো, সংক্ষেপে বলো, শুনি।

আফ্রিদি বলতে থাকে। তুমি বোধহয় জানো, আমি সক্-হর-অল্ জিনি। দাউদের পুত্র শাহেনশাহ সুলেমানের এক বিদ্রোহী নফর। এক সময় সুলেমান তার দুর্ধর্ষ উজির আশফ-ইবন-বারাখ্যাকে পাঠিয়েছিলো আমাকে শায়েস্তা করার জন্য। আমার অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও আমাকে কাবু করে ফেলেছিলো সে। বিশ্বাস করো, তখন আমার নিজেকে এত ক্ষুদ্র, এত হেয় মনে হয়েছিলো তা বলার নয়। সুলেমান আমাকে খুব ভালোভাবেই বলেছিলো, তোমার সব বেয়াদপি মাফ করে দেবো আমি। তুমি আমার অনুগত বান্দা হয়ে থাকো। আমি কিন্তু তার কথা শুনলাম না। বললাম, না, তা হয় না। তখন একটা তামার জালা এনে, তার মধ্যে আমাকে পুরে, সীসের পাত দিয়ে জালার মুখটা এঁটে দিলো। বাদশাহ সুলেমানের মোহর এঁকে দিয়ে জালাটা ফেলে দিয়ে গেলো এই দরিয়ায়।



জলের তলায় তামার জালায় বন্দী আমি। মুক্তি প্রতীক্ষায় দিন গুনি। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, একশো বছরের মধ্যে যদি কেউ মুক্ত করে আমাকে তবে সারা জীবনের মতো তাকে আমি দুধে-ভাতে রাখবো। ধনদৌলতে ভরে দেবো তার ঘর। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কেউই এলো না আমাকে মুক্ত করতে। আমার বন্দীদশার প্রথম একশো বছর পার হয়ে গেলো। আমি আবার প্রতিজ্ঞা করলাম, এই চলতি একশো বছরের মধ্যে যদি কেউ মুক্ত করে আমাকে, তাকে দেবো আমি সারা দুনিয়ার হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তা—যতো আছে। কিন্তু কেউ এলো না। এইভাবে চারশো বছর কেটে গেলো। কেউ আমাকে এই মুক্ত আলো হাওয়ার জগতে ফিরিয়ে আনলো না। আমি পড়ে রইলাম দরিয়ার তলায়, বন্দী হয়ে। আবার আমি হলফ করলাম, এবার আমাকে যে মুক্তি দেবে তাকে আমি দেবো তিনটি বর। সে যা কামনা করবে, তাই পাবে। তবু কেউ এলো না। তখন আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। সেই দুর্ভেদ্য জালার মধ্যে লাফাতে ঝাঁপাতে লাগলাম। রাগে ক্ষোভে সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে আমার। এবার আমি শপথ নিলাম, যে ব্যাটা মুক্ত করবে আমাকে, তাকে নির্ঘাৎ হত্যা করবো।

তোমার দুর্ভাগ্য, তুমিই এলে। তুমিই আলোর মুখ দেখালে আমাকে। ঠিক। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ধীবর। কোন উপায় নাই। আর প্রতিজ্ঞা পালন আমাকে করতেই হবে। মৃত্যু তোমার অবধারিত। মরতে তোমাকে হবেই। এখন ঠিক কর, কী ধরনের মৃত্যু তুমি চাও?

দৈত্যের কাহিনী শুনে ধীবরের বুক দুরু দুরু করে। এই আমার নসীবে লেখা ছিলো? আমি তো জীবনে সজ্ঞানে কখনও কোনও পাপ করিনি। উপায়ন্তর না দেখে করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগলো ধীবর। তুমি আফ্রিদি সম্রাট, তোমার মহিমা অপার, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। খোদা তোমার ভালো করবেন।

আফ্রিদি কিন্তু সে কথায় কান দিলো না। বললো, আমার সময় নষ্ট করো না। এখন ঠিক কর, কী রকম মৃত্যু তোমার কাম্য।

ধীবর বললো, অমি কোন দোষ করিনি। আমাকে যদি হত্যা করো, আল্লাহ্ তোমাকে রেহাই দেবেন না। তোমার চেয়ে শক্তিমান কাউকে পাঠাবেন তিনি। তার হাতে তোমার মৃত্যু হবে।

কিন্তু আফ্রিদির সেই এক কথা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে আমাকে মুক্তি দেবে আমি তাকে হত্যা করবো। তুমি সেই লোক। তোমাকে আমি ছাড়তে পারি না।

ধীবর তখন মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে। এই ভাবেই কি উপকারীর প্রতিদান দাও তোমরা? প্রবাদ শুনেছি :

দুধ দিয়ে কাল-সাপ পুষো নাকো ঘরে।
একদিন তারই বিষে উপকারী মরে।।

—থাক থাক, ঢের হয়েছে, দৈত্যটা চড়া গলায় হুঙ্কার ছাড়ে, মেলাই বকেছো। এবার থামো। নাও চটপট তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমার জান নেবো।

ধীবর দেখলো, সব চেষ্টা বিফল হয়ে গেলো, আর কোন গতি নাই। কিন্তু আল্লাহ্ আফ্রিদিকে অসীম শক্তি আর মানুষকে কিছু বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছে। দেহের বলের চেয়ে বুদ্ধির বল অনেক বড়। সেই রকম একটা বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলতে না পারলে শয়তানটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ একটা ফন্দি এলো ধীবরের মাথায়। বললো, তুমি তো আমাকে হত্যা করবেই।

—কোন সন্দেহ নাই।

—কিন্তু কী অপরাধে?

আফ্রিদি এবারে ক্রুদ্ধ। বার বার এক কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। তোমাকে তো অনেকবার বললাম, আমি হলফ করেছি—যে আমাকে মুক্ত করবে তাকেই আমি হত্যা করবো। আমি ঐ তামার জালায় বন্দী ছিলাম। আজ তুমি জালার মুখ খুলে দিয়ে আমাকে মুক্ত করেছো।

ধীবর বললো, জালা আমি পানি থেকে তুলেছি, ঠিকই। এবং তার মোহর ভেঙে ঢাকনাও খুলেছি—তাও ঠিক। কিন্তু একটা কথা বলি দৈত্য মশায়, তোমার ঐ বিশাল বপুটা ঐ জালার মধ্যে আঁটে? কেউ বিশ্বাস করবে এই আজগুবি কথা? তোমার একখানা ঠ্যাং-এর অর্ধেক ঢুকবে না ওর ভেতর। তা আবার বলছো গোটা শরীরটা নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছো এতোটা কাল? এমন আষাঢ়ে গল্প তো আরব্য-রজনীর কাহিনীতেও শুনিনি কখনও।

ধীবরের কথা শুনে দৈত্য তো রেগে কাঁই। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দু' হাত দিয়ে ধীবরের গলাটা টিপে ধরতে যায়। বলে, মুখ সামলে কথা বলো বলছি। একেবারে শেষ করে দেবো। আমি মিথ্যে কথা বলেছি? আমি মিথ্যেবাদী? আমি ছিলাম না ঐ তামার জালাটায়! এতো বড় কথা! এই দ্যাখো, কেমন করে এর মধ্যে আমার দেহটা ঢোকে একবার চোখ মেলে দ্যাখো।

এই বলে আর কালক্ষেপ না করে জালাটার মধ্যে আস্তে আস্তে নিজের দেহটা গুটিয়ে নিয়ে ঢোকাতে লাগলো। এইভাবে পুরো দেহটা যখন ঢুকে গেলো, তক্ষুনি ধীবর সেই সীসের ঢাকনাটা এঁটে দিলো জালার মুখে।

এমন সময় প্রভাতের আগমনে শাহরাজাদ থামলো।

পরদিন চতুর্থ রাত্রির কাহিনী শুরু হলো।

শাহরাজাদ বলতে থাকে, তারপর শুনুন জাঁহাপনা, ধীবর সেই সীসের ঢাকনা জালার মুখে এঁটে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আফ্রিদিকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, ওহে, শয়তানের বাচ্চা এবার তুমি বেছে নাও, কী ধরনের মৃত্যু তুমি চাও। না হলে আমি তোমাকেও আবার ঐ দরিয়ার জলে ডুবিয়ে দেবো। আর এই দরিয়ার পাড়েই ঘর বেঁধে বাস করবো। যাতে না অন্য কোনও ধীবর তোমাকে তুলে তার নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। আমি ঢ্যাঁড়া পিটে আশেপাশের পাঁচটা গ্রামের লোককে জানিয়ে দেবো তোমার শয়তানী। তোমাকে মুক্ত করা মানেই নির্ঘাৎ মৃত্যু। এই কথা চাউর করে দেবো সারা দেশে। ভয়ে কেউ ধারে কাছে ঘেঁসবে না এই দরিয়ার। দেখি, কে তোমাকে মুক্ত করে। হা—হা—হা—।

জালার মধ্যে নিজের বোকামির জন্যে ছটফট করতে থাকে আফ্রিদি। প্রাণপণে

চেষ্টা করে বেরিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু সুলেমানের মোহর-আঁটা জালার মুখ খোলার বা ভাঙার ক্ষমতা কোন দৈত্যের নাই।

অনেক কাকুতি মিনতি করলো আফ্রিদি। তোমাকে কথা দিচ্ছি ধীবর ভাই, আমি তোমার কোন ক্ষতি তো করবোই না, বরং দুনিয়ার ধনদৌলতে ভরে দেব তোমাকে। আমাকে ছেড়ে দাও ভাই।

ধীবর কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করে না। তোমাকে যে বিশ্বাস করবে সে-ই মরবে। তুমি কি জানো না, সেই বাদশাহ্ উনানের উজির আর হেকিম রায়ানের কিস্সা? শোনোনি কখনও?

জালার ভিতর থেকে আফ্রিদি বলে, না ভাই! বলো দেখি শুনি।

—ধীবর বলতে শুরু করে। তবে শোনো ঃ পুরাকালে রুম দেশে ফার শহরে এক প্রবল প্রতাপ সুলতান প্রজাপালন করতো। হাজার হাজার সৈন্য সামন্ত, লোক-লস্কর দাসদাসী আর অঢেল ধনদৌলত ছিলো তার। কিন্তু মনে কোন শান্তি ছিলো না। সারা দেহে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি। কত না ডাক্তার কবরেজ দেখিয়েছে। কিন্তু কেউ সারাতে পারে নি। কত শত জড়িবড়ি খেয়েছে। কত রকমের মলম মালিশ লাগিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

একদিন এক বৃদ্ধ হেকিম এলো বাদশাহ্র কাছে। শুধু বয়সে না, জ্ঞানেগুণেও সে বৃদ্ধ। তার নাম রায়ান। নানা ভাষায়, নানা বিদ্যায় তার তুল্য পণ্ডিত সে তল্লাটে কেউ ছিলো কিনা সন্দেহ! গ্রীক, পার্শি, ল্যাটিন, আরবি—নানা ভাষার কিতাব পড়তে পারতো সে। নানা দেশের নানা বিদ্যা রপ্ত করেছিলো। গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ বেশ ভালো ভাবে শিখেছিলো।

সুলতান য়ুনানের দরবারে এসে সালাম জানালো রায়ান—আমি আপনার ব্যাধির খবর পেয়ে এসেছি। শুনেছি, আপনার ব্যাধি নাকি দুরারোগ্য। কোন ওষুধেই নাকি তা সারানো যায় না। কিন্তু আমি আপনাকে সারিয়ে তুলবো। শুধু এই জন্যেই এ শহরে আমি এসেছি। আপনি সারা দেশের সুলতান। আমি এক নগণ্য হেকিম। আমাকে আপনি জানেন না, চেনেন না। আমার দেওয়া দাওয়াই আপনি খাবেন কেন? আমি দেবোও না। না, খাওয়ার বা লাগাবার কোন ওষুধ দেবো না আপনাকে।

তবে, সুলতান কৌতূহলী হয়, কী করে সারাবে শুনি? যাই হোক, যদি সারাতে পারো আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি, তাহলে যা চাও—অঢেল ধনদৌলত পাবে। শুধু তুমি না, তোমার ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি—বংশানুক্রমে মাসোহারা পাবে আমার কাছ থেকে। তোমাকে আমার সভার প্রধান পারিষদ করে রাখবো। তুমি হবে আমার আপনজন। বন্ধু।

এই বলে বাদশাহ্ য়ুনান সূক্ষ্ম কারুকার্য করা, মূল্যবান একখানা শাল উপহার দিলো রায়ানকে। তোমার যেমন ইচ্ছে সেইভাবে আমার চিকিৎসা করতে পারো, কোন আপত্তি নাই। আমার শুধু একমাত্র আশা, তুমি আমার রোগ সারিয়ে দেবে।

রায়ান ভরসা দিলো, আপনি নিশ্চিত থাকুন, হুজুর। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলবো।

অনেক দিন বাদে সুলতানের মুখে হাসি দেখা গেলো, তাহলে আর দেরি করে কী লাভ? কাল থেকেই শুরু করো, বন্ধু।

রায়ান মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালো, তাই হবে জাঁহাপনা।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নিজের বাসায় ফিরে এলো রায়ান। ভাড়া করা একটা ঘর। শহরে এসেই এই ঘরটা ভাড়া করেছে। তার যতো সব গাছ-গাছড়া, জড়িবড়ি আর মোটা মোটা বইপত্তরে ঘরটা ভরে গেছে।

প্রথমে একটা ওষুধ বানালো রায়ান। তারপর একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির মধ্যে

পুরলো সেই গাছ-গাছড়ায় তৈরি খানিকটা ওষুধ। লাঠিটার মাথায় হাতল লাগিয়ে দিলো। এবার তৈরি করলো একটা পোলো বল। ভেতরে পুরে দিলো খানিকটা ওষুধ।

পরদিন সকালে সেই ছড়ি আর বল নিয়ে প্রাসাদে এলো রায়ান। আভূমি আনত হয়ে সুলতানকে কুর্নিশ করলো। তারপর বললো, আজ থেকে আপনাকে ঘোড়ায় চেপে পোলো খেলতে হবে। এই নিন আপনার ছড়ি আর বল। ঘোড়ায় চেপে ছড়িটা মুঠো করে ধরে পোলো খেলতে থাকবেন। যতক্ষণ না সারা শরীরে দর দর করে ঘাম ঝরে ততক্ষণ খেলবেন। তারপর প্রাসাদে গিয়ে বেশ ভালো করে গোসল করবেন। আর কিছু করতে হবে না আপনাকে। এই আপনার চিকিৎসা। এতেই আপনি সেরে উঠবেন।

রায়ানের কথা মতো বাদশাহ্ য়ুনান তার আমির-অমাত্য-ওমরাহ-উজির-নাজির সমভিব্যাহারে ময়দানের দিকে রওনা হলো। সঙ্গে ধন্বন্তরী রায়ান।

ময়দানে পৌঁছে কী করে ছড়িটা ধরতে হবে—নিজের হাতে ধরে শিখিয়ে দিলো রায়ান। ঘোড়ার পিঠে চেপে শক্ত মুঠিতে ছড়িটা ধরে পোলো খেলতে লাগলো সুলতান। এক সময় ঘেমে নেয়ে গেলো সারা শরীর।

রায়ান থামিয়ে দিলো। আজ এখানেই থামান। এবার প্রাসাদে ফিরে গিয়ে হামামে ঢুকে পড়ুন।

সেদিন রাত্রে সুলতানের সুখ নিদ্রা হলো। সকালে উঠে মনে হলো, দেহের জড়তা যেন অনেকটা কেটে গেছে। খুশি খুশি মেজাজ। ফুর্তি ফুর্তি ভাব।

রায়ান আসতেই সাদরে ডেকে কাছে বসালো। বললো, অনেকটা আরাম বোধ করছি।

সেদিনও তাকে এক মূল্যবান পোশাক উপহার দিলো সুলতান। তারপর সদলবলে রওনা হয়ে গেলো ময়দানের দিকে।

এইভাবে আরও কয়েকটা দিন কাটলো। বাদশাহ দেখলো, তার দেহ থেকে কুষ্ঠের ক্ষতগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। দারুণ আনন্দ হলো মনে।

রায়ান প্রতিদিনই দরবারে আসে। বাদশাহর সঙ্গে দেখা করে। খুশি হয়ে রোজই মূল্যবান সামগ্রী উপহার দেয় বাদশাহ্।

একদিন লক্ষ্য করলো বাদশাহ্, তার শরীরে আর কোন কুষ্ঠব্যাধি নাই। রায়ানকে ডেকে অনেক ধনদৌলত, মূল্যবান পোশাক-আশাক—অনেক কিছু দান করে দিলো। তার মনে আজ আনন্দের সীমা নাই।

তার এই দান-ধ্যান উজিরের সহ্য হলো না। হিংসায় কাতর সে। সুলতানের বিশ্বস্ত অমাত্য। প্রয়োজন হলে নিজের জানকেও কবুল করতে পারে সুলতানের জন্যে। সে কথা জানেনও তিনি। অথচ তার ওপর কোন নজর নাই বাদশাহর। কোথাকার কে এক গুপ্তচর! তাকে নিয়ে এতো মাতামাতি—

পরদিন সকালে খুস মেজাজে দরবারে এসে বসলো বাদশাহ্। তার দুই পাশে আমি-অমাত্য-উজির—সবাই নত মস্তকে দণ্ডায়মান। একটু পরে রায়ান এলো। বাদশাহ্ শশব্যস্ত হয়ে উঠে এলো সিংহাসন ছেড়ে। বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো তার পাশের আসনে। সে আসনে সমমর্যাদার কোন সুলতান ছাড়া বসতে পায় না।

বাদশাহর এবংবিধ আচারে ক্ষুব্ধ হলো অনেকেই। চাপা গুঞ্জন উঠলো দরবারে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস নেই কারও।

সেই হিংসা-কাতর উজির ফুঁসতে লাগলো। ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকলো।

সব মানুষই কাউকে না কাউকে হিংসা করে। কেউ প্রকাশ্যে কেউ মনে মনে। যারা দৃঢ়চেতা তারা প্রকাশ্যে করে। আর যারা হীনমন্য তারা করে মনে মনে।

সেই উজির বাদশাহর সামনে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনার শতায়ু কামনা করি, বাদশাহ চিরজীবী হোন, প্রার্থনা করি। এই অধমের একটা ছোট্ট আর্জি আছে আপনার দরবারে। কথাটা বলবো বলবো করেও বলতে পারি না। কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত নোকর। না বলাও গুনাহ্।

উজিরের এই ভণিতায় বিরক্ত হয়ে বাদশাহ্ কিছু রুষ্টভাবেই বললো, সোজাসুজি খুলে বলো। কী বলতে চাও?



—আমার গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, যে লোক দানের যোগ্য নয় তাকে দান মানে অপাত্রে দান। যে গ্রহীতা শ্রদ্ধা না করে দান গ্রহণ করে সে পরম শত্রু।

—হেয়াঁলী রাখো, বাদশাহ্ গর্জে ওঠে, কে সেই লোক, নাম বলো।

উজির তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, এই হেকিম রায়ান। তার যা প্রাপ্য নয় তাই তাকে আপনি দিচ্ছেন। আর সে অকৃতজ্ঞভাবে আত্মসাৎ করছে। ও আপনার পরম শত্রু। এইভাবে দিতে থাকলে আপনার আস্ত খাজাঞ্চিখানাই ও গিলে ফেলবে।

—থামো। ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় উজিরকে। কার সম্বন্ধে কী ভাবে কথা বলতে হয় তাও ভুলে গেছো দেখছি। তামাম দুনিয়ায় যদি একজনও পরম প্রিয় আপনজন থাকে আমার তা সে এই রায়ান। সে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। আমার দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি সারিয়েছে। তার বদলে কতটুকু দিয়েছি তাকে! আমার সল্-তানিয়ৎটাই যদি তাকে দিয়ে দিই তাও এমন কিছু বেশি দেওয়া হয় না। তার পাওনা শোধ করা যায় না। তার ঋণ পরিশোধ হয় না। না না, এসব কথা তোমার মুখে সাজে না উজির। তুমি হিংসায় জ্বলছো। তোমার দিল সাফা করো। বাদশাহ্ সিনবাদকে নিয়ে ঠিক এই ধরনের একটা কাহিনী শুনেছিলাম—কোন এক পারিষদের কাছে।

এই সময় সুলতানের অনুমতি নিয়ে দরবার ছেড়ে চলে গেলো রায়ান।

শাহরাজাদ দেখলো প্রভাত সমাগত। এবার সে থামলো। দুনিয়াজাদ খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, বাঃ মিষ্টি, কী সুন্দর তোমার গল্প দিদি।

শাহরাজাদ বলে। এর চেয়েও ভালো কাহিনী শোনাতে পারি বোন, যদি বেঁচে থাকি।

শারিয়ার ভাবে, বাকী গল্পগুলো শোনার জন্যে আরও কিছুদিন ওকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

পরদিন পঞ্চম রজনীতে শাহেনশাহ্ শারিয়ারের অনুমতি নিয়ে আবার গল্প শুরু করে শাহরাজাদ। শুনুন শাহজাদা, সেই বাদশাহ যুনান তার উজিরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো, তোমার দিল সাফা করো উজির। তুমি হিংসায় জ্বলছো। তোমরা হয়তো চাও, রায়ানকে আমি হত্যা করি। এবং বাদশাহ সিন্‌বাদ যেমন তার প্রাণ-প্রিয় বাজপাখীটাকে হত্যা করে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়েছিলো, তেমনি আমিও দগ্ধ হতে থাকি।

উজির জানতে চাইলো, সিন্‌বাদের সেই কাহিনী আমি শুনিনি জাঁহাপনা। যদি মেহেরবানী করে শোনান, বুঝতে পারি।

যুনান বলতে শুরু করে। এক সময়ে ফার শহরে এক প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ্ বাস করতো। তার নাম শাহেনশাহ সিন্‌বাদ। খেলাধূলা, শিকার এবং অশ্বারোহণে ভারি ওস্তাদ ছিলো

সে। তার একটা পোষা, শিকারী বাজপাখী ছিলো। দিবারাত্র তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো সেই পাখীটা। কোনও সময়ই সঙ্গ ছাড়া করতো না। এমন কি, রাতের বেলাতেও যদি শিকারে বেরুতো, পাখীটাকে হাতের মুঠোটায় বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতো। জিগরিদোস্তের মতো ভালোবাসতো তাকে। অর্থাৎ প্রাণের বন্ধু। তার গলায় শিক্‌লি দিয়ে বাঁধা থাকতো একটা সোনার পেয়ালা। জলটল খাওয়ার জন্যে।

একদিন সিন্‌বাদের কাছে এসে তার বাজপাখীর প্রধান পরিচারক জানালো, আজকের এই দিনটা শিকারের পক্ষে বহুৎ আচ্ছা। যাবেন নাকি, শাহজাদা?

সিন্‌বাদ বললো, ঠিক আছে, তোমরা সব গুছিয়ে নাও, যাবো।

লোক-লস্কর আর তার প্রাণ-প্রিয় বাজপাখীকে নিয়ে রওনা হলো সিন্‌বাদ শিকার সন্ধানে।

বেশ কিছু দূরে এক পাহাড়ের উপত্যকায় উপস্থিত হলো এক সময়। শিকারের জাল পাতা হলো, চারদিক বেষ্টন করে। দেখা গেলো, একটা রামছাগল ধরা পড়েছে জালে। সিন্‌বাদ সবাইকে হুঁসিয়ার করে দিলো, সাবধান ছাগলটা যেন না পালায়। যে ওকে পালাতে দেবে তাকে আমি জবাই করবো।

জালটাকে গুটিয়ে জন্তুটাকে কাছে আনা হলো। রামছাগলটা সিন্‌বাদের সামনে এসে, পিছনের পা দু'টোয় ভর দিয়ে খাড়া হয়ে, সামনের পা দু'টো করজোড়ের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে পড়লো। সিন্‌বাদের মনে হলো, ছাগলটা বুঝে সালাম জানাতে চায়। মজা লাগলো। প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠে হাততালি দিয়ে উঠলো। বুঝিবা একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ তড়াক করে একটা লাফ দিয়ে সিন্‌বাদের কাঁধের পাশ দিয়ে শোঁ করে বেরিয়ে গেলো। বেশ কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়েই চোঁ দৌড়। একেবারে হাওয়া। ব্যাপারটা পলকের মধ্যে ঘটে গেলো। এমনটা যে ঘটতে পারে কেউ ভাবতেই পারেনি। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও দারুণ ক্ষিপ্রতায় ঘোড়ার পিঠে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করে চললো ছাগলটাকে। শুধু তার চিৎকার শোনা গেলো, আমার হাত থেকে পালিয়ে কেউ কখনও নিস্তার পায়নি। তুমি পাবে? যেমন করে পারি ধরবোই তোকে।



তীরবেগে ছুটে চললো তার ঘোড়া। শেষে নাগালে পেলো রামছাগলটাকে। ছাগলটাও ছুটছে, ঘোড়াও তার পিছনে পিছনে। উভয়েরই ক্ষিপ্রগতি। ছাগলটাকে ধরি ধরি করেও ধরা যায় না। এমন সময় বাজপাখীটা উড়ে গিয়ে ছাগলটার সামনে থেকে গোঁত্তা মেরে ধারালো ঠোঁট দু'টো ঢুকিয়ে দিলো ওর চোখের মধ্যে। যন্ত্রণায় ছটফট করে ছিটকে পড়ে গেলো ছাগলটা। গড়াতে গড়াতে আটকে গেলো একটা ঝোপের সঙ্গে। তামার দস্তানা পরা হাতের এক মুষ্ঠাঘাত করলো সিনবাদ। সাত হাত দূরে ছিটকে পড়লো রামছাগলটা। আর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

ছাল চামড়া ছাড়িয়ে ছাগলটাকে জিনের নিচে ঝুলিয়ে রওনা হলো। সিনবাদ আর তার ঘোড়া উভয়েই তখন দারুণ পিপাসার্ত। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। প্রাণ যায় যায়, এমন অবস্থা। খর রৌদ্র-তাপে ধরিত্রী দগ্ধ হচ্ছে তখন। যে দিকে তাকাও ধূ ধূ করে উত্তপ্ত বালুকা রাশি। কোথাও জলের সন্ধান নাই।

এইভাবে যেতে যেতে পথের একটা বাঁক ঘুরতেই সিনবাদ দেখলো, অদূরে একটা

বিশাল বৃক্ষ। আর তার নিচে একটা পুকুর। কিন্তু পুকুরের জল যেন কেমন থকথকে পুরু। গোলা ময়দার মতো। চামড়ার দস্তানা পরা হাতে বাজপাখীর গলা থেকে সোনার পেয়ালাটা খুলে নিয়ে পুকুর থেকে এক পেয়ালা জল ভরে এনে পাখীটার মুখের সামনে তুলে ধরলো সিনবাদ। কিন্তু কী আশ্চর্য, এক ঝাপটায় পেয়ালাটা ছিটকে ফেলে দিলো পাখীটা। পেয়ালাটা আবার ভরে নিয়ে এলো। আবার ওর মুখের সামনে তুলে ধরলো। এবারও এক ঝাপটায় ছুঁড়ে দিলো পেয়ালাটা। এবার বিরক্ত হলো সিনবাদ। যাই হোক আবার ভরে আনলো জল। এবার সে ঘোড়ার মুখের কাছে ধরতে গেলো। কিন্তু সেই একই ঘটনা—পাখার ঝাপটায় পাখীটা আবার ফেলে দিলো পেয়ালাটা। এবার সিনবাদ ক্রুদ্ধ, কুপিত হলো। তলোয়ার বের করে দু'টো পাখাই কেটে ফেললো পাখীটার। নিজে নিজেই বলতে লাগলো, ওটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নিজেও খাবে না, খেতেও দেবে না কাউকে।

পাখীটার দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই তার। মাথা উঁচু করে ইশারায় দেখিয়ে দিলো সেই বিশাল বৃক্ষটা। সিনবাদ এবার ভালো করে লক্ষ্য করে, গাছটার ডালে জড়ানো অসংখ্য ময়াল সাপ। তাদের মুখ থেকে বিষ মেশানো লালা ঝরে ঝরে পড়ছে পুকুরের জলে। এই দৃশ্য দেখে ব্যথায় মথিত হতে লাগলো সিনবাদের হৃদয়। অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকলো সমস্ত সত্তা।

প্রাসাদে ফিরে এসে ছালছাড়ানো ছাগলটাকে বাবুর্চির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, পাকাও।

সিনবাদের হাতের মুঠির ওপর বসে বাজপাখীটা তখনও ধুঁকছিলো। একটুক্ষণ পরে ঝপ করে পড়ে গেলো নিচে। সিনবাদ তুলে দেখলো, সব শেষ।

অনুতাপের অনলে পুড়তে লাগলো সিনবাদ। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে সে। আর কেউ না, আর কেউ না, আমি—আমি নিজেই তাকে খুন করেছি আমার প্রাণের দোস্ত, আমার কলিজা....

বাদশাহ য়ুনান থামলো।

উজির বললো, কিন্তু জাঁহাপনা আপনার এ কাহিনীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আপনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন, সিনবাদ তার পরম সুহৃদ, উপকারী বন্ধু সেই বাজপাখীটাকে হত্যা করে পরে অনুতপ্ত হয়েছিলো। কিন্তু ওই রায়ান আপনার পরম সুহৃদ-উপকারী বন্ধু আদপেই না। ও হচ্ছে ফন্দীবাজ, দারুণ শয়তান। কিন্তু হুজুর এখন ভালো মন্দ বিচার করতে পারছেন না। রায়ানের মোহে আপনি আচ্ছন্ন। আপনার মোহ কেটে গেলে আপনা থেকেই বুঝতে পারবেন। এখন আপনাকে হাজার বোঝালেও বুঝবেন না।



সেই উজির আর বাদশাহ পুত্রের কাহিনী কি জানেন আপনি? উজির যেমন তার বাদশাহ পুত্রের অনিষ্ট করতে গিয়ে নিজেই ধ্বংস হয়েছিলো। তেমনি আপনিও একদিন নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনবেন।

এক বাদশাহর এক পুত্র ছিলো। ঘোড়ায় চড়া আর শিকারে তার ভীষণ ঝোঁক। বাদশাহ তার এক উজিরকে দেখাশোনার ভার দিয়েছিলো। সারা দিনরাত বাদশাহ পুত্রের সহচর হয়ে থাকাই তার একমাত্র কাজ।

কিন্তু একাজ সম্মানজনক বলে মনে করতে পারলো না উজির। এ হলো গরু চরানো রাখালের কাজ। আর সে কিনা সুলতানের উজির! ফিকির খুঁজতে লাগলো, কী করে এ থেকে অব্যাহতি পাবে সে। আবার গিয়ে বসবে দরবারে—

একদিন বাদশাহপুত্র উজির সমভিব্যাহারে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। টগবগিয়ে ছুটে চলেছে দু'জনের ঘোড়া। শাহজাদা আগে আগে আর উজির পিছনে। যেতে যেতে দেখলো, কিছু দূরে তাদের সামনে রাস্তার ওপর বসে আছে এক আজব জানোয়ার। এর আগে কখনও দেখেনি শাহজাদা। উজির চিৎকার করে উঠলো, শিগ্গির ধরুন শাহজাদা, শিগ্গির ধরুন। দেখুন যেন পালাতে না পারে।

তৎক্ষণাৎ আরও জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়া করলো শাহজাদা। কিন্তু জানোয়ারটাকে ধরতে পারলো না। মরুপ্রান্তরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

শাহজাদা ততক্ষণে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোন্ পথে ফেরা যাবে, কিছুই ঠাওর করতে পারছে না।

দিশাহারা হয়ে একটা অচেনা পথ ধরে চলেছে সে। এমন সময় দেখলো, কিছুটা দূরে পথের ধারে বসে একটি মেয়ে অঝোরে কাঁদছে। মেয়েটি সুন্দরী—রূপবতী যুবতী। কাছে এসে শাহজাদা জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি সুন্দরী? কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার?

মেয়েটি বলে, আমি হিন্দের শাহজাদী। এই মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার দলের লোকজনদের খুঁজে পাচ্ছি না।

মেয়েটির কথা শুনে বড় মায়া হলো শাহজাদার। ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো তাকে। যেতে যেতে এক সময় দেখলো একটা ছোট্ট জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়ি। মেয়েটি বললো, মালিক একটু থামো, আমার 'ছোটঘর' পেয়েছে, আমি এখুনি আসছি।

মেয়েটি নেমে সেই বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেলো। শাহজাদা অপেক্ষা করতে থাকে। অনেকক্ষণ কেটে গেলো। কিন্তু মেয়েটি আর ফেরে না।

ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে পায়ে বাড়িটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ে শাহজাদা। নিজেকে আড়াল করে নেয় একটা দেওয়ালের পাশে। জানলার ফুটোতে চোখ রেখে দেখলো, সেই মেয়েটা এক রাক্ষসীর রূপ ধারণ করেছে। ঘরে ছিলো আরও দুটি রাক্ষস-রাক্ষুসী। বুড়ো-বুড়ি। মেয়েটা বলছে তোমাদের জন্যে আজ একটা নাদুস-নুদুস মালপোয়া নিয়ে এসেছি।

বুড়ি রাক্ষসীটা বললো, তাকে ভেতরে নিয়ে আয় মা। আজ আমরা পেট পুরে ফলার খাবো।

এ কথা শুনে শাহজাদার বুক কেঁপে ওঠে। হাত পা হিম হয়ে যেতে থাকে। শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো। কোনরকমে সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

এদিকে সেই রাক্ষসী মেয়েটাও বেরিয়ে এসেছে। আবার সেই আগের চেহারা। সুন্দরী রূপবতী-যুবতী। শাহজাদাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে সে হাসলো। বললো, অমন করে ভয়ে কাঁপছো কেন তুমি?

শাহজাদা বললো আমার মনে হচ্ছে শত্রুর আস্তানায় এসে পড়েছি আমি।

—তুমি না বলেছিলে, তুমি বাদশাহর ছেলে!

—হ্যাঁ।

—তবে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের বশ করছো না কেন?

শাহজাদা বললো, পয়সার লোভে ভুলবে না। আমাকে মেরে আমার দেহটা ছিঁড়ে খাবে ওরা।

মেয়েটি আঁৎকে উঠলো। তবে কি শাহজাদা সব জেনে ফেলেছে? সব শুনে ফেলেছে তাদের কথাবার্তা? তাহলে তো ওকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না ঘরে। সে এখন এখানে একা। শাহজাদার কাছে মারাত্মক শিকারাস্ত্র আছে। যদি তার বুকে বসিয়ে দেয়—একা রুখতে পারবে না সে।

নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে মেয়েটি বললো, তাহলে খোদাই একমাত্র ভরসা। তার নাম জপ করো। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। সব বিপদ কেটে যাবে।

দু-হাত একত্র করে, হাঁটু গেড়ে বসে, মুদ্রিত নয়নে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায় শাহজাদা। চোখ মেলে দেখে মেয়েটি হাওয়া হয়ে গেছে।

অনেক পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে প্রাসাদে ফিরতে পারলো শাহজাদা। বাবার কাছে আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বললো।

সব শুনে বাদশাহ উজিরের গর্দান নেবার হুকুম দিলো।

উজির তার কাজে গাফিলতি করেছিলো। জেনেশুনে শাহজাদাকে রাক্ষস-পুরীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এই অপরাধে উজিরের প্রাণদণ্ড হয়েছিলো।



এই কাহিনী বলে বাদশাহ য়ুনানের উজির বললো, আমার যদি কোন বদ মতলব থাকে আমিও আপনার কাছে সমুচিত দণ্ড পাবো। এবং সে দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে আমাকে, আমি জানি। এবং এসব জেনেশুনেও আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি—আপনি যাকে আপাতত বন্ধু বলে মনে করছেন, মুক্ত হস্তে উপঢৌকন দিয়ে তাকে খুশি করার চেষ্টা করছেন, সে আপনার পরম শত্রু। অন্য দেশের গুপ্তচর। আপনার প্রাণনাশের ফিকির খুঁজছে সে। তার অসাধ্য কিছুই নাই। সামান্য একটা লাঠি হাতে ধরিয়ে আপনার দুরারোগ্য ব্যাধি সে সারিয়ে দিয়েছে। যাদুমন্ত্রের মতো। যদি মনে করে, অতি তুচ্ছভাবেই সে আপনার মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক! ঠিক বলেছো। বড় জব্বর কথা বলেছো। তুমি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তোমার কথাই ঠিক। তোমার কথাই আমার শোনা দরকার। কি জানি, লোকটা হয়তো বা গুপ্তচর। হয়তো সে আমার মরণ ফাঁদ তৈরি করছে—ভেতরে ভেতরে। তার অসাধ্য কিছুই নাই। হয়তো কোন অলৌকিক কায়দায় আমার মৃত্যুও ঘটাতে পারে সে। হয়তো বা কোন একটা কিছু শুঁকতে দিয়েই আমাকে মেরে ফেলতে পারে। কে জানে তার মনে কী আছে? তা হলে—তা হলে এখন আমার কী করা উচিৎ, উজির?

—আপনার সামনে তাকে হাজির হতে হুকুম করুন জাঁহাপনা। তারপর, এখানে এলে তার গর্দান নিয়ে নিন। ব্যাস, পথের কাঁটা সাফ হয়ে যাবে। আপনাকে খতম করার আগে তাকেই আগে খতম করে দিন আপনি। এই হচ্ছে একমাত্র শাহী কায়দা।

বাদশাহর হুকুমে দূত গেলো হেকিম রায়ানের কাছে। তড়ি-ঘড়ি রায়ান এসে হাজির। বেচারী জানেও না তার মৌৎ এতো কাছে। এমনটাই হয়। মৃত্যু হঠাৎই আসে জীবনে। আগে থেকে শমন পাঠিয়ে আসে না বড় একটা। তাই মৃত্যুর আগমনে বিচলিত না হয়ে সহজভাবে নিয়তিকে মেনে নেওয়াই ভালো। কবির ভাষায় :

'শিশুর সারল্য নিয়ে, ফুল্ল মনে
নির্দ্বিধায় পথ চলো।
এই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, স্থল-জল-অন্তরীক্ষ, দিনরাত্রি
নিরন্তর নিয়ন্ত্রিত যার ইশারায়,
জন্মের প্রদোষকালে লিখেছেন তিনি,
তোমার ভাগ্যের বিধান।
কপালে যা লেখা আছে খণ্ডাতে পারো না তুমি,
তাই নির্দ্বিধায়, শিশুর সারল্য নিয়ে পথ চলো!

আমার বিমুগ্ধ প্রাণ উদাস মাতাল হয় তার নাম গানে,
নিজেকে উজাড় করে নৈবেদ্য সাজাই;
বিনিময়ে কণামাত্র করুণার প্রত্যাশায় অভিভূত থাকি।
শুধু এইটুকু দয় করো প্রভু,
তোমার দয়ার দান বহিবার বল যেন পাই।
তোমাকে বন্দনা করি—মুখে নাই ভাষা,
সুললিত কণ্ঠ নাই—সেই গান গাই।
দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ছেড়ে খোলা মনে পথ চলো,
তিনিই নিতান্ত নির্ভর।
মুছে ফেলো সব দুঃখ ভয়,
তিনিই তোমার ধাতা।
ভাগ্যের অমোঘ লিপি লিখেছেন তিনি,
যা ঘটে ঘটুক,
মেনে নাও ফুল্ল মনে,
নির্দ্বিধায় মাথা পেতে দাও।।'

বাদশাহ য়ুনান রায়ানকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি জানো রায়ান, কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি?

—আপনার মনের কথা একমাত্র খোদা জানেন, আমি কেমন করে জানবো, জাঁহাপনা?

—তোমাকে আজ ডাকা হয়েছে তোমার গর্দান নেবার জন্যে।

—কেন আমাকে হত্যা করবেন? কী আমার অপরাধ?

—ওরা আমার পারিষদরা বলছে, তুমি নাকি গুপ্তচর। আমাকে হত্যা করতে এসেছো। সুতরাং, আমাকে বাঁচতে হলে তোমাকে আগে হত্যা করতে হবে।

এই বলে বাদশাহ জল্লাদকে হুকুম করলো, এই বিশ্বাসঘাতকের গর্দান নাও।

তখন সেই হতভাগ্য রায়ান কাতরভাবে মিনতি করতে লাগলো, আমাকে বাঁচান জাঁহাপনা, আল্লাহ আপনার ভালো করবেন। আমাকে মারবেন না হুজুর। এ পাপ আপনার সইবে না। আমি আপনার দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে নতুন জীবন এনে দিয়েছি, আর আপনি কিনা আমাকে হত্যা করবেন?

বাদশাহ য়ুনান বললো, আমি তোমার উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়েছি। এখন যতক্ষণ না তোমাকে হত্যা করছি আমার শান্তি নাই। একটা তুচ্ছ লাঠি হাতের মুঠোয় ধরিয়ে তুমি আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়েছো, সুতরাং তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। হয়তো বা একটা ফুলের গন্ধ শুঁকতে দিয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে! কিংবা অন্য কোন উপায়েও মারতে পারো।

রায়ান মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে, এই কী আমার পুরস্কার? এই ভাবেই কী আপনার জীবনদাতাকে পুরস্কার দেবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন?

কিন্তু বাদশাহ তার সিদ্ধান্তে অনড়।—মৃত্যুই তোমার একমাত্র পথ। অন্য কোন পথ খোলা নাই রায়ান।

রায়ান বুঝলো, বাদশাহ তাকে মারতেই বদ্ধপরিকর। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকে। গায়ে পড়ে সেধে এসে অন্যের উপকার সে কেন করতে এলো? কেন এই দুর্মতি হলো তার?

এর পর জল্লাদ এসে তার চোখ বেঁধে দিলো। খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো। বাদশাহর কাছ থেকে সরে আসতে বললো সে। কিন্তু রায়ান তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে। ভয়ে পিছনে সরতে থাকে সে।—দোহাই হুজুর, আমাকে ছেড়ে দিন। আল্লাহ আপনার ভালো করবেন। আমাকে বিনা দোষে হত্যা করলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না। আপনার সর্বনাশ হবে।

বাদশাহ তখনও বললো, আমি যা হুকুম দিয়েছি তার নড়চড় হবে না।

—হায় খোদা, এই কি আমার পুরস্কার? এতো সেই শয়তান কুমীরের প্রতিশ্রুতির মতো হলো।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, কী সেই কুমীরের শয়তানি শুনি?

—না, আমার মরার সময় আর আপনাকে সে সব কাহিনী শোনাতে ভালো লাগছে না। আমাকে বাঁচান, আপনার ভালো হবে। অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে থাকে রায়ানের দু'গাল বেয়ে।

এমন সময় বাদশাহর কিছু প্রিয় পাত্র দাঁড়িয়ে আর্জি পেশ করলো, জাঁহাপনা, এই হেকিমকে ছেড়ে দিন, এই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের মনে হয়, লোকটা খারাপ না। তাছাড়া সে আপনার ঐ দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে আপনাকে নতুনভাবে জীবনদান করেছে।

কিন্তু বাদশাহ বললো, ওর ক্ষমতা অনেক। সে তুচ্ছ উপায়ে যেমন আমার রোগ সারিয়েছে তেমনি আবার কোন তুচ্ছ উপায়ে আমাকে মেরেও ফেলতে পারে। হয়তো আমাকে মারার জন্যেই কেউ তাকে পাঠিয়েছে এখানে। হয়তো আমাকে মারতে পারলে অনেক বড় ইনাম সে পাবে। আমি একটু শান্তিতে বাঁচতে চাই। মাথায় দুশ্চিন্তা রেখে ঘুমুতে পারবো না। ওকে মেরে ফেলা ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই।

এ কথা শুনে রায়ান আবার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। একটু পরে বললো, বাদশাহ, আপনি যখন আমাকে হত্যাই করবেন তখন আমার একটা শেষ আর্জি আছে। আমাকে একবার আমার বাসায় যেতে দিন। আমার জিনিসপত্রগুলো একেবারে অগোছালো করে রেখে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। সেগুলো গুছিয়ে টুছিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আমি ফিরে আসবো। আর সবচেয়ে দরকার আমার ঐ হেকিমী বইগুলো। ওগুলো আমি ওখান থেকে সরিয়ে দিতে চাই। আমার বইগুলোর মধ্যে একখানা বই-এ সব রোগের সার কথা লেখা আছে। এবং তা সারাবার সার দাওয়াই-এর হদিসও দেওয়া আছে, সে বই-এ। এই বইখানা আমি আপনাকে উপহার দিয়ে যেতে চাই। আপনার গ্রন্থাগারের মূল্যবান বইগুলোর মধ্যে সযত্নে রেখে দেবেন। এর থেকে আপনি অনেক দুরারোগ্য রোগ সারাবার দাওয়াই খুঁজে পাবেন।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, সে বই কেমন?

রায়ান বললো, সে এক মহামূল্যবান গ্রন্থ। তাতে যা লেখা আছে তা ধন্বন্তরী সব দাওয়াই-এর কথা। আমার মুণ্ডুটা যখন কেটে ফেলবেন, তখন ঐ বইটার তিনের পাতা খুলে উপরের তিনটি লাইন পড়লে দেখবেন, আমার বিচ্ছিন্ন মুণ্ডুটা কথা বলছে।

এমন অদ্ভুত কথা শুনে বাদশাহ মজা পেলো। বললো, সত্যি, তোমার মাথাটা কেটে ফেললেও তুমি কথা বলতে পারবে?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা, সত্যি। আমি যে-সব অলৌকিক জ্ঞান সঞ্চয় করেছি এ তারই একটা।

এ কথা শুনে বাদশাহ হুকুম করলো, রায়ানকে সশস্ত্র প্রহরী ঘিরে তার বাসায় নিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো রায়ান। উজির আমির অমাত্য পবিবেষ্টিত হয়ে বাদশাহ বসেছিলো সিংহাসনে। সামনে এসে দাঁড়ালো রায়ান। তার এক হাতে সেই প্রাচীন পুঁথি, অন্য হাতে একটা ছোট্ট বাক্সে কিছু পাউডার। একখানা প্লেট আনতে বললো সে একজনকে। প্লেট এলো। বাক্সের খানিকটা পাউডার প্লেটে ঢেলে সে বাদশাহকে বললো, জাঁহাপনা,

আপনি যখন আমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলবেন, তখন তার রক্ত বন্ধ করার জন্যে এই প্লেটের পাউডারের ওপর মুণ্ডুটা রাখবেন। দেখবেন, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এবার এই বইটা নিন হুজুর। কিন্তু আমার মুণ্ডুটা না কাটা পর্যন্ত বই-এর পাতা খুলবেন না। কাটা মুণ্ডুর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে বই-এর পাতা খুলবেন।

কিন্তু বাদশাহ তখন উত্তেজনায় অধীর। ভালো করে শুনলোও না রায়ানের কথা। বইটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই তার পাতা ওলটাতে লাগলো। পাতায় পাতা সেঁটে আছে। বাদশাহ ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটের লালায় ভিজিয়ে নিয়ে পাতা ওলটাতে চেষ্টা করে। প্রথম পাতাটা ওলটালো। কিন্তু দ্বিতীয় পাতাও সেঁটে আছে। আবার আঙুলটা মুখের লালায় ভিজিয়ে নিয়ে পাতাটা ওল্টালো। কিন্তু কী ব্যাপার কোনো পাতাতেই তো কিছু লেখা নাই। একেবারে সাদা। বাদশাহ চেঁচিয়ে উঠলো, কই, কিছু তো লেখা নাই হে।

রায়ান বললো, আছে, আছে। পাতা ওলটান, লেখা চোখে পড়বে, জাঁহাপনা।



বাদশাহ দ্রুতগতিতে পাতা ওলটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু না, হাত পা যেন কেমন অবশ হতে থাকে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠতে লাগলো। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। তারপর ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়ে গেলো সিংহাসনের নিচে। শুধু গোঁ গোঁ করে বলতে পারলো, বিষ, বিষ! তার পরই সব শেষ।

এ কাহিনী থেকে কী শিক্ষা পেলে, দৈত্য? যে অন্যায় করে না, আল্লাহ তাকে রক্ষা করে। তুমি অন্যায়ভাবে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ ওপরে আছেন। তিনি তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

শাহরাজাদ দেখলো রজনী অবসান হতে চলেছে। থামলো সে। দুনিয়াজাদ বললো, কী সুন্দর করে বলতে পারো তুমি, দিদি।

—তোমাদের কাল রাতে আরও ভালো, আরও মজার গল্প শোনাবো বোন। কিন্তু সবই নির্ভর করছে মেহেরবান শাহজাদার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর।

পরদিন রাত্রে আবার কাহিনী শুরু হয় : তারপর সেই ধীবর দৈত্যকে বললো, এক সময় তোমার কব্জায় পড়েছিলাম আমি, এবার তুমি আমার কব্জায়। তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। এখন তোমাকে আমি এক তামার জালার মধ্যে পুরেছি, এবার তোমাকে ঐ দরিয়ার জলে ডুবিয়ে রাখবো।

—আল্লাহর দোহাই, অমনটি করো না, ভাই, মরে যাবো। তুমি কত মহৎ, কত উদার। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যা করতে চেয়েছিলাম তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। আর কক্‌খোনো ওসব কাজ করবো না, কথা দিচ্ছি। তুমি জানো ভাই, আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, যে লোক তার দুষ্কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত, তাকে ক্ষমা করতে হয়। তা সে যত বড় অপরাধীই হোক না। উমান আর আতিকাহ্‌র কাহিনী—জানো তো?

ধীবর উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে, কী সেই কাহিনী? বলো, শুনি।

দৈত্য বলে, নিশ্চয়ই বলবো। কিন্তু ভাই, এই জালার মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে সে কাহিনী বলতে আমার ভালো লাগবে না। জালার মুখটা একবার খুলে দাও, আমি বেরিয়ে আসি, তারপর কত গল্প শুনতে চাও? সব শোনাবো।

ধীবর কিন্তু ভোলবার পাত্র নয়।—না, না, গল্প শোনার দরকার নাই আমার। তোমাকে আমি জলের তলায় ফেলবো এখুনি। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি আমায় আস্ত রাখবে নাকি?

দৈত্য এবার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি গল্প শোনাবো। ধনদৌলতে তোমার ঘর ভরে দেবো। আমাকে খালাস করে দাও। আল্লাহর নামে হলফ করছি। তোমাকে আমি মারবো না, বরং বাদশাহ বানিয়ে দেবো।

কী জানি কী মনে হলো ধীবরের, সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে ফেললো দৈত্যের কথা। জালার মুখটা খুলে দিলো। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগলো আকাশের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এক বিশালকায় বিকট দৈত্যের আকার ধারণ করলো সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী। প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে পিতলের জালাটা ছুঁড়ে দিলো দরিয়ার মাঝখানে। এই না দেখে ভয়ে ধীবরের বুক শুকিয়ে কাঠ। না জানি দৈত্যটা কী করে! বললো, এটা কী করলে? এ তোমার অন্যায়। তুমি আল্লাহর নামে হলফ করেছো দানব। তুমি তোমার সেই দু'টো শর্তই মানবে, আমি আশা করি। সেই বাদশাহ য়ুনানের কাহিনী মনে করো। সে তার উপকারীকে হত্যা করতে চেয়েছিলো বলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলো না। তুমি যদি তোমার উপকারীর ক্ষতি করার চেষ্টা করো, তোমারও সেই দশা হবে।

এই কথা শুনে দৈত্য অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, ঠিক আছে। আমার সঙ্গে এসো। এই বলে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগলো। ধীবরের মনে শঙ্কা। না জানি ব্যাটা কোথায় নিয়ে যেতে চায়! আবার কী নতুন ফন্দী গজিয়েছে তার মাথায়। কিন্তু উপায় বা কী? তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে জেলে। ক্রমে শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে এগুতে থাকে সে। এক সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দাঁড়ালো তারা। ওপারে তাকাতেই চোখে পড়লো নিচে সুন্দর এক নীল নির্জন উপত্যকা। আর ঠিক তার মাঝখানে এক সরোবর। তার পাশে এসে দৈত্যটা থামলো। ধীবরকে হুকুম করলো, জাল ফেলো।

ধীবর দেখতে পেলো, সরোবরের স্বচ্ছ জলে কী সুন্দর সব লাল, নীল, সবুজ—নানা রঙের মাছ—খেলা করে বেড়াচ্ছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। জাল ফেললো সে। চারটে চার রঙের মাছ উঠলো। আনন্দে বুকটা নেচে উঠলো তার। দৈত্য বললো, এই মাছ চারটে নিয়ে এখানকার সুলতানের কাছে যাও। সে তোমাকে অনেক ইনাম দেবে। সেই টাকায় তুমি বড়লোক হয়ে যাবে।

এই দ্যাখো অনেক দিনের বন্দী দশায় সব আদব-কায়দা আমি একেবারে ভুলে গেছি। তুমি ভাই আমার গোস্তাকি মাফ করে দিও। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি রোজ একবার করে এই সরোবরে জাল ফেলবে। আর সেই মাছ বিক্রী করে তোমার সংসার চলে যাবে। কিন্তু দিনে একবারের বেশী জাল ফেলো না।

এই বলে দৈত্য এক লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে ধীরে ধীরে আকাশের নীলিমায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বাড়িতে ফিরে এসে একটা মাটির হাঁড়িতে করে মাছগুলো নিয়ে শহরের পথে পা বাড়ালো ধীবর। হাঁড়ির জলের মধ্যে খলবল করে নেচে বেড়াতে লাগলো মাছগুলো। এক সময় সুলতানের প্রাসাদে পৌঁছে গেলো সে। সুলতানের সামনে এসে কুর্নিশ করে মাছগুলো তার কাছে তুলে ধরলো। হরেক রকম রঙের মাছগুলো দেখে সুলতান তো মহাখুশি। এমন আজব মাছ সে জীবনে কখনো দেখেনি। রুমের বাদশাহ দিন তিনেক আগে একটা নিগ্রো পাচিকা উপহার পাঠিয়েছে। তার হাতের রান্না এখনও আস্বাদ করেনি সুলতান। উজিরকে বললো, আজ এই মাছ তাকে দাও। সে পাকিয়ে আনুক।

উজির তৎক্ষণাৎ মাছগুলো নিয়ে গিয়ে সেই নিগ্রো পাচিকার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এখুনি আচ্ছা করে পাকাও। সুলতান খাবেন। খেয়ে যাতে তিনি বাহবা দেন তেমনি করে তৈরি করো। রান্নায় তোমার কতটা কেরামতি—আজ প্রথম দিনে দেখবো আমি। আজকের এই খানা যদি সুলতানের ভালো লাগে তা হলে তোমার পোয়া বারো।

উজির সুলতানের কাছে ফিরে এলো। সুলতান বললো, এই জেলেকে চারশো দিনার ইনাম দিয়ে দাও।

দিনারগুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে মহাখুশি হয়ে ঘরে ফিরে এলো ধীবর। বৌকে বললো, দ্যাখো, ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ভালোমন্দ খাওয়াতে হবে। ওদের জন্যে জামাকাপড় কিনে দিতে হবে।

এদিকে সেই নিগ্রো পাচিকা মাছগুলো কুটে ধুয়ে উনুনে চাপিয়ে দিলো। এক পিঠ যখন ভাজা হয়ে এসেছে, তখন মাছগুলো উলটিয়ে দিতে গেছে এমন সময় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেলো। রসুই ঘরের একটা দেওয়াল দু'টো ভাগ হয়ে খানিকটা ফাঁক হয়ে গেলো। আর সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকলো একটি পরমা সুন্দরী যুবতী। সুরমা টানা আয়ত চোখ, উন্নত উদ্ধত বুক। সুঠাম দেহবল্লরী। সমুদ্র নীল রঙের একখানা রেশমী রুমাল মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে চিবুকের নিচে বাঁধা। হাতের কব্জীতে সোনার ব্রেসলেট, আর আঙ্গুলে নানা রঙের হীরা-চুনী-পান্না বসানো গোটা কয়েক আংটী। তার রূপের জৌলুসে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। উনুনের কাছে এগিয়ে এলো সে। তার হাতে ছিলো বাঁশের একখানা লাঠি। ভেতরটা ফাঁপা। কড়াইয়ের ওপর লাঠিটা ধরে অন্যপ্রান্তে মুখ লাগিয়ে বললো, মাছ ভাই, মাছ ভাই শুনছো?

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পাচিকা তো ভয়ে অজ্ঞান। মেয়েটি বার বার মাছগুলোকে ঐভাবে ডাকতে লাগলো। একটু পরেই মাছগুলো কড়াইয়ের মধ্যে থেকে মাথা তুললো। বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো শুনি।

মেয়েটি হঠাৎ কড়াইটা ধরে উনুনের মধ্যে উপুড় করে ঢেলে দিলো মাছগুলোকে। তারপর যে পথে এসেছিলো সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক হয়ে যাওয়া দেওয়ালটা আবার যেমন ছিলো তেমনি জোড়া লেগে গেলো। পাচিকার হুঁশ ফিরে এলো যখন, মাছগুলো উনুনের আগুনে পুড়ে ছাই। কপাল চাপড়ে তারস্বরে কাঁদতে লাগলো সে।—এ কী সর্বনাশ আমার হলো গো। আমার যে গর্দান যাবে।

তার কান্নার আওয়াজে উজির ছুটে এসে দেখে, সব মাটি হয়ে গেছে। বললো, ঐ পোড়া মাছগুলো নিয়ে চলো সুলতানের কাছে। দ্যাখো, তোমার কী দশা হয়!

একথা শুনে পাচিকা কান্নায় ভেঙে পড়লো। উজিরকে আদ্যোপান্ত যা ঘটেছে, খুলে বললো।

উজির শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসলো। যত্ত সব গাঁজাখুরি গল্প। আবার সে ধীবরকে বলে পাঠালো, আরও চারটে ঐ মাছ যেন সে দিয়ে যায়। উজিরের হুকুমে ঐ সরোবর থেকে আরও চারটে মাছ ধরে তাকে দিয়ে এলো। এবার উজির পাচিকাকে বললো, আমার সামনে খানা পাকাও, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই, কী ঘটে! যথা হুকুম—পাচিকা মাছগুলো কুটে ধুয়ে আবার কড়াইতে করে ভাজতে থাকে। এক পিঠ যখন ভাজা হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে গেলো। উজির থ'!

এমন সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি বিদায় নিচ্ছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

পরদিন সপ্তম রাত্রি। আবার সে বলতে শুরু করে। তারপর সেই মেয়েটা যখন মাছের কড়াইটা উনুনের উপর উপুড় করে মাছগুলোকে আগুনে ফেলে দিলো, তখন অবশ্য উজির বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো। আর উপায়ন্তর না দেখে সুলতানের কাছে গিয়ে আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বললো সে। সুলতান হেসে উড়িয়ে দিলো, যত্ত সব আজগুবি কিস্‌সা! কে আছো, এখনি সেই জেলেকে ডাকো।

ধীবরকে ডাকা হলো। তাকে হুকুম করলো সুলতান, আরও চারটে ঐ মাছ নিয়ে এসো। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই, এই সব ভুতুড়ে কাণ্ড!

ধীবর তো মহানন্দে আবার সেই সরোবরে গিয়ে চারটে মাছ ধরে নিয়ে এলো। এবং ইনাম হিসেবে চারশো দিনার খুঁটে বেঁধে বাড়ি ফিরে গেলো। সুলতানের হুকুমে তার চোখের সামনে সেই মাছ পাকানোর ব্যবস্থা করা হলো। নিজে রসুইখানায় গিয়ে বসলো। তার সামনে মাছগুলো কুটে ধুয়ে আবার কড়াইতে ভাজতে লাগলো পাচিকা। এক পিঠ ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। ওলটাতে যাবে, এমন সময় আবার সেই কাণ্ড। এবার কিন্তু রূপবতী সেই যুবতী না, এবার দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ঢুকলো এক আবলুস কালো নিগ্রো। বিশাল একটা বুনো মোষের মতো চেহারা। তার হাতে সদ্য ভেঙে আনা একটা গছের ডাল। বিশ্রী একটা আওয়াজ তুলে সে ডাকতে লাগলো, মাছ ভাই, মাছ ভাই, শুনছো?

মাথা তুলে মাছগুলো বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনছি, বলো ভাই।

আবার সেই একই কাণ্ড। কড়াইটা উনুনের উপর উপুড় করে ধরে মাছগুলোকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলো। নিমেষে পুড়ে ছাই। নিগ্রোটাও দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সুলতান ভাবতে লাগলো, এ তো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। এর পিছনে অন্য কোনও গভীর রহস্য আছে। কী সেই রহস্য, জানতে হবে। কিন্তু কী করে জানা যায়? ডাকো সেই জেলেকে। কোথা থেকে আনে সে এ মাছ? সেখানে যেতে হবে। সেখান থেকেই পাওয়া যাবে এ রহস্যের হদিশ। ধীবরকে ডেকে পাঠানো হলো। সে এসে বললো, শহরের কাছেই যে পাহাড়টা—তার ওপরে একটা সায়র আছে, সেই সায়র থেকে এই মাছ সে ধরে আনে।



সুলতান তখন সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সেই পাহাড়ের পথে রওনা হয়ে গেলো। তার মনে এক দারুণ সংশয়। সৈন্য দল পাহাড় ডিঙিয়ে ওপরে গিয়ে পৌঁছলো। এক মনোরম ঘন সবুজ উপত্যকা। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই। এমন সুন্দর জায়গা তারা আগে কখনও দেখেনি। সবাই দেখলো, সরোবরের স্বচ্ছ জলে খেলা করছে অসংখ্য রঙিন মাছ।

সুলতান তার লোকজনদের জিজ্ঞেস করলো, এর আগে তাদের কেউ এ জায়গায় এসেছে কিনা। তারা সবাই ঘাড় নেড়ে জানালো না। তখন আল্লাহর নামে হলফ করে সে বললো, যদি আল্লাহ বলে কোনও কেউ থাকেন, তবে তার দিব্বি করে বলছি, আসল ব্যাপার কী, না জেনে আমি এখান থেকে নড়ছি না।

তারপর তার লোকজনকে পাঠালো পাহাড়ের চারপাশ ঘুরে দেখে আসতে। সুলতান তার জ্ঞানবৃদ্ধ উজিরকে ডেকে বললো, শোনো উজির, আজ রাত্রে আমি একা এই পাহাড়ে, এই সরোবরে ঘুরে দেখতে চাই। আমার তাঁবুর চারপাশে কড়া পাহারা বসাবে। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বলে দেবে, সুলতান কারো সঙ্গে দেখা করবেন না আজ রাত্রে। আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে, এই সরোবর আর তার আজব মাছের রহস্য। আমার এই মতলবের কথা যেন কোনক্রমেই ফাঁস না হয়, উজির।

উজির হলফ করে জানালো, কেউ জানতে পারবে না।

সুলতান ছদ্মবেশে একাকী বেরিয়ে পড়লো। সারা রাত ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে। এইভাবে রাত্রি যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে তখন সে দেখতে পেলো, ভীষণ কালো একটা কী বস্তু! বেশ খানিকটা দূরে। তার মন নেচে উঠলো। হয়তো এবার সে

জানতে পারবে এ রহস্যের হদিশ। কিন্তু হা হতোহস্মি! কাছে আসতেই দেখলো, একটা প্রাসাদ। আগাগোড়া কালো পাথরে তৈরি। প্রাসাদের সামনে এক বিশাল সিংহদরজা। তার একটা পাল্লা খোলা। আস্তে আস্তে কড়া নাড়লো সুলতান, এক দুই তিন বার। কিন্তু কোনও জবাব নাই। মনে হলো, জনমানব বর্জিত। এখানে কেউ বাস করে না। পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো সে। একটু চড়া গলায় ডাকতে লাগলো, কে আছো, মালিক! আমি এক ক্লান্ত পথিক, বড় তেষ্টা পেয়েছে, আমাকে একটু পানি দাও। বার বার উচ্চারিত হতে থাকলো কথাগুলো। কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। আরও ভিতরে ঢুকে পড়লো সুলতান। একেবারে প্রাসাদের মাঝখানে। কিন্তু কোথাও কেউ নাই। সুরম্য অট্টালিকা। সাজানো গোছানো। ঝকঝকে তকতকে। এক জলের ফোয়ারা দেখতে পেলো। তার চার পাশে চারটে সোনার সিংহ।

ফোয়ারার জলের ফিনকির সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে হীরা-পান্না-চুণী। আর সেগুলো জমে জমে চতুর্দিকে স্তূপাকার।

চারপাশের দেওয়ালে নানা জাতের রঙবেরঙের অসংখ্য পাখী। কিন্তু সবাই বন্দী। উড়ে পালাবার পথ নাই। ওপরটা সোনার জাল দিয়ে ঘেরা।

সুলতান বিস্ময় বিমূঢ়! কিন্তু চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন জন-মানবের সন্ধান পাওয়া গেলো না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এক সময় বসে পড়লো এক জায়গায়।

হয়তো বা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে একটু তন্দ্রাভাব জড়িয়ে ধরেছিলো। এই সময় মৃদু কণ্ঠের এক করুণ-সঙ্গীত ভেসে এলো তার কানে।

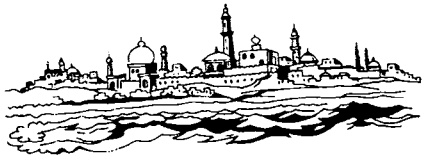

হারিয়ে গেলো প্রেমের স্বপন,
কেন আমার ভাঙিয়ে দিলে ঘুম?
তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিলে দিল্-এ,
এমন করে করলে কেন খুন?

মনে হলো বেশি দূরে না, কাছেই কেউ গাইছে। একটু এগোতেই সুলতানের চোখে পড়ে, একখানা বাদশাহী পর্দা ফেলা এক দরজা।

পর্দাখানা তুলতেই চোখে পড়লো, এক পালঙ্কে অর্ধশায়িত এক যুবক। কী তার রূপ! টানা টানা চোখ। উন্নত নাসিকা। আপেল সদৃশ চিবুক। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।

তার চুলের অরণ্যের ছায়ায় রাত্রি নেমে আসে
আর ঐ উজ্জ্বল চোখের মণি
হার মানে আসমানের রুদ্ধবাক তারা
এমন রূপের ঐশ্বর্য দেখে কে না মুগ্ধ হবে, বলো।
আমি তো হবোই। হতবাক আমি।
এমন চাঁদের রূপ পেলো সে কোথায়?
কে দিয়েছে তাকে?

সুলতানের মনে আর আনন্দ ধরে না। ঘরের মধ্যে পা রেখে বললো, আমার কী সৌভাগ্য, তোমার দেখা পেলাম।

কিন্তু পালঙ্কে অর্ধশায়িত যুবকটি, যেমনটি শুয়েছিলো তেমনি শুয়ে রইলো। তার সর্বাঙ্গ এক মূল্যবান শাল-এ ঢাকা। শুধু বললো, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি উঠতে পারছি না। আমার দেহ অসাড়।

সুলতান দুঃখিত হলো। একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা এখানকার ঐ সরোবরে

নানা রঙের মাছের কাহিনী কি তুমি জানো? যদি জানো, আমাকে বলো। আর এই কান্নার গানই বা তুমি গাইছো কেন, আমাকে জানাবে? কী তোমার দুঃখ, কী তোমার ব্যথা?

এই কথা শুনে যুবকের চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। কান্না চেপে বললো, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ আমার এই দশা।

এই বলে শালটা দেহ থেকে সরিয়ে দিলো। সুলতান বিস্ময়ে বিমূঢ়! তার দেহের নিচের অংশ মারবেল পাথরের, আর কোমর থেকে ওপরের অংশ রক্তমাংসের।

যুবক বলতে থাকে, তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, সেই অদ্ভুত ধরনের রঙিন মাছের আর আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী আপনাকে বলি :

—আমার বাবা এক দেশের সুলতান ছিলেন, সে দেশ আপনি হয়তো চিনবেন না। খোদার দোয়ায় তিনি সত্তর বছর প্রজা পালন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সুলতান হলাম। আমার চাচার মেয়েকে শাদী করে বেগম করলাম। সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। কোনও কাজে তাকে ছেড়ে কখনও যদি কোথাও যেতাম নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিতো সে। এমনি ভালোবাসা। এমনিভাবে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। একদিন গোসলের জন্যে সে হামাম-এ ঢুকেছে। বাবুর্চিকে হুকুম করে গেছে, নানা-স্বাদের মুখরোচক খানা সাজাতে। আমি তখন আমার পালঙ্কে শুয়ে। আমার মাথা আর পায়ের কাছে দুই ক্রীতদাসী পাখায় হাওয়া করছে। হালকা ঘুমের আমেজ লেগেছে আমার চোখে। এমন সময় কানে এলো, ঐ দুই ক্রীতদাসী ফিসফিস করে বলাবলি করছে। আমাদের মালিকের কী দুর্ভাগ্য ভাই, ঐ রকম একটা খারাপ মেয়েমানুষ আজ তার বেগম। রোজ একটা করে নতুন মরদা না হলে যার ঘুম হয় না, সে কিনা আমাদের মালকিন, ছিঃ ছিঃ! আমাদের মালিক কিন্তু ভাই একেবারে মাটির মানুষ। অতোশত ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে পারে না। কেউ যে তাকে ঠকাতে পারে সে কথা সে ভাবতেই পারে না।

—কী করে ভাববে বলো, অন্যজনে বলে, সেই শয়তানিটা রোজ রাতে মালিকের সরাবের সঙ্গে কী একটা মিশিয়ে দেয়। আর তাই খেয়ে মালিক বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। সেই মওকায় সে পরপুরুষকে নিয়ে মজা লোটে। সারা রাত ধরে ফুর্তি করে ভোরবেলায় হুজুরের ঘরে এসে নাকের কাছে কী একটা ধরে। আর তখুনি মালিকের ঘুম ভেঙে যায়, নেশা কেটে যায়।

ওদের কথা শুনে সারাটা দুনিয়া আঁধার হয়ে যায় আমার চোখের সামনে। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে।

একটু পরে হামাম থেকে ফিরে এসে আমাকে আদর করে জাগিয়ে দিলো বেগম। এও নিত্যকার ঘটনা। এর পর আমরা খানা খেতে বসলাম। নানা স্বাদের সুন্দর সুন্দর খাবার। দুষ্প্রাপ্য সরাব। অনেকক্ষণ ধরে বেশ তৃপ্তি করে খেলাম দু'জনে।

রোজ রাত্রে শোবার আগে একপাত্র সরাব পান করা আমার চিরকালের অভ্যেস। আর পাত্রটি নিজের হাতে তুলে দেয় আমার বেগম। সেদিনও সে যথারীতি তুলে দিলো আমার হাতে। একটু কায়দা করে, তার অলক্ষ্যে পিকদানীতে ঢেলে দিলাম সরাবটুকু। তারপর শয্যায় এলিয়ে পড়লাম ঘুমের ভাণ করে। আমার কপালে হাত বুলাতে লাগলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকতে লাগলাম আমি। শুনতে পেলাম ও বলছে, ঘুমোরে হারামজাদা, ঘুমো। আমি চললাম। তোর সুরৎ দেখলে সারা শরীর জ্বলে যায় আমার।

এবার সে সাজগোজ করতে লাগলো। দামি জমকালো শাড়ি পরলো। সুর্মা টানলো চোখে। খোঁপা বাঁধলো সুন্দর করে। খোঁপায় গুজলো একটা লাল গোলাপ। একেবারে মনমোহিনী রূপ। আতর ছিটালো গায়ে। সারা ঘর সুগন্ধি খুশবুতে ভরে গেলো। কোমরে বাঁধলো

আমার তলোয়ারখানা। তারপর কালো একটা বোরখা দিয়ে ঢেকে নিলো সারা অঙ্গ। এবার সে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো।

আমিও উঠে পড়লাম। তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে চললাম। প্রাসাদের চত্বর ছাড়িয়ে সিংহদরজা পেরিয়ে চলতে লাগলো সে শহর সীমান্তের দিকে। ওদিকটায় কোন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করে না। নিম্নস্তরের চাকরবাকররা থাকে সব। মাটির দেওয়াল গাঁথা, খড়ের ছাউনি ঢাকা ছোট ছোট ঘর। আমার বেগম গিয়ে ঢুকলো ঐরকম একটা বাড়িতে।

ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে একটা ঘুলঘুলির ফুটোয় চোখ রেখে দেখতে থাকলাম তার কাণ্ডকারখানা। ঘরের ভেতর বসেছিলো মোষের মতো বিকটাকৃতি মিসমিসে কালো এক নিগ্রো। পুরু ঠোঁট দু'টো ঝুলে পড়েছে। দাঁতগুলো বরফের টুকরোর মতো। হাতে আধখানা আখ। তার চারপাশে ইত্যাকার ছড়ানো আখের ছোবড়া। সামনে মাটির হাড়িতে হাড়িয়া।

ঘরের ভেতর ঢুকেই আমার বেগম সেই নিগ্রোটার সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সালাম জানালো। নিগ্রোটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিশ্রী ভাষায় খেউড় করলো। এতো দেরি হ'লো কেন র‍্যা, মাগী? সব ব্যাটা মদ-ফদ টেনে যে যার মেয়েমানুষ লিয়ে লটকে পড়েছে। আর আমি শালা, এখানে বসে বসে ছোবড়া চুষছি।

আমার বেগম তখন ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, তুমি তো জানো, মালিক; আমার চাচার ছেলের সাথে শাদী হয়ে গেছে আমার। সে এখন সুলতান। তাকে ছুপিয়ে তো আসতে হবে। আগে, আমার যখন শাদী হয়নি, তখন কী আমার দেরী হ'তো? এখন যদি সুলতান কোনও রকমে জানতে পারে, আমার গর্দান যাবে। লোকটাকে কুত্তার মতো ঘেন্না করি আমি। ওর কাছে গেলে, ওর মুখ দেখলে গা রি রি করে ওঠে আমার।

কিন্তু তবু সে সুলতান, আমার স্বামী। তার কথা না শুনলে আমাকে জ্যান্ত রাখবে না সে। শোনো, প্রাণনাথ, তোমাকে আমার মনের আসল কথা বলি, আমার যদি তেমন কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে ওর ওই প্রাসাদ-নগর ভেঙে চুরমার করে দিতাম। ভিটিতে ঘুঘু চরাতাম। আমি সহ্য করতে পারি না তার নবাবি চাল। ধন-দৌলত আর আভিজাত্য আমি পায়ে দলে তোমার কাছে চলে আসতে চাই, কিন্তু.....

—থাম্, নিগ্রোটা চিৎকার করে উঠলো, অনেক ঢং তোর দেখেছি। সত্যি করে বল, হারামজাদী, কোন নাগরের গলায় ঝুলছিলি এতক্ষণ? এই শেষবারের মতো তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, এরপর আর একদিনও যদি দেরি করে আসিস তবে তুলে আছাড় দেবো। আর আমি যদি সাচ্চা নিগ্রোর বাচ্চা হই তবে তোর শরীলের ওপর আমি শালা আর ঝাম্পেশ করবো না। তুই হচ্ছিস একটা বিশ্বাসঘাতিনী, বাজারের বারোভাতারী মেয়েমানুষ।

—শুনুন জাঁহাপনা, শাহজাদা বলতে থাকে, আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনুন। সেই নিগ্রো আর আমার বেগমের এই ধরনের কথাবার্তায় আমার রক্ত গরম হয়ে উঠলো। মনে হতে লাগলো, তামাম দুনিয়াটা মিথ্যা, একটা মস্ত বড় ধাপ্পা। মানুষ কিসের জন্যে বেঁচে থাকে? ধনদৌলত, বৈভব, স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা সব-সব তখন আমার কাছে মিথ্যে হ'য়ে যেতে লাগলো।

নিগ্রোর কথা শুনে আমার বেগম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় কেউ আমার নাই। বিশ্বাস করো প্রাণনাথ, আমাকে দূরে ঠেলে দিও না, সোনামানিক। আমি চিরটা কাল তোমারই হয়ে থাকবো।

ওর কান্না দেখে বোধ হয় নিগ্রোটা নরম হলো। বললো, ঠিক আছে, নাও, এসো।

আমার বেগমের মুখে তখন হাসি ফুটেছে। ক্ষিপ্র বেগে শাড়ী জামা পেটিকোট,

কাঁচুলি সব খুলে ফেলে দিলো পাশে। কোমরের তলোয়ারখানা একপাশে একটা বাক্সের ওপর রেখে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়ালো সে নিগ্রোটার চোখের সামনে।

—প্রাণেশ্বর, আমাকে কিছু খেতে দেবে না?

—দ্যাখো, ওখানে ইঁদুরের ঝোল আর ঝারিতে খানিকটা হাড়িয়া আছে।

আমার বেগম তখন ঐ কুখাদ্য মাংস আর সেই হাড়িয়া বেশ তৃপ্তি করে খেলো। হাত মুখ ধুয়ে এসে বাঁশের খাটিয়ায়, নিগ্রোটার পাশে ওর শতছিন্ন তেল চিটচিটে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ঐ নোংরা ঘিনঘিনে বিছানাটার উপর, ওর ফুলের মতো পেলব দেহটা, নিগ্রোটার বুকের নিচে দলাই-মলাই হতে লাগলো। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ক্ষিপ্রবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বাক্সটার ওপরে রাখা আমার তলোয়ারখানা খুলেই প্রচণ্ড এক কোপ বসিয়ে দিলাম, নিগ্রোটার গর্দানে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। ভালুকের মতো এক বিকট চিৎকার করে বেগমের বুকের ওপর থেকে ছিটকে গড়িয়ে পড়ে গেলো নিচে। আর সেই মুহূর্তে বেগমকে কোন রকমে জামা কাপড় পরিয়ে টেনে বের করে নিয়ে এলাম আমার প্রাসাদে।



এমন সময় নিশাবসান হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ তার কাহিনী থামালো।

সারাদিন দরবারের কাজকর্ম সেরে শারিয়ার যখন আবার অন্দর মহলে ফিরে এলো রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে, শুনুন জাঁহাপনা, তারপর কী করে ঐ শাহজাদা শাপগ্রস্ত হলো, সেই কাহিনী আজ বলবো।

শাহজাদা বলতে থাকে, আমি যখন নিগ্রোটার গর্দানে কোপ বসিয়ে দিয়েছি, তখন, আমার ইচ্ছে ছিলো, দু'জনকেই এক কোপে সাবাড় করে দেবো। কিন্তু তা হলো না। ঐ দৈত্যের মতো নিগ্রোটার গর্দানের অর্ধেক মাত্র কাটা গেলো সেই কোপে। নিগ্রোটা নিচে পড়ে গেলো। মনে হ'লো, ব্যাটা মারা গেলো। কিন্তু না, সে মরলো না। কিন্তু আমি তখন ভেবেছিলাম মরেই গেলো। যাইহোক, আমার বেগমকে প্রাসাদে নিয়ে এসে আমার ঘরেই আটকে রাখলাম সে রাতে। পরদিন দেখি, সে মাথার চুল ছেঁটে ফেলেছে। পরণে পরেছে কালো শোকের পোষাক। জিজ্ঞেস করতে বললো, কাল তার মা মারা গেছে, তাই। কিছুদিন আগে যুদ্ধে মারা গেছে তার বাবা আর এক ভাই। সে বললো, আমি এক বছর ধরে শোক পালন করবো। আমার জন্যে একটা শোক-মঞ্জিল বানিয়ে দাও। সেখানে থেকে আমি তাদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করবো।

তার কথা মতো প্রাসাদের বাইরে একটু নির্জন জায়গায় একখানা শোক-মঞ্জিল বানিয়ে দিলাম। সকাল সন্ধ্যায় সে যেতো সেখানে। করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে শোক জানাতো। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিলো তার অন্য।

ওই মঞ্জিলের গম্বুজের মধ্যে এনে রেখেছিলো সে তার প্রেমিক নিগ্রোটাকে। তখনও তার ক্ষত সারেনি, কথা বলতে কষ্ট হয়। নড়াচড়াও খুব বেশী একটা করতে পারে না। বেগম প্রতিদিন তাকে সুন্দর সুন্দর খাবার দিয়ে আসতো। মুরগীরঝোল, দামি সরাব। ভালো ভালো ফলমূল সব, দিয়ে আসতো তাকে। আমার কেমন সন্দেহ হলো। একদিন ও মঞ্জিলের দিকে

বেরিয়ে যাবার পর পায়ে পায়ে ওর পিছনে পিছনে আমিও গেলাম। শুনতে পেলাম, ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে কাঁদছে বেগম। কিন্তু না, কাছে আসতেই আমার ভুল ভাঙলো, এতো করুণ সুরে কান্নার গান না। এতো গানের ছলে দয়িতের কাছে প্রেম নিবেদন।

যখন তুমি সমুখ দিয়ে যাও,
বিশ্ব আমার আঁধার হয়ে আসে।
ভাবি মনে, ভুলবো তোমায়,
সকল ছেড়ে যাবো বনবাসে।
যখন তুমি ফিরে আসো,
অঙ্গ আমার নেচে ওঠে যেন।
এমন কেন হয় গো, বলো,
বুকের মধ্যে অমন করে কেন?
যখন তোমার বাঁশির আওয়াজ শুনি,
তোমার সুরে শুনি আমার নাম,
পাগল করে, মাতাল করে হিয়া,
লুটিয়ে প'ড়ে জানাই আমার হাজারো এক সালাম।।

এই প্রেম সঙ্গীতে যখন সে বিভোর তখন তরবারি উন্মুক্ত করে আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। গান থামতেই চিৎকার করে উঠি, ওরে শয়তানি এই তোর শোকগাথা। মহব্বতের গীত গাইতে গাইতে আত্মহারা হয়ে গেছো! এই বলে প্রচণ্ড শক্তিতে তলোয়ারের এক কোপ বসালাম। কিন্তু তড়াৎ করে এক লাফে কয়েক হাত দূরে সরে যেতে পারলো সে। এমন সময় এক কর্কশ কণ্ঠের অভিশাপ শুনতে পেলাম।—আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, আমার অলৌকিক ক্ষমতা বলে তোর দেহের নিম্নাঙ্গ পাথর হয়ে যাবে।

সেই থেকে আমি এই রকম হয়ে আছি। নিজের দেহটাকে এদিক ওদিক নড়াতে চড়াতে পারি না। আমার দুশ্চরিত্রা বেগমটা রোজ চাবুক হাতে আসে। আর সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে চলে যায়।

এই বলে সেই যুবক কান্নায় ফেটে পড়লো। কান্নার মধ্যেই গাইতে লাগলো :

খোদার কাছে নালিশ আমার,
বিচার কর, বিচার চাই।
বিচার আশায় বসে আছি
দিন-রজনী, চক্ষে আমার নিদ্রা নাই।।

সুলতান বললো, আমিও বড় দুঃখী, কিন্তু তোমার দুঃখে আরও দুঃখ পেলাম। সেই মেয়েটা কোথায় থাকে বলতে পারো?

—ওই যে গম্বুজওয়ালা ছোট্ট বাড়িটা—সেখানে সে ওই নিগ্রোটাকে নিয়ে পড়ে আছে। প্রত্যেক দিন একবার করে আসে। আর আমার পিঠে ঘা কতক চাবুক মেরে চলে যায়। আমি তো নড়তে চড়তে পারি না। তাই নীরবে সহ্য করে যেতে হয়। সে তার ভালোবাসাকে রোজ মুরগীর ঝোল, মদ আর ভালো ভালো খাবার খাইয়ে তাজা করছে।

—যদি মাথার ওপরে আল্লাহ থাকেন, তবে তার নামে হলফ করে বলছি, সুলতান উত্তেজিতভাবে বলতে থাকে, এমন শিক্ষা তাকে আমি দেবো, জীবনে ভুলতে পারবে না।

শাহজাদার সঙ্গে বাকী রাতটুকু কথাবার্তা বলে কাটিয়ে সুলতান ভোরবেলা সেই শোক-মঞ্জিলের দিকে পা বাড়ালো। খাপ থেকে তলোয়ারখানা খুলে গুটিগুটি ঘরের

মধ্যে ঢুকে পড়লো। একপাশে একটা টুলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে। সারা ঘরময় আতরের সুবাস। ওপাশে একটা পালঙ্কে ঘুমুচ্ছে সেই নিগ্রোটা। তিলমাত্র দেরি না করে প্রচণ্ড এক কোপে দু'খানা করে ফেললো তাকে। তারপর ওর দেহটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলো একটা কুয়োর মধ্যে। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে আবার সে ফিরে এলো সেই মঞ্জিলের পিছনে। শাহজাদার বেগমটার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এই ঘটনার ঘণ্টাখানেক বাদে শাহজাদার ঘরে ঢুকলো সেই শয়তানী বেগমটা। হাতে তার শঙ্কর মাছের চাবুক। নিষ্ঠুরভাবে মারতে লাগলো শাহজাদার পিঠে। আর্তনাদ করে ওঠে শাহজাদা। না, না, আর মেরো না আমাকে, তোমার পায়ে পড়ি। একটুখানি দয়া করো।



—দয়া? তোমাকে দয়া করবো? কেন? তুমি আমাকে দয়া করেছিলে! আমার ভালোবাসাকে তুমি জখম করেছো। তোমাকে আমি দয়া করবো?

শাহজাদার গায়ে চাদরখানা চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

খানিকটা দামি সরাব আর মুরগীর ঝোল নিয়ে মঞ্জিলের ঘরে এলো শয়তানী। নিগ্রোটাকে না দেখে সে কেঁদে উঠলো, কোথায় গেলে গো! একবার সাড়া দাও, মালিক। চেয়ে দ্যাখো, তোমার জন্যে আমি সরাব এনেছি, খাবার এনেছি, তুমি খাবে না? হায়, খোদা, সে কোথায় গেলো, তাকে ফিরিয়ে দাও।

এমন সময় দূরাগত এক বাণী শুনতে পেলো সে। তুমি আমার হুকুম তামিল করোনি কেন?

অদৃশ্য আল্লাহর বাণী বলে মনে করলো মেয়েটা। আপনার কী হুকুম তামিল করিনি, খোদা?

—তুমি প্রতিদিন তোমার স্বামীকে চাবুকের ঘা মারো। তার আর্তনাদে আমার বুক চিরে যায়। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করি। আমার চোখে ঘুম আসে না। তোমাকে আমি বারণ করেছিলাম, এমনি ক'রো না, স্বামীকে আঘাত করা মহাপাপ। কিন্তু আমার কথা তুমি শোনো নি। অমন নিষ্ঠুর ভাবে তোমার স্বামীর ওপর অত্যাচার যদি না করতে, তাহলে, অনেক আগেই তোমার 'ভালোবাসা' সেরে উঠতো।

—আমার গুণাহ মাফ করুন, খোদা। এখন আমাকে হুকুম করুন, কী করতে হবে?

—তোমার স্বামীকে শাপমুক্ত করো।

—তাই করছি, খোদা।

আর ক্ষণমাত্র দেরি না করে শাহজাদার শোবার ঘরে এলো বেগম। একটা বাটিতে খানিকটা জল নিয়ে বিড় বিড় করে কী যেন সব মন্ত্র পড়লো। তারপর সেই জল হাতে নিয়ে শাহজাদার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে কী সব মন্ত্র আওড়াতে থাকলো। কী আশ্চর্য, একটু পরে শাহজাদা পালঙ্কের উপর দিব্যি সুস্থ মানুষের মতো উঠে বসলো। গায়ের চাদরটা সরিয়ে রাখলো। ওর দেহের নিচের অংশটা আর মারবেল পাথরের নয়, একেবারে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের দেহের আকার ধারণ করেছে। বিছানা থেকে নেমে মেঝেয় পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আনন্দে উল্লাসে সে আত্মহারা। খোদা, তোমার দয়ায় আজ আমি আবার আমার জীবন ফিরে পেলাম। তোমাকে আমার হাজার সালাম। তারপর তার বেগমের দিকে ঘৃণার চোখে তাকালো, ওরে হারামজাদী, যদি জানে বাঁচতে চাস তবে আমার সামনে থেকে দূর হ। নইলে তোকে খুন করে ফেলবো।

শয়তানীটা ফিরে এলো মঞ্জিলে।

—তোমার হুকুম মতো আমার স্বামীকে শাপমুক্ত করে দিয়েছি, খোদা। এবার হুকুম করো, আর কী করতে হবে আমাকে।

সেই দূরাগত বাণী আবার শোনা গেলো। এখনও তোমার অনেক কাজ বাকী। ঐ যে সায়রের মধ্যে রঙিন মাছগুলোকে বন্দী করে রেখেছো, ওরা রোজ রাতে জল থেকে মাথা তুলে আমার কাছে মুক্তির প্রার্থনা করে। ওরা মুক্ত না হ'লে আমিও শান্তি পাচ্ছি না।

শয়তানী বললো, এই কথা, এখুনি আমি ওদের শাপ মুক্ত করে দিচ্ছি।

দ্রুত পায়ে সে সায়রের দিকে হেঁটে চললো।

এমন সময় ভোর হয়ে এলো, শাহরাজাদ তার গল্প থামালো।

কাহিনী আবার শুরু হলো নবম রাত্রির দ্বিতীয় যামে। সায়রের পাড়ে এসে শয়তানী খানিকটা জল হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়ে ফেলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সারা সায়রটা উথাল পাথাল হতে লাগলো। তারপর দেখা গেলো, সব মাছগুলো মানুষ হয়ে গেছে। এগুলো সবই শাহজাদার সৈন্য সামন্ত, দাস-দাসী, লোকজন। এরাই ছিলো শহরের বাসিন্দা। তারপর মানুষগুলো নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেলো। হাট, বাজার কেনা বেচায় সরগরম হয়ে উঠলো। ঐ পাহাড়টা আবার এক সমতলভূমি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেলো। সেখানে চাষবাস করে সোনার ফসল ফলাতে লাগলো মানুষ।

শয়তান মেয়ে এবার ফিরে এলো মঞ্জিলে। খোদা মেহেরবান, আপনার সব হুকুমই তো আমি তামিল করলাম। এবার বলুন, কী করবো?

হাঁটুগেড়ে গোড়ালীর ওপর বসে, দু'হাত জোড় করে মুখের সামনে তুলে ধরে চোখ দু'টো বুঁজে সে প্রার্থনা জানাচ্ছিলো।

—আর তোকে কিছু করতে হবে না রে শয়তানী। এই নে তোর পুরস্কার। তলোয়ারখানা সোজা বসিয়ে দিলো সুলতান, সেই শয়তানীর পিঠে। একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়। পিঠের ভিতর দিয়ে বুকের ওপারে বেরিয়ে গেলো। নিজের স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস, আল্লাহর হুকুমে তোকে আজ খতম করলাম। এবার তার নাম জপ কর।

সুলতান এবার শাহজাদার ঘরে এলো। দেখলো, শাপমুক্ত হয়ে সে তার প্রতীক্ষায় বসে আছে। আদ্যোপান্ত সব কাহিনী—বললো তাকে। আনন্দে অধীর শাহজাদা। কোন কথা বলতে পারলো না। সুলতানকে জড়িয়ে ধরলো। সুলতান বললো, এবার আমার ছুটি, সুখে সচ্ছন্দে প্রজাপালন করো। আমি আমার দেশে ফিরে যাই।

শাহজাদা বললো, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আপনার দেশে বেড়াতে যাবো।

শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এসে সুলতান সবিস্তারে সব কাহিনী বললো উজিরকে। উজির বিস্ময়ে হতবাক। সুলতান যে আবার ফিরে আসতে পারবেন সে আশা ছিলো না তার। আনন্দে সারা শহর মেতে উঠলো। প্রজারা আল্লাহর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো। সেই ধীবরকে ডেকে মূল্যবান ধনরত্ন এবং নানা উপঢৌকন দিলো সুলতান। এতোসবের একমাত্র সূত্র তো সেই ধীবর। ধীবরের সংসারের নানা খুঁটিনাটি খোঁজখবর জেনে নিলো সে। একটি ছেলে, দুটি মেয়ে আর বৌ। এই নিয়ে তার সংসার। সুলতান নিজে একটিকে শাদী করলো। আর একটি মেয়ের সঙ্গে শাদী দিলো শাহজাদার। এইভাবে সেই ধীবর দেশের মধ্যে সেরা ধনী হয়ে উঠলো। তার দুই মেয়ে বাদশাহর বেগম হয়ে সারাজীবন সুখে-সচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগলো।

শাহরাজাদ একটু থামলো, পরে বললো, কিন্তু মনে ভেবো না, এর চেয়ে সুন্দর কাহিনী আর নেই। এর পর এক কুলির কাহিনী তোমাদের শোনাবো। সে কাহিনী আরও চমৎকার। আরও মজার।

এক সময়ে বাগদাদ শহরে এক প্রিয় দর্শন যুবক বাস করতো। একা সে। বিয়ে থা করেনি। কুলি-গিরি করে খায়। একদিন তার খালি ঝুড়িটা সামনে রেখে রাস্তার একপাশে খদ্দেরের প্রতীক্ষা করছিলো। এমন সময় নজর পড়লো। ক্ষীণ-কটি উদ্ধত উন্নতবক্ষা, অপ্সরা সদৃশ, পরমা সুন্দরী এক যুবতী তারই দিকে এগিয়ে আসছে। দুধে-আলতা গায়ের রঙ। চাঁপার কলির মতো তার হাতের আঙ্গুলগুলো। কাছে এসে মুখের নাকাব ঈষৎ সরিয়ে সে বললো, এই, যাবে?

হরিণীর মতো টানা টানা চোখ। সুরমা পরে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। টিকালো নাক। গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল। এমন রূপসী নারী সচরাচর চোখে পড়ে না। ও যখন ডাকলো, এই যাবে? যেন মধু ঢেলে দিলো তার কানে। কি মিষ্টি গলার স্বর।

খালি ঝুড়িটা তুলে নিয়ে তার পিছে পিছে চলতে থাকে সে। এক সময় এক বাড়ির দরজার সামনে এসে কড়া নাড়লো মেয়েটি। একটি ট্যাশ মেয়েছেলে দরজা খুলে দিলো। তার হাতে কিছু দিনার দিতে একবোতল মদ এনে দেয় সে। সরাবের বোতল ঝুড়িতে তুলে দিয়ে আবার চলতে থাকে । তার পিছে পিছে চলে কুলি। এক ফলের দোকানের সামনে এসে থামে। কিছু ফল কেনে। নানা দেশের সেরা সব ফল। সিরিয়ার আপেল, ওসমানী বেদানা, উমানের আখরোট, আলেপ্পোর আলুবখরা, দামস্কাসের আঙুর, নীল-এর শশা,মিশরের পাতিলেবু, সুলতানী চাটনী, লাল রঙের জাম। ফলগুলো ঝুড়িতে তুলে নিলো।এবার হেনা, গোলাপ, চামেলী, যুঁই, আরও সব নানা জাতের সুন্দর সুন্দর সুগন্ধী ফুল কিনলো মেয়েটি। তারপর এল কষাই-এর দোকানে। পাঁচ সের মাংস নিলো। এর পর সে আলমন্ড কিনলো। তারপর এলো মিষ্টির দোকানে। পেস্তার বরফি, গাজরের হালওয়া, মাখন চীজ, দুধ, মধু, চিনি দিয়ে তৈরি হরেক রকম জিভে-জল-আসা ভালো ভালো মেঠাই কিনে ঝুড়িতে তুলে দিলো। তার সওদা করার বহর দেখে কুলি তো অবাক। ঝুড়িতে আর আঁটে না। কী পেল্লাই ভারি হয়ে গেলো ঝুড়িটা। একটু বিরক্ত হয়ে অথচ হাসতে হাসতে বললো, আগে যদি জানাতে মালকিন, তা হলে তোমার জন্য একটা খচ্চর ভাড়া করে দিতাম। এতো কি মানুষ বইতে পারে।

তার রসিকতায় হাসলো মেয়েটি। চোখে বান মারলো। মুখে কথা বললো না।

একটা আতরের দোকানে এসে গোলাপজল, আতর আর দশ বোতল নির্মল পানীয় জল নিলো। পিচকারীর যন্ত্রও কিনলো একটা। সব শেষে সে আলেকজান্দ্রিয়ার সুন্দর সুন্দর মোমবাতি কিনলো কিছু। সবগুলো ঝুড়িতে তুলে দিয়ে বললো, নাও, চলো, সব হয়ে গেছে।

সুবোধ বালকের মতো ঝুড়ি মাথায় তার পিছু পিছু চলতে থাকে সে। এক সময় দেখে অবাক হতে হয়, এক মনোরম প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো তারা। সামনে ফুলের বাগিচা। জলের ফোয়ারা। দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেলো। কুলিটা দেখলো, দরজা খুলে দিয়েছে এক নবযৌবন-উদ্ভিন্না এক কিশোরী। যৌবনে হবে পরমা সুন্দরী রমণী। তার ছোট ছোট সুগঠিত স্তন, সরু কোমর আর কুসুম-পেলব তনুতে এখনই যাদু লেগেছে। টানা টানা চোখ, উন্নত নাসিকা, গালে গোলাপের আভা। চোখের তারায় হরিণীর চঞ্চলতা।

আজকের দিনটা তার ভালোই যাবে মনে হচ্ছে। কুলিটা ভাবলো, সকাল বেলায় এমন সুন্দরী নারীর দর্শন, এ পরম সৌভাগ্যের কথা।

ঘরের ভিতর ঢুকলো ওরা। বিশাল বিস্তৃত হল ঘর। দরজা জানলায় কারুকার্য করা

সিল্কের পর্দা। দামি আসবাবে সাজানো গোছানো। মেহগনি কাঠের টেবিল চেয়ার, সোফা কৌচ। পারস্য-গালিচায় মোড়া মেঝে। একটা পালঙ্কে মখমলের শয্যায় শুয়ে ছিলো একটি মেয়ে। তার



পায়ের গোড়ালির কাছে শাড়িটা একটু উপরে উঠে গেছে। ধবধবে ফর্সা পা দু'টো দেখে অবাক হয়ে যায় কুলিটা। এমন ফর্সা মানুষ হয়? ওপাশে কাত হয়ে শুয়েছিলো মেয়েটা। ওর চওড়া ভারি নিতম্ব ছোট্ট একটা পাহাড়ের ঢেউ খেলানো চূড়োর মতো। কোমরের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে আবার বুক-পাঁজরের কাছে উঠে গেছে। পিঠের নিচে কটিদেশে ও গ্রীবার অনাবৃত অংশটুকু দেখে কুলির সারা দেহে রোমাঞ্চ লাগে। অপলক চোখে দেখতে দেখতে ভুলে যায় তার মাথার ওপর অত বড় একটা ভারি বোঝা।

এমন সময় আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরলো মেয়েটি, প্রভাতের শুকতারার মতো প্রশান্ত মুখশ্রী। নিখুঁত সুন্দর। চোখ মেলে তাকালো। সমুদ্র-নীল গভীর আয়ত চোখ। আলস্য ঝেড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললো, তোমরা সব অমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওর মাথা থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে নাও।

দু'জনে ধরাধরি করে ঝুড়িটা নামিয়ে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে লাগলো শামানগুলো। কুলিটাকে দু'টো দিনার দিয়ে বললো ঠিক আছে?

কিন্তু কুলিটা কোন কথা বলতে পারলো না। হতবাক নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে লাগলো মেয়েগুলোকে। এত সুন্দর মেয়েছেলে ও জীবনে দেখেনি কখনও? এমন রূপ যৌবন অথচ কোন পুরুষ মানুষ নেই ওদের! এতো খানা-পিনার আয়োজন, এতো ফুলের সৌরভ, মনমাতানো সুগন্ধ সবই ওদের নিজেদের জন্যে? কোন পুরুষের ভাগ নেই এতে। অবাক হলো কুলিটা।

মেয়েগুলোর মধ্যে বড়জন জিজ্ঞেস করলো। কি হলো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার কিরায়া পছন্দ হয়নি? এই নাও আরেক দিনার দিচ্ছি।

কুলিটা হাত সরিয়ে নিলো। না না, সে কি কথা। আমার মজুরী তো মাত্র এক দিনার। তোমরা দিয়েছ আমাকে দু' দিনার। সেদিক থেকে আমি খুব খুশি।

—তবে? মেয়েটি অবাক হয়। তবে দাঁড়িয়ে রইলে।

কুলি ছেলেটা একটু ইতস্তত করে বলে, তখন থেকে অন্য একটা কথা ভাবছি আমি। তোমরা তিনটি খুবসুরৎ লেড়কী। কোন কিছুই অভাব নাই তোমাদের। কিন্তু এমন একা একা থাকো কেন তোমরা? আমার তখন থেকে একটা কথাই মনে হচ্ছে-তোমাদের কোন পুরুষ মানুষ নাই কেন? যদি আচ্ছাসে ভোগ না করতেই পারলে তবে এই অঢেল রূপ যৌবনের কি দরকার, বলো? তোমরা তো তিনজনই উঠতি বয়সের যুবতী নারী। কামনা-বাসনা-লালসা সবই তোমাদের আছে? না নাই? অন্তত একটা পুরুষমানুষও তো তোমাদের দরকার! যদি না কোন পুরুষের সঙ্গ পায় যদি না তার পৌরুষের স্বাদ পায় তবে তো নারীর রূপ যৌবন সবই বিফলে যায়। এ সব আমার বানানো কথা না বিবিজান। কিতাবে লেখা আছে।

—কিন্তু আমরা যে কুমারী মেয়ে, গো। পরপুরুষের সঙ্গ আমাদের বিপদ ঘটাতে পারে। বড়বোন বলতে থাকে, তারা কাছে এসে আমাদের সর্বনাশ করে দিয়ে পালিয়ে যাবে। আর তার পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে আমাদের। এই ভয়েই আমরা একা একা দিন কাটাই।

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে কুলি ছেলেটি বলে ওঠে, আমি তোমাদের কথা

দিচ্ছি, আমাকে দিয়ে কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ পাবে না তোমরা। যেমনটি চাইবে তেমনটিই করবো।

নানা রকম ভালো ভালো শায়ের আওড়াতে থাকে ছেলেটা। কুলিগিরি করে বটে কিন্তু পড়াশুনা বেশ আছে। ওর কথা বার্তায় কবিতায় সবাই বেশ খুশি হলো।

মেজোটা বড়দিদির কানে কানে ফিসফিস করে বলে, ছোঁড়াটাকে নিয়ে একটু মজা মস্করা কর দিদি।

বড়টা গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলে, তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছো আজকের বাজার হাট। অনেক খরচাপাতি হয়ে গেছে আমাদের। আজকের মাইফেলে আমাদের সঙ্গ দিতে চাইছো, খুব ভালো কথা। কিন্তু মালকড়ি আছে কিছু সঙ্গে? দিতে পারবে কিছু? আনন্দে ভাগ নেবে। খরচার ভাগ দেবে না?

কুলি ছেলেটা মুখ কাচুমাচু করে বলে দিন আনি দিন খাই। তোমাদের এই পেল্লায় খরচের কতটুকু দিতে পারি বলো। আর সে সামান্য পয়সা নিয়ে তোমাদেরই বা কি হবে?

মেজো বোনটা এগিয়ে এসে বলে, তা বললে কি করে চলবে, নাগর। সারা দিন সারা রাত ধরে মাইফেল চলবে আমাদের। সরাবের ফোয়ারা ছুটবে। খানা পিনা— কতো খরচ বলো। তার কিছু ভাগ না নিলে কি করে চলে বলো? মুফতে কি এসব চিজ মেলে?

—কিন্তু আমি কোথায় পয়সা পাবো অতো। এখন তোমরা যত দিনারের সওদা করে আনলে সারা মাসেও আমি তা রোজগার করতে পারি না।

এই বলে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে ছেলেটা বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই মেজোটা খপ করে চেপে ধরলো ওর একখানা হাত। আহা, গোসা হয়ে গেলো বুঝি নাগরের। খারাপটা কি বলেছি শুনি? পুরুষ মানুষ, মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করবে, পয়সা খরচা করতে পারবে না? তুমি না পুরুষ মানুষ। মেয়ে মানুষ খুশি করার পয়সা রোজগার করতে পার না কেন?

বড়বোন এবার মুখ খুললো, জানো তো পয়সা ছাড়া পিরীত জমে না। কথায় আছে, ফেল করি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?

মেজো আর বড় দু'জনেই খিল খিল করে হেসে ওঠে। ছোটটা কিন্তু রেগে ওঠে। কি, হচ্ছে দিদি, বেচারাকে নিয়ে অমন পুতুল নাচ করাচ্ছো কেন? ওকে ধরে রাখো আজকের মাইফেলে। দেখো, মজা হবে খুব। আমাদের তিনজনকেই আনন্দ দিতে পারবে ছেলেটা। দেখছো না ওর বুকের ছাতিখানা।

মেজোটা ভীষণ আমুদে। বলে, কিন্তু ওর ট্যাক তো গড়ের মাঠ। বিনি পয়সায়—

ছোট বলে, ঠিক আছে রাখো তোমার পয়সা। পয়সাটাই সব না? এক কাড়ি পয়সা খরচা করে কতো তো সওদা করে এনেছো। ওসব খেয়ে ভালোও লাগবে ঠিকই। সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতেও পারবে। কিন্তু তাই কি সব? পেটের খিদে পুরে গেলে, সুরার নেশা মিটে গেলেও আরও কিছু বাকি থেকে যায়। তা কি মেটাতে পারবে ওসব দিয়ে? আর পয়সাই যদি চাও না হয় আমি দেব ওর হয়ে।

মেজোটা বাঁকা চোখে তাকায়। মুখে দুষ্টু হাসি । বলে, মরেছিস।

এ কথা শুনে আনন্দে নেচে ওঠে ছেলেটার মন। ছোটকে লক্ষ্য করে বললো, তোমার অনুগ্রহের জন্য আমি চিরঋণী থাকবো।

—থাক ও কথা, মেয়েটি বললো, এসো এবার আমরা মন খুলে একটু কথাবার্তা বলি।

অন্য দুই বোনও ছেলেটিকে ভরসা দিয়ে বললো, আমরা এতক্ষণ তোমাকে নিয়ে

মজা করছিলাম। তোমার কোন অনাদর হবে না। আজ তুমি আমাদের মেহমান। যতো পার পান করো, খাও, নাচো, গাও।

এক এক করে সুরাপাত্র পূর্ণ করে নিলো সবাই। তিনটি রূপবতী নারী পরিবেষ্টিত হয়ে ছেলেটি ভাবতে লাগলো, একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড। মৃদু মদের নেশা লেগেছে। ছোট বোনটি এক এক করে তিনবার সরাব ঢেলে দিলো তাকে। তারা নিজেরাও নিলো। ধীরে ধীরে নেশা জমছে।

ছেলেটা গান ধরলো ঃ

আজকে রাতে মদের নেশায় টলবো না,
আজকে শুধু গাইবো গান,
কাজের কথা বলবো না।
রূপের নেশায় মাতাল আমি,
মদের নেশায় নই।
একটুখানি আদর করো,
যেটুকু সময় রই।।

গান শেষে তিনজনের হাতে চুমু খেলো সে। তারপর বড়জনকে বললো, আমি তোমার দাসানুদাস, যেমন তুমি হুকুম করবে, তামিল করব আমি।

তোমার দুয়ারে ক্রীতদাস আমি
আদেশ করোগো, বিবিজান।
অসাধ্য কিছুই নাই
বলো যদি দিতে পারি প্রাণ।।

—খুব হয়েছে, বড়বোন বললো, এবার মদ খাও তো। এসো, কাছে বসো।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আবার গান ধরলো সে ঃ

সুরার নেশায় বিভোর হয়ে
ছিনু বাধা প্রিয়ার বাহু ডোরে।
কে ভাঙ্গালো ঘুম গো আমার,
সাক্ষী তারার ভোরে।।

ছোটবোন আরও এক পেয়ালা মদ এনে ধরলো তার ঠোঁটের কাছে।

এক চুমুকে উজাড় করে এবার উঠে নাচতে লাগলো ছেলেটি। তার সঙ্গে ওরা তিন বোনও নাচতে শুরু করলো। দু'জনকে দু' পাশে আর বড়জনকে সামনে নিয়ে নাচতে লাগলো ছেলেটা। হাসির হুল্লোড়ে মাতোয়ারা সবাই।। এক সময় অন্য দু'টোকে ছেড়ে বড়টিকে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলো ছেলেটা। মেজোটা একটা ফুলগাছের ডাল নিয়ে পেটাতে থাকে ছেলেটাকে। তখন বড়কে ছেড়ে মেজোর কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকে।

এদিকে ছোটজন রাগে ফুসছে। কিল চড় লাথি চালাতে লাগলো ছেলেটার ওপর। কিন্তু তখন ওরা অন্য রাজ্যে। আলিঙ্গন আর অবলেহনের অতৃপ্ত আনন্দে আত্মহারা। নিরুপায় হয়ে শ্বেত পাথরের মেজেয় শুয়ে হাত-পা ছুড়তে থাকে ছোট।

ছেলেটা তখন মেজোকে ছেড়ে দিয়ে ছোটর দিকে এগিয়ে যায়। দু-হাতে ওর দেহটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে বাইরে বাগিচা প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ায়।

নানা জাতের মন মাতানো ফুলের সৌরভে বাগিচা ভরপুর। হরেক রকম রঙের বাহারী ফুলের সাজে সেজেছে সে। মাঝখানে একটা জলের ফোয়ারা। আর তার পাশে ঘিরে আছে এক প্রকান্ড চৌবাচ্চা। ছোটখাটো একটা পুকুর বলা যায়। মারবেল পাথরে বাঁধানো

তার পাড়। চৌবাচ্চার পাড়ে বসে নিরন্তর নির্ঝর ফোয়ারার দিকে চেয়ে থাকতে কতো না ভালো লাগে। চারপাশে ফোটা ফুলের সৌরভ, আর চৌবাচ্চার হালকা নীল স্বচ্ছ জলের তলায়, লাল নীল হলদে রঙের ছোট্ট ছোট্ট মাছগুলোর হুটোপুটি, মনে বসন্তের রঙ ধরিয়ে দেয়।

ছোটর রাগ আরও বেড়ে যায়। ছেলেটার মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে। এলো পাথাড়ী চড়চাপড় মারতে থাকে। কিন্তু ছেলেটা নিরস্ত করে না তাকে। তার ছোট ছোট নরম হাতের আঘাতে মাদকতা আছে। ভালো লাগে—খুব ভালো লাগে ছেলেটার। কাঁধের ওপর থেকে বুকের মধ্যে নামিয়ে নেয় ওর দেহটা। এবার হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে যায় মেয়েটা। দুহাতে ছেলেটার গলা জড়িয়ে ধরে আয়ত চোখ দু'টো মেলে অপলক ভাবে দেখতে থাকে ওর মুখ। ওর পৌরুষ- পুরু ঠোঁট। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে এইভাবে। অতর্কিতে মুখটা ওপরে তুলে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ছেলেটার নিচের ঠোঁটটা। আঃ বলে যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে ছেলেটা। ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ে।



ছোট এই প্রথম বুঝলো, রক্তের স্বাদ নোনতা। আরও নিবিড় করে চেপে ধরে ছেলেটাকে।

ছেলেটার বুকের মধ্যে তখন সমুদ্রের ঝড়। মেয়েটার শরীরের শক্ত বাঁধুনির আকর্ষণে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেই মারবেলের ওপর বসে পড়লো ছেলেটা। ছোটকে শুইয়ে দিলো নিচে। ওর উদ্ধত বুকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। মেয়েটির চোখ ছেলেটির চোখের দিকে। ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠলো। ছেলেটার হাত দু'টো টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলো। ছেলেটা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অস্ফুট স্বরে স্তনন করতে থাকে ছেলেটা। এই সময় জলের পাড়ে এসে দাঁড়ালো বড়বোন। মদির নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখ। ভিতরের অঙ্গবাস ছাড়া একে একে অন্য সব সাজ পোশাক খুলে ঝাঁপ দিলো জলে। সাঁতার কেটে খেলা করতে লাগলো। জল ছিটাতে লাগলো গায়ে। ডাকতে লাগলো, ওহে নাগর, নেমে এসো।

ছেলেটার কোন সাড়া নাই। অসাড়ের মতো পড়ে আছে চিৎপাট হয়ে। জলে জলে সারা জামাকাপড় ভিজে একাকার। সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নাই।

ছোট উঠে এসে ছেলেটার জামা পাতলুম খুলে দিলো। একটা তোয়ালে এনে সযত্নে মুছিয়ে দিলো ওর সারা শরীর। কি শক্ত তার হাতের পেশী। কি বিশাল চওড়া বুকের ছাতি। এক সুঠাম সুন্দর যৌবন। শরীরের কোথাও এক ফোঁটা চর্বি নাই। শক্ত সমর্থ মাংসপেশী গড়া এক সিংহ সদৃশ পৌরুষ প্রত্যক্ষ করতে করতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সে।

বড় উঠে আসে জল ছেড়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটার ওপর। এবার আচ্ছন্নভাব কেটে যায় ছেলেটার। দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে।

কি যেন ঘটে গেলো মুহূর্তে। কি যাদু ছড়িয়ে দিলো বড়, যেন বেহেস্তের দরজা খুলে গেলো তার সামনে।

মেয়েটা শীৎকার দিয়ে বলে, কি অসভ্য তুমি?

এক হাতে তার ঘাড়টা চেপে ধরে অন্য হাতে থাবড়াতে লাগলো ছেলেটাকে। সে আঘাত বড় মধুর মনে হতে থাকে তার। রিরংসায় ক্রমশই হিংস্রতর হতে থাকে মেয়েটি।

এক সময় ক্লান্ত অবসন্ন অথচ প্রসন্ন হয়ে ছেলেটার দেহের উপরে ঢলে পড়ে মেয়েটা।

এর পর আর এক চক্কর সুরা পান করা হলো।

এবার মেজো বোনের পালা।

সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ জল-কেলি করার পর সিক্ত দেহে উঠে এসে ছেলেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তারপর চলতে থাকে সেই একই রঙ্গরীতি।

অবশেষে ক্লান্ত, অবসন্ন অথচ প্রসন্ন হয়ে সে-ও ঢলে পড়ে এক সময়।

এবার উঠে দাঁড়ালো ছোট। ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সাঁতারের নানা কায়দা জানে সে। কখনও ডুব দিয়ে হারিয়ে যায়। আবার কখনও চিৎ হয়ে জলের উপর ভাসতে থাকে। মনে হয় ওর শরীরের বুঝি বা কোন ওজন নাই। হালকা একটা শোলার ভেলা। ফিকে নীল জলের ওপর ওর চাঁপার কলির মতো দেহটা আরও মনোহারিণী আরও রমণীয় মনে হয়। তার মরাল সদৃশ গ্রীবা, কুসুম পেলব বাহু, আপেলের মতো স্তন, ক্ষীণ কটি ভারি নিতম্ব দিনে দিনে তাকে এক পূর্ণ নারী করে তুলেছে।

মেয়েটা উঠে আসে। লজ্জাবনতা হয়ে ছেলেটার কাছে এসে দাঁড়ায়। শুয়ে শুয়ে সব দেখছিলো ছেলেটা। এবার দু-হাত বাড়িয়ে দেয়। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না মেয়েটা।

এবার পুতুল খেলায় মেতে উঠে ছোট। এক সময় প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে কেঁপে ওঠে ছেলেটা। আর তৎক্ষণাৎ মেয়েটির সে কি অস্ফুট আর্তনাদ আরও শক্ত করে জাপটে ধরলো ছেলেটাকে। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে অবসাদে অসাড় হয়ে ঢলে পড়ে ছোটর দেহ। সারা মুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছে তার অনেক পাওয়ার পরিতৃপ্তি। এবার ছেলেটি নামলো জলে। ভালো করে ঘসে মেজে সাফ করলো নিজেকে।

তিন বোন তখন শান বাঁধানো জলের পাড়ে শুয়ে ছেলেটার জলকেলি প্রত্যক্ষ করছিলো। প্রত্যক্ষ করছিলো তার সারা শরীরের মজবুত মাংসপেশী। রিরংসায় কাতর হচ্ছিলো দেহমন।

ছেলেটা জল থেকে উঠে এসেই বসে পড়লো বড়বোনের পাশে। তার কাণ্ড দেখে তিনজনেই হেসে খুন।



—বিবিজান, এবার তোমায় ছাড়বো না।

মেয়েটি ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলে,তুমি ছাড়লেই আমি ছাড়বো নাকি।

ছেলেটি মুখটা নামিয়ে আনে মেয়েটার কানের কাছে। ফিসফিস করে বলে, কী? কেমন?

—খু-উ-ব ভালো। মনে হচ্ছে, যেন কোথায় কোন এক অজানা দেশে ভেসে চলেছি।

এবার ওরা আরও বেশী সময় ধরে গভীর আলিঙ্গনে আবিষ্ট হয়ে পড়ে রহলো।

এক সময় ঘুমে জড়িয়ে আসে ওদের চোখ।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। বাহুপাশ মুক্ত করে উঠে পড়ে দু'জনে।

বড়বোন বলে, অনেক রঙ্গ দেখালে বটে। কোন মায়ের দুধ খেয়েছিলে গো? এত তাগৎ পেলে কোথায়। বাব্বাঃ, শরীরটা আমার তুলোধোনা করে দিয়েছো। সে যাক, সন্ধ্যে হয়ে এলো, এবার তুমি কেটে পড়ো নাগর।

—না না, ছেলেটি কান্নার স্বরে মিনতি জানায়, অমন করে এখনি আমাকে তাড়িয়ে দিও না। তাহলে আমি মড়ে যাব। সোনা, তোমাদের পায়ে ধরি, আজকের রাতটা এমনি সুখে কাটাতে দাও। কাল তো আমাকে যেতেই হবে।

ছোটজন বললো, থাক দিদি, আজকের রাতটা। কেমন মজার আমুদে লোক। সারাদিন ধরে কতো আনন্দ দিলো আমাদের। রাতটাও বেশ হৈহুল্লোড়ে কাটাতে পারবো। লোকটার সরম লজ্জা একটু কম, কিন্তু বেশ ভালো।

তার কথায় অন্য দুই বোন রাজি হলো। বড়জন বললো, বেশ ঠিক আছে, আজকের রাতটা আমাদের সঙ্গে কাটাবে তুমি। কিন্তু একটা শর্ত! আমরা যা বলবো তাই করতে হবে তোমাকে। কেন করতে হবে কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। কী, রাজি?

—রাজি।

তাহলে ওঠো, চলো দেখবে দরজার পাল্লায় কী লেখা আছে । ছেলেটাকে নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। ওকে দেখালো, সোনার অক্ষরে লেখা আছে ঃ

'তোমার ভালো লাগলো কি মন্দ লাগলো সেটা কোন কথাই নয়, যা করতে বলবো শুধু তাই করে যাবে। অন্যের ব্যাপারে আদৌ নাক গলাবে না।'

ছেলেটা বললো তোমাদের সাক্ষী রেখে আমি হলফনামা পড়লাম। এর অন্যথা করবো না।

এক সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামালো।

পর দিন দশম রাত্রি। শাহজাদা অন্দরে এলে আবার কাহিনী শুরু করলো শাহরাজাদ।

কুলিটা হলফ করার পর মেয়েরা খাবার টেবিলে খানা সাজালো। সারাদিন মদ খেয়ে হৈহুল্লোড় করে সবারই পেটে চনমনে ক্ষিদে। একজন জ্বেলে দিলো মোমবাতি-সুগন্ধী-চন্দন ধূপ। এবার সবাই খেতে বসলো। ছোটজন আর এক পাত্র মদ ঢেলে দিলো সবাইকে । তার পর নানারকম মুখরোচক খানা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো সকলে। সবচেয়ে উপভোগ্য হলো ছেলেটার অনর্গল কবিতা আবৃত্তি। চোখ বুজে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করতে থাকে সে। ওরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে চৈতন্য ফেরে। কে যেন ডাকে ?

বড়বোন উঠে গিয়ে দরজা খোলে। একটু পরে ফিরে এসে বলে, আজ রাতে সত্যিই মজা হবে। তিনজন বিদেশী এসেছে। রাতটা এখানে থাকতে চায়। কারোরই দাড়ি গোঁফ নেই। আর তিনজনের বাঁ চোখটা কানা—ঠুলি পরা। অদ্ভুত কেমন যোগাযোগ। দেখলেই বোঝা যায় ওরা সবাই রম দেশের বাসিন্দা। ওদের যদি থাকতে দেওয়া যায় তা হলে ভারি মজা হতে পারে রাতে।

সবাই বললো, বেশ তো ওদের ভিতরে নিয়ে এসো। কিন্তু ওদের আগে দরজার হলফনামা পড়িয়ে দাও। ওই শর্তে যদি ওরা রাজি থাকে তবেই ওরা থাকতে পারে, নচেৎ নয়।

ছোট বোনটা ছুটে গেলো দরজার দিকে। একটু পরে ওই তিনজন বিদেশীকে ভিতরে নিয়ে এলো সে । সবাই মিলে তাদের অভ্যর্থনা করে বসালো। ওরা বসলো। কুলি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখলো তারা। ছেলেটা তখন মদের নেশায় মাতাল। ওকে দেখে ওরা ফিসফিস করে বলাবলি করতে থাকে। মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটাও আমাদের জাতভাই— আর এক কালান্দার ফকির।

ওদের কথা কিন্তু ছেলেটার কানে গেলো। আর হঠাৎ সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললো, ঠিক আছে ভাইসাব, আপনারা আরোও একটু ঘরোয়া হয়ে আলাপ সালাপ চালান। গোমড়া মুখ হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

ওর কথা বলার ধরণধারণ দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

মেয়েরা বললো, আমরা এই বিদেশী কালান্দার ফকিরদের নিয়ে একটু মজা করবো।

কালান্দারদের খেতে দিলো ওরা। গোগ্রাসে খেলোও তারা প্রচুর। যেমন খেলো খানা, তেমনি গিললো মদ। অবশেষে সবাই যখন মদের নেশায় চুর তখন মেয়েগুলো বায়না ধরলো, কালান্দারদের গান শুনবে তারা। ওরা বললো, নিশ্চয়ই শোনাবো। কিন্তু গানের সাথে বাজনা না হলে কি জমবে? বাজাবার কিছু আছে ঘরে?

বড় বোন জবাব দিলো, আছে— একটা বড় মসুল জয়ঢাক আছে। ইরাকের ফ্লুট আর পারস্যের সানাই আছে আমাদের ঘরে।

উল্লাসে ফেটে পড়লো ছেলেটা। হা, হা ইয়া আল্লাহ, কী মজা! গানের সঙ্গে এমন বাজনা— জমবে ভালো।

এমন সময় আর একবার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো।

সেই রাতে খলিফা হারুন-অল-রসিদ নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। প্রায় প্রতি রাতেই তিনি নিজের চোখে দেখতে বেরোন তার প্রজারা কীভাবে দিন কাটাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে থাকে উজির জাফর-অল-বারমাকি এবং তার তলোয়ার বাহক মাসরুর।

যখন তিনি নগরের পথ ধরে হেঁটে চলেছেন, তখন এই বাড়িটার ভেতর থেকে গান বাজনার আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জাফরকে বললেন, আমি বাড়িটার অন্দরে ঢুকে দেখতে চাই কারা এই গান বাজনায় মত্ত।

জাফর খলিফাকে নিরস্ত করার জন্য বললো, ওরা এখন মদটদ খেয়ে চুর হয়ে হৈহুল্লোড় করছে। ওদের সামনে যাওয়া কি আপনার ঠিক হবে, হুজুর। হয়তো আপনার কোন চোট লেগে যেতে পারে।

—তা হোক, খলিফা বললেন, দেখতে হবে ব্যাপারটা। তুমি এমনভাবে ঢোকার ব্যবস্থা কর যাতে ওরা বুঝতে না পারে আমার পরিচয়।

—যা বলবেন হুজুর।

জাফর গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ালো। ছোট বোনটি খুলে দিলো দরজা। জাফর বললো, শোনো মা, আমরা তিবারিয়া দেশের সওদাগর। দশ দিন হলো বাগদাদ শহরে এসেছি। এখানকার সওদাগরদের মোড়লের বাড়িতে উঠেছি আমরা। সেখানেই রেখেছি আমাদের সামানপত্তর। আজ রাত্রে এক ব্যবসায়ী আমাদের খানাপিনার নিমন্ত্রণ করেছিলো। তার বাড়িটাও আমরা দেখেছি। কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে ঠাওর করতে পারছি না। পথ হারিয়ে ফেলেছি। গোলক ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে গেলো। এখন আমরা আর ফিরতে পারবো না। আজকের রাতটার মতো যদি তোমাদের এখানে একটু আশ্রয় দাও, খুব উপকার হয়। আল্লাহ তোমাদের দোয়া করবেন।

মেয়েটি দেখলো, সম্ভ্রান্ত বংশের লোক এঁরা। ভিতরে গিয়ে অন্য দুই বোনের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিরে এসে বললো, আপনারা মেহেরবানী করে ভেতরে আসুন। আজ রাতে আমাদের মেহমান হয়ে থাকবেন আপনারা।

ভিতরে ঢুকতেই আর দুই বোন স্বাগত জানালো। আজ রাতে আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন। শুধু একটি শর্ত। ঐ দরজার গায়ে যে হলফনামাটা লেখা আছে আপনারা সকলে তা মেনে চলবেন, এই অনুরোধ।

জাফর হলফনামা পড়ে দেখলো। বললো, আমরা রাজি।

ওরা তিনজনে গিয়ে বসলো ঐ কালান্দারদের পাশে। একটি মেয়ে সোনার পাত্রে সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য সরাব এনে ধরলো খলিফার সামনে। খলিফা বললেন, আমি হজযাত্রী ওসব আমি খাই না। তখন গোলাপ জলের সরবৎ এনে দেওয়া হলো তাকে। সাগ্রহে পান করলেন তিনি।

খলিফা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, তিনজন কালান্দারের বাঁ চোখ কানা—ঠুলি পরা।

ওদিকে নাচ গান বাজনা খানা পিনা জোরসে চলছে। এক সময় বড়জন বললো, আর কারো খানাপিনার কিছু দরকার আছে? সবাই জানালো, না যথেষ্ট হয়ে গেছে। তখন কালান্দারদের সে অনুরোধ করলো তারা হলের মাঝখানটা ছেড়ে যেন দরজা ঘেঁসে বসে।

হলটা ভালো করে সাফ করলেন এক বোন। অন্য দু'জন কুলি ছেলেটাকে ডেকে বললো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি তো আর বাইরের লোক নও। এখন আমাদের ঘরেরই একজন।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ গায়ের চাদর আর জামা খুলে ফেলে কোমরের দড়িটা ভালো করে আঁটতে আঁটতে বললো, জো হুকুম, বিবিসাব।

আমার পিছনে এসো। এই বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো। একটু পরে শিকল বাঁধা দু'টো কালো কুচকুচে মাদি কুকুরকে নিয়ে আবার ঘরের মাঝখানে ফিরে এলো। একখানা শক্কর মাছের চাবুক হাতে তুলে দিয়ে ছেলেটাকে বললো, কষে লাগাও ঘা কতক, এই মাদিটাকে।

একটা কুকুরকে এগিয়ে দিলো সামনে। বড় বোনের হুকুম মতো চাবুক চালাতে লাগলো সে। কুকুরটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে। এক সময় ছেলেটার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করতে লাগলো। পিঠ চাপড়ে আদর করলো, চোখের জল মুছিয়ে দিলো, আর কপালে চুমু খেলো। একটু পরে অন্য কুকুরটাকে এগিয়ে দিলো ছেলেটার দিকে। বললো, চালাও চাবুক।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগলো।

এই দৃশ্য দেখে খলিফার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠলো। জাফরকে বললো, মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করোতো কি ব্যাপার?

জাফর বললো, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকাই ভালো।

মেজো বোন ছোটকে বললো, এসো, আমরা রোজ রাতের মতো প্রথা অনুসারে, এবার যা যা করতে হবে, করি।

এই বলে মারবেল পাথরের বাঁধানো বেদীর উপর উঠে দাঁড়ালো সে। ছোট বোনটি পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলো একটা বটুয়া থলে। অন্য দুই বোনের সামনে দাঁড়িয়ে থলে থেকে ছোট্ট একটা ফ্লুট বের করে বাজাতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে করুন সুর বাজালো। পরে যখন থামলো, মেজোবোন চিৎকার করে উঠলো, আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন বোন।

তারপর উন্মাদের মতো নিজের পোশাক-আসাক ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে লাগলো। এক সময় অচৈতন্য হয়ে মেজেয় লুটিয়ে পড়লো। খলিফা লক্ষ্য করলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন তিনি। বড় বোন এসে তার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরলো। এবার সে নতুন জামা কাপড় পড়ে উঠে দাঁড়ালো। খলিফা ফিসফিস করে জাফরকে বললেন, ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে? কিছু বুঝলে? মেয়েটির সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ দেখতে পেয়েছো? ঐ মাদী কুকুর দু'টোকে নির্মম ভাবে প্রহার করা, আর মেয়েটার পিঠের ঐ চাবুকের দাগ, আমাকে গোলক ধাঁধায় ফেলেছে। এ রহস্যের সন্ধান আমাকে করতেই হবে।

জাঁহাপনা, জাফর সবিনয়ে বললো, সেই শর্তের কথা স্মরণ করুন, হুজুর। কোন কিছু অহেতুক কৌতূহল এবং যে ব্যাপারের সঙ্গে আপনি জড়িত নন সে কথা জিজ্ঞেস করা শর্ত বিরুদ্ধ।

এমন সময় মেজো বোনটা আবার সেই ফ্লুট বাজাতে লাগলো। সেই করুণ সুর। আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। খলিফা দেখলেন, মেয়েটি তার পরিধেয় বস্ত্র কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে অজ্ঞান হয়ে গেলো। তার গায়ে সেই চাবুকের দাগ। চোখে মুখে জলের ঝাপটা মেরে আবার জ্ঞান ফেরানো হলো। এই ভাবে একই ঘটনার তিনবার পুনরাবৃত্তি হলো।

সেই তিন কালান্দার ফকির এবার ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগলো। এর চেয়ে অন্য কোথাও রাত কাটালেই ভালো ছিলো। এই বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

খলিফা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

কালান্দাররা বললো, আমরাও তাই জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

—ওঃ, তবে এখানে আপনারা নবাগত?

—একেবারে। আপনাদের আসার একটু আগে এসেছি আমরা। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়,ঐ ছেলেটা বোধহয় সব জানে।

কুলি ছেলেটার কানে গেলো কথাগুলো। বললো, আজই আমি প্রথম ঢুকেছি এ বাড়িতে। এই সব হতচ্ছাড়া কান্ডকারখানার বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারছি না আমি। আজকের রাতটাই মাটি হয়ে গেলো। এর চেয়ে যদি রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে থাকতাম, তাও ভালো ছিলো।

তখন ওরা সবাই মিলে পরামর্শ করতে লাগলো। আমরা সাতজন আর ওরা তিনটি মেয়ে। আমাদের অতো ভয় পাবার কি আছে? চলো, আমরা এর চেয়ে কৈফিয়ৎ তলব করি, এসবের মানে কী? কেন এই নৃশংসতা? ওরা যদি সোজা কথায় জবাব না দেয় জোর করে জবাব আদায় করতে হবে।

সবাই এককথায় রাজি হলো। হলো না শুধু জাফর। বললো, আমরা যে শর্তাবদ্ধ সে কি মনে নেই? আজ রাতে আমরা ওদের মেহমান। আগে থেকে শর্ত করিয়ে নিয়েছে আমাদের। যে ব্যাপারে আমাদের কোন স্বার্থ নেই, সে ব্যাপারে নাক গলানো চলবে না। কোন কৈফিয়ৎ তলব করা চলবে না। এখন যদি আমরা এ শর্ত না রাখি, আতিথ্যের অপমান করা হয় না? ভোর হতে আর তো মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকী। তারপর আল্লাহর নাম করে যে যার পথে বেরিয়ে পড়বো।

খলিফার দিকে ঝুঁকে আবার বলতে লাগলো। আর তো মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকী। তারপর দরবারে ফিরে গিয়ে ওদের তলব করে নিয়ে যাবো। তখন তো আপনি সব ব্যাপারই জানতে পারবেন, হুজুর ।

—কিন্তু, খলিফা অধৈর্য হয়ে বললেন, অতোটা সময় আমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারবো না।

এ ব্যাপারে সকলেই অধৈর্য হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কে জিজ্ঞেস করবে ওদের? শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ছেলেটাই বলবে।



মেয়েদের একজন জিজ্ঞেস করলো। তোমরা ফিসফিস করে কী কথা বলাবলি করছো?

তখন বুকে সাহস করে কুলি ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মালকিন, আমরা জানতে চাই, কেন আপনি ওই কুকুর দু'টোকে অমন প্রহার করলেন? আর কেনই বা তাদের সোহাগ করে চুমু খেলেন? আর আপনার দেহেই বা ওরকম চাবুকের দাগ দেখলাম কেন? কী ব্যাপার, আমাদের খুলে বলুন।

বড়বোন জিজ্ঞেস করলো, একি তোমার একার প্রশ্ন না সবাই জানতে চেয়েছেন? ছেলেটা বললো, একমাত্র জাফর ছাড়া আর সকলেরই এই জিজ্ঞাসা।

বড় বোন বিস্মিত হয়ে বললো, আপনারা আতিথ্যের শর্তভঙ্গ করেছেন। আপনাদের শাস্তি পেতে হবে। আপনারা না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবেন না, কোন কৈফিয়ৎ চাইবেন না? কিন্তু এ কি ব্যবহার আপনাদের। আদর করে ঘরে ডেকে এনে জায়গা দিয়ে ভালো মন্দ খাইয়ে আমরা কি অন্যায় করেছি?

এই বলে চাবুকটা তুলে নিয়ে শপাং শপাং করে তিনবার আওয়াজ করলো মেজেয়। আর তখনি, কি আশ্চর্য, পর্দার ওপারে দরজার পাল্লা খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকলো, দৈত্যের মতো দেখতে, সাতজন নিগ্রো। সবারই হাতে ধারালো অস্ত্র। মালকিন হুকুম দিলো, এই অসভ্য লোকগুলোকে শিকল দিয়ে একটার সঙ্গে একটাকে বাঁধো।

তৎক্ষণাৎ ওরা সবাইকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে বললো, মালকিন হুকুম করুন, এখুনি এগুলোকে কোতল করি।

এই কথা বলে খাঁড়া তুলতেই, শোনা গেলো,থামো। ঘণ্টাখানেক বাদে আমি হুকুম দেবো। তার আগে জেনে নিতে চাই কে কি মেকদারের লোক।

কুলি ছেলেটা কেঁদে ফেললো, দোহাই মালকিন, আমার কোন দোষ নাই, আমাকে মেরো না। এই এক চোখওলা কালান্দার ফকিরগুলো যদি না ঢুকতো বাড়িতে, তাহলে এসব কিছুই হোতো না। যত নষ্টের গোড়া এই ফকিরগুলো।

বড় বোন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, ছেলেটার কথা শুনে।

এমন সময় শাহরাজাদ দেখলো রাত শেষ হয়ে আসছে। গল্প শেষ করে চুপ করে বসে রইলো সে।

পরদিন একাদশ রাত্রি। কাহিনী শুরু হলো।

বড় বোনের অট্টহাসিতে সবাই আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। না জানি কি করে? সবাইকে লক্ষ্য করে সে বললো, আমি তোমাদের অসহায় নিরাশ্রয় ভেবে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের আত্ম-পরিচয় বলো, শুনবো। যদি বুঝি তোমরা সত্যিই অসহায় নও তা'হলে তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য।

এই সময় খলিফা জাফরকে বললো,শুনলে তো জাফর। আর বাঁচার কোন আশা নাই। চটপট আমাদের আসল পরিচয় জানিয়ে দাও। নাহলে বেঘোরে প্রাণ যাবে।

—তাইতো আমাদের প্রাপ্য, হুজুর।

—এটা কি রসিকতা করার সময়, জাফর?

বড় বোন সব আগে কালান্দার ফকির তিন জনকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা কি তিনজন ভাই?

—না না। তিনজন তিন দেশের লোক। আমরা গরীব দুঃখী মানুষ। দিন আনি, দিন খাই। আমাদের বিষয়-আশয়, সহায় সম্বল বলতে কিছুই নাই। ত্যাগই আমাদের ধর্ম।

—তোমাদের কি সবাই জন্ম থেকে এক চোখ কানা?

একজন কালান্দার জবাব দিলো, না। জন্মের সময় আমি কানা ছিলাম না। কিন্তু এক অদ্ভুতভাবে আমার চোখটা হারিয়েছি আমি।

বাকী দু'জন কালান্দারও এই একই কথা বললো। আরও বললো, তারা তিনজনে তিন দেশের বাসিন্দা। ঘটনাচক্রে একত্র হয়ে গেছে। ওদের জীবনের কাহিনী বড় বিচিত্র চমৎকার।

ঠিক আছে, বড় বোন গম্ভীরভাবে বললো, তাহলে এক এক করে তোমাদের জীবনের কাহিনী শোনাও। সব শুনে যদি ভালো লাগে তবে, এখান থেকে নিরাপদে চলে যেতে দেওয়া হবে।

কুলি ছেলেটা এগিয়ে এসে বললো, মালকিন, আমি গরীব সামান্য কুলি— সে তোমাদের জানা। তোমরা আমাকে কুলি হিসেবেই বাড়িতে নিয়ে এসেছো। আমার জীবনের অদ্ভুত ঘটনা কিছু নাই। অদ্ভুত যা কিছু আমার জীবনে আজ দিনের বেলায় তা ঘটেছে। আর সেসব

তো তোমাদের জানা। সে কাহিনী এখানে বলাও যাবে না। তাই, আমাকে রেহাই দাও।

ঠিক আছে, এখন তুমি যাও বিশ্রাম কর গে, সব শেষে তোমার কথা শুনবো।

ছেলেটি আপত্তি জানিয়ে বললো, না, না, ওদের কাহিনী না শুনে আমি নড়বো না।

প্রথম কালান্দার এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করলো। শুনুন মালকিন, কেন আমার দাড়ি গোঁফ কামানো। আর কেন একটা চোখ আমার কানা— সেই কাহিনী বলি ঃ

আমার বাবা ছিলেন এক দেশের বাদশাহ। আর আমার চাচাও আর-এক দেশের বাদশাহ । এমনি যোগাযোগ যে, আমার যেদিন জন্ম হয় আমার চাচারও একটি পুত্র সন্তান হয় সেইদিনই।

অনেক দিন কেটে গেছে। আমরা দু'ভাই তখন যুবক। আমাদের পরিবারের প্রথা ছিলো— কিছুদিন পর পর আমরা পিতৃব্যের কাছে গিয়ে বেশ কিছু দিন কাটিয়ে আসতাম । শেষবারের মতো যেবার আমার চাচার ওখানে যাই, তিনি আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করেছিলেন। নিত্য আমার জন্য সবচেয়ে ভালো ভেড়ার মাংস রান্না হতো। দুষ্প্রাপ্য সরাব জোগাড় করা হতো, আমরা দু'ভাই মদ্য পান করতে বসতাম। মদ পেটে পড়লে সে বেশ মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। একদিন মদের নেশা যখন বেশ জমে উঠেছে, ভাইজান আমার দিলদরিয়া মেজাজে বললো, তুমি আমার শুধু ভাই নও, প্রাণের দোস্ত কি বলো? আমি তোমাকে একটা কথা বলবো কিন্তু তুমি না করতে পারবে না কিন্তু। বলো, না করবে না?

আমি তখন মদে বিভোর। বললাম, কথা দিচ্ছি না শুধু আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, তুমি যা বলবে তাই করবো।

এই কথা শোনা মাত্র তড়িৎবেগে অন্য ঘরে চলে গেলো সে। একটু পরে এক লাস্যময়ী পরমাসুন্দরী— যুবতীকে নিয়ে আবার ফিরে এলো। তার পরনে মহা দামী জমকালো শাহী পোশাক। দেহে মনমাতানো আতরের খুশবু।

—ভাই জান, তুমি একে নিয়ে গোরস্তানে গিয়ে ঘুমটি ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসো। কেউ যেন টের না পায়। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

আমি আর কি বলবো। আগেই আমার কাছে কথা আদায় করে নিয়েছে, ও যা বলবে শুনতে হবে। মেয়েটিকে নিয়ে নির্জন গোরস্তানের মধ্যে ঢুকলাম। তার মাঝখানে একটা ঘুমটি ঘর। সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওর জন্য। একটু বাদে সে এক ঝারি জল, খানিকটা প্লাস্টার আর একটা ছোট কুঠার নিয়ে হাজির হলো। ঘুমটির পাশেই একটা পেল্লাই পাথরের চাঁই। কুঠার দিয়ে সেই পাথরটা একটু করে কাটতে লাগলো। কাটতে কাটতে বেশ খানিকটা গর্ত বেরোলো যা—পরে সুড়ঙ্গ মতো হয়ে গেছে। আরোও একটু নিচে সরাতেই দেখা গেলো মনোরম এক প্রাসাদপুরি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে মেয়েটি চোখের আড়ালে চলে গেলো। ভাই আমাকে বললো, আমি নিচে চলে যাচ্ছি, তুমি পাথরটা চাপা দিয়ে, তারপরে পাথরের টুকরোগুলো সাজিয়ে, প্লাস্টারগুলো দিয়ে লেপে পুছে এমন ভাবে বানাবে যেন, যেমনটি ছিলো তেমনটি দেখতে হয়।

আমি ওর কথা মতো সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে, যেমনটি ছিলো ঠিক তেমনি ভাবে তৈরি করে, প্রাসাদে ফিরে এলাম। ফিরে শুনলাম, চাচা কোথায় শিকারে বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন, কে জানে! একা একা আর ভালো লাগছিলো না। সারা রাত কেটে গেলো। চাচার ছেলে ফিরলো না দেখে আমি আবার গেলাম সুড়ঙ্গে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের কোন সন্ধান পেলাম না। বিষণ্ন মনে ফিরে এলাম। এইভাবে সাতটা দিন কেটে গেলো। সে ফিরলো না। আমার আর কিছুই ভালো লাগে না। নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলাম । আবার গেলাম সেই সুড়ঙ্গের

মধ্যে। অনেক খুঁজলাম। কিন্তু না, কোথাও কোন হদিশ করতে পারলাম না। শেষে ভারাক্রান্ত মনে নিজের দেশে রওনা হলাম।

আমার নিজের শহরে প্রবেশ পথে একদল সশস্ত্র লোক আমাকে ঘিরে ফেললো। আমাকে ওরা বন্দী করলো। আমি এদেশের শাহজাদা। আমাকে বন্দী করার দরুন অবাক হলাম। দেখলাম, যারা আমাকে বন্দী করেছে, তারা সকলেই আমার এবং বাবার অনুরক্ত বিশ্বাসী কর্মচারী।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেলো। তাহলে? তাহলে আমার বাবার কি হয়েছে? আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা বলো, আমার বাবার কী হয়েছে? সে কেমন আছে?

কিন্তু কেউ জবাব দিলো না। একটু পরে আমার ব্যক্তিগত এক নোকর আমাকে ফিস ফিস করে বললো, তোমার বাবা আর বেঁচে নেই। উজির সেনাপতির সঙ্গে যোগসাজস করে বিদ্রোহ করেছে। এখন এখানকার বাদশাহ তোমার বাবার উজির। আমরা তার আজ্ঞাবহ। তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে।

বাবার মৃত্যু সংবাদে আমি তখন ভেঙ্গে পড়েছি। ওরা আমাকে নিয়ে হাজির করলো উজিরের সামনে। আমার ওপর এই উজিরের ক্রোধ ছিলো বহুদিন ধ'রে।

অনেকদিন আগে, আমি তখন খুব ছোট, একদিন তীর ধনুক নিয়ে পাখি শিকার করছিলাম। একটা পাখি লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তীরটি পড়ল পাশের বাগানে। ঐ সময় উজির তখন ওই বাগানে পায়চারী করছিলো। তীরটা গিয়ে বিদ্ধ করলো উজিরের চোখে। বেচারীর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলো। উজির ক্রুদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু প্রকাশ করতে পারলো না। কারণ সে আমার বাবার কর্মচারী।

আজ আমি বন্দী। তার সামনে দাঁড়াতেই হুকুম দিলো, গর্দান নাও।

আমি শান্ত ভাবে প্রশ্ন করলাম কি আমার অপরাধ?

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সে। চোখের ঠুলিটা দেখিয়ে বললো, এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে?

—কিন্তু সে তো একটা দুর্ঘটনা মাত্র। আমি তো ইচ্ছা করে করিনি!

উজির আমাকে তার কাছে যেতে বললো। আমি তার হাতের নাগালের মধ্যে যেতেই নখের খোঁচা মেরে আমার এই চোখটা ঘায়েল করে দিলো সে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে পড়ে গেলাম আমি। সেই থেকে চোখটা হারালাম। শুধু চোখটা নষ্ট করেই রেহাই দিলো না সে। আমাকে একটা বাক্সের মধ্যে পুরে জল্লাদকে হুকুম করলো, ওকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যা। সেখানে হত্যা করে ওর দেহটা শেয়াল শকুনিদের মুখে ফেলে দিয়ে আয়।

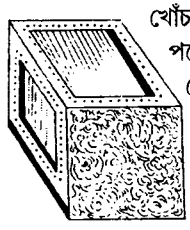

বধ্যভূমিতে এনে বাক্সর ভিতর থেকে আমাকে বের করলো লোকটা।



আমি তখন চোখের যন্ত্রণায় কাতর। এইরকম যন্ত্রণা একদিন উজিরও পেয়েছিলো, কিন্তু সেদিন আমার যন্ত্রণাও কিছু কম হয়নি। একটা মানুষের চোখ নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগে দগ্ধ হয়েছিলাম আমি। কিন্তু আজ সে আমার চোখ কানা করে দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, আমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে।

জল্লাদ আমার বাবার বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিলো। আমাকে বললো, আমি আপনাদের নিমক খেয়েছি সারা জীবন। আজ নিজের হাতে আপনাকে হত্যা করে নিমকহারামী করতে

পারবো না শাহজাদা। আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যান হুজুর। কিন্তু আবার যদি কখনও ফিরে আসেন, আমার গর্দান যাবে।

চোখটা হারালাম, কিন্তু জানে বাঁচলাম। অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আবার আমার চাচার কাছে ফিরে গেলাম। চাচাকে যখন আমার দুর্ভাগ্যের কথা বললাম, তিনি হাপুস নয়নে কাঁদলেন। বললেন তোমার দুঃখের কথা শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, বাছা। এদিকে আমার দুঃখ আরোও কাহিল করেছে আমাকে। অনেকদিন ধরে আমার ছেলেটা নিখোঁজ। কেউই বলতে পারে না, কি হলো। তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নাই। কিন্তু একটা চোখ হারিয়েও যে তুমি জানটা বাঁচাতে পেরেছো, এজন্য আল্লাহকে সালাম জানাই।

চাচার কথা শুনে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। তার ছেলের কীর্তি কাহিনী সব খুলে বললাম তাঁকে। সব শুনে তার মুখে হাসি ফুটলো।

গোরস্থানে গিয়ে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই সুড়ঙ্গের মুখটা নজরে পড়লো। পাথর সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কয়েক ধাপ নিচে নামতেই একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়ে ভয় করতে লাগলো। চাচা আমায় অভয় দিয়ে বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই বাছা। আল্লাকে স্মরণ কর, সব ভয় কেটে যাবে।

সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। শেষে, একটা বিরাট হল ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। নানা ধরনের খাবার আর দামি দামি সরাবে ভর্তি সারা ঘরটা। একপাশে একটা পালঙ্ক। মনে হলো, মশারীর মধ্যে বিছানায় কারা যেন ঘুমিয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, চাচার ছেলে আর ঐ মেয়েটা উভয়ে জড়িয়ে ধরে ঘুমে আচ্ছন্ন। মশারীটা তুলে আঁতকে উঠলাম, একি? দু'টি দেহই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

চাচা আমার, ডুকরে কেঁদে উঠলেন, এই তোর উচিত ইনাম মিলেছে রে হারামী, তোর পাপের শাস্তি যে তোকে পেতেই হবে। শুধু জানে মরেই তোর শাস্তির শেষ হবে না। আল্লাহর দরবারে তোর বিচার হবে, সে বিচারে অনন্ত দোজকে যেতে হবে তোকে। আমি তোর বাবা হয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি।

এই বলে পায়ের পয়জার খুলে ওর মাথায় আঘাত করলো চাচা।

এমন সময় রজনী অতিক্রান্ত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামালো।

পরদিন দ্বাদশ রাত্রি সমাগত। আবার কাহিনী শুরু হলো।

খলিফা, জাফর এবং সেই মেয়েদের সামনে কালান্দার বলে চলে তার জীবনের বিচিত্র কাহিনী।

আমার চাচা যখন ভাইয়ের মাথায় জুতোর বাড়ি মারলো, দেখলাম তার মাথাটা ছাতু হয়ে গেলো। বিছানার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো খানিকটা কাঠকয়লার গুঁড়ো আর টুকরো। আমি কেঁদে উঠলাম, চাচার হাতটা চেপে ধরে বললাম, আপনি ক্ষান্ত হোন, এ দৃশ্য কি সহ্য করা যায় চাচা। ওদের দু'জনের শরীরই পুড়ে শুধু কাঠকয়লা হয়ে গেছে।

তখন চাচা বললেন, জানো, বাছা, কার পাপে এমন হয়েছে? ওর পাশে যে মেয়েটা দেখছো, ওটা ওর বোন, আমার মেয়ে। ওর এই ব্যভিচার কি আল্লাহ সহ্য করবেন? এতো পাপ দুনিয়া ধারণ করতে পারে না। ছোট বেলা থেকেই সে তার বোনের সঙ্গে এই অনাচার করে আসছে। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, শাসন করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে আড়ালে তারা দু'জনে এক জায়গায় হতো। কিন্তু বাছা, আমার চোখকে ফাঁকি দিলেই কি তাঁর চোখ এড়ানো যায়? ওকে আমি কতভাবে শাসন করেছি, কত ভয় দেখিয়েছি

কিন্তু সব পানি হয়ে গেছে। দুনিয়াতে এরকম কদর্য কাজ এর আগে কখনও কেউ করেনি, ভবিষ্যতেও কেউ করবে না। আমি তাকে হাজার বার বলেছি, তুমি যদি এসব নোংরামী না ছাড়ো তাহলে পরকালে দোজকের আগুনে দগ্ধ হতে হবে তোমাকে।

কিন্তু এতেও তাকে নিরস্ত করা যায়নি। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ সব নোংরামী, ব্যভিচার থেমে গেছে। আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলাম, যা করেছো করেছো, এখনও সময় আছে, বন্ধ করো। না হলে আমি নিজে হাতে তোমাকে খুন করবো। কিন্তু, শোভান আল্লাহ, আমার হাতে আর ওর খুন মাখতে হলো না। ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটারও মতিভ্রম ঘটেছিলো। সবই শয়তানের খেলা। তা না হলে এমনটা হবে কেন, বাছা। আমি যখন ভাইবোনকে আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করলাম, তখন সে গোপনে গোপনে সুড়ঙ্গ কেটে মাটির তলায় এই ঘর তৈরি করেছে। তখন কি সে জানতো, আসলে এটা ঘর না—কবর। আমি যখন শিকার বা অন্য কাজে শহর ছেড়ে কোথাও যেতাম, তখনই তারা দু'জন এখানে এসে ব্যভিচার করতো। আগুনে পুড়ে মরেছে, আমি খুব খুশি। পরলোকে আরও বীভৎস শাস্তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।

এই বলে চাচা আকুলভাবে কাঁদতে লাগলো। সে কান্না পুত্রশোকের, আমি শান্ত করতে চাইলাম না তাকে। কাঁদুক, আরও কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে বুকটা হালকা হোক।

চাচা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, বাছা আজ থেকে তুমি আমার ছেলে, তোমার বাবা নিহত হয়েছেন, আজ থেকে আমি তোমার বাবা। চলো, আমরা প্রাসাদে ফিরে যাই।

দরবারে ফিরে এসেই আর এক দুঃসংবাদ শোনা গেলো। যুদ্ধের দামামা বাজছে শহর প্রান্তে। বিদেশী শত্রু শহর আক্রমণ করেছে। সাজ সাজ রব পড়ে গেলো তখুনি। কিন্তু কোন লাভ হলো না। দুর্বার গতিতে শত্রু-সৈন্য শহরের পথে পথে ঢুকে পড়েছে। আমাদের সৈন্যরা প্রস্তুত ছিলো না। এই অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পলায়ন করতে লাগলো। চাচা তার এক সহচরকে প্রশ্ন করলেন, কিছু বুঝতে পারছো, কে আক্রমণ করেছে।

সে বললো, সেই উজির। যে তোমার ভাইকে হত্যা করে তাঁর দেশ-এর বাদশাহ বনেছে, সেই বদমাইসটা—

এ কথা শুনে আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। কিছুই মাথায় এলো না, সেই মুহূর্তে কি করা উচিত। ভাবলাম, আমি যদি অস্ত্র ধারণ করি তবে সম্মুখ সমরে লড়াই করতে হবে। তার ফল অনিবার্যভাবে খারাপ। উজিরের সৈন্যসামন্ত সবই আমার বাবার পুরোনো লোক। আমাকে দেখা মাত্র ওরা চিনে ফেলবে। আর চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে হত্যা করবে। সুতরাং ওভাবে বাঁচা যাবে না। হঠাৎ আমার মাথায় একটু বুদ্ধি খেলে গেলো। আমার চাপদাড়িটা খুর দিয়ে কামিয়ে ফেললাম। তারপর এই ছেঁড়া কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে এক ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে গুটি গুটি করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক দুর্গম পথ হেঁটে, অতি কষ্টে এই বাগদাদে এসে পৌঁছুলাম। শুনেছি এখানাকার বাদশাহ আল্লাহর পয়গম্বর খলিফা হারুন-অল-রসিদ পরম দয়ালু। তার কাছে গিয়ে অধমের আর্জি পেশ করবো, এই আমার ইচ্ছা। আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনে যদি তিনি কিছু দয়া করেন, সেই আশায় এতোটা পথ এসেছি। শহরে যখন ঢুকলাম, সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। পথঘাট কিছু জানি না। কোথায় যাবো, কি খাবো, কোথায় শোব কিছুই ঠিক ছিলো না। এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমন সময় এই কালান্দার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে আরও একজন কালান্দার এসে হাজির হলো। আমরা সবাই এখানে বিদেশী। কারুরই কোন আস্তানা নাই। রাতে তিনজনেরই আশ্রয় দরকার। তাই আপনার দরজায় কড়া নেড়েছিলাম আমরা। এই হলো আমার একটা চোখ নষ্ট হওয়া আর দাড়ি গোঁফ কামানোর ইতিবৃত্ত।

বড়বোন সব শুনে খুশি হলো। বললো, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এবার তুমি মুক্ত, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো।

প্রথম কালান্দার বললো, কিন্তু মালকিন, আমরা সঙ্গের দু'জনের কাহিনী না শোনা পর্যন্ত আমি এক পাও নড়ছি না এখান থেকে।

খলিফা জাফরকে ফিসফিস করে বললেন, এমন সাংঘাতিক ঘটনা একটা মানুষের জীবনে ঘটতে পারে, ভাবা যায় না।

প্রথম কালান্দার নিজের জায়গায় সরে যেতে দ্বিতীয় কালান্দার এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

আমিও এক চোখ কানা হয়ে জন্মাইনি, মালকিন। আজ আমার এই ফকিরের বেশ, কিন্তু আদপে আমি ফকির ছিলাম না। আমিও এক বাদশাহর সন্তান। আমার বাবা শুধু ঐশ্বর্যবানই ছিলেন না, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি কমই জন্মায়। আমাকেও তিনি প্রচুর লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমাদের প্রাসাদে পৃথিবীর সেরা সব বই ছিলো। দিনরাত সেই বইপত্র নিয়েই আমার কাটতো। নিজের প্রশংসা নিজে করা ঠিক না, তবে লোকে বলতো আমি নাকি পণ্ডিত। অনেক নাকি আমার জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি। দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়লো আমার পাণ্ডিত্যের কথা। বাদশাহ, সুলতানরা আমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে যেতো। সম্মান করতো। একবার সমরখন্দের এক বাদশাহর কাছ থেকে আমার আমন্ত্রণ এলো। বাবার অনুমতি নিয়ে রওনা হলাম। অনেক দিনের পথ। খাবার দাবার, পোশাক আশাক বিলাসব্যসন এবং লোক লস্করে ছয়খানা জাহাজ বোঝাই করা হলো। এক মাস ধরে জাহাজ চলছে। একদিন এক বন্দরে ভেড়ানো হলো। ঘোড়া আর উটগুলোকে নামানো হলো। তাদের পিঠে বোঝাই করা হলো নানা জাতের নানা ধরনের মনোহারী উপহার-সামগ্রী। বাদশাহকে ভেট দিতে হবে। বন্দর থেকে বাদশাহের দরবার ঘণ্টাখানেকের পথ। কিছু দূর এগোতেই প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেলো চারদিক। ঝড়ের ঘূর্ণিতে কে কোনদিকে কোথায় যে উড়ে গেলাম কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। অবশেষে বর্ষণ শুরু হলো।এবার ঝড় থেমেছে। অন্ধকার কেটেছে। দেখলাম, আমরা এক বিশাল মরুপ্রান্তরে জনা ষাটেক সশস্ত্র ডাকাতের একটা দল পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। বুঝলাম, প্রাণ-সংশয় উপস্থিত। বললাম, শাহেন শাহর জন্যে উপহার সামগ্রী নিয়ে চলেছি আমরা। সুতরাং আমাদের কোন ক্ষতি না করে পথ ছেড়ে দাও।



কিন্তু তারা সিংহের মতো গর্জে উঠলো, শাহ-ফাহ জানি না আমরা। আমরা আরব দস্যু। এই সব সামান আমরা লুঠ করে নেবো।

এমন সময় ডাকাতদের কে একজন আমাদের একজন ক্রীতদাসকে খুন করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয়ে চিৎকার দিয়ে যে যেদিকে পারলো চোঁ দৌড় দিতে লাগলো। আমিও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। চাচা আপন বাঁচা। কে কোথায় রইলো, কিছু দেখার ফুরসৎ নেই তখন।

দৌড়তে দৌড়তে এক পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। সেখানে এক গুহায় রাতটা কাটলো। পরদিন সকালে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। শেষে, এক সুন্দর শহরে এসে হাজির হলাম। যেদিকে তাকাই, চোখ জুড়িয়ে যায়। চারিদিকে প্রকৃতির বিচিত্র সমারোহ। এখানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বলে কিছু নেই। সারাটা বছরই বসন্তকাল। শহরের পথ দিয় হেঁটে চলেছি। একসময় দেখলাম, এক দর্জি তার দোকানে বসে কাপড় রিপু করছে। আমাকে বোধহয় বিদেশী

দেখেই হাসলো। আমিও হেসে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে বসতে দিলো সে। তারপর জানতে চাইলো আমার কথা। সব শুনে তার চোখে মুখে ভয়ের ভাব ফুটে উঠলো। বললো তোমার বাবার সব চেয়ে বড় শত্রু এদেশের বাদশাহ। তোমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনার উদ্দেশ্য হলো হত্যা করা। তোমার পরিচয় জানতে পারলে কেউ তোমাকে আশ্রয় দেবে না।

সে আমাকে খেতে দিলো। আমরা একত্রে বসে আহার করলাম। গভীর রাত পর্যন্ত অনেক কথা, অনেক গল্প হলো। তারপর আমার জন্যে একটা মাদুর আর চাদর নিয়ে এসে বললো, নাও এবার শুয়ে পড়ো।

দোকানের এক পাশে শুয়ে রাত কাটালাম। এইভাবে তিন দিন তিন রাত্রি সেই দর্জির দোকানে কাটলো। এক সময় দর্জি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এমন কোন বিদ্যা কি তোমার জানা আছে—যা দিয়ে তোমার জীবিকা নির্বাহ হতে পারে?

—নিশ্চয়ই, আমি ববলাম, আমি আইনে পণ্ডিত। এছাড়া সাহিত্য দর্শন শাস্ত্রে আমার অনেক পড়াশুনা আছে। হিসাব শাস্ত্রও আমার নখদর্পণে।

—কিন্তু, সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, তোমার ঐ বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এ শহরে কী ব্যবসা হতে পারে? এখানে কেউ ওসবের কদর করবে না। এখানকার লোকের একটাই লক্ষ্য, কি করে পয়সা বানানো যায়।

আমি বললাম, কিন্তু আমি তো এছাড়া অন্য কিছুই জানি না।

তখন দর্জি বললো, ঠিক আছে, বাছা, আল্লাহ আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন, কোন চিন্তা করো না।

একখানা কুঠার এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বনে গিয়ে কাঠ কেটে এনে শহরে বিক্রী করো। দেখবে খাওয়া পরার পয়সা রোজগার হয়ে যাবে।

অন্যান্য কাঠুরেদের সঙ্গে বনে গিয়ে প্রতিদিন এক-মোট কাঠ কেটে এনে বিক্রী করতে লাগলাম। এক মোটের দাম এক আধুলী। সামান্য কিছু খরচ করে খানা খেতাম, আর বাকীটা সযত্নে জমাতাম। এইভাবে পুরো একটা বছর কেটে গেলো। প্রতিদিন কাজ করি আর রাত্রে এসে দর্জির দোকানে ঘুমোই।

একদিন কাঠ কাটতে গিয়ে আমার সঙ্গীদের ছেড়ে আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। মোটা মোটা অসংখ্য গাছ। আমি একটা মরা গাছ বেছে নিয়ে কাটতে লাগলাম। গাছের গোড়ায় কোপ চালাতে চালাতে এক সময় আমার কুঠারের মুখে একটা তামার বালা উঠে এলো। একটু অবাক লাগলো। খানিকটা মাটি কেটে তুলতেই দেখি, একটা কাঠের পাটাতন। দু' হাত দিয়ে পাটাতনটা সরাতেই চোখে ধাঁধাঁ লাগলো। মাটির নিচে এক মনোরম প্রাসাদ। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। একটা ঘরে পালঙ্কে শুয়ে আছে বেহেস্তের পরীর মতো পরম সুন্দরী একটি মেয়ে।

মেয়েটি আমাকে প্রশ্ন করে, তুমি মানুষ না দৈত্য?

আমি বললাম, আমি মানুষ।

মেয়েটি বললো। আজ কুড়িটা বছর কেটে গেছে, কোন মানুষের মুখ আমি দেখিনি, তুমি কী করে এখানে এলে?

—খোদাই আমাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে সুন্দরী। এতো দিন ধরে যত দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, আজ তোমাকে দেখে তা সব লাঘব হয়ে গেলো।

আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী তাকে বললাম। শুনে তার চোখে জল এলো। তার নিজের জীবনের করুণ কাহিনী শোনালো আমাকে ঃ

আমি ইফতিমাসের সুলতানের কন্যা। আমার চাচার ছেলের সঙ্গে আমার শাদী

হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু শাদীর দিনে বাজমুস দৈত্যের পুত্র জারজিস আমাকে উধাও করে নিয়ে এসে এই পাতালপুরীতে বন্দী করে রেখেছে। অন্য কোন দিকে কোন অভাব সে রাখেনি আমার। আমি যা খেতে চাই তাই এনে দেয়। দামি দামি সাজপোশাকে ভরে দিয়েছে আমার ঘর। দশ দিন পর এক দিনের জন্য আসে সে আমার কাছে। সারা দিন রাত আমার সঙ্গে থাকে। আমার সঙ্গে খানা খায়, আমার সঙ্গে সহবাস করে। তারপর সকালবেলা চলে যায়। আবার দশ দিন পরে আসে। অবশ্য যদি কোন কারণে এই দশদিনের মধ্যে আমার দরকার হয়, তবে তাকে স্মরণ করলে তখুনি সে এসে হাজির হবে। পাশে একটা ছোট ঘর আছে। সেই ঘরের দেওয়ালে দু'টো লাইন মন্ত্র লেখা আছে। সেই লেখাটার ওপর হাত রেখে তাকে ডাকলেই সে এসে পড়বে। চার দিন আগে সে এসেছিলো। আরও ছয় দিন বাকী তার আসার। সুতরাং নিশ্চিন্তে পাঁচটা দিন কাটাতে পারো তুমি আমার সঙ্গে। জারজিস আসার আগে তুমি চলে যেও, কেমন?

—ঠিক আছে, তাই হবে।

আমি রাজি হওয়াতে খুশিতে নেচে উঠলো মেয়েটি। আমাকে টানতে টানতে তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে বসালো। আমার হাতের মধ্যে ওর হাত। ধমনীতে রক্ত প্রবাহ দ্রুততর হয়ে ওঠে। সে বললো, তোমাকে এই পাতালপুরীটা ঘুরিয়ে দেখাই।

একটার পর একটা সাজানো গোছানো ঘর দেখতে দেখতে এক সময় হামাম ঘরে এলাম আমরা। দামি আতরের গন্ধ মাতিয়ে তুললো আমাকে। প্রকাণ্ড বড় একটা বৃত্তাকার চৌবাচ্চা। তার ঠিক মাঝখানে একটা সুন্দর ফোয়ারা। দিবারাত্র জলের তুবড়ী ছুটিয়ে চলেছে। পোশাক-আশাক খুলে চৌবাচ্চার পাড়ে এসে বসলাম দু'জন। নিচে হালকা নীল জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করে কাটালাম। তারপর আমার সারা শরীরে খুব ভালো করে তেল মাখালো সে। আমিও তাকে মাখিয়ে দিলাম। মেয়েটির নরম হাতের স্পর্শে আমার দেহমন উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ওর মুখে তখন দুষ্টুমীর হাসি। কী অমন করছো কেন?

এই বলেই আচমকা একটা ঠেলা দিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিলো আমাকে। তারপর হো হো করে হেসে উঠলো। ফোয়ারার মতই সে হাসি অনর্গল, অবারিত। সেও ঝাঁপিয়ে পড়লো।



য়ে এসে চেপে ধরলো আমার পা। বুকের ওপর টেনে নিলাম নেকক্ষণ ধরে অনেক জলকেলী করে গোসল সারলাম আমরা। মাকে সাবান মাখালো সারা শরীরে। আমিও তাকে মাখালাম। ল থেকে উঠে আবার জামা কাপড় পরে তার শোবার ঘরে ফিরে এলাম আমরা। আমাকে আদর করে সে বললো, এবার সোনা ছেলের মতো ঘুমোও দেখি। এখন কিচ্ছু হবে না। ঘুমিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নাও। তারপর রাতের বেলায়... ঘুম থেকে উঠে আমরা খানা খাবো। মুরগীর মাংস আর শেরী। দেখবে, তারপর কত মজা হয়। এবার ঘুমাও।

আমার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করতে লাগলো সে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমে কেটেছে। কার যেন হাতের স্পর্শে ঘুমটা ছেড়ে গেলো। চোখে তখনও তন্দ্রা। আমি বুঝতে পারছি একটা নরম হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার সারা শরীরের ওপর দিয়ে। বুঝতে পারলাম। মেয়েটি খেলা করছে আমার দেহটা নিয়ে। না জাগার ভান করে ওর আদর খেতে থাকলাম। একটু পরে সে টিপতে লাগলো আমার পা দু'টো, উরু, কোমর। আঃ কী ভালোই না লাগছে! সারা শরীর চনমন করে উঠলো। আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। কাছে টেনে নিলাম।

বিস্ময়ে চোখ দু'টো বড় বড় করে তাকালো আমার দিকে। ওরে দুষ্টু-এতক্ষণ তাহলে ঘাপটি মেরে ছিলে?

আমি আরও নিবিড় করে নিলাম ওকে।

ও বললো, ওঠো, এবার খানা-পিনা করবো আমরা।

খেতে খেতে অনেক সুখ দুঃখের কথা হলো। ও বললো, তুমি এলে, তাই আমার মুখে হাসি দেখছো। আজ বিশটা বছর আমি শুধু কেঁদে কাটিয়েছি। উপরে আল্লাহ আছেন, তিনি আমার কান্না শুনে তোমাকে পাঠিয়েছেন। না হলে কোনও মানুষের পক্ষে কি এখানে আসা সম্ভব?

গুনগুনিয়ে গান ধরলো সে ঃ

আগে যদি জানতেম সখা, আসবে আমার ঘরে,
ফুলের শয্যা বিছিয়ে দিতাম, তোমার পথের 'পরে।
দেখতে আমার সাজের বাহার, রূপের বাহার যতো
রাঙিয়ে দিতাম হৃদয় তোমার, লাল গুলাবের মতো॥

কি মিষ্টি গলা। মনটা ভরে গেলো গান শুনে। এতোদিনের ক্লান্তি আমি মুছে ফেলে নতুন করে জীবনের আনন্দ ভালোবাসার স্বাদ পেলাম। হাত ধরাধরি করে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। শেরী নিলাম দু'জনে। অনেকক্ষণ ধরে অনেক সরাব খেলাম। কাবাব, রোস্ট, চাঁপ, রোটি, শাহী- হালওয়া আরও কত সুন্দর সুন্দর খানা খেলাম, খুব তৃপ্তি করে। আজ বছর খানেক পোড়ারুটি আর ডাল খেয়ে মুখ আমার হেজে গিয়েছিলো।

খানা পিনা শেষ করে বিছানায় এসে শুলাম দু'জনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একের দেহ-মন-প্রাণ অন্যের মধ্যে হারিয়ে গেলো। বেহেস্ত কোথায় জানি না, সেখানে অপার সুখ আছে, সুধা আছে—শুনেছি। কিন্তু সে রাত্রে যে সুখ আমি পেয়েছি, যে সুধা আমি পান করেছি তার কোনও তুলনা নাই। আল্লাহ আমাকে বহুৎ কষ্ট সহ্য করিয়েছেন, সেই রাত্রির সুখের স্বাদ, সেই জন্যেই বুঝি এতো বেশী করে পেলাম।

খুশি খুশি মেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম সকালে। ওকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার চোখে তখন ভালোবাসার রঙ ধরেছে। বললাম, তোমাকে এই পাষাণ পুরীতে রেখে যাবো না আমি। দৈত্যটা তোমার দেহ ছিঁড়ে খাবে, আমি ভাবতেই পারছি না।

—আহা, কী ভালোবাসার কথা গো, মেয়েটি কটাক্ষ হেনে বললো, ইচ্ছে করে, কলজেটা ছিঁড়ে দিই তোমাকে। কিন্তু সোনা, তুমি অমন অধৈর্য হয়ো না। সবুরে মেওয়া ফলে। দৈত্যটা তো দশদিন অন্তর একদিন আসে। তাতে আর কী যায় আসে। বাকী ন' দিন তো আমরা এক হয়ে থাকতে পারবো?

আমি তখন প্রেমে পাগল। ওর এই কথা আমার পছন্দ হলো না। বললাম, না, না, সে হয় না। আর একটা দিনও ব্যাটাকে ভোগ করতে দেবো না তোমাকে। তুমি শুধু আমার। আমি ওই শালার লেখাটা এখুনি মুছে ফেলবো। তাহলেই তো সে এসে পড়বে। আর আসলেই আমার হাতে তার মৃত্যু অবধারিত।

ছোটবেলা থেকেই আমার খুব ঝোঁক দৈত্যের সঙ্গে লড়বো। দৈত্যকে মারতে পারলে খুব পুণ্য হয় শুনেছি।

প্রেমের নেশায় হয়ো না অন্ধ,
ঝোঁকের মাথায় করো না কোন ভুল
হারিয়ে যাবে তুমি, ফুরিয়ে যাবে প্রেম
(তখন) কে রবে দুঃখী বলো, আমার সমতুল?

সুন্দর করে আবৃত্তি করলো সে। কিন্তু এ কবির সার কথায় কর্ণপাত করলাম না আমি। ছুটে গিয়ে আফ্রিদির সেই যাদু করা লেখাটার ওপর প্রচণ্ড ঘা মারলাম কুঠারখানা দিয়ে।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো প্রভাত সমাগত। গল্প থামালো।

ত্রয়োদশ রজনীতে আবার শুরু হলো কাহিনী। শুনুন, শাহজাদা, সেই দ্বিতীয় কালান্দার তার কাহিনী বলে চলেছে ঃ

আমি যখন সেই দেওয়ালের লিখনে কুঠারের আঘাত করলাম, চিৎকার করে কেঁদে উঠলো মেয়েটি। হায় আল্লাহ, এ কি করলে তুমি? এখুনি এসে হাজির হবে দৈত্য। তোমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে আছাড় দেবে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি পালাও। যে পথ দিয়ে এসেছিলে সেই পথ দিয়ে পালিয়ে যাও। আমার কথা শোন।

আমি সিঁড়ির দিকে ছুটলাম। পড়ি মরি করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। সরাব আর প্রেমের নেশা তখন ছুটে গেছে আমার। ভয়ে বুকটা শুকিয়ে গেলো। হঠাৎ মনে পড়লো, পায়ের জুতো আর কুঠারখানা ফেলে এসেছি। আবার তরতর করে নেমে ফিরে এলাম ওর ঘরে। এই ফিরে আসাই কাল হলো। মেদিনী কাঁপিয়ে এসে হাজির হলো সেই দৈত্য। কী ভীষণ দেখতে। এমন বীভৎস যে, চেয়ে দেখা যায় না। মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত কড়মড় করতে করতে বললো, এই অসভ্যতার মানে কী? আমি তো ভাবলাম তোমার কোন বিপদ আপদ ঘটেছে। ব্যাপার কী? হয়েছে কী?

মেয়েটি বললো, কিছুই ঘটেনি। আমি একটু নেশা করে টলে পড়ে গিয়েছিলাম দেওয়ালের গায়ে।

কিন্তু দৈত্যটা সে কথা বিশ্বাস করলো না। আমার জুতো আর কুঠার নজরে পড়লো তার। ওরে হারামজাদী, মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি। এগুলো কী? শিগ্গির বল, কার এগুলো?

মেয়েটি বললো, সত্যি, বিশ্বাস করো, তুমি দেখালে তাই দেখলাম। এর আগে আমার নজরে পড়েনি। আমার মনে হয় তুমিই কখনও নিয়ে এসেছিলে।

—থামো। বিকট চিৎকার করে উঠলো দৈত্যটা, ওসব বুজরুকী অন্য জায়গায় ঝেড়ো। এখন সত্যি কথা বল শয়তানী, না হলে দেখ তোর কী করি।

এই বলে মেয়েটাকে একেবারে ন্যাংটো করে মাটিতে শোয়ালো। হাত দু'টো আর পা দু'টো ক্রুশ-এ গেঁথে দিলো মাটির সঙ্গে। তারপর চালাতে লাগলো নৃশংস অত্যাচার। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ। এবার সিঁড়ির দিকে চলে এলাম, পা টিপে টিপে। নিজের বোকামীর জন্যে ঠোঁট কামড়াতে লাগলাম। শুধু আমার দোষে, একটা ফুলের মতো মেয়ের জীবন শেষ করে দিলাম। অনুতাপে পুড়ে যেতে লাগলো বুকটা। মেয়েটা আজ কুড়িটা বছর বন্দী হয়েছিলো এখানে। কিন্তু তবু তো জানে বেঁচেছিলো। আর আজ! আজ তো সে মরে যাবে। শুধু আমার জন্যে—শুধু আমার জন্যে তাকে আজ মরতে হলো। হায় আল্লাহ, এ পাপ আমি কোথায় রাখবো?



যখন সেই দর্জির দোকানে এসে হাজির হলাম দর্জি তো আমাকে দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। বললো, কাল সারারাত আমি বসে বসে কাটিয়েছি। সবাই ঘরে ফিরলো।

কিন্তু তুমি ফিরে এলে না। আমার ভয় হলো, হয়তো কোন জানোয়ারের মুখে পড়েছো তুমি। তোমাকে খেয়ে ফেলেছে। যাক, খোদার দোয়ায় ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছো, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

তার পাশে বসে আগাগোড়া সব ঘটনা সবিস্তারে বলতে লাগলাম। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দর্জি উঠে গেলো। একটু পরে ফিরে এসে বললো এক পার্শি সাহেব। তোমার জুতো জোড়া আর কুঠারখানা নিয়ে এসেছে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

দর্জির কথা শুনে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। কী করি, কী বলি, কিছুই ভাবতে পারলাম না। মাথাটার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো।

দর্জি বললো, যাও না, দেখা করে এসো। তোমার উপকার করতেই তো এসেছেন। অতো ঘাবড়াবার কি আছে? জুতো জোড়া আর কুঠারটা নিয়ে উনি ঘুরেছেন অনেক। শহরের কাঠকুড়ানোওয়ালারা যে অঞ্চলে বাস করে সেখানে গিয়েছিলেন প্রথমে। তাদের একজন তোমার জুতো জোড়া চিনতে পেরে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। যাও, দরজার সামনে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলো। শুক্রিয়া জানিয়ে এসো।

ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলো আমার পা। কোনরকমে উঠে দরজার কাছে গিয়ে একটু ফাঁক করে দেখলাম, এক সুদর্শন পার্শি দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে জুতো অন্য হাতে কুঠার। চিনতে ভুল হলো না, আমারই। ভাবছি, দরজাটা খুলে ওর সামনে দাঁড়াবো কি দাঁড়াবো না। এমন সময় দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খপ করে আমার একখানা হাত চেপে ধরলো। দেখলাম, সে-হাতের থাবাটা কোনও মানুষের না। দৈত্যের। একটা বিকট আওয়াজ তুলে সে আমাকে হ্যাচকা টানে বের করে ফেললো। তারপর এক লাফে উঠে গেলো মহাশূন্যে। তার হাতের মুঠোয় আমি ঝুলতে ঝুলতে চললাম। কোথা দিয়ে কিভাবে আবার সেই পাতালপুরীর প্রাসাদে আমাকে এনে ফেললো, বলতে পারবে না। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আমি। যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখি, আমার সামনে সেই সুন্দরী—বিবস্ত্রা রক্তাপ্লুত দেহে গোঁঙাচ্ছে।

—এ্যাই হারামজাদী, ফিরে দেখ, দৈত্যটা গর্জে উঠলো, তোর পিরিতের নাগরকে ধরে এনেছি।

মেয়েটা বললো, আমার কোন পিরিতের মানুষ নাই। আমি কাউকে চিনি না। এই বলে মেয়েটা আমার দিকে তাকালো। তারপর আবার বললো, না, একে আমি কখনও দেখিনি, চিনি না।

—কী? গর্জে উঠলো দৈত্যটা, চেনো না? মিথ্যুক কাঁহিকা। যাকে নিয়ে ব্যভিচার করেছিস, তাকে চিনতে পারছিস নে। ঠিক আছে, এই নে তলোয়ার। কাট—কেটে ফেল ওর গর্দান। আমি দেখতে চাই নিজের চোখে।

মেয়েটা হাত পেতে নিলো তলোয়ারখানা। এগিয়ে এলো আমার সামনে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো আমার মুখ। চোখের ইশারায় মিনতি জানালাম, মেরো না আমাকে। আড়চোখে দেখে নিলো আমার ইশারা। তার পর চিৎকার করে উঠলো, তোমার জন্যেই আমাদের যত অশান্তি।

তারপর করুণ একটা গানের কলি গাইলো ঃ

দুঃখের দিনে কেন এলে?
সইবে কি গো, চোখের পানি।
ওই ইশারায় বলতে যা চাও,
অনেক আগেই হৃদয় দিয়ে জানি।

মাথা মোটা দৈত্যটা বুঝলো না, এই গানের মর্মার্থ। আমি বুঝলাম। মেয়েটা তলোয়ারখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দৈত্যটা কুড়িয়ে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিলো সেখানা। বললো, তোমার মেহবুবার গর্দানটা যদি কেটে ফেলতে পারো তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবো আমি। কোন ক্ষতি করবো না। জবান দিচ্ছি।

তলোয়ারখানা নিয়ে মেয়েটার সামনে এগিয়ে গেলাম। হাতটা ওপরে তুলতেই তার চোখের কাতর মিনতি আমাকে বিমূঢ় করে দিলো। তাই তো, এতো অত্যাচার সত্ত্বেও সে তো ভালোবাসার অপমান করেনি। তবে আমি নিজের স্বার্থের জন্যে এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছি কেন তার সঙ্গে? কান্নায় চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়লো। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তলোয়ারখানা। তারপর দৈত্যকে কাতরভাবে বললাম, তুমি দৈত্য অধিপতি, তোমার হুঙ্কারে সারা দুনিয়া কেঁপে ওঠে। আমার আর্জি—তুমি আমাকে এই নৃশংস কাজ করতে হুকুম করো না। আমি পারবো না। তুমি তো দেখলে, সে আমাকে হত্যা করলো না। কারণ আমি তার কোন ক্ষতি করিনি কখনও। আমার সঙ্গে তার পরিচয় নাই। আমারও সেই কথা। সে যখন আমাকে হত্যা করতে পারলো না, আমিই বা তাকে হত্যা করবো কোন অপরাধে? আমি পারবো না। এর চেয়ে আমাকে জহর এনে দাও। আমি খেয়ে মরতে রাজি আছি, কিন্তু বিনা দোষে একজনকে কোতল করতে পারবো না।

—হুম, দৈত্যটা বিজ্ঞের মতো বললো, এবার বুঝলাম, কিরকম মহব্বতে হাবুডুবু খাচ্ছো তোমরা।

তারপর শুনুন, মালকিন, দ্বিতীয় কালান্দার বলতে থাকে, সেই পাষণ্ড দৈত্যটা বেহেস্তের পরীর মতো দেখতে ঐ মেয়েটার দু'খানা হাত আর দু'খানা পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এই লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে তখন আমার দশা কী, ঠাওর করতে পারছেন? মনে হতে লাগলো, এ দৃশ্য দেখার চেয়ে আত্মহত্যা অনেক ভালো। তখনও মেয়েটার ধড়ে জান ধুক ধুক করছিলো। আমাকে চোখের ইশারা করলো সে। দৈত্যের নজর এড়ালো না তার এই ইশারা। গর্জে উঠলো, ওরে খানকীর মেয়ে এখনও পিরিত করতে সাধ হচ্ছে। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি।

এই বলে গর্দানটা কেটে আলাদা করে ফেললো। আমার দিকে চেয়ে বললো, শোনো মানুষের বাচ্চা, আমাদের দৈত্যকুলে নিয়ম আছে ব্যভিচারিণীর একমাত্র সাজা—মৃত্যু। এই মাগীটাকে তার বিয়ের দিনে উধাও করে নিয়ে এসে, মানুষের অগম্য এই পাতালপুরীতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তখন বয়স তার বারো। আজ কুড়িটা বছর সে আমার সঙ্গে সহবাস করছে। অথচ আমার ওপর তার ভালোবাসা জন্মালো না। মহব্বত করলো সে তোমার সঙ্গে। একদিনেই তুমি তার দেহ-মন সব জয় করে নিলে? যাই হোক, সবই আমার ধারণা। নিজের চোখে আমি দেখিনি তোমাদের ব্যভিচার। সেই জন্যে তোমাকে জানে মারতে চাই না। কিন্তু আমার যাদু-মন্ত্রে তোমাকে আমি কোনও একটা জন্তু-জানোয়ার বানিয়ে রাখতে চাই। এখন তোমার কী ইচ্ছে, বলো? কী জন্তু হয়ে থাকতে চাও? শিগ্গির বলো। নষ্ট করার মতো সময় আমার নাই। জলদি করো।

আমি বললাম, কিন্তু আমি তো কিছুই ভাবতে পারছি না, কী হয়ে থাকলে আমার ভালো হবে।

—এখনও ভালো করে ভেবে বলো। গাধা, কুকুর, না খচ্চর, না কাক, না বাঁদর? কী হতে চাও, বলো?

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। তখন সে ভীষণ রেগে গেলো। বাঁ হাতের থাবায় কোমরটা চেপে ধরে শোঁ করে শূন্যে উঠে গেলো। উড়তে উড়তে এক পাহাড়ের

মাথায় গিয়ে নামলো। এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়লো। তারপর আমার গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, বাঁদর হয়ে যা। আর সঙ্গে সঙ্গে একশো বছরের বুড়ো লোম চর্ম এক বাঁদর বনে গেলাম আমি। ভয়ে, দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলাম। আর দৈত্যটা খিক্ খিক্ করে হেসে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। বাদশাহজাদা আমি। আমার কত বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান গরিমা। আজ আমি এক ঘৃণ্য বাঁদরে পরিণত হয়ে গেলাম। নিয়তির অভিশাপ!

পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নামলাম। কাছেই সমুদ্রতীর। সারাদিন সমুদ্রের কূলে কূলে ঘুরে বেড়াই। গাছের ফল আর নদীর জল খাই। রাত্রে গাছের ডালে ঘুমোই। এইভাবে দিন কাটে। একদিন দেখলাম, জাহাজ আসছে। জাহাজটা ক্রমশ কাছে এলো। আমি বিরাট এক লাফ দিয়ে উঠে এলাম জাহাজের ডেকে। ধর ধর, মার মার শোর পড়ে গেলো জাহাজময়। লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এলো সবাই। কেউ বলে তাড়িয়ে দাও। কেউ বলে, না মেরে ফেলো। একজন তেড়ে এলো একখানা তলোয়ার নিয়ে। আমি কায়দা করে এক থাবায় কেড়ে নিলাম। ওরা ভয় পেয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলো। আমি তলোয়ারখানা পাশে রেখে কাঁদতে লাগলাম। নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে ওদের বোঝাতে চাইলাম, আমাকে মেরো না, তোমরা। আমি কোন ক্ষতি করবো না তোমাদের। ওরা বোধহয় আমার নীরব ভাষা বুঝলো। জাহাজের কাপ্তেন এগিয়ে এসে সবাইকে বললো, মনে হয়, বাঁদর আমাদের আশ্রয় চাইছে। যাই হোক, ওকে তোমরা মেরো না। দেখা যাক, কী করে।

আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো তার কেবিনে। অনেক ভালো কথা বললো। আমি সবই বুঝতে পারলাম। কিন্তু জবাব দিই কী করে? আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তুমি যা করতে বলবে আমি ঠিক ঠিক তাই করবো।

কাপ্তেনের ব্যক্তিগত নোকরের কাজে রাখা হলো আমাকে। আমার কাজে কাপ্তেন সাহেব মহা খুশী। যা যা বলে, ঠিক ঠিক করি। কোন ভুলভ্রান্তি হয় না।

এইভাবে পঞ্চাশ দিন পরে এক বন্দরে নোঙর করা হলো জাহাজ। সে দেশের সুলতানের আমির আমলারা এসে সেলাম জানালো জাহাজের বণিকদের। সুলতানের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হলো নানা উপঢৌকন। তারা বললো, আমাদের সুলতানের উজির সম্প্রতি মারা গেছেন। তিনি নানা বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তাঁর উজিরের সমকক্ষ পণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে সুলতান উজিরে বহাল করতে চান। কিন্তু তেমন কোন লোক আমরা জোগাড় করতে পারছি না। আপনাদের মধ্যে যদি তেমন কোনও যোগ্য ব্যক্তি থাকেন, সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। একটা জড়ানো পাট্টা খুলে দেখালো তারা। যে সব লোক উজিরের পদপ্রার্থী—তারা সকলে স্বহস্তে তাদের নাম স্বাক্ষর করে তার পাশে তাদের যোগ্যতার বিবরণ লিখে দিয়েছে।

ওদের হাত থেকে খপ করে কেড়ে নিলাম পাট্টাটা। শশব্যস্ত হয়ে পড়লো তারা। এই বুঝি কাগজটা ছিঁড়ে ফেলি আমি। কেউ আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করলো। আবার কেউ ভয় দেখালো, মেরে ফেলবে। আমি যখন ইশারায় তাদের বুঝালাম, আমিও লিখতে পড়তে জানি তখন ওরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কাপ্তেন সাহেব এগিয়ে এসে বললো, ঠিক আছে ওকে দোয়াত কলম দাও। লিখুক, দেখি!

কাপ্তেনের কথা মতো দোয়াত কলম এলো। আমি অতি সহজভাবেই গোটা গোটা অক্ষরে একটা শায়েরী লিখলাম। সবাই অবাক হয়ে আমার লেখা দেখছে। পরপর আরও তিনটে শায়েরী লিখে দিলাম। এবার কাগজখানা তুলে দিলাম ওদের হাতে। আমলারা কাগজখানা নিয়ে গিয়ে সুলতানের সামনে পেশ করলো। পাট্টায় আরও অনেকের লেখা ছিলো। সুলতান

আমার লেখায় মুগ্ধ হয়ে আমলাদের বললো, তোমরা দামি দামি পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে গিয়ে দাও এই মহা পণ্ডিতকে। আর আমার সবচেয়ে মূল্যবান খচ্চরকে বাদশাহী কেতায় জাঁকজমক করে সাজিয়ে নিয়ে যাও। খচ্চরের পিঠে তাকে বসিয়ে কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে সসম্মানে নিয়ে এসো। আমার দরবারে। আমি তাঁকে উজিরের পদে বহাল করবো।



সুলতানের কথা শুনে হাসি চাপতে পারলো না কেউ। কি করেই বা পারবে? একটা বাঁদরকে বাদশাহী কায়দায়...

সুলতান কিন্তু ক্রুদ্ধ হলো। হাসার কি কারণ ঘটতে পারে এ কথায়? আমি হুকুম দিচ্ছি, আর তোমরা শুনে হাসছো? এতো বড় স্পর্ধা!

গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, আপনার কথা শুনে হেসে উঠবো, এমন দুঃসাহস আমাদের কখনই হতে পারে না। কিন্তু সব কথা শুনলে আপনি নিজেও না হেসে পারবেন না। আপনি যাকে মহাপণ্ডিত বলছেন আসলে সে কোন মানুষ না, একটা বুড়ো বাঁদর। ঐ জাহাজের কাপ্তেনের কাছে আছে।

ওদের কথা শুনে সুলতান তো থ! এমন একটা অদ্ভুত জীব জীবনে দেখেনি সে। যত টাকা লাগে বাঁদরটা সে কিনে নেবে। সুলতান বললো, তোমরা মূল্যবান পোশাক-আশাক আর আমার সবচেয়ে দামী খচ্চরটাকে জঁকজমকভাবে সাজিয়ে নিয়ে যাও। জাহাজ থেকে তাকে বাদশাহী মর্যাদায় খচ্চরে চাপাবে। তারপর ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে মহা সমারোহে শহরের সদর রাস্তা পরিক্রমা করে নিয়ে আসবে আমার দরবারে।

সুলতানের হুকুমে কাপ্তেনের কাছে এসে প্রচুর ইনাম দিয়ে আমাকে কিনে নিলো তারা। তারপর সুলতানের নির্দেশ মতো মহাসমারোহে নিয়ে হাজির করলো দরবারে। আমি মাটিতে দু'হাত ছুঁইয়ে সেলাম জানালাম সুলতানকে। তারপর হাত জোড় করে দাঁড়ালাম তার সামনে। আমার নিখুঁত দরবারী আদব কায়দায় মুগ্ধ হয়ে গেলো সুলতান। মুগ্ধ হলো সবাই আমির অমাত্য, পারিষদ। আমার নির্দিষ্ট আসনে বসলাম আমি। সুলতানের ইশারায় দরবার ফাঁকা হয়ে গেলো। শুধু রইলাম আমি, সুলতান, একটা দশ বছরের প্রিয় চাকর, আর হারেমের প্রধান খোজা। আমি যা যা খেতে ভালোবাসি, জেনে নিয়ে, সেই সব খানার ফরমাশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে খানা সাজানো হলো ফরাসে। সুলতান আমাকে খানা খেতে অনুরোধ জানালো। নিখুঁত দরবারী আদব কায়দা দেখিয়ে আমি খানাপিনা সারলাম।

দোয়াত কলম কাগজ দেওয়া হলো আমার সামনে। কয়েকটা বিখ্যাত পারস্য শায়েরী লিখলাম আমি। সুলতানের সামনে তুলে ধরলাম কাগজ খানা। সুলতান তো অবাক! আমার হাতের লেখা মুক্তোর মতো। কবিতার লাইনগুলো পড়লো সে।—এ কি করে সম্ভব! একটা বাঁদর—সে কী করে লিখতে পড়তে পারে। খোদার মহিমা অপার। এ সবই তাঁর লীলাখেলা।

দাবার ছক আর ঘুটি আনা হলো। সুলতান জিজ্ঞেস করলো, জানা আছে কি?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, জানি। দাবার ছকটা বিছিয়ে ঘুটিগুলো সাজালাম। আমার সঙ্গে দাবায় মেতে উঠলো সুলতান। দু'দুবার মোক্ষম চালে মাৎ করে দিলাম সুলতানকে। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো সে। দাবা খেলায় তার জুড়ি নাই দেশে। অথচ মাত্র গোটা কয়েক

চালেই বাজি মাৎ করে দিয়েছি আমি। সুলতান বলতে থাকে, তুমি যদি মানুষ হতে তবে দুনিয়ার সেরা পণ্ডিত বলে মেনে নিতো লোকে।

এই অদ্ভুত দৃশ্য তার প্রাণ-প্রতিমা কন্যাকে না জানিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলো না সুলতান। হারেমের প্রধান খোজাকে ডেকে বললো, শাহজাদীকে তলব দাও।

একটু পরে শাহজাদী এলো। ঘরে ঢুকেই দু'পা পিছিয়ে গিয়ে নাকাবে মুখ ঢেকে নিলো। বললো, আব্বাজান, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছো। শুনলাম, মজার একটা জানোয়ার এসেছে। সে নাকি লিখতে পারে। দাবা খেলায় তোমাকেও নাকি হারিয়ে দিয়েছে! কিন্তু এই বিদেশীর সামনে তুমি আমাকে ডেকে বে-আব্রু করালে কেন? আব্বাজান?

সুলতান অবাক হয়। বিদেশী—বে-আব্রু? তুমি কি বলছো মা? এখানে আমি আর এই খোজা ছাড়া আর কাকে দেখলে তুমি?

—তুমি যাকে বাঁদর মনে করছো আসলে সে শাহজাদা। শাহেনশাহ ইফিতামারাসের পুত্র। ফার দেশের বাদশাহ। আফ্রিদি জারজিসের যাদুতে সে বাঁদর হয়ে গেছে। এই শাহজাদা জ্ঞানে গরিমায় অনেক নাম যশের অধিকারী। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ লোক চোখে হেয় এক বাঁদর ছাড়া কিছুই না।

সুলতান প্রশ্ন করে, তুমি যা বললে, সব সত্যি, মা?

শাহজাদী বললো, তুমি ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না?

সুলতান আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। আমার চোখে তখন জলের ধারা। ঘাড় নেড়ে জানালাম। সবই সত্যি।

শাহজাদীর প্রতি এবার সুলতানের জিজ্ঞাসা।—তুমি এসব জানলে কেমন করে, মা?

—আমি যখন খুব ছোট, তখন এক বুড়ি পরিচারিকা ছিলো আমাদের প্রাসাদে। সে-ই আমাকে শিখিয়েছে এই যাদুবিদ্যা। অবশ্য তারপর আমি নিজে বহু চর্চা করেছি। অনেক পড়াশুনা করেছি। হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি অনেক। প্রায় একশো সত্তরটা মন্ত্র আমি শিখেছি। এবং তা কাজে লাগাতে পারি। আমি এমন বিদ্যা রপ্ত করেছি, আব্বাজান, যদি বলো, মুহূর্তে তোমার এই বিশাল প্রাসাদ এক ফুৎকারে শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারি। চাইকি, গোটা শহরটাকে এক তুড়িতে মরুভূমি বানিয়ে ফেলতে পারি। শহরের ও প্রান্তে যে কাফ্ পর্বতমালা—তাকেও উর্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে দিতে পারি মাত্র এক আজ্‌লা পানি ছিটিয়ে। আর পাহাড়ের ওপারে যেখানে তোমার প্রজারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করছে তাও হয়ে যেতে পারে বিশাল এক সায়র। তোমার প্রজারা সাঁতার কেটে খেলা করে বেড়াতে পারে নানা রঙের মাছ হয়ে।

—এমন অলৌকিক বিদ্যা তুমি জানো, আমি তো জানতাম না। যাই হোক, এই বেচারীকে যাদুমুক্ত করে ওকে মানুষ করে দাও, মা। কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে সে, বলো। কত জ্ঞানীগুণী মানুষ সে। তাকে আমি আমার প্রধান উজির করে রাখবো। তুমি যা জানো, সেই বিদ্যা দিয়ে, এই অভিশপ্ত জীবন থেকে অব্যাহতি দাও ওকে।

শাহজাদী বললো, আপনার আদেশ শিরোধার্য, আব্বাজান।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, প্রভাত সমাগত। সে চুপ করে গেলো।

চতুর্দশ রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার কাহিনী শুরু করে শাহরাজাদ।

শুনুন, মহানুভব শাহজাদা, সেই দ্বিতীয় কালান্দার তার আত্মকাহিনী বলে চলেছে বড় বোনের সামনে।

একখানা ছুরি নিয়ে এলো শাহজাদী। প্রাসাদের সভাকক্ষের ঠিক মাঝখানে হিব্রুভাষায় কয়েকটা কথা লিখলো সেই ছুরির ফলা দিয়ে। এবং লেখাটাকে কেন্দ্র

করে বিরাট এক বৃত্ত এঁকে দিলো। এবার সে বৃত্তের মাঝখানে সেই খোদাই করা লেখাটার উপর দাঁড়ালো। তারপর বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব আওরাতে থাকলো। মুহূর্তের মধ্যে সারা প্রাসাদকক্ষ ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেলো। এমন অন্ধকার যে কোন কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ মনে হলো, সারা প্রাসাদটা দুলছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার কাটতে থাকে। প্রাসাদকক্ষে দেখা গেলো ভয়ঙ্কর দর্শন সেই আফ্রিদি জারজিসকে। গাঁইতির মতো তার হাত, মাস্তুলের মতো তার পা। চোখ দু'টো আগুনের গোলা সদৃশ। শাহজাদী ছাড়া আমরা সবাই ভয়ে শিউড়ে উঠলাম।

শাহজাদীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এসো, আফ্রিদি, তোমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আফ্রিদি হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।—যে বিদ্যা শিখেছো তার মর্যাদা রাখতে পারলে না তুমি। কথা ছিলো, আমরা কারো কাজে বাধা হবো না। একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করবো না—এই ছিলো আমাদের হলফনামা। তুমি আজ সেই সত্যভঙ্গ করেছো। এর প্রতিফল তোমাকে পেতে হবে। এবং এক্ষুণি।

চোখের পলকে সেই আফ্রিদি দৈত্যটা এক হিংস্র সিংহের রূপ ধারণ করলো। শাহজাদীর দিকে থাবা বাড়িয়ে গর্জন করতে লাগলো। তার সেই ভয়ঙ্কর মুখের হা দেখে আমাদের আত্মারাম তখন খাঁচা-ছাড়া। মনে হলো এখুনি বুঝি শাহজাদীকে মুখের মধ্যে পুরে ফেলবে সিংহটা।

কিন্তু না। শাহজাদী ক্ষিপ্রহাতে মাথার একগাছি চুল ছিঁড়ে মন্ত্র পড়তেই মস্ত এক তলোয়ার হয়ে গেলো। সেই শাণিত তলোয়ারের আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো আমাদের। সিংহের ধড় আর কাল্লা দু'খানা হয়ে গেলো শাহজাদীর এক কোপে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সিংহের মুণ্ডটা এক প্রকাণ্ড কাঁকড়াবিছে হয়ে শাহজাদীর পায়ের দিকে ছুটে এলো কামড়াতে। চোখের পলকে এক বিষধর সাপের আকার ধারণ করলো শাহজাদী। তখন লড়াই শুরু হলো কাঁকড়াবিছে আর সাপে। সে কি প্রচণ্ড লড়াই। অনেকক্ষণ ধরে চললো। এক সময় দেখলাম, কাঁকড়াবিছেটা হয়ে গেলো একটা শকুনী। আর তক্ষুণি সাপটাও ঈগলপাখীর রূপ ধরলো। শকুনি আর ঈগলের যুদ্ধও চললো ঘণ্টাখানেক। এরপর শকুনি হলো এক বন-বিড়াল, ঈগল হয়ে গেলো নেকড়ে বাঘ। বিড়াল আর নেকড়ের লড়াই-এ বিড়ালটা কাবু হয়েছে প্রায়, এমন সময় দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড বড় ডালিম হয়ে লাফিয়ে গিয়ে বসলো দরবার প্রাঙ্গণের ফোয়ারাটার চারপাশের গোলাকৃতি চৌবাচ্চার ওপর। নেকড়েটাও ঝাঁপিয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। ডালিমটা এক লাফে উঠে গেলো শূন্যে। কিন্তু প্রাসাদ কক্ষের ছাদে বাড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লো একটা থামের গায়ে। আর প্রচণ্ড শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো নিচে মারবেলের মেজের ওপর। সারা ঘরময় ছড়িয়ে গেলো ডালিমের দানা। নেকড়েটা তখন একটা মোরগ হয়ে সেই দানাগুলো খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলতে লাগলো; এইভাবে একটা দানা বাদে সমস্তগুলোই খেয়ে নিলো। শেষ দানাটাও খাবে বলে ঠোঁটে করে তুলেছে এমন সময়, ভাগ্যের কি পরিহাস, ঠোঁট থেকে পিছলে পড়ে গেলো একখানা ফাটা মারবেলের ফাটলের মাঝখানে। ঠোঁটটা আর ঢোকাতে পারলো না মোরগ। তখন চিৎকার করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ঠোঁটটা নেড়ে চেড়ে কি যেন একটা বোঝাতে চাইলো। কিন্তু তার ইঙ্গিত অনুধাবন করতে পারলাম না আমরা। পরে বুঝেছিলাম, সে বোঝাতে চেয়েছিলো, তোমরা ঐ মারবেল-এর টুকরোটা তুলে দাও। আমি ঐ শেষ দানাটা খাবো। ওটা খেতে পারলেই আফ্রিদিকে পুরো হজম করে ফেলতে পারবো। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে। যা হবার তাই হবে। আমরা তার ভাষা বুঝলাম না। সে প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করতে লাগলো। তার চিৎকারে প্রাসাদটা দুলতে থাকে। বুঝিবা এখুনি হুড়মুড় করে ধসে পড়বে আমাদের মাথায়।

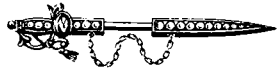

মোরগটা ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে চলেছে মারবেলটার ওপর। এক সময় দেখা গেলো, মারবেলের ভাঙা একটা টুকরো তুলে ফেলে দিয়ে সেই শেষ দানাটা ঠোঁটে করে তুলে নিলো সে। কিন্তু কি ব্যাপার, বুঝতে পারলো না। ডালিমের দানাটা ছিটকে গিয়ে পড়লো চৌবাচ্চার জলে। আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো একটা মাছ। মোরগটা তার রূপ পালটে হলো পানকৌড়ি। চৌবাচ্চার জলে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেলো, পানকৌড়ি আর ওঠে না।

এক সময়ে প্রচণ্ড এক গোঁঙানীর শব্দে চমকে উঠলাম আমরা। দেখলাম, উথাল পাথাল করছে চৌবাচ্চার জল। এবার দেখলাম, আফ্রিদি তার আসল চেহারা নিয়ে উঠে আসছে জল থেকে। তার শরীরটা এক জ্বলন্ত অঙ্গার। গনগনে আগুনের এক বিরাট চাঁই। সে কি ভয়াবহ দৃশ্য! তার নাক চোখ মুখ দিয়ে উদ্গিরণ হচ্ছিলো চিমনীর ধোঁয়া। তার পিছনে পিছনে শাহজাদীও উঠে আসে। ঠিক আগের মতো এক রূপবতী যুবতী। কিন্তু তার দেহটাও লাল টকটকে। আগুনে দগ্ধ এক ধাতব মূর্তি।

ক্রমশ তারা দু'জনেই আমাদের দিকে এগুতে থাকে। ভয়ে শিউড়ে উঠলাম। ঐ আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে ভস্ম হয়ে যাবো আমরা। কি করবো কিছু ভাবতে পারছি না। পালাবার পথ নাই। ঠিক করলাম চৌবাচ্চার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই আগুনের হল্কা থেকে নিজেকে বাঁচাই। কিন্তু দেখলাম, আফ্রিদিটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একমুহূর্ত। তারপর বিকট এক চিৎকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো—দরবার প্রাঙ্গণে—ঠিক আমাদের মাঝখানে। এক ঝলক আগুনের হল্কা এসে লাগলো আমার চোখে মুখে। এমন সময় শাহজাদীর জ্বলন্ত দেহটা এসে জাপ্‌টে ধরলো আফ্রিদিকে। দুই অগ্নিপিণ্ডের সে উদ্দাম লড়াই। আগুনের উত্তাপ দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। আফ্রিদির মুখ-নিঃসৃত একটা উল্কার মতো আগুনের ফলা এসে ঘায়েল করে দিলো আমার এই বাঁ চোখটা। আর একটা হল্কা এসে লাগলো সুলতানের থুতনীর কাছে। পুড়ে ঝলসে গেলো। নিচের ঠোঁটটা খসে ঝুলতে লাগলো। আর নিচের পাটির দাঁতগলো ঝুপ ঝুপ করে পড়ে গেলো মার্বেলের মেজের ওপর। আর একটা তির্যক আগুনের ফলা এসে বিঁধলো সেই হারেমের প্রধান খোজার বুকে। ব্যাচারী। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলো সে।

এই সময়কালের মধ্যে আফ্রিদি আর শাহজাদীর যুযুৎসুর লড়াই চলছিলো। আফ্রিদি চেয়েছিলো আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে জীবন্ত দগ্ধ করে ফেলতে। কিন্তু শাহজাদীর প্যাঁচে পড়ে আর এগুতে পারলো না সে। তাই আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চেয়েছিলো সবাইকে। আমরা দু'জনে অঙ্গহানির ওপর দিয়ে বেঁচে গেলাম। কিন্তু খোজাটা প্রাণ হারালো।

এমন সময় আর্তনাদ করে উঠলো আফ্রিদি। আল্লাহ, আমাকে তোমার কোলে টেনে নাও। তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নাই। জীবনে যতো পাপ করেছি—তার শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। তোমার দেওয়া সব শাস্তি আমি মাথা পেতে নেবো, মালিক। তোমার পায়ের কাছে আমাকে একটু ঠাঁই দাও।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো আফ্রিদির আর্তনাদ। পাহাড়ের মতো তার ঐ বিশাল জ্বলন্ত বপুটা লুটিয়ে পড়ে গেলো মার্বেলের মেজের উপর। আগুনের তেজ কমে আসতে লাগলো। একটু পরে একেবারে নিভে ছাই-এর পাঁজা হয়ে পড়ে রইলো তার দেহটা।

শাহজাদী এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। বললো, শিগ্গির—শিগ্গির নিয়ে এসো এক গেলাস পানি।

জল এলো। সে বললো, আমার মুখের সামনে তুলে ধরো গেলাসটা। জলের

গেলাসটা সামনে ধরতে বিড়বিড় করে কি সব দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়ালো খানিকটা। তারপর বললো পানিটা ছিটিয়ে দাও ঐ বাঁদরটার ওপর।

আমার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হলো সেই মন্ত্রপুত জল। সেই সঙ্গে শাহজাদী পরিষ্কার আরবীতে বললো, সর্বশক্তিমান—একমাত্র পরমসত্য আল্লাহর দোয়ায় তুমি তোমার আগের চেহারায় ফিরে এসো।

তখনি, আমি আমার আসল রূপ ফিরে পেলাম। মানুষের রূপ। শুধু ফিরে পেলাম না আমার বাঁ চোখটা—আগুনের হল্কায় কানা করে দিয়েছিলো—।

আমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে দেখে শাহজাদী দুঃখ করলো খুব। কি করবে বলো। আগুন যাকে স্পর্শ করবে তাকেই দহন করবে। এই তার ধর্ম। বাবার ঝলসানো পোড়া মুখটা দেখেও তার অন্তর মথিত হতে লাগলো।

তারপর শাহজাদী বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো। বিষাদ বিবশ কণ্ঠে বলতে লাগলো, আব্বজান, আমারও যাবার সময় হয়ে এলো, আল্লাহর দরবারে ডাক পড়েছে আমার। বিধিলিপি এড়ানো যায় না। না হলে, দৈত্যটা যখন ডালিমদানা হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো আমি তার প্রতিটি দানাই পেটে পুরে নিয়ে ছিলাম—শুধু মাত্র একটি ছাড়া। ঐ দানাটা, আমার দুর্ভাগ্য, মার্বেলের ফাটলের মধ্যে আটকে গিয়েছিলো। ওটাকে যদি খেয়ে ফেলতে পারতাম—তবে, সেই মুহূর্তে আফ্রিদির মৃত্যু ঘটতো। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডন করবে, বলো! না হলে সব দানা খেয়ে শেষ করলাম আর ঐ একটা দানাই বা ফস্‌কে পড়ে যাবে কেন, মুখ থেকে। যাক, এ নিয়ে দুঃখ শোক ক'রো না, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হয়েছে, হবে।

একটু থেমে শাহজাদী আবার বলতে থাকে, আমার আর আফ্রিদির এই প্রচণ্ড লড়াইএ আগাগোড়াই আমি তাকে ঘায়েল করে গিয়েছি। আর প্রাণপণে আঘাত প্রতিরোধ করার চেষ্টামাত্র করে গেছে সে। পাল্টা আক্রমণ কোন সময়ই হানতে পারেনি। সে দিক থেকে এ লড়াই জয় আমার অবধারিত ছিলো। কিন্তু নিয়তি বড় নিষ্ঠুর—বড় নির্মম। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোনও লড়াই—এই সে যখন সুবিধে করতে পারলো না তখন সে নিজেই বেছে নিলো শেষ মারণাস্ত্র। অগ্নি কুণ্ডের দরজা খুলে ঝাঁপ দিলো সে। আমার হাতে মরতে তার পৌরুষ অহমিকায় বাধলো। কিন্তু আমার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। ওকে আত্মঘাতী হতে দেবো না আমি। নিজে হাতে খতম করবো, এই আমার জেদ। আর সে জন্যই কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমিও সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। টুঁটি চেপে তুলে নিয়ে এলাম ওপরে। নিজে হাতে খতম করবো তাকে—এই আমার তখন একমাত্র রোখ।

সবই নিয়তির পরিহাস, আব্বাজান। না হলে আফ্রিদি তো বিলকুল হেরে গিয়ে আত্মহত্যাই করতে গিয়েছিলো। আমি আবার কেন তার পিছে পিছে ধাওয়া করে সে আগুনে ঝাঁপ দিলাম। তার কোন দরকার ছিলো না। সে তো ঐ আগুনেই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু এই রকমই ঘটতে হবে। এই আল্লাহর অভিপ্রায়। এ-ই বিধিলিপি! আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন। আমার ধ্যান জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না। তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই। মহম্মদ আল্লার পয়গম্বর।

এই বলে মেজের ওপর লুটিয়ে পড়ে গেলো—শাহজাদী। আফ্রিদির দেহাবশেষের পাশে তার নির্বাপিত দেহটাও পড়ে রইলো—একটা ছোট্ট ছাই-এর ডেলা হয়ে।

আমরা অনেক কাঁদলাম। এর চেয়ে আমার নিজের মৃত্যুই ভালো ছিলো। আমার মুক্তির জন্য তার আত্মাহুতি আমাকে দগ্ধ করতে লাগলো। কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে গেলো।

কন্যার শোকে উন্মাদের অবস্থা হলো সুলতানের। কপাল চাপড়াতে লাগলো

বারবার। নিজের হঠকারিতার জন্যে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো। কেন সে তার মেয়েকে বললো, বাঁদরকে মানুষ করে দিতে। কেনই বা সে তাকে দরবারে ডেকে পাঠালো। হায় আল্লাহ, এ দুর্মতি কেন হলো তার? অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলো সমস্ত অন্তরাত্মা। কন্যার ভস্মীভূত দেহটার পাশে গিয়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো সুলতান। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো সে।

হারেমের বেগমরা এলো। ক্রীতদাসীরা এলো। বাদশাহী মর্যাদায় সাতদিন ধরে শোক পালন করা হলো শাহজাদীর উদ্দেশে।

শোক-সপ্তাহ শেষ হলে সুলতানের হুকুমে হাজার হাজার ক্রীতদাস আর হাজার হাজার বেগার মজদুর খাটিয়ে এক শাহজাদী স্মৃতি-মিনার গড়ে তোলা হলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আলোর মালায় সাজানো হলো মিনারটা।

শোকে দুঃখে দিন দিন কৃশকায় হতে থাকে সুলতান। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলো। কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না। দরবারে বসে না নিয়ম মতো। সারা প্রাসাদ এক বিষাদের ছায়া। কারো মুখে হাসি নাই। সবাই যেন কেমন বিষণ্ণ—চুপচাপ। এইভাবে মাসাধিককাল কাটলো। একদিন সুলতান আমাকে ডেকে পাঠালো।

—শোনো, বাবা, তুমি এখানে আসার আগে আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো আমাদের। কিন্তু তুমি যে দিন এলে, সেই দিন থেকেই আমার সৌভাগ্যের চাকা উল্টোদিকে ঘুরছে। দুঃখ, শোক, দুর্বিপাকে জীবন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে আমার। আমার ইচ্ছে নয়, তুমি আর এখানে থাকো। তোমার মুখ আর আমি দেখতে চাই না। আমার কথায় মনে কোনও দুঃখ করো না, বাবা। তোমার কোনও দোষ নাই। দোষ তোমার ভাগ্যের। তোমার ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য জড়াতে যাবে যে তারই ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঘটবে—এই নিয়তি। তাই তোমাকে বলছি, বাবা, তুমি এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। এদেশে তুমি থাকলে সারা দেশটাই উচ্ছন্নে যাবে আমার। তুমিই আমার প্রাণ প্রতিমা কন্যার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। তোমার জন্যেই আমার মুখটা পুড়ে কদাকার হয়ে গেছে। দাঁতগুলো হারিয়েছি। তুমি এদেশে না এলে আমার একান্ত বিশ্বাসী প্রধান খোজার প্রাণনাশ ঘটতো না। কিন্তু মনে করো না, বাবা, তোমাকে দোষারোপ করছি। তোমার কি দোষ? দোষ তোমার দুর্ভাগ্যের। তোমাকে সত্যিই আমি ভালোবাসি। আমার কন্যা তার নিজের জীবন দিয়ে তোমাকে শাপমুক্ত করে দিয়েছে। তুমি তোমার আসল রূপ ফিরে পেয়েছো। এবার তুমি এসো। আমার ভাগ্যে যা লেখা ছিলো তাই ঘটেছে। নিয়তি এড়ানো যায় না। ঢের সয়েছি শোকতাপ। এবার ফিরে যাও, শাহজাদা। আমাদের একটু শান্তিতে বাস করতে দাও, বাবা।

মালকিন্ বিশ্বাস করুন, তখন সেই মুহূর্তে, আমার নিজেকে মনে হলো দীন, হীন, অপয়া, অপদার্থ এক হতভাগা। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এলো আমার কণ্ঠ। চিৎকার করে বলতে চাইলাম, ধরণী দ্বিধা হও, আমি ঢুকি। কিন্তু পারলাম না। মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ছেড়ে। তারপর পথ আর পথ। শুধু পথ চলা। কোথায় চলেছি কিছুই জানি না—জানতে চাই না। শুধু উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে অবশেষে আজ সন্ধ্যায় এসে হাজির হলাম এই বাগদাদ শহরে।

বাগদাদ আমার ছোটবেলার স্বপ্ন-শহর ছিলো। এখানে কেউ দুঃখে দিন কাটায় না, শুনেছি। এখানকার সুলতান নাকি পরম ধার্মিক দয়াবান মহান। তাকে চোখে দেখার বাসনা আমার বহু কালের। এই হতভাগার জীবনের করুণ কাহিনী তাকে শোনাবার বড় সাধ আমার। কী পাপ করেছি আমি, যার জন্যে এতো দুঃখ এতো কষ্ট আমাকে পেতে হচ্ছে। মনে পড়ে, সেই

মরুভূমির ডাকাতদের হাতে পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে সেই দর্জির আশ্রয়ে এসে কাঠুরিয়ার জীবন। আজ মনে পড়ে, পাতালপুরীতে চিরবন্দিনী আমার সেই দুদিনের প্রিয়া। কেনই বা তার কাছে গেলাম, কেনই বা আফ্রিদির হাতে তাকে হত্যা করলাম! সেই অনুতাপে নিয়ত দগ্ধ হচ্ছি আমি। আর আমার দুর্ভাগ্য—না হলে আফ্রিদির যাদুতে কেনই বা হবো আমি বাঁদর! মনে পড়ে, শাহজাদা হয়েও নোকরের কাজ করেছি আমি, জাহাজের কাপ্তেনের। এমনকি শনির দশা আমার—যে, সুলতানের সুখের সংসার আমি বিষাদের সায়রে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছি। তার প্রাণাধিকা কন্যার মৃত্যুর কারণ হয়েছি। সুলতানের মুখটাও পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছে আমারই জন্যে। তার বিশ্বস্ত নফর, ব্যাচারী খোজা, তার কি দোষ, সে কেন প্রাণটা হারালো? সেও তো আমার জন্যেই। আমিও অবশ্য হারিয়েছি আমার এই বাঁ চোখটা। তা আমার দুর্ভাগ্যের ফল তো আমি পেতেই পারি? কিন্তু ওরা? ওরা কেন এই ভয়াবহ বিষময় ফল ভোগ করলো আমার কারণে? আমার একটা চোখ গেছে, তবু তো আর একটা আছে। সব তো যায়নি। কিন্তু ওরা তো সব খুইয়েছে। আর আমিই সে জন্যে একমাত্র দায়ী। একমাত্র অপরাধী।



নানা পথ হেঁটে অবশেষে আজ সন্ধ্যায় এই বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছলাম এক ফকিরের বেশে।

শাহজাদা নই—এক কালান্দার ফকির। একটা চোখ কানা। দাড়িগোঁফ কামিয়ে আমার নিজেকে বেমালুম পাল্টে ফেলেছি। কেউ আমাকে চিনবে না—আমি এক বাদশাহজাদা।

এক চৌরাস্তার মোড়ে এসে দেখি, আমারই মতো আর এক কালান্দার। তারও বাঁ চোখ কানা। দাড়িগোঁফ কামানো। সেও আশ্রয় আস্তানা খুঁজছে আমারই মতো। তার কাছে এলাম। একটু পরে আর এক কালান্দার এসে মিলিত হলো আমাদের সঙ্গে। অবাক কাণ্ড, তারও বাঁ চোখ কানা। সেও দাড়িগোঁফ হীন। এই তৃতীয় কালান্দার। তারও একই সমস্যা। রাতের মতো কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা সেই চিন্তা।

তারপর আমরা তিন কালান্দার মিলে আশ্রয় সন্ধান করতে করতে তোমাদের দরজাতেই করাঘাত করেছিলাম, মালকিন। সবই তার ইচ্ছে। আমরা নিমিত্ত মাত্র।

এই আমার জীবনের করুণ ইতিহাস।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলো এতক্ষণ। দ্বিতীয় কালান্দার তার কাহিনী শেষ করতেই বড়বোন বাহবা দিলো তাকে। বাঃ, বড় চমৎকার তোমার কাহিনী। আমি খুশি। এবার তোমার যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। তোমার ছুটি।

দ্বিতীয় কালান্দার বললো, কিন্তু এই তৃতীয় কালান্দারের কাহিনী না শুনে যাবো না। এই আমি গ্যাট হয়ে বসলাম।

এবার তৃতীয় কালান্দার এগিয়ে এসে তার কাহিনী বলতে শুরু করে :

শুনুন মালকিন, মনে করবেন না, আমার কাহিনী ওদের দু'জনের চেয়ে আরও চমৎকার। তা নাও হতে পারে। তবে সত্যি ঘটনা—এটুকু বলতে পারি। কারণ এর সবই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

ওদের দু'জনের মতো আমারও বহু বিড়ম্বিত ভাগ্য। তবে ওদের দু'জনের মতো অতোটা না। আমার এই বাঁ চোখটা হারিয়েছি একমাত্র আমার নিজের দোষে। এর জন্য অন্য কাউকে দোষ দিতে পারি না।

আমি এক বাদশাহ। আমার বাবাও ছিলেন বাদশাহ। আমার বাবা কাসিব যখন মারা

গেলেন আমি তখন সিংহাসনে বসি। আমার ন্যায়বিচারে প্রজারা খুব খুশি ছিলো আমার ওপর।

ছোটবেলা থেকেই সমুদ্র যাত্রা আমার বড় প্রিয়। তার একটা কারণ বোধহয় আমার সল্‌তানিয়তের প্রধান শহরটা ছিলো সমুদ্রোপকূলবর্তী। বহুদূরব্যাপী সমুদ্রের মধ্যেকার দ্বীপগুলো ছিলো আমার দখলে। দশখানা রণতরী সাজিয়ে মাসাধিককাল ধরে যাত্রা করতাম আমি। আমার অধিকৃত দ্বীপগুলো পরিদর্শনে যেতাম।



এই রকম একবার যাত্রাপথে দারুণ ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো আমাকে—সারাদিন সারারাত্রিব্যাপী।

রাত্রি অবসান হলো। ঝড়ও থামলো। আবার হাসি ঝলমল দিন উপছে পড়লো। কিন্তু আমি দেখলাম, একটি ছোট্ট দ্বীপের চড়ায় এসে আটকে গেছে আমার জাহাজগুলো।

সমুদ্র তখন শান্ত অবোধ শিশুর মতোন। তার ঘন নীল জলে কাব্যের গন্ধ। কে বলবে গত রাত্রে সংহার মূর্তি ধারণ করেছিলো সে।

দিন দুই সেই দ্বীপে একটু জিরিয়ে নিলাম। তারপর পাল তুলে পাড়ি দিতে থাকলাম আবার। কুড়িদিন কেটে গেলো। তবু হারানো পথের নিশানা খুঁজে পেলাম না। তখন আমরা ভাসছি এক অজানা সমুদ্রে। দিশাহারা পাখীর মতো। নীড়ের সন্ধান চাই।

কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কত দূর? কোথায় এলাম আমরা?

উত্তর পেলাম, জানি না, বলতে পারবো না।

এ সমুদ্র পথ তার অচেনা। কখনও সে কোনও দিন আসেনি এই পথে।

উপায়ন্তর না দেখে একজন ডুবুরিকে নামিয়ে দিলাম জলে। কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এলো। বললো, সমুদ্রের ওধারে বড় বড় মাছ দেখলাম অনেক। আরও দূরে দেখতে পেলাম একটা পাহাড়। তার খানিকটা অংশ সাদা আর খানিকটা কালো।

ডুবুরীর কথায় ডুকরে কেঁদে উঠলো কাপ্তেন—আর রক্ষা নাই। মৃত্যু অবধারিত। ডুবুরি যা দেখে এসেছে ওটা একটা মরণ-ফাঁদ—চুম্বক পাহাড়। পাহাড়টার গায়ে গাঁথা আছে হাজার হাজার চুম্বক লোহার বর্শা। আমাদের জাহাজ যতই তার কাছে যেতে থাকবে সেই চুম্বকের প্রচণ্ড আকর্ষণ হিড় হিড় করে টেনে নেবে। আর পাহাড়ের ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাবে জাহাজগুলো। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে আমাদের। এখন আল্লাহর নাম জপ করা ছাড়া আর কোন পথ নাই, জাঁহাপনা। আগামীকালই আমরা পাহাড়ের দুর্বার আকর্ষণে প্রাণ হারাবো। সবাইকেই মরতে হবে। কেউ বাঁচতে পারবে না। এ পর্যন্ত যত নাবিক পথ হারিয়ে এই পাহাড়ের আকর্ষণ-আওতায় গিয়ে পড়েছিলো তারা কেউই ফেরেনি। আমাদেরও আর ফেরা হবে না।

কাপ্তেনের দু'গাল বেয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা। অসহায় শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে। কাঁদতে কাঁদতেই আবার বলে, ঐ পাহাড়ের চূড়ায় একটা গম্বুজ আছে। দশটা পিতলের খুঁটির উপরে সেই গম্বুজ। আর গম্বুজের উপরে রয়েছে এক ঘোড়-সওয়ার। ব্রোঞ্জের তৈরি। এক হাতে ঢাল অন্য-হাতে তরোয়াল। দেহে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ—রণসাজে সজ্জিত এক যোদ্ধা। সীসার ফলকে উৎকীর্ণ করা এক দৈববাণী—আঁটা আছে তার বুকে। শুনুন শাহজাদা, লোকে বলে, ঐ পাহাড়ের চূড়ায় যতদিন ঐ ঘোড়সওয়ার ঐ ভাবে অবস্থান করবে ততদিন কোন জাহাজের নিস্তার নাই। তার আকর্ষণ-আওতার মধ্যে পড়লেই প্রচণ্ড বেগে টেনে নিয়ে খান খান করে দেবে। এইভাবে কত যে জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কত শত সহস্র নাবিক প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। ঐ ঘোড়সওয়ারকে ওখান থেকে ফেলে দিতে না পারলে এমনি ধ্বংসের তাণ্ডব চলতেই থাকবে।

মৃত্যুর আশঙ্কায় কাপ্তেনের দেহে কাঁপুনি ধরে যায়। আমরাও সকলে ভয়ে আঁতকে হিম হয়ে যাই। মোউৎ অনিবার্য। তার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া ভিন্ন পথ নাই। হায় আল্লাহ্, কী এমন পাপ করেছিলাম, যার জন্যে বিদেশ-বিভুঁই-এ এইভাবে বেঘোরে জান কবুল করতে হচ্ছে।

পরদিন প্রত্যুষে কাপ্তেন জানালো, সেই কোষ্ঠী-কালো চুম্বক-পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি আমরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জাহাজগুলো ভেঙে গুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নাম নাও সবাই।

প্রচণ্ড শব্দে জাহাজগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। উত্তাল ঢেউ-এর প্রলয় নাচনের মধ্যে পড়ে কে যে কোথায় হারিয়ে গেলাম কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। কে মরলো, আর কে বেঁচে থেকেও মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে লাগলো তার কোনও হদিশই করতে পারলাম না।

সারাটা দিন অশান্ত ঢেউ-এর মুখে মুখে ওঠা-নামা করতে করতে নাম-না-জানা ঠিকানার উদ্দেশে ভেসে চলেছি—যারা বেঁচে আছি তখনও। সে কি দুর্যোগ, সে কি নিদারুণ ঝড়ঝঞ্ঝা! এলোপাথাড়ী হাওয়ার দাপটে উত্তালতরঙ্গমালা ভেঙেচুরে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস-এ পরিণত হতে লাগলো। আর কিছু মনে নাই। অজ্ঞান হয়ে গেছি।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? আল্লাই বাঁচালেন সে যাত্রা। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখি, সেই পাহাড়টার নিচে এক বালির চূড়ায় আটকে আছি আমি। জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড আঘাতে মরিনি, হাঙর কুমীরেও খায়নি, আশ্চর্য! সবই আল্লাহর দোয়ায়।

উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, সামনেই একটা পথ, সোজা উঠে গেছে পাহাড়ের মাথায়। খোদা ভরসা করে উপরে উঠতে লাগলাম।

এই সময় রাত্রি ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন পঞ্চদশ রাত্রি। শাহরাজাদ গল্প শুরু করে ঃ

তৃতীয় কালান্দার তার জীবন কাহিনী বলে চলেছে। আর শুনছে সেই তিন বোন, কুলি ছেলেটা, তার সঙ্গী—আর দুই কালান্দার, খলিফা হারুন-অল-রসিদ, উজির জাফর, দেহরক্ষী আর সেই সাতজন সশস্ত্র নিগ্রো-প্রহরী।

আল্লাহর কি অপার মহিমা, আমি যখন সেই খাড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে চলেছি তখন হঠাৎ হাওয়ার দিক পরিবর্তন হয়ে গেলো। এবং এই হাওয়ার আনুকূল্যে তরতর করে উঠে যেতে পারলাম ওপরে। বিপরীতমুখী হাওয়ার বেগ অগ্রাহ্য করে এ-পথ বেয়ে এক পাও এগুনো সম্ভব নয় কোন মানুষের।

যাই হোক, উপরওয়ালার কৃপায় উপরে উঠে এসে সেই গম্বুজের নিচে এসে দাঁড়ালাম। আনন্দে আমার শরীর তখন কাঁপছে।

সারা দিনের শ্রান্তিতে অবশ অবসন্ন হয়ে এলো শরীর। গম্বুজের নিচে—যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই—শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেলাম, এক দূরাগত কণ্ঠের বাণী—শোনো কাসিবের পুত্র, ঘুম থেকে জেগে উঠে তোমার পায়ের ঠিক তলায় গর্ত খুঁড়ে দেখো, একখানা তীর আর ধনুক পাবে। এই তীরধনুকটা দৈবশক্তিসম্পন্ন। তারপর ঐ ধনুকে তীরটা জুড়ে গম্বুজের মাথার ওপরে ঐ ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দাও। তাহলে ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ারটা সমুদ্রে পড়ে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দুনিয়ার মানুষ পরম উপকৃত হবে চিরকালের মতো। সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত থেকেও খসে পড়ে যাবে ধনুকটা। যে গর্ত খুঁড়ে তুলেছিলে সেই গর্তেই ধনুকটা রেখে মাটি চাপা দিয়ে দিও। এর পর সামনে তাকালে দেখতে পাবে, সমুদ্রের জল ফুলে উঠছে। ফুলতে ফুলতে এক সময় দেখবে, তোমার পায়ের তলার পাহাড়ের চূড়া-সমান হয়ে গেছে। এই সময় দেখবে, একটা ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা বেয়ে আসছে একটা লোক।

তোমারই দিকে। কাছে এলে পরিষ্কার মনে হবে, সেই ঘোড়সওয়ার—অবিকল তার চেহারার সঙ্গে মিল আছে এই ডিঙ্গির লোকটার। আসলে কিন্তু তা ঠিক না। নৌকোটা আরও কাছে এলে দেখবে, মরার মাথার খুলিতে ভর্তি নৌকোর পাটাতন। ভয় পেয়ো না। তোমাকে নিরাপদে সাগর পার করে দেবার জন্যেই সে আসবে। সেই রূপই নির্দেশ দেওয়া আছে তাকে। কিন্তু সাবধান, তার নৌকোয় উঠে ভুলেও কখনও আল্লাহর নাম মুখে এনো না। নৌকোয় উঠলে সে একটানা দশ দিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তোমার দেশের চেনা শান্ত নিরাপদ সমুদ্র এলাকায় পৌঁছে যাবে। সেখানে দেখবে সওদাগরের এক নৌকো। তারা তোমাকে তুলে নিয়ে তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আবারও বলছি, ভুলেও কখনও তাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে না।

ঘুম ভেঙে গেলো। খোয়াব কেটে গেলো। উঠে দাঁড়ালাম। পায়ের তলার মাটি খুঁড়ে পেলাম সেই ধনুক আর তীর। ধনুকে তীর জুড়ে ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। প্রচণ্ড এক শব্দে নিচে সমুদ্রের জলে পড়ে গেলো মূর্তিটা। আর তৎক্ষণাৎ দেখলাম, সমুদ্র এক ভীষণ রূপ ধারণ করছে। টগবগ করে ফুটতে লাগলো অনন্ত জলরাশি। ফুসতে ফুসতে ফুলতে ফুলতে ক্রমশ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে গেলো। দেখলাম দূরে একখানা ছোট নৌকা বেয়ে নিয়ে আসছে একটি লোক। হুবহু যেমনটি দেখেছিলাম স্বপ্নে, সেই রকম সব ঘটে যেতে লাগলো। নৌকোটা কাছে আসতে লোকটাকে দেখলাম, ঠিক ঐ ঘোড়সওয়ারের মতো। কিন্তু স্বপ্নে জেনেছিলাম, দেখতে এক রকম হলেও ওরা এক না। আমার হাত থেকে ধনুকটা খসে পড়ে গেছে মাটিতে। ঐ গর্তটায় রেখে মাটি চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়লাম। নৌকোটা ততক্ষণে আরও কাছে—একেবারে আমার সামনে এসে থেমে গেছে। দেখলাম, লোকটার এক হাতে অনেকগুলো মড়ার মাথার খুলি। আর কি আশ্চর্য, যদিও নৌকো বাইছে, লোকটা কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ না। পিতলের তৈরি এক মানুষের মূর্তি। তার বুকে আঁটা এক সীসার ফলক। তাতে উৎকীর্ণ করে লেখা আছে এক দৈববাণী।

আমি কোন কথা না বলে নৌকোয় উঠে বসলাম। সেই পিতলের মানুষটা বেয়ে চললো নৌকোটা। এক-দুই-তিন এইভাবে দশটা দিন কেটে গেলো। অবশেষে দেখলাম, আমাদের দেশের চেনাজানা সমুদ্রে এসে পড়েছি। আনন্দে উল্লাসে আমি তখন আত্মহারা। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, আল্লাহ তোমার মহিমা অপার। তোমার দোয়াতেই আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি, আজ আমার নিজের দেশের মুখ দেখতে পেয়েছি। তুমি সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বর। তোমাকে ছাড়া অন্য কোন অলৌকিক শক্তিতে আমার আস্থা নাই। তুমিই একমাত্র পথ।

আমার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো। দেখলাম, সেই পিতলের মূর্তিটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দিলো আমাকে। তারপর নৌকোটা নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেলো কোথায়!

আমি খুব ভালো সাঁতারু। সমুদ্রের নীল জলে গা ভাসিয়ে দিলাম। এইভাবে সারাটা দিন কেটে গেলো। আমার হাত পা অবশ হয়ে আসতে লাগলো। ভয় হলো, এবার মৃত্যু অনিবার্য। আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় মসজিদ চূড়ার মতো উঁচু উত্তাল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে চললো আমাকে। সমুদ্র-কূলের দিকে। তারপর এক সময় অনুভব করলাম, আমাকে তীরে ছুঁড়ে দিয়ে ঢেউটা আবার সমুদ্রে ফিরে গেছে। বুঝলাম এও তাঁরই এক মহিমা।

সমুদ্র সৈকতে উঠে এসে জামাকাপড় খুলে শুকাতে দিয়ে বালির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে শুকনো জামাকাপড়গুলো পরে সামনে চেয়ে দেখি, এক সবুজ শস্যক্ষেত্র। আনন্দে নেচে উঠলো মন। এপাশ ওপাশ চক্কর দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে

লাগলাম। যেদিকে তাকাই শুধু জল আর জল আর জল। সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটা দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

একটা জায়গায় বসে পড়লাম। আমার অধম অদৃষ্টের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। নিজেকে এক হতভাগা বলে মনে হতে লাগলো। একটা ভুলের জন্যে এতো কষ্ট সহ্য করতে হলো আমাকে। ঠিক করলাম, এবার থেকে দেখে শুনে সাবধানে চলতে হবে। অদৃষ্ট যখন সাধ দিচ্ছে না তখন, যখন-তখন বিপদ-আপদ আসতে পারে।

এমন সময় নজরে এলো, একখানা জাহাজ এই দিকেই আসছে। না জানি, আবার কোন বিপদ হয়, এই ভেবে একটা গাছের উপর উঠে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিলাম পাতায় ঢেকে। জাহাজটা এসে নোঙর করলো। জনাদশেক নফর নামলো। সবাইর হাতে একখানা করে মাটিকাটা কোদাল। ওরা ঐ শস্যক্ষেত্রের এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কি যেন একটা খুঁজতে লাগলো। তারপর একটা জায়গায় মাটি কেটে গর্ত করতে থাকলো। আমি গাছের ডালে বসে দেখলাম, খানিকটা গর্ত করার পর একটা গুপ্ত দরজার সন্ধান পেলো তারা। দরজার পাল্লা খুলে ফেললো। এরপর আবার তারা ফিরে গেলো জাহাজে। নানারকম দামি দামি খাবারদাবার মাথায় নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলো! গুপ্তদরজা দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে সামানগুলো রেখে আবার ফিরে গেলো জাহাজে। আবার নিয়ে এলো সাজপোশাক ইত্যাদি। এইভাবে নানারকম জিনিসপত্তর নামিয়ে রেখে এলো মাটির নিচের সেই ঘরে। মোট কথা, একটা খানদানি পরিবারে যা যা দরকার তার সবকিছুই ছিলো তার মধ্যে। তারপর জাহাজ থেকে নেমে এলো জরাবার্ধক্যে জীর্ণ এক থুরথুরে বৃদ্ধ—একটা ফুটফুটে কিশোরের হাত ধরে। পিছনে পিছনে নফরগুলো। তাদের হতে মণিমুক্তা-খচিত সূক্ষ্মকারুকার্য করা বাদশাহী শাল। ওরা সবাই সেই গুপ্ত দরজা দিয়ে নিচে নেমে গেলো। কিছুক্ষণ বাদে সেই ছোট্ট কিশোর বালকটি ছাড়া আর সবাই উঠে এসে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো।

জাহাজটা যখন অনেক দূরে চলে গেছে, গাছ থেকে নামলাম আমি। ঐ জায়গাটায় গিয়ে মাটিগুলো সরিয়ে গুপ্ত দরজাটা খুলে ফেললাম। পাথরের তৈরি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম নিচে। এক সুরম্য অট্টালিকা। একটু এগোতেই চোখে পড়লো, দামি মখমলের পর্দা দেওয়া একটা দরজা। পর্দা সরিয়ে ভিতরে পা রাখতে সাহস হলো না। ঝকঝকে তকতকে আনকোরা বহু মূল্যবান পারস্য গালিচায় প্রকাণ্ড ঘরটার পুরো মেজেটা মোড়া। সুন্দর সুন্দর সোফা কোচ, টেবিল আলমারীতে চমৎকার সাজানো গোছানো ঘরটা। মাথার উপরে কারুকার্যখচিত ঝাড়বাতি। টেবিলের উপর সাজানো সুন্দর কাজ-করা এক ফলের ঝাঁপি আর মিঠাই মণ্ডার রেকাবী। তার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক ফুলদানী ওপাশে সোনার পালঙ্কে বসে সেই কিশোর বালক সোনার পাখায় হাওয়া খাচ্ছে। আমাকে দেখা মাত্র ভয়ে আঁৎকে উঠলো সে। আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, কোন ভয় নেই, বন্ধু। আমিও মানুষ—এক বাদশাহর ছেলে। এবং নিজেও আমি বাদশাহ, আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। বরং তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতে এসেছি। ওরা তোমাকে এই পাতালপুরীতে রুদ্ধ করে হাওয়া হয়ে গেলো। এখান থেকে কোন ভাবেই তুমি বেরিয়ে বাঁচতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে বাঁচাতে এলাম।

আমার কথা শুনে কিশোর একটু হাসলো। কি সুন্দর তার ঠোঁটের হাসি। যেন মুক্তো ঝরে পড়লো। তার আয়ত চোখ, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট দেখে মনে হয়, এক খানদানী বংশের ছেলে সে। ইশারায় তার পাশে গিয়ে বসতে ডাকলো আমাকে।—শুনুন মালিক, ওরা আমাকে এখানে ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। আমার মৃত্যুও তাদের আদৌ কাম্য নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই ওরা আমাকে লোকচক্ষুর অগোচর এই পাতালপুরীতে লুকিয়ে রেখে গেলো।

তুমি হয়তো আমার বাবার নাম শুনে থাকবে। তামাম দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে সেরা জহুরী আমার বাবা। তার মতো ধনী লোক বোধহয় খুব কমই আছে। দুনিয়ার এমন কোন সুলতান বাদশাহ নাই যার কাছে আমার বাবা হীরে-জহরৎ বিক্রী করেনি। তার খ্যাতি নাম জগৎজোড়া। বাবার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান আমি।



আমার জন্মের সময় এক সিদ্ধবাক গনৎকার বলেছিলো, এই শিশু তার পিতামাতার জীবদ্দশাতেই মারা যাবে। এর বয়স যখন পনেরো হবে সেই সময় বাদশাহ কাসিবের পুত্রের হাতে এর মৃত্যু ঘটবে।

গণৎকার আরও বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। এক সময় বাদশাহ কাসিবের পুত্র সমুদ্র যাত্রায় জাহাজ ডুবি হয়ে এক কষ্টি-পাথর পাহাড়ে গিয়ে উঠবে। সেই পাহাড়ের চূড়ায় এক পিতলের ঘোড়সওয়ারকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে চিরকালের মতো হাজার হাজার নাবিকের প্রাণ বাঁচাবে।

আমার বাবা এই পনেরো বছর ধরে আমাকে খুব সাবধানে চোখে চোখে রেখে মানুষ করেছে। কয়েক দিন হলো খবর ছড়িয়ে পড়েছে কাসিবের পুত্র সেই পাহাড়ে উঠে পিতলের ঘোড়সওয়ারটাকে জলে ফেলে দিয়েছে। এই খবর শোনার পর থেকে আমার মা-বাবার চোখে ঘুম নাই। এই ক'টা দিনের মধ্যে আমার বাবার শরীর বার্ধক্যে একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেখলে চেনা যায় না, এমন। আমার মা কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর থেকেই বাবার চিন্তা, কি করে আমাকে কাসিবের পুত্রের হাত থেকে রক্ষা করবে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে এই নির্জন দ্বীপে মাটির তলায় এই প্রাসাদপুরী বানিয়ে রেখেছে সে। পনেরো বছর বয়সের সময় যাতে সে লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে এনে আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কাসিবের পুত্র সেই পিতলের ঘোড়সওয়ারকে জলে ফেলে দিয়েছে। তাই আজ আমাকে সে এখানে লুকিয়ে রেখে গেলো। গণৎকারের ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা হয়েছিলো, ঘোড়সওয়ারকে জলে ফেলে দেবার চল্লিশ দিনের মধ্যে এই ঘটনা ঘটবে। তাই বাবা আমাকে চল্লিশ দিনের জন্য এখানে লুকিয়ে রেখে গেলো। বাবার এবং আমার নিজেরও বিশ্বাস, এই দূরধিগম্য পাতালপুরীর সন্ধান কিছুতেই পাবে না সে।

রাগে কাঁপতে লাগলো আমার শরীর। কী মিথ্যেবাদী, ভণ্ড এই সব গণৎকারগুলো। নিরীহ মানুষের মনে এরা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। ওই ব্যাটাদেরই খুন করা দরকার। এমন সুন্দর ফুলের মতো এক কিশোর—নিষ্পাপ নির্মল—তাকে কিনা আমি হত্যা করবো। গাঁজাখুরি বানানো একটা গপ্পো শুনিয়ে ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে এদের মনে। এই বালকের জীবন রক্ষার জন্যে, যদি প্রয়োজন হয়, আমার জীবনও তুচ্ছ করে দিতে পারি। শয়তান গণৎকারটাকে—পেলে একবার শুনিয়ে দিতাম সে কথা। গলা চড়িয়ে বেশ জোরেই বললাম, শোনো বাছা, উপরে আল্লাহ আছেন। তোমার মতো একটা ফুলের কুঁড়িকে ছিঁড়ে ফেলবে কেউ, তা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সে যেই হোক, তোমাকে যে হত্যা করতে আসবে তাকে আমি হত্যা করবো আগে। আমাকে না মেরে তোমাকে ছুঁতে পারবে না কেউ। আমি তোমার পাহারায়, তোমার সঙ্গে বাস করবো এই চল্লিশ দিন। দেখি, কে তোমাকে মারে। তারপর চল্লিশ দিন কেটে গেলে, তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে আমার দেশে যাবো আমি। তুমি হবে আমার প্রাণের বন্ধু। তোমাকেই আমি বসিয়ে যাবো আমার সিংহাসনে।

জহুরীর ছেলে খুশী হলো খুব। বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানালো আমাকে। আমার উপর তার গভীর আস্থা লক্ষ্য করে আনন্দ হলো মনে।

অনেক গল্প কাহিনী শোনালাম তাকে। সেও শোনালো। খুশিতে ভরে গেলো আমাদের মন। নানারকম খানাপিনা করলাম। এতো খাবার দাবারে ঘর ভর্তি যে, শ'খানেক লোক সারা বছর ধরে খেয়েও তা ফুরাতে পারবে না।

আমার ব্যবহারে মুগ্ধ হলো কিশোর। তাকে যে আমি গভীর ভালোবাসার চোখে দেখছি সে কথা বুঝতে বেশী দেরি হলো না তার।

সারা রাত বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুলো সে। আমিও। সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে দু'জনে নাস্তা করলাম। তারপর নানারকম মজার মজার কিস্‌সা শুনালাম তাকে। খেলাধুলা করলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সুগন্ধী আতর দেওয়া জলের চৌবাচ্চায় অবগাহন করে গোসল করলাম আমরা। দুপুরের খানাপিনা সেরে একটু বিশ্রাম করে আবার শুরু হলো আমাদের গল্প, খেলা। রাত্রিবেলায় পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিলাম তাকে। দু'জনে একসঙ্গে বসে মাংস রুটী, মাখন, ফল, দুধ, মধু, মিঠাইমণ্ডা দিয়ে রাতের আহার শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিনের পর দিন এইভাবে খেলাধূলা, হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কেটে যেতে লাগলো। তার মা-বাবার অদর্শন, তার মরণভীতি, সব ভুলিয়ে দিলাম আমার বন্ধু-সুলভ ব্যবহার দিয়ে, আমার আন্তরিকতা দিয়ে। এইভাবে কি করে যে চল্লিশটা দিন কেটে গেলো আমিও টের পাইনি, সেও বুঝতে পারেনি।

সেদিন সে ফিরে যাবে তার দেশে। তার বাবা আসবে তাকে নিয়ে যেতে। সকালে উঠেই এক হাঁড়ি গরম জল বসালাম। গরম জল-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে খুব আচ্ছা করে ঘসে মেজে স্নান করালাম তাকে নিজের হাতে। খুব ভালো করে দামি সাজপোশাকে সাজালাম। আতরের খুশবু ছড়িয়ে দিলাম তার গায়ে।

পালঙ্কের ওপর শুয়ে শুয়ে সে ভাবছে, বাবা আসবে। সে চলে যাবে। আর আমি ভাবছি এ ক'দিনের দোস্ত, আবার কোথায় হারিয়ে যাবে। মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায়।

তন্ময় হয়ে কি ভাবছে দেখে আমি কথা বললাম, কিগো সাহেব, কি খাবে বলো?

ছেলেটা বললো, তরমুজ খাবো।

একটা বড়সড়ো পাকা তরমুজ নিয়ে এলাম। পালঙ্কের ওপাশের দেওয়ালে টাঙানো ছিলো একখানা ছুরি। তরমুজটা কাটবো বলে ছুরিটা নামিয়ে আনার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম পালঙ্কের ওপর। কাঁটায় ঝোলানো ছুরিটা খুলে হাতে নিয়েছি এমন সময় ঘটলো সেই কাণ্ডটা। ছেলেমানুষের খেয়াল, দুষ্টুমীতে ভরা মন। আমি যখন নাগালের খানিকটা ওপরে ঝুলানো সেই ছুরিটা হাতের মুঠোয় খুলে নেবার জন্য করসৎ করছি তখন তা দেখে হয়তো বা শিশু-সুলভ সারল্যে মজা অনুভব করেছিলো ছেলেটা। আমার উঁচু হয়ে যাওয়া পায়ের গোড়ালীতে সুড়সুড়ি দিলো। ঐ অবস্থায় আমার কি দশা হয় তাই দেখার মজায় পেয়ে বসেছিলো তাকে। অতর্কিতে তার কাতুকুতুর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না আমি। চমকে উঠে পাটা সরিয়ে নিতে গিয়েই শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম ছেলেটার ওপর। চিৎ হয়ে শুয়েছিলো সে। আমার হাতের শানিত ছোরা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেলো তার বুকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়ে গেলো আমারই হাতের উপর।

মালকিন, তখন আমার কি অবস্থা একবার কল্পনা করুন। আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছি। নিজের জামাকাপড় নিজেই ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে লাগলাম। কেঁদে গড়াগড়ি দিচ্ছি, হাত-পা ছুঁড়ছি, চোখের জলে বন্যা বয়ে চলেছে। হায় আল্লাহ একি হলো। একি করলাম আমি। কি এমন পাপ আমি করেছিলাম, যার জন্যে এই শোক অনুতাপে পুড়তে হলো আমাকে! না, একেই বলে নিয়তি! একটা দিন পরে হলেও গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণীই তো সত্যি হলো।

আল্লাহ তুমি আমাকে শাস্তি দাও। আমি মাথা পেতে নেবো। এ জীবন আমি আর রাখতে চাই না। আমাকে মৃত্যু দাও। আমি মরতে চাই।

ছেলেটার বাবা বৃদ্ধ জহুরী আসবে সন্ধ্যাবেলা। কি করে তার সামনে দাঁড়াবো আমি। কি ভাষায় সান্ত্বনা দেব তাকে। না-না, আমি পারবো না। পুত্রশোকের সেই নিদারুণ দৃশ্য আমি নিজের চোখে কিছুতেই দেখতে পারবো না। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। গুপ্ত দরজা বন্ধ করে মাটি চাপা দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিলাম।

মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, এখন কি করা যায়। কোন জায়গায় লুকিয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে হবে। তা না হলে, ঐ নফরগুলো আমাকে দেখতে পেলেই খুন করে ফেলবে।

সেই গাছটায় উঠে গেলাম। একটা ডালে পাতার আড়াল করে বসে রইলাম। খন্টাখানেক বাদে সেই জাহাজটা এসে ভিড়লো। নেমে এলো সেই দশজন নফর আর সেই বৃদ্ধ জহুরী। হন হন করে এগিয়ে এলো আমার গাছের নিচে। গুপ্ত দরজার জায়গাটায় চোখ পড়তে ভয়ে শিউরে উঠলো তারা। একি, গর্তের মাটি তো মনে হচ্ছে সদ্য সরানো হয়েছিলো। তবে? তবে কি বাছা আমার বেঁচে নাই।



জহুরী চিৎকার করে ওঠে, তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো? চটপট মাটি সরাও। দরজা খুলে নিচে যাও। নিয়ে এসো আমার জানের কলিজাকে।

নফরগুলো অনায়াসেই সদ্য বুজানো মাটিগুলো সরিয়ে ফেলে নিচে নেমে গেলো। গাছের উপরে বসে সব দেখতে লাগলাম আমি। ছেলের নাম ধরে তারস্বরে ডাকতে লাগলো বৃদ্ধ। কিন্তু কে উত্তর দেবে! সে তো বেঁচে নাই। আমার হাতের ছুরি তার বুকে বিদ্ধ হয়ে গেছে। সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে সে। সে-ঘুম আর কোনদিন ভাঙ্গবে না তার।

নফররা এসে বৃদ্ধকে নিচে নিয়ে গেলো। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তার যে কি অবস্থা আমি গাছের ডালে বসেই তা অনুমান করতে পারলাম। একটু পরে নফরগুলো ধরাধরি করে বৃদ্ধর অচৈতন্য দেহটা উপরে নিয়ে এসে গাছের তলায় শুইয়ে দিলো। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে জ্ঞান ফিরে এলো তার। ছোট শিশুর মতো চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলো। সে দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, এখনি বুঝি নিচে পড়ে যাবো। এর পর নফরগুলো নিচে নেমে গিয়ে ছুরিবিদ্ধ কিশোরকে উপরে নিয়ে এলো। পাশেই একটা জায়গায় কবর খোঁড়া হলো। কবরের তলায় তার মৃতদেহটা শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিলো তারা। তারপর পাতালপুরীর সামানপত্তর সব জাহাজে তুলে নিয়ে চলে গেলো।

আমি গাছ থেকে নিচে নামলাম। সেই ছোট্ট দ্বীপটার চারদিকে চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারদিকে অনন্ত জলরাশি। যত দূর চোখ যায়, তীরের সন্ধান নাই। অথচ তীরের সন্ধান চাই। কেঁদে কেঁদে দিন কাটে। গাছের ফল খাই, গাছের তলায় শুই। দেশে ফেরার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি এমন সময় একদিন দেখলাম সমুদ্র শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। অবাক কাণ্ড! এমনও আবার হয় নাকি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখলাম, জল সরে গিয়ে বালির চড়া পড়ে গেছে। যত দূর চাই শুধু ধূ ধূ করা বালি। হাঁটতে হাঁটতে দিন শেষ হয়ে এলো। দেখলাম, শক্ত মাটির আসল তীরে পৌঁছে গেছি আমি। কৃতজ্ঞতায় মাথা নত এলো তাঁর উদ্দেশে।

মাঠের পথ বেয়ে হেঁটে চলেছি। এমন সময় দেখলাম, দূরে এক লাল আগুনের শিখা। মনে আশা হলো, কাছেই কোনও লোকালয় আছে। হয়তো বা কেউ ভেড়া পোড়াচ্ছে। কিন্তু কাছে আসতে ভুল ভাঙ্গলো। অবাক হয়ে দেখলাম, এক বিরাট প্রাসাদ। আর গোটা প্রাসাদটাই পিতলের তৈরি। সূর্যাস্তের লাল আভা এসে পড়েছে পিতলের উপর। তাই মনে হচ্ছে, গনগনে আগুনের এক কুণ্ড জ্বলছে।

প্রাসাদের সামনে দাঁড়াতেই দশজন যুবক এসে দাঁড়ালো প্রাসাদের সিংহ দরজায়। তারা সবাই সুঠাম দেহী সুন্দর সুপুরুষ। কিন্তু সবারই বাঁচোখ কানা—ঠুলি পরা। তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো এক অশীতিপর বৃদ্ধ। জরা বার্ধক্যে গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কিন্তু দেখলে বোঝা যায়, যৌবনে এক রূপবান পুরুষ ছিলো সে। আটজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে এলো বৃদ্ধ। শুধু দু'জন দাঁড়িয়ে রইলো আগের জায়গায়। সবাই আমাকে স্বাগত জানালো। আমিও সালাম জানালাম। তারপর আমার ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের এক নিষ্ঠুর কাহিনী সব খুলে বললাম তাদের কাছে। সে কাহিনী আপনারা সবাই এতক্ষণ শুনলেন, তাই আর পুনরুক্তি করবো না এখানে। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে তারাও খুব দুঃখিত হলো। সাদরে প্রাসাদের অন্দরে নিয়ে চললো। বিরাট প্রাসাদ। মহলের পর মহল পার হয়ে চলেছি। কিন্তু শেষ আর হয় না। প্রাসাদ কক্ষগুলো আগাগোড়া সাজানো গোছানো ঝকঝকে তকতকে। শেষে প্রকাণ্ড দরবার কক্ষে এসে আমরা থামলাম। এইটিই সব চেয়ে বড় কক্ষ। এবং প্রাসাদের ঠিক মাঝখানে। কি সুন্দর করে সাজানো। দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। দশখানা বিরাট বিরাট পারস্যের মূল্যবান গালিচায় মোড়া দরবার কক্ষের চারপাশ। আর মাঝখানে সুন্দর সব কাজ করা আর একখানা আরও দামি গালিচা পাতা। বৃদ্ধ গিয়ে বসলো সেই গালিচায়। আর যুবকরা গিয়ে বসলো চারপাশের সোফায়। বৃদ্ধ করজোড়ে আমাকে বললো, মালিক, মেহেরবানী করে বসুন।

আমাকে একটা সব চেয়ে উঁচু আসন দেখিয়ে বসতে অনুরোধ জানালো সে। বললে, চুপ করে বসুন ওখানে। কোন কথা বলবেন না, আমরা আপনার জন্যে প্রার্থনা জানাবো তাঁর কাছে।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলো বৃদ্ধ। তারপর উঠে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক পায়চারী করলো একটু। তারপর মাংস আর মদ এলো আমাদের জন্যে। অন্য দশজন এবং আমি মোট এগারোজন একসঙ্গে বসে খানাপিনা সারলাম। বৃদ্ধ নিজে হাতে করে আমাদের এঁটোকাটা পরিষ্কার করলো। তারপর আবার তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো। কিন্তু কোন কথা বললো না।

বেশ রুক্ষ মেজাজেই যুবকদের একজন বললো, প্রার্থনা জানাবার জন্যে আমাদের দরকারী সামানপত্তর না এনেই বসে পড়লে কেন?

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলো না। উঠে অন্য ঘরে চলে গেলো। এক এক করে দশবারে সুদৃশ্য সাটিনের ঢাকনায় ঢাকা দশটা পাত্র এবং দশটা চিরাগ বাতি নিয়ে এসে ঐ যুবকদের প্রত্যেকের পাশে রাখলো। কিন্তু আমার জন্যে কিছুই আনলো না সে। যে যার সবাই পাত্রগুলো হাতে তুলে নিয়ে মুখের ঢাকনা খুলে ফেলতেই দেখলাম, উনুনের ছাই, চিরাগের কালি আর কাজলে ভরা সেই পাত্রগুলো। ওরা সবাই ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো, আমাদের পাপের ফল।

ছাইগুলো নিজের নিজের মাথায় ছড়িয়ে দিলো, মুখে মাখলো চিরাগের কালি, আর ডান চোখে পরলো সেই কাজল।

ভোরবেলা আবার সবাই ধুয়ে মুছে সাফ করলো সেই ছাই, কালি আর কাজল। পাট করা পোশাক পরলো। একেবারে ফিটফাট সাহেব আগের মতো।

ওদের এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। কৌতূহল হলো। কিন্তু কোন কথা বলার উপায় নাই। আগেই বারণ করে দিয়েছে বৃদ্ধ—কোন কথা বলবে না, চুপ করে বসে থাকবে শুধু। কিন্তু এইরকম কৌতূহল কি

চেপে রাখা যায়। পর পর তিন রাত্রি কেটে গেলো। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। ওদের কাছে জানতে চাইলাম, আচ্ছা মালিক, এ সব কী ব্যাপার? কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি জানি, এসব কথা জানতে চাওয়া বারণ আছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত সব কাণ্ড—না জেনেই বা থাকি কি করে? আমার ভাগ্যে যা আছে হবে। তবু আমি আজ শুনবো। বলুন, কেন আপনাদের সবারই বাঁ চোখটা কানা? আর প্রতি রাত্রে কেনই বা আপনারা মাথায় মাখেন ছাই, মুখে মাখেন কালি, আর চোখে পরেন কাজল?

—এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? তোমার যে সর্বনাশ হবে। কেন জানতে চাইছো এসব।

আমি তখন বেপরোয়া। বললাম, তা হোক, তবু বলুন, আমি শুনতে চাই।

—কিন্তু সে কথা শুনলে তোমারও বাঁ চোখটা যাবে।

—তা যাক্, তবু বলুন, আমি শুনবো। সারা জীবন ধরে একটা অদম্য কৌতূহল জীবিত রাখার চেয়ে আমার বাঁচোখটা কানা হওয়াও ভালো। কৌতূহল যদি কুরে কুরে খায় আমাকে, তবে কি হবে আমার চোখ দিয়ে। আপনারা বলুন। আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক—আমি শুনবোই।

তখন সেই যুবকদের একজন বললো, আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের দোষে বাঁচোখ হারিয়েছি। তুমিও হারাবে তোমার নিজের দোষে। এ জন্যে পরে আমাদের দায়ী করো না। তোমার বাঁচোখ কানা হবার পর কিন্তু এখানে তোমার ঠাঁই হবে না। কারণ, মাত্র দশজনেরই জায়গা আছে এখানে, এগারোজনের জায়গা হবে না।

এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ একটা জ্যান্ত ভেড়া নিয়ে ঢুকলো ঘরে। কোন কথা বললো না, একখানা ছুরি দিয়ে জবাই করে মারলো ভেড়াটাকে। ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে আবার চলে গেলো।

যুবকদের একজন বললো, এই ভেড়ার চামড়ার মধ্যে তোমাকে ভরে, সেলাই করে এই প্রাসাদের ওপরে চূড়ায় রেখে আসা হবে। রুখ পাখী জানো? একটা আস্ত হাতীকে ঠোঁটে তুলে উড়ে যেতে পারে। সেই রুখ পাখী এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। তার ধারণা, তুমি বুঝি বা সত্যিই একটা ভেড়া। তোমাকে ফলার বানিয়ে খাবে, এই তার ইচ্ছা। উড়তে উড়তে সে গিয়ে বসবে একটা বিরাট উঁচু পাহাড়ের মাথায়। মানুষের সাধ্য নাই, সেখানে ওঠে। তোমাকে সেলাই করে ভরার আগে একটু ছুরি দেবো সঙ্গে। তুমি সেই ছুরি দিয়ে সেলাই কেটে বেরিয়ে আসবে। ভয় নাই, রুখ পাখী কখনও মানুষ খায় না। তোমাকে দেখা মাত্র সে উড়ে পালিয়ে যাবে। তারপর তুমি চলতে থাকবে। চলতে চলতে একসময় দেখতে পাবে এক বিশাল প্রাসাদপুরী। এই প্রাসাদের প্রায় দশ গুণ বড় আর এর চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর সাজানো গোছানো। ঝলমলে। বলতে গেলে সারা প্রাসাদটাই সোনার পাতে মোড়া। দেয়ালে দেয়ালে হীরে চুনী পান্না বসানো। দেখে তোমার তাক লেগে যাবে। এমনটা হয়তো তুমি রূপকথার গল্পেই পড়েছো। কিন্তু নিজের চোখে দেখোনি কখনও। এখানেই তোমার বাঁচোখ কানা হবে। আমরা সবাই যেভাবে বাঁচোখ হারিয়েছি, তুমিও ঠিক সেই ভাবেই হারাবে। প্রতি দিন রাত্রে আমরা তার কাছে এইভাবে প্রার্থনা জানিয়ে একটু আত্মতুষ্টি লাভ করি মাত্র। এই হলো মোটামুটি ব্যাপার। বিস্তারিত বিবরণ শোনাবার দরকার কী? আপনা থেকেই তো সব জানতে পারবে।

দেখলাম, তারা আমাকে ভেড়ার চামড়ার মধ্যে ভরবার তোড়জোড় করছে। আমার হাতে একটা ছুরি দিয়ে বললো, এটা তোমার সঙ্গে রাখো। সেলাই কেটে বেরুবার সময় দরকার হবে।

ছুরিটা নিলাম। ওরা আমাকে ভেড়ার চামড়ার খোলের মধ্যে পুরে সেলাই করলো। তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে রেখে এলো প্রাসাদের চূড়ায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখলাম ঈগলের মতো প্রকাণ্ড বড় একটা পাখী উড়ে এসে ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নিয়ে গেলো মহাশূন্যে। ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে গেলো আমার। যদি তার ঠোঁট থেকে খসে পড়ে যাই? যদি আমার ভার সে বইতে না পারে? কিন্তু না, আমাকে নিয়ে গিয়ে নামলো মানুষের দুর্লঙ্ঘ্য

আকাশ ছোঁয়া এক পর্বত শিখরে। চটপট ছুরিটা দিয়ে সেলাই কেটে লাফিয়ে বেরিয়ে আসলাম। তারপর পাখীটাকে ভয় দেখাবার জন্যে বিকট এক আওয়াজ তুলে চিৎকার দিলাম। নিমেষে উড়ে পালিয়ে গেলো সে। এবার ভালো করে দেখলাম, কি বিশাল তার আকার, কি ভয়ঙ্কর তার রূপ। দশটা হাতী জোড়া দিলে যা হয়, সেইরকম তার বপু। আর কুড়িটা উটপাখী পিঠে পিঠে উঠে দাঁড়ালে যতটা উঁচু দেখাতে পারে, ততটা সে উঁচু।

আর তিল মাত্র না দাঁড়িয়ে চলতে লাগলাম। কৌতূহল এমনই বস্তু তার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত সে হনন করে চলে। আমার আর ধৈর্য সয় না। দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকি। সেই প্রাসাদের সন্ধান চাই। দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছলাম সেই প্রাসাদের সামনে। ঐ দশজন যুবক প্রাসাদের অনেক গুণকীর্তন শুনিয়েছিলো আমাকে। তা থেকে মোটামুটি একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলাম মনে মনে। কিন্তু চোখের সামনে যা প্রত্যক্ষ করলাম তা কল্পনাতীত। এমন সুরম্য প্রাসাদ আমি জীবনে দেখিনি কখনও। সিংহ দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। নিরানব্বইটা বিরাট বিরাট চন্দন কাঠের দরজা পেরিয়ে প্রাসাদের মাঝখানের প্রশস্ত কক্ষে এসে দাঁড়ালাম। যে দিকে তাকাই—হীরা চুনি পান্নার মেলা। দেওয়ালের গায়ে বসানো এই সব অমূল্য রত্নগুলো ঝকমক করছে। মনে হলো, দুনিয়ার সব মণিমাণিক্যই বুঝি এখানে এনে রাখা হয়েছে।

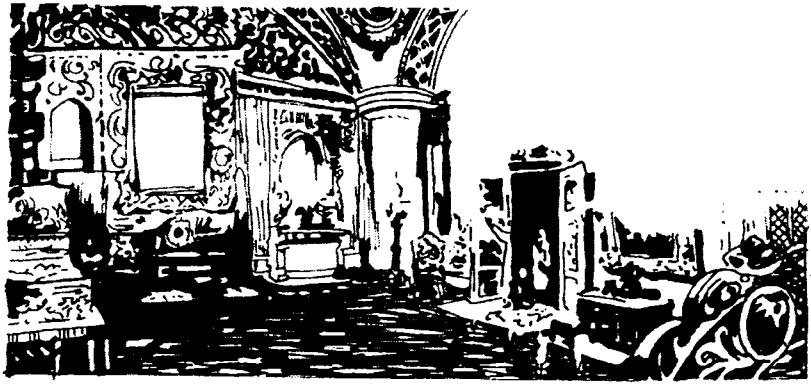

একটা ঘরে দেখলাম, বেহেস্তের পরীর মতো পরমাসুন্দরী চল্লিশটি যুবতী। আমার তেমন কোন ভাষা নাই—তাদের রূপের বর্ণনা দিতে পারি। এক কথায়, এমন নিখুঁত অনিন্দ্য সুন্দরী নারী সারা দুনিয়া ঢুঁড়েও একটা মিলবে না। আর কি আশ্চর্য, চল্লিশজনের প্রত্যেকেই একই রকম দেখতে। কারো সঙ্গে কারো এক ফোঁটা অমিল নাই। হুবহু সবাই এক ছাঁচে ঢালা পুতুলের মতো।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো তারা। মধুঝরা মিষ্টি গলায় স্বাগত জানালো। তুমি আমাদের আজ মেহমান। আমাদের কাছে মন প্রাণ খুলে দাও। আনন্দ করো। তুমি আমাদের ঘরের লোক আজ।

একটা উঁচু মঞ্চের উপরে নিয়ে গিয়ে বসালো আমাকে। আর ওরা বসলো নিচে—দামি কার্পেটের উপর। বললো, মালিক, আমরা তোমার দাসী। যা হুকুম করবে তাই করে ধন্য হবো আমরা। তুমি আমাদের প্রভু। মাথার মণি। তোমার আগমনে আমরা আনন্দে আত্মহারা। তুমি আমাদের ভাগ্যবিধাতা। তোমার সুখেই আমাদের সুখ। তোমার আনন্দেই আমাদের আনন্দ। তোমার ইচ্ছাতেই আমাদের ইচ্ছা। আমরা সবাই একান্তভাবে তোমারই।

একজন তোয়ালে আর গরম জল নিয়ে এলো। আর একজন আমার পা ধুইয়ে

দিলো। একজন খানিকটা সুগন্ধী আতর ঢেলে দিলো আমার গায়ে। আর একজন আমাকে পরিয়ে দিলো সিল্কের দামি পোশাক। সোনার তৈরি একটা বেল্ট দিয়ে এঁটে দিলো আমার পাতলুম। একজন এনে ধরলো এক পেয়ালা গুলাবী সরবৎ। কেউ আমার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো, কেউ মুচকি হেসে চোখের বান হানলো, কেউ ভ্রূ নাচিয়ে ইশারা করলো। কেউ বা শায়েরী আওড়াতে লাগলো। কেউ ধরলো গান। কেউ বা ঠেলাঠেলি করে সামনে এসে দাঁড়ালো। কারো মুখে 'বাঃ, কী সুন্দর'। কেউ বা বলে, 'কী মিষ্টি চেহারা রে'! তার জবাবে আর একজন বলে, 'চেটেপুটে খেয়ে নে'। সবাই মিলে হো হো করে হেসে ওঠে। একজন গেয়ে ওঠে, 'তুমি যে রূপের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে'—আর একজন হাত ধরে বলে, 'তুমি হবে মোর প্রিয়তম, আমি হবো তব দাসী।' একজন লাফিয়ে এসে পড়ে আমার কোলে। গলা জড়িয়ে ধরে বলে, না না না, তুমি আর কারো না। 'রূপটা তোমার খাসা। তুমি আমার—শুধু আমার ভালোবাসা।'

আমার চারপাশে মৌচাকের মতো ঘিরে বসলো মেয়েগুলো। কেউ আমাকে ঠেলা মেরে আদর করে। কেউ চিমটি কাটে। কেউ সুড়সুড়ি দেয়। চুল ধরে টানে কেউ। কেউ বা কোমর ধরে। সবাই মিলে আব্দার করে, তোমার জীবনের কাহিনী শোনাও, মালিক। আমরা এখানে বনবাসের মতো দিন কাটাই। কালেভদ্রে কোন পুরুষের সঙ্গ পাই। আজ তোমাকে পেয়েছি; অনেক দিন পরে। এবার আমরা খুশির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেবো। তুমি আমাদের ভালোবাসা দেবে, আদর করবে, সুখের সাগরে ডুবিয়ে দেবে।

আমি আমার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা সংক্ষেপে বললাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সূর্য গেলো অস্তাচলে। আঁধার নেমে এলো। মেয়েরা অসংখ্য মোটা মোটা মোমবাতি এনে জ্বেলে দিলো। দিনের আলোর মতো ঝলমল করে উঠলো প্রাসাদ কক্ষ। চারপাশের দেয়ালের হীরা মণিমাণিক্যের ছটা এসে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

ফরাসের উপর নতুন চাদর পাতলো। তারপর এক এক করে খানা নিয়ে এসে সাজাতে লাগলো তারা। মুরগীর মাংস, দামী সরাব। ফল। মিষ্টি। তারপর আরম্ভ হলো নাচ গান বাজনা। একদল বাজাতে থাকলো। একদল ধরলো নাচের তালের গান। আর একদল নাচতে লাগলো মোহিনী রূপ ধরে। সে নাচে পুরুষের রক্ত নাচে। আগুন ধরে বুকে। আমি মদ আর মাংস খেতে খেতে দেখতে থাকলাম, তাদের এই অনিন্দ্যসুন্দর মনোরঞ্জন।

আমার খানাপিনা শেষ হলো। ওরাও গানবাজনা থামালো। একজন এগিয়ে এসে বললো, রাত হলো, এবার শোবে চলো, মালিক। আমাদের এই চল্লিশজনের মধ্যে যাকে খুশি তোমার বেছে নিয়ে যাও। আজকে রাতে সে হবে তোমার প্রিয়া—তোমার সাথী। সে তোমাকে সুখ দেবে, আনন্দ দেবে—ভালোবাসায় দেবে ভরিয়ে। তোমার যাকে পছন্দ বেছে নাও। আমাদের কারো মনে কোন হিংসা বা কোন ক্ষোভ থাকবে না। আমরা চল্লিশটি বোন পালা করে চল্লিশটি রাত কাটাবো তোমার সঙ্গে।



একথা শুনে আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেলো। কাকে ছেড়ে কাকে নেবো? চোখ বুজে আন্দাজে খপ করে ধরলাম একজনকে। সবাই হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়লো। চোখ খুলে দেখি, আমার বাহুপাশে আবদ্ধ এক ষোড়শী। আমার হাত ধরে নিয়ে গেলো সে তার শয্যায়। সারা রাত ধরে সে আমাকে দুধের সায়রে ডুবিয়ে রাখলো। চল্লিশবার পান করালো তার অমৃত।

আমিও তাকে খাওয়ালাম আমার মধু—চল্লিশবার। সেও খেলো লেহন করে করে—প্রাণ ভরে।

এইভাবে চল্লিশটা সুখের রাত্রি কাটালাম আমি। চল্লিশটি বোন এক এক করে চল্লিশটি রাত্রে আমার প্রিয়া আমার সাকী হয়ে দুধের সায়রে ডুবিয়ে তাদের অমৃত পান করালো আমাকে। আমিও তাদের প্রাণ ভরে খাওয়ালাম আমার মধু। প্রতিটি রাত্রিবাসের পর আমার প্রিয়া আমার সাকী নিয়ে যেতো আমাকে হামামে। ঘসে মেজে সাফ করে স্নান করাতো আমাকে। নতুন পোশাক পরাতো। আতর মাখাতো গায়ে।

এমনিভাবে চল্লিশটা দিন-রাত্রি কেটে গেলো। মেয়েগুলো সবাই এলো আমার শয্যা পাশে। কেঁদে আকুল হলো। মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো। তাদের সেই আকুলিবিকুলি কান্নার মধ্যে একটা কথা শুনতে পেলাম।—তুমি ছিলে আমাদের চোখের মণি, আজ তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। এর আগে যারা এসেছিলো, তাদেরও একদিন বিদায় দিতে হয়েছে। তারা সকলেই আমাদের সুখ আনন্দ আর ভালোবাসা দিয়েছিলো। কিন্তু মালিক তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। সিংহের মতো তোমার ঐ পৌরুষ আর কোন পুরুষের দেহে দেখিনি আমরা। আমাদের জীবনে যত পুরুষ এসেছে—তুমিই সবার সেরা। তোমার দুরন্ত যৌবনের অসভ্য দুষ্টুমি পাগল করে দিয়েছে—মাতাল করে দিয়েছে আমাদের। আবার তোমার শান্ত সৌম্য ব্যবহারেও মুগ্ধ হয়ে গেছি আমরা। তবুও আজ তোমাকে ছেড়ে চল্লে যেতে হবে আমাদের। আমরা চল্লিশ বোন, জনমানব বর্জিত এই প্রাসাদপুরীতে সারাটা বছর নিঃসঙ্গ যৌবন যন্ত্রণায় দিন কাটাই। খোদা মেহেরবান, বৎসরান্তে মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য তিনি একজন পুরুষ পাঠিয়ে দেন এখানে। সারা বছরে আমরা প্রত্যেকে একটিমাত্র রাতে পৌরুষের স্পর্শ পাই।

আমি জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আমাকে ছাড়বেই বা কেন তোমরা? কেন বিদায় দেবে আমাকে?

একজন জবাব দেয়।—আমরা একই বাবার চল্লিশ বোন। কিন্তু আমাদের সকলের মা আলাদা। আমাদের বাবা এখানকার শাহেনশাহ। সারা বছর ধরে আমরা এই প্রাসাদে বাস করি। তারপর বছরের চল্লিশ দিন বাকী থাকতে আল্লাহ একজন পুরুষ পাঠিয়ে দেন আমাদের যৌবন রক্ষার জন্য। এই চল্লিশ দিন পরে বছরের শেষে আমরা বাবা-মাকে দেখতে চলে যাই। আজ সেই দিন—বছরের প্রথম দিন। আজ আমাদের চলে যেতে হবে তোমাকে ছেড়ে। কিন্তু প্রিয়তম মন চায় না। তোমার গভীর প্রেমে মজে গেছি আমরা। ফি বছর একজন পুরুষ আসে। কিন্তু তোমার মতো এমন রূপ এমন উন্মত্ত যৌবন কারো দেখিনি। তাই তোমাকে ভালো লেগেছে খুব। তোমাকে ছেড়ে যেতে যে কি কষ্ট তা বোঝাবো কি করে? কিন্তু কী উপায় বলো, যেতেই যে হবে!



—কিন্তু সোনারা, আমি তো তোমাদের ছেড়ে এখান থেকে যাবো না কোথাও। বেশ তো, তোমরা যাও, তোমাদের মা বাবাকে দেখে এসো। আমি এখানে অপেক্ষা করবো।

মেয়েগুলো নেচে উঠলো।—সত্যি? সত্যি থাকবে তুমি? তা হলে এই নাও, চাবির গোছা। প্রত্যেকটি দরজার চাবি আছে এতে। তোমার নিজের ঘর মনে করে থাকবে এখানে। আজ থেকে এই প্রাসাদের মালিক তুমি। কিন্তু সাবধান, বাগিচার ওপাশে যে তামার দরজা আছে, ওটা কিন্তু ভুলেও খুলো না। তা হলেই সর্বনাশ হবে। যদি খোলো জীবনে আর তোমার সঙ্গে আমাদের মোলাকাৎ হবে না কখনও।

এক এক করে সবাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার কাছে বিদায় নিলো। তাদের সেই করুণ বেদনার্ত চোখের চাহনি আজও আমি ভুলতে পারিনি, মালকিন।

তারা চলে গেলো। আমি একা পড়ে রইলাম সেই বিশাল শূন্য-প্রাসাদ কক্ষে। হাতে

আমার এক গোছা চাবি। ওরা দিয়ে গেছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। ক'দিন কি অপরূপ হাসি আনন্দ গানে উচ্ছ্বাস উচ্ছলতায় কেটে গেলো বেশ। কিন্তু আজ সেই প্রাসাদপুরী শূন্যতার হাহাকারে ভরা। এমন নীরব নিস্তব্ধতা মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলাম। যেদিকে তাকাই কি অপরূপ কারুকর্ম। নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত শিল্প নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এর সর্বাঙ্গে। মেয়েগুলোকে নিয়ে মশগুল ছিলাম এ ক'দিন, তাই এসব দেখার সময় হয়ে ওঠেনি। আজ চোখ সার্থক হলো। তাদের রূপের জৌলুষে চোখ আমার ধাঁধিয়ে ছিলো। তাই এই শিল্পরূপ আমার চোখে পড়েনি।

প্রথম চাবিটা দিয়ে প্রথম দরজাটা খুললাম। এক সুন্দর ফলের বাগান। এমন নানা জাতের ফলের গাছ একটা বাগানে আগে কখনও দেখিনি। আপেল, আঙ্গুর, কমলালেবু, শশা, কলা, পেয়ারা আরও কত নাম নানা জানা মিষ্টি মধুর ফল। প্রাণ ভরে পেটপুরে খেলাম। এর পর দ্বিতীয় দরজা খুললাম।

ফুলের সৌরভে ভরে গেলো দেহমন। এমন ফুলের মেলা কেউ কি দেখেছে কখনও? আমি তো দেখিনি। হয়তো বা নবাব বাদশাহদের বাগিচায় থাকতে পারে। যুঁই, বেল, মালতী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, হাসনুহানা, টগর, মল্লিকা, সূর্যমুখী, ক্রিসেমথিমাম, পারিজাত আরও অসংখ্য। সব নাম ক'জনেই বা জানে। এমন এক স্বপ্নের দেশে, এমন এক কল্পনার কল্পলোকে এসে প্রাণ আমার নেচে ওঠে।

আর একটা চাবি দিয়ে তৃতীয় দরজা খুললাম। নানা জাতের নানা রঙের হাজার হাজার পাখীর কলকাকলীতে মুখরিত হচ্ছে সারা বাগিচা। মনে হলো, দুনিয়ার সব রকম পাখীই বোধহয় জোগাড় করে রাখা হয়েছে সেখানে। সারাদিন ধরে পাখীদের সঙ্গে খেলা করলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি।

পরদিন চতুর্থ দরজা খুলতেই দেখি, বিশাল এক প্রাঙ্গণ। তারপর চার পাশে চল্লিশটা বড় বড় কক্ষ চন্দনকাঠের বিরাট বিরাট দরজা। দরজাগুলো সব খোলা। একটা ঘরে ঢুকেই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। সারা ঘরের মেজেয় ঢালা আছে কয়েকশো মণ মুক্তা। এতো বড় বড় মুক্তো কখনও দেখিনি আমি। পায়রার ডিমের মতো প্রায়। মুক্তোর আলোর ছটায় সারা ঘরটায় পূর্ণচাঁদের হাট। পাশের ঘরে এলাম। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত হীরা আর রুবীতে ঠাসা। তৃতীয় ঘরে থরে থরে সাজানো ছিলো চুনী, পান্না, তার পাশের ঘর সোনার তাল-এ ভরা। পরের ঘরটায় সোনার মোহরের পাহাড়। এতো মোহর এলো কোথা থেকে। যতই দেখতে থাকি অবাক হই। তার পাশের ঘর রূপোর বাটে ভর্তি। পরের ঘরে শুধু রূপোর মুদ্রা।

পর পর ঘরগুলো সবই দেখলাম মহামূল্যবান ধনরত্ন মণিমাণিক্যে ঠাসা। দেখলাম আর অবাক বিস্ময়ে ভাবলাম, এতো সম্পদ আমার গোটা সলতানিয়ৎ-এ নাই।

আমার কোন কাজ নাই, প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটার পর একটা চাবি দিয়ে দরজা খুলতে থাকি। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দিন কাটে। কী অপার ঐশ্বর্য, কী বিচিত্র সংগ্রহ। তারিফ না করে পারা যায় না।

এইভাবে ঊনচল্লিশ দিন পার হয়ে গেলো। একটি ছাড়া সবগুলো দরজাই খুলে দেখেছি। এবার মাত্র একটি চাবিই বাকী আছে। কিন্তু মেয়েগুলো আমাকে দিব্বি দিয়ে বারণ করে গেছে এই চাবিটা দিয়ে যেন আমি না খুলি সেই তামার দরজা। কিন্তু মন আমার ভীষণ কৌতূহলী। অজানাকে জানার ইচ্ছে আমার জন্মাবধি। না দেখাকে দেখার আগ্রহ আমার শিরায় শিরায়। কিন্তু মেয়েগুলোর সেই করুণ মিনতি, সেই জলভরা চোখ আমার চোখের সামনে

ভেসে ওঠে। ওরা বলেছিলো, খুলো না, কোন কারণেই খুলো না সেই সর্বনাশা তামার দরজা। আর যদি না শোনো আমাদের কথা, যদি খোল, চিরদিনের মতো তোমার সঙ্গে আমাদের আর মোলাকাৎ হবে না। তোমাকে আমরা হারাতে চাই না, সোনা। তুমি শুধু এই কথাটা আমাদের রেখো। খুলো না—খুলো না, কিছুতেই যেও না ওই দরজার কাছে।

চাবিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি আর ভাবি। কী সুন্দর পরীর মতো মেয়েগুলো। কী রূপ আর কী উচ্ছল উদ্দাম যৌবন। তাদের মধুর ব্যবহার, তাদের নাচ, তাদের গান, তাদের আদরযত্ন, তাদের দেহ আমাকে চল্লিশটা দিন স্বর্গসুখ দিয়েছিলো। প্রতিটি দিনের স্মৃতি প্রখর স্পষ্ট হয়ে রয়েছে প্রদীপশিখার মতো আমার হৃদয়ে। ভুলবো না, কখনও ভুলবো না এই পরম পাওয়ার চল্লিশটা দিন-রজনী। আর ভুলতে পারবো না সেই মেয়েগুলোকে—যারা আমাকে ভরে দিয়েছিলো—হাসি আর গানে। যৌবনের পূর্ণ সুধাপাত্র আকণ্ঠ পান করিয়েছিলো যে সব যৌবন মদেমত্তা পরম রমণীয় নারী,—কেমন করে ভুলবো তাদের? কিন্তু কৌতূহল এমনই এক বস্তু তার নিবৃত্তি না হলে সব তুচ্ছ মনে হয়। জানি আমার সর্বনাশ হবে, জানি এই স্বর্গসুখ, এই নারী সংসর্গ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিতে হবে। তবু কৌতূহল দমন করা গেলো না। তামার দরজাটা খুলে ফেললাম। শয়তান যখন পিছনে লাগে তার আর নিস্তার নাই।

দরজাটা খুললাম বটে—কিন্তু কিছুই দেখলাম না। একেবারে শূন্য ঘর। শুধু কেমন একটা গন্ধ ভেসে আসতে লাগলো। গন্ধটা ক্রমশ উগ্রতর হতে লাগলো। আমার শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠলো। তারপর আর মনে নাই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরে এলো। উঠে বসলাম। গন্ধটা বেশ হালকা হয়ে এসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখার জন্য পা বাড়ালাম। ওপাশে আর একটা দরজা। আর একটা ঘর। প্রকাণ্ড বড়। জাফরানে রং করা দেওয়াল। মোমবাতির মিষ্টি আলোয় এক মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। আতরের খুশবুতে ভরে গেছে সারা ঘর। ঘরের চারপাশে চারটে সোনার তৈরি চিরাগবাতি জ্বলছিলো। সেই পোড়া তেলের অপূর্ব এক মিষ্টি গন্ধও ছড়িয়ে পড়েছিলো ঘরময়। ঘরের এক পাশে একটা কালো ঘোড়া চোখে পড়লো। জবরদস্ত তাগড়াই। তার কপালে একটা সাদা তারার ছাপ। পিছনের দিকের বাঁ পা আর সামনের দিকের ডান পায়ে সাদা মোজা পরানো। তার পিঠের জীন সোনার তৈরি। নিপুণ স্বর্ণকারের সূক্ষ্ম কারুকর্ম করা। যবের আটা আর বার্লির জাবনা তার সামনে। আর একটা বারকোষে খানিকটা জল।



ঘোড়াটা দেখে আমার ভীষণ লোভ হয়। ছোট বেলা থেকেই দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার হিসাবে সারা দেশে নাম ছিলো আমার। বাঘা বাঘা জাঁদরেল ঘোড়সওয়ারকে পাল্লায় হারিয়ে দিয়েছি এক সময়। পিঠে চড়ে ঘরের বাইরে বাগানের মাঝখানে নিয়ে এলাম ঘোড়াটাকে। আর নড়তে চায় না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। একেবারে বেয়াড়া বেহুদা জানোয়ার। সপাং সপাং করে ঘা কতক লাগাতেই চি-হি-হি করে লাফিয়ে উঠলো। আর কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা পেল্লাই পাখা ছড়িয়ে পড়লো, দু-পাশে এমনভাবে গোটানো ছিলো যে, চোখেই পড়েনি এতক্ষণ। এর পর অদ্ভুত ধরনের এক আওয়াজ তুলে শোঁ শোঁ করে আকাশের দিকে যেতে লাগলো। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘর-বাড়ি মানুষজন সব ছোট হতে হতে আরও ছোট হয়ে আসতে লাগলো আমার চোখে। অনেক উপরে উঠে গেছি

তখন। একেবারে মেঘের কাছাকাছি। এবার ঘোড়াটা বাজপাখীর মতো তীর বেগে ছুটে চললো শক্ত করে লাগামটা ধরে বসে রইলাম। ভয় আমি পাইনি। বরং এক অপূর্ব শিহরণ বোধ করছিলাম সারা দেহে।

আকাশ পথে দেশদেশান্তর পেরিয়ে উড়ে চললো সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া। তারপর এক সময় দেখলাম সেই তাম্র-প্রাসাদের ছাদে গিয়ে নামলো সে। এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে গাঝাড়া দিয়ে আমাকে ফেলে দিলো নিচে—ছাদের উপর। আমি সামলে ওঠার আগেই ছুটে এসে তার একখানা পাখার ঝাপ্‌টা মারলো আমার এই বাঁ চোখে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে পড়ে গেলাম আমি। আর তক্ষুণি শোঁ শোঁ করে মহাশূন্যে উঠে গিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেলো সে।

এক হাতে বাঁ-চোখটা চেপে ধরে প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। সেই দশজন বাঁ-চোখ কানা যুবক বেরিয়ে এলো।

—অতো পইপই করে বারণ করেছিলাম সেদিন, কিন্তু আমাদের কথা গ্রাহ্য করলে না। এখন ঠেলা বুঝলে? তোমাকে আগেই বলেছিলাম দশজনের বেশী জায়গা নেই এখানে। আর দশজন আমরা হয়েই গেছি। তোমার জায়গা হবে না। এখন নিজের পথ নিজে দেখো। তবে তোমাকে একটা পথের নিশানা বলে দিতে পারি। সেই পথ ধরে যদি যাও তবে দিন কয়েক পরে বাগদাদ শহরে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। সেখানকার খলিফা হারুন-অল্-রসিদ পরম দয়ালু। তার কাছে গেলে তোমার আশ্রয় মিলতে পারে, তার দান ধ্যানের খ্যাতি জগৎ-জোড়া। তিনিই তোমার ভাগ্যবিধাতা।

দাড়ি গোঁফ কামিয়ে এক কালান্দার ফকিরের বেশে পথে নেমে পড়লাম। কেউ চিনবে না, কেউ জানবে না আমি বাদশাহ কাসিবের পুত্র। দিনের পর দিন হেঁটে হেঁটে আজ সন্ধ্যায় এই বাগদাদ শহরে পৌঁছেছি। কোথায় যাবো, কোথায় পাবো একটা আস্তানা—আজকের রাতের মতো, সেই ভাবনা ভাবতে ভাবতে একটা রাস্তার চৌমাথায় এসে দাঁড়ালাম। সেখানে দেখি আমারই মতো আরও দু'জন কালান্দার। তাদেরও দাড়ি গোঁফ কামানো। আমার মতো তাদের দু'জনেরও বাঁ চোখে ঠুলি পরা। কানা। ওরাও শহরে নবাগত। রাতের আশ্রয় খুঁজছে। তিনজনের একই সমস্যা। এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম আস্তানার সন্ধানে। রাতের মতো একটু আশ্রয় পেয়ে যাবো এই আশায় তোমাদের দরজায় কড়া নাড়লাম।

এই হলো আমার হতভাগ্য জীবনের করুণ কাহিনী। এই হলো আমার বাঁচোখ হারানো আর গোঁফদাড়ি কামানোর ইতিবৃত্ত।

সেই সুন্দরী তিন বোন তৃতীয় কালান্দারের কাহিনী শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হতবাক। বড়বোন বললো, খুব খুশি হয়েছি তোমার কাহিনী শুনে। যাও এক্কেবারে ছুটি।

—কিন্তু মালকিন, এখানে আর যাঁরা আছেন তাদের কাহিনী শুনবো না?

ছোটবোন তখন খলিফা জাফর আর মসরুর-এর দিকে চেয়ে বললো, এবার আপনাদের কাহিনী শোনান।

জাফর বললো, আমাদের যা কাহিনী তা তো দরজায় ঢোকার মুখেই তোমাকে বলেছি, মা। এর বেশী বলার মতো কোনও ঘটনা আমাদের জীবনে নাই।

বড়বোন বললো, ঠিক আছে, সবাইকে আমি মুক্তি দিলাম। যে যেখানে যেতে চাও যেতে পারো।

খলিফা ফিরে এসে ঘুমুতে গেলো। কিন্তু ঘুম আর আসে না। বাকী রাতটা পায়চারী

করে কাটায় ঘরময়। সকাল হতে দরবারে গিয়ে বসে। জাফরকে বলে, সেই তিনটি মেয়েকে আর তাদের ঐ মাদী কুকুর দু'টো আর ঐ তিন কালান্দারকে হাজির করো এখানে—এখুনি।

একটু বাদেই তাদের হাজির করা হলো দরবারে। আমির ওমরাহ পারিষদে গম্ গম্ করছে দরবার। তখন উজির জাফর বলতে লাগলো, কাল রাতে আমরা তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। তখন অবশ্য তোমরা জানতে না আমাদের পরিচয়। তবু বলবো, কোন খারাপ ব্যবহার করোনি আমাদের সঙ্গে। এখন শোনো, তোমরা পঞ্চম আব্বাস খলিফা হারুন-অল-রসিদের দরবারে এসেছো। যা বলবে সত্য বলবে, কোন মিথ্যা বলবে না। এখন বলো, কী তোমাদের কাহিনী, আর এই রহস্যজনক মাদী কুকুর দু'টারই বা ইতিবৃত্ত কী?

জাফরের এই কথা শুনে বড়বোন এগিয়ে এসে খলিফাকে কুর্নিশ জানালো। বললো, আপনি মহানুভব মেহেরবান শাহেনশাহ। আপনি আল্লাহর পয়গম্বর। আপনার কাছে কোন মিথ্যা বলবো না। কিন্তু আমার কাহিনী এতোই অদ্ভুত, শুনে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন হুজুর। এক বর্ণও মিথ্যা বানিয়ে বলবো না কিছু।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন রাত্রে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ। শুনুন শাহজাদা, সেই সুন্দরী তিন বোনের বড় জন তখন দরবার কক্ষে খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে তার জীবনের কাহিনী বলতে লাগলো ঃ

জাঁহাপনা, আমার নাম জুবেদাহ, আমার ছোট যে, অর্থাৎ মেজো, তার নাম আমিনাহ আর সবার ছোটর নাম ফহিমাহ। আমাদের তিন বোনের বাবা এক কিন্তু মা আলাদা। আমার বাবার তিন বিবি। প্রথম বিবি আমার মা। তার আরও দুই মেয়ে ছিলো আমার সহোদরা। তারা দু'জনই আমার চেয়ে বড়ো। কিন্তু আমার দুই বিমাতার এই দুই কন্যা—আমিনা আর ফহিমার চেয়ে আমি বয়সে কিছু বড়।

আমার বাবা মারা যাবার সময় পাঁচ হাজার দিনার রেখে গিয়েছিলো আমাদের জন্য। ফহিমা আর আমিনা চলে গেলো তাদের মায়ের কাছে। আমি আর আমার দুই বড়বোন একত্রে রয়ে গেলাম।

কিছুদিনের মধ্যে আমার বড় দুই বোন শাদী করলো। দিদিদের পয়সাকড়ি যা ছিলো তাই দিয়ে সওদাগরী ব্যবসা করবে। আমার দুই ভগ্নিপতি একদিন সমুদ্র-যাত্রা করলো। দিদিরাও তাদের সঙ্গে চলে গেলো।

চার বছর কেটে গেলো। একদিন দীন ভিখারীর বেশে ফিরে এলো তারা। তাদের শতছিন্ন নোংরা ময়লা জামাকাপড় দেখে প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি। শীর্ণকায় দেহ। রুক্ষ এলোমেলো চুল। কালিবর্ণ গায়ের রং। গর্তের মধ্যে বসে গেছে চোখ। তুবড়ে গেছে গাল। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে গেছে। দুঃখে কষ্টে অনাহারে অনিদ্রায় হারিয়ে গেছে রূপের জৌলুষ। হাড় জিরজিরে কঙ্কাল-সার দু'টি রূপ যৌবন খোয়ানো মেয়েছেলেকে দেখে কি করে বিশ্বাস করি এরাই আমার সেই পরমা সুন্দরী রূপবতী দুই দিদি। পরিচয় দিতে তবে বুঝলাম।

রাতারাতি বড়লোক হবার বাসনায় সওদাগর হয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে সব খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়। সওদা সামান, পয়সাকড়ি সব ডাকাতরা লুঠ করে নিয়েছিলো। তারপর একদিন এক অচেনা শহরে তাদের দু-বোনকে অচেনা লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়ে যায় তারা। অনেক দুঃখে কষ্টে এতোদিনে দেশে ফিরে আসতে পেরেছে। দিনের পর দিন শুধু নদীর জল খেয়ে আর গাছতলায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে। দু-বছরের মধ্যে গোসল করতে পারেনি তারা। পরনের একখানা মাত্র বস্ত্র সম্বল। তাও শতছিন্ন ময়লা।

তাদের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে চোখে জল আসে আমার। সান্ত্বনা দিয়ে বলি, যা হয়েছে তা নিয়ে আর দুঃখ করো না দিদি। আল্লাহর বোধহয় এইরকমই ইচ্ছে ছিলো। তার বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না।

নতুন জামাকাপড় দিলাম। ভালো করে ঘসেমেজে সাফ করে গোসল করলো তারা। এক সঙ্গে বসে খানাপিনা করলাম। নতুন করে জীবন গড়ার অনেক কথাই হলো। বললাম, তোমরা আমার বড়বোন। বাবা মার অবর্তমানে বলতে গেলে তোমরাই আমার একমাত্র আপনজন, অভিভাবক। আল্লাহর দোয়ায় আমি যা পেয়েছিলাম, এই ক'বছরে তা বেড়ে অনেক হয়েছে। সেই লাভের টাকাটা নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করে রুজি রোজগারের ধান্দা করো। দেখো সুখে স্বচ্ছন্দে দিব্যি চলে যাবে আমাদের।

আমার কাছেই তারা রইলো বছরখানেক। একদিন দুই বোন এসে আমাকে বললো, দেখ ছোট, বিয়েই মেয়েদের কাছে সব চেয়ে বড়। আমরা ভেবেছি আবার শাদী করবো।

শঙ্কিত হয়ে বললাম, দেখ দিদি একবার শাদী করেও তোমাদের শিক্ষা হয়নি। কী মধু পেয়েছ শাদী করে? আজকাল দুনিয়ায় সাচ্চা মানুষ ক'টা খুঁজে পাবে? ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।

কিন্তু ওরা আমার কথায় কান দিলো না। আমাকে গোপন করেই শাদীর পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেললো ভিতরে ভিতরে। অবশ্য সবই আমি জানতে পারলাম পরে। আমার মত না থাকলেও নিজেই সব ব্যবস্থা-পত্র করে শাদী দিয়ে দিলাম দু'জনের। আমার সাধ্যমত পয়সাকড়ি দান সামগ্রী সবই দিলাম। তাদের এই নতুন স্বামীরাও কিন্তু আবার সেই একই ভাবে বিদেশে রওনা হয়ে গেলো বাণিজ্য করতে। আমার দিদিদেরও নিয়ে গেলো সঙ্গে।

আবার সেই কাণ্ড। এবার আর বেশি দিন দেরি হলো না। কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে এলো তারা সব খুইয়ে, একেবারে কপর্দক শূন্য ভিখিরি হয়ে। তাদের স্বামীরা দু'জনেই ঠগ প্রবঞ্চক। এক অজানা বন্দরে ভুলিয়ে ভালিয়ে নামিয়ে দিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। ওরা এসে বললো, দেখ ছোট আমাদের বকাবকি করিসনে। ভুল আমরা করেছি ঠিকই। কিন্তু হাজার হলেও তোর বড়বোন তো আমরা। তোর না হয় বুদ্ধিসুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তা বলে কি আমাদের ফেলে দিবি? এবারকার মতো ক্ষমাঘেন্না করে নে বোন। কথা দিচ্ছি এ পোড়ার মুখে আর কখনও বিয়ে শাদীর নাম উচ্চারণ করবো না।

আমি তাদের আদর আপ্যায়ন করে বসালাম। বললাম, তা ভুল মানুষেরই হয়। ভুলের জন্য অনুতাপ হলেই যথেষ্ট। কী আছে, আবার নতুন করে শুরু করো জীবন।

বছরখানেক কেটে গেছে। আমরা তিন বোন একসঙ্গে থাকি। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, বাণিজ্যে যাবো। সব ব্যবস্থা পাকা করে দুই দিদিকে বললাম, আমি বিদেশে বাণিজ্যে যাবো ঠিক করেছি। তোমরা যদি সঙ্গে যেতে চাও চলো। না হলে বাড়িতেই থাকো।

তারা বললো, তারাও যাবে আমার সঙ্গে। সুতরাং ওদের দু'জনকে সঙ্গে করে একদিন সমুদ্রযাত্রা করলাম। সব টাকাটা আমি সঙ্গে নিলাম না। অর্ধেকটা লুকিয়ে রেখে গেলাম বাড়িতে। বাকী অর্ধেক নিলাম সঙ্গে কি জানি, বিদেশে বিভুঁই। যদি খোয়া যায়। তবে খালি হাতে দেশে ফিরে পথে না বসি।

দিনের পর দিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছি। কিন্তু কূলের হদিশ পাওয়া গেলো না। চিন্তিত হলাম আমি। কাপ্তেন বললো, আমাদের বরাত খারাপ। পথ হারিয়ে ফেলেছি। এক অচেনা সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। জানি না কি হবে। এখানকার জল বড় বেয়াড়া। এমন এলোপাথাড়ি মারাত্মক ঢেউ আমাদের সমুদ্রে কখনও হয় না।

যাই হোক, জাহাজের গতি ঘুরিয়ে নিয়ে দিন দশেক বাদে একটা বন্দর পাওয়া

গেলো। কাপ্তেন বললো, এ বন্দর তার অচেনা। এর আগে কখনও সে আসেনি এখানে। এই সমুদ্রের নামও তার অজানা। তবে এটুকু বোঝা যায়, বিপদ অনেকটা কেটে গেছে। একেবারে অকূল পাথারে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে না। এখন শহরটা ঘুরে দেখতে হবে। সওদাপত্র কিছু হয় কি না। আমি বললাম, জাহাজ নোঙর করো, দেখা যাক, কিছু বাণিজ্য করা যায় কিনা।

ঘণ্টাখানেক বাদে বন্দরে পৌঁছনো গেলো। কাপ্তেন জানালো, বন্দরের নাম ডিসেম্বার্ক। আল্লাহর নাম করে শহরে ঢুকে পড়ো। দেখ কি হয়।

শহরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড, যেদিকে তাকাই সমস্ত ঘরবাড়িগুলো দেখলাম কালো পাথরের তৈরি। পথেঘাটে কোন জনপ্রাণী নাই। কিন্তু দোকান-পাট সব সাজানো গোছানো, ঝক্‌ঝকে তকতকে। দামি দামি সোনা রূপার তৈরি সামানপত্রে ঠাসা। কী ব্যাপার, কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না।

রাস্তার চৌমাথায় এসে আমরা চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। সবারই উদ্দেশ্য, দামি দামি সোনারূপার গহনা আর বাহারী সাজপোশাক সংগ্রহ করা।

আমি চললাম প্রাসাদের দিকে। কিছু দূর যেতেই চোখে পড়লো, বিশাল এক প্রাসাদ। তার সিংহ দরজাটা পুরো সোনার তৈরি। ভিতরে ঢুকে প্রাসাদের প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেটাও সোনার। মখমলের পর্দা ঝুলছে। পর্দা উঠিয়ে ভিতরে ঢুকতেই চোখ ছানাবড়া। বিরাট এক দরবার মহল। হীরা মণি মাণিক্যখচিত সিংহাসনে বাদশাহ বসে আছেন। তার দুই পাশে উজির আমীর ওমরাহ, গণ্যমান্য ব্যক্তি। কেউবা সোনা কেউ বা রূপার চেয়ারে আসীন। দরবার কক্ষের চারপাশে সশস্ত্র সিপাহী মোতায়েন। কিন্তু সবাই অনড় অচল নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কার অভিশাপে? কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।



দরবার ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকলাম। হারেম। আরও সুন্দর আরও মনোহর। দরজা জানালা, খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল যাবতীয় আসবাবপত্র সব সোনার তৈরি। সূক্ষ্ম কারুকার্য করা সিল্ক আর মখমলের পর্দায় ঢাকা জানালা দরজাগুলো। হারেমের মাঝখানে এক দঙ্গল বেগম, পরিচারিকা, দাসী, খোজা। যে যেমনভাবে ছিলো, পাথর হয়ে গেছে। মূল্যবান হীরা মণিমুক্তার রত্নাভরণে সজ্জিতা এক যুবতীকে দেখে বুঝলাম, হারেমের সে প্রধান বেগম। নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তি হয়ে পালঙ্কে অর্ধশায়িতা।

আরও একটু এগিয়ে একটা রূপার দরজা খুলে আরও অবাক হই। একটা বিরাট চবুতরা। সাতটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। শ্বেত পাথরে তৈরি এই মঞ্চটা আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। কার্পেটখানা সোনার জড়ি দিয়ে তৈরি। একপাশে মখমলের গদি বিছানো এক বিরাট ফরাশ। অন্য দিকে একখানা বাদশাহী শয্যা। সারা মঞ্চটা আলো ঝলমল করছিলো, এতো আলোর উৎস কিন্তু একটা বিরাট হীরা। একটা ছোট্ট মেহগনি কাঠের টুলের ওপরে রাখা ছিলো রাজহাঁসের ডিমের মতো সেই হীরাটা, তার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা চবুতরায়।

সারা মঞ্চটা নিপুণভাবে সাজানো গোছানো। মনে হয়, কোন জীবন্ত মানুষের হাতের ছোঁয়া আছে সর্বত্র। তা না হলে এমন ঝকঝকে তকতকে থাকতো না সব। হয়তো আশেপাশে কোথাও আছে কেউ। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করতে লাগলাম। কিন্তু না, অনেকগুলো মহল ঘুরলাম—কোথায়ও কোন জীবন্ত মানুষ দেখলাম না। যাদের দেখলাম সবই পাথরের।

এটুকু বেশ বোঝা যায়, ওরা সবাই একদিন রক্তমাংসের মানুষ ছিলো। হয়তো কোন কারণে কোন এক মুহূর্তে পাথর হয়ে গেছে। পাথর হওয়ার আগে যে যে ভঙ্গীতে ছিলো সে সেই ভঙ্গীতেই রয়ে গেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা জানার জন্যে তখন আমার মন আকুলি বিকুলি করছে। কিন্তু কোন জীবন্ত মানুষের সন্ধান পাওয়া না গেলে কে বলবে সে সব কথা। এবং আমার মনে হলো, কেউ না কেউ আছেই। আছে যে, তার কিছু প্রমাণও আমি পেয়েছি। সারা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। তখন আমার নেশায় পেয়ে বসেছে। সব ভুলে গেলাম। কে আমি—কোথা থেকে এসেছি। আমার জাহাজ, আমার বাণিজ্য, সব মন থেকে হারিয়ে গেছে তখন। এমহল থেকে ওমহলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যা নেমে এলো। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ফিরে এলাম আবার সেই ঘরে। যেখানে চবুতরার ওপরে সোনার কার্পেটের ওপর ফরাশ আর এক দিকে ছিলো বাদশাহী শয্যা। সেই সাতটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে শয্যায় শুয়ে পড়লাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে পড়েছি। একখানা শাল টেনে নিলাম বুক অবধি। মাথার কাছে রাখা ছিলো একখানা পবিত্র কোরান। শোবার সময় রোজ রাতে কোরান পড়া আমার বহুকালের অভ্যাস। আল্লাহর বাণী পড়তে পড়তে মনটা বেশ প্রশান্ত হয়ে যায়। তখন ঘুমিয়ে পড়ি। সারারাত বেশ সুখ-নিদ্রা হয়। কোরানখানা তুলে নিলাম। সোনার পাত দিয়ে বাঁধানো, সোনার জলে লেখা একখানা খুব সুন্দর বই। আমাদের ধর্মগ্রন্থ। কয়েকটা উপদেশবাণী পড়লাম। তাঁর অপার মহিমার কথা পড়তে পড়তে দেহ মনের সব শ্রান্তি কেটে গেলো। এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকলাম।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর তখনও আমি জেগে। এপাশ ওপাশ করছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। হঠাৎ একটা হাল্কা এক সুমধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বেশ কিছু দূরে কে যেন কোরাণের পয়ার সুর করে আবৃত্তি করছে। শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লাম। সেই আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। একটা ছোট্ট খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হলো আওয়াজটা এদিক থেকে ভেসে আসছে। ভিতরে ঢুকলাম। আমার হাতে ছিলো একটা চিরাগবাতি। তার আলোয় দেখলাম, ভিতরটা এক মসজিদ। একটা সবুজ রঙের স্তিমিত বাতি জ্বলছে। মেজের ওপর একখানা কম্বল বিছানো। তার উপর পূর্বদিকে মুখ করে হাঁটুগেড়ে নামাজের ভঙ্গীতে বসে এক প্রিয়দর্শন নওজয়ান পবিত্র কোরান পাঠ করছে। কী অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ, আর কী পরিষ্কার উচ্চারণ! মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে একাগ্র চিত্তে কোরান পাঠে মগ্ন হয়ে গেছে সে। কে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—কোন দিকে খেয়াল নাই তার।

আমার মনে তখন একটা কথাই হানা দিচ্ছে। এই প্রাসাদপুরীতে—অথবা আরো ভালো বিশেষণে ভূষিত করলে বলতে হয় পাষাণ পুরীতে সবাই যখন কোন কারণে পাষাণে পরিণত হয়ে গেছে তখন এই যুবক কী করে অব্যাহতি পেলো? সে যদি সেই মুহূর্তে প্রাসাদের বাইরেও কোথাও থেকে থাকতো তবু তো এ অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা নয়। কারণ, গোটা শহরটারই তো এই একই দশা।

আমি তার পাশে গিয়ে সালাম জানালাম। সেও আমাকে সালাম জানালো। আমি বললাম, তোমার অপূর্ব কোরান পাঠ আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি। তুমি বন্ধ করো না, আল্লাহর পবিত্র বাণী শুনে আমিও ধন্য হই।

সে একটু হাসলো। বললো, আচ্ছা সুন্দরী, আগে বলো, এখানে এলে কি করে তুমি? তারপর তুমি যা শুনতে চাইবে শোনাবো আমি।

আমি আমার কাহিনী শোনালাম তাকে। এবার তাকে প্রশ্ন করলাম, এ শহরে প্রবেশ করেই তাজ্জব বনে গেছি। এখানকার জনমানব পশুপক্ষী সব পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে কী করে? আর একমাত্র তুমিই বা কী করে অব্যাহতি পেয়ে গেছো?

কোরানখানা বন্ধ করে একটা সাটিনের থলের মধ্যে ভরলো সে। আমাকে তার পাশে বসতে বললো। আমি বসলাম। তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। রূপের মাধুর্যে ভরা অপূর্ব সুন্দর সেই মুখ। যেন এক পূর্ণ চাঁদের মায়া। তার সৌম্য প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কী সুঠাম সুন্দর তার দেহের গড়ন।

তখন তন্ময় হয়ে রূপের সমুদ্রে আমি স্নান করছি। সারা শরীরে শিহরণ লেগেছে আমার। বুকের মধ্যে বহ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে। কিন্তু কেন? আগে তো কখনও দেখিনি তাকে। এই তো প্রথম পরিচয়। তবে কেন এমনভাবে আমার সব ওলোটপালট হয়ে যেতে লাগলো। কী যাদু আছে তার ঐ রূপে? আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, শাহজাদা, মেহেরবাণী করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

সে বললো, নিশ্চয়ই। এবার বলছি, শোনো সুন্দরী!

এ শহরের সুলতান ছিলেন আমার বাবা। ধনে জনে পূর্ণ ছিলো তার সল-তানিয়া। কারো কোনও অভাব ছিলো না। প্রজারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো আমার বাবাকে। বাবারও খুব নাম যশ ছিলো প্রজাবৎসল হিসাবে। কিন্তু এমনি নিয়তি, আজ সারা দেশের মানুষজন, পশুপক্ষী সব পাষাণ হয়ে গেছে। ঐ যে দরবার মহল দেখছো, সিংহাসনে যিনি বসে আছেন পাথর হয়ে, তিনি আমার বাবা। আর হারেমে দেখেছো, প্রধান বেগম—যিনি পালঙ্কে অর্ধশায়িত—পাষাণ-প্রতিমা, তিনি আমার মা। এঁরা দু'জনেই যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নারদুন-এর উপাসক পরম নাস্তিক আমার মা-বাবা ইসলামে বিশ্বাস করতেন না। শয়তান নারদুন তাদের ঘাড়ে ভর করেছিলো।

বহুকাল পর্যন্ত বাবা-মার কোন সন্তানাদি ছিলো না। আমিই তাদের ঘরে একমাত্র পুত্র জন্ম নিলাম। স্বভাবতই বুঝতে পারছো আদর যত্নের সে কী ভীষণ ঘটা। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। আমার খাওয়া দাওয়া, আমার খেলাধূলা, পড়াশুনা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে সবাই তটস্থ। বাবা-মার শুধু চিন্তা—আমি কি করে মানুষের মতো মানুষ হবো। বড় হয়ে আমি তাঁর শাসনভার হাতে নিয়ে সুনামের সঙ্গে প্রজাপালন করবো—এই তাঁর একমাত্র বাসনা ছিলো। সেই সঙ্গে আর একটা ইচ্ছেও তার ছিলো, আমি যাতে সেই ভয়ঙ্কর শয়তান নারদুন-এর ভক্ত হই।

আমাদের এই প্রাসাদে এক বৃদ্ধা মহিলা ছিলো। গোপনে গোপনে সে আল্লাহর নামাজ করতো। আল্লাহর পয়গম্বর হজরত মহম্মদের নামগান করতো। কিন্তু বাবা-মার কাছে এমন ভাব দেখাতো যেন মনে হতো ইসলামের সব চেয়ে বড় শত্রু সে। বাবা তাকে খুব ভালো চোখে দেখতেন। আমার দেখ-ভালের ভার পড়লো তার উপর। বাবার ধারণা ছিলো, বৃদ্ধাও তাঁর ধর্মে বিশ্বাসী। ছেলেকে সে তার মনের মতো করে মানুষ করে তুলবে এই অগাধ বিশ্বাস বাবার ছিলো। আমার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব বৃদ্ধার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাবা তাকে বলেছিলেন, তুমি বিদ্যায় বুদ্ধিতে এই প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। তোমার হাতে আমার একমাত্র সন্তান, আমার বুকের কলিজাকে তুলে দিচ্ছি। তুমি ওকে আদর্শ মানুষ করে গড়বে। যাতে সে এক আদর্শ সুলতান হয়ে আমার মুখ উজ্জ্বল করে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। আর তাকে আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা সর্বশক্তিমান নারদুনের মন্ত্রে দীক্ষা দেবে। যাতে সে তার যোগ্য ভক্ত হতে পারে।

বৃদ্ধা বাবাকে আশ্বাস দেয়, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, জাঁহাপনা। আমি তাকে শিক্ষায় দীক্ষায় আদর্শ মানুষ করে তুলবো।

কিন্তু সে আমাকে ইসলামের ধর্মে দীক্ষা দিলো। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অপার মহিমা, তার বাণী তার ফরমান শোনাতে লাগলো। পবিত্র কোরান পড়ে শোনাতো আমাকে। আল্লার পয়গম্বর মহম্মদের কাহিনী শোনাতো। আমি প্রাণ-মন দিয়ে শুনতাম। সে-সব ধর্মকথা। ধীরে ধীরে এক সাচ্চা মুসলমান হয়ে উঠতে লাগলাম আমি।

বৃদ্ধা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো, দেখো বাবা, তোমার আব্বাজান যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। তাহলে গর্দান যাবে আমার। আমি তোমাকে আদর্শ মানুষ করে গড়তে চাই। কিন্তু ইসলাম বিশ্বাসী না হলে আদর্শ মানুষ হতে পারে না কেউ। তোমার বাবার ধর্ম অসত্যের, অবিশ্বাসের, ধ্বংসের ধর্ম। নারদুন এক মহা শয়তান। ঝাড়ফুক মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে সে লোককে বশ করতে পারে। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা দয়া দান উদারতা মহত্ব তার ধাতে নাই। সে শুধু জানে জ্বালাতে পোড়াতে, ধ্বংস করতে।

আমার শিক্ষা দীক্ষা প্রায় শেষ হয়ে আসছে এমন সময় একদিন সেই বিদুষী বৃদ্ধা দেহ রাখলো।

একদিন গভীর রাতে শহরের সবাই যখন নিদ্রামগ্ন আল্লাহ স্বপ্ন দেখালেন প্রত্যেক শহরবাসীকে।—তোমরা জাগো, ওঠো। আমিই একমাত্র আল্লাহ—আমার হুকুমেই তামাম দুনিয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই জগতে যা কিছু দেখছো সবই আমার সৃষ্টি। আবার আমাতেই লয় হবে তারা। আমি ছাড়া তোমাদের কোন গতি নাই। তোমরা এখন মোহাচ্ছন্ন হয়ে ঘোর পাপে লিপ্ত আছো। শয়তান নারদুন তোমাদের যাদু করে রেখেছে। তাকে তোমরা একমাত্র উপাস্য বলে মনে করছো। কিন্তু ভুল। সে তোমাদের মোক্ষদাতা নয়। পাপের পঙ্কিল থেকে সে কখনও উদ্ধার করতে পারবে না তোমাদের। কারণ, সে ক্ষমতা তার নাই। পাপই তার একমাত্র সহায়। ধ্বংসই তার একমাত্র সম্বল। কী করে সে নিয়ে যাবে তোমাদের পুণ্য লোকে। কী করে সে দেবে সৃষ্টির আনন্দ? ওঠো-জাগো। আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না। আমার নামগান করো। মুক্তির আনন্দ পাবে।

পরদিন সকালে শহরবাসীরা সন্ত্রস্ত, ভীতচকিত হয়ে সুলতানের দরবারে এসে হাজির হলো। সব শুনে সুলতান অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। ঘাবড়াও মাৎ। ওই শয়তানটা আমাকেও ওই একই স্বপ্ন দেখিয়েছে। ভয় দেখিয়ে বলেছে, আমি যদি তার কথা না শুনি তবে নাকি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। হা-হা-হা—। ধ্বংস হবে না ঘণ্টা হবে। ঐ সব শয়তানের শয়তানিতে ডরো মাৎ। আমি সব শায়েস্তা করে দেবো নারদুনকে দিয়ে। ওসব দুশ্চিন্তা বিলকুল মুছে ফেলো মন থেকে। নিজের নিজের কাজকাম করো, খাওদাও, নাচো গাও। ওসব মনে রেখো না। নারদুন সর্বশক্তিমান—তিনিই রক্ষা করবেন।

প্রজারা অবনত মস্তকে ফিরে গেলো। একটা বছর কেটে গেছে প্রজারা ভুলে গেছে সে রাতের স্বপ্নের কথা। এমন সময় আর এক রাত্রে আকাশ থেকে দৈববাণী শোনা গেলো। তোমরা আমার ফরমান শুনছো না। এখনও সময় আছে। শয়তানের কব্জা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে আমার প্রতি আস্থা রাখো। না হলে সর্বনাশ হবে।



গগন বিদারী সেই আওয়াজে হৃদ্‌কম্প ধরে যায় শহরবাসীর। কিন্তু আবার সেই সুলতানের তড়ফানী। কোন ভয় নাই। অগ্নির উপাসনা করে যাও তিনিই একমাত্র মোক্ষদাতা।

পরের বৎসর আবার ঠিক সেই দিনে—গভীর রাতে আবার সেই গগন ভেদী আওয়াজ শোনা গেলো। এবারে আরও জোরালো আরও ভয়ঙ্কর হুকুমনামা শোনা গেলো।

এইভাবে পর পর তিন বৎসর ঠিক একই দিনে—একই সময়ে আল্লাহর ফরমান শোনা গেলো। কিন্তু সুলতান তার সেই এক গোঁ ধরে বসে রইলো।

এর পরিণাম হলো ভয়াবহ। একদিন সকালে সবাই যখন শতকর্মে রত তখন আকাশপথে এক উল্কার আবির্ভাব হলো। সারা শহরটা বিজলীর আলোয় চমকে উঠলো এক মুহূর্ত। ব্যাস, তারপরই সব শেষ। শহরের প্রতিটি মানুষ পরিণত হয়ে গেলো পাষাণে। গাধা, ঘোড়া,

উট, খচ্চর—সব প্রাণী পাথর হয়ে যে যেখানে যেমনটি ছিলো, দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু আমি—একমাত্র প্রাণী ইসলামে বিশ্বাসী—বেঁচে গেলাম।

সেই থেকে আমি একা। আল্লার নামগান করে, কোরান পাঠ করে দিন কাটাই। সঙ্গী সাথী বলতে কেউ নাই আমার। আমি বড় একা। আজ বহুকাল বাদে তুমি এলে, তাই প্রাণ খুলে দু'টো কথা বলতে পারলাম। তোমাকে আজ কাছে পেয়ে কি যে ভালো লাগছে, সুন্দরী, কী বলবো?

তার কথা বলার ঢং-এ কী এক যাদু আছে—আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বললাম, আমাদের বাগদাদ শহরে চলো না, দেখবে তোমার আরও ভালো লাগবে। সেখানে কেউ কাউকে ঠকায় না। সবাই সবাইকে ভালোবাসে। আর সেখানকার সুলতান—খলিফা হারুন-অল-রশিদ আল্লার পীর। দয়ার সাগর। তার কাছে হাত পাতলে কেউ কখনও বিমুখ হয় না। দুনিয়াতে যদি বেহেস্ত কোথাও থেকে থাকে তবে সে বাগদাদে। চলো, ওখানে চলে যাই আমরা। সেখানে ইসলামের অনেক আদর্শ লোকের সঙ্গে তোমার মোলাকাৎ হবে। তাদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মের আরও গভীর তত্ত্বের সন্ধান পাবে। আর দ্বিধা করো না চলো কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেখানে আমার প্রাসাদের মতো বাড়ি আছে। ধনদৌলত যা আছে, বেশ চলে যাবে আমাদের। বাগদাদ শহরে আমার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি নাম যশ আছে। লোকে খাতির করে আমাকে। তোমাকেও করবে। এতোকাল আমি শাদী নিকা করিনি। তার কারণ বোধহয় তুমি, তোমাকে পাবো বলেই অন্য কাউকে মনে ধরেনি। চলো, আমরা বাগদাদে গিয়ে ঘর বাঁধবো, স্বর্গ রচনা করবো। তুমি হবে আমার মালঞ্চের মালাকর। আমি হবো তব প্রিয়া। আল্লাহর বোধহয় এইরকমই ইচ্ছা। তা না হলে সমুদ্রে পথ হারিয়ে অচেনা-অজানা সমুদ্রে গিয়েই বা পড়বো কেন। আর কেনই বা ভেড়াবো আমার তরী—এই নাম না জানা বন্দরে! সবই নিয়তি। এ শহরে না এলে তোমার দেখা পেতাম?

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। কাহিনী থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

পরদিন সপ্তদশ রজনী।

—শুনুন, জাঁহাপনা, শাহরাজাদ বলতে শুরু করে, জুবেদা তখন সেই শাহজাদার প্রেমে ডগমগ। সে রাত্রে সেই প্রিয়দর্শন যুবকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করার সাধ্য ছিলো না তার। তাদের সারাটা রাত কিভাবে কেটেছিলো সে বর্ণনা খলিফা-হারুন-অল-রসিদের কাছে দেয়নি জুবেদা। দেয়নি অথবা দিতে পারেনি, সে কথা জানি না। অল্প অল্প কথাবার্তা শেষে বাকী রাতটায় সে কি পেয়েছিলো অথবা পায়নি তা তার জবানীতে বলা হয়নি। আপনি অনুমান করে নিন, কী ঘটতে পারে!

সকালবেলায় দেখা গেলো, জুবেদা সেই যুবকের পায়ের কাছে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

এবার জুবেদার জবানীতেই কাহিনী শুরু করি ঃ

সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গতেই উঠে পড়লাম। প্রাসাদের মূল্যবান, ধনরত্ন, যতটা পারলাম পোঁটলা বেঁধে নিলাম। শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে ফিরে এসে দেখি কাপ্তেন, আমার দিদিরা আর কুলিকামিন সবাই দারুণ উৎকণ্ঠায় বসে আছে। আমাকে দেখে হাসি ফুটলো তাদের মুখে। দিদিরা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছিলো তোর। কাল ফিরলি না কেন? আর এ কে?

আমি বললাম, এ হচ্ছে এখানকার বাদশাহর ছেলে। আমাদের সঙ্গে বাগদাদে যাবে। আমার সঙ্গে থাকবে। ঘর বাঁধবো আমরা।

তারপর গতকালের আদ্যোপান্ত সব কাহিনী বললাম তাদের। কাপ্তেন এবং আমার জাহাজের কর্মচারীরা মহা খুশী হলো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম আমার দুই দিদির মুখের হাসি

মিলিয়ে গেলো। এতো ধন-দৌলত এবং তার সঙ্গে সুন্দর সুপুরুষ এক শাহজাদা জোগাড় করে এনেছি দেখে খুশি হতে পারলো না তারা।

জাহাজ ছেড়ে দিলো। শাহজাদা আমার কাছ ছাড়া হয় না। সারা দিন-রাত আমরা ভালোবাসার সায়রে গা ভাসিয়ে থাকি। আমার দিদিরা হিংসায় জ্বলতে লাগলো। দু' দুবার শাদী করে সংসারী হওয়ার সাধ করেছিলো তারা। কিন্তু বিধি বাম। কপালে নাইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী।

এমন সুন্দর সুপুরুষ শাহজাদা তারাও আশা করেছিলো জীবনে। কিন্তু তার বদলে জুটেছিলো ঠগ প্রতারক জংলীজানোয়ার। দুই বোন মিলে ফন্দী আঁটতে লাগলো। খতম করতে হবে আমাদের দু'জনকে। তাহলে বুকের জ্বালাও জুড়াবে, আবার আমার ধনদৌলতও সব হাতানো যাবে। আমি কিন্তু তখন অন্য জগতে। ভালোবাসার এমন মধুর স্বাদ এর আগে তো কখনও পাইনি। তাই আমরা দু'জনে তখন একান্ত আপন হয়ে এই সব হিংসা দ্বেষের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছি। নিকষিত হেম আমাদের প্রেম তখন সমাজ সংসার ছাড়িয়ে ইন্দ্রলোকের অমৃত আহরণে ব্যাকুল।

হাওয়া আমাদের অনুকূল। জাহাজ চলেছে। সমুদ্র শান্ত। চিন্তার কোন কারণ নাই। এমন চলতে থাকলে তাড়াতাড়িই পৌঁছে যাবো দেশে। দিনকয়েক পরে বসরাহ বন্দরে পৌঁছে গেলাম। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। জাহাজ নোঙর করা হলো। খানাপিনা সেরে সবাই আমরা শুয়ে পড়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা।

কিন্তু আমার দুই দিদি ঘুমোলো না। তারা পা টিপে টিপে আমাদের কামরায় এসে দাঁড়ালো। খুব সন্তর্পণে আমাদের ঘুমন্ত মানুষ দু'টোকে তুলে নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো। অন্ধকার রাত। সমুদ্রের জলে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। ছোটবেলায় সাঁতার শিখেছিলাম। সাঁতার কেটে কুলে এসে উঠলাম এক সময়। কিন্তু শাহজাদা—আমার ভালোবাসার কোন হদিশ করতে পারলাম না। সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম তাকে। কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না তার।

সিক্ত জামাকাপড়ে সমুদ্রসৈকতে বসে বসে বাকী রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ভোর হলে দেখলাম, ঢেউ-এর মুখে উথাল পাথাল হতে হতে জাহাজ ছেড়ে অনেক দূরে এসে গেছি আমি। এদিক ওদিক লক্ষ্য করতে করতে একটা পায়ে চলা পথ চোখে পড়লো। আশায় দুলে উঠলো মন। তাহলে জনবসতি লোকালয় আছে কাছে পিঠে। পথটা ধরে চলতে থাকি। হঠাৎ দেখলাম একটা ছোট্ট সাপকে তাড়া করে আসছে একটা প্রকাণ্ড বড় সাপ। এখনি হয়তো মেরে ফেলবে ওকে। আহা বেচারা। বড় মায়া হলো। ছোট সাপটা আমাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ছুটছে। আর বড় সাপটা ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না তাকে। কাছেই পড়েছিলো একটা পাথরের চাঁই। দু হাতে তুলে নিয়ে তাক করে ছুঁড়ে মারলাম। বড় সাপটার মাথা থেঁতলে গেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে গেলো। আর তক্ষুণি, আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে, ছোট্ট সেই সাপটা পা মেলে শূন্যে উঠে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রাত্রির সেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই আর অনিদ্রায় দেহ আর চলছিলো না। কাছেই একটা গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো দেখি আমার পায়ের কাছে বসে আছে এক হাবসী কিশোরী। কালো হলে কি হয়, দেখতে খুব সুন্দরী। মেয়েটা আমার পা টিপে দিচ্ছে দেখে অবাক লাগলো। পা দু'টো সরিয়ে নিয়ে বললাম, কে গা তুমি? আমার পায়ে হাত দিয়েছো কেন? কী হয়েছে তোমার? কী চাও?

মেয়েটি সলজ্জভঙ্গীতে বললো, আজ আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন। আমি এক জিনিয়াহ। ছোট্ট একটা সাপের রূপ ধরে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিলাম। আমার পিছনে তাড়া করে আসছিলো একটা বড় সাপ। সে আমার শত্রু, একটা জিনি। আমার উপর বলাৎকার করতে চেয়েছিলো। আমাকে ধরতে পারলে আমার সর্বনাশ করতো, তারপর মেরে ফেলতো সে। তুমি আমাকে রক্ষা করেছো। সেই কৃতজ্ঞতায় তোমার একটু উপকার করতে তখুনি আমি উড়ে গিয়ে তোমার জাহাজ থেকে তোমার দুই বোনকে উধাও করে নিয়ে এসেছি। ঐ দ্যাখো তাদের দু'জনকে যাদু করে কালো কুত্তি বানিয়ে রেখেছি আমি। তোমাকে ওরা মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। তাই আমি ওদের এই শাস্তি দিয়েছি। তুমি যদি না চাও তবে ওদের আবার যেমন ছিলো তেমনি মেয়েছেলে করে দেবো।

আমি বললাম, না, ওইরকমই থাক। কিন্তু আমার ভালোবাসা সেই বাদশাহজাদা কোথায় বলতে পারো?

মেয়েটি মুখ নিচু করলো। হতভাগ্য সে আর বেঁচে নাই। তার দিন ফুরিয়ে এসেছিলো। আল্লাহ তাকে কোলে টেনে নিয়েছেন। সাঁতার জানতো না সে। জলে পড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে তলিয়ে গেছে।

কান্নায় চোখ ফেটে জল এলো। বুকের মধ্যে হাহাকার করতে লাগলো। আমার বোন দু'টোকে, তখন মনে হচ্ছিলো ঠেঙিয়ে মেরে ফেলি। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। হাজার হলেও ওরা আমার মায়ের পেটের বোন।

হাবশী কিশোরী তখন আমার দুই বোন—সেই কালো কুত্তি দু'টোকে এক হাতে এবং অন্য হাতে আমাকে নিয়ে আকাশে উড়লো। উড়তে উড়তে এক সময় এসে নামলো আমার নিজের দেশ এই বাগদাদ শহরে—আমার বাড়ির দরজায়।

ঘরে ঢুকে দেখলাম আমার জাহাজের সব ধনদৌলত থরে থরে সাজানো আছে চারপাশে।



জিনিয়াহ জানালো, আমি যখন ঐ গাছতলায় ঘুমিয়ে ছিলাম, সেই সময়ে সে ওগুলো জাহাজ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে রেখে গেছে। জিনিয়াহ বললো, এবার আমার যাবার পালা। যাবার আগে আমি শাহেনশাহ সুলেমানের ফরমান জানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। এই দুই কুত্তিকে প্রতিদিন তিনশো ঘা করে চাবুক মারবে। যদি কোনওদিন মারতে ভুলে যাও তবে আমি ফিরে আসবো পরদিনই। এবং ওদের আবার ফিরিয়ে দেবো আগের দেহরূপ। আমি বললাম, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

সেই থেকে প্রতি রাত্রে আমি তাদের নির্মমভাবে প্রহার করি।

এই আমার দুঃখের কাহিনী, জাঁহাপনা। এবার আমার বোন আমিনাহ তার বিচিত্র কাহিনী শোনাবে আপনাকে।

এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে জুবেদার কাহিনী শুনছিলেন খলিফা হারুন-অল-রসিদ। এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, তোমার জীবনের ঘটনা বড় বিচিত্র, বড় করুণ, বড় ভালো। খুব খুশি হলাম।

আমিনা বলতে শুরু করে।—জাঁহাপনা পরম পুণ্যাত্মা, আল্লাহ আপনার সহায়।

আমার দিদি আপনাকে বলেছে, বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা কে কোথায় গেলাম। আমি আর এখানে তার পুনরাবৃত্তি করবো না।

আমি আমার মার কাছে গিয়ে বাস করতে লাগলাম। কিছুদিন পরে এক থুরথুরো

বুড়ো সওদাগরের সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে দিলো। লোকটার অনেক টাকা পয়সা ছিলো। কিন্তু শরীরে কোন সামর্থ্য ছিলো না। তবে লোভ ছিলো অনেক। বছর ঘুরলো না, দেহ রক্ষা করলো সে। তার বিশাল সম্পত্তির অনেকখানির মালিক হলাম আমি। নগদ পেলাম আশী হাজার সোনার মোহর। শাড়ী গহনা কেনার ধূম পড়ে গেলো আমার। হাজার মোহর দামের দশটা সেট দামি পোশাক বানালাম। হীরা চুনী পান্না বসানো জড়োয়া গহনা গড়ালাম। এবং আরও অনেক দামি দামি সামানপত্র কিনে সব পয়সা উড়িয়ে দিলাম দু'দিনে।

একদিন এক খুনখুনে বুড়ি এলো আমার কাছে। আগে কখনও দেখিনি তাকে। দেখতে কদাকার কুৎসিত। মুখটা একটা কুমড়োর মতো। চোখ দু'টো হোদল কুৎকুৎ। নাকটা থ্যাবড়া। একান ওকান পর্যন্ত বিস্তৃত মুখের হা। দাঁতগুলো মিশমিশে কালো ভাঙাভাঙা। নাকের উপরে একটা মস্ত আব। গলাটা মুরগীর গলার মতো সরু আর লম্বা।

আমাকে সালাম জানিয়ে বুড়িটা বললো, একটা অনাথ মেয়েকে লালন-পালন করেছি আমি। আজ রাতে তার শাদী দিচ্ছি। কিন্তু মা, বড় গরীব আমি। পয়সা কড়ি কিছু নাই। মাথার ওপর ভরসা করার মতো লোকজনও কেউ নাই আমার। তোমার গুণের কথা অনেক শুনেছি লোকের কাছে। পরের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে, আমি জানি। আমার আর কিছু বলার নাই মা। তোমার যা প্রাণ চায় আমাকে দিও। আমি খুশি হয়ে তাই মাথা পেতে নেবো। কিন্তু একটা কথা, মা, তোমাকে নিজে একবার যেতে হবে আমার গরীবখানায়। তোমার পায়ের ধুলো পেলে আমার মেয়ের কল্যাণ হবে। তবে এখন তোমাকে যেতে বলছি না। যখন রাতের বেলায় শাদী হবে। আমি তোমাকে নিতে আসবো—সন্ধ্যাবেলা। নিয়ে যাবো, আবার পৌঁছে দিয়ে যাবো তোমার দৌলতখানায়।

বুড়ির কথা মধুঢালা। কী করে বুঝবো ভিতরে তার এতো বিষ! ঘাড় নেড়ে বললাম, ঠিক আছে আমি তৈরি হয়ে থাকবো। সন্ধ্যাবেলায় এসো তুমি, যাবো।

বিকেলে হাতমুখ ধুয়ে সাজগোজ করলাম। আমার সবচেয়ে দামি সাজপোশাক পরলাম। জড়োয়ার গহনাগুলো পরে সুন্দর করে সাজালাম নিজেকে। গলায় পরলাম সাতনরী হার। হাতে বাজু, বাহুতে তাগা মাথায় টায়রা কোমরে বিছে নাকে নাকছাবি কানে মাকড়ী পায়ে মল পরে বেহেস্তের পরীর মতো। নাও, আর দেরি করো না, চলো। পাত্রের লোকজন এসে ভরে গেছে বাড়ি। সবাই তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে। তুমি না পৌঁছলে তো শাদীর কাজ শুরু হবে না।

একটা নোকরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ভিস্তিওলা রাস্তায় জল দিয়ে গেছে। মৃদুমন্দ সন্ধ্যাসমীরণ বইছে। কিছুক্ষণ চলার পর একটা বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছলাম আমরা। প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য সে বাড়ি। বৃদ্ধা কড়া নাড়লো। দরজা খুলে যেতেই ভিতরে ঢুকলাম আমরা। শাহী কায়দায় সাজানো হয়েছে গোটা বাড়িটা। বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে কড়িবর্গা থেকে। সবুজ রঙের বাতি জ্বলছে। চারদিকের দেওয়ালে সাজানো সব সমরাস্ত্র। ঢাল তলোয়ার বর্শা তীর ধনুক। মূল্যবান পর্দা ঝুলছে দরজায়। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকলাম বিশাল এক কক্ষে। সে ঘরের মনোহর রূপ আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। মন ভোলানো চোখ জুড়ানো অবাক হওয়ার মতো জিনিসপত্রে সুন্দর করে সাজানো সারা ঘরটা। পারস্য গালিচায় মোড়া মেজে। এক পাশে বহু কারুকার্য করা এক পলতে মখমলের গদীর বিছানায় শুয়ে ছিলো এক যুবতী। কী অপরূপ তার রূপ লাবণ্য। যেন মনে হয় আসমানের চাঁদ নেমে এসেছে। আমাকে দেখে উঠে বসলো সে।

—এসো ভাই, এসো। কী আমাদের সৌভাগ্য, তোমার পায়ের ধুলো পড়লো। কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ভেবে পাচ্ছি না।

নেমে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসালো।

—একটা কথা বলার জন্যে মন আমার ছটফট করছে বোন। আমার এক ভাই আছে। দেখতে সুপুরুষ। সুন্দর চেহারা। আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুন্দর সে। পয়সা কড়িও যথেষ্ট আছে। একটা শাদীর আসরে তোমাকে দেখেছে সে। তোমার রূপে পাগল হয়ে উঠেছে সেই থেকে। সেই কিছু পয়সা দিয়ে বুড়িকে পাঠিয়েছিলো তোমার কাছে। বুড়িটা অন্য একটা ফন্দী করে তোমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। অবশ্য, সেটা এমন আর কি দোষের? খারাপ কোন উদ্দেশ্য তো নাই এর পিছনে। সে তোমাকে সসম্মানে শাদী করে জীবন-সঙ্গিনী করতে চায়। এই তার অপরাধ। তা সে পাত্র হিসেবে আমার তো মনে হয় তোমার অযোগ্য হবে না। না হয়, একবার নিজের চোখে দেখেই পছন্দ অপছন্দ জানিয়ে দাও।

আমি বললাম, ঠিক আছে আমার অমত নাই।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো মেয়েটি। হাতে তুড়ি বাজাতেই সামনের একটা দরজা খুলে গেলো। এক সুদর্শন যুবক এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। তার বোন কাছে টেনে নিয়ে বসালো একপাশে।

আমি মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকি। এতো রূপ পুরুষ মানুষের হয় নাকি। যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো মনে নিমেষে মুছে গেলো। একটু পরেই ঘরে ঢুকলো মৌলভী আর চারজন সাক্ষী। একটা কাগজে শাদীর কবুলনামা লেখা ছিলো। পড়ে শোনালো মৌলভী। আমার সম্মতি নিয়ে ঐ চারজন সাক্ষী সই করলো কবুল নামায়। এর পর সবাই চলে গেলো। শুধু রইলাম আমি আমার নতুন স্বামী আর তার বোন।

সামনের টেবিলে রাখা ছিলো একখানা পবিত্র কোরান। সেখানা তুলে আমার হাতে দিয়ে সে বললো, সুন্দরী এই পবিত্র কোরান ছুঁয়ে তুমি হলফ করো, আমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষে আসক্ত হবে না কখনও।

কোরানখানা হাতে নিলাম। অকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম। 'আজ থেকে তুমি আমার স্বামী, তোমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষে আসক্ত হবো না কখনও।'

আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো সে। তার উষ্ণ আলিঙ্গনে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিলাম তখুনি। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে লাগলো। এক অনাস্বাদিত পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার সারা দেহ-মন।



বাবুর্চি খানা সাজালো। আমরা তিনজনে তৃপ্তি করে নানা ধরনের মুখোরোচক খানা খেলাম। দামি শ্যাম্পেন খেলাম একটু। গুলাবী নেশা ধরলো চোখে। রাত গভীর হতে থাকে। আমার স্বামীর বোন আমাকে আদর করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সেই রাত আমার পরম পাওয়ার প্রথম রাত। যদিও আগে আমার আর একবার শাদী হয়েছিলো, তবুও সেদিনের রাতটাই আমার কাছে এক উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। এর আগে যার সঙ্গে আমরা শাদী হয়েছিলো সে এক বিগত যৌবন বৃদ্ধমাত্র। আমার নারীত্বকে যেমন ভোগ করতে পারেনি তেমনি আমিও পাইনি কোন পৌরুষ প্রসাদ। সেদিন রাতে আমার কুমারীত্বের বিসর্জন হলো। আর সেই বিসর্জন উৎসবের হলাহল মন্থন করে প্রাণভরে পান করলাম পরিপূর্ণ এক সুধাপাত্র। মুখে মুখ,

বুকে বুক রেখে, হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে, কখনও স্বর্গে কখনও পাতালে আরোহণ করে এক ছন্দময় সৃষ্টির আনন্দে উদ্দাম হয়ে কাটালাম সারাটা রাত। আমার নারী-জন্ম সার্থক হলো।

একটা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেলো, বুঝতে পারলাম না। সুখের দিনগুলো সব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। একদিন স্বামীকে বললাম, বাজারে যেতে হবে। কিছু জামাকাপড় কেনা দরকার।

স্বামীর সম্মতি নিয়ে বুড়িকে সঙ্গে করে বাজার করতে বেরুলাম। একটা রেশমী কাপড়ের দোকানে এসে হরেক রকম বাহারী শাড়ি দেখে লোভ হলো। দোকানীকে বললাম, আপনার যা ভালো ভালো কাপড় আছে দেখান।

দোকানী অনেক দামি দামি শাড়ি বের হলো। ইচ্ছে করে, সবগুলোই নেই। খানকতক পছন্দ করলাম। দোকানি বেঁধে ছেঁদে দিলো সেগুলো। আমি পয়সা বের করে দিলাম বুড়ির হাতে। কিন্তু দোকানি দাম নিতে চায় না। বললো, আজ প্রথম আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমার দোকানে। আজ কোন দাম নেবো না। এগুলো আমার উপহার ধরে নিন।

আমি রেগে গেলাম।—সে হয় না, আপনি যদি দাম না নেন তবে ওগুলো রেখে চলে যাবো। দাম না দিয়ে নিতে পারবো না আমি।

বুড়ি বলে, নাও না মা। উনি যখন ভালোবেসে দিতে চাইছেন, নিলে ক্ষতি কী?

—ভালোবেসে? কিসের ভালোবাসা? না না, তুমি চলো এখান থেকে। দরকার নাই আমার শাড়ি।

দোকানি হাত জোড় করে পথ রুখে দাঁড়ালো। সে কি? রাগ করে চলে যাবেন? এই সামান্য কটা শাড়ি, কতই বা এর দাম। এগুলো আপনাকে উপহার দিচ্ছি। মেহেরবানী করে নিয়ে আমাকে খুশি করুন। তার বদলে আপনার একটুখানি সঙ্গ দু'টো মিষ্টি কথা আর একটা ছোট্ট চুম্বন আমি প্রত্যাশা করছি আপনার কাছে।

বুঝলাম, বদমাইশ বুড়িটার সঙ্গে দোকানির সাট আছে। শয়তানিটা ওর কাছ থেকে পয়সা খেয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। অতো সহজে নিস্তার পাওয়া যাবে না।

বুড়িটা বললো, জানো মা, দোকানি মেলাই পয়সার মানুষ। তা না হলে সামান্য একটা চুমুর বদলে এতোগুলো দামি শাড়ি কাপড় দিয়ে দিতে চায়? আর তাছাড়া বয়সেও নওজোয়ান। দেখতে খুবসুরৎ। একটা সামান্য চুমু বইতো নয়। রাজি হয়ে যাও মা, রাজি হয়ে যাও। সবে তো আজ প্রথম দিন। যদি বরাতে থাকে, দেখো, সোনাদানা-হীরে জহরতে ভরে দেবে তোমাকে।

—কিন্তু আমি যে আল্লাহর নামে হলফ করেছি আমার স্বামীর কাছে। অন্য কোন পুরুষে আসক্ত হবো না। আমার স্বামী জানতে পারলে আস্ত রাখবে না আমাকে।

—কি করে জানবে বাছা, জানবো তো আমরা এই তিনজন। আর কোন কাকপক্ষীও টের পাবে না। নাও, রাজি হয়ে যাও। আর দেরি করো না।

আমি দেখলাম নিরুপায়। বুড়ির কথাগুলো ক্রমশ অনুনয় বিনয়-এর ঢং ছাড়িয়ে অন্য সুরে বেজে উঠলো আমার কানে। এর পর 'না' করা মানে জবরদস্তি ইজ্জত খোয়ানো। অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম। রাস্তার দিকে পিছন করে দাঁড়ালাম। যাতে আমার মুখ দেখতে না পায় কেউ। নাকাব দিয়ে মুখটা ঢেকে নিলাম। আমার বোরখার তলা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিলো লোকটা। আমার মুখের কাছে মাথাটা তুলে একটা গালে চুমু খেলো একবার। একটাই চুমু খাওয়ার কথা। তাই তার মাথাটা দু হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন সে আমাকে জানোয়ারের থাবায় আঁকড়ে ধরেছে। গালটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে শক্ত করে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠি আমি। লোক জড়ো হয়ে যাবার ভয়ে কিংবা আমার প্রচণ্ড

ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছিটকে বেরিয়ে গেলো সে বোরখা থেকে। আমিও অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লাম।

যখন জ্ঞান ফিরলো দেখি, দোকানের বাইরে রোয়াকে বুড়িটার কোলে শুয়ে আছি আমি। বাঁ-গালটা কেটে রক্ত ঝরছে। বুড়ির চোখে মুখে দারুণ ভয়ের ছাপ। দোকানি দোকান বন্ধ করে পালিয়েছে। বুড়িটা বললো দুঃখ করো না মা। নসীবে যা লেখা ছিলো তাই ঘটেছে। এখন ঘরে ফিরে চলো। কিন্তু খুব সাবধান! বিমার-এর ভান করে বিছানায় পড়ে থাকবে। কাউকে দেখতে দেবে না বাঁ-গালটা। আমি ভালো মলম এনে দেবো। দেখবে দু'দিনেই দাগ মিলিয়ে যাবে।

ক্ষিপ্র পায়ে হেঁটে চলে এলাম স্বামীর ঘরে। সটান গিয়ে শয্যা নিলাম। যে আসে বলি, তবিয়ৎ খারাপ। বুকের মধ্যে দুর দুর করতে লাগলো। সবাইকেই না হয় এড়ানো যাবে; কিন্তু স্বামী? তাকে এড়াবো কি করে। কি মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে পারবো এই কলঙ্ক?

একটু পরে আমার স্বামী এলো। আমাকে শয্যাশায়ী দেখে উদ্বিগ্ন হলো খুব।

—এই তো একটু আগেও বেশ বহাল তবিয়তে বাজারে বেরুলে। এর মধ্যে শরীর খারাপ হয়ে গেলো?

আমি বলি, কই না তো, শরীর আমার ভালোই আছে।



আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনলো সে। হঠাৎ শিউড়ে উঠে প্রশ্ন করে, এ কী? তোমার গালটা কেটে ছড়ে গেলো কী করে? আহা, এতো নরম জায়গা—একেবারে সাংঘাতিক ঘায়েল হয়ে গেছে।

আমি কোনরকমে বলতে পারলাম, যখন তোমার কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম সেই সময় একটা উট পিঠে জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসছিলো। কাঠের খোঁচাগুলো এপাশে ওপাশে বর্শার ফলার মতো বেরিয়ে ছিলো। আমি অতোটা লক্ষ্য করিনি। সেই কাঠের খোঁচায় গালটা কেটে গেছে।

—বাগদাদের রাস্তাগুলো এমন গলির মতো যে, দু'টো গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে না। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। কাল সকালেই আমি দরবারে নালিশ করবো। সব শালা উট-সোয়ারগুলোকে ধরে এনে কোতল করাবো।

রাগে ফুঁসতে লাগলো আমার স্বামী। আমি শঙ্কিত হলাম।—না না, অমন কাজটি করো না। মহা পাপ হবে। তা ছাড়া ওদের কি দোষ, বলো! দোষ তো আমারই পথঘাট দেখেশুনে না চলতে পারলে খেসারৎ দিতেই হবে। আমি ছিলাম একটা গাধার পিঠে। গাধাটা তিড়িং বিড়িং করে চলছিলো। আমি ঠিকভাবে চালাতে পারছিলাম না। তাই একটা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম নিচে। একটা চেলা কাঠ পড়েছিলো মাটিতে। সেই কাঠের খোঁচায় গালটা আমার কেটে গেছে।

আমার স্বামী আরও রেগে গেলো।—যত্তোসব বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো শয়তানের বাচ্চাগুলো রাস্তায় রাস্তায় ডাংগুলি খেলবে। কাল সকালেই আমি যাবো উজির জাফর-অল-বারমাকীর কাছে। বাঁদরগুলোকে ধরে এনে কিরকম পিটানি দেওয়াই একবার দেখো।

—আমার জন্যে কি দুনিয়াশুদ্ধ লোককে মারধোর করাবে নাকি? যা ঘটেছে নেহাতই দুর্ঘটনা মাত্র। এর জন্যে কাউকে কি দায়ী করা চলে? না দায়ী করা উচিত? আমার নসীবে যা লেখা আছে তা তো আমাকে ভোগ করতেই হবে।

আমার এই অজুহাতে ভোবি কিন্তু ভুললো না। এবার সে উগ্র চণ্ডালের মূর্তি ধারণ

করলো।—চুপ কর্, হারামজাদী, বিশ্বাসঘাতিনী। মিথ্যে দিয়ে মিথ্যে ঢাকা যায় না। তুই না আমার কাছে কোরান ছুঁয়ে হলফ করেছিলি? দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।

এই বলে মেজের ওপর পদাঘাত করলো কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলো দৈত্যের মতো দেখতে সাতটা হাবশী ক্রীতদাস। তারা এসেই এক ঝটকায় নিচে নামিয়ে নিলো আমাকে। তারপর আমার স্বামীর হুকুম মতো আমাকে ঘরের মাঝখানে কার্পেটের ওপর উপুড় করে শোয়ালো। একজন আমার মাথার উপর বসে দু হাতে দু কাঁধ চেপে ধরে থাকলো। আর একজন হাবশী বসলো আমার হাঁটুর উপর। সে ধরে রইলো আমার পা দু'টো। আর তৃতীয়জন উঠে দাঁড়ালো আমার পিঠে। হাতে তার শানিত তরবারী।

এবার শুনলাম আমার স্বামীর সিংহগর্জন।—কাট্, কেটে আলাদা করে দে, ধড় আর গর্দান। নেকড়েকে দিয়ে খাওয়াবো তোমার শরীরের মাংস। শয়তানী, বিশ্বাসঘাতিনী, এই তোমার যোগ্য পুরস্কার।

আগে যদি জানতাম আমি কলঙ্কিনী তুমি।
কে জানাতো এতো প্রেম তোমার অধর চুমি॥
ক্ষমা করো খোদাতালা দোষ নিও না প্রভু।
মহব্বতের এই অপমান সইবোনাকো কভু॥

—সাদ্, চিৎকার করে আমার স্বামী, কেটে দু'খানা করে ফেল, হারামজাদীকে।

মালিকের হুকুম তামিল করতে উদ্যত করেছে সে তরবারী। এমন সময় বোধ হয় ইশারায় নিরস্ত করলো তাকে। আমাকে লক্ষ্য করে বললো, মরার আগে তোর শেষ ইচ্ছা কী বল। আমার এখানে তোর সাজপোশাক সামান-পত্র সোনাদানা টাকা পয়সা যা কিছু আছে যাকে যা দিতে চাস দিয়ে যা। তোর মতো কলঙ্কিনীর একটা কুটোও আমার ঘরে রাখবো না আমি।

মুখটা একটু উঁচু করে তুলে বললাম, আমাকে তো তুমি মারবেই। তবু একটুখানি সবুর করো, আমার কয়েকটা কথা বলার আছে, বলে যাই ঃ

যদি জ্বালিয়ে ছিলে প্রেমের শিখা
(তবে) এমন কোরে নিভিয়ে দিলে কেনো?
যদি এমনি করেই ঝরিয়ে দেবে ফুল
(তবে) আদর করে ফুটিয়েছিলে কেনো?

চিৎকার করে উঠলো আমার স্বামী।—থামাও, থামাও তোমার ন্যাকামী। প্রেম—ভালোবাসা অতো বড় বড় কথা তোমার পাপ মুখে মানায় না, বুঝলে?

আমি আবার আবৃত্তি করলাম ঃ

ভালোবাসার প্রথম পাঠ
তোমার কাছেই পেলাম।
মরবো আমি দুঃখ নাই,
রইলো আমার সেলাম॥

—ঢং দেখাবার জায়গা পেলে না? আমার কাছে প্রেমের প্রথম পাঠ নিয়েছো? কেন, তোমার সে সব পীরিতের নাগররা কি করেছে এতোদিন?

তার একথা কানে শুনলাম না। প্রতিবাদও করলাম না। বিশ্বাস করবে না। কী লাভ? শুধু তাকে মনে করিয়ে দিলাম ঃ

সোহাগ করে বলেছিলে কপোলখানি চুমি।
বিশ্ব যদি নিঃস্ব হয়—রইবো আমি তুমি॥

—যা বলেছিলাম অন্তর থেকেই বলেছিলাম। ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে। কিন্তু তার মর্যাদা বুঝলে না। আমি তোমার রূপে, তোমার মন ভোলানো মুখের কথায় ভুলেছিলাম। আজ আমার ভুল ভেঙে গেলো। তুমিই আমার মোহ কাটিয়ে দিলে।

কবির ভাষাতেই বলি ঃ

ভালোবাসায় অন্ধ ছিলাম
তুমিই আমার দিয়েছো খুলে চোখ।
মৃত্যু হলো আমার প্রেমের,
কেমন করে সইবো বলো, শোক॥
কুসুম-পেলব দেহ তোমার
খাঁড়ার ঘায়ে দুভাগ করে দেবো।
মরবে তুমি—বাঁচবে তুমি;
সকল দুঃখ পাঁজর পেতে সবো॥

আমার চোখ জলে ভরে এলো। এতো অবিশ্বাস, এতো সন্দেহ! কিন্তু যে ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্যে আমি কতটুকু দায়ী? সবই নিয়তি। আমি তো এ সর্বনাশ আমার চাইনি। ঐ শয়তানী বুড়িটাই তো আমাকে কলঙ্কের মুখে ঠেলে দিলো? তাই আমার অমন ভালোবাসার স্বামী আজ এতো নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে। সে কি সব ভুলে গেছে? কত প্রেম কত ভালোবাসা?

তোমার উদ্দাম প্রেম, উচ্ছল যৌবন,
আমার সুখের নীড়—স্বর্গ-উপবন,
ভুলে গেছো সব প্রিয়? কত ভালোবাসা
কি করে বোঝাই বলো! মুখে নাই ভাষা।

—থাক থাক, আর বুঝিয়ে কাজ নাই, অনেক বুঝেছি। এবার মৃত্যুর জন্যে মাথা পেতে দাও।

মৃত্যুকে সামনে দেখেও মৃত্যুভয় আমাকে বিচলিত করেনি। শুধু ভাবতে লাগলাম, লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছে কেন সে? কী আমার অপরাধ খতিয়ে দেখলো না। এক কথায় কাজীর বিচারের মতো রায় হয়ে গেলো। মৃত্যুদণ্ড! একি তার ক্রোধ, না ছল! পুরুষের কাছে একটা মেয়ের যৌবন আর ক'দিন ভালো লাগে?

ভালোবাসার শাঁসটা খেয়ে
ছোবড়াখানা ফেলবে ছুঁড়ে,
কি আর এমন নতুন কথা!
সবাই জানে বিশ্ব জুড়ে।
তোমার প্রেমে গলদ ভরা
আগাগোড়া সবটা জাল।
রইলো আমার ভালোবাসা
তারার মতো জ্বলবে চিরকাল॥

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। হায় আল্লাহ এই কি আমার ভালোবাসার পরিণাম! আমার অনিচ্ছায় যে পাপ আমি করেছি, তার কি ক্ষমা নাই! আমি নিতান্তই বোকা-সোকা মেয়ে। অতোশতো বুঝিনি। হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেলো, জানি না। আমার মতো বোকা মেয়েরা যেন প্রেমের ফাঁদে পা না দেয়। কাতর কণ্ঠে তাকে বললাম ঃ

এই অনুনয় ওগো প্রিয়, একটি কথা রাখো,
মারার পরে গোরস্তানে এই কথাটি লিখো ঃ

'ভালোবাসা তারই সাজে হিসাব যে-জন জানে।
বোকা মেয়ের বোকা প্রেম মৃত্যু ডেকে আনে॥'

আমার স্বামী শান্ত হলো না। তুমি বোকা মেয়ে? তোমার মতো নাগর নাচানো ঘড়েল মেয়ে ক'টা আছে। এ পাপের ফল তোমাকে পেতে হবে।

ওরে পাপীয়সী নারী, কেনো করেছিলি পাপ?
দোজকে যখন যাবি—হবে নাকি অনুতাপ!

এই বলে আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। সাদ, কাটো, কেটে ধড়-গর্দান আলাদা করে ফেলো। আমি আর ওর মুখদর্শন করতে চাই না।

হাবশীটা তরবারি উঁচিয়ে ধরেছে এমন সময় সেই বুড়িটা ঢুকলো ঘরে।—দোহাই বাবা, ওকে মেরো না। ওর কোন দোষ নাই। আমি তোমার মায়ের সমান। ছোট থেকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি তোমাকে। আমার একটা কথা রাখো বাবা। ওকে আর যে শাস্তিই দাও, জানে মেরো না। এমন গোস্তাকি সে করেনি, যাতে ওকে জান খোয়াতে হবে।

ছোটবেলায় আমার স্বামীর মা মারা যায়। তখন থেকে এই বুড়ি তাকে লালনপালন করেছে। সেই আব্দারে সে আমার প্রাণ-ভিক্ষা করছে।—কম বয়েসের নওজোয়ান লেড়কী। এ বয়সে একটু আধটু ভুলচুক হয়েই থাকে, বাছা। তা একটু ক্ষমা ঘেন্না করে দাও। এবারের মতো ওকে মাফ করে দাও, বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, আর কখনও খারাপ কাজ করবে না সে। আমি চোখে চোখে রাখবো।

বুড়ির কথায় বোধ হয় কাজ হলো। গুম্ মেরে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। তারপর বললো, শুধু তোমার কথায় আজ ওকে জানে মারলাম না। কিন্তু এমন চিহ্ন এঁকে দেবো ওর শরীরে যা চিরকাল মনে করিয়ে দেবে এই বিশ্বাসঘাতকতা।

তার হুকুমে আমাকে বিবস্ত্র করা হলো। একখানা লিকলিকে বাঁশের কঞ্চি কেটে এনে সপাং সপাং করে নিজের হাতে মারতে থাকলো আমার পিঠে। কয়েক ঘা পরেই অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলাম তার পায়ের উপর। আরও কত ঘা বসিয়েছিলো তা বলতে পারবো না।

সারা রাত কিভাবে কেটেছে জানি না। সকাল বেলায় যখন জ্ঞান হলো দেখলাম, আমার নিজের বাড়ির একটা ঘরে পড়ে আছি আমি। সারা দেহ চাবুকের কষাঘাতে জর্জরিত। বেশ কয়দিন আমি উঠে দাঁড়াতে পারিনি। সারা অঙ্গে ক্ষত। অনেক মলম, অনেক দাওয়াই লাগিয়ে বেশ কিছুদিন পরে খানিকটা সুস্থ হতে পারলাম। ঘাগুলো শুকিয়ে গেলো। কিন্তু দাগগুলো মিলালো না। কাল রাতে আমার সারা শরীরে এই দাগগুলোই দেখেছেন আপনারা।

মাস চারেক পরে ঘাগুলো সব শুকিয়ে গেলো। পুরো সুস্থ হয়ে উঠলাম। একদিন পায়ে পায়ে আমার স্বামীর বাড়ির পথে এগিয়ে চললাম। কিন্তু অবাক, কে বা কারা বাড়িটা গুড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে। অতো বড় একটা প্রাসাদের মতো বাড়ি একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে। অথচ তার আশেপাশের বাড়ির এতোটুকু ক্ষতি হয়নি। পাশের অনেক লোককে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু কেউ আমার কথার জবাব দিলো না। কেউ বললো না, আমার স্বামী বেঁচে আছে কি নাই। কিংবা সে অন্য কোথাও চলে গেছে কিনা।

এরপর আমি আমার ছোট বোন ফহিমার কাছে চলে যাই। পরে ফহিমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসি আমার এই দিদি জুবেদার বাড়িতে। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে মর্মাহত হলো দিদি। তবু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, দুখ করিস নে বোন। দুনিয়ায় একটা মানুষও দেখাতে পারবি না, যে সব দিক থেকে সুখী। সুখ দুঃখ মিলে জীবন। আমাদের বাসনা সুখটাই বেশী পাই,

কিন্তু আল্লাহর বিধান তা নয়। দুঃখের ভাগটাই বেশী করে দেন তিনি। যাতে সুখের স্বাদটা আরও ভালো করে অনুভব করতে পারি।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিদি বলে, মনে কোন ক্ষোভ রাখিস নে। দুঃখ যখন এতো পেয়েছিস, এবার সবুর কর, সুখও পাবি। আমার কাছে থাক তোরা। এক সঙ্গে তিন বোন থাকবো। খাবোদাবো বেড়াবো, হাসবো, গাইবো, নাচবো। কিন্তু শাদী করবো না কেউ। কোন্ পুরুষ কি ধাঁচের কে জানে! কী দরকার ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে।

সেই থেকে আমরা আর বিয়ে শাদী করিনি। খাইদাই, মনের আনন্দে গান গাই। খাসা আছি। আমরা আমাদের কাজ কাম ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছি। আমি বাজার হাট করি—খানাপিনা বানাই। আর ছোট ঘরদোর গুছিয়ে রাখে। আর দিদি জুবেদা সে গৃহকর্ত্রী। তার কথাতেই সব চলে।

কোন পুরুষের সঙ্গ ছাড়াই দিব্যি দিন কাটছিলো আমাদের। অনেক কাল বাদে ঐ কুলীছেলেটা এসেছিলো বাজারের মোট নিয়ে। তাকে নিয়ে বেশ হৈহল্লা করে কেটে গেলো সারাটা দিন। তারপর আশ্রয়হীন এই তিন কালান্দার ফকির এলো আমাদের ঘরে। তার পরেই আপনাদের আগমন। এর পরের ঘটনা তো সবই আপনাদের জানা।

এই হলো আমারে দুর্ভাগ্যের কাহিনী।

আমিনার কাহিনী শুনে প্রীত হলেন খলিফা।

এই সময়ে দেখা গেলো রজনী অতিক্রান্ত প্রায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে রইলো।

অষ্টাদশ রজনীর মধ্যভাগে আবার গল্প বলতে আরম্ভ করে শাহরাজাদ।

জুবেদা আর আমিনার কাহিনী শোনার পর তাদের ছোট বোন ফহিমা, সেই দুই কালো কুক্কুরী আর তিন কালান্দারকে খলিফার সামনে হাজির করা হলো।

জুবেদা আর আমিনার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন খলিফা। অনুলেখকরা পাণ্ডুলিপি পেশ করলো খলিফার সামনে।

জুবেদাকে লক্ষ্য করে বাদশাহ বললেন, যে জিনিয়াহ তোমার এই দুই বোনকে কুকুর বানিয়ে রেখেছে তার কোন পাত্তা জানো।

জুবেদা বললো, আমি তার ঠিকানা বলতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু দরকার হলেই সে এসে হাজির হবে আমাদের সামনে।

মাথার দু'গাছি চুল ছিঁড়ে হাতে নিয়ে খলিফাকে বললো, এই চুল দু'গাছি পুড়িয়ে দেওয়া মাত্র সে সামনে হাজির হবে জাঁহাপনা।

খলিফার হুকুমে চুলের গাছিখানা জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। আর সেই মুহূর্তে সারা দরবার মহল, সারা প্রাসাদ দুলতে লাগলো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ দেখা গেলো এক রূপ যৌবনবতী হাবশী কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে দরবারের এক প্রান্তে। জুবেদা তাকে কাছে ডাকলো। খলিফাকে বললো, এই সেই জিনিয়াহ হুজুর।

জিনিয়াহ এগিয়ে গিয়ে সালাম জানালো খলিফাকে।—আল্লাহর পয়গম্বর আপনি, আমার সালাম জানাই আপনাকে।

খলিফা আশীর্বাদ করলেন, তোমার কল্যাণ হোক।

জিনিয়াহ বললো, এই যুবতী এক সময়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো। তারই প্রতিদান স্বরূপ আমি তার কিছু উপকার করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। এই কুক্কুরী দু'টো তার দুই বোন। এরা তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলো। তাই তাদের আমি কুক্কুরী বানিয়ে

রেখেছি। আপনি যদি চান, আমি ওদের শাপমুক্ত করে আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারি।

খলিফা বললেন, আমার মনে হয় তাদের কৃতকর্মের যথেষ্ট ফলভোগ তারা করেছে। এবার এদের মুক্তি দাও। তারপর দেখছি আমিনার ব্যাপারটা। যদি তার কাহিনী সত্য হয় তবে যেমন করেই হোক, তার স্বামীকে খুঁজে বের করতে হবে আমার সারা সল্-তানিয়ৎ ঢুঁড়ে। আমার দেশে এতো অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করবো না আমি।

জিনিয়াহ করজোড়ে বললো, আপনি যা চান এখুনি করে দিচ্ছি আমি। কুক্কুরী দু'টোকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। তার আগে বাদশাহর কাছে ছোট্ট একটা কথা বলতে চাই।

খলিফা কৌতূহলী হলেন।—বলো।

আমিনার সেই অত্যাচারী স্বামীকে পলকের মধ্যেই হাজির করতে পারেন আপনি। সে আপনার খুব কাছেই থাকে।

—কে সে?

—সে আপনার পুত্র, অল-আমিন।

সমস্ত দরবার ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো। কারো মুখে কোন কথা নাই। শুধু খলিফার একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো।

একটা পাত্রে খানিকটা জল মন্ত্রপুত করে কুক্কুরী দু'টোর গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে কি সব আওড়ালো জিনিয়াহ। তারপর দেখা গেলো, ধীরে ধীরে রূপলাবণ্যবতী যুবতীর আকার ধারণ করলো ঐ কুক্কুরী দু'টি।

এতক্ষণ দরবারের কেউ কোন শব্দ উচ্চারণ করেনি। খলিফাও না। বোধ হয় জিনিয়াহর কথায় মর্মাহত হয়ে ভাবছিলেন, কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? কোন মানুষের কথা হলে অবিশ্বাস করার কারণ অবশ্যই ছিলো। প্রমাণপত্রের প্রয়োজন হতো। কিন্তু এতো জিনিয়াহর কথা। ওরা তো সর্বজ্ঞ। ইচ্ছা করলেই সব কিছু জানতে পারে। পুত্রকে ডেকে পাঠালেন খলিফা। অল-আমিন এলে কৈফিয়ৎ তলব করলেন তিনি।

নিজের কোলে ঝোল টেনে মোটামুটি কাহিনী বিবৃত করলো সে। সে কাহিনী থেকে তাকে খুব একটা দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। যাই হোক, খলিফা তলব করলেন মৌলভীকে। তৎক্ষণাৎ হাজির হলো মৌলভী। শাদীর কবুলনামা লেখা হলো। অল-আমিনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার শাদী হলো আমিনার। জুবেদার সঙ্গে শাদী হলো প্রথম কালান্দার-এর। আর জুবেদার দুই সহোদর বোনের সঙ্গে শাদী দেওয়া হলো অন্য দুই কালান্দারের। আর খলিফা নিজে গ্রহণ করলেন ছোট বোন কুমারী ফহিমাহকে।

খলিফা হারুন-অল-রসিদ প্রত্যেক জুটির জন্যে একটা করে প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে উপঢৌকন দিলেন প্রচুর ধনদৌলত। সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করতে লাগলো তারা।

—কিন্তু, শাহরাজাদ বলে, এ কাহিনী আপনার কেমন লাগলো জানি না, জাঁহাপনা। তবে এর পরের যে কাহিনী শোনাতে চাই তা আরও চমৎকার আরও মজাদার। কিন্তু শাহেনশাহর কি আর শোনার ধৈর্য হবে?

শারিয়ার মুচকী হাসলো, মেয়েটা তো ভারি রসিক। এমন রসের গল্প ফাঁদবে; আবার ঠুকে কথা বলবে, 'শোনার ধৈর্য হবে' কিনা। শাহরাজাদের দিকে ফিরে বলে, বেশ তো হচ্ছে। বলো, শুনি।

একদিন রাতে খলিফা হারুন-অল-রসিদ উজির জাফর অল-বারমাকীকে বললেন,

আজ রাতে শহরের ভিতরটা একটু ভালো করে ঘুরে দেখতে চাই। আমার কাছে কিছু নালিশ এসেছে। নগরপাল এবং ওয়ালিরা নাকি তাদের কাজে গাফিলতি করছে। যদি প্রমাণ পাই, তবে ওদের বরখাস্ত করবো আমি।

জাফর সবিনয়ে বললো, হুজুরের যেমন মর্জি।

খলিফা, জাফর এবং খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর শহরের পথে বেরিয়ে পড়ে। এক সরুগলি দিয়ে যাবার সময় খলিফা দেখলেন, এক বৃদ্ধ ধীবর তার মাছধরা জাল মাথায় নিয়ে চলেছে। আর স্বগতোভাবে মনের দুঃখ প্রকাশ করছে।—এতো বড় শহরে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও দু'খানা রুটি দিতে পারি না বাছাদের। কি নসীব নিয়ে জন্মেছি, খোদা। এই কি তোমার বিচার।

বৃদ্ধের কথা শুনে খলিফা এগিয়ে গেলেন। মনে হলো লোকটা অনেক দুঃখ কষ্টে দিন কাটায়। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বাবা, তোমার কীসের কারবার?

—আমি মাছ ধরে খাই, মালিক। বুড়ো হয়ে গেছি। খাটার বল কমে গেছে। কিন্তু সংসারটা কম না, বেশ বড় সড়। সেই দুপুর থেকে এখন পর্যন্ত খেটে চলেছি। কিন্তু আল্লাহর কি বিচার, এখন পর্যন্ত বাল-বাচ্চাদের মুখে দু'খানা—পোড়া রুটি যোগাবার পয়সা রোজগার হলো না। রোজ এই একই হাল। চোখের সামনে ছেলেমেয়েদের কষ্ট আর সহ্য হয় না। খোদার কাছে আর্জি জানাই আর কেন, এবার কোলে টেনে নাও।

খলিফা বললেন, আমার একটা কথা শুনবে? নদীর ধারে চলো। টাইগ্রিস-এর পানিতে একবার মাত্র জাল ফেলবে তুমি। জালে যা উঠবে আমার। আর যদি কিছু নাও ওঠে তবু তোমাকে একশো দিনার দেবো। তোমাকে দিয়ে আজ আমার ভাগ্য পরীক্ষা করাতে চাই।

বৃদ্ধ উল্লসিত হলো, এ আর এমন কি কথা, চলুন মালিক।

টাইগ্রিসের তীরে এসে জাল ফেললো বৃদ্ধ। আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনলো উপরে। মাছটাছ কিছু ওঠেনি। উঠে এসেছে একটা তালাবন্ধ বাক্স। পেল্লাই ভারি। খলিফার কাছ থেকে একশোটা দিনার নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেলো বৃদ্ধ। জাফর আর মাসরুর ধরাধরি করে বাক্সটা নিয়ে এলো প্রাসাদে। একটা চিরাগবাতি এনে আলো দেখালেন খলিফা। মাসরুর ভেঙে ফেললো বাক্সের তালাটা। ডালাটা তুলতেই দেখলো, কতকগুলো তালের পাতা। পাতাগুলো সরাতেই চোখে পড়ে একখানা কার্পেট। তারপর একখানা সাদা বোরখা। তারপর এক বীভৎস দৃশ্য—একটা মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেহাংশগুলো সাজানো আছে। শিউড়ে উঠলেন খলিফা। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। দু-হাতে চোখ ঢাকলেন তিনি। চিৎকার করে জাফরকে বললেন, আমার সলতানিয়তে এই সব কাণ্ড ঘটছে, জাফর। তোমরা কেনো আছো আমার দরবারে। কি কর তোমরা, সব অপদার্থ? এইরকম নিষ্ঠুরভাবে মানুষ মানুষকে খুন করছে। আর তোমরা আমাকে বোঝাচ্ছো, এমন ন্যায় বিচারের দেশ আর হয় না। যত্তো সব ধোঁকাবাজী। শোনো, জাফর, তোমাকে তিন দিনের সময় দিচ্ছি আমি। তার মধ্যে যদি এই খুনীকে ধরে না আনতে পারো তা হলে তোমার প্রাণ যাবে। ঐ যে দেখছ দরবারের সিংদরজা—ওই দরজার পাল্লায় পেরেক দিয়ে গেঁথে মারা হবে তোমাকে। আর শুধু তোমাকে না, তোমার বংশের যত মেয়েপুরুষ আছে সবাইকে এনে কোতল করা হবে। তোমার বংশ আমি নির্বংশ করে দেবো। যাও, তিন দিনের সময় দিলাম। তার মধ্যে খুনীকে খুঁজে বার করো। এতো বড় একটা অপরাধ নিজের চোখে দেখে চুপচাপ সহ্য করতে পারি না আমি। এর বিহিত করতেই হবে আমাকে। তা না হলে আল্লাহর দরবারে শেষ বিচারের দিনে কী জবাবদিহি করবো আমি?

বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরে আসে জাফর। এতো বড় একটা শহর। কে কোথায় কাকে খুন করেছে কী করে তার হদিশ মিলবে। যে খুন করেছে সে কি সেধে এসে বলবে, আমি

খুন করেছি? আর যে খুন করে, সেকি কোন সাক্ষীসাবুদ রেখে করে? আর যদি কারো চোখেই পড়তো তা সে তো নিজে থেকেই দরবারে এজাহার দিয়ে যেতো। এখন শুধু-মুদু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কোন ফয়দা আছে? একি গরুছাগল হারিয়েছে—যে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় পাওয়া যাবেই। আর বিনা কারণে যাকে তাকে সন্দেহ করে ধরে আনাও তো ঠিক না। কারণ এ বিচারের একমাত্র সাজা প্রাণদণ্ড। তা সন্দেহ করে কোন লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া তো উচিত হবে না। আবার খালি হাতে গেলেও নিস্তার নাই। খলিফার মুখ থেকে একবার যে কথা বেরিয়েছে তার নড়চড় হবার জো নাই। উভয় সংকটে পড়লো জাফর। একদিকে তার নিজের এবং পরিবারের প্রাণ সমস্যা—অন্য দিকে কোন নিরীহ লোকের জীবননাশের আশঙ্কা। অনেক ভেবে চিন্তে জাফর ঠিক করলো, যায় যাক প্রাণ, তবু সে মিথ্যাচার করতে পারবে না। যাকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাড়ি-কাঠে ঢুকিয়ে দেবার পাপ সে কিছুতেই করবে না।

তিন দিন কেটে গেলো। জাফর চিন্তায় জর্জরিত। দেহটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে এলো দরবারে। মৃত্যু অবধারিত। সে জন্যেও সে ভীত নয়। তার শুধু চিন্তা তার পরিবারের চল্লিশজন নিরপরাধী ছেলেমেয়ে নারীপুরুষেরও প্রাণ যাবে আজ তারই কারণে। এই পাপই বা সে রাখবে কোথায়। চিন্তায় চিন্তায় জাফরের শরীর আধখানা হয়ে গেছে এই তিন দিনে।

চার দিনের দিন সকালবেলায় দরবারে এলো জাফর। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, খুনীর হদিশ পেয়েছো?

জাফর বলে, কেউ কি সেধে এসে আমাকে ধরা দিয়ে বলবে, সে খুন করেছে। আর সারা শহরে কোথায় খুঁজবো? না আমি হাত গুণতে জানি? না, লোকের মুখের চেহারা দেখে বোঝা সম্ভব?

জাফরের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো খলিফা। তোমার কোন ওজর শুনতে চাই না। আমি তোমাকে শূলে দেবো।

জল্লাদকে ডেকে হুকুম দিলো, জাফরকে দরবারের সদর দরজার পাল্লায় শূলে গেঁথে হত্যা করবে। তার আগে সারা শহরে ঢ্যাড়া পিটিয়ে আমার এই ফরমান জারি করে দাও। যারা দেখতে চায় আসতে পারে।

খলিফার এই হুকুমনামায় শঙ্কিত হয়ে উঠলো শহরবাসী। তার মতো জ্ঞানীগুণী সজ্জন মানুষকে হত্যা করার কী কারণ ঘটতে পারে, কিছুই বুঝতে পারলা না কেউ। প্রতি ঘরে প্রতি জনে নানারকম জল্পনা করতে লাগলো। কেউ বললো, আহা বড় ভালো লোক ছিলো। কেউ বলে, অমন ইমানদার লোক আজকালকার দিনে হয় না। কেউ অনুমান করার চেষ্টা করে, নিশ্চয়ই এমন কোন মারাত্মক গোস্তাকি করেছে—যার জন্যে খলিফা ক্ষেপে আগুন হয়ে বারমাকী বংশ নির্বংশ করে দিচ্ছে।

সারা শহর ভেঙে পড়লো প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। এমন দৃশ্য দেখবে তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। কান্নার রোল উঠলো। এমন একটা সাচ্চা আদমী আজ শূলে যাবে! যেন তাদের কোন আপনজন হারাতে বসেছে তারা। জাফর, আর তার পরিবারের সবাইকে সকলেই ভালবাসতো। তাদের আচার ব্যবহার, দয়াদাক্ষিণ্য সকলের মন কেড়ে নিয়েছিলো।

শূলে বিদ্ধ করার সব আয়োজন শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা—খলিফার হুকুমের। হঠাৎ একটা সোরগোল পড়ে গেলো। এক যুবক ভীড় ঠেলে খলিফার একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। মাটিতে দু-হাত ছুঁইয়ে কুর্নিশ জানালো খলিফাকে। তারপর বললো, আপনি আল্লাহর পয়গম্বর দীনদুনিয়ার মালিক, আপনাকে আমার একটা কথা বলার আছে।

—কী কথা?

আপনি জাফর সাহেবকে বিনা দোষে হত্যা করবেন না। আমিই সেই আসামী। আমিই ঐ মেয়েটাকে খুন করে টাইগ্রিসের জলে ফেলে দিয়েছিলাম। ওঁকে রেহাই দিয়ে আমাকে হত্যা করুন, জাঁহাপনা। ওঁর কোন দোষ নাই।



যুবকের কথা শুনে জাফরের অন্তর ব্যথায় টনটন করে ওঠে। আহা, বেচারা। কিন্তু নিজের পক্ষে যে এটা কত বড় আনন্দের খবর তা সে ভুলেই গেলো। যুবকের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ শোনার জন্য প্রশ্ন করতে যাবে এমন সময় পিছন থেকে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলো সামনে।

—ওর কথা বিশ্বাস করবেন না, হুজুর। ও সব বানিয়ে বলছে। আসলে খুন করেছি আমি। শাস্তি যা দেবার আমাকে দিন, হুজুর। যুবক তখন প্রতিবাদ করে বলে, উজির সাহেব, লোকটার বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে। আপনি ওর কথা শুনবেন না। যেমন আপনার ইচ্ছে সেইরকম শাস্তি আমাকে দিন; আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

বৃদ্ধ তখন যুবকের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, বাবা, তোমার বয়স কম; আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আজ বাদে কাল মরে যাবো। কেন বাধা দিচ্ছো। আমার এই বরবাদ হয়ে যাওয়া জানটার বদলে তোমার, উজির-সাহেব আর তার পরিবারের সকলের জান যদি বাঁচে তাতে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী সুখী হবে না। তুমি বাধা দিও না, সরে যাও। জাঁহাপনা আমি আবার বলছি, আমিই সেই খুনী। আমাকে শাস্তি দিন।

খলিফা হারুন-অল-রসিদ মহা ফাঁপরে পড়লেন। এ আবার কি অদ্ভুত কথা। জাফরকে বললেন, ওদের দু'জনকেই শূলে চাপাও।

জাফর বললেন, কিন্তু একজনের অপরাধে দু'জনের প্রাণদণ্ড—এ যে ঘোরতর অবিচার হবে, জাঁহাপনা।

যুবক তখন চিৎকার করে বলতে থাকে, এই চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা যার হুকুমে কাজ করে সেই পরম পিতা আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, খুন আমি করেছি। এবং তার প্রকৃত প্রমাণ আমি খাড়া করতে পারি।

এই বলে যুবক কী করে মেয়েটাকে খুন করেছিলো তার আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করলো। যুবকের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো খলিফার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী করে খুন করেছিলে তাতো শুনলাম। কিন্তু কেন খুন করেছিলে, সে কথা বলতো! আর খুন করে সব প্রমাণপত্র লোপাট করার জন্যে যদি লুকিয়ে ছুপিয়ে লাশটাকে নদীর পানিতেই ডুবিয়েই দিয়েছিলে, তবে আর নিজে থেকে এসে ধরাই বা দিলে কেন? কী ব্যাপার?

যুবক তখন বলতে থাকে। তবে শুনুন জাঁহাপনা, এই মেয়েটি আমার শাদী করা বিবি। এই বৃদ্ধ তার বাবা—আমার শ্বশুর। অনেক দিন আগে আমাদের শাদী হয়েছে। একসঙ্গে ঘর করেছি সুখে দুঃখে। আমার তিনটি সন্তানের মা সে। আদর্শ ঘরণী হিসাবে কোন খুঁত ছিলো না তার। আমি তার স্বামী—আমার ওপর তার গভীর ভালোবাসা ছিলো বরাবরই।

এই মাসের গোড়ার দিকে সে অসুখে পড়ে। আমার সাধ্যের অতীত নামকরা হেকিমকে দিয়ে দেখালাম। দাওয়াই পত্র খাওয়াতে লাগলাম। আমার দোকান-পাট মাথায় উঠলো। বিবির বিমার আর সারতে চায় না। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো সে। কয়েকদিন বাদে জ্বরের প্রকোপটা একটু কমলো বটে, কিন্তু একেবারে ছেড়ে গেলো না। মুখে রুচি নাই। কিছুই খেতে পারে না। ঘুসঘুসে জ্বর প্রায় সারাদিন লেগেই থাকে।

একদিন আমাকে বললো, কিচ্ছু খেতে রুচছে না মুখে। যদি পারো ভালো দেখে আপেল পাও তো নিয়ে এসো।

কিন্তু সারা বাজার ঢুঁড়েও কোন ভালো জাতের আপেল পেলাম না একটা। পাওয়া গেলো না, পাওয়া যাবে না একথা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না তার কাছে। তখন আমার একমাত্র চেষ্টা, কী করে তাকে ভালো করা যায়, কী করে তাকে খুশি রাখা যায়, কী করে তার মুখে একটু হাসি ফোটানো যায়।

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, কাল সকালে আপেলের বাগানে যাবো। যদিও এটা আপেলের মরশুম না, তবু কোন কোন গাছে দু-চারটে আপেলও তো ধরতে পারে।

ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়লাম। অনেকগুলো বাগানে ঘুরলাম। কিন্তু না, কোন গাছেই আপেল নাই। শেষে এক বাগানের বৃদ্ধ মালিক আমাকে বললো, এ সময়ে আপেল পাওয়া খুবই মুসকিল বাছা। এ তল্লাটে কোথাও পাবে না। একমাত্র পাওয়া গেলেও যেতে পারে—যদি বসরাহর বড় বাজারে যাও। ওখানে কিছু ফল আসে। তবে শুনেছি, সে আপেল সাধারণ লোকের খাবার জন্যে বিক্রী হয় না। সবই চলে যায় খলিফার প্রাসাদে।

বাড়ি ফিরে এসে বিবিকে বললাম সব কথা। শুনে সে নির্বিকারভাবে বললো, পাওয়া যখন যাবে না,—তুমি আর কি করবে।

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেলো। ঠিক করলাম, বসরাহর বাজারেই যাবো। পনেরো দিনের পথ। পথের শ্রান্তির কথা ভুলে গেলাম। আল্লাহর নাম নিয়ে বসরাহর পথে পা বাড়ালাম।

বরাতের জোরে তিনটি আপেল জোগাড় হলো। ইনাম মোট তিন দিনার। তা হোক। বিবির যদি মুখে রুচি ফিরে আসে তা হলেই আমার এতো পরিশ্রম, এতো দাম দিয়ে কেনা সার্থক হবে।

মনে বড়ো আশা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আপেল কটা দেখে নিশ্চয়ই সে খুশি হবে। কিন্তু না, আপেল তিনটে হাতে করে নিয়ে একপাশে রেখে দিলো সে। বোধ হয় শরীরটা আবার বেশি খারাপ হয়েছে। আমিও মুসড়ে পড়লাম। পরে শুনলাম, আমি যে দিন বসরাহর বাজারে আপেল সওদা করতে রওনা হয়ে গিয়েছিলাম সেই দিনই আবার কাঁপিয়ে জ্বর এসেছিলো তার। গতকাল থেকে একটু কম।

আমার আর দোকান-পাট খোলা হলো না। বিবির শয্যাপার্শ্বে বসে রইলাম এক হপ্তা। এই ক'দিনের দাওয়াইপত্র আর আমার অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় একটু ভালোর দিকে মনে হলো। আল্লাকে স্মরণ করে দোকানে গিয়ে বসলাম পরদিন।

ঠিক দুপুর বলা যায় না তখনও—দেখলাম একটা নিগ্রো ছোঁড়া একটা আপেল এক হাত দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে অন্য হাতে লুফতে লুফতে এগিয়ে চলেছে।

—ও ভাই, শুনছো, নিগ্রো ছেলেটাকে ডাকলাম আমি। আচ্ছা বলতে পারো, এই অসময়ে এই আপেলটা কোথায় পেলে তুমি?

—আমার পিয়ারীর কাছ থেকে পেয়েছি, কেন?

—পিয়ারী, কে তোমার পিয়ারী? কোথায় থাকে সে?

নিগ্রো যুবকটা বেশ গর্বের সঙ্গেই জবাব দেয়, ঐ যে তাঁতীপাড়ায় ঢুকতে একটা ছোট্ট তালাও আছে না? সেই তালাও-এর পশ্চিম পাড়ের যে জাফরানী রঙের বাড়িটা—সেই বাড়ির একটা মালিকের বিবি আমার ভালোবাসা। লোকটা এমন হাঁদা কিস্‌সু বোঝে না। বিবি-অন্ত প্রাণ। ব্যাটা মেয়েমানুষের কথায় ওঠ্ বোস্ করে। ওর বিবিটার আজ মাস-খানেক বিমার। আহাম্মকটা পনেরো দিনের পথ হেঁটে বসরাহর বাজারে গিয়েছিলো আপেল আনতে। মনে আশা, যদি সে খুশি হয়। আমি আজ গিয়ে দেখি ওর বিছানার পাশে তিনটি আপেল। আমাকে এটা খেতে দিলো।

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগলো। আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, সেই মুহূর্তে মনে হলো সারা দুনিয়াটা মিথ্যে মস্ত বড় একটা ধাপ্পা। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। এই বিশ্বসংসার সব অন্ধকার হয়ে গেলো আমার চোখের সামনে। ক্রোধে উন্মত্ত এক সিংহের মতো ছুটে এলাম বাড়িতে—আমার বিবির ঘরে। হাতে আমার শাণিত ছোরা। কোন প্রশ্ন করলাম না, কোন কিছু জানতে চাইলাম না। শুধু একবার তাকিয়ে দেখলাম, আজ সাতদিন ধরে যেখানে তিনটি আপেল রাখা ছিলো সেখানে আজ দু'টি আছে—আর একটা নাই। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেলো জানি না, দেখলাম আমার ছুরিটা আমূল বসে গেছে আমার বিবির বুকে। এক অসহায় আর্তনাদ করে থেমে গেছে তার বুকের স্পন্দন—চিরদিনের মতো।



যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো, ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেলো। আমি খুন করে ফেলেছি। আমার ফাঁসী হবে। আতঙ্কে শিউড়ে উঠলাম। এখন কি করা যায়? হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এসে গেলো। ক্ষিপ্র হস্তে খাটের তলা থেকে একটা বাক্স টেনে বের করলাম। বিবির হাত, পা, ধড়, মুণ্ডু সব টুকরো করে কেটে বাক্সটায় ভরলাম। কার্পেট আর ওর বোরখাটায় রক্ত লেগে গিয়েছিলো। ও দু'টোও বাক্সে ভরে তালের পাতা দিয়ে ঢেকে বন্ধ করে দিলাম ডালাটা। একটা তালা এঁটে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম টাইগ্রিসের জলে।

যুবক থামলো একটু। তারপর কাতর অনুনয় জানিয়ে বললো, আপনি ন্যায়বিচারক, আল্লার পয়গম্বর, আপনার কাছে আমার আর্জি, যতো তাড়াতাড়ি হয় আমার প্রাণদণ্ড মঞ্জুর করুন। তা না হলে আল্লাহর দরবারে আমাকে আরও কঠোর সাজা পেতে হবে।

আমি যখন টাইগ্রিসের জলের তলায় বাক্সটা ডুবিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম দেখি, আমার বড় ছেলেটা দরজার সামনে বসে আকুল নয়নে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে, কাঁদছিস কেন?

কাঁদতে কাঁদতে ও বলতে থাকে, মায়ের বিছানার পাশ থেকে একটা আপেল নিয়ে গিয়েছিলাম খেলা করতে। মা টের পায়নি। ঘুমিয়েছিলো। ভেবেছিলাম খেলাটেলা শেষ করে আবার ওখানে রেখে আসবো। কিন্তু পথ দিয়ে যাচ্ছিলো একটা তাগড়াই নিগ্রো। আমার গালে দু'টো থাপ্পড় দিয়ে আপেলটা কেড়ে নিয়ে দু-হাতে নাচাতে নাচাতে চলে গেলো। লোকটা কী জাঁদরেল। বাবাঃ দেখলে পিলে চমকে যায়।

ওর কথায় বুঝলাম, আপেলটার জন্যে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে সাহস করেনি। সদর দরজার ওপর বসে কাঁদছিলো। আহা বেচারী, ওর মা যে আর এ জগতে নাই, সে খবরও জানে না।

ছেলের কথায় বুঝলাম, যে ভুল আজ করলাম তার আর কোন চারা নাই। হারামজাদা নিগ্রোর বাচ্চা—একেবারে ডাঁহা মিথ্যা কথা বলে গেছে। বিবির কোনও দোষ ছিলো না। একটা নিষ্পাপ মেয়েকে খুন করার পাপ বোধ দংশন করতে লাগলো আমাকে। আমি আর আমার এই শ্বশুর সারা রাত ধরে কাঁদলাম।

আজ পাঁচদিন হলো আমি খুন করেছি আমার আদরের বিবিজানকে। পাঁচটা রাত ঘুমুতে পারিনি। মনের শোকতাপ প্রকাশ করতে পারিনি কারো কাছে। পারলেও বা কিছুটা

হালকা হতো বুকের জ্বালা। অপরাধী আমি, আমার শাস্তি একমাত্র মৃত্যু। আপনি আমার ভাগ্যবিধাতা, আল্লাহর পয়গম্বর। আপনার কাছে আমার একটাই আর্জি, আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি হয় শূলে দিন। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন আমাকে।

খলিফা বিস্ময়ে হতবাক। কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। তারপর চিৎকার দিয়ে উঠলেন, আমি ওই বদমাইশ নিগ্রোটাকে শূলে দেবো। এতো বড় একটা সর্বনাশ সে করেছে?

এই সময় প্রভাত সমাগত দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করলো শাহরাজাদ।

তারপর শুনুন শাহজাদা, শাহরাজাদ আবার উনিশতম রজনীর দ্বিতীয়যামে গল্প শুরু করলো, খলিফা দেখলেন, যুবকের কোন দোষ নাই। যত নষ্টের মূল ঐ নিগ্রোটা। বললেন, আমি ঐ নিগ্রোটাকে শূলে চড়াবো, ধরে নিয়ে এসো তাকে। তাকে যদি ধরে আনতে না পারো জাফর, তাহলে তোমাকেই শূলে চাপাবো আমি।

জাফর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গেলো।—কোথায় পাবো তাকে। কোথায় থাকে সেই নিগ্রো—কে তার হদিশ দেবে? এ যাত্রায় যদি বা বাঁচলাম, কিন্তু এর পরে বোধহয় বাঁচার আর কোন আশা নাই। এখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে।

তিন দিন আর বাড়ি থেকে কোথাও বের হলো না। মনে মনে ভাবে এই তিন দিনে যদি খলিফার রাগ পড়ে যায়। যদি তিনি তাকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু লোক মারফৎ খবর পাওয়া গেলো খলিফা প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। জাফর নিগ্রোটাকে ধরে নিয়ে যাবে। আর তিনি তাকে শূলে চাপাবেন। আর যদি ধরে না নিয়ে যেতে পারে তবে তার মরার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন তিনি।

কাজীকে ডেকে পাঠালো জাফর। তার বিষয় সম্পত্তির উইল বানালো। বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরবারে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো। একে একে সবাইকে আদর জানালো। সব শেষে সবচেয়ে ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতে যাবে এমন সময় ওর কামিজের পকেটে কি একটা গোলাকৃতি বলের মতো বস্তু অনুভব করলো সে। অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে জাফর জিজ্ঞেস করলো, তোমার জেবে কী, বেটী?

—একটা আপেল আব্বাজান, আপেলটা বের করে দেখালো সে।—দিন চারেক আগে আমাদের নিগ্রো নফর রেহান আমাকে কোথা থেকে এনে দিয়েছে।

'নিগ্রো' এবং 'আপেল'এই শব্দ দু'টো শুনে কেমন যেনো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো জাফরের মুখ। এক মুহূর্ত। তারপর এক অদ্ভুত আনন্দে নেচে উঠলো তার সারা দেহ মন। তক্ষুণি ডেকে পাঠালো তাকে। রেহান এলে জিজ্ঞেস করলো, এই আপেলটা কোথায় পেয়েছিলি রে?

নিগ্রোটা বললো, আজ্ঞে মালিক, ক'দিন আগে পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখি, কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে। একজনের হাতে ছিলো এই আপেলটা। আমি ওকে দু'টো থাপ্পড় দিয়ে কেড়ে এনেছিলাম। আমাদের খুকুমণির জন্যে। ছেলেটা কেঁদে উঠে ফেরৎ চেয়েছিলো আমার কাছে। 'নিও না, ফেরৎ দিয়ে দাও ওটা। আমার মা আমাকে খুব বকবে। তার ভীষণ অসুখ। বাবা সেই বসরাহর বাজার থেকে তিনটি আপেল কিনে এনেছে মার জন্যে। মা একটাও খায়নি। আমি একটা চুরি করে এনেছি। ফেরৎ দিয়ে দাও আমাকে, তোমার দু'টো পায়ে পড়ি। না হলে মা আমাকে মারবে।' আমি কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে লুফতে লুফতে চলে এলাম। আমার তখন মনে ঘুরছে, খুকুমণি আপেলটা পেলে খুব খুশি হবে।

জাফর বড় সমস্যায় পড়লো। তার নিজের গৃহভৃত্য এর সঙ্গে জড়িত। ব্যাপারটা কেউ ভালো চোখে দেখবে না। কিন্তু হতভাগাটা একি কাণ্ড করে বসেছে। এই হ্যাপা এখন কী

করে সামাল দেবে সে? খলিফার যা রাগ, তাতে তো রেহাই দেবে বলে মনে হয় না। যাক, ভেবে আর কী হবে? রেহানকে বন্দী করে দরবারে নিয়ে এলো সে।

জাফর ভাবে, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে দু-দুবার কীভাবে সে রক্ষা পেলো। একেই বলে আল্লাহ যাকে বাঁচাবেন, মারবে কার সাধ্য?

প্রাসাদে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললো খলিফাকে। খলিফা শুনে তো অবাক।—এমন অদ্ভুত ব্যাপার তো জীবনে কখনও শুনিনি। সামান্য একটা তুচ্ছ ঘটনা একটা মানুষের জীবন নাশের কারণ; সে কথা কি ভাবতে পারে কেউ?



জাফর বলে, তাই হয় জাঁহাপনা। কোন একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাই অনেক বিরাট বড় একটা ঘটনার মূলসূত্র হতে পারে। সবই আল্লাহর খেলা। সবই নিয়তি। তা না হলে বেচারী যুবকটাই বা তার অতো পেয়ারের বিবিকে বিনা দোষে খুন করতে যাবে কেন? ওর হাতে ওর বিবির মৃত্যু নিয়তির লেখা ছিলো। ঐ আপেল আর নিগ্রোটার বোকামী সবই উপলক্ষ মাত্র। যাই হোক আপনাকে আমি এর চেয়েও অবাক করার মতো কাহিনী শোনাতে পারি জাঁহাপনা। উজির নূর-অল-দীন আর তার ভাই সামস্-অল-দীন-এর কাহিনী—আপনি শুনেছেন?

—না। কী সেই কাহিনী, শোনাও দেখি। জাফর বললো, বলবো নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা আর্জি—ঐ বেচারী নিগ্রোটাকে আপনি রেহাই দিন।ওটা একটা বোকা পাঁঠা। কিসে থেকে কি ঘটতে পারে সে চৈতন্য ওর নাই। ওর বোকামীর ফলে যা ঘটে গেছে তা আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু এও ঠিক, খুন করার জন্যে খুন করা, আর তার অজ্ঞাতসারে বোকামীর জন্যে কেউ খুন হয়ে যাওয়া এক নয়। ও জানেও না ওর একটা মিথ্যে কথা বলার জন্যে কী ঘটে গেছে। তাই আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি ওর দোষ মাফ করে দিন। আমি আপনাকে আরো অদ্ভুত, অবাক করার মতো কাহিনী শোনাচ্ছি।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে আমি ওকে রেহাই দিয়ে দিলাম। সত্যিই তো, এই গুরুদণ্ড পাওয়ার মতো গোস্তাকি সে করেনি।

এক সময়ে মিশরে পরম দয়ালু ধর্ম পরায়ণ এক সুলতান প্রজাপালন করতেন। তার এক উজির ছিলো নানা বিদ্যায় বিশারদ। চাঁদের মতো সুন্দর দেখতে তার দুই যমজ পুত্র ছিলো। একটির নাম সামস্-অল-দীন, আর একটির নাম নূর-অল-দীন। বড়টি ছিলো যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি ছিলো তার আচার ব্যবহার। এক কথায় রূপ গুণে অসাধারণ। আর ছোটটি ছিলো আরও সুন্দর, আরো গুণবান। সারা দুনিয়ার সেরা ছেলে। মিশরে যে সব বিদেশীরা আসতো তারা অবাক হয়ে চেয়ে দেখতো তার রূপ।

উজিরের মৃত্যুর পর সুলতান সাদরে ডেকে নিলো দুই ভাইকে। তার দরবারে দু'জনকেই সমমর্যাদায় উজিরের আসন দিলো। নানা ধরনের মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে বললো, তোমরা আজ থেকে আমার দরবারে উজিরের কাজে বহাল হলে। বাবার স্মৃতির উদ্দেশে শোকপালন করে এক মাস বাদে তারা কাজে এলো দরবারে।

একদিন দুই ভাই দরবারে যাবার পথে এইরকম কথাবার্তা বলতে বলতে পথ চলছিলো :

বড়ভাই বলছিলো, এবার আমাদের বিয়ে শাদী করা দরকার। সুলতানের দরবারে পাকাপাকি চাকরী হয়ে গেলো। সুতরাং খাওয়া পরার ভাবনা তো আর থাকবে না।

তাছাড়া সময় মতো শাদী না করলে বালবাচ্চাদের মানুষ করে যাবো কী করে? তাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ভালোভাবে বিয়ে শাদী দিতে হবে। আমার মনে হয়, এখনই শাদীর প্রশস্ত সময়। আর শাদী যখন করবো—দু'ভাই একসঙ্গে একই দিনে করবো। তুমি কী বলো?

ছোটভাই নূর-অল-দীন বললো, তুমি যেরকম বলবে, তাই হবে।

বড়ভাই সামস্-অল-দীন তখন বললো, ধরো শাদীর পর একই সঙ্গে আমাদের দু'জনের দু'টি বাচ্চা হলো। আচ্ছা ধরো, আমার মেয়ে আর তোমার ছেলে হলো। তা হলে তো আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের শাদী দিতে হয়।

ছোট বললো, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বলো, তোমার মেয়ের জন্যে কী দেনমোহর দিতে হবে আমার ছেলেকে?

বড়ভাই বলে, আমি ভাবছি, তোমার ছেলের কাছ থেকে তিন হাজার সোনার দিনার নেবো। আর নেবো তিনটি খামার। আর জায়গীর নেবো তিনটি বড় গ্রাম। আমার মনে হয়, আমার মেয়ের জন্যে খুব বেশী কিছু একটা চাওয়া হবে না। অবশ্য তোমার ছেলে যদি না রাজী হয় তবে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নাই। এখানেই প্রস্তাব খারিজ করে দেবো।

ছোট ভাই বললো, ভাই-এ ভাই সম্পর্ক হবে। ওরা ভাই-এ বোনে শাদী করবে। তা এর মধ্যে যৌতুক নিয়ে অতো দর কষাকষি কি আছে, দাদা? কেউ আমরা কম নই। দু'জনেই উজির। কার কী অভাব থাকবে। আমার তো মনে হয়, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের শাদী হয়ে যাবে—এইটাই সব চেয়ে বড় কথা হওয়া উচিত। যৌতুকপত্র সেখানে নগণ্য। তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, টাকাপয়সাই যেনো সব। কি করে ধন সম্পত্তিকে রাতারাতি দু'গুণ চারগুণ করে বাড়াবে সেই সব সুদখোরদের মতো কথাবার্তা তোমার মুখে মানায় না, দাদা।

বড়ভাই বললো, তোমার কি ধারণা হচ্ছে, তোমার ছেলে আমার মেয়ের চেয়ে রূপেগুণে আরও বড়ো হবে? সে অহঙ্কার যদি করো তা হলে তোমার ছেলের সঙ্গে কিছুতেই আমি শাদী দেবো না আমার মেয়ের। তা যদি তাকে পাল্লায় ওজন করে সোনা ঢেলে দাও, তবু না। আমারটা মেয়ে বলে কি ফেল্না?

সামস্-অল-দীন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো শেষের কথাগুলো। নূর-অল-দীনও ভীষণ ক্ষেপে গেলো দাদার কথায়। বললো, আমার ছেলেও ফেল্না নয়। আমি এই বলে রাখলাম, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের শাদী দেবো না, দেবো না। ব্যাস, এখানেই সব খতম হয়ে গেলো। এ নিয়ে আর কখনও কথা হবে না।

বড়ভাই বললো, কাল সকালে সুলতানের সঙ্গে বেরুবার পালা আমার। আমি তাকে বলবো তোমার এই অসভ্যতার কথা। তারপর দেখো কি হয়?

নূর-অল্-দীন রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলো। আর কোনো কথা বললো না।

পরদিন সকালে সুলতানের সঙ্গে সামস্-অল-দীন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নীল নদের ধারে এলো। একটা পান্সি নৌকো করে ওপারে জিজা যাওয়ার ইচ্ছা করলো। জিজায় অনেক পিরামিড আছে।

এদিকে সারারাত রাগে ক্ষোভে অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোর না হতে উঠে পড়ে নূর-অল-দীন। দাদার সঙ্গে তার সেই কথা কাটাকাটি ও তার কটূবাক্যে মনটা বিষিয়ে গেছে। সে ঠিক করলো দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

তার নফরকে ডেকে বললো, আমার সেই ছাই রঙের খচ্চরটা বের করে জীন লাগা।

এই খচ্চরটা দেখতে খুব বাহারী। শখের জানোয়ার। সোনার কাজ করা মখমলের

গদি পাতা দামী জীন লাগালো নফরটা। এমন কায়দায় সাজালো যেন মনে হয় শাদী করতে যাবে কোন বর। একটা দামী রেশমী গালিচা আর একখানা কম্বল সঙ্গে নিলো। খচ্চরের পিঠে চেপে নফরকে উদ্দেশ করে বললো নূর-অল-দীন, আমি চললাম রে, তোদের দেশে আর থাকবো না।

নফরটা জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন, হুজুর?

—আগে যাবো কালিব শহরে। সেখানে দু-তিন দিন থাকবো। তোদের এই পচা শহরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটু খোলামেলা আলো-হাওয়ায় মনটা সাফা করবো সেখানে। তারপর ভাববো, কোথায় যাবো। তোদের কিন্তু বারবার বারণ করে যাচ্ছি আমার কোন খোঁজখবর করার চেষ্টা করবি না। আমি একটু একা থাকতে চাই। এই হিংসা কুটিলতা স্বার্থপরতার নোংরামি থেকে পালিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চাই।

নূর-অল-দীন রওনা হয়ে গেলো। কাইরো ছাড়িয়ে বুলবেশা-এ যখন পৌঁছলো তখন ঠিক দুপুরবেলা। খচ্চরটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। তার নিজেরও বেশ খিদে পেয়েছে। একটা সরাইখানার সামনে নেমে খচ্চরটাকে ছেড়ে দিয়ে একটু কিছু খেয়ে নিলো সে। তারপর শহরের ভিতরে ঢুকে টুকিটাকি দরকারী দু-চারটে জিনিসপত্র কিনলো।

আবার যাত্রা শুরু হয়। দু'দিন বাদে জেরুজালেমে এসে পৌঁছলো নূর-অল-দীন। পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়েছে দেহ। এবার সে গালিচা আর কম্বলটা নামিয়ে খচ্চরটাকে চরতে পাঠিয়ে দিলো। কাছেই একটা কাফে খানা। হাত মুখ ধুয়ে খানাপিনা সেরে গালিচাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলো দাদাকে। দু'জনে ঝগড়া কথা কাটাকাটি করছে। ঘুম ভাঙতেই মনটা বিষিয়ে গেলো। সংসারের নীচতা-হীনতা থেকে সরে থাকবে বলে দেশ, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে এসেছে সে। কিন্তু এতো দূর এসেও তাকে সেই চিন্তাই হনন করছে এখনও।

পরদিন সকালে আবার রওনা হয়ে পড়ে নূর-অল-দীন। কোথায় যাবে তার কোন ঠিকানা নাই। যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। সন্ধ্যে হয়ে এলো। এবার থামতে হয়। দেখলো আলেপ্পো শহরের কাছে এসে পড়েছে। একটা সরাইখানায় আশ্রয় নিলো। জায়গাটা বড় সুন্দর। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ে নূর-অল-দীন। বেশ খুশি খুশি মেজাজে ভরে যায় মন। প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখতে দেখতে তিনটি দিন কেমন করে কেটে যায় খেয়াল করতে পারে না সে। মনের প্রসন্নতা এমনই বস্তু—তার প্রসাদে বিশ্বসংসার সব সুকুমার সুন্দর মনে হয়।

আলেপ্পোর মেঠাই-মিষ্টি খুব নাম করা। ছেলেবেলা থেকেই অনেক প্রশংসা শুনে এসেছে সে। মাঝে মাঝে খেয়েছেও। বিদেশীরা এখানে এলে হাঁড়ি ভরে নিয়ে যায় নিজের দেশে। এখানকার সবচেয়ে নামকরা পেস্তার বরফী কিনলো খানিকটা। আরও নানারকম মেঠাই মণ্ডা ভরে নিলো একটা পাতিল-এ।

আবার পথযাত্রা। নিরুদ্দেশের পথে। খুশিতে নেচে উঠেছে তার মন প্রাণ। আজ আর কোন মোহ মায়া নেই তার। সে এক যাযাবর। সমাজ সংসারের দ্বন্দ্ব কোলাহল, স্বার্থ সংঘাত তাকে বিচলিত করতে পারছে না। উন্মুক্ত আকাশের পাখীর মতো ডানা মেলে দিয়েছে সে। যেদিকে যায় যাক না।

এ আর এক আনন্দের জগৎ। এ রসের স্বাদ যে পায়নি তাকে কখনও বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। বন্ধনহীন হরিণের মতো ছুটে চলার যে কি আনন্দ তা সংসার সীমাবদ্ধ প্রাণী বুঝবে কি করে?

দিনের পর দিন একটানা চলতে চলতে একদিন এসে পৌঁছলো সে বসরাহ শহরে। নূর-অল-দীন কিন্তু জানে না বসরাহয় পৌঁছে গেছে সে। চলার পথে প্রতিদিন কত ছোট বড় গ্রাম শহর পেরিয়ে চলেছে—কে মনে রাখে সে সব নাম। আর কিই বা দরকার। সে তো

আর ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার মতলব করে পথে বেরোয়নি। সে এক পথভোলা পথিক। পথ চলাতেই তার আনন্দ। অন্য কোন উদ্দেশ্য তার নাই। যা দেখলো যা জানলো তা যে সবই মনে ধরে রাখতে হবে তার কি মানে আছে। যা মনের পাতায় দাগ কাটে তা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলেও মোছা যায় না। আবার যাকে মনে ধরে রাখবো বলে অনেক চেষ্টা করা হয় তাও কখন হারিয়ে তলিয়ে যায় বুঝতে পারা যায় না।

একটা সরাইখানায় নামলো নূর-অল-দীন। খানসাহেবের কাছে জানতে পারলো , সামনেই যে শহর—ওটাই বসরাহ। নাম অনেক শুনেছে। এই প্রথম প্রত্যক্ষ করবে সে। বিরাট বন্দর। দেশবিদেশের সওদাগররা আসে এখানে বাণিজ্য করতে। বহু দূর দেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক আসে কেনাকাটার জন্যে।

খানাপিনা সেরে নূর-অল-দীন খানসাহেবকে বললো, আপনার একটা লোক দিন আমার সঙ্গে। খচ্চরটা ধরে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখবো শহরটা। ছেলেবেলা থেকে অনেক গল্প কাহিনীতে এই বসরাহর কথা পড়েছি। আজ যখন এসেই পড়েছি একবার ভালো করে দেখে যাই।

পাহাড়ী চড়াই উৎরাই পথ। কখনও বা খাড়া উপরের দিকে উঠে গেছে, আবার কখনও বা তরতর করে নিচে নেমে গেছে। খচ্চরের পিঠে চড়ে চলা নতুন লোকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু শহরের ভিতর ভাগ অতোটা উঁচুনিচু নয়। ছোকরাটা বললো, মালিক, এবার আপনি উঠে বসতে পারেন। কোন ভয় নাই। আমি লাগাম ধরে দেখে শুনে নিয়ে যাবো।

ছোকরার কথা মতো নূর-অল-দীন খচ্চরের পিঠে উঠে বসলো। ছেলেটা পাকা ওস্তাদ। এমনভাবে সামাল দিয়ে খচ্চরটাকে নিয়ে যেতে লাগলো—যাতে নূর-অল-দীনের কোন ঝাঁকানি না লাগে।

বসরাহর উজির সাহেব তখন তার প্রাসাদের গবাক্ষ পাশে বসে শহরের শোভা প্রত্যক্ষ করছিলো। হঠাৎ নজর পড়লো নূর-অল-দীনের ওপর। তার রূপ-জাঁকজমকে মুগ্ধ হলো সে। একটা নফরকে ডেকে বললো, যাতো, দেখে আয়, কে যায়, ঐ খচ্চরটার পিঠে? ডেকে নিয়ে আয় ওর সহিসটাকে।

যখন সে এলো বৃদ্ধ উজির জিজ্ঞেস করলো, তোমার মনিব কোন দেশের লোক, তার পরিচয় কিছু জানো?

—আজ্ঞে তাতো বলতে পারবো না। তবে মনে হয়, খুব খানদানী ঘরের আদমী। কোনও সওদাগরের লেড়কা হতে পারে।

—এখানে কোথায় উঠেছে সে?

সহিস ছোকরা বললো, আজ্ঞে আমাদের খান সাহেবের সরাইখানায়। কী সব দামী দামী সামানপত্তর। সুলতান বাদশাহর ঘরে অমনটা দেখা যায়।

উজির আর বিশেষ কোনও কথা বললো না ছেলেটার সঙ্গে। ওর খানসাহেবের সরাইখানার ঠিকানাটা নিয়ে দু'টো দিনার বকশিস দিয়ে বললো, ঠিক আছে, যাও।

বিকেলের দিকে সেই সরাইখানার সামনে এসে থামলো উজির। খানসাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার এখানে যে বিদেশী এক যুবক এসেছে তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

উজিরকে দেখে তো খানসাহেবের দফা রফা। না জানি কি বিপদ আপদ ঘটলো। শশব্যস্ত হয়ে করজোড়ে বললো, মেহেরবানী করে আমার গরীবখানায় হুজুরের পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হোক।

কিন্তু উজির ঘোড়া থেকে নামলো না।—তুমি তাকে একবার খবর পাঠাও।

নূর-অল-দীন ছুটে এলো। আপনি নিজে কষ্ট করে কেন এলেন, জনাব? আমাকে ডেকে পাঠালেই হাজির হতাম।

—তোমাকে তো হাজির করার জন্যে নিতে আসিনি, বাবা। আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি একটু।

উজিরকে সাদর অভ্যর্থনা করে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলো নূর-অল-দীন।



প্রাথমিক আলাপ পরিচয় হলো খানিকটা। তার পরেই উজির বললো, আমাদের দেশে এসে তুমি এই নগণ্য এক সরাইখানায় পড়ে থাকবে তাতো হয় না বাবা। চলো, আর এক মুহূর্তও তোমাকে এখানে থাকতে দিতে পারি না আমি। আমার বাড়ি চলো তুমি। তার পর অন্য কথা হবে।

নূর-অল-দীনের কোন ওজর আপত্তিই টিকলো না। দু'জনে ঘোড়ার পিঠে চেপে উজিরের বাড়ি এসে পৌঁছলো তারা। যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ণ করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো নূর-অল-দীনকে। বৃদ্ধ উজির এবার প্রশ্ন করে। এবার বলো বাবা, আমাদের এই বসরাহ-তে কেন এসেছো। কোনো কাজে কামে কী?

—জী না, স্রেফ বেড়াতে। আমি আজ অনেক দিন হলো আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমি কায়রো থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আমার বাবা মিশরের সুলতানের উজির ছিলেন। সম্প্রতি তিনি গত হয়েছেন। আমরা দুভাই-ই সুলতানের দরবারে উজিরের পদে বহাল হয়েছিলাম। কিন্তু সংসারের স্বার্থপরতা নীচতা দেখে আমি অস্থির অশান্ত হয়ে উঠলাম। মনে হলো এ আমার জায়গা নয়। এখান থেকে অনেক দূরে চেনা জানার বাইরে অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে উধাও হয়ে যেতে হবে আমাকে। তাই একদিন সবার অগোচরে পথে বেরিয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে, আমি ঠিক পথের সন্ধান করেছি। সারা দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে মানুষের মেলা দেখে বেড়াবো। আর দেখবো প্রাণ ভরে আল্লাহর অপার সুন্দর সৃষ্টি—প্রকৃতির বহু বিচিত্র রূপ। এর মধ্যেই আমার জীবনের আনন্দ, পূর্ণতা খুঁজে পাবো, এই আমার বিশ্বাস।

যুবকের এই উদাস বিবাগী হওয়ার সঙ্কল্প শুনে চমকে ওঠে উজির।—বাবা, তুমি যে পথ বেছে নিয়েছো, আপাতভাবে তোমার কাছে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ মনে হলেও আসলে কিন্তু চিরদিন তোমার ভালো লাগবে না। এখন প্রথম যৌবনের রঙ আছে তোমার চোখে। দেহে আছে সামর্থ্য। পথ চলার ক্লান্তি অগ্রাহ্য করার যথেষ্ট ক্ষমতা এখন তোমার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যেদিন নিজের দেহকে মনে হবে অসহ্য, অতিরিক্ত এক বোঝা। তখন চোখেও এই রং থাকবে না। শোনো বাছা, এই দুনিয়াটা বিরাট। একটা কেন দশটা জীবনের পরমায়ু পেলেও তুমি তাকে দেখে নিঃশেষ করতে পারবে না। আমি বুঝতে পারছি তুমি সুদূরের এবং সুন্দরের পিয়াসী। তুমি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে নিজেকে হারিয়ে দাও, তাও আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু বাবা, এই অরূপরতনের সন্ধানে কি তোমাকে তামাম দুনিয়া চুঁড়ে বেড়াতে হবে। একটা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু প্রমাণ সৌন্দর্য আছে, তাকি তোমার চোখে পড়েনি? সকালবেলায় দুয়ার খুলে ঘরের বাইরে এসে যে প্রথম শিশির কণাটা চোখে পড়ে তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছো কখনও? প্রভাত কিরণের প্রতিসরণে সাতরঙা রঙে সে কি অপরূপ রূপবান হয়? তার তুল্য অপার সৌন্দর্যের সন্ধান তুমি কোথায় পাবে?

উজিরসাহেব শুধু বয়সে নয় জ্ঞানেও বৃদ্ধ। তার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সচরাচর মেলে না, সুলতানের দরবারে তার নাম যশখ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচুর। নূর-অল-দীনকে ঘরমুখো

করার জন্যেই এতো যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরে উজির। মনে বাসনা, তার একমাত্র কন্যার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিয়ে সুলতানকে ধরে তার দরবারে তাকে উজির করে কাছে রাখবে সে।

খানসাহেবের সরাইখানা থেকে নূর-অল-দীনের খচ্চর আর সামানপত্র নিয়ে আসার জন্য নফর পাঠিয়ে দিলো উজির। একখানা সুসজ্জিত কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করলো তার। উজিরের কাছে প্রতিদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আসে। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো তার। এইভাবে বেশ কয়দিন কাটে। একদিন নূর-অল-দীনের কাছে প্রস্তাব রাখলো, বাবা, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। ভাবছি আমি অবসর নেবো সুলতানের দরবার থেকে। তার আগে আমার একমাত্র কন্যার শাদী দিতে চাই। দেশবিদেশের বহু পাত্রের সন্ধানও এসেছে আমার কাছে। তাদের অনেকেই জ্ঞানে গুণে ধন-দৌলতে উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আমার কাউকেই তেমন মনে ধরেনি। নিজের মেয়ের রূপগুণের ব্যাখ্যান করতে চাই না। তা করাও ভালো দেখায় না। কিন্তু লোকে বলে, আমার মেয়ের মতো রূপ যৌবন নাকি সারা দেশে নাই। আমার যেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি আছে মেয়েকে শেখাবার চেষ্টা করেছি। তার অসাধারণ মেধা আমাকে অবাক করেছে। তোমাকে দেখে, বাবা, আমি মুগ্ধ হয়েছি। রূপ যৌবন তোমার অসাধারণ। কিন্তু তার চেয়েও বড় তোমার জ্ঞানগরিমা। আমি এই রকম পাত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তোমার যদি অমত না হয় তবে আমার কন্যাকে গ্রহণ করো, বাবা। আমি খুব সুখী হবো। তুমি তোমার দেশে ফিরতে চাও না, যেও না। আমি সুলতানকে বলে তোমাকে তার দরবারের উজির-এ বহাল করে দেবো। তোমাকে পেলে আমার অভাব পূরণ হবে সুলতানের। আমি দরবার থেকে অবসর নেবো। এই বুড়ো বয়সে খাটতে আর ভালো লাগে না। শেষ ক'টা দিন আল্লাহর নামগান করে কাটাবো, এই ইচ্ছে।

সলজ্জভাবে মাথা নত করে বসে থাকে নূর-অল-দীন। কোন কথা বলে না। বলতে লজ্জা করে। একটু পরে মৃদু কণ্ঠে বলে, আপনি যা বলবেন, তাই হবে, জনাব।

উজিরের আনন্দ আর ধরে না। সাজো সাজো রব পড়ে গেলো বাহির অন্দর মহলে। আলোর মালায় সাজানো হলো সারা প্রাসাদ। প্রশস্ত প্রাসাদ কক্ষে অভ্যাগত আমিরদের বসার ব্যবস্থা করা হলো। সুগন্ধী আতরের খুশবুতে মদির হয়ে উঠলো সারা বাড়ি। খানাপিনার সেকি এলাহী আয়োজন।

একে এক অভ্যাগতরা আসতে লাগলো। উজিরের ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব, সুলতানের পারিষদবৃন্দ, শহরের গণ্যমান্য সওদাগর প্রভৃতি আরো বহু মাননীয় ব্যক্তির সমাগমে সরগরম হয়ে উঠলো প্রাসাদকক্ষ। সবারই সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো নূর-অল-দীনের। সবাই এক বাক্যে তারিফ করতে লাগলো উজিরের পাত্র নির্বাচনের।

উপস্থিত অভ্যাগতরা খুব আমোদ আহ্লাদ করে খানাপিনা করলো। দামি দামি শরাব। শাম্মিকাবাব, শাহী কোপ্তা, মোঘলাই বিরিয়ানী, আলেপ্পোর মিঠাই, ইরানী হালওয়া, আপেল, আঙুর, বেদানা, পেস্তা বাদাম, আখরোট, আলুবখরা আরও হরেক রকম মুখরোচর খানাপিনা খুব তৃপ্তি করে খেলো সবাই। আতর গুলাবের খুশবুতে মেতে উঠলো সকলে। সব শেষে গুলাবজল ছিটানো প্রচলিত প্রথা। এর পর আর কেউ সেখানে থাকে না। যে যার মতো বিদায় নেয়।

সবাই চলে গেলে উজির নফরদের হুকুম করলো, নূর-অল-দীনকে হামামে নিয়ে যাও।

শাদীর সময় এও এক প্রচলিত নিয়ম। হবু জামাতাকে হামামে নিয়ে গিয়ে মূল্যবান আতর দেওয়া জলে গোসল করাতে হয়। কন্যার পিতা তার সবচেয়ে সেরা পোশাক নিয়ে দাঁড়াবে। সেই পোশাক পরে বাইরে আসবে বর। তার জন্যে অপেক্ষমান বহু রত্নখচিত সবচেয়ে দামী খচ্চরের পিঠে চেপে শহর পরিক্রমায় বেরুবে সে। এ সবই চিরাচরিত প্রথা।

রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক জড়ো হতে লাগলো। উজিরের হবুজামাই

শাদীর সাজে শহর পথে ঘুরবে। পথঘাট আলোর মালায়, তোরণ দ্বারে সাজানো হয়েছে। নূর-অল-দীন-এর রূপ আর তার সাজের বাহার দেখে মনে হলো, আসমানের চাঁদ বুঝি মাটিতে নেমে এসেছে। শহর পরিক্রমা শেষ করে যখন ফিরে এলো নূর, উজির তখন অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নেবার জন্য সদর দরজায় অপেক্ষা করছিলো। খচ্চর থেকে নেমে উজিরের হাতে চুম্বন করলো সে। এবং তারপর.....

এই সময় শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে গেলো। দেখা গেলো রজনী অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

পরদিন রাত্রে।

তারপর শুনুন শাহজাদা, উজির বুকে জড়িয়ে ধরে নূরকে। বিংশ রজনীতে কাহিনী শুরু করলো শাহরাজাদ।

আল্লাহ তোমার কল্যাণ করবেন বাবা, উজির আদর জানিয়ে বললো, যাও ওপরে যাও। তোমার বিবি তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে।



নূর-অল-দীন উপরে উঠে এলো। সুসজ্জিত পালঙ্কে ফুলের সজ্জা। আজ তাদের পরিণীত জীবনের প্রথম রাত্রি। বহু মূল্যবান রত্নালঙ্কারে অপরূপ সেজেছে তার বিবি। তার দেহের অপরূপ রূপ লাবণ্যে তা আরও মনোহর আরও সুন্দর করে মানিয়েছে। দু'জনে দু'জনের হৃদয় বিনিময় করলো প্রথমে। অনেক কথা অনেক গল্প অনেক গান হলো অনেক রাত অবধি। তারপর রাত্রির দ্বিতীয় যামে দু'জনের দেহ মন প্রাণ দু'জনের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেলো।

পয়লা প্রহর মে সবকোই জাগে
দোসরা প্রহর মে ভোগী।
তিসরা প্রহর মে তস্কর জাগে
চৌঠা প্রহর মে যোগী।।

এর চেয়ে বেশী কিছু কাম্য ছিলো না নূর-অল-দীনের।

এদিকে বড়ভাই সামস্-অল-দীন সুলতানের সঙ্গে পিরামিড দেখে যখন ঘরে ফিরলো দেখে, ভাই নূর নাই। নফররা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। ওরা বললো, ছোট মালিক সুবা না হতেই হুকুম করলেন, খচ্চর-এর পিঠে জিন লাগাও। আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে দিলাম। তিনি কালিবের পথে চলে গেলেন। বললেন, বাইরের খোলা আলো হাওয়া পেলে তার বুকের জ্বালা যন্ত্রণার হয়তো উপশম হবে। এর বেশী আমরা আর কিছু জানি না, মালিক।

ভাইয়ের শোকে ভেঙে পড়লো সামস্-অল-দীন। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতে লাগলো। রাগের মাথায় ঐ সব কটু কথা বলে সে মহা অন্যায় করেছে। ছোটবেলা থেকেই সে শান্ত মেজাজের ছেলে। ওই সব কথায় নিশ্চয়ই খুব আঘাত পেয়েছে সে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ হতে লাগলো তার। যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে তাকে।

সুলতানের কাছে সব খুলে বললো সামস্-অল-দীন। তিনিও ব্যথিত হলেন খুব। নানা দেশের দরবারে দূত পাঠানো হলো। সন্ধান জানার জন্য। কিন্তু সব দেশ থেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে দূত। না, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেলো না।

কিন্তু দূতরা কেন বসরাহতে গেলো না, কেন তার খোঁজ করলো না সেখানে সে প্রশ্ন কারুর মনে জাগলো না। সামস্-অল-দীন বুক চাপড়াতে লাগলো। শুধু আমার নিজের দোষে ভাইকে হারালাম আমি। তাকে দেশান্তরী করলাম? তার মনে দুঃখ দিয়েছি—আঘাত করেছি। সে আঘাত ভাই আমার সহ্য করতে পারেনি।

পুত্র বিয়োগের শোকও একদিন থিতিয়ে আসে। সেইরূপ সামস্-অল-দীনও একদিন শোকতাপ অন্তরের এককোণে সরিয়ে রেখে আবার হেসে গেয়ে দিন কাটাতে লাগলো। কাইরোর এক সম্ভ্রান্ত সওদাগরের সুন্দরী কন্যাকে শাদী করে সংসারী হলো।

যোগাযোগই বলা যায়, তা না হলে একই দিনে—যেদিন ছোট ভাইয়ের শাদী সেদিনই তারও শাদী হয় কী করে! এবং শাদীর প্রথম রাতে দু'জনের বিবিই অন্তঃসত্ত্বা হলো। এও কি যোগাযোগ?

এদিকে শাদীর সব পর্ব শেষ হয়ে গেলে উজির একদিন সুলতান সমীপে হাজির হলেন জামাতা নূর-অল-দীনকে সঙ্গে নিয়ে। যুবকের রূপে মুগ্ধ হলো সুলতান। দু-হাত মাটিতে ছুঁইয়ে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো নূর। উদাত্ত কণ্ঠে সুন্দর করে আবৃত্তি করলো একটা শায়ের।

সবই ভালো লগে তার,
মনে হয় সবই অপরূপ।
হৃদয় মথিত করে,
জ্বলে উঠে কামনার ধূপ।
আমার এ তরুমূলে
সিঞ্চন করে সে বারী।
স্বর্গ সুখে তৃপ্ত হই,
আমি সেই নারী।।

সুলতান মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে নূর এর দিকে। কি সুন্দর রূপ! আর কী অপরূপ তার বাচনভঙ্গী। উজির এগিয়ে এসে বলে, আমার জামাতা। রূপে গুণে সেরা ছেলে।

সুলতান আরও খুশি হয়।—কিন্তু উজির, এ যুবক তোমার জামাতা না হলেও আমি তাকে সমানই আদর করতাম। ওকে আমার পাশে বসিয়ে দেওয়ানের কাজকর্ম বুঝিয়ে দাও। তুমি বয়সে ও জ্ঞানে অনেক বৃদ্ধ। তোমার যোগ্য সম্মান দিতে গেলে তোমার সহকারী হিসাবেই তাকে স্থান দেওয়া দরকার। তা না হলে ওকে আমি আজ থেকেই উজিরের পদে বহাল করতাম। তুমি যতদিন আছো, তুমিই উজির থাকবে। তোমার পর ওকে আমি উজির করবো।

একথা শুনে উজিরের মনে আহ্লাদ হলো।

সুলতান এই নবাগত যুবককে দেওয়ানের পদে বহাল করে নানারকম দামী দামী সাজপোশাক, এক হাজার সূক্ষ কারুকর্মের যোগ্য সূচ, দামী দামী সেরা খচ্চর এবং প্রচুর দাসদাসী ও নফর উপঢৌকন দিলো।

এর কিছুদিন পরে নূরের এক পুত্র সন্তান হয়। ঠিক সেইদিনই কায়রোতে তার দাদার এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। নূর তার ছেলের নাম রাখলো হাসান বদর-অল-দীন। তার রূপের বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য কারো নাই। বেহেস্তে হয় কিনা জানা নাই, ধরায় এরূপ কেউ প্রত্যক্ষ করেনি।



হাসলে পরে মুক্ত ঝরে
কান্নাতে তার পান্না।
এমন ছেলে কোথায় পেলে,
ও বিবিজান, বলো না।

নূর-অল-দীন নিয়মিত দরবারে যায়। তার কাজে মুগ্ধ হয় সুলতান। বসরাহ শহরের পরিচালন ভার দেওয়া হলো তাকে। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সব সমস্যার সমাধান করে দেয় নূর। এমন একজন দেওয়ান পেয়ে গর্ব হয় সুলতানের। নূরের মর্যাদা আরও বেড়ে যায় দরবারে। শুধু তার বেতনই বাড়ে না, সেই সঙ্গে তার

সৈন্যসামন্ত, লোকলস্কর, নফর চাকর, ক্রীতদাসের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়ে দেয় সুলতান। নূর আসার পর থেকে খাজনা আদায়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এর পর থেকে সবচেয়ে দুরূহ সমস্যাগুলো সমাধানের ভার পড়ে তার উপর। শহরবাসীরাও খুব খুশি। নূর আসার পর সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যে রাস্তাঘাট সংস্কার করা হয়। জল সরবরাহ, নতুন নতুন বাসগৃহ নির্মাণ অনেক বেড়ে যায়। আরও বেশী লোকের রুজি রোজগারের জন্য ক্ষেত-খামার, জাহাজ নির্মাণ, বাঁধ, সড়ক তৈরি করে দেয় সে।

হাসান-বদর-অল-দীনের বয়স যখন চার বছর সেই সময় উজির দেহ-রক্ষা করে। যথাযোগ্য মর্যাদায় তার শোক পালন করে নূর। এবার সে দরবারে উজিরের আসন পায়।

হাসানের লেখাপড়া শিক্ষাদীক্ষার দিকে প্রখর দৃষ্টি দিতে থাকে নূর। মাদ্রাসার প্রধান মৌলভীকে শিক্ষক নিযুক্ত করে। বৃদ্ধ মৌলভী প্রতিদিন এসে হাসানকে পড়াতে লাগলো। দিনে দিনে বড় হতে থাকে হাসান। ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলায় সেরা ছাত্র হয়ে ওঠে সে। হাসানের বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ মৌলভী সাহেব। গর্বে বুক ফুলে ওঠে নূর-এর। মনে হয়, বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে সে।

হাসানের বয়স যখন পনেরো তখন মৌলভী সাহেব বললেন, সারা জীবন ধরে আমি যে বিদ্যা আহরণ করেছি তার সবই তোমার পুত্র শিখে নিয়েছে মাত্র এই বারো বছর বয়সে। আমার আর কিছু শেখাবার নাই, বাবা।

নূর খুশি হয়ে মূল্যবান সাজপোশাক, এক হাজার সোনার মোহর এবং সবেচেয়ে সেরা একটা খচ্চর উপহার দিলো মৌলভীকে। হাসানকে সঙ্গে নিয়ে সুলতানের দরবারে যাওয়ার পথে হাজার হাজার নারীপুরুষ হাসানের রূপের হাট অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলো আর বললো, বাপ্ কা বেটা। এই প্রথম সে ঘর ছেড়ে শহরের পথে বেরিয়েছে। এতোদিন ছেলেকে প্রাসাদের বাইরে কখনও যেতে দেয়নি নূর।

হাসানকে দেখে সুলতান বিস্মিত হয়। একদিন সে নূরকে দেখে বলেছিলো, এতো রূপ ধরায় হয় না। কিন্তু আজ তার ছেলের রূপ দেখে মুখে কোনও ভাষা জোগালো না। শুধু মুগ্ধ নয়নে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। একটুক্ষণ পরে শুধু বলতে পারলো, তোমার মতো নসীব আমার যদি হতো, উজির....প্রথম দর্শনেই তোমার ছেলের প্রেমে পড়ে গেলাম। আর তো ওকে না দেখে থাকতে পারবো না। রোজ তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। আমার হুকুম। বুঝলে উজির।

নূর আর কি বলবে।—জো হুকুম জাঁহাপনা।

প্রতিদিন হাসান বাবার সঙ্গে দরবারে যায়। সুলতান আদর করে সারাক্ষণ তার পাশে বসিয়ে রাখে। এইভাবে সুলতানের সঙ্গে তার গভীর সখ্যতা গড়ে ওঠে। শুধু সুলতানের নয়, সারা দরবারের আমির ওমরাহ—সবারই পরম প্রিয়পাত্র হয়ে পড়ে সে।

এইভাবে সুখের সমুদ্রে সাঁতার কেটে দিন গড়িয়ে চলছিলো। হঠাৎ একদিন নূর-অল-দীন অসুখে পড়লো। কঠিন অসুখ। অনেক বড় বড় হেকিম ডাকা হলো। অনেক দাওয়াই দিলো তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষে হেকিমরা জবাব দিয়ে গেলো। তাদের বিদ্যায় আর কিছু করার নাই। এবার আল্লাহ ভরসা।

পুত্র হাসানকে কাছে ডেকে নূর বললো, বাবা, আমার ডাক এসেছে। যেতে হবে। তোমরা অবশ্য প্রাণপণে চেষ্টা করলে—যদি আরও কিছু কাল ধরে রাখা যায়। কিন্তু তা হয় না। আমি যে ক'দিনের জন্য তাঁর কাছ থেকে ছুটি করে এসেছিলাম তোমাদের এই হাসি-খেলায়, তা আমার ফুরিয়ে এলো। এবার যেতে হবে। আমরা মায়াবদ্ধ প্রাণী। এ সংসারে এসে ভাবি এই

আমাদের চিরকালের আবাসস্থল। কিন্তু তা তো একদম ভুল, বাপজান। পথ চলতে চলতে সরাইখানায় যেমন দু'টো দিন কাটিয়ে যাই, এও তো তেমনি। আসল ঠিকানায় তো সবাইকে একদিন পৌঁছতে হবে। সেখানে পৌঁছে গেলে আর কোন দুঃখ তাপ কিছুই থাকে না। শোকতাপ দুঃখ-দূর্দশা যা পাওয়ার তা এ সংসারেই পাবে। তার কাছে পৌঁছতে পারলে খালি সুখ আর সুখ।

নূর-অল-দীন চুপ করলো। একটানা অনেক কথা বলে ফেলেছে। দূর্বল শরীরে হাঁপ ধরে যায়। একটু পরে আবার বললো, বাবা, আমার যা করার ছিলো সবই প্রায় নিখুঁতভাবে আমি সমাধা করেছি। শুধু একটি কাজ বাকি রয়ে গেলো। তোমাকে তার ভার দিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমার হয়ে সেটুকু করে নিও। খুব ভালো করে মন দিয়ে শোনো। কাইরোতে আমার বড়ভাই সামস্-অল-দীন সেখানকার সুলতানের উজির। আমিও সেখানকার আর এক উজির ছিলাম। কিন্তু তুচ্ছ একটা কারণে দাদার সঙ্গে আমার একদিন কলহ বাধে। আমি রাগ করে দেশত্যাগ করে এই বসরাহতে চলে আসি।

নূর একটু দম নেবার জন্য থামলো। হাসানকে বললো, কাগজ কলম নিয়ে এসো।

হাসান একটা সোনার দোয়াত কলম আর তুলোট কাগজ নিয়ে এসে বসলো। নূর যা বলে গেলো হুবহু লিখে নিলো হাসান। বসরাহতে কবে সে এসেছিলো, কবে তার শাদী হয়েছিলো, সুলতানের দরবারে উজিরের পদ, হাসানের জন্ম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সন তারিখ সহ বিস্তারিত বিবরণ লিখে নিলো সে। তারপর নূর বলতে লাগলো তার বংশ পরিচয়। তার বাবার তরফ আর মায়ের তরফ। তাদের শাখা প্রশাখা—যে যেখানে থাকে সব ঠিকানাপত্র। তারপর বললো, ভালো করে কাগজখানা রেখে দিও। সময়ে কাজে দেবে। আমার মৃত্যুর পর তুমি তোমার স্বদেশ কাইরোতে যেও একবার। আমার বড়ভাই তোমার চাচা ওখানকার উজির। তার সঙ্গে দেখা করে বলবে, এ জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হলো না আমার। আমাকে যেন মাফ করে সে।

নূর-অল-দীনের গাল বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কাগজখানা পড়ে শোনায় হাসান। নূর ঘাড় নেড়ে জানালো ঠিক আছে। বাবার মোহর এঁকে দিলো কাগজটার ওপর। তারপর ভাঁজ করে একখানা মোমকরা কাপড়ে জড়িয়ে বাঁধলো। এইভাবে রাখলে নষ্ট হবে না সহজে। বাইরের স্যাঁতসেতে হাওয়া ঢুকতে পারবে না। এবার কাপড়ে জড়ানো কাগজখানা তার পাতলুনের কোমরবন্ধনীর মধ্যে ঢুকিয়ে সুচ সুতো দিয়ে সেলাই করে দিলো। আর হারাবার ভয় থাকলো না।

এরপর একটা দিন মাত্র বেঁচে ছিলো সে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে সারা শহর ভেঙে পড়লো। হাজার হাজার নরনারী কালো পোশাক পরে শোকমিছিলে সামিল হলো। সুলতান শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। তার ডান হাতখানা আজ চলে গেলো।

যথাযোগ্য শাহী মর্যাদায় সমাহিত করা হলো তাকে। হাসান আজ পিতৃহারা। শোকের সায়রে ভাসতে থাকে। দু' নয়নে জলের ধারা। বাবার সেই কথাগুলো মনে করে নিজেকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে। এ দুনিয়াটা পান্থশালা, দু'দিনের জন্যে আসা এখানে। সবাইকেই তো একদিন সব ফেলে চলে যেতে হবে।

দু'মাসব্যাপী মৌন হয়ে শোক পালন করলো হাসান। তারপরও সে বড় একটা কারো সঙ্গে কথা বলে না। বাবার শোকে সে মুহ্যমান। সুলতান তাকে খবর পাঠালো। তার দরবারে উজির করবে তাকে। কিন্তু হাসানের কোন হুঁশ নাই। ঘর ছেড়ে বেরোয় না সে। নাওয়া খাওয়া একরকম বন্ধ করে দিয়েছে। দিনে দিনে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেলো তার শরীর। সুলতান বারবার লোক পাঠায়। কিন্তু হাসান গেলো না। তার মনের মধ্যে শুধু একটা কথাই ঘোরাফেরা করে। তাকে যেতে হবে কাইরো। তার বাবার শেষ আদেশ।

সুলতান কুপিত হলো।—কী ওর এতো বড় স্পর্ধা! আমার হুকুম অমান্য করে সে। ধরে বেঁধে নিয়ে এসো তাকে। আমি তাকে শায়েস্তা করবো।

সুলতানের পরোয়ানা নিয়ে ছুটলো সিপাই বরকন্দাজ। শহরবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সর্বনাশ! না জানি, কী সাজা দেবে তাকে সুলতান। হাসানের এক বিশ্বস্ত নফর এসে খবর দিলো, শিগ্গির পালিয়ে যান হুজুর। সুলতান ক্ষেপে গেছে। আপনাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। এখুনি পাইক বরকন্দাজ এসে পড়বে।

হাসানের চৈতন্য হয়। তাই তো, সুলতানের আদেশ অমান্য করেছে সে। তার পরিণাম তো মারাত্মক। হয়তো তার গর্দান যাবে। সুলতান ভেবেছে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করে তার ডাকে সে সাড়া দেয়নি। কিন্তু কী করে বোঝাবে সে, তার বাবার মৃত্যু কত বড় শেল হেনেছে তার বুকে।

হাসান বললো, আমাকে কিছু টাকাকড়ি দাও, জলদি করে।

নফর বললো, টাকাপয়সা বের করার সময় নাই। আপনি আর এক পলক দেরি করবেন না, হুজুর। বেরিয়ে যান এখান থেকে। না হলে জানে বাঁচবেন না। সুলতানের লোক এসে পড়বে এখুনি। আপনাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। আপনার ঘর বাড়ি বিষয় আশয় সব বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে সে। আপনি পালান।



হাসান কি করবে বুঝতে পারে না। এক মুহূর্ত। মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো। নিজের গায়ের দামী শালখানা ফেলে দিয়ে নফরের কাঁধের ময়লা চাদরখানা টেনে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে সারা দেহটা ঢেকে নিলো। আপাতভাবে দেখে মনে হয়, কোন দীন ভিখারী। খিড়কীর দরজা দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

প্রথমে ঠিক করলো বাবার গোরস্তানে গিয়ে আজকে রাতের মতো আশ্রয় নেবে সেখানে। তারপর কাল সকালে ভাববে কী করে কাইরোর পথে রওনা হওয়া যায়।

বাবার কবরের পাশে বসে ভাবছে এমন সময় সেখানে এলো এক জু। বসরাহর নামকরা ধনী সওদাগর। এক অদ্ভুত হাসিতে নেচে উঠলো তার চোখ।—হুজুর এখানে? আহা কী দশা হয়েছে আপনার। একেবারে চেনা যায় না। তা সবই ভাগ্যের খেলা। আজ যে উজির কাল সে ফকির এই তো মালিকের খেলা।

হাসান সত্য গোপন করে বানিয়ে বললো, আজ দুপুরে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি, বাবা বলছেন, আমার কবরের পাশে যাস। তোকে একটা কথা বলবো। তাই এসে বসে আছি এখানে।

জু বললো, আপনার বাবা বড় সজ্জন ছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। অনেক দিন ধরে আপনাকে একটা ব্যবসার কথা বলবো বলবো করেও বলার সময়-সুযোগ পাইনি। আপনি তো জানেন, আপনার বাবার বড় জাহাজের কারবার আছে। আপনার বাবার কাছ থেকে একখানা জাহাজ কিনবো এইরকম একটা কথাবার্তা আমার হয়েছিলো এক সময়। কিন্তু তারপরই তিনি অসুখে পড়লেন। ব্যাপারটা ওখানেই থেমে গেলো। এখন আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমাকে বিক্রী করতে পারেন একখানা জাহাজ। আমি আপনাকে এক হাজার দিনার দাম দিচ্ছি।

সওদাগরের কথায় না করতে পারলো না হাসান।এক এক করে এক হাজার দিনার গুণে দিলো সওদাগর। তার সঙ্গে একটা সাদা কাগজ আর কলম তুলে দিলো হাসানের হাতে। বললো, নামকে ওয়াস্তে একটা রসিদ করে দিন হুজুর।

হাসান লিখে দিলে : "আমি মৃত উজির নূর-অল-দীনের একমাত্র পুত্র হাসান বদর-অল-দীন আপনার নিকট হইতে এক সহস্র দিনার গ্রহণ করিয়া আমার পিতার

(বর্তমানে আমার) একখানি সওদাগরী জাহাজ বিক্রয় করিলাম। বন্দরে প্রথম যে জাহাজ নোঙর করিবে সেই জাহাজই আপনি পাইবেন।"

নাম স্বাক্ষর করে জুয়ের হাতে তুলে দিলো হাসান। 'হুজুরের অশেষ কৃপা—হুজুর আমার মা-বাপ' এইরকম অনেক সৌজন্য দেখিয়ে বিদায় নিলো সে। বাবার সমাধির পাশে বিষন্ন মনে বসে রইলো সে। রাত্রি গভীর হতে হতে গভীরতর হয়। এক সময় ঘুমে ঢুলে পড়ে সে।

চাঁদ তখন মাথার ওপরে। হাসানের সারা দেহে চাঁদের আলোর লুটোপুটি। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে। দিনেরবেলার আতঙ্কভাব আর নাই। এক অপরূপ প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে।

এই গভীর রাতে গোরস্তানে আসে অশরীরী আত্মারা, জীন, পরীরা। এক খুবসুরৎ জিনিয়াহ তখন আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো। চাঁদের আলোয় হাসানের সুন্দর চেহারা দেখে সে নেমে আসে। এমন রূপবান যুবক সে তো কখনও দেখেনি। কে সে? এলো কোথা থেকে? আল্লাহ তাকে কি দিয়ে গড়েছেন? প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলে সে। জিনিয়াহ ভাবে, গায়ের রঙ তার কালো হলে কি হয়, মুখের চেহারা কি তার খারাপ? ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এখন ওর ঘুম ভাঙাবো না, বরং আকাশের নীলিমায় একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক।

আবার শোঁ শোঁ করে অনেক উপরে উঠে যায় জিনিয়াহ। একেবারে মেঘের মেলায়। ওখানে দেখা হয়ে গেলো এক চেনাজানা জিনের সঙ্গে। দু'জনেই দু'জনকে হাত নেড়ে স্বাগত জানায়। জিনিয়াহ, জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে আসছো ভাই?

জিনি বলে কাইরো। সোজা কাইরো থেকে আসছি।

—ওখানকার খবর কী? আমাদের জাতভাইবোনেরা কেমন আছে সব?

—ভালো। সবাই বেশ ভালো আছে, বোন। তোমার খবর কী?

—চলছে ভালোই। চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। নিচে একটা গোরস্তানে একটি চাঁদের মতো ফুটফুটে ছেলে ঘুমুচ্ছে। তুমি দেখলে তাজ্জব বনে যাবে। অমন রূপের বাহার আমি কখনো দেখিনি, ভাই।

জিনি বললো, চলো তো দেখি।

ওরা দু'জনে নেমে নিলো নিচে। গোরস্তানের ওপরে। সত্যিই অবাক করার মতো চেহারা বটে। জিনি বললো, লোকে বলে, তামাম দুনিয়ায় নাকি উজির নূর-অল-দীন-এর ছেলে হাসানের মতো রূপ আর কারো নাই। কিন্তু এ ছেলের রূপই বা কম কিসে? আমি কাইরোর উজির সামস্-অল-দীনের মেয়েকে দেখেছি। অমন হুরীর মতো রূপ কোন মেয়ের হয় না। একমাত্র সেই মেয়ের সঙ্গেই মানায় একে।

জিনিয়াহ বললো, আমি তাকে দেখিনি কখনও।

—তাহলে শোনো, জিনি বললো, সেই হতভাগ্য মেয়েটার কাহিনী শোনাই তোমাকে। সামস্-অল-দীনের মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে সুলতান একদিন প্রস্তাব করলো, দেখো উজির, তোমার মেয়ে রূপেগুণে সেরা হয়ে উঠেছে। আমি ইচ্ছা করি তুমি আমার সঙ্গে শাদী দাও তোমার মেয়ের।

সুলতানের কথায় আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়।—জাঁহাপনা, অধমের গোস্তাকি মাফ করবেন। আপনি তো জানেন, আপনাকে অনেক আগেই বলেছি, আমার ছোটভাই দেশত্যাগী হয়েছে। এবং কী কারণে হয়েছে তাও আপনাকে বলেছি। আমাদের কথা ছিলো, আমার মেয়ে আর তার ছেলে হলে দু'জনের শাদী দিয়ে দেবো। আল্লার দয়ায় তাইই হয়েছে। নূরের

ছেলে এখন বসরাহতে বড় হচ্ছে। আমার ভাই সম্প্রতি দেহ রেখেছে। এখন আমি ঠিক করেছি তাকে এনে আমার মেয়ের সঙ্গে শাদী দিয়ে দেবো। এ যদি না করি আমার ছোটভাই বেহেস্তে গিয়েও শান্তি পাবে না। আপনি, হুজুর খুঁজলে এই মিশরে আরো অনেক খুবসুরৎ লেড়কী পাবেন। এবং আপনি চাইলে যে কোন মেয়েই বর্তে যাবে। শুধু এইটুকু অনুগ্রহ আমাকে করুন, আমার সত্যরক্ষা করতে দিন আমাকে।

কিন্তু সুলতান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। কী এইভাবে অপমান? আমাকে প্রত্যাখ্যান? এতো বড় স্পর্ধা! দাড়াও মজা দেখাচ্ছি! আমি সুলতান হয়ে তোমার কাছে হাত পাতলাম। কোথায় তুমি ধন্য হবে তা না, আমাকে অবজ্ঞা করলে? আমাকে তুমি মেয়ে দেবে না, ঠিকই করে রেখেছো। খালি ফালতু বাহানা দেখাচ্ছো। দাঁড়াও মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি। আমার ঘোড়াশালে একটা কুঁজো বামন আছে। সহিসের জোগানদার। বাঁদরের বাচ্চার মতো ওর মুখ, পায়রার মতো ওর বুক। খুব মানাবে ভালো তোমার মেয়ের সঙ্গে। আজ রাতেই শাদীর সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। ঐ বাঁদর মুখো কুঁজোটার সঙ্গে তোমার মেয়ের শাদী হবে—আমার হুকুম। সারা দেশে ঢ্যাড়া পিটে দাও। ঢাক ঢোল, সানাই বাজিয়ে কুঁজো যাবে শাদী করতে। তাকে সাজানো হবে জাঁকজমক করে। যত টাকা লাগে দেবো আমি। কোনো চিন্তা নাই। আজকের দিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলো উজির। যতো ভালো পাত্রই তোমার হাতে থাক তাদের কারো সঙ্গে শাদী দিতে পারবে না। আমার পছন্দ করা পাত্রকেই তোমার জামাই করতে হবে। আজ রাতে তোমার মেয়েকে নিয়ে মধুযামিনী করবে ঐ কুঁজোটা। এই তোমার সাজা।

আমি যখন কায়রো ছেড়ে আসি সে সময়ে দেখলাম, দাসদাসী নফর চাকররা ঐ বাঁদর মুখো কুঁজোটাকে ঘিরে খুব হাসি মস্করা করছে। শাদীর দিনের লোকাচার, কাম কাজ শুরু হয়ে গেছে তখন। দল বেঁধে মেয়েরা সুর করে শাদীর গান করছে, দেখে এলাম। কুঁজোটাকে ধরে বেঁধে একটা চৌবাচ্চার খুশবু গোলা পানিতে ডোবাচ্ছে আর তুলছে। ঠাট্টা মজাক-এ মশগুল হয়ে গেছে দাসদাসীরা। এমন কাণ্ড তো তারা কখনও দেখেনি জীবনে। সত্যি বলতে কি বোন, লোকটাকে দেখলাম, অমন কদাকার কুৎসিৎ মানুষ আমি কখনো দেখিনি। জানোয়ারও ওর চেয়ে দেখতে ভালো হয়।

দাঁত মুখ সিঁটকে বিকট মুখভঙ্গী করে সেই কুঁজোটার কদাকার চেহারার একটা ছবি ফোটাবার চেষ্টা করে জিনি।

দুঃখ করে আবার বলতে থাকে, আহা, বেচারী! অমন খুবসুরৎ লেড়কী, তার কী নসীব! আমার মনে হয়, সামস্-অল-দীনের মেয়ে সিৎ-অল-হুসন তোমার এই মন ভোলানো ছেলেটার চাইতেও সুন্দর। শাদীর সাজে সাজানো হয়েছে তাকে অপরূপ করে। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তার গাল। সুরমা কাজল ধুয়ে গেছে। প্রাসাদের মাঝখানের বড় ঘরে বসানো হয়েছে তাকে। তার চারপাশে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে—গান বাজনা হৈ হল্লা হাসি মসকরায় মত্ত হয়ে গেছে। একটু পরেই ঐ বাঁদর মুখো কুঁজোটা বর সেজে আসছে। সবাই তার অপেক্ষায় আছে।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো রাত্রি প্রভাত হতে চলেছে। বলা থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

একুশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়। শাহরাজাদ বলে, তারপর শুনুন শাহজাদা, সেই জিনিয়াহ বললো, তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছো ভাই। এই ছেলের মতো রূপ সারা দুনিয়ায় কারো নাই। আমি ভাবতেই পারছি না, তোমার সেই সিৎ-অল-হুসন এর চেয়ে সুন্দর কি করে হতে পারে! অসম্ভব।

আফ্রিদি বললো, তুমি বিশ্বাস করো, বোন। আমি এতোটুকু বাড়িয়ে বলছি না। সত্যি, তার মতো রূপসী যুবতী হয় না। বিশ্বাস না হয়, চলো, নিজের চোখেই দেখবে। আর যেতেও হবে আমাকে। আমি বেরিয়েছি তার উপযুক্ত একটা পাত্রের সন্ধানে। তা তোমার ছেলেটার সঙ্গে মানাবে ভালো। একেবারে শাহী জুটি। ওই বাঁদর মুখো কুঁজোটা মেয়েটার পাপড়ীর মতো দেহটাকে ছিঁড়ে খাবে এ আমি বরদাস্ত করবো না কিছুতেই। যেমন করেই হোক শাদীর নামে এই বাঁদরামী বন্ধ করতেই হবে। চলো, আর দেরি না, এই ছেলেটাকে নিয়ে এখুনি আমরা উড়ে যাই কায়রো।

জিনিয়াহ বললো, হ্যাঁ তাই চলো, বাঁদরের বাচ্চাটা মেয়েটার শয্যাসঙ্গী হবে এ কিছুতেই হতে পারে না।

অকাতর ঘুমে আচ্ছন্ন হাসানের দেহটাকে সন্তর্পণে নিজের পিঠে তুলে নিলো আফ্রিদি। জিনিয়াহকে বললো, তুমি আমার পাশে পাশে থাকো।

প্রায় উল্কার গতিতে শোঁ শোঁ করে ছুটে চললো তারা। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে নামলো কায়রো শহরের এক প্রান্তে। কাছেই উজিরের প্রাসাদ। আলোর মালায় সাজানো হয়েছে চমৎকার করে। সদরে বসানো হয়েছে নহবৎ। সানাই-এ বাজছে বেহাগ। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা মোমবাতি হাতে চলেছে দলে দলে। রাস্তার পাশে একটা পাথরে-তৈরি চবুতরার উপরে ওরা শুইয়ে দিলো হাসানকে। এবার তার ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মেলে দেখে, অচেনা জায়গা। সে তো শুয়েছিলো তার বাবার গোরস্তানে বসরাহয়। কিন্তু এতো একটা অজানা অচেনা শহরের রাস্তার চবুতরা। অবাক হয়ে উঠে বসে সে। আরও অবাক হয় বিশালাকৃতির দাঁড়িগোঁফহীন একটা মানুষকে দেখে। ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে—মুখে তর্জনী চেপে কোন কথা না বলতে ইশারা করছে।

হাসান ভয়ে চুপ করে থাকে।

সেই বিরাট মানুষটা ওর হাতে ধরিয়ে দেয় একটা জ্বালানো মোমবাতি।—ধরো, এই বাতিটা নিয়ে ঐ নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে মিশে যাও। তুমি অবাক হয়ে ভাবছো, আমি কে? আমি হচ্ছি এক জীন। আল্লাহ আমার একমাত্র উপাস্য। তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমার ভালো করার জন্যেই তোমাকে এ শহরে নিয়ে এসেছি। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে বসরাহর এক গোরস্তানে। এখন তুমি বসে আছো কায়রো শহরে। আজ রাতে এখানকার উজির সামস্-অল-দীনের লেড়কীর শাদী হবে। একটা বাঁদর মুখো কুঁজোর সঙ্গে। ঐ যে প্রাসাদটা দেখছো, আলোয় ঝলমল করছে, কাতারে কাতারে লোকজন যাচ্ছে মোমবাতি হাতে ওখানেই আছে সেই উজিরের মেয়ে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে সে। যাও আর দেরি করো না। উঠে পড়ো। মোমবাতিটা হাতে ধরে মিশে যাও ভিড়ে। নহবৎখানা পেরিয়েই দেখবে বাঁদিকে হামাম ঘর। ওখানে ঐ বাঁদর মুখো কুঁজোটাকে গোসল করাচ্ছে দাসদাসীরা। কুঁজোটা যখন বরের ছাঁদে সেজেগুজে এসে খচ্চর-এর পিঠে চাপবে তখন তুমি তার পুরোভাগে থাকবে। যেন সবাই মনে করে তুমিই বরকর্তা। যে সব মেয়েছেলেরা গান বাজনার মুজরো করতে এসেছে—ওরা মাঝে মাঝেই নাচ গান থামিয়ে বরের সামনে ওড়না পেতে ধরবে প্যালা পাওয়ার জন্যে। তুমি তোমার জেবে হাত ঢোকাবে, আমার যাদুতে দেখবে, তোমার মুঠো ভরে উঠে আসবে সোনার মোহর। কোন অবাক না হয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে সবটাই ছুঁড়ে দেবে ওদের দিকে। হয়তো বা দু-চারটে মাটিতেও পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তুমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবে না। তোমার কোন ভাবনা নাই, যতোবার দরকার জেবে হাত ঢোকালেই পেয়ে যাবে মুঠিভরা মোহর। ফুরাবে না। এইভাবে হামাম থেকে প্রাসাদের মাঝখানের বড় ঘরের দরজা অবধি মুড়িমুড়কীর মতো মোহর বিলিয়ে যাবে, যাকে তাকে। ওই বড় ঘরে শাদীর আসর। ওখানে জড়ো হয়েছে শহরের উজির আমির ওমরাহ

সওদাগরদের বিবিরা। সবাই পরে এসেছে দামী দামী সাজপোশাক, রত্ন আভরণ। সেখানে একমাত্র বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তোমাকে কায়দা করে ঢুকে পড়তে হবে। এবং সেটা তোমার পক্ষে তখন আর খুব শক্ত কাজ হবে না। কারণ পয়সার প্যালা এমন একটা বস্তু যাতে সবাই থ হয়ে যাবে। তোমাকে ঘিরে ধরবে সকলে। মাথায় করে নাচতে চাইবে।



জিনি অদৃশ্য হয়ে গেলো। জ্বালানো মোমবাতিটা হাতে ধরে মিছিলে সামিল হয়ে যায় সে। বুঝতে অসুবিধা হলো না একটুও। নহবৎখানার বাঁ-পাশেই হামাম। তার চত্তরে অনেক দাসদাসী মুজরো করা মেয়ে মানুষ। ওরা পয়সা নিয়ে নাচগান করে বেড়ায়।

হামাম থেকে বেরিয়ে এলো সেই বাঁদরমুখো কুঁজো বর। মুক্তোর মালা গলায় পরেছে। সূক্ষ্মকারুকার্য করা বহু মূল্যবান বাদশাহী পোশাকে সাজানো হয়েছে তাকে। কয়েকজন মিলে চ্যাংদোলা করে তুলে খচ্চরটার পিঠে বসিয়ে দিলো কুঁজোটাকে। নাচনেওয়ালীরা খ্যামটা নাচ নাচতে লাগলো। কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে কাওয়ালী ধরলো কিছু মেয়ে। আর কতকগুলো বাজাতে লাগলো ঢোল নহবৎ। হাসির হুল্লোড় উঠলো প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। হাসান গিয়ে ধরলো খচ্চরের লাগাম। আগে আগে চলে সে। পিছে পিছে আসে খেমটাওয়ালীরা।

রূপবান হাসানকে দেখে সবাই মুগ্ধ হলো। মনে করলো, শাহ-পরিবারের কেউ। বরপক্ষের লোক। মেয়েগুলো মাঝে মাঝেই নাচগান থামিয়ে এগিয়ে এসে ওড়না পেতে ধরে। প্যালা চায়। বড় ঘরে বিয়ে শাদীর সময় এইরকম রেওয়াজই চালু। হাসান পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভরে তুলে আনে সোনার মোহর। ছুঁড়ে দেয় একটা মেয়ের আঁচলে। আর একট মেয়ে এগিয়ে আসে তখন। তাকেও দেয় এক মুঠো। তারপর আরও একজন। এমনিভাবে যে আসে, যে হাত পাতে তাকেই মুঠো ভরা মোহর দিতে লাগলো সে। সবাই অবাক। একেবারে আদৎ খানদানি ব্যাপার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবারই নজর গিয়ে পড়লো হাসানের উপর। কুঁজো বরের দিকে তখন আর কেউ তাকায় না।

এইভাবে প্রাসাদের প্রধান কক্ষের দরজায় এসে পৌঁছলো তারা। এবার বর একা যাবে সেই অন্দরমহলে। সেখানে গণ্যমান্য উজির আমিরের বিবিরা ঘিরে আছে সিৎ-অল-হুসনকে। কুঁজোটার একটা হাত ধরে প্রায় হিড় হিড় করে টেনে ভিতরে ঢুকে পড়ে হাসান। কেউ কিছু বলার বা বাধা দেবার চিন্তাই করলো না।

ভিতরে ঢুকেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় হাসানের। শহরের খানদানি পরিবারের লেড়কী বিবিরা এসে জড়ো হয়েছে সেই বিশাল কক্ষে। তাদের বাহারী সাজপোশাকের জেল্লায় সারা ঘরটা ঝকমক করছে।

একরাশ মেয়ে, তার মধ্যে ওরা দু'টি মাত্র পুরুষ। মেয়েরা সবাই নাকাব নামিয়ে মুখ ঢাকলো। প্রত্যেকে মোমবাতি হাতে, দু'টি সমান্তরাল রেখায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বরকে স্বাগত জানাবার জন্য। দুই সারির মাঝখান দিয়ে হাসান কুঁজোটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বসালো শেষ প্রান্তের মঞ্চের উপরে। নিজেও বসলো তার পাশে। এবারে মেয়েরা বিবিরা নাকাবের জাফরি দিয়ে ভালো করে দেখলো দু'জনকে। হাসানের রূপের চমক দেখে চোখের পলক পড়ে না কারো। দেখে আর ভাবে, এতো সুন্দর চেহারার পুরুষ মানুষ হয় নাকি। মেয়েদের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে। সবারই ইচ্ছে হয় ছেলেটার কাছে যায়। পাশে গিয়ে বসে। একটু

আদর করে। তার হাত দু'টো টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে। কারও ইচ্ছে করে গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে চুমু খেতে। সবাই কেমন উষ্ণ রোমাঞ্চ অনুভব করে হাসানকে দেখে। কেউ ভাবে, যে যা বলে বলুক যে যা ভাবে ভাবুক ছুটে গিয়ে তার কোলের ওপর বসে পড়বে সে। কামনায় উদ্বেল হতে থাকে উপস্থিত মেয়ে বিবিদের দেহ মন। নিজেকে সামাল দিয়ে রাখা দায় হয়ে ওঠে। ষোল থেকে ষাট—সব মেয়ে বিবিদেরই তখন একই দশা। লাজলজ্জার বালাই আর রইলো না। এক এক করে সবাই নাকাব মাথার ওপরে তুলে দিয়ে হাসানকে দেখতে থাকলো। নাকাব খোলার উদ্দেশ্য অন্য। মেয়েরা বিবিরা তাদের নিজেদের চেহারা হাসানকে দেখাতেই মরিয়া হয়ে তুলে দিয়েছে মুখের ঢাকনা। যদি হাসান চেয়ে দেখে, যদি তার নজরে ধরে যায় তার রূপ যৌবন—ধন্য হতে পারবে সে। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা। এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় ওদের। হুড় পাড় করে গিয়ে ছেঁকে ধরে হাসানকে। সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে ওর চাঁদপনা মুখের দিকে। কেউ জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে। কেউ বা একটা চোখ ঈষৎ চোখ করে ইশারা করে। আবার কেউ নিজের ঠোঁটে নিজের দাঁত বসিয়ে রক্ত বের করে চোষে। আর এক রূপসী তেরছা চোখের বান মেরে বলে, তুমি কোন আশমানের চাঁদ, নাগর? কোথায় তোমার ঘর? কে বা তোমার মেহেবুবা?

হাসান বলে ঃ যে আশমানের সিতারো তোমরা, সেই আশমানেই আমার ঘর। আর মেহেবুবা? তাকেই তো ঢুঁড়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। তোমরা যদি কেউ রাজি হও? এ বান্দা রাজি আছে।

হাসির হুল্লোড় ওঠে। মেয়েটা গালে হাত রেখে বলে, ওমা, কী ফাজিল? শরমে মরমে মরে যাই...

খেমটাওয়ালীরা তখন মেয়ে বিবিদের কাছে হাসানের দু'হাত ভরে মোহর ছড়ানোর কথা বলতে থাকে। ওদের কথাবার্তা শুনে মেয়ে বিবিদের মনে হয়, এ তো তবে সাধারণ ঘরের ছেলে না। নবাব বাদশাহর খানদানি ঘরানা-না-হলে এমন দিলদরিয়া শেরিফ মেজাজ—হয় না কারো। সবাই তখন হা হুতাশ করতে লাগলো, হায় আল্লাহ, এমন একটা মানানসই বর হাতের কাছে থাকতে বাঁদর মুখো ঐ কুঁজোটার সঙ্গে শাদী হবে বেহেস্তের হুরী সিৎ-অল্-হুসন-র। আল্লাহ বোধ হয় দু'জনকে দু'জনের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের বাদশাহ বাদ সেধেছেন। কি উপায়!

সবাই যখন হাসানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর কুঁজোর পিণ্ডি চটকাতে ব্যস্ত সেই সময় হঠাৎ সামনের একটা দরজা খুলে গেলো। পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়ালো মৌলভী আর সিৎ-অল-হুসন্। সঙ্গে একদঙ্গল পরিচারিকা, দাসী, খোজা। আর এলো বাজনাদাররা। কামনার হিল্লোল জাগানো, বুকে আগুন ধরানো বাজনা বাজাতে লাগলো তারা। হুসন্ এসে দাঁড়ালো সেই প্রশস্ত কক্ষের ঠিক মাঝখানে। চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো সব মেয়ে বিবিরা। মনে হতে লাগলো, মেঘশূন্য নীল আকাশে লক্ষ তারার মাঝখানে এক পূর্ণচন্দ্রের হাট। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো এক জ্যোতির জোয়ার। তার পাশে দাঁড়িয়ে শহরের সম্ভ্রান্ত খানদানি পরিবারের পরমাসুন্দরী সব মেয়ে বিবিরা ঝরে পড়া কুসুমের পাপড়ির মতো মূহ্যমান ম্লান দেখাতে লাগলো। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তার দেহের খুশবু। মসলিনের ওড়নার নিচে যত্নে পাট করা রেশমের মতো তার ঘন চুলের অরণ্যে লুকিয়ে আছে এক মুকুলিত যৌনের যাদু। তাঁর নিচে চাঁপার পাপড়ির



মতো পেলব কোমল মরাল গ্রীবায় পরেছে তারার মতো ছোট ছোট হিরে জহরৎ-এর এক জড়োয়া মানতাশা। টকটকে লাল সালোয়ার কামিজ পরেছে পরনে। সোনার জড়িতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা—নিপুণ শিল্পীর হাতে নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে নানা ধরনের পশু পাখীর বিচিত্র ভঙ্গী। দু'টো খুদে সাপ তার দুই বাহুকে আড়াই প্যাঁচ দিয়ে চেপে ধরে ফনা বাগিয়ে ধরেছে। সোনার সেই সাপ দু'টোর গায়ে চুনী পান্না বসানো। আর তাদের ফনার মাথায় জ্বলজ্বল করছে দু'টো চন্দ্রকান্তমণি। গলায় সাতনরী হার। পায়ে মল। বাঁহাতের অনামিকায় ইয়া বড় হীরা বসানো আংটি। কপালে টিকলি। মাথায় সোনার টায়রা—ছন্দোবদ্ধভাবে বসানো অসংখ্য হিরে-জহরৎ। আর তার মাঝখানে পাখীর ডিমের মতো একটা কোহিনূর। জানি না—কত লক্ষ লক্ষ দিনারের রত্নাভারণে সাজানো হয়েছে তাকে। তবু তার রূপের জেল্লার কাছে ঐ সব রত্ন আভরণ-এর চমকছটা তেমন কিছু না। কোন অলঙ্কার না পরলেও তার রূপের বাহার কি কিছু কম হতো? একদম না। সিৎ-অল-হুসন্‌র দেহে শোভা পেয়ে অলঙ্কার-আভরণ-ই আজ ধন্য হয়েছে।

হুসন্ এগিয়ে গেলো হাসানের দিকে। হাসান তখনও তেমনিভাবে বসে ছিলো মঞ্চের উপর। কুঁজোটা উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে ধেই ধেই নেচে কুদে স্বাগত জানাতে লাগলো হুসন্‌কে। হুসন এক ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলো কুঁজোটাকে। হাসানের কাছে এসে দাঁড়ালো। এমন রূপের জৌলুস কোন পুরুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেনি হুস্‌ন। তার বাবার মুখে শুনেছিলো তার চাচার ছেলে হাসান নাকি দেখতে এমনি চাঁদের মতো সুন্দর। হুস্‌ন ভাবে এ সেই চাচার ছেলে হাসান না তো!

হুস্‌নকে মুগ্ধ নয়নে হাসানের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে উপস্থিত সব মেয়ে বিবিরা ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো। হুস্‌ন ততক্ষণে হাসানের গালদু'টো দু'হাতে চেপে ধরে আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে থাকে। ইয়া আল্লাহ, এই তো আমার স্বামী—আমার বুকের কলিজা—আমার মেহেবুব। তোমার পায়ে আমার হাজারো সালাম, তুমি আমাকে এর হাতে তুলে দাও। ঐ বাঁদরমুখো কুঁজোটার থাবা থেকে আমাকে মুক্ত করো খোদা।

হাসান তার জেবে হাত ঢোকালো। মুঠো মুঠো মোহর ছড়িয়ে দিলো মেজের উপর। নফর চাকর আর মুজরোওয়ালীরা হুড়োহুড়ি করে কুড়িয়ে নিলো—যে যতটা পেলো। সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, এই আমাদের পাত্র। [এখানে বলে রাখা দরকার নবাব বাদশাহদের শাদীর বাসরে, নফর-চাকরদের মধ্যে, পাত্র নিজে হাতে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করে থাকে।]

কুঁজোটা রাগে গর গর করতে থাকে। বাঁদরগুলো রাগলে যেমন নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে, দাঁত মুখ খিচিয়ে, নিজের গালে নিজে থাপ্পড় মারতে থাকে, তেমনি সব হাস্যকর কাণ্ডকারখানা করতে লাগলো সে। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি হতে লাগলো। কেউ বা ওর কাছে এগিয়ে যায়। কুঁজোটা শূন্যে মুঠি ছোড়ে—ঘুসি মারার ভয় দেখায়, আরও মজা পায় মেয়েরা। নানাভাবে ক্ষেপিয়ে দিতে থাকে। একটি মেয়ে কাছে এসে বলে, আহা, তোরা হাসছিস কেন রে। দেখছিস না, আমাদের কুঁজো বোনাই বিবির শোকে কাঁদছে। তা বোনাই সাহেব কী আর করবে বলো। তোমার হবু বিবি তো আশমানের চাঁদ হাতে পেয়েছে। তোমাকে তার মনে ধরবে কেন?

আহা দুঃখু করো না বাঁদর বোনাই।
নাইবা হলো শাদী, নাইবা এলো পাশে,
নাইবা পেলে খাটে।
কিন্তু সে স্বপ্নে যাবে কোই!
ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে তাকে পাবেই।

হাসির ফোয়ারা ছোটে। একজন বলে, একটা ফিতে নিয়ে আয়তো রে, মেপে দেখি। আমাদের কুঁজো বাঁদরটা লম্বায় কয় ইঞ্চি। হুস্‌নর মেহেবুব-এর চাইতে কতটা বেঁটে।

আর একটি মেয়ে বলে, ফিতে টিতের কি দরকার। মেহবুব-এর হাঁটুর চাইতেও খাটো হবে কুঁজোটা।

—লোকে বলে না—বামন হয়ে চাঁদে হাত। তা—এ দেখছি, তারও বাড়া। বামনতো বটেই, তারপর আবার কুঁজো-বাঁদরমুখো। বাঁদরটার কলা ছেড়ে আপেল খাওয়ার শখ হয়েছে। মারো ঝাড়ু।

এবার পাত্রীর প্রদক্ষিণ পর্ব শুরু হলো। প্রতিবার নতুন সাজে সেজে এসে এক এক করে সাতবার সারা কক্ষটার চারপাশ—প্রদক্ষিণ করলো হুস্‌ন। প্রতিবার ঘুরে এসে দাঁড়ালো হাসানের মুখোমুখি। শাদীর প্রথা অনুসারে এইটাই প্রধান রীতি। এই সময় উপস্থিত মেয়েরা, ভালোবাসার মিলনের এবং খিস্তি খেউড়ের গান ধরে। যারা নাচে তাদেরও অঙ্গভঙ্গীতে কামকলার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বাজনার তালে তালে রক্তে নাচন শুরু হয়। মেয়েরা জড়াজড়ি কামড়া কামড়ি শুরু করে। তখন সবাই এক অন্য নেশায় মেতে ওঠে। কেউ শুয়ে পড়ে আর একজনকে বুকের উপরে টেনে নেয়। ঠোঁট-এ ঠোঁট রাখে। আর চোখ রাখে হাসানের দিকে। দেখে মনে হয়, যেন এক জোড়া মেয়ে পুরুষ মেতে উঠেছে কাম কলায়।

এ সবই লোকাচার। শাদীর রাতের প্রচলিত রীতি। নানা ভাবে পাত্র-পাত্রীকে কাম ভাবে উত্তেজিত করাই এর আসল উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে পাত্রীর সাত পাক ঘোরা শেষ হয়। এক এক করে সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। শুধু থাকে হাসান, বাঁদরমুখো কুঁজো বড়, হুস্‌ন আর তার দাসী পরিচারিকারা। তারা এবার পাত্রী নিয়ে যায় পাশের ঘরে। শাদীর সাজ পোশাক ছাড়ানো হবে তার।

বিশাল কক্ষের শাদী মঞ্চে তখনও দু'টি প্রাণী বসেছিলো। একজন হাসান, আর একজন সেই বাঁদরমুখো কুঁজো পাত্র। মঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়ালো কুঁজোটা। বললো, তুমি আজ আমাদের শাদীর বাসরে মেলাই আনন্দ দিয়েছো মালিক। সেজন্যে বহুত সুক্রিয়া। দু'হাতে অনেক মোহর ছড়িয়ে আমাকে অনেক ঋণী করেছো। তোমার এ ঋণ শোধ করতে পারবোনা আমি। যাই হোক, এবার তো আমাদের আসল কাজ-কাম আরম্ভ হবে। তা তোমাকে কি চ্যাংদোলা করে বাইরে বের করে দিয়ে আসতে হবে। যদি বলো, লোকজন ডাকি।

লোকটার কথায় হাসানের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। কি এর উত্তর দেবে ভেবে পায় না। আস্তে আস্তে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু বেরোন আর হয় না। সেই আফ্রিদি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে দরজা-ঘিরে। —কোথায় যাচ্ছো হাসান? দাঁড়াও, আমি যা বলি, শোনো। আমি ঐ কুঁজোটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও পাত্রীর পালঙ্কে। তাকে বলবে, তুমিই তার কানুন সম্মত শাদী-করা স্বামী। মজা করবার জন্যে কুঁজোকে বর সাজিয়ে পাঠিয়েছিলো সুলতান। এরপর দেখো, তোমার কথায় খুশি হবে সে। তারপর তাকে নিয়ে শাদীর রাতে যা করতে হয় করবে। সে সব আর আমি তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে চাই না।



হাসান ফিরে এলো শাদীর মঞ্চে। কুঁজোটা গিয়ে ঢুকেছে পাশের 'ছোট ঘরে।' পায়খানা প্রস্রাব সেরে হাত মুখ ধুয়ে পাত্রীর শয্যা সঙ্গী হওয়ার বাসনায় কল ঘরে ঢুকেছে সে। জিন এক ধেড়ে ইঁদুরের রূপ ধরে তার এপাশ-ওপাশ কখনও বা তার পায়ের তলা দিয়ে হুটোপাটি করতে থাকে। তখন সবে সে বসেছে দাস্ত করতে। ভয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে। ইঁদুরটা তখন জলের নর্দমার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঝিক ঝিক আওয়াজ তুলতে থাকে। কুঁজোটা

হিস হিস করে তাড়াতে যায়। জোরে জোরে হাততালি বাজায়। হঠাৎ একটা বিরাট কালো বিড়াল মেঁউ মেঁউ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। চোখ দু'টো তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। কুঁজোটা হ্যাট হ্যাট করে তাড়া করতে থাকে বিড়ালটাকে। এমন সময় একটা জাঁহাবাজ কুকুর হয়ে গেলো বিড়ালটা। ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায় ওকে। কুঁজোটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। এই, যা ভাগ, পালা, পালা এই রকম আওয়াজ করতে থাকে। একটু ক্ষণের মধ্যে কুকুরটা—গাধায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। গাধার কর্কশ ধ্বনি কানে তালা ধরিয়ে দেয়। নাক মুখ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে হাওয়া আর থুথু ছেটাতে থাকে কুঁজোটার মুখ বরাবর। ভয়ে থর থর কাঁপতে থাকে শরীর। হড় হড় করে পায়খানা করে ফেলে মেজের উপর। প্রাণভয়ে পালাবার জন্যে দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা করে। কিন্তু গাধা তখন একটা বিরাট মোষের রূপ ধরে দরজা আড়াল করে দাঁড়ায়। এই সময়ে মানুষের গলায় বলতে থাকে মোষটা।—ওরে হতচ্ছাড়া নচ্ছার বাঁদর, চাঁদের মতো বিবি বাগাবার বাসনা হয়েছে তোর? তার আগে আমার—শিং-এর গুঁতো খেয়ে নে আগে একটা।

এই বলে তেড়ে যায় মোষটা। কুঁজোটা তখন শিউড়ে উঠে পিছে হঠতে গিয়ে হড়কে পড়ে মেজের উপর। সারা গায়ে একাকার হয়ে যায় তার পেট ছেড়ে দেওয়া বিষ্ঠায়।

মোষটা গর্জে ওঠে, ওরে মুখপোড়া বাঁদরের বাচ্চা দুনিয়াতে তোর যোগ্য পাত্রী খুঁজে পেলি না। যার তুই নফর হতে গেলে সাত জন্ম তপস্যা করতে হবে তোকে তাকে কি না তুই বিবি বানাতে চাস। বলো এমন আশা তোর হলো কি করে। —বল—না হলে এবার তোর বিষ্ঠা তোকেই খাওয়াবো।

কুঁজোটা তখন ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, আমার কোন দোষ নাই, বাবা। আমাকে জোর করে ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। এ সব ঝামেলায় যেতে চাই নি আমি। কিন্তু কি করবো সুলতানের হুকুম। না মানলে গর্দান যাবে যে। আর তা ছাড়া আমি তো আদপেই জানতাম না—লেড়কীটার 'ভালোবাসা' আছে। দোহাই মহিষ সম্রাট; তোমার চারখানা পায়ে পড়ি, আমার গোস্তাকি মাফ করে দাও। আর কখনও এমন কাজটি করবো না।

মোষ তখন বলে, তা হলে আল্লাহর নামে হলফ করে বল—আমি যা বলবো তা শুনবি।

—তাঁর নামে হলফ করে বলছি যা বলবে, তাই করবো।

—তা হলে শোন, সকাল না হওয়া পর্যন্ত এইখানে ঠিক যেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছিস তেমনি দাঁড়িয়ে থাকবি। এক পা যদি নড়িস বা শাদীর বাসর ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারিস, তোকে আর আস্ত রাখবো না। একটা গাট্টায় মাথা গুড়িয়ে ছাতু করে দেবো। আর এই সব ব্যাপারে কারো সামনে যদি মুখ খুলিস, কাউকে যদি একটা কথাও বলিস তা হলে প্রাসাদের গম্বুজের উপর থেকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দেবো। তুমি ভেবো না আমি কিছু জানতে পারবো না। যত লুকিয়ে ছুপিয়ে বলো আমি সব টের পাবো। আর একটা কথা এর পরে কখনও যদি দেখি তুই এই প্রাসাদ মুখো হয়েছিস তা হলে রাস্তার পাশের ঐ বড় নর্দমায় ডুবিয়ে মেরে ফেলবো তোকে। যা বললাম সব ঠিক ঠিক মনে থাকবে?

কুঁজোটা সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নেড়ে বললো, যে আজ্ঞে, তা আর মনে থাকবে না!

মোষটা বললো, ওদিকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নর্দমার গর্তের মধ্যে একটা পা ঢুকিয়ে দাঁড়া—। ওই ভাবে বাকী রাত দাঁড়িয়ে থাকবি। সূর্য ওঠা পর্যন্ত। একটু নড়া চড়া করেছিস কি মরেছিস।

—না-না; তা করবো কেন? এই আমি গর্তের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দাঁড়ালাম।

তখন মোষটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। কুঁজোটা ঐ ভাবেই 'ছোট ঘরে' গর্তের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চলুন আমরা এবারে যাই হাসান বদর-অল দীনের কাছে।

এতক্ষণ হাসান একা একা বসে সিৎ-অল-হুস্‌নর দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলো। বুড়ি ধাই হুসনকে সঙ্গে করে দরজার কাছে ডাকলো, কই গো কুঁজো বড় এদিকে এসো। তোমার সোহাগের বিবিজানকে কোলে করে তুলে নিয়ে যাও পালঙ্কে। আল্লাহ তোমাদের সুখে রাখুন বাছা।

হুস্‌ন-এর বুক দুর দুর করে ওঠে। নিজে নিজেই বলতে থাকে, ওই খুদে বামন কুঁজো বাঁদরটাকে নিয়ে শোবার আগে যেন মৃত্যু হয় আল্লাহ!

কিন্তু দু-পা এগিয়ে আসতেই হাসানকে দেখতে পেয়ে আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ে সে। —প্রিয়তম আমার সোনা, তুমি? তুমি একা বসে আছো আমার জন্যে? আমি ভেবেছিলাম ওই কুঁজোটার সঙ্গে হয়তো বা একটু ভাগ নেবে আমার দেহটার।

—ছিঃ অমন কথা ভাবলে কি করে বিবিজান?

আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা মজার। আর তা ছাড়া কুঁজো বামনটাকে আনার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিলো। শয়তানের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করা। জানোতো প্রবাদ আছে বামন আর কুঁজো থাকলে—শয়তান আসতে পারে না। তোমার বাবা দশ দিনার দিয়ে ভাড়া করে এনে ছিলো ওটাকে। সে এখন তার আস্তানায় আবার ফিরে গেছে।

হুস্‌ন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। হাসানের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করলো সে। হেসে গলা জড়িয়ে ধরে সোহাগ চাইলো। —সোনা আমাকে ধরো, আদর করো, আমাকে তোমার কোলে বসিয়ে নাও। আমার এই সতের বছরের যৌবন আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম।



শুধুমাত্র একখানা শালে ঢাকা ছিলো তার দেহ। হাসানের ধমনীতে রক্তের প্রবাহ দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগলো। ক্ষিপ্র হাতে পাতলুনটা খুলে ছুঁড়ে দিলো ডিভান-এর উপর। টাকা পয়সার বটুয়াটা রাখলো চেয়ারে, আর সেটা চাপা দিয়ে দিলো সোনার কাজ করা মাথার টুপিটা দিয়ে। শোবার সময় পরার জন্যে একটা সাদা মাঠা কাপড়ের টুপি তুলে নিয়ে মাথায় পরলো। টুপিটা পরার কথা ছিলো কুঁজোটার। কিন্তু তার নসিবে নাই, কি হবে। খালি ইজেরটা সোনার রশি দিয়ে বেশ আঁটো করে কোমরে বাঁধা। হুস্‌ন হাঁটু গেড়ে ওর কোমরের সোনার রশিটা ধরে এমন জোরে এক হ্যাঁচকা টান মারলো যে পটাং করে ছিঁড়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেলো সে মখমলের শয্যার উপর। হো হো করে হেসে উঠলো হাসান। হাসির তুফান তুললো হুস্‌ন-ও। সেই তুফানের সমুদ্রে ওরা কে যে কোথায় তলিয়ে গেলো তার কোন হদিশ পাওয়া গেলো না।

যখন শান্ত অবসন্ন অথচ প্রসন্ন হয়ে ঢলে পড়লো দু'জনে তখন হাসান শুধু বলতে পারলো, বুঝলাম, আমিই তোমার জীবনে প্রথম পুরুষ।

সেই রাত্রেই হুসন অন্তঃসত্ত্বা হলো। তার পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, সে কাহিনী আপনাকে পরে বলবো, জাঁহাপনা। সেই রাতের সল্পকালের মধ্যে মোট পনেরো বার তারা মিলিত হলো। হাসান বললো, আজকে রাতের মতো এখানেই ইতি করা যাক। এবারে একটু ঘুমতে হয় কী বলো?

হুসন বলে ঘুমে আমারও চোখ জড়িয়ে আসছে।

একটু ক্ষণের মধ্যে অসাড় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে দু'জনেই।

'ছোট ঘর' থেকে বেরিয়ে এসে জিনি দেখে জিনিয়াহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের সুখ নিদ্রা। জিনি বললো, নাও আর দেরি করো না, ছেলেটাকে তুলে নাও। যেখান থেকে এনেছিলাম—সেই বসরাহর গোরস্থানে রেখে আসতে হবে।

জিনিয়াহ নিজের পিঠে তুলে নিলো ছেলেটাকে। গায়ে একটা জামা মাত্র সার। ইজের পাতলুন কিছুই পরনে নাই। শোঁ শোঁ করে আকাশ পথে উড়ে চললো। পাশে পাশে চলতে থাকে জিনি। এইভাবে চলা কালে জিনির মধ্যে বদ চিন্তা চাড়া দিয়ে ওঠে। জিনিয়াহর উপর বলাৎকার করতে উদ্যত হয়। অন্য সময় হলে জিনিয়াহ খুব একটা গররাজি হতো না। কিন্তু তখন তার পিঠে হাসান। এ অবস্থায় রতি বিহার করতে গেলে ছেলেটা পড়ে যেতে পারে। সেই আশঙ্কায় জিনিকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু আফ্রিদিদের সঙ্গম চিন্তা একবার চেগে উঠলে ক্ষান্ত করা অসম্ভব। বাধা পেলে তখন সে ভয়াল-ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সমস্ত কিছু-ভেঙেচুরে খানখান করে ফেলে। তেমনি কিছু একটা অঘটনই হয়তো ঘটতো কিন্তু উপরে আল্লাহ আছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়লো জিনির মাথায়। ব্যাস, সব শেষ। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা জিনির সেই প্রকাণ্ড বপুটা তীর বেগে নেমে গেলো মাটির দিকে। জিনিয়াহ শুনতে পেলো, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এক আর্তনাদ উঠলো। মাটিতে পড়ে খান খান হয়ে গেলো জিনির দেহটা। পুড়ে ছাই হয়ে গেলো সব। জিনিয়াহ আস্তে আস্তে নেমে এলো জিনির জ্বলন্ত চিতার পাশে। সিরিয়ার দামাসকাস শহরের প্রবেশ মুখে নেমে পড়েছে সে। হাসানকে পিঠ থেকে নামিয়ে রাস্তার এক পাশে শুইয়ে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একেই বলে নিয়তি।

তখন বেশ বেলা হয়েছে, প্রবেশ দ্বার খুলে দিয়েছে দ্বারী। শহরের পথে লোকসমাগম হতে থাকে। আর সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো নবাবপুত্রের মতো দেখতে সুন্দর এক অর্ধউলঙ্গ যুবক ঘাসের উপর শায়িত। ঘুমে আচ্ছন্ন। গায়ে শুধু কামিজ আর মাথায় একটা রাতে পরার টুপি। পাতলুন ইজের—কিচ্ছু নেই পরনে। একজন পথচারী বললো, আহা, বেচারা বোধহয় বড়ই ক্লান্ত এবং বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। আর একজন বলে, কী সুন্দর চেহারা। অন্যজন প্রশ্ন তোলে, কিন্তু ছেলেটা উলঙ্গ হলো কি করে। কেউ কি পাতলুন ইজের খুলে নিয়েছে? আবার কেউ বা বাঁকা করে ফোড়ন কাটে দেখগে, বেহেড মাতাল হয়ে কোথায় কোন্ নর্দমায় পড়েছিলো।

যখন তারা এইরকম আজগুবি কল্পনায় মশগুল সেই সময় সকালবেলার একটা হাল্কা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গেলো তার কামিজ। সবাই দেখে অবাক হলো তার দেহের গোপন অঙ্গের অপূর্ব মনোহর সৌষ্ঠব। এই সময় হাসানের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখে অচেনা অজানা এক নতুন জায়গা। একটা শহরের প্রবেশমুখে রাস্তার একপাশে তৃণশয্যায় শুয়ে আছে সে। আর তাকে ঘিরে একপাল লোক জটলা করছে। চিৎকার করে উঠলো, আপনারা বলুন, আমি কোথায়? আর আপনারাই বা আমাকে এমন ভাবে ঘিরে ধরেছেন কেন? কী ব্যাপার?

একজন জবাব দিলো, তুমি এই অবস্থায় এখানে পড়ে আছো দেখেই আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি। তুমি কি জানো না জায়গাটা দামাসকাস শহরের ঢোকার প্রধান দরজা? কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে? আর কী করেই বা তোমার পরনের পাতলুন খোয়া গেছে?

হাসান প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, এ সব কী ব্যাপার কিছুই মাথায় ঢুকছে না। কাল রাতে ছিলাম আমি কাইরো। আর তোমরা বলছো, আমি এখন দামাসকাসে?

হাসানের কথা শুনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলো কয়েকজন। একজন বললো, চরসের মাত্রা বোধ হয় একটু বেশি হয়ে গেছে সাহেবের?

দামাসদকাস থেকে কাইরোর দূরত্ব অনেক। এক রাতে কেন দশদিন দশরাত হাঁটলেও পৌঁছানো সম্ভব নয়। সুতরাং গাঁজাখুরি কথা শুনে এ-ধরনের মন্তব্য তো করবেই লোকে।

আর একজনের মনে হলো, লোকটা বোধ হয় বদ্ধ পাগল।

অন্য একজন বলে, আহা, এমন সুন্দর চাঁদের মতো ছেলে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একেই বলে নসীবের লেখা।

একজন বয়স্ক ভারিক্কিচালের লোক তার কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, বাপু খোলসা করে বলো দেখি, কি তুমি বলতে চাও?

হাসান বলে, গতকালে মাঝরাতে আমি কাইরোতে ঘুমিয়েছিলাম আর সন্ধ্যাবেলায় ছিলাম আমি আমার নিজের শহরে—বসরাহয়।

এবারে আর সেই বয়স্ক ভারিক্কিচালের লোকটিও হাসি চাপতে পারলো না। ওর কথা শুনে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি? ঐ লোকটি বলে নাঃ, কোন আশা নাই। একেবারেই গেছে।

একজন সম্ভ্রান্ত গোছের শিক্ষিত লোক এগিয়ে এসে বলে, তোমার মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো। অমন বোকার মতো কথা বললে তো লোক হাসাহাসি করবেই।

—আমি বেশ সুস্থ। ভেবে চিন্তেই বলছি সব কথা। গতরাতে কাইরোতে আমার শাদী হয়েছে। চমৎকার কেটেছে রাতটা।

একজন ঠাট্টা করে ওঠে, সাহেব বোধ হয় স্বপ্নের ঘোরে শাদীর মজা লুটেছে রে! তা বাবা পাত্রীটা দেখতে কেইসা? হুরী পরী হবে নিশ্চয়ই।

হাসান বেশ রুষ্টই হয় তার কথা শুনে। বলে, ঠাট্টা করছো কেন? তা সে হুরীর কম কিসে? তার মতো রূপ যৌবন কোন মানুষের হয় না। আর স্বপ্ন বলে তামাশা করছো কেন? যা করেছি তা ঘুমুবার আগেই করেছি। একটা বাঁদরমুখো কুঁজো বামন-এর সাধ হয়েছিলো, শাদী করতে এসেছিলো তাকে। তার বাঞ্ছা আর পূরণ হয়নি। ভাগিয়ে দিয়েছি তাকে। আমার মাথায় এই যে রাতের টুপিটা দেখছো—এটা তার জন্যেই আনা হয়েছিলো।

এই বলে আশে পাশে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে থাকে হাসান। তারপর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, হায় খোদা, আমার—টুপীটা গেলো কোথায়? আমার টাকা পয়সার বটুয়াটা? ইজের আর পাতলুনই বা কি হলো?

আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে তড়াৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে শহরের প্রবেশ দরজা পেরিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগলো। হাসানের তখন এক চিন্তা—তার টুপী তার বটুয়া আর পাতলুন। তার পিছন পিছন এক দঙ্গল ফচকে চেংড়া যে তাড়া করে চলেছে সে দিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। ছেলেগুলো মজা করে আওয়াজ তুলছে—পাগল পাগল...

হাসান দেখলো নিরুপায়। যতো সে এগোচ্ছে তত বেশী ফাজিল ফক্কড় ছোঁড়া এসে দল ভারী করে তুলছে। একটা রুটীর কারখানার দরজা খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে সে। এই দোকানের মালিকটা দারুণ বদমেজাজী লোক। তার ভয়ে ছোকরাগুলো কেটে পড়লো যে যার মতন।

এবার হাসানকে এখানে রেখে আসুন আমরা যাই সিৎ-অল-হুসনর কাছে।

সকালে ঘুম ভেঙে গেলো হুসনর। পাশে দেখে হাসান নাই। ভাবলো, হয়তো ছোটোঘরে ঢুকেছে। যখন হাসানের প্রতীক্ষায় সে বসে আছে, ঘরে ঢুকলো তখন তার বাবা সামস্-অল-দীন। জিজ্ঞেস করলো, কেমন কাটলো, বেটী?

তার মন বড় বিষণ্ণ, মুখে হাসি নাই। সুলতানের কোপে পড়ে মেয়েটার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেলো। একটা কদাকার কুঁজোর সঙ্গে তার শাদী হলো। হয়তো মনের দুঃখে মেয়েটা তার আত্মঘাতী হবে। আবার প্রশ্ন করলো, তোর কোন অসুবিধে হয়নি তো মা?

বাবা ভেবেছিলো, মেয়েকে দেখবে বিষণ্ণ কাতর। কিন্তু একি তার টসটসে চেহারা। আনন্দে ডগোমগো হয়ে উঠেছে ওর মুখ চোখ। রাগে গর্জে উঠে সে, বেশরম বেহায়া লেড়কী? বংশের খানদানী মর্যাদার কথাও কি সব ভুলে গেছিস তুই। একটা নীচ নফরকে নিয়ে আমোদ ফুর্তি করেছো সারারাত? তার চেয়ে গলায় দড়ি জুটলো না?

—আব্বাজান! হুসন বাবাকে জড়িয়ে বলে, তুমি ভুল করেছো। কাল রাতে আমার সঙ্গে যার শাদী হয়েছে তার পায়ের নখের যুগ্নিও না তোমার ঐ বাঁদরমুখো কুঁজো বামনটা। আমরা সবাই মিলে লোকটাকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছি সারাক্ষণ। ভারি মজা করেছি। তুমি মজাক করে কুঁজোটাকে নিয়ে এসে অবশ্য ভালোই করেছো, কিন্তু আমার অবস্থা বোঝ তখন? আমি তো কেঁদে সারা। তখন কী করে বুঝবো, ওটা আসলে আমার বর না—তোমরা তামাশা করার জন্যে পাঠিয়েছো? যাক গে? এখন অন্য কথা বলো।

হুসনর কথায় আরো রেগে উঠলো সামস্-অল-দীন।—কথাবার্তা যখন বলবে, একটু হিসেব করে সভ্য-ভব্য ভাবে ব'লো। এ সব কি অনা-সৃষ্টি কথা তোমার মুখে? তুমি কি বলতে চাও, ঐ কুঁজোটাকে নিয়ে রাত কাটাওনি?

হুসন আদুরে মেয়ের মতো ন্যাকা সুরে বলতে থাকে, আবার সেই হতচ্ছাড়া কুঁজোটার নাম মুখে আনছো আব্বাজান? বলছি, ওসব অলক্ষুণে কথা থাক এখন। তা হলে গোড়া থেকেই বলি, শোনো।

গতরাতের আগাগোড়া সব কাহিনী বিবৃত করলো হুসন। আঃ কী আমার বরাত আব্বাজান। আজ আমার মতো সুখী আর কোন মেয়ে নাই দুনিয়ায়। কী তার রূপ কী তার যৌবন। সারা দেশ ঢুড়লে তার জুড়ি পাবে না তুমি। যেমন রূপ তেমনি তার ব্যবহার। সারারাত ধরে কত ভাবে কত আদর সোহাগ করেছে—সে তোমাকে তো খুলে বলা যায় না, আব্বাজান!

--তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি? কই, কোথায় সে ছেলেটা?

হুসন বলে, দেখো, হয়তো ছোটঘরে গেছে।

আর দেরি সহ্য হলো না। ক্ষিপ্র পায়ে উঠে গিয়ে ছোটঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো। একটা বেটে কুঁজোলোক গর্তের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

—কে তুমি? উজির গর্জে ওঠে।—তুমি সেই কুঁজোটা, না?

কিন্তু লোকটা এমনই ভীতসন্ত্রস্ত যে কোন জবাব দিতে পারলো না। কেবলই তার মনে হতে লাগলো, জিনিটাই বুঝি আবার ফিরে এসেছে।

এই সময় রাত্রি অবসান হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন বাইশতম রাত্রি। আবার সে গল্প শুরু করে।

তারপর শুনুন শাহজাদা, জাঁফর তার গল্প বলে যাচ্ছে আর খলিফা হারুন-অল-রসিদ তন্ময় হয়ে শুনছেন।

সেই ভীত সন্ত্রস্ত কুঁজোটা কোন উত্তর দিতে পারলো না। শুধু তার মনে হতে থাকে, জিনি এসে পড়েছে আবার।

উজির এবার আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে, কে তুমি বলো শিগ্গির। জবাব দাও। না হলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেবো।

এই ওষুধে কাজ হলো।—দোহাই বাবা, জিনি সাহেব, তুমি অগতির গতি, জগতের পতি, অনাথের নাথ, পরম পিতা, তোমাকে গড় করি। আমার কোনো দোষ নিও না, আমি তোমার কোন কথার অবাধ্য হইনি।

—কী যাতা বক বক করছো। আমি কোন জিনি-ফিনি না, আমি মেয়ের বাবা-সুলতানের উজির।

তখন সেই কুঁজোটা তড়ফে উঠলো, ওঃ আপনি? আপনি বেরিয়ে যান এখান

থেকে। আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। আমার জীবনটাই বরবাদ করে দিয়েছেন আপনি। শিগ্গির এখান থেকে কেটে পড়ুন। না হলে, এক্ষুণি সেই আফ্রিদি এসে পড়লে ঠ্যালা বুঝবেন। আপনার মুখ দেখতে চাই না আমি, চলে যান। যত নষ্টের গোড়া আপনি। আমার এতো কষ্ট খালি আপনার জন্যে। আপনি আমাকে একটা নষ্ট মেয়েছেলের ঘাড়ে চাপাবার মতলবে ছিলেন। আপনার মেয়ে মহব্বত করে একটা মোষ—একটা গাধা—মানে মানে—একটা আফ্রিদি দৈত্যর সঙ্গে। আপনি নিজেও যতটা আপনার মেয়েও ঠিক ততটা খারাপ বদমাইশ।

—তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ, উজির বললো, এদিকে একবার বেরিয়ে এসো, তারপর তোমাকে মজা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কুঁজো তখন সেয়ানার মতো বলে, হুঁ বাবা, ওটি হচ্ছে না। আফ্রিদির হুকুম ছাড়া একপাও এখান থেকে নড়বো না, অতোটা পাগল এখনও হইনি আমি। যতক্ষণ না সূর্য উঠছে ততক্ষণ একপা নড়ছি না এখান থেকে। আপনি সরে যান। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। আচ্ছা, বলুন তো, এতক্ষণে সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি?

উজির বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করে, আফ্রিদি কী কী করেছে, কী কী বলেছে তোমাকে?

কুঁজো তখন সমস্ত খুলে বললো তাকে।

উজির পায়খানার ওপাশের আর একটা দরজা খুলে দিয়ে বললো, রোদ উঠে গেছে, যা পালা এখান থেকে।

দরজার ওপারে পা দিয়েই চোঁ দৌড় দিয়ে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেলো কুঁজোটা। দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলো প্রাসাদের দরবার মহলে—একেবারে সুলতানের সামনে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সব বৃত্তান্ত। কালকের রাতের সব কাহিনী।

এদিকে সামস্-অল-দীন সিৎ-অল-হুসনর কাছে এসে দিশাহারা ভাবে বললো, বেটা মনে হচ্ছে আমার মাথাটা বোধ হয় খারাপই হয়ে গেছে।

—কেন আব্বাজান?



—এ যে সব ভুতুড়ে আজগুবী কাণ্ডকারখানা আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। একটু খোলসা করে বলতো, মা।

হুসন বাবার হাত ধরে কাছে বসায়। বলে, এতো জলের মতো পরিষ্কার, আব্বাজান! সেই প্রিয় দর্শন যুবক গত রাতে উপস্থিত সবারই খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলো। তার সঙ্গেই আমি মধুযামিনী যাপন করেছি। তোমাকে বলতে লজ্জা করছে, আব্বজান, আমার বিশ্বাস, তার সঙ্গে গতরাতে সহবাসের ফলে আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি। এই দেখো তার প্রমাণ—তার মাথার বাদশাহী টুপী, তার টাকাপয়সার বটুয়া, আর ঐ দেখো তার পাতলুন আর ইজের।

চেয়ারের উপরে রাখা টুপীটা হাতে তুলে নিলো সামস্-অল-দীন। এ টুপী তো বসরাহর উজির আমিররা পরে। দেখেই চিনতে পারলো। সোনার পাতে মোড়া। নানা লতাপাতার নক্সা করা চার পাশে। হুসন বসলো, বাবা দেখো, ওর পাতলুনের কোমর বন্ধনীতে কি একটা শক্ত জিনিস।

পাতলুনটা বাবার হাতে এগিয়ে দিলো হুসন।

ক্ষিপ্রহাতে উজির সেলাইটা ছাড়িয়ে ফেললো কোমরবন্ধনীর। একখানা কাপড় জড়ানো তুলোট কাগজ। কাগজখানার ভাঁজ খুলতে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে সে। হুসন, মা পেয়েছি! এই তো আমার জানের ভাই নূর-এর সই কার দস্তাবেজ। টাকা পয়সার বটুয়াটা খুলে দেখলো, এক হাজার সোনার মোহর—সেই সওদাগরের দেওয়া। সেই সঙ্গে একখানা কাগজে

কয়েকটা ছত্র লেখা। বসরাহর সেই সওদাগর একহাজার মুদ্রার বিনিময়ে নূর-অল-দীনের পুত্র হাসান বদর-অল-দীন-এর কাছ থেকে একটা জাহাজ ক্রয় করেছে। এবং নগদে সেই মুদ্রা হাসানের হাতে তুলে দিয়েছে। তারই বয়ান লিখে সওদাগর সই করে দিয়েছে ঐ কাগজে। সামস্-অল-দীন পড়ে উল্লাসে ফেটে পড়লো।—আমার ভাই নূর-অল-দীন। তার ছেলে হাসান বদর-অল-দীন। তারপরে বুক চাপড়াতে লাগলো উজির।—হায়রে আমার আদরের অভিমানী ভাই। রাগ করে চলে গেলে জন্মের মতো। আর দেখা হলো না, আর দেখা হবে না। জানো মা—এই নূর-অল-দীন তোমার আপন চাচা, আমার সহোদর ভাই। হাসান বদর-অল-দীন তার ছেলে। তোমার চাচার ছেলে—তোমার ভাই। এর সঙ্গেই তোমার শাদী হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু একটা তুচ্ছ কারণে আমাদের ঝগড়া বাঁধে। আর তার জন্যে ভাই আমার চিরকালের মতো দেশান্তরী হয়ে গেলো। সে যাই হোক, আজ আঠারো বছর বাদে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। হাসানকেই আমি চেয়েছিলাম জামাই করতে। তা এই নাও, তোমার একহাজার দেনমোহর। শাদীর যৌতুক রেখে গেছে সে।

তুলোট কাগজখানা ভালো করে আর একবার পড়লো উজির। নূর-অল-দীনের জীবনের মোটামুটি রোজনামচা। তার শাদী এবং হাসানের জন্ম তারিখ দেখে অবাক হয় সে। সে কি, এ যে তারও শাদীর তারিখ। হাসানের জন্মতারিখে তার মেয়ে হুসনও তো জন্মেছে। আশ্চর্য খোদার লীলা! উজির আর অপেক্ষা করে না। তড়িঘড়ি সুলতানের কাছে গিয়ে কাগজখানা হাতে তুলে দেয় তার। আদ্যোপান্ত সব কাহিনী খুলে বলে তাকে। সব শুনে হতবাক হয়ে পড়ে সুলতান। এমন আশ্চর্য যোগাযোগ—যেন আল্লাহরই অভিপ্রায় বলে প্রতিভাত হয় তার কাছে। নকল নবীশদের ডেকে বলে, কাহিনীর সব বিবরণ হুবহু লিখো রাখো।

উজির আবার ফিরে আসে মেয়ে হুসনর কাছে। কিন্তু তখনও হাসান ফিরে আসে না। এদিকে বেলা বাড়তে থাকে। উজির উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তবে কি চলে গেছে?

হুসন বলে, কিন্তু বাইরে সে যাবে কি করে আব্বাজান। ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখতে না পেয়ে প্রথমে ভেবেছিলাম সে বাইরে কোথাও গেছে। কিন্তু দরজাগুলো সব যেমন বন্ধ করা হয়েছিলে'—তেমনি বন্ধই ছিলো। আমি নিজে হাতে দরজাগুলো খুলেছি। তার খানিকবাদে তুমি এলে আমার কাছে।

উজির ভাবলো, এও আল্লাহরই এক লীলা। এর অর্থ উদ্ধার করা মানুষের কর্ম নয়।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো রাতের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

তেইশতম রজনী। আবার কাহিনী শুরু হলো। শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, আপনার তো খেয়াল আছে নিশ্চয়ই, জাফর গল্প শোনাচ্ছে আর খলিফা মাঝে মাঝে তারিফ করে উঠছে।

উজির বুঝতে পারলো তার ভাইয়ের ছেলে—তার জামাতা উধাও হয়ে গেছে। কবে ফিরবে কে জানে। কিন্তু দুনিয়ার সব কিছু এতো দ্রুত বদলায় যে আজকের মানুষকে দু'বছর বাদে চেনা দায় হতে পারে। তাছাড়া কত রকমের ঠগ জোচ্চোর আছে—তাদের কত রকম ফন্দী, কে ধরতে পারে। একটিমাত্র রাত—তাও সারাক্ষণ নয়—তার মধ্যে কতটুকু সময়ই বা হুসন তাকে কাছে পেয়েছে? তাকে যদি সে পরে ঠিকঠাক চিনতে না পারে, দোষ দেওয়া যায় না। তাই শাদীর বাসর সজ্জা ভেঙে ফেলার আগে তার একটা নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তুলে বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখার সিদ্ধান্ত করলো। দোয়াত কলম নিয়ে একখানা তুলোট কাগজে ঘরের খুঁটিনাটি সব জিনিসপত্রের হুবহু বর্ণনা লিখে নিতে লাগলো। কোনখানে মঞ্চ—কী ভাবে কী কী

জিনিস দিয়ে তাকে সাজানো হয়েছিলো, ঘরের কোথায় কোথায় ছিলো ঝাড়বাতি, কোথায় মোমবাতি, কোথায় ছিলো ফুলদানি, কোথায় ছিলো টেবিল, কোথায় কখানা চেয়ার ইত্যাদি সব বিবরণ লিখে গেলো উজির। লেখা শেষে কাগজখানা ভাঁজ করে পাতলুন, টুপী, ইজের বটুয়া সব চাদরের সঙ্গে সিন্দুকে ভরে রাখলো। মেয়েকে বললো দরকার হলে কাগজখানা পড়ে দেখো, মা। কাজে লাগতে পারে।

সিৎ-অল যা ভেবেছিলো তাই। শাদীর প্রথম রাতেই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলো। ন'মাস পরে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিলো সে। ছেলের বাবার মতো সেও অনিন্দ্যসুন্দর। ধাত্রী এসে বাচ্চাকে গোছল করিয়ে, কাজল পরিয়ে নাড়ী কেটে ধাইমার কোলে তুলে দিলো। নাম রাখা হলো আজীব—অর্থাৎ আজব, মানে চমৎকার। যখন আজীবের বয়স সাত, কাইরোর এক নাম করা মাদ্রাসায় ভর্তি করা হলো তাকে। প্রতিদিন সে সেজেগুজে দাদামশায়ের এক পুরোনো বিশ্বস্ত নফরের সঙ্গে মাদ্রাসায় যায়। দুপুর বেলায় খানা খেতে আসে। আবার ফিরে যায়। আসে সেই বিকেলে। কিন্তু পাঁচটা বছর পরে মাদ্রাসার পাঠে ইতি করে ঘরে ফিরে আসতে হয় তাকে।

আজীব ভীষণ দুরন্ত ছিলো। তার সহপাঠীদের মানুষ বলেই গণ্য করতো না। সব সময় তার অহঙ্কার ভাব। সে উজিরের নাতি। কথায় কথায় সহপাঠীদের শুনিয়ে দিতে সে কথা। যাই হোক, এই ভাবে পাঁচ বছর কেটে গেলো। একদিন ছেলেরা দল বেঁধে মৌলভীর কাছে নালিশ করলো। মৌলভী সাহেব বড় সদাশয় ব্যক্তি। তিনিও পছন্দ করতেন না আজীবের ডেপোমী। ছেলেদের শান্ত করে বললেন, তোমরা এখন চুপচাপ থাকো। কাল আমি এর বিধি ব্যবস্থা করবো। যাতে আর কখনও সে তোমাদের পিছনে না লাগে। কাল যখন তোমরা সবাই খেলার সময় এক জায়গায় জড়ো হবে, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আজ একটা ভারি মজার খেলা দেখাবো আমি। কিন্তু তার আগে তোমরা সবাই চেঁচিয়ে তোমাদের মা বাবার নাম বলবে—যাতে প্রত্যেকে শুনতে পায়। যদি কেউ তার মা বাবার নাম না বলতে পারে, তবে সে জারজ। তার সঙ্গে আমরা আর কখনও খেলবো না।'

পরদিন সকালে যথারীতি আজীব মাদ্রাসায় গিয়ে পৌঁছলো। খেলার সময় ছেলেরা তাকে ছেঁকে ধরে বললো—আজ আমরা একটা মজার খেলা খেলবো। কিন্তু তার আগে ভাই সবাইকে তার মা বাবার নাম বলতে হবে। যে বলতে পারবে না তাকে আমরা খেলায় নেবো না। কী, সবাই রাজি।

রাজি-রাজি-রাজি বলে সবাই সমস্বরে আওয়াজ তুললো।

—আচ্ছা তা হলে আরম্ভ করা যাক।

একটি ছেলে সামনে এগিয়ে এসে বললো, আমার নাম নবী, মার নাম নবীহাহ্ আর আমার বাবার নাম ঈজ্-অল-দীন। আর একজন এসে বললো, আমার নাম নাবীজ, আমার মায়ের নাম জামিলাহ, বাবার নাম মুসতাফা। এইভাবে একে একে প্রায় সকলেই সবার মা-বাবার নাম বলতে লাগলো। যখন আজীবের পালা এলো, গর্বভরে সামনে এসে বলতে লাগলো, আমার নাম আজীব, আমার মার নাম সিৎ-অল-হুসন আর আমার বাবা মিশরের উজির সামস্-অল-দীন।

তৎক্ষণাৎ সব ছেলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে।—দুয়ো দুয়ো, কিচ্ছু জানো না। তিনি তোমার বাবা কি করে হবেন?

আজীব ক্রুদ্ধ হয়।—তোমাদের ডাণ্ডা মেরে মাথা গুড়িয়ে দেবো। উজিরই আমার বাবা।

ছেলেরা সবাই প্রতিবাদ করতে থাকে।—না না না। কিচ্ছু জানো না তুমি। উজির তোমার বাবা নন। তিনি তো তোমার মায়ের বাবা তোমার দাদু। দুয়ো, বাবার নাম বলতে পারে না। তোমার সঙ্গে আর কেউ খেলবো না।

ছেলেরা কেউ বা মাথায় টোকা মেরে পালায়, কেউবা জামা ধরে টানে আবার কেউ চিমটি কেটে চম্পট দেয়। আজীব একা অতোগুলো ছেলের টিটকিরিতে নাস্তানাবুদ হয়ে ওঠে। এক পাশে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে থাকে, ব্যাপারটা কী?

মৌলভী সাহেব কাছে এসে সস্নেহে বলেন, ওরা ঠিক কথাই বলেছে, বাবা। উজির সাহেব তোমার বাবা নন। উনি তোমার দাদু হন। তুমিও জানো না—আমরাও জানি না তোমার বাবা কে? সুলতান তোমার মার সঙ্গে এক কুঁজো বামনের শাদী দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কখনও তোমার মার সঙ্গে সহবাস করেনি। সে অবশ্য গল্প বলে বেড়ায় শাদীর রাতে বাসরঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও নাকি জীন এসে তোমার মার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে গেছে। আচ্ছা তুমিই বলো, বাবা এসব গাজাখুরি গল্প না? সুতরাং তোমার সহপাঠীরা যা সব বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে তা মোটেই অন্যায্য নয়। ওরা তোমাকে জারজ বলেছে, আমি শুনেছি। যার বাবার ঠিক নাই তাকেই তো আমরা জারজ বলি। সে দিক থেকে তারা তো কিছু অন্যায় বলেনি? রাস্তার একটা নামগোত্রহীন ক্রীতদাসকে আমরা অতো অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করি কেন? কারণ ওর মা-বাবার ঠিক নাই। তাই বলছি, বাবা দেমাকটা একটু কমাও, একটু নরম হয়ে মিলেমিশে চলো দেখবে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে, মাথায় করে রাখবে।



আজীব কিন্তু মৌলভীর উপদেশে কর্ণপাত করলো না। মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো, তার মা—সিৎ-অল-হুসন-এর সামনে।—মা, কে আমার বাবা। কী তার নাম? বলো।

ছেলের এই মূর্তি কখনও দেখেনি সে। চোখের জলে বুক ভেসে গেলো তার। বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, কে আবার, উজির তোমার বাবা।

—না না, মিথ্যে কথা। উজির সামস্-অল-দীন আমার বাবা না। সে তোমার বাবা। আমার বাবা কে বলো?

সিৎ-অল চুপ করে থাকে। উত্তর দিতে পারে না। আজীব কিন্তু নাছোড়বান্দা। চিৎকার করে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলে, বলবে কিনা বলো? যদি না বলো, এক্ষুণি আমি তরোয়াল দিয়ে গলা কেটে ফেলবো আমার।

সিৎ-অল আঁতকে ওঠে।—না না, বাবা, না। অমন কথা মুখে এনো না। বলছি, তোমার বাবার কথা। বলছি, শোনো।

শাদীর প্রথম রাতে এসেছিলো সে।
তার লকলক করা রূপের আগুনে
পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম আমি—নিমেষে।
আমার সকল সত্ত্বা; আমার সকল সঞ্চয়,
দেহ মন প্রাণ
নির্ভয়ে উজাড় করে দিয়েছি তার হাতে,
নিয়ে সে উধাও হলো জানি না কোথায়।
অনেক শীতের রাত,
ফাল্গুনের মাস
একে একে পার হয়ে যায়,

আজও বসে আছি প্রতীক্ষায় তার—দিবস শর্বরী,
আমি এক নিন্দিত শবরী।

মা যত কাঁদে ছেলে আরও বেশী কাঁদে। হুসনর প্রাণ হুহু করে যায়। আজ বারোটা বছর তুষের আগুন জ্বলছে তার বুকে। মুখ ফুটে বলতে পারে না কাউকে। আজ পেটের সন্তান আজীবকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তার দুঃখের কাহিনীর কিছুটা বলতে পেরে, ভার কিছুটা লাঘব হয়।

উজির-এর কাছে খবর পৌঁছয়, আজীব অশান্ত হয়ে উঠেছে। সে তার জন্ম পরিচয় জানতে চায়। তাড়াতাড়ি ছুটে আসে হুসনর মহলে। দেখে মা বেটা দু'জনে আকুল নয়নে কেঁদে চলেছে।

—কী হয়েছে মা, তোমরা কাঁদছো কেন?

হুসন বললো, আজ মাদ্রাসা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা আমার বাবা কে?' আমি কী উত্তর দেবো, আব্বাজান? মাদ্রাসার ছেলেরা তাকে অনেক মন্দ কথা বলেছে। তাই বোধহয় ওর মনে আঘাত লেগে থাকবে।

নাতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে উজির বলতে থাকে, সেই সব অতীত কাহিনী। তার ছোট ভাই নূর-অল-দীন কী কারণে দেশত্যাগী হয় এবং বসরাহয় গিয়ে কবে সে সেখানকার উজিরের কন্যাকে শাদী করে। তারপর হাসানের জন্ম, নূর-এর লোকান্তর এবং শাদীর রাতে হাসানের অলৌকিক আবির্ভাব এবং শাদীর রাত শেষে তার রহস্যজনক অন্তর্ধান—সব সবিস্তারে বর্ণনা করলো সে। অবাক বিস্ময়ে শুনতে থাকে আজীব।

—আমার বাবা কবে ফিরে আসবে, দাদু?

উজির এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। কান্নায় ভেঙে পড়ে—তা তো বলতে পারবো না ভাই। চলো আমরা বসরাহ-য় যাই। তাকে খুঁজে নিয়ে আসি।

উজির সুলতান সমীপে হাজির হয়ে নিবেদন করলো সব বৃত্তান্ত।

—হুজুর, এ ধরনের গুঞ্জন বে-ইজ্জতের ব্যাপার। এভাবে তো আর চলতে দেওয়া যেতে পারে না। একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

সুলতান বললো, এক কাজ করো, উজির। কিছুদিনের জন্য ছুটি দিচ্ছি তোমাকে। যাও, একবার খোঁজ করে দেখে এসো তাকে। আমার মনে হয়, বসরাহতেই বা তার কাছাকাছি কোথাও আছে সে। আমি তার নামে হুলিয়া করে দিচ্ছি। আমার হুলিয়া সঙ্গে থাকলে যে কোন দেশের সুলতান তোমাকে তার সন্ধান দেবার সাধ্যমতো ব্যবস্থা করবে। এবং যেখানে খুশি তুমি যেতেও পারবে।

সুলতানের বদান্যতায় মহা খুশি হলো উজির। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ করে দরবার থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। হুসন ও আজীবকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিনই বসরাহর পথে বেরিয়ে পড়লো। অনেকদিন পরে তারা এসে পৌঁছলো দামাসকাস শহরে। কাইরো থেকে দামাসকাস যতোটা পথ দামাসকাস থেকে বসরাহও ততোটা। এখনও অর্ধেক বাকী। পথের ক্লান্তি কাটাবার জন্য সেখানে দু'টো দিন বিশ্রামের সিদ্ধান্ত করে উজির। শহরের প্রবেশ তোরণের সামনে তাঁবু গাড়লো সে।



উজিরের সঙ্গে যতো নফর চাকর এসেছিলো সবাই দামাসকাস দেখার জন্য ব্যাকুল হলো। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে শহর পরিক্রমা শুরু করলো উজির। সেখানাকর নানারকম মনোহারী জিনিসপত্র সওদা করলো ওরা। নিজেদের দেশের কিছু কিছু বাহারী

জিনিস বিক্রিও করলো কেউ কেউ। শহরের বনেদী হামাম-এ গোছল করলো। ওখানকার বহুপ্রাচীন মসজিদ উম্যাদ-এ নামাজ পড়লো। লোকে বলে দামাস্কাসের এই মসজিদ দুনিয়ার সেরা। এতো প্রাচীন, এতো বিশাল মসজিদ নাকি আর কোথাও নাই।

সবাই যখন এই সব করছে, আজীব তখন শহরের পথে পথে নানা রঙের মজার মজার জিনিসের সন্ধান করে চলেছে। উজিরের পুরাতন ভৃত্য খোজা সাইদ রয়েছে তার পাশে পাশে। তার হাতে একখানা লম্বা লাঠি।

দামাস্কাসের দামাল ছেলেরা আজীবের পিছনে পিছনে ধাওয়া করে। এমন খুবসুরৎ লেড়কা জীবনে দেখেনি তারা। কিন্তু আজীবের বা সাইদের এসব ভালো লাগে না। একটু স্বচ্ছন্দে পথ চলার যো নাই। সাইদ লাঠি উঁচিয়ে ভয় দেখায়—'হট যাও, হট যাও হিঁয়াসে!' কিন্তু ভিড় আরো বাড়তেই থাকে। শুধু ছেলেরাই না, শহরের হাজার হাজার মেয়েপুরুষ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। আজীবের অসাধারণ রূপের কথা চাউর হয়ে গেছে সারা শহরে। কেউ বলে, এমন রূপের বাহার কোন মানুষের হয় না। নিশ্চয়ই কোন বেহেস্তের দূত মাটিতে নেমে এসেছে। আবার কেউ বলে আসমানের শুকতারার মতো আলো ঠিকরে পড়ছে তার শরীর থেকে।

ভিড় ক্রমশই বাড়তে থাকে। জনতার চাপে আজীবের দেহে আঘাত লাগতে পারে আশঙ্কায় সাইদ চিৎকার করে ওঠে।—কী; হচ্ছে কি? তোমরা কি ছেলেটাকে পিষে মেরে ফেলবে নাকি? এতো দেখবার কি আছে? আসমানের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে বুঝি। যত্তোসব...

কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করে না। সাইদ তখন লাঠি নিয়ে তাড়া করে। কিন্তু এভাবে আর কাঁহাতক পারা যায়। দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে ওরা এক সময় এক খাবার-এর দোকানের সামনে এসে পড়ে। সাইদ ভাবে, জনতার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়া ছাড়া বোধহয় আর গতি নাই।

এই খাবারের দোকানের সঙ্গে আপনাদের একবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। হাসান বদর-অল-দীন একদিন চেংড়া ছোঁড়াদের তাড়া খেয়ে এই দোকানেই আশ্রয় নিয়েছিলো। তারপর থেকে সে আর এ দোকান থেকে চলে যায়নি। দোকানের মালিক তাকে আদর করে আশ্রয় দিয়েছিলো। পরে তাকে নিজের ছেলের মর্যাদায় দোকানের কাজে বসিয়ে তার হাতেই চাবি তুলে দেয়। আজ বারো বৎসর এই দোকানেই আটকে পড়ে আছে হাসান। মালিক আজ তিন বছর হলো দেহ রক্ষা করেছে। এখন সেই পুরোপুরি মালিক। সে-দিন নানারকম খাবারের মধ্যে একটা খুব মুখোরোচক খাবার বানিয়েছিলো সে। বেদানার হালওয়া। সারা দামাসকাস শহরের আর কোন দোকানে এ খাবার পাওয়া যায় না। দামাসকাস শহরেই বা বলি কেন, তামাম দুনিয়ার কেউ এ খাবার বানাতে পারবে না। শুধু একজন ছাড়া। সে তার মা। ছোটবেলায় প্রায়ই সে এই হালওয়া তৈরি করে খাওয়াতো তাদের। মা-র কাছ থেকেই তার শেখা।

আজীবকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসানের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে তার নিখুঁত চেহারা—রূপ। এ ছেলে তো কোনো সাধারণ ঘরের না।—খোকা ভেতরে এসো, না! এসো, ভেতরে এসে বসো। তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে! তোমার চাঁদের মতো সুরৎ দেখে আমার কেমন যেনো সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেনো তোমাকে দেখেছি, বাবা। কিছুতেই মনে করতে পারছি নে। অথচ মনে হয়, খুবই চেনা, খুবই আপনার। ভেতরে এসে বসো, বাবা। তোমাকে একটু মিষ্টি-মুখ করাতে চাই। আমি নিজে হাতে বানিয়েছি।

হাসানের কথা শুনে আজীবের ভালো লাগে। সাইদের দিকে চেয়ে বলে, দেখো, বাবা-সাইদ, মনে হয়, লোকটা বড় দুঃখী। বোধহয় আমার মতো একটা ছেলে ছিলো তার। হয়তো বা সে বেঁচে নেই। অথবা থাকলেও তার কাছে নেই। চলো লোকটা যখন অতো করে

ডাকছে ভেতরে গিয়ে বসি। সে যেমন তার ছেলের জন্যে পাগল আমিও তো তেমনি আমার বাবাকে খুঁজতেই পথে বেরিয়েছি। তার কথা শুনলে আল্লাহ খুশি হবেন। তিনি হয়তো আমার বাবাকে ফিরিয়ে দেবেন।

কিন্তু সাইদ সঙ্গে সঙ্গে 'না না' করে ওঠে। ওরে সব্বোনাশ উজিরের ছেলে হয়ে তুমি এই বাজারের দোকানের খাবার খাবে, তা কক্‌খনো হয় না। উজির জানতে পারলে আমার গলা কেটে ফেলবে। তোমার কিচ্ছু ভয় নাই। তোমাকে এই লোকগুলো যারা ঘিরে ধরেছে তাদের আমি এক্ষুণি লাঠি-পেটা করে ভাগিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তাই বলে তুমি দোকানের ভিতরে গিয়ে বসবে—তা হতে পারে না। তোমার কত মান ইজ্জত। উজিরের ছেলে তুমি। একটু তুচ্ছ মেঠাইওলার দোকানে বসে যা তা খাবে, তা হয় না।

সাইদের কথা সবই শুনতে পায় হাসান। চোখে ভরে আসে জল। কাকুতি মিনতি করে বলে, মেহেরবানী করে একটিবার আমার দোকানে তোমার পায়ের তুলে দাও, মালিক—। আমি মনে একটু শান্তি পাবো। আমাকে এইটুকু অনুগ্রহ করো, বাবা। আল্লাহ তোমাকে সুখে রাখবেন। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

সাইদ বলে, সে হয় না দোকানি। আমার মালিক তোমার দোকানে বসে বারোজনে যা খায় সে জিনিস খেতে পারে না। কত বড় ঘরের ছেলে সে। তার বনেদীয়ানা নষ্ট হয়ে যাবে, না!

হাসান এবার সাইদের মন ভিজাতে বলে, তোমার বাইরেটা ঝুনো নারকেলের মতো অতো শক্ত হলে কি হবে, আমি বুঝেছি, ভেতরটা ধবধবে সাদা মিষ্টি শাসে ভরা।

হাসানের কথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ঝুনো নারকেল সাইদ।—আচ্ছা! তাই নাকি? বাঃ, বেশ মজার কথা বলতে জানো তো!

হাসান আবৃত্তি করে ঃ একান্ত সে অনুরক্ত, সুলতানের বিশ্বস্ত নফর।
জুড়ি তার পাবে নাকো, করে এসো দুনিয়া সফর॥
আপন মাথার মণি—অন্তরের ধন।
তার হাতে তুলে দেয়, নিশ্চিন্ত নির্ভর অনুক্ষণ॥

যাদু মন্ত্রের মতো কাজ হলো এই কবিতার কটা ছত্রে। প্রশংসায় কে না খুশি হয়! আজীবের হাত ধরে দোকানে ঢুকে পড়ে সাইদ।

হাসান যেনো আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। বাদশাহ সুলেমানের সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন হাতের মুঠোয় পেলেও এতো আনন্দ হতো না তার। অপলক নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে আজীবকে। দেখে দেখে যেনো আর আশ্ মেটে না।

দু'খানা তামার রেকাবী করে বেশ খানিকটা বেদানার হালওয়া এনে রাখলো আজীবের সামনে।—আজ আমার বড় আনন্দের দিন, তোমাকে মিষ্টিমুখ করাতে পারছি। আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে, বাবা। যতো দিন বাঁচবো।

আজীব আর সাইদ প্রাণভরে তৃপ্তি করে খেলো। বেদানার দানাগুলোর সঙ্গে চিনি, দুধ, বাদাম, পেস্তা, মনাক্কা এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে তৈরি এই বেদানার হালওয়া। এমন সুন্দর মিষ্টি গন্ধ—সারা দোকান ঘরটা ভরপুর হয়ে গেছে। সবটুকু চেটেপুটে খেলো দু'জনে। আজীব মহা খুশি। বাঃ বেড়ে মজার জিনিস। আমাদের হালুইকররা তো বানাতে পারে না, বাবা-সাইদ?

সাইদ বলে, আমি বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি। অনেক সুলতান বাদশাহর নেমন্তন্ন খেতেও গেছি তোমার দাদুর সঙ্গে। কিন্তু কই, কোথাও তো এমন খাবারের নামও শুনিনি কখনও!

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আজীব বললো, বড় চমৎকার তোমার হালওয়া দোকানি। তা তুমি নিজে একটু খাও। সারা দিন রাত শুধু খেটেই চলেছো, একটু বসো আমাদের পাশে, গল্প করি।

হাসান পিস্তার বরফী বানাচ্ছিলো। হাতটা ধুয়ে এসে আজীবের পাশে বসলো।—ঠিক আছে আজ আর কোন কাজ নয়, বলো, আজ তোমার কথাই শুনবো শুধু।

আজীব বললো, জানো আমিও বড় দুঃখী। আমার বাবা কোথায় চলে গেছে সেই কবে, আর ফেরেনি। আমি আমার মা আর দাদু দেশে দেশে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাকে। হয়তো এমনি করে খুঁজতে খুঁজতে সারা দুনিয়াটাই ঘুরে বেড়াতে হবে। জানি না, খোদার কি ইচ্ছা। তুমিও একটু আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙ্গো না, দোকানি। আমার বাবাকে যেনো আমরা তাড়াতাড়ি খুঁজে পাই।

আজীবের চোখে জল এলো। হাসানও রুদ্ধ করতে পারে না তার অশ্রু। এই দশা দেখে সাইদের বুকটা টনটন করে ওঠে। ভাবে, শুধু মেঠাই মণ্ডাতে পেট ভরলেও প্রাণ ভরে না।

যাই হোক, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়, এবার তারা উঠে পড়ে তাবুর পথে রওনা হয়ে পড়ে।

আজীব চলে যেতেই হাসানের প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। সব যেন কেমন ফাঁকা শূন্য হয়ে যায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। চটপট দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে রাস্তায় নেমে পড়ে। দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দামাসকাসের প্রধান তোরণ দ্বারের কাছে চলে আসে। সামনে অদূরে দেখতে পেলো ওরা দু'জনে চলেছে। চলার গতি মন্থর করে ওদের পিছনে পিছনে অনুসরণ করতে থাকে। হাসানের কিন্তু কখনও মনে হয়নি, আজীব তার নিজের ঔরসের সন্তান।

সাইদের সন্দেহ হয়, কে যেন তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করে আসছে। হঠাৎ পিছন ফিরে দু'পা পিছিয়ে এসে হাসানকে প্রশ্ন করে, আমাদের পিছনে পিছনে আসছো কেন, তুমি? কী মতলব তোমার?

হাসান বলে, শহরের বাইরের একটু কাজে যাচ্ছি। তা তোমরাও এই পথে যাচ্ছো দেখে একটু পা চলিয়ে কাছে এলাম। একই যখন পথ, একটু গল্পসল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

সাইদ কিন্তু ক্ষেপে গেলো তার কথায়—তুমি কি ভেবেছো একটু হালওয়া খাইয়ে আমাদের মাথা কিনে নিয়েছো? মনে হচ্ছে, এখনি বমি করে দিই।

কিন্তু আজীব দেখলো, সাইদের এই কথায় হাসানের মুখা কালো হয়ে গেলো। বললো, তা আসুক না, কি হয়েছে? খোদার তৈরি পথে সব সাচ্চা মুসলমানেরই সমান অধিকার। ওর পথে ও চলবে, আমাদের কি ক্ষতি? তবে যদি সে আমাদের তাঁবুর দিকেও যেতে থাকে তা হলে মজা টের পাইয়ে দেবো বাছাধনকে।

প্রধান তোরণ দ্বার পার হয়ে ওরা হাসাবার দিকে পা বাড়ালো। হাসাবার সমতলে তাঁবু গেড়েছে ওরা। হাসানও বাঁদিকে বেঁকে ওদের পিছু নিলো। এবার আজীব রেগে আগুন। তা হলে তো সাইদ ঠিকই বলেছে। লোকটার মতলব খারাপ। একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে মারলো হাসানকে। অব্যর্থ লক্ষ্য। পাথরটা গিয়ে আঘাত করলা হাসানের কপালে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত চেপে বসে পড়লো পথের উপর। রক্তে ভেসে যেতে লাগলো ওর সারা মুখ। আজীবের হাত ধরে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে তাঁবুতে এসে পৌঁছলো সাইদ।

নিজের হঠকারিতার জন্যে নিজেকেই দোষারোপ করতে লাগলো হাসান। কেন-বা সে তার দোকান বন্ধ করে তাদের পিছু ধাওয়া করতে গেলো। ওরা তো তাকে বারণ করেছিলো। সে তো তা শুনলো না, মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাদের পিছু নিলো কেন? ফিরে এসে আবার দোকান খুলে বেচাকেনা করতে লাগলো হাসান। আজ তার মা-র একটা কথা বার বার মনের মধ্যে নাড়া দিতে লাগলো। নিয়তি কখনো এড়ানো যায় না।

দু'দিন দামাসকাসে কাটাবার পর তৃতীয় দিনের শেষে তাঁবু গুটিয়ে আবার বসরাহর পথে যাত্রা করলো সামস-অল-দীন। চলার পথে হীম, হামাহ, আলেপ্পো, দিয়ার, বাকর,

মরিদীন, মসুল প্রভৃতি নানা ছোট বড় গ্রাম-শহর পেরিয়ে চললো। অবশেষে একদিন বসরাহয় এসে পৌঁছলো তারা।

সব আগে গিয়ে উঠলো সুলতানের দরবারে। যথাযোগ্য শাহী কায়দায় কুর্নিশ জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলো সুলতানের কাছে।

—আপনার পূর্বতন উজির নূর-অল-দীনের বড়ভাই আমি। মিশরের উজির পদে বহাল আছি।

সুলতানও খুব খাতির যত্ন করে বসালো তাকে। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলো। বললো, নূর-অল-দীন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আমি তার কথা আজও ভুলতে পারি না। সে আমার বড় প্রিয় ছিলো। তার কাজে কামে, আচারে ব্যবহারে আমি কেন, আমার সল্‌তানিয়তের প্রতিটি মানুষ মুগ্ধ ছিলো। তার মতো মানুষ লাখে একটা মেলে। আর তার হীরের টুকরো ছেলে—হাসান, সে আমার চোখের মণি ছিলো। তাকেও হারিয়েছি আমি আজ তেরো বছর। কোথায় যে চলে গেলো—কেউ বলতে পারে না। তার মা—নূর-অল-দীনের বিধবা বিবি এখনও এই বসরাহতেই পড়ে রয়েছে। ছেলের প্রতীক্ষায়। যদি কখনও সে ফিরে আসে—সেই আশায়। নূর-অল-এর শ্বশুরও বিচক্ষণ উজির ছিলো আমার দরবারে। অনেক আগেই সে দেহ রক্ষা করেছে।

হাসানের মা-র কথা শুনে তাকে দেখার জন্য ব্যগ্র হলো সামস্-অল-দীন। লোকজন সঙ্গে দিয়ে সামস্-অল-দীনকে হাসানের মা-র কাছে পৌঁছে দিলো সুলতান।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে নূর-এর প্রাসাদোপম বিরাট ইমারৎ। নানা বিচিত্র রঙের মারবেল পাথরে তৈরি। সদর দরজায় ঢুকতেই সোনার ফলকে উৎকীর্ণ করা নূর-অল-দীনের নামের ফলক চোখে পড়লো। সামস্-অল-দীন নামটার উপর হাত বুলিয়ে কি যেন অনুভব করলো। চোখ জলে ভরে এলো।

রুদ্ধকণ্ঠে অনর্গল আওড়াতে থাকলো ঃ

সকালবেলায় সূর্যকে প্রতিদিন জিজ্ঞেস করেছি
তোমার কথা। সন্ধ্যাবেলার শুকতারাকেও।
হায়রে আমার নসীব। কেউ তো জবাব দেয়নি!
কিন্তু ওরা তো সবাই জানতো তোমার ঠিকানা—
তুমি এখানেই আছো।
কত হাজারো স্বপ্ন দেখেছি, কতো সব!
কিন্তু ভাই আমার—
তোমাকে তো কখনও পেলাম না আমার খোয়াবে?
একবার ফিরে এসো, দেখে যাও,
এখনো আমার মন তেমনি সবুজ আছে—
তেমনি কোমল। সেই যখন দুভাই একসাথে
ঘুরে বেড়াতাম নীলের তীরে—ঠিক তেমনি।
আবার যদি ফিরে আসো একবার!
আবার যদি তেমনি করে হাসো!
সেই আকাশ ফাটানো দিলখোলা হাসি—
জলপ্রপাতের মতো উচ্ছল—নির্ঝর।
লোকে বলে, কত নাম যশ, কত বড় দিল্ আমার।



কিন্তু ওরা তো জানলো না, শুধু তোমার জন্যে
খাটো হয়ে মাথা হেঁট করতেও দ্বিধা ছিলো না আমার।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করলো সামস্-অল-দীন। হাসানের মা-র রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতে খুলে গেলো। হাসান উধাও হওয়ার দীন থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোকানলে জ্বলছে সে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা তাজিয়া সাজিয়ে রেখেছে। তার ধারণা, হাসান—তার আদরের দুলাল আর বেঁচে নাই। তাই তার স্মৃতি হিসাবে এই তাজিয়াটা তৈরি করিয়েছে। সারা দিন রাত তাজিয়াটার সামনে বসে ছেলের কথা ভাবে সে।

তাজিয়া, তুমি কি বলতে পারো সে আর এ জগতে নাই!
সে কি তোমার কোলেই মাথা রেখেছে?
আর কি তাকে দেখতে পাবো না কোনদিন?
দুনিয়াটা আমার কাছে আজ শুকনো এক সাহারা,
খালি ধূ ধূ করা ধুলো আর বালি।
ঐ দূর আশমানের তারাদের ভীড়ে,
এক নওজোয়ান শাদীর পাত্রের সাজে,
সে তো তোমার কোলেই শুয়ে আছে...

হাসানের মা-র এই শোকগাথা শুনে দরজার সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সামস-অল-দীন। একটু পরে হাসানের মা উঠে এসে স্বাগত জানায়। ভিতরে এসে বসে সামস্-অল-দীন। প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে পরে আগাগোড়া সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বললো তাকে। কীভাবে তার কন্যার শাদীর রাতে সে বাসর ঘরে ঢোকে, কীভাবে তার সঙ্গে শাদী হয়। এবং কীভাবে তার সঙ্গে রাত্রিবাস করে সকাল হওয়ার আগেই রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান হয়—সব কাহিনী। তারপর আজীবকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে, এই নাও তোমার নাতি—আমার নাতি। এই-ই এখন আমাদের একমাত্র শুকতারা। একে বুকে জড়িয়ে মনের শোকতাপ কিছুটা হাল্কা করো।

সামস-অল-দীনের কথায় বুঝলো তার ছেলে হাসান তাহলে বেঁচেই আছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে।

ওরা যারা বলেছিলো ম'রে গেছে সে;
বিশ্বাস করি না—করি না সে কথা।
বহুকাল পরে আজ আমি ক্ষুধার্ত জননী,
খানা দাও খাবো, প্রাণ খুলে গাবো
আজ উৎসবের গান। নানা সাজে সাজাও আমাকে।

আজীব এগিয়ে এসে দাদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। সামস-অল-দীন বলে, এখন তো কান্নার সময় নয়, মা। অনেক কাজ বাকী আমাদের। নাও, তৈরি হয়ে নাও, আর দেরি না, এখুনি আমরা রওনা হয়ে যাবো মিশরের পথে। হাসানকে খুঁজে বের করতেই হবে।

হাসানের মা চটপট তৈরি হয়ে নিলো। সামান-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেলো। পথের খানাপিনা যোগাড় যন্তর করলো। জনকয়েক নফরদাসী নিয়ে সামস্-অল-দীনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো পথে।

বসরাহ ত্যাগ করার আগে সুলতানের কাছে বিদায় নিতে গেলো তারা। নানারকম সুন্দর সুন্দর বাহারী জিনিস উপহার দিলো সুলতান। মিশনের সুলতানের জন্যেও দিলো আরও অনেক মূল্যবান উপঢৌকন। এর পর আজীব, হুসন, হাসানের মা আর নফরচাকরদের সঙ্গে নিয়ে বসরাহ ছেড়ে ফিরে চললো সামস্-অল-দীন।

কয়েকদিন পরে আবার তারা এসে পৌঁছলো দামাসকাসে। দু'একদিন একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে আবার তারা তাঁবু গাড়লো ঐ একই জায়গায়। সামস্-অল-দীন বললো, এখানে কয়েকটা দিন থাকবো আমরা। সুলতানের জন্যে কিছু কেনাকাটা করবো এখানকার বাজারে।

পরদিন উজির গেলো বাজারে—সওদাগরী দোকানে। আজীব তখন আব্দার ধরলো, বাবা সাইদ চলো আমরা শহরে এদিক ওদিক একটু ঘুরে আসি। মজার মজার কত কি দেখা যাবে। তা ছাড়া ওই হালুইকর লোকটা কেমন আছে তাও একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। আহা, লোকটাকে সেদিন অমন করে ঘায়েল না করলেই হতো। কি সুন্দর মেঠাই খেতে দিয়েছিলো আমাদের।

সাইদ বললো, যা বলবে, মালিক।

আজীব আর সাইদ দামাসকাসের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে। কত সুন্দর সুন্দর সাজানো গোছানো দোকানপাট কত মজার মজার উট, গাধা, আর ঘোড়ার মিছিল। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। সূর্য পাটে বসেছে। দেখলো দলে দলে মুসলমানরা চলেছে বানু য়ুমায়াদ মসজিদে সন্ধ্যাকালীন নামাজ পড়তে। আজীবের চিনতে অসুবিধা হলো না, সেই হালুইকরের দোকানের সামনে এসে পড়েছে তারা। দোকানের বাইরে থেকেই দেখতে পেলো, আজও সে সেই বেদানার হালওয়া বানিয়েছে। খুশবুতে ভরে গেছে চারপাশ। দোকানের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখলো দোকানি আছে কিনা। তার মাথার ঘাটা শুকিয়েছে কিনা, তাও একবার দেখতে চায় সে। দেখলো, ঘা শুকিয়েছে কিন্তু দাগটা মিলায়নি।

—কেমন আছো গো, হালুইকর। সারাটা পথ তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে আসছি। আমাকে চিনতে পারছো তো! আহা, সেদিন জব্বর লেগেছিলো তোমার।

হঠাৎ আজীবকে সামনে দেখে হাসান কেমন স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। জল ভর্তি গামলাটা হাত থেকে পড়ে যায়। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। মাথাটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে। জীভটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না। মুহূর্তমাত্র। তার পরে নিজেকে সংযত করে বলে, ভিতরে এসো, মালিক। যদি মেহেরবানী করে আজকেও একটু মিষ্টি-মুখ করো খুব খুশি হবো। আল্লাহ জানেন কেন, সেদিন তোমাকে দেখা অবধি দিন রজনী তোমার কথা মন থেকে সরাতে পারি না। কী যাদু আছে তোমার ঐ চোখে। ঘুমের ঘোরেও তোমার ঐ চোখ দু'টো ভেসে ওঠে আমার সামনে। তোমাদের পিছু ধাওয়া করা আমার খুব বোকামী হয়ে গিয়েছিলো। সে জন্যে পরে আমাকে অনেক অনুতাপও করতে হয়েছে।

আজীব বলে, তুমি তো ভারি সাংঘাতিক লোক! আদর করে ডেকে মেঠাইমণ্ডা খাইয়ে আবার আমাদের জানে ভয় ধরানোর জন্যে পিছু ধাওয়া করেছিলে! কিন্তু কেন? আজ আর তোমার দোকানে ঢুকবো না। আগে হলফ করো আমাদের পিছু নেবে না, তবে তোমার হালওয়া খেতে পারি। না হলে আর কক্‌খনো আসবো না তোমার দোকানে। আমরা এবার এক হপ্তা থাকবো দামাসকাসে। আমার দাদু সুলতানকে ভেট দেবার জন্যে হরেক রকম বাহারী সওদা করবে।

—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বাছা। আর কখনও তোমাদের পিছু নেবো না। এসো ভিতরে এসো।

আজীব আর সাইদ খুব মৌজ করে খেতে থাকলো সুন্দর মিষ্টি আর মধুর সেই বেদানার হালওয়া। আজীব বললো, ও হালুইকর, কই তুমিও এসো, তুমিও খাও আমাদের সঙ্গে। আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙ্গো, যাতে আমার বাবাকে খুঁজে পাই।

হাসান ওদের সামনে এসে বসলো। অপলক ভাবে আজীবকে দেখতে থাকে। কোন কথা বলতে পারে না। তার একভাবে চেয়ে থাকার ভঙ্গীটা ভালো লাগে না আজীবের। একটু বিরক্ত হয়েই বলে, হাঁ করে কি অমন দেখছো, বলো তো। আমার মুখে কি বেদানার

হালওয়া মাখানো আছে—চেটে চেটে খাচ্ছো? দোহাই বাপু, তোমার চোখ দু'টো সরাও। গিলে খাবে নাকি আমার মুখটা।

হাসান হাসে। রাগ করে না ওর কথায়, কবিতা করে বলে ঃ

তোমার ইশারায় সূর্য যদি নিভে যায়—যেতে পারে,
রূপোলী তারারাও খ'সে যেতে পারে হয়তো বা,
চাঁদকেও ছিঁড়ে নিলে নিতে পারো—হতে পারো আরও শক্তিধর।
তবু বলি শোনো বন্ধু,
আন্দাজ পাবে না আমার অপার আনন্দ উৎসর।

এছাড়াও হাসান আরও সুন্দর সুন্দর ছড়া, শায়ের শোনাতে লাগলো আজীব আর সাইদকে। কথা আর কবিতায় ভুলিয়ে রাখলো তাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পরেও প্রায় এক ঘণ্টা। তারা বুঝতেই পারে না, কিভাবে এতোটা সময় কেটে যায়। মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে দু'জনে। একটা বাটিতে ঈষৎ গরম জল এনে নিজে হাতে আজীবের হাত ধুইয়ে দেয়। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেয় হাত আর মুখ। কুলুঙ্গী থেকে গুলাবজলের পিচকারীটা নামিয়ে এনে পিচকারী করে দেয় তার গায়ে। তারপর দু' গ্লাস সরবত এনে সামনে রাখে।—নাও, খাও।

সুন্দর সুমিষ্ট গুলাবের সরবৎ। খেয়ে মন ভরে যায় দু'জনের। খাওয়াদাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে তারা, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তাঁবুতে ফিরে দেখে মা দাদী সবাই চিন্তিত হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছে। বিদেশ বিভুঁই জায়গা—কি জানি কি হয়। আজীব ছুটে গিয়ে প্রথমে মাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। তারপর দাদীকে। দাদী তো কেঁদে আকুল। বলে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি, ভাই?

—বাজারে দাদী।

—তবে তো খিদে পেয়েছে খুব। আয়, খেতে দিই।



উঠে গিয়ে একটা সুদৃশ্য চীনামাটির পিরিচে করে খানিকটা বেদানার হালওয়া এনে রাখে আজীবের সামনে। বসরাহতে প্রায়ই করে খাওয়াতো সবাইকে। খেয়ে সবাই তারিফ করতো তাকে। এমন সুন্দর মেঠাই শহরের কোন দোকানে কিনতে পাওয়া যেতো না। বানাতে পারতো না কেউ। হাসানের মার এটা নিজস্ব আবিষ্কার বলা যায়। সাইদকেও বলে, তুমিও তোমার মনিবের সঙ্গে বসে যাও, খেয়ে দেখো, আমার তৈরি বেদানার হালওয়া কেমন লাগে। তোমাদের মিশরে কেন, দুনিয়ার কোথাও কেউ বানাতে পারবে না এ জিনিস।

হতভাগ্য খোজা সাইদ হাসতে চেষ্টা করে। —জী আজ্ঞে এখন দেবেন না। হুজুরের সঙ্গে বসে খাবো, তাকি হয়?

আজীব খানিকটা হালওয়া মুখে পুরে এগাল ওগাল করতে থাকে। কিন্তু বিচ্ছিরি স্বাদ। চিনি কম, খুশবু নাই। কেমন এক অদ্ভুতভাবে মুখব্যাদান করে আজীব বলে, এ কেমন হালওয়া, দাদী, একদম ভালো হয়নি।

—কী বলছিস, দাদু। আমি বানাতে জানি না? এক সময়ে এই বেদানার হালওয়া খেয়ে তোর বাবা কি তারিফ করতো। কেমন করে কি কি মসলাপাতি দিয়ে আমি বানাই—সব শিখে নিয়েছিলো আমার কাছে। পরে আমাকে করেও খাওয়াতো মাঝে মাঝে। তা আমার চেয়ে খারাপ হতো না। তাই বলে আমার হালওয়ার নিন্দে তো শুনিনি তার কাছে। তুই তার ব্যাটা হয়ে আমার নিন্দে করছিস আজ?

আল্লা সাক্ষী, দাদীমা, আমি কোন বানিয়ে বলছি না। সত্যিই তোমার মেঠাই-এ মিষ্টি কম হয়েছে। আর সেই খুশবু কোথায়—নাকে লাগলেই জিভে জল আসে? তাহলে তোমাকে সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, দাদী। কিন্তু খবরদার মা আর দাদু যেনো জানতে না পারে। তাহলে একেবারে কোতল করে ফেলবে। আমি আর বাবা-সাইদ এইমাত্র বাজারের একটা হালুইকরের দোকানে খেয়ে এসেছি এই বেদানার হালওয়া। এই-সা চমৎকার খেতে, কী বলবো তোমাকে। গন্ধ পেলে মরা মানুষ উঠে বসে খাবে। এখনো মুখে লেগে আছে তার স্বাদ। তাই তোমারটা আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, ওর কাছে একেবারে পানসে। তুমি বোধ হয়, ঠিক ঠিক মশলা-পাতি যা লাগে, দিতে পারোনি।

তখন দাদীমা রেগে আগুন হয়ে সাইদকে বললো...

এই সময় প্রায় সকাল হয়ে যাচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুনিয়াজাদ বললো, তোমার বলার কি মিষ্টি কায়দা, দিদি! আর কী করেই বা বলো এমন সুন্দর কিস্‌সা।

শাহরাজাদ বলে, এখনো তো গল্পটা শেষ হয়নি। কাল রাতে বাকীটা যখন শুনবে, আরও ভালো লাগবে। নাও, এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

শারিয়ার ভাবে, মেয়েটার গল্পগুলো সব শুনতে হবে। তারপর ওকে মারবো।

তারপর দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে ওরা। দরবারের সময় হলে উঠে শাহজাদার সাজে—সজ্জিত হয়ে দরবারে যায়। এক এক করে হকুমতের সব কাজ সমাধা করে দিনের শেষে আবার অন্দর মহলে ফিরে আসে শারিয়ার। রক্তে ধরেছে গল্প শোনার নেশা। শাহরাজাদও প্রতীক্ষায় ছিলো তারই।

চব্বিশতম রজনী। ওদের দৈনন্দিন কাম কলা শেষ হবার পর নিচের কার্পেট থেকে উঠে আসে দুনিয়াজাদ। বলে, এবার তোমার কাহিনী শোনাও, দিদি।

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ শুনুন, জাঁহাপনা, তখন আজীবের দাদীমা আগুন হয়ে সাইদকে বললো, হতভাগা কোথাকার এই ভাবে ছেলেটার সর্বনাশ করেছো? এতো বড় স্পর্ধা তোমার কি করে হলো, একটা তুচ্ছ হালুইকরের দোকানে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়েছিলে তাকে। মান ইজ্জত কিছুই গ্রাহ্য করোনি। এতো বড়ো শয়তান তুমি।

সাইদ বেমালুম অস্বীকার করে। —না দাদীমা, ওর কথা ধরবেন না। হালুইকরের দোকানে যাইনি। আমরা দোকানটার পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছি শুধু।

কিন্তু হাঁদা গঙ্গারাম আজীব এর গূঢ়ার্থ বুঝলো না। চিৎকার করে তাঁবু মাথায় করলো। —হেই আল্লাহ, কি বলে শোনো, আমরা বলে যাইনি দোকানে। আমরা দোকানে বসলাম। দোকানী কত আদর করে বেদানার হালওয়া খেতে দিলো। আমি খেলাম, তুমিও খেলে। আবার বলে দোকানে যাই-ই নি। একেবারে সব ভুলে মেরে দিয়েছো? তোমার মাথাটা একেবারেই গেছে বাবা-সাইদ। হেকিম দেখাও। দাদীমা ওর কথা শুনো না, আমরা সত্যিই গিয়েছিলাম। আর পেট পুরে খেয়েছিও দু'জনে। আঃ, কী সুন্দর হালওয়া দাদী, কী তার বাস, আর কী তার স্বাদ। গন্ধেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়।

হাসানের মা এবারে উজিরের কাছে ছুটে যায়। নালিশ জানায়, ঐ কালো কুৎসিৎ খোজাটা কি সাংঘাতিক কাণ্ড করেছে, আপনি একবার শুনুন।

হাসানের মার কাছ থেকে সব শোনার পর উত্তেজিত হয়ে সাইদকে ডেকে পাঠায় উজির।

—যা শুনেছি, সব ঠিক? আজীবকে নিয়ে তুই হালুইকরের দোকানে গিয়েছিলো।

—জী হুজুর, না।

ভয়ে কুঁকড়ে গেলো সাইদ। কিন্তু আজীব বলে ডাঁহা মিথ্যে কথা, দাদু। ও আর আমি দু'জনেই খেয়ে এসেছি হালুইকরের দোকানে। পেট পুরে বেদানার হালওয়া খাওয়ার পর আবার এক গেলাস করে গুলাবের সরবৎও খেতে দিয়েছিলো আমাদের। ভারি সুন্দর। দিল্ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সাইদ কিন্তু তখনও বলে, না তারা সেখানে যায়নি, বা খায়নি।

উজির বলে, ঠিক আছে, এক্ষুণি প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এখানে বোস। আমার ভাইয়ের বিবি যা বানিয়েছে পেট ভরে আজ খেতে হবে তোকে। একটুও নষ্ট করতে পারবি নে। তাতেই বোঝা যাবে, খেয়েছো কি খাওনি।

সাইদ প্রাণপণে পেটে পুরে নেবার চেষ্টা করলো। যতটা সম্ভব। কিন্তু প্রথম গ্রাসটাই গিলতে পারলো সে। বমি করে ফেললো। পেটে আর জায়গা থাকলে তো ঢুকবে। মিথ্যে করে আবার একটা গপ্পো বানিয়ে বলে, গতকাল নফরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোগ্রাসে অনেক কিছু খেয়ে ফেলেছিলো সে। তাই আজ সারাটা দিন পেটের গোলমাল চলছিলো। বদহজম।

কিন্তু উজির বুঝতে পারলো, আগাগোড়া পুরোটাই মিথ্যে বলে যাচ্ছে। অন্য একটা নফরকে ইশারা করতেই দামাদ্দম পেটাতে শুরু করলো সাইদকে। পিটুনির ঠেলায় কবুল করলো, হ্যাঁ, সে আর আজীব হালুইকরের দোকানে খেয়ে এসেছে। এবং তার কথা থেকে এও বেশ বোঝা গেলো, সেই বেদানার হালওয়া সত্যিই অপূর্ব। তার কাছে দাদীমার হালওয়া এককথায় 'অখাদ্য'।

উজির হো হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু হাসানের মা আরও আহত, আরও গম্ভীর হয়ে গেলো। তার অহঙ্কারে আঘাত লেগেছে। —মিথ্যেবাদী। বিশ্বাস করি না, আমার চেয়ে ভালো বেদানার হালওয়া কেউ বানাতে পারে। আমার হাতের জিনিস খেয়ে দুনিয়াশুদ্ধ লোক বাহবা দিয়েছে এতোকাল। আর ওরা বলছে আজ, আমার হালওয়া মুখে তোলা যায় না। যা, নিয়ে যা একটা বাটি, নিয়ে আয় দেখি, তোর কেমন সে হালওয়া। আমার স্বামীর বড়ভাই খেয়ে বিচার করবেন, কারটা ভালো।

সুতরাং সাইদ একটা চিনেমাটির বাসন আর আধলা দিনার নিয়ে রওনা হয় হালওয়া আনতে। দোকানে এসে হালুইকরকে বললো, দেখো ভাই, আমাদের বাড়ির একজন খানদানি আদমি তোমার ঐ বেদানার হালওয়া খাবে। আমাকে এই বাটিটায় আধ দিনারের মতো দাও। বাড়িতেও আজ এই হালওয়া বানানো হয়েছে। দু'টো একসঙ্গে খেয়ে যাচাই করা হবে, কোনটা বেশী ভালো। সেই জন্যে বলছি, ভালো জিনিস দিও। আমি আর খেয়ে দেখতে চাই না, কারণ তোমাকে আমার বিশ্বাস আছে।

—ঘাবড়াও মাৎ। এমন জিনিস দেবো, খেয়ে তাক লেগে যাবে। এ জিনিস এক আমার মা ছাড়া সারা দুনিয়ায় কেউ বানাতে জানে না। আজ সে এখন অনেক দূর দেশে থাকে।

বাটিটা ভর্তি করে হালওয়া দিয়ে তার উপরে ছিটিয়ে দিলো একটু গুলাবজল। সাইদ নিয়ে এসে দিলো দাদীমার হাতে।

বাটিটা হাতে নিয়েই চেখে দেখার জন্য একটুখানি তুলে মুখে দিলো সে। আর তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেলো হাসানের মা।

হালওয়ার এক টুকরো জিভে ঠেকাতেই বুঝতে পারলো, এ আর কারো নয়, তার পুত্র হাসানের নিজের হাতের জিনিস। উজির এবং আর যে যেখানে ছিলো, ছুটে এলো। জলের ঝাপটা দেওয়া হলো চোখেমুখে। একটু পরে জ্ঞান ফিরলো। বললো, এ হালওয়া আমার ছেলে হাসানের তৈরি। দুনিয়াতে সে ছাড়া এর কৌশল আর কারো জানা নাই। আমি নিজে হাতে তাকে শিখিয়েছি। আর আমি কারো কাছ থেকে শিখিনি। নানা রকম খাবার তৈরি করা

আমার শখ ছিলো। নানা রকম মাল-মশলা দিয়ে বানাতে বানাতে একদিন হঠাৎ তৈরি হয়ে গিয়েছিলো এই বেদানার হালওয়া। আমি শুধু তাকেই শিখিয়েছিলাম, আর কাউকে নয়।

উজিরের তখন অবস্থা কাহিল। হারানো মণি খুঁজে পাওয়ার অদ্ভুত এক আনন্দে কাঁপিয়ে জ্বর এসে গেলো তার। —শেষে আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন।

কিন্তু তখন কী করা যায় কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না উজির। একটু ভেবে সাইদকে বললো, জনা-বিশেক নফর সঙ্গে নিয়ে এক্ষুণি যাও সেই দোকানে। যেমন করে পারো বেঁধে ছেঁদে তুলে নিয়ে আসবে তাকে। কিন্তু দেখো, তার যেনো কোন চোট না লাগে।



উজির নিজে একটা ঘোড়ায় চাপলো। মিশরের সুলতানের দেওয়া পরোয়ানাখানা সঙ্গে নিয়ে দামাসকাসের কাইরেনি হুকুমদারের দপ্তরে গিয়ে পৌঁছালো। হুকুমদার আদর অভ্যর্থনা করে বসালো তাকে। জিজ্ঞেস করলো কাকে আপনি কয়েদ করতে চান?

—এই বাজারের এক হালুইকরকে।

—এ আর এমন বেশী কি কথা, আমি এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

জনা কয়েক সিপাই বরকন্দাজ পাঠিয়ে দিলো তখনি। তাদের বলে দিলো, উজির সাহেবের লোকজন সেখানে গেছে, তোমরা গিয়ে দেখো, যদি দরকার হয় সাহায্য করবে তাদের।

সামস্-অল-দীন তখন হুকুমদারের দপ্তর থেকে সোজা তাঁবুতে ফিরে এলো।

একদল লোক লাঠি-সোটা কোদাল গাইতি নিয়ে হাজির হলো হালুইকরের দোকানের সামনে। নিমেষে ভেঙে চুরমার করে দিলো সব। মেঠাই মণ্ডা যা তৈরি হয়েছিলো সব ছুঁড়ে ফেলে দিলো তারা। তারপর হাসানকে দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে আসতে থাকলো। নফরের পিঠে চেপে আসতে আসতে ভাবে হাসান, খানিকটা বেদানার হালওয়া যে এমন বেদনাদায়ক হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

হাসানকে যখন উজিরের সামনে নামানো হলো, তখন সে কান্নায় ফেটে পড়লো। —কী আমার গুনাহ, হুজুর?

—তুমি তৈরি করেছিলে সেই বেদানার হালওয়া?

—জী হুজুর। কেন, বে-আইনী কোনো কাজ করেছি আমি?

—বে-আইনী? তাতে আর কী শাস্তি তোমার হতে পারে। তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।

একজন নফরকে একটা বড় কাঠের বাক্স কিনে আনতে বললো উজির। হাসানকে সেই কাঠের বাক্সে ভরে উটের পিঠে চাপিয়ে কাইরো নিয়ে যেতে হবে।

উজির ভাবে, এখন ওর মা, হুসনকে কিচ্ছু বলা হবে না। মিশরে পৌঁছনোর পর জানাবে সব।

তাঁবু গোটানো হলো। উজির তার দলবল নিয়ে কাইরোর পথে রওনা হয়ে পড়লো। দিনের পর দিন তারা চলতে থাকে। আহারের সময় হলে হাসানকে নামানো হয় কিছুক্ষণের জন্য। খানাপিনা শেষ হলে আবার বাক্সে পুরে চাপানো হয় উটের পিঠে। এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটে। হাসানকে মাঝে মাঝে নামিয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে উজির। —তুমি নিজে হাতেই কি বানিয়েছিলে সেই বেদানার হালওয়া?

হাসান জবাব দেয়, জী হুজুর।

উজির তখন হুকুম দেয়, লোকটাকে বাক্সে পুরে আবার উটের পিঠে চাপাও।

অবশেষে তারা কাইরোর সীমানায় এসে পৌঁছয়। শহরের এই শেষ প্রান্তে

জায়দানিয়াহ ময়দানে সেনা বাহিনীর ছাউনি। উজিরের নির্দেশে ময়দানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো তার দলবল। হাসানকে নামিয়ে আনতে বললো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নামিয়ে উজিরের সামনে দাঁড় করানো হলো। পিছমোড়া করে বাঁধা হাসান। বুঝতে পারে না সে, কী তার অপরাধ। আর কী সাজাই বা তাকে পেতে হবে। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে উজিরের সামনে। উজিরের নির্দেশে একজন ছুতোর মিস্ত্রি এলো। উজির বললেন, এই লোকটার মাপে একটা কাঠের ক্রুশ বানাও। জলদি। তারপর সেই ক্রুশে তার হাত পা কোমর গলা রশি দিয়ে বেঁধে একটা মোষের গাড়ির পিছনে বেঁধে দাও।

হাসান কেঁদে ওঠে, একি করছেন হুজুর।

উজির হুঙ্কার ছাড়ে, আমি তোমাকে ক্রুশে গেঁথে মারবো। এখন তোমাকে গাড়ির পিছনে বেঁধে ছেচড়াতে ছেচড়াতে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। শহরবাসীরা আগে দেখুক তোমাকে। তারপর ক্রুশে গাঁথা হবে তোমাকে।

—কিন্তু আমার কি অপরাধ?

—অপরাধ? তুমি সেই বেদানার হালওয়াতে ঠিকমতো মরিচের গুঁড়ো মেশাওনি। এই তোমার অপরাধ।

এই কথা শুনে নিজের গাল নিজে থাবড়াতে থাকে হাসান। —হায় আল্লাহ, এই একটা তুচ্ছ ব্যাপারে একেবারে ফাঁসীর হুকুম। এই জন্যে আপনি আমাকে এতোদিন ধরে হাত পা বেঁধে বাক্সে পুরে রেখেছেন? সারা দিনে দানা পানি বলতে গেলে নামে মাত্র একবার দিয়েছেন? এতো অত্যাচার করেছেন, এতো কষ্ট দিয়েছেন তাতেও আপনার সাধ মিটলো-না। তাতেও আমার অপরাধের সাজা হলো না? এরপর আমাকে ক্রুশে গেঁথে মারলে তবে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে?

—ঠিক, ঠিক, ধরেছো। তবেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ঠিক মতো কেন দাওনি তুমি মরিচের গুঁড়ো? কেন দাওনি? সেজন্যে এই-ই তোমার যোগ্য সাজা!

হাসান মাটির উপর বসে পড়ে। দু' চোখে জলের ধারা। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ভেবে আকুল হয়।

একটু পরে উজির প্রশ্ন করে, কী, ভাবছ কী?

—নাঃ, কিছু না। শুধু ভাবছি, আপনার মতো মাথা মোটা লোকগুলো দেশের শির-মণি হয়ে আছে বলেই দুনিয়ার আজ এই দশা। আপনার মতো গর্দভের হাতে যদি দেশের শাসনভার না থাকতো তাহলে আমার মতো নির্দোষ নিরীহ লোকের এইরকম তুচ্ছ কারণে এইভাবে জান খোয়াতে হতো না। হুঁ! অপরাধ কী? না, ঠিক মতো মরিচের গুঁড়ো মেশানো হয়নি—বেদানায় হালওয়ায়। এই না হলে কাজীর বিচার।

উজির তখন গম্ভীর চালে মাথা দুলিয়ে বলে, আমাকে তো দেখতে হবে, আবার যাতে তোমার কাজে তুমি ফাঁকি না দাও!

—কিন্তু, হাসান বলে, লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখলে তবে তো বোঝা যাবে—পরে সে তার কাজে ফাঁকি দেবে কি দেবে না?

উজির বলে, সে হয় না। তোমার তো আর একদিনের দোষ না। রোজই তুমি এই বেদানার হালওয়া বানিয়েছো আর রোজই লোককে ফাঁকি দিয়েছো। ঠিক মতো মরিচের গুঁড়ো মেশাওনি। প্রত্যেক দিনের অপরাধ তিল তিল করে জমে এখন পাহাড় হয়ে গেছে। তা একদিনের ফাঁকির জন্যে যদি এক ঘা বেতের সাজা হয় তবে তুমিই ভেবে দেখো, এক সঙ্গে জমা হলে

এতো কালের অপরাধের সাজার পরিমাণ কী দাঁড়ায়। মৃত্যুদণ্ড তো কমই হলো, আমার হিসাবে আরো বেশী সাজা পাওয়া উচিৎ তোমার।

হাসান ভাবে, প্রতিবাদ করে, কথা কাটাকাটি করে কোন লাভ নাই। শুধু বলে, উন্মাদের সঙ্গে তর্ক করা যায় না।

হাসান আর উজিরের মধ্যে যখন এইসব তর্ক বিতর্ক চলছিলো, ছুতোর তখন তার কাজ করে চলেছে। আর মাঝে মাঝে হাসানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আহা, বেচারা, আর একটু বাদেই ক্রুশটা তৈরি হয়ে যাবে। তখন কি আর ও অমনিভাবে উজিরের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতে পারবে?

সন্ধ্যা নেমে এলো। হাসানকে আবার সেই কাঠের বাক্সে ভরা হলো। উজির গর্জে ওঠে, কাল তোমাকে ক্রুশে গাঁথা হবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো উজির। অন্য দিনের মতো আজ আর তড়ফানি নাই হাসানের। বাক্সের মধ্যে ভরার পরই নেতিয়ে পড়লো। তার পর যখন দেখলো সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, লোকজনদের বললো, এবারে চলো আমার ইমারতে।

ঘরে ফিরে আসার পর এই প্রথম সিৎ-অল-হুসন আর হাসানের মা-র কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললো উজির।

প্রথমে সে গেলো কন্যা হুসন-র ঘরে। মেয়েকে আদর করে বললে, বেটা, এতো দিন তোর দুঃখ কাটলো। এবারে তোর মুখে হাসি দেখবো। ওঠ মা, উঠে বোস, ভালো করে সাজগোজ কর। আমি তোদের বলিনি। হাসানকে আমি খুঁজে পেয়েছি। তাকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। নে, ওঠ। আনন্দ কর। শাদীর রাতে যেভাবে বাসর সাজানো হয়েছিলো, মনে আছে?

আছে আব্বাজান।

—ঠিক ঠিক সেই ভাবে সাজাতে হবে আবার আজ। হুবহু সেই ভাবে যেখানে যেমনটি ছিলো। যদি অসুবিধে হয়, সিন্দুক খুলে কাগজখানা বের কর। সব নিখুঁত করে লেখা আছে।

আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো হুসন-র মনে। নফরদাসী লোকজন ডাকা হলো তখুনি। হুসন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করে তাদের দিয়ে বাসরঘর সাজাতে লাগলো। ঠিক যেমনটি সাজানো হয়েছিলো শাদীর রাতে। যদি কোন ভুলচুক হয়ে যায় সেজন্যে সিন্দুক থেকে বাবার লিখে রাখা সেই কাগজখানা বের করলো। চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্ক যেখানে যা ছিলো ঠিক তেমনি করে সব সাজানো হলো। শাদীর রাতে যারা উপস্থিত ছিলো তারা যদি দেখে, তো তাজ্জব বনে যাবে।

সব সাজনো গোছানো হয়ে গেলে উজির সিন্দুক খুলে বের করলো হাসানের সেই পাতলুন, ইজের, টুপী আর মোহরের বটুয়া। চেয়ারের উপর রাখলো টুপী। আর টুপীর নিচে রাখলো সেই বটুয়া—যার মধ্যে আছে এক হাজার সোনার মোহর আর সেই ইহুদী সওদাগরের লেখা একখানা চিরকুট। খাটের বাজুতে রাখলো পাতলুন ঠিক শাদীর রাতে যেমনটি রেখে ছিলো হাসান। আর এলোমেলো বিছানার উপর ফেলে রাখলো তার দড়ি ছেঁড়া ইজেরখানা। সব শেষে উজির নিজে হাতে পাতলুনের কোমর বন্ধনীর ভিতরে ঢুকিয়ে দিলো সেই নূর-অল-দীনের সই করা ঠিকুজী পত্রখানা। সূচসুতো দিয়ে সেলাই করে দিলো—ঠিক যেমনটি ছিলো তেমনিভাবে। তারপর হুসনকে বললো, মা, ঠিক শাদীর রাতে হাসানের সঙ্গে পালঙ্কশয্যায় শোবার আগে যে অবস্থায় ছিলে তেমনি বিবস্ত্রা হয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ো তুমি। হাসানকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে এলে সেদিন যেভাবে তাকে আদর অভ্যর্থনা করে কাছে নিয়েছিলে ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করো।

হুসন-র ঘর ছেড়ে হাসানের কাছে চলে গেলো উজির। সেই কাঠের বাক্সর ভিতরে

হাসান তখন ঘুমে অচৈতন্য। উজিরের ইশারায় নফররা টেনে বের করলো তাকে। কিন্তু ঘুমে গলে গেছে সে। পরনের কামিজ পাতলুন সব খুলে ফেলে উলঙ্গ করা হলা। শুধু একটা দামী রেশমীর কোর্তা আর মাথায় একটা সাদা পাড়ের টুপী পরিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে রেখে এলো হুসন-র ঘরের মেজেয়—গালিচার উপর।



এক সময় হাসানের ঘুম ভাঙ্গে। চোখ মেলে অবাক হয়। সে কি স্বপ্ন দেখছে নাকি। আবার চোখ বন্ধ করে। না, স্বপ্ন তো নয়। এই তো সেই ঘর। সেই পালঙ্ক। সেই হুসন শুয়ে আছে। ঠিক যেমনটি সেই শাদীর রাতে দেখেছিলো। সব-সব হুবহু একই রকম। কিন্তু তা কি করে হয়! সে তো কতকাল আগের কথা! নাঃ, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। পায়ের আঙুল দিয়ে টিপে গালিচার মসৃণতা অনুভব করে। না না, তা কি করে হয়? এই বাসর-শয্যা এই ঝাড়বাতি, এই ফুলদানি, এই আতরের খুশবু এ যেমন সত্যি তেমনি সে যে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় একটা কাঠের বাক্সে বন্দী হয়েছিলো তাও তো আরো সত্যি। কিন্তু দু'টোর মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক। কী করে সম্ভব হতে পারে?

একবার মনে হয়, সে বুঝি পাগল হয়ে গেছে। তা বিচিত্র নয়। উজির তাকে যে অত্যাচার করেছে এবং যে সাজা দেবার ফরমান দিয়েছে, তাতে যে কোন সুস্থ লোকই পাগল হয়ে যেতে পারে?

হঠাৎ চোখ পড়লো, চেয়ারের উপরে রাখা তার বাহারী সেই বসরাহর টুপী। সোনার পাতে মোড়া। নানা কারুকার্য করা। টুপীটা তুলে দেখলো, হ্যাঁ ঠিক তেমনি রাখা আছে সেই মোহরের থলিটা। খুলে দেখলো, সব ঠিক আছে। সেই ইহুদী সওদাগরের চিরকুটটা দেখে মনে পড়লো, একখানা জাহাজ কেনার পাল্টা রসিদ করে দিয়েছিলো সে। ওপাশে খাটের বাজুতে রাখা পাতলুনটা তুলে নিলো। হ্যাঁ, এও তারই। কোমর বন্ধনীতে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো, সেই তুলোট কাগজে লেখা, তার বাবার সই করা, সেই কুলজীপত্রখানা—ঠিক যেমন ছিলো তেমনি আছে। যতই দেখতে থাকে ততই কেমন গোলমাল হয়ে যায়। হিসাব মেলাতে পারে না কিছুতেই।

একপা একপা করে পালঙ্কের পাশে এগিয়ে আসে হাসান। পাশবালিশ আঁকড়ে শুয়ে হুসন। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক পাওয়ার প্রশান্তি। দু-চারটে খুচরো চুল এসে পড়েছে গালে। অধরে মৃদু মিষ্টি হাসির রেখা। বন্ধ চোখের কোণে কাজল আর সুরমার মাখামাখি। রাত্রির অত্যাচারে মুখের প্রসাধন মুছে গেছে। ভয়ে ভয়ে বিছানায় বসে ওর কপোলের চুলগুলো সরিয়ে দিলো হাসান। আড়মোড়া ভেঙে চোখ মেলে তাকালো হুসন।—বাব্বাঃ সেই কখন গোসল খানায় ঢুকেছো, আর এই এখন বেরুলে! ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি, সোনা?

দু'হাত বাড়িয়ে হাসানকে বুকে টেনে নিতে চায় হুসন।—আরো কাছে এসো না? অমন হা করে কী দেখছো আমাকে। এতো করে দেখলে তবু আশ মিটলো না? সকাল হয়ে গেছে। এখন আর হবে না।

হুসনর কথা শুনে বোকার মতো হাসে হাসান। হি হি হি। হো হো হো। ভারি মজার খোয়াব তো? আবার ভাবে, নাঃ, নিশ্চয়ই সে হাসিস গাঁজা কিছু একটা খেয়েছে। না হলে এমন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা কখনো হতে পারে। হুসনকে ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে সে।

ছানাবড়ার মতো চোখ করে, হাত দু'টো কানের দু'পাশে তুলে ধরে, একপা একপা করে পিছু হটতে থাকে। যেন কোন সাপটাপ তাড়া করেছে। হঠাৎ দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় গালিচার উপর। হুসন আর হাসি চাপতে পারে না। বিছানায় উঠে বসে বলে, আহা, লাগলো নাকি! তা তুমি অমন করছো কেন সোনা। কোনো নেশাভাঙ করেছো নাকি?

—নেশা ভাঙ? কি নেশা ভাঙ? হাসিস? গাঁজা? আফিং?

—তা আমি কেমন করে বলবো। ভালো মানুষ, ফূর্তি করলে কত, কাজকাম সেরে ছোটাঘর-এ গেলে। তারপর তো আমি কিছু জানি না। তুমি ওখানে নেশা করেছো বা ঘুমিয়ে পড়ে খোয়াব দেখেছো আমি জানবো কি করে? তবে তোমার দেরি হয়েছে বেশ। তা ঘণ্টাখানেক হবে।

—ঘণ্টা খা-নেক। তা হলে তো মনে হয় আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি সব যাতা স্বপ্ন দেখেছি। দেখছি, দেখছি, দামাসকাসে আমি একটা হালুইকরের দোকান করেছি। নিজে হাতে মেঠাই মণ্ডা বানিয়ে বিক্রী করি।

হুসন হেসে লুটিয়ে পড়ে।—ওমা তুমি হালুইকর-এর কাজ জানো নাকি?

—ছোট বেলায় আমার মার কাছ থেকে বেদানার হালওয়া তৈরি করা শিখেছিলাম। খেতে খুব মজাদার। তোমাকে করে একদিন খাওয়াবো। তা শোনো, সেই দোকানে একদিন একটা বাচ্চা ছেলে এলো। কি সুন্দর দেখতে, তোমায় কি বলবো, যেন বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে। তাকে আদর করে ডেকে আমার নিজের হাতের তৈরি সেই বেদানার হালওয়া খাওয়ালাম। আর সেই আমার কাল হলো।

হুসন চোখ বড় বড় করে শুনছে। বলে, ক্বী হলো?

হাসান বলে সন্ধ্যাবেলা ছেলেটাকে আর তার নফরটাকে হালওয়া খাইয়ে ছেড়ে দিলাম। তার খানিক পরে একদল লোক এসে আমার সেই দোকানটা ভেঙে চুরে তছনছ করে দিলো। রাস্তায় ছুঁড়ে দিলো মিঠাই-মণ্ডাগুলো। আমাকে পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে বাঁধলো।

হুসন অবাক হয়।—কেন, কেন বাঁধলো?

—কি করে বলবো, বলো। যারা বাঁধলো তারাও বলতে পারলো না। উজিরের হুকুম, তাই। যাই হোক উজিরের সামনে হাজির করা হলো আমাকে। আমাকে দেখেই উজির হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, হুম্, তুমি বানিয়েছো বেদানার হালওয়া?

হুসন বলে, তা বানিয়েছো তো হয়েছে কি? কেন, খেয়ে কি সেই ছেলেটার অসুখটসুখ করেছিলো নাকি?

—আরে না না, সে সব কিচ্ছু না। যাই হোক শোনো, উজির তার লোকজনদের হুকুম করলো, আমাকে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে উটের পিঠে চাপিয়ে কাইরো নিয়ে যেতে হবে।

হুসনর মুখ শুকিয়ে যায়। কাঠের বা-ক্স-সে পুরে? তোমাকে? দেখি দেখি, তোমার হাত-পা ছড়ে গেছে কিনা!

হাসান হেসে বলে, দূর বোকা মেয়ে, স্বপ্নে হাত-পা ছড়ে যাবে কি করে? এতো আর সত্যি সত্যি না। তারপর শোনো, আমাকে তো কাঠের বাক্সে ভরে উটের পিঠে চাপিয়ে কাইরো আনা হলো।

হুসন জিজ্ঞেস করে, খেতে টেতে দেয়নি.

—খেতে? সারা দিনে মাত্র একবার।

—আহারে, সেই জন্যে শরীরটা শুকিয়ে গেছে, সোনা।

—তোমার মাথাটাথা খারাপ হলো নাকি? বলছি না—স্বপ্নে দেখেছি সব।

—না গো, না, সত্যিই কেমন রোগা হয়ে গেছো তুমি।

—তোমার যেমন কথা। এই একঘণ্টা আগে শরীরটা তাগড়াই ছিলো, আর এর মধ্যেই রোগা হয়ে গেলাম? তোমাদের—মেয়েদের কাছে শরীর স্বাস্থ্যের কথা একবার উঠলে হয়—। যাকগে ওসব, এবার উজির সাহেবের হুকুম হলো, একটা ক্রুশ-এ গেঁথে আমাকে হত্যা করা হবে। ছুতোর ডেকে আমার মাপ নিয়ে কাঠের ক্রুশ বানানো হতে লাগলো।

হুসন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনছিলো হাসানের কথা। এবার কঁকিয়ে ওঠে, কিন্তু কি তোমার গোস্তাকি?

—বেদানার হালওয়াতে মরিচের গুঁড়ো একটু কম হয়ে গিয়েছিলো, এই আমার অপরাধ!

—এ্যাঁ?

হুসন হাসবে কি কাঁদবে, ঠাওর করতে পারে না। হাসলেই সব মাটি হয়ে যাবে। তাই সে কেঁদেই ফেললো। হায় আল্লাহ, এমন স্বপ্ন মানুষে দেখে! তুমি 'ছোটাঘরে' গেলে। দেরি হচ্ছিলো। আমি ঘুমিয়ে গেছি। তুমিও যে গোসলখানায় ঘুমিয়ে পড়েছো, বুঝবো কি করে?

হাসান বললো, কিন্তু সোনা, আমার যেন মনে হলো, বারো তেরোটা বছর পার হয়ে গেছে আমার জীবনে।

—স্বপ্নে ঐ রকমই হয়। ও নিয়ে আর মন খারাপ করো না। নাও। এসো একটু জড়িয়ে ধরে শুই। শরীরটা গরম হলে দুঃস্বপ্নের ঘোরটা কেটে যাবে।

হুসন দু' হাতে হাসানকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে। চুলের মধ্যে হাত বুলাতে লাগলো। এক সময় আঁৎকে উঠে বললো, একি তোমার কপালে এতো বড় একটা কাটা দাগ কিসের?

হাসান কপালে হাত বুলালো—তা হলে তো ব্যাপারটা স্বপ্ন না, হুসন। ঐ ছেলেটাকে ধাওয়া করে যাওয়ার সময় রেগেমেগে সে একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো। কপালটা কেটে দরদর করে রক্ত ঝরছিলো। ঘাটা শুকোতেও সময় লেগেছিলা বেশ কয়দিন? কিন্তু সে যাক, সব যে আমার কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে কি...

আর ভাবতে পারে না হাসান। হুসনর বুকে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়ে থাকে।

হুসন আদর করে বলে, ছাড়ো, ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামানোর দরকার নাই। যাই হয়ে থাক, তুমি তো এখন আমার কাছেই ফিরে এসেছো?

কেমন একটা তন্দ্রার ভাব হাসানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিড়বিড় করে আপন মনেই বলতে থাকে। স্বপ্ন—সবটাই কি স্বপ্ন?



অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গে হাসানের। তখনও সে হুসনর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলো। চোখ মেলতেই দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই উজির—যে তাকে ক্রুশে গেঁথে মারার হুকুম দিয়েছিলো। এই লোকটার হুকুমেই তার দোকানটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো তার লোকজন। হাসান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো উজিরের দিকে। কোন কথা বলতে পারলো না।

সামস্-অল-দীনই কথা বললো।—শোনো, বাবা, তুমি আমার ছোট ভাই নূর-অল-দীনের ছেলে। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। ক্রুশে গেঁথে হত্যা করার হুমকী দিয়েছি। বেদানার হালওয়ায় মরিচের গুঁড়ো কম দিয়েছিলে এই অজুহাতে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো বলে ভয় দেখিয়েছিলাম। কিন্তু আসল কারণ তা নয়। আমার প্রাণপ্রতিমা কন্যা হুসনকে শাদী করে তার গর্ভে সন্তান দিয়ে সেই রাতেই তুমি উধাও হয়ে গিয়েছিলে।

আর আমার মেয়ে বারোটা বছর কেঁদে কেঁদে সারা হলো। সেই রাগে তোমাকে ঐ সাজা দিয়েছি। আমার খুব কষ্ট হয়েছে বাবা। যাক, মনে আর কোন ক্ষোভ রেখো না। এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না। শাদীর রাতে বা তার আগে তোমাকে কখনও দেখিনি। তুমিই যে আমার মেয়ের প্রকৃত স্বামী, তোমার ঔরসেই আমার নাতি আজীবের জন্ম হয়েছে তা নিশ্চিত হবার জন্যেই এই চাতুরি আমাকে করতে হয়েছে। গতকাল রাতে আমি পাশের ঘরে ছিলাম। তোমাদের কথাবার্তা সব শুনে আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছি। আর কোন সংশয় সন্দেহ নাই। তুমিই আমার জামাতা-আজীবের বাবা। এতো সব কাহিনী কেচ্ছার কিছুই হতো না। নূর-এর সঙ্গে আমার সেই সামান্য ভুল বুঝাবুঝির জন্যেই যতো সব অনাসৃষ্টি কাণ্ডকারখানা ঘটে গেলো।

উজির আবার সেই সব পুরোনো কাহিনী শোনালো হাসানকে। কি নিয়ে নূর-এর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়—যে কারণে মনের দুঃখে দেশত্যাগী হয়ে বসরাহয় চলে যায় সে। সব শেষে উজির বলে, বাবা, তোমার মাকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি বসরাহ থেকে। এখুনি তাকে দেখতে পাবে। তোমার ছেলে আজীব-তাকেও আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে বৃদ্ধ উজির ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। একটুক্ষণ পরেই আজীব ছুটতে ছুটতে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। হুসন বলে, এই তোর আব্বাজান।

আজীব দেখলো সেই দামাসকাসের হালুইকর। অপলকভাবে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর আকুল আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো হাসানের বুকে।

তারপর এলো হাসানের মা। আনন্দে আত্মহারা। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। তার এতোকালের ব্যথা বেদনা কান্না শোক আজ এই আনন্দ কান্নার তলায় চাপা পড়ে মরে গেলো। সব দুঃখ আজ নিমেষে উধাও হলো। এখন থেকে তার আহ্লাদের দিন শুরু হলো।

ক্ষত শুকিয়ে গেলো। যন্ত্রণার উপশম হলো। কিন্তু দাগটা স্মৃতি হয়ে থাকবে চিরকাল।

শাহরাজাদ চুপ করলো। একটুক্ষণ। তারপর বলে, উজির জাফর বারমাকীর গল্প এখানেই শেষ। খলিফা হারুন-অল-রসিদ রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলো এতক্ষণ। মুগ্ধ হয়ে বললো অপূর্ব তোমার কাহিনী, জাফর। এতো ভালো কিসসা শুনিনি কোথাও। নকলনবীশদের ডেকে বললো জাফরের কাহিনীটা লিখে রাখো। ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েরা পড়ে অনেক আনন্দ পাবে। আর জাফর, তোমার ওপর খুশি হয়ে তোমার পিয়ারের নফর রাইহানকে রেহাই করে দিলাম আমি। আচ্ছা সেই হতভাগ্য খুনী স্বামীটাকে একবার ডাকো। বেচারা অমন ভালো বিবিটাকে ভুল করে হত্যা করে কি অনুতাপেই না দিন কাটাচ্ছে। একটা ভালো ডাগর দেখে মেয়েকে রক্ষিতা করে দাও ওর। যা মাসোহারা লাগে আমি দেবো।

শাহরাজাদ বললো, এ কাহিনী আপনার কেমন লাগলো জানি না, শাহজাদা। হয়তো আমার বলার দোষেই খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু জাঁহাপনা যদি শুনতে ইচ্ছা করেন তবে আরও একটা মজার গল্প শোনাতে পারি। হুজুরের হয়তো ভালোই লাগবে।

শারিয়ার প্রশ্ন করে, কী গল্প?

শাহরাজাদ বলে, সে এক অদ্ভুত গল্প।

শারিয়ার অধৈর্য হয়, আঃ, গল্পের নামটা কী?

শাহরাজাদ বলে, গল্পের নামটা বেশ বড়সড়—বাগদাদের এক কুঁজো দর্জি, ইহুদী, খ্রীস্টান, আর নাপিত-এর কাহিনী।

শারিয়ার বলে, ঠিক আছে, বলো দেখি, শুনি।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে, শুনুন জাঁহাপনা ঃ

এক সময়ে চীন দেশের এক শহরে এক দর্জি বাস করতো। দিল দরিয়া মেজাজের লোক। কারো সাতে পাঁচে নাই। খায় দায় গান গায় আর দোকানে কাজ করে চলে। খাওয়া পরার জন্যে যতটুকু দরকার রোজগার করে তারপর বাকী সময়টুকু হৈহল্লা আনন্দ করে কাটায়। বিকেল হলেই আর কোন কাজ নয়, বিবিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হয়। নদীর ধারে ময়দানে ঘুরে বেড়ায়। আবার সন্ধ্যার মুখে দু-চারটে কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরে।



সেদিনও তেমনই বেড়াতে বেরিয়েছিলো তারা দু'জনে। অনেক হৈহল্লা করে অনেক জায়গা ঘুরেটুরে বাড়ি ফেরার পথে এক কুঁজোর সঙ্গে দেখা হলো। কুঁজোটা দেখতে কেমন অদ্ভুত হাস্যকর। লোকটা ওদের দেখে হঠাৎ হো হো করে হাসতে লাগলো। দর্জি বেশ মজা পেলো ওর হাসি আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দেখে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, কী ব্যাপার হাসছো কেন?

—এমনি, হাসি পেলো তাই হাসছি।

এই বলে আবার হাসতে লাগলো। দর্জি জিজ্ঞেস করলো, আমাদের সঙ্গে যাবে আমাদের বাড়িতে। আজ রাতে আমাদের ওখানেই খাবে থাকবে, বেশ মজা হবে।

কুঁজো বললো, যাবো।

ওরা কুঁজোটাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে এলো। ওকে দোকানে বসিয়ে রাতের দরকার মতো কয়েকটা জিনিস সওদা করে আনলো। ভাজা মাছ, রুটি, লেবু আর লম্বা একফালি ক্ষিরা।

রাতে বেশ মৌজ করে খানাপিনা করতে লাগলো তিনজনে। এক সময় দর্জির বিবি মজা করার জন্যে বড় দেখে একখানা মাছের টুকরো নিয়ে কুঁজোর মুখে পুরে দেয়। বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষ। অত বড় মাছের টুকরোটা ওর মুখে আর ধরে না। কিন্তু উগরে ফেলারও জো নাই। দর্জির-বিবি হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকে ওর মুখ। আল্লাহর দোহাই, খেয়ে নাও, তা না হলে ভীষণ রাগ করবো।

অনেক কষ্টে এগাল-ওগাল করে মাছের টুকরোটি গলাধঃকরণ করতে পারলো। কিন্তু বিপত্তি এড়ানো গেলো না। গলায় গেঁথে গেলো একটা হাড়। আর সঙ্গে সঙ্গে কুপোকাৎ—মরে গেলো লোকটা।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো রাত্রি শেষ হতে আর বেশি দেরি নাই। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

পরদিন পঁচিশতম রজনী।

দুনিয়াজাদ আব্দার ধরলো, তোমাদের কাজ কাম সব তো মিটলো। এবার তাহলে সেই গল্পটা শুরু করে, দিদি!

শাহরাজাদ বললো, এখুনি করছি, বোন। কিন্তু তার আগে বাদশাহজাদার অনুমতি চাই তো!

শারিয়ার বললো, ঠিক আছে, বলো, শুনি।

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

তারপর শুনুন শাহজাদা, সেই দর্জি আর তার বিবি দেখলো, তাদের চোখের

সামনে অসহায়ের মতো লোকটা মরে যাচ্ছে। দেখলো, কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। নিয়তির লেখা। তা না হলে লোকটাকে কেনই বা তারা ঘরে নিয়ে আসবে। আর কেনই বা তার বিবির অমন প্রাণঘাতী বিদঘুটে রসিকতার নেশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ওর মোৎ বোধ হয় এইভাবেই লেখা ছিলো।

—এখন কি করা যায়?

দর্জি জিজ্ঞেস করে তার বিবিকে। বিবি বললো, কাঁধে তোলো লোকটাকে। আমি শাল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আচ্ছা দাঁড়াও শালে জড়িয়ে কাঁধে নিচ্ছি আমি। যা করার আমিই করছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আমার পিছনে পিছনে এসো।

দর্জির বিবি কুঁজোটাকে কাঁধে করে রাস্তায় নামলো। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তর তর করে হেটে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে কোন লোকজন আসছে দেখলেই—আরও গলা চড়িয়ে দেয়।—ওগো আমার কি হবে গো। আমার ছেলেটা আর বাঁচবে না। আমার ঘরে বসন্তের দয়া হলো কেনো গো। ওগো তোমরা কে কোথায় আছো দেখে যাও আমার জানের কলিজার দশা। বসন্তে সারা গা ছেয়ে গেছে বাছার আমার।

দর্জি-বিবির কান্নাকাটিতে পথচারীরা বেশ ভালো করেই বুঝলো। বৌটার ছেলের বসন্ত রোগ হয়েছে। আশায় আশায় হেকিমের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। যদি বাঁচে। শোনামাত্র সবাই আর কোন কথাবার্তা জিজ্ঞেস না করে রাস্তার ওপাশে চলে যেতে লাগলো।

এইভাবে সারাটা পথ লোক সরাতে সরাতে শেষে এক ইহুদী হেকিমের বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লো। একটা অল্প বয়সের কালো নিগ্রো ক্রীতদাসী এসে দরজা খুলে দিলো।

দর্জি-বিবি জিজ্ঞেস করে, হেকিমসাহেব বাড়ি আছেন। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলে, আছেন।

এই নাও সিকি একটা। তোমার মনিবকে গিয়ে দাও। আর বলো, শিগ্গির করে আসতে। আমার বাছাটার খুব অসুখ। যেন দেরি না করে, বুঝলে?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে উপরে চলে যায়। দর্জির বৌটা উঁকি দিয়ে দেখলো নিগ্রো মেয়েটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। দর্জিকে ফিস ফিস করে বললো, আর এক লহমা দেরি না, চলো কেটে পড়ি এখান থেকে।

কুঁজোটাকে সিঁড়ির একটা ধাপের উপর বসিয়ে দিয়ে একরকম প্রায় জোর করেই দর্জির হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামালো রাস্তায়। তারপর লম্বালম্বা পা ফেলে জোর কদমে হেঁটে চললো। রীতিমতো দৌড়নোই বলা যায়।

ইহুদী হেকিমের হাতে সিকিটা দিয়ে নফরাণীটা বললো, নিচে একটা রুগী এসেছে। খুব খারাপ অবস্থা। এখুনি একবার চলুন।

চকচকে সিকিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বলে, বাঃ, ভালো খদ্দের তো। একেবারে আগাম পয়সা দিয়েছে! চল্ দেখি। পড়ি মরি ভাবে তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে ইহুদী হাতে চিরাগ নেবার আর তর সয় না। অন্ধকারে সিঁড়ির ধাপগুলো দেখা যায় না। আন্দাজে পা চালাতে থাকে। সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে এসে কিসে যেনো ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। হেকিমের পড়ে যাওয়ার শব্দে বাতি নিয়ে নেমে আসে মেয়েটা। দেখে একটা কুঁজো লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে সিঁড়ির নিচে। ইহুদী ভাবলো, সেই তার মৃত্যুর কারণ। তার ধাক্কাতেই লোকটা মরে গেলো। মনে খুব দুঃখ হলো তার। হায় প্রভু, একি হলো, একি পাপের ভাগী করলে আমাকে?

ইহুদী ভেবে পেলো না কি করা যায়। মৃতদেহটা বাড়ির প্রাঙ্গণে বের করে তার বৌকে খবর পাঠালো। ইহুদী বৌ এসে বললো, এক্ষুণি সরাতে হবে ওটাকে। এভাবে এখানে রাখা যাবে না কিছুতেই। যা হোক একটা ব্যবস্থা করো।

ইহুদী বলে, এই রাতবিরেতে কী ব্যবস্থা করি বলো তো?

ইহুদী বৌ বলে, চলো, ধরাধরি করে ছাদের উপরে নিয়ে যাই। ওখান থেকে পাশের মুসলমান বাড়ির ছাতে ছুঁড়ে দেবো। ও বাড়ির মালিক সুলতানের বড়ো বাবুর্চি। অনেক ইঁদুর কুকুর বেড়াল আছে ওবাড়িতে। রাতের অন্ধকারে এসে খেয়ে ফেলবে।

অতঃপর ইহুদী আর তার বৌ ধরাধরি করে কুঁজোর মরদেহটা ছাতে উঠিয়ে এনে পাশের বাড়ির ছাদে ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য পাশের বাড়ির ছাদের ওপর ফেলতে পারলো না। নিচে পড়ে গেলো বাবুর্চির রান্নার ঘরের পাশে।

কিছু পরে সুলতান প্রাসাদের কাজ শেষে বাড়ি ফিরে বাতি জ্বালতেই চমকে ওঠে লোকটা। একি! এ যে একটা মানুষ মরে পড়ে আছে? লোকটা বোধহয় চুরি করে খেতে এসেছিলো। কিন্তু খোদার মার দুনিয়ার বার। একেবারেই শেষ খাওয়া খাইয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এই রাতে এই মড়াকে নিয়ে কি করা যায়?

কুঁজোর লাশটা কাঁধে তুলে বাজারের দিকে যেতে থাকে। খুঁজে পেতে একটা জুৎসই জায়গায় এক দোকানের দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে চলে আসে।

রাত্রি তখন অনেক। এক খ্রীষ্টান মাতাল পথ দিয়ে চলেছে। আর নেশা জড়ানো কণ্ঠে বলে চলেছে, ঠিক আছে যিশু আসছেন, যিশু এক্ষুণি এসে পড়বেন, তারপর বাছাধনরা কোথায় পালাবে। আমার মাথায় মদ ঢেলে দেওয়া? এতো বড়ো আস্পর্দা। দাঁড়াও যিশু এসে পড়লেন বলে।

একবার এপাশ, একবার ওপাশ সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলতে চলতে বাজারের পাশে হামামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা। হাসি মজাক করে ওর সঙ্গের লোকরা মদ ঢেলে দিয়েছে মাথায়। বেচারী গোসল করবে এই মাঝ রাতে।

ঐ দোকানটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলো। কিন্তু মদের নেশায় এমনই বুঁদ হয়ে হয়ে টলছে যে কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। মরা লাশটা যে তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে দেখলো না। কিন্তু টলতে টলতে এক-পা পিছু হটতেই বুঝতে পারলো, কে যেনো তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। খ্রীষ্টানের আর বুঝতে বাকী রইলো না, সে এখন ছেনতাই-এর কবলে। এসব ব্যাপার খুব চট্ করে বুঝে ফেলে। চোখের পলকে নিজের শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়েই ধাঁ করে এক ঘুষি বসিয়ে দিলো লোকটার মুখে। আর এক ঘুষিতেই পপাত ধরণীতলে।—তবে রে ব্যাটা, একেবারে খুন করে ফেলবো। ওঠ্, উঠে দাঁড়া বলছি। হুঁ হুঁ বাবা, কোথায় তুমি খাপ খুলতে এয়েছিলে? একেবারে বাঘের মুখে পড়ে গেছো।

তার চিৎকারে, তরফানীতে বাজারের ঘুমন্ত পাহারাওলা লাফিয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই কোন চোর ছ্যাঁচোড়। লাঠি হাতে দৌড়ে আসে। কিন্তু যখন দেখলো একটা খ্রীষ্টান একজন মুসলমানকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, সে তখন বললে, ঠিক আছে ছেড়ে দিন সাহেব। এই, ওঠ!

কিন্তু লোকটা আর্ ওঠে না। তখন ঝুঁকে পড়ে দেখলো, লোকটা মরে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে সারা বাজারের লোকজন জাগিয়ে তুললো।—কে আছো, বেরিয়ে এসো, দেখো, এক খ্রীষ্টানের বাচ্চা একজন মুসলমানকে মেরে ফেলেছে।

পাহারাওলা দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধলো খ্রীষ্টানটাকে। কোতোয়াল সাহেবের বাড়ির দিকে যেতে থাকলো। হায় যিশু তুমি নেমে এসো, রক্ষা করো। আমি তো লোকটাকে মেরে ফেলতে চাইনি। আর এক ঘুষিতেই মরে যাবে—তাই বা ভাববো কি করে? তুমি এসো যিশু, তুমি না বাঁচালে এ মাতালকে কেউ উদ্ধার করবে না।

কোতোয়াল সাহেব ঘুমুচ্ছেন। তাকে বিরক্ত করা যাবে না। সুতরাং বাকী রাতটা

তালাবন্ধ ঘরে কাটাতে হলো খ্রীষ্টানকে। সকালবেলায় বিচারে বসলো কোতোয়াল। সব শুনেটুনে রায় দিলো—খ্রীষ্টানের ফাঁসী।

শহরের পথে পথে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে প্রথমে। তারপর হাজারো লোকের সামনে বাজারের মধ্যে তাকে ফাঁসীতে ঝুলাতে হবে।

সারা শহর ঘুরিয়ে এনে যখন তার গলায় ফাঁসীর দড়ি পরাতে যাবে এমন সময় সুলতানের সেই বড় বাবুর্চি এসে বলে, তোমরা দাঁড়াও একটু। কেন, এই নিরীহ নিরপরাধ লোকটাকে ফাঁসীতে ঝুলাতে চাইছো। ওতো মারেনি ঐ কুঁজোটাকে। মেরেছি আমি।

কোটাল বললো, তার প্রমাণ?

প্রমাণ দিচ্ছি। গতকাল আমি সুলতানের খানা পাকিয়ে যখন বাড়ি ফিরি তখন অনেকখানি রাত। বাতি জ্বালাতেই দেখি একটা লোক আমার রসুইখানার কাছে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। খানা চুরি করতে এসেছিলো। আমি একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে এক ঘা বসাতেই বেচারা মরে গেলো। তখন আমি কাঁধে করে এনে বাজারের পাশে ঐ দোকানটার পাশে মরাটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যাই। আমার দোষে একজন মুসলমানের প্রাণ গেছে। আবার আমার কারণেই একজন খ্রীষ্টানের প্রাণ যেতে বসেছে। এতো পাপ আমার সইবে না। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। তার চেয়ে আপনি আমাকে ফাঁসী দিন। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

বাবুর্চির কথা শোনার পর খ্রীষ্টানকে ছেড়ে দিলো কোটাল। জল্লাদকে বললো, ওকে ছেড়ে দাও, ওর কোনও দোষ নাই। বাবুর্চি যখন নিজের মুখে তার দোষ স্বীকার করছে তার উপরে তো আর অন্য কোনও প্রমাণের দরকার নাই। নাও, আর দেরি করো না, ফাঁসীর দড়ি বাবুর্চির গলায় পরিয়ে দাও।

জল্লাদ এবার বাবুর্চির গলায় দড়ি পরাতে যায়। এমন সময় সেই ইহুদী ডাক্তার ছুটে আসে। একটুখানি সবুর করো, বাবা। ওকে ছেড়ে দাও ওর কোন দোষ নাই। আমিই ঐ কুঁজোটাকে হত্যা করেছি।

ইহুদীর বক্তব্যে পরিষ্কার বোঝা গেলো বাবুর্চির কোনো দোষ নাই। হত্যাকারী আসলে ইহুদীই।

এবার ইহুদীর গলায় ফাঁসীর দড়ি পরানো হলো। এমন সময় ভীড়ের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার শোনা গেলো। এই রোকো, রোকো, থামাও। এই হেকিমের কোন দোষ নাই। সে ঐ কুঁজোটাকে হত্যা করেনি, গতকাল বিকেলে আমি আর আমার বিবি বেড়িয়ে ফিরছিলাম। এই কুঁজোটাকে দেখলাম একটা রাস্তার মোড়ে বিনা কারণে খুব হাসছে। আমার খুব মজা লাগলো, ওকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এলাম। লোকটা খুব মজার ছিলো। কথায় কথায় খুব হাসাতে পারতো। সুতরাং অতি অল্প সময়েই আমার এবং আমার বিবির প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলো। আমরা এক সঙ্গে খেতে বসেছি। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে ও ভীষণ লাজুক। কিছুই যেন খেতে চায় না। কিন্তু আমার বিবিও নাছোড়বান্দা। খাওয়াবেই। এক টুকরো মাছ জোর-জার করে ওর মুখে পুরে দিয়েছিলো সে। মাছের টুকরোটা গলায় আটকে গিয়ে বেচারা সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। আমাদের চোখের সামনে। নিরুপায় হয়ে আমার স্ত্রী ওকে চাদর চাপা দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে গেলো এই হেকিমের বাড়ি। সঙ্গে আমিও ছিলাম। কড়া নাড়তেই একটা নিগ্রো নফরাণী দরজা খুলে দেয়। তার হাতে একটা সিকি দিনার দিয়ে বলি হেকিম সাহেবকে জলদি ডেকে আনো। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। নফরাণীটা ওপরে গেলো হেকিম সাহেবকে ডাকতে। ইতিমধ্যে আমার বিবি সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর কুঁজোটাকে বসিয়ে দিয়ে আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। তারপর বোধহয় হেকিম সাহেব অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ধাক্কা খায়। তার ধারণা হয়, তার ধাক্কাতেই লোকটার জীবনান্ত হয়েছে। তাই না হেকিম সাহেব?

ইহুদী তখন মাথা নেড়ে বলে, একদম ঠিক।

দর্জি বলে, তাহলে, দারোগা সাহেব, ওকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে ফাঁসী দিন।

দারোগা সাহেব হুকুম দিলো, ইহুদীকে ছেড়ে দাও। আর এই দর্জিকে ফাঁসীতে ঝুলাও। আমি এবার আসল লোককে পেয়ে গেছি। আর আমার হুকুমের রদবদল হবে না।

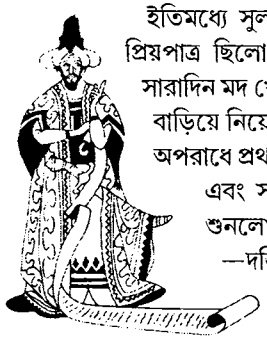

ইতিমধ্যে সুলতানের কানে গেলো এই খবর। এই কুঁজোটা সুলতানের খুব প্রিয়পাত্র ছিলো। তার আগেরদিন সকালে সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মাতলামী করে বেড়ায়। শেষে এক দর্জি তাকে বাড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর কিভাবে তার মৃত্যু ঘটে এবং দারোগা সাহেব সেই অপরাধে প্রথমে এক খ্রীষ্টান, পরে সুলতানের বাবুর্চি, তারপর এক ইহুদী হেকিম এবং সব শেষে ঐ দর্জিকে ফাঁসীর হুকুম দেয় তার বিস্তারিত বিবরণ শুনলো সুলতান।

—দর্জিটাকে কি ফাঁসী দেওয়া হয়ে গেছে।

—আজ্ঞে না, তাকে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড় করানো হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ার পাঠানো হলো সুলতানের আদেশে। ফাঁসী রদ করার ফরমান দিয়ে ঘোড়সওয়ার ছুটলো কোটালের কাছে।

কোটাল এসে কুর্নিশ জানিয়ে সবিস্তারে জানালো সব বৃত্তান্ত। সুলতান অবাক হলেন। এমন ঘটনা জীবনে সে শুনেনি কখনও। নকলনবীশদের নির্দেশ দিলো, ঘটনাটা ভালো করে লিখে রাখো। এমন ঘটনা কি তোমরা কখনও কেউ শুনেছো?

সেই খ্রীষ্টান লোকটি এগিয়ে এসে বললো, হুজুর আমি আপনাকে আরও অবাক করার মতো গল্প শোনাতে পারি। যদি হুকুম করেন।

সুলতান বললো, নিশ্চয়ই। বলো, শুনবো।

তখন সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে খ্রীষ্টানটি তার গল্প আরম্ভ করলো।

আপনি দীন-দুনিয়ার মালিক। আপনাকে আমার হাজারো সালাম।

আমি এক বিদেশী। দেশ আমার কাইরো। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষে একদিন আপনার দেশে এসে ব্যবসা শুরু করলাম। আমার বাবাও আমার সঙ্গে এসেছিলেন। তিনিও আমার এই ব্যবসাই করতেন। দালালীর ব্যবসা আমাদের বংশগত।

আমার বাবার মৃত্যুর পর আমিই পুরো মালিক হলাম আমার ব্যবসার। আর এই দালালীর কাজে আমার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি আর ছিলো না এ তল্লাটে।

একদিন আমি আমার গদিতে বসে আছি দেখি একটি যুবক গাধার পিঠে চড়ে আমার দিকেই আসছে। দেখে মনে হলো, বেশ সুদর্শন সুপুরুষ। এবং খানদানী বংশের ছেলে। সামনে এসে সালাম জানালো আমাকে। আমি আলেকুম সালাম জানালাম। ছেলেটি একখানা রুমালে কিছু ক্ষীরার বীজ-এর নমুনা খুলে দেখালো আমাকে। জিজ্ঞেস করলো, কী রকম দাম যাচ্ছে এখন।

আমি বললাম একশো দিরহাম।

সে বললো, দাড়ি বাটখারা সঙ্গে নিয়ে আপনি আসুন খান-অল-জয়ালী বিজয় দরওয়াজার কাছে। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো সেখানে।

রুমালে বাঁধা ক্ষীরার বীজগুলো রেখে সে চলে গেলো। তখুনি আমার মহাজনের ঘরে গিয়ে নমুনা বীজগুলো দেখিয়ে কেনার দাম জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, তুমি কি দাম বলেছো।

—একশো দিরহাম।

—আমরা তোমাকে দশ দিরহাম লাভ দেবো। মোট একশো দশ পাবে তুমি।

আমি মহা আনন্দে দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলাম। ওজন করে মোট পঞ্চাশ মণ হলো। যুবকটি বললো, মণ প্রতি দশ দিরহাম দালালী পাবেন আপনি। মালগুলো নিয়ে যান। মোট পয়সা কড়ি মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে রাখুন। আমি পরে গিয়ে নিয়ে আসবো। মোট দাম হচ্ছে পাঁচ হাজার। তার থেকে আপনার দালালী পাঁচশো কেটে রেখে আমার সাড়ে চার হাজার একটু সাবধানে রেখে দেবেন। আমার এদিকের কাজ কাম সেরে সুরে আপনার কাছে গিয়ে একদিন নিয়ে আসবো।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম ঠিক আছে।

সেই দিন আমি হাজার দিরহাম রোজগার করেছিলাম। পাঁচশো মহাজনের কাছ থেকে, আর পাঁচশো ছেলেটার কাছ থেকে। মানে শতকরা কুড়ি।

মাসখানেক বাদে ছেলেটি আমার কাছে এলো। আমি বললাম তোমার টাকাটা আমি একটা থলে করে বেঁধে রেখেছি। নিয়ে যাও।

ছেলেটি বললো, আরও কিছুদিন আপনার কাছেই রেখে দিন। আমার একটু রাখার অসুবিধে আছে।

মাসখানেক বাদে আবার একদিন সে এলো। তখনও তাকে বললাম, তোমার টাকাটা নিয়ে যাও।

সে বললো, আরও কিছুদিন আপনার কাছেই রাখুন। পরে সুবিধে মতো নিয়ে যাবো।

আমি বললাম, অনেক বেলা হয়ে গেছে। দুপুরের খানাটা আজ আমার বাড়িতেই সেরে যাও।

কিন্তু সে বললো, আমার হাতে এখন অনেক কাজ। মরবার ফুরসৎ নাই। পরে একদিন এসে খেয়ে যাবো।

এর মাসখানেক বাদে সে গাধার পিঠে চেপে আমার গদীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে বললো, এখন আর নামবো না। সন্ধ্যেবেলা ফেরার পথে টাকাটা নিয়ে যাবো আজ।

আমি ওর টাকার থলেটা এনে সারা সন্ধ্যা বসে রইলাম। অনেকটা রাত হয়ে গেলো। কিন্তু সে আর সেদিন ফিরলো না। এর মাসখানেক বাদে আবার একদিন এলো। আমি বললাম, তুমি কেমনধারা লোক বাপু! একটা অচেনা অজানা দালালকে এতো বিশ্বাস করলে কি দেখে? এতোকাল দালালী করে খাচ্ছি কিন্তু তোমার মতো এতো অদ্ভুত লোক তো জীবনে দেখিনি। কিন্তু সেদিনও সে টাকাটা না নিয়েই চলে গেলো।



সব শেষে আবার একদিন সে এসে হাজির হলো। সেদিন বেশ জাঁকজমক করে সেজেগুজে এসেছে। দামী রেশমের কোর্তা, পাতলুন পরনে। মাথায় সোনার জরির

টুপী। চোখের কোণে কাজল টেনেছে। অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো দেখতে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাতে একটা চুমু খেয়ে আদর করে নামালাম। আজ মনে হয় তোমার সময় হবে বাছা। টাকাটা নিয়ে আমাকে একটু নিশ্চিন্ত করো। তোমার টাকাটার জন্যে রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারি না। কি জানি, পরের টাকা যদি কোনভাবে খোয়া যায়।

—আর একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। প্রায় মেরে এনেছি। আর ক'টা দিনের মধ্যেই এখানকার কাজকারবার আমার শেষ হয়ে যাবে। তখন যাবার সময় আপনাকে ভারমুক্ত করে টাকাটা নিয়ে যাবো।

এই বলে সেদিনও সে চলে গেলো।

আমি ভাবলাম, আবার হয়তো সে অনেক দিন বাদে এই একই কথা বলে টাকাটা না নিয়েই চলে যাবে। আমি ওর টাকাটা সুদে খাটাতে লাগলাম। শতকরা কুড়ি টাকা সুদ প্রতি মাসে। এইটেই আমাদের দেশে প্রচলিত। ছেলেটা যদি বছরখানেক বাদে টাকাটা ফেরৎ নেয়, তবে তার মধ্যে অনেক টাকা বানিয়ে নিতে পারবো আমি।

বছরখানেক বাদেই সে আবার একদিন এলো। বেশ সেজেগুজে। আমি তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নামালাম। এবং বললাম, আজ আর তোমাকে না খাইয়ে ছাড়বো না।

সে খুব হাসলো, পরে রাজি হলো একটা শর্তে।—খেতে পারি। কিন্তু আজ যা খরচ হবে, সব আমার। আমার টাকা থেকে খরচ করতে হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে।

তাকে বাড়িতে আদর যত্ন করে বসিয়ে বাজারে গেলাম আমি। ভালো দামী সরাব আর মাংস নিয়ে এলাম খানিকটা। সেই সঙ্গে কিছু ফল আর মিষ্টি। খানাপিনার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই হলো। টেবিলে খানা সাজিয়ে তাকে ডাকলাম। বেশ আগ্রহ নিয়ে খেলোও সব। কিন্তু দেখে অবাক লাগলো, সমস্ত খাবারই সে বাঁ হাত দিয়ে খেলো। আমি ভাবলাম, হয়তো দুর্ঘটনায় ডান হাতটা জখম হয়ে থাকবে।

খাওয়া শেষ হলে লক্ষ্য করাম, বাঁ হাতখানা ধুলো সে ডান হাতখানার সাহায্য ছাড়াই। আমার কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, আচ্ছা মালিক, আপনার ডান হাতখানার কী হয়েছে। কোন দুর্ঘটনায়...

গায়ের আলোয়ানখানা সরিয়ে আমাকে দেখালো। তার ডান হাতখানা কব্জী থেকে কাটা। ছেলেটি বললো, আজ যে আমি আপনার বাড়িতে এসে বাঁ হাত দিয়ে খেলাম এতে আপনি অপমানিত হবেন না; আশা করি। তার কারণ, ডান হাত দিয়ে খাওয়ার কোন উপায় আমার নাই। আর এই হাতটা কাটার পিছনে এক অদ্ভুত কাহিনী আছে।

তখন ছেলেটি তার কাহিনী বলতে লাগলো।

বাগদাদ শহরে আমার জন্ম। আমার বাবা ছিলেন ওখানকার এক লক্ষপতি সওদাগর। যখন আমার উঠতি বয়স, সেই সময় থেকেই বাবার ব্যবসা বাণিজ্য বেশ মোটামুটি বুঝতে শিখলাম। সারা বছরই আমাদের বাড়িতে তীর্থযাত্রী, মুসাফীর এবং বিদেশী সওদাগরদের আগমনে ভরে থাকতো। বাবা মারা যাবার পর আমি তার ব্যবসা বাণিজ্য সম্পত্তির ষোল আনা মালিক হলাম। যার কাছে যা পাওনা ছিলো আদায়পত্র করে সব টাকায় কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করলাম। বাগদাদ আর মসুল ছিলো কাপড়ের জন্যে বিখ্যাত। নানারকম পোশাক আশাক কিনে

উটের পিঠে চাপিয়ে একদিন কাইরো যাত্রা করলাম। খোদার মেহেরবানীতে কয়েকদিন বাদে নিরাপদেই এসে পৌঁছলাম কাইরোয়।

শহরের কাছে এক সরাইখানায় উঠলাম। কাপড়ের গাঁটগুলো রাখার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করা হলো। সামানপত্র নামানোর পর নফরটাকে পয়সা দিয়ে বললাম, একটু কিছু খাবার নিয়ে আসতে। খানাপিনা সেরে একটু জিরিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে শহরের পথে বেরুলাম। বেন-অল-কাসরেন ফূর্তি করার জায়গা। সন্ধ্যাবেলায় নাচ গানে জমে ওঠে বেশ। মেয়েমানুষ আর মদের আখড়া। নতুন জায়গার নতুন স্বাদ। সন্ধ্যাটা কাটলো বেশ। পথের ক্লান্তি কেটে গিয়ে চাঙ্গা হলো শরীর। সরাইখানায় ফিরে এসে সুখ-নিদ্রা হলো সেদিন।

সকালে উঠে নফরকে বললাম, চল বাজারে বেরুতে হবে। সবরকম কাপড় চোপড় কিছু কিছু করে নিয়ে একটা গাট্‌রী বাঁধ। দেখি, কী বাণিজ্য করা যায়।

শহরের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র কাইজারিয়াৎ জিরজিস। এইখানেই সব বড় বড় দোকানপাট। দেশবিদেশের সওদাগররা আসে বাণিজ্য করতে। একটা দালালকে ধরে বললাম, আমি বাগদাদ আর মসুলের বাহারী সাজপোশাক এনেছি। কী দাম পাওয়া যাবে, একটু দেখবে?

দালালটা বললে, ঠিক আছে, চলুন আমার সঙ্গে। ভালো মহাজন ঠিক করে দিচ্ছি। মাল পছন্দসই আর দামে বনলে সওদা হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার নসীব খারাপ, অনেকগুলো বড় বড় মহাজনের গদি ঘুরেও একখানা জামা কাপড় বিক্রী করতে পারলাম না। তারা যে দামে কিনতে চায় সে দামে আমারই কেনা নাই। তার উপর রাহা খরচ, দালালী এবং আমার মুনাফা আছে।

দালালটা বললো, মুনাফা বের করার একটাই উপায় আছে। এখানে এসে সব সওদাগররাই যা করে আপনাকেও তাই করতে হবে। আপনি এক কাজ করুন, মালগুলো ধারে বেচে দিন। ধারে দিলে একটু বেশী দামে নেবার অনেক দোকান পাবেন। তাতে আপনার মোটামুটি ভালোই মুনাফা থাকবে। মাল দেওয়ার সময় ওরা আপনাকে হুণ্ডি করে দেবে। এক মাস পরে প্রতি সোমবার আর বৃহস্পতিবার ওরা কিস্তি দেয়। সপ্তাহে এই দু'দিন এসে কিস্তি আদায় করবেন, আর বাকী কটা দিন—আনন্দ ফূর্তি করে কাটাবেন। এখানকার শহর আর নীল নদের শোভা আপনার ভালোই লাগবে।

আমি বললাম, বাঃ, খাসা হবে।

দালালকে সঙ্গে করে আমার সরাইখানায় এলাম। আমার ভাড়া করা গুদামে যতো মাল ছিলো সব তাকে দেখালাম। সেইদিনই সব মাল বিক্রী হয়ে গেলো। বেচে নগদ কিছু পেলাম না বটে, কিন্তু তার বদলে হুণ্ডির কাগজ করে দিলো দোকানীরা।

খুব খুশি মনে সরাইখানায় ফিরে এলাম। এখন একটা মাস শুধু খাওয়া দাওয়া, স্ফূর্তি করা, আর ঘুমানো ছাড়া আর কোন কাজ নাই। প্রতিদিন সকালে উঠে মাখন, রুটি আণ্ডা, আপেল, বেদানা, আঙুর, মিষ্টি দিয়ে নাস্তা করে নীলের ধারে বেড়াতে যাই। আবার দুপুরে এসে মাংস পরোটা সব্জী দিয়ে খানা সারি। তারপর বিকাল থেকে শুরু হয় সরাব। সন্ধ্যাবেলায় বেন-অল কাসবেন পাড়ায় মৌজ করে মেয়েমানুষের নাচগানে মেজাজটা শেরিফ হয়ে ওঠে। অনেক রাতে আবার সরাইখানায় ফিরে আসি।

এইভাবে এক মাস কাটলো। এবার শুরু হলো আমার কিস্তি আদায়। প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার। বাজারে গিয়ে আমি এক এক দিন এক একটা দোকানে বসি। আমার দালালটা খুব চৌকস। দোকানে দোকানে ঘুরে সে আমার কিস্তির পাওনা টাকা পয়সা আদায়

করে এনে দেয়। একদিন কাইজারিয়ৎ জিরজিস-এর একটা বড় রেশম কাপড়ের দোকানে বসেছি। দোকানের মালিক, আমারই সমবয়েসী হবে, আমার সঙ্গে ইয়ার দোস্তের মতো হাল্কা মজাক করতো। আমার চেহারা নাকি মেয়েদের খুব পছন্দসই। তারা একবার পেলে আর আমাকে ছাড়বে না—এইরকম আদি রসাত্মক চুলবুলানী ধরিয়ে দিতো আমার দেহ মনে।

একটা বোরখা ঢাকা মেয়ে এসে বসলো আমার পাশের একটা টুলে। কিছু কাপড় চোপড় কিনবে। তার পাতলা নাকাবের ভিতর দিয়ে মুখের আদলটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। টানা টানা চোখ, টিকলো নাক আর চাঁপার মতো গায়ের রং। দামী আতরের খুশবু ছড়িয়ে পড়ছিলো তার গা থেকে।

স্বভাবতই আমি তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। সেও যে আমার প্রতি উদাসীন ছিলো না, একটু পরেই তা বুঝলাম। মুখের নাকাবটা সরিয়ে চোখের বান ছুঁড়লো আমার উপর। দেখলাম, তার গভীর কালো আয়ত চোখ। দোকানের মালিক বদর-অল-দীন বুস্বানীকে বললো, কয়েকটা ভালো শাড়ি দেখান তো।

খুব মিষ্টি গলার স্বর। যেন মধু ঝরে পড়ে। আমার হৃদয়ে অনুরণন তোলে তার সেই মৃদু কণ্ঠের কয়টি কথা—কয়েকটা ভালো শাড়ি দেখান তো।

অনেকগুলো বাহারী শাড়ি দেখানো হলো। কিন্তু একটাও পছন্দ হলো না তার। বললো, সোনার জড়ির কাজ করা কোন ভালো মসলিন আছে?



বদর-অল-দীন দোকানের অপর প্রান্ত থেকে একটা লম্বা কাঠের বাক্স নিয়ে এলো। অনেক দামী দামী মসলিন বের করে দেখালো। এর মধ্যে একখানা কাপড় সে পছন্দ করলো। জিজ্ঞেস করলো, কত দাম?

দাম শুনে মেয়েটি বলে, অতো টাকা তো সঙ্গে আনিনি। ঠিক আছে, কাপড়খানা দিন, বাড়ি গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দোকানের মালিক বললো, আমাকে মাফ করবেন মালকিন, এ কাপড় আমি ধারে বেচতে পারবো না। এই দেখুন আমার মহাজন বসে আছেন। তাকে আজ টাকা দিতে হবে।

দোকানীর কথা শুনে মেয়েটা তো রেগে আগুন।—আমি আপনার দোকানের পুরোনো খদ্দের। কত টাকার জিনিস কিনি। আর আজ আপনি আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করছেন? এই যে এতো দিন ধরে হাজার হাজার টাকার কাপড় চোপড় কিনেছি; আমার কি কোন বাকী বকেয়া আছে আপনার কাছে। ধারে নিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে কি টাকা পাঠিয়ে দিই নি?

—নিশ্চয়ই দিয়েছেন। আপনার মতো ভালো খদ্দের আমার অহঙ্কার। কিন্তু আজ আপনাকে ধারে দিতে পারছি না, আমাকে ক্ষমা করুন। আজ আমার এই পাওনাদারদের দেনা মেটাতে হবে। আপনি নগদ দিয়ে নিন।

এই কথা শুনে সে দোকানীর মুখের উপর ছুঁড়ে দিলো কাপড়খানা। —আপনারা—এই বাজারের সব দোকানীরা এইরকম। ভালোমন্দ খদ্দের যাচাই করার ক্ষমতা আপনাদের কারুরই নাই।

রাগের মাথায় শরীরটাকে একটু বেশী মাত্রায় ঝাঁকানী দিয়ে উঠে গট গট করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

আমার খুব ভালো লাগলো না। মেয়েটার জন্যে মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করতে লাগলো। আহা, বেচারী খুব অপমানিত হয়েছে। দোকানী যখন আপত্তি করলো, তখন

আমি লক্ষ্য করছিলাম সারা মুখটা লাল হয়ে উঠেছিলো তার। আমি আর থাকতে পারলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে হন হন করে হেঁটে গিয়ে ধরলাম তাকে।—শুনছেন মালকিন, রাগ করে চলে যাবেন না। আসুন, একবার দোকানে ফিরে আসুন, কথা আছে।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো। মিষ্টি করে হাসলো। ভুরু নাচিয়ে বললো, দোকানীর ব্যবহারে খুব আঘাত পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, শুধু আপনার খাতিরে আমি যেতে পারি।

মেয়েটি ফিরে এসে বসলো আবার সেই টুলে। বদর-অল-দীনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ঐ কাপড়খানার দাম কত?

দোকানী বললো, এগারোশো দিরহাম।

—ঠিক আছে, কাপড়খানা ওকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে ঐ টাকার একখানা রসিদ করে দিচ্ছি।

তারপর মেয়েটিকে বললাম, আপনি নিয়ে যান। আপনার যখন খুশি হবে, আমাকে দিয়ে দেবেন দামটা। প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার আমি এই মহল্লায় আসি। এই কাপড় পট্টির কোন এক দোকানে বসি। আপনার ইচ্ছা হলে দেখা করবেন। আর যদি এই শাড়িখানা আমার সামান্য উপহার হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে বিশেষ ধন্য হবো আমি।

আমার কথা শুনে মেয়েটা গলে গেলো। আপনার মতো মহানুভব মানুষ আমি দেখিনি। আল্লাহর দয়ায় আপনার অনেক আছে। এ হয়তো আপনার কাছে কিছুই না। কিন্তু আমি আজ কৃতার্থ হয়ে গেলাম। আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দেন, খুব খুশি হবো।

—তা হলে কাপড়টা নিন, সুন্দরী। আর আপনি যখন আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণই করছেন, আপনার সঙ্গে তখন তো আমার আর পর্দার সম্পর্ক রইলো না। আপনার অমন সুন্দর মুখখানা নাকাবে ঢেকে রাখবেন? খুলুন না। দেখে নয়ন সার্থক করি।

মেয়েটি নাকাব তুলে দিলো। এবার ভালো করে দেখলাম তার চোখ ঝলসানো রূপ। চোখ আর ফেরানো যায় না। আমাকে ঐভাবে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে শরমে মুখটা নামিয়ে নিলো একটু। কিন্তু বুঝলাম আড়চোখে আমাকেও দেখছে সে। ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি। আমার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে। কপালে স্বেদবিন্দু জমে ওঠে।

কাপড়খানা হাতে নিয়ে উঠে পড়লো সে।—তাহলে মালিক, আজ চলি। আপনি আসছেন তো আমাদের বাড়ি? না, চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের আড়াল হয়ে যাবো? আমার ঠিকানা এখানেই পাবেন।

আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। সে সুযোগও দিলো না মেয়েটি। দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সারাটা বিকাল বসে রইলাম ঐ দোকানে। চুপচাপ। শুধু মেয়েটির কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গী, বাঁ চোখের চাহনী, ভুরু নাচানো—সব, সব ছবির মতো ভেসে উঠতে লাগলো আমার চোখের সামনে। বদর-অল-দীন মাঝে মাঝে ঠাট্টা মজাক করে আমাকে সহজ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই মৃত্যু হয়ে গেছে, আমার।

সেদিন আর কাসরেন পাড়ায় গেলাম না। সরাব ভালো লাগলো না। সকাল সকাল সরাইখানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। নফরটা এসে বলে, মালিক, খানাপিনা করবেন না।

আমি বলি, নারে, তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

সে বললো, কেন, মালিক, তবিয়ৎ খারাপ হয়েছে নাকি?

বিদেশ বিভূঁই জায়গা। আমার পুরাতন ভৃত্য চিন্তিত হয়ে পড়লো। কিন্তু ওকে আমি তখন কি করে বোঝাই, আমার কী হয়েছে? মনের মধ্যে কিসের তুফান উঠেছে? তার প্রথম চোখের বাণ আমাকে বিদ্ধ করেছে। সেইখানেই আমার মৃত্যু হয়ে গেছে।

সারা রাত ঘুম এলো না। ঘরের এ প্রান্ত ও প্রান্ত পায়চারি করে কাটালাম। সকাল না হতেই গোসল করলাম। জমকালো দামী পোশাক পরলাম। একটু সরাব আর নাস্তা খেয়ে বাজারের দিকে পা বাড়ালাম। বদর-অল-দীন তখন সবে দোকান খুলে বসেছে। আমাকে দেখেই হৈহৈ করে উঠলো, আরে ব্যাস, সুবা না হতেই সূর্য উঠেছে আজ।

বদর-এর পাশে বসে আছি। অনর্গল রঙ্গ রসিকতা করে চলেছে সে। তার সব কথা কানেও ঢুকছে না আমার। 'হু' 'না' করে তার দু-একটা কথার জবাব দিই। আবার কখনও একেবারেই দিই না। আমার তখন এক চিন্তা। এক ধ্যান-জ্ঞান। সেই মদালসা মোহিনী।

একটু পরেই মেয়েটি এলো। আমার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, ভালো আছেন?

—হ্যাঁ। আপনি?

ঘাড় নেড়ে জানালো, সেও ভালো আছে। তারপর ছোটখাটো আরও কিছু কথা হলো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, আজ আর সে একবারও দোকানীর দিকে ফিরে চাইলো না, বা তার সঙ্গে কোনও বাক্যালাপ করলো না।

তারপর এক সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এবার চলি। আপনার কোন একজন লোক দিতে পারেন আমার সঙ্গে? টাকাটা দিয়ে দিতাম তার হাতে।

—থাক না, এতো তাড়া কিসের?

—আপনি বহুৎ দিল-দরিয়া মানুষ। তাই এমন কথা বলতে পারলেন?

—টাকাটা দিয়ে দিতে পারলেই তো যোগাযোগের সুতোটাও ছিঁড়ে দিতে পারবেন। থাক না। ওই তুচ্ছ টাকাটার অছিলা করেও যদি আপনার দরবারে হাজিরা দিতে পারি, ধন্য হয়ে যাবো।

মেয়েটি ঠোঁট দিয়ে দাঁত কামড়ে ধরলো। বটুয়া খুলে গুণে গুণে এগারোশো দিরহাম আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললো আমার মহল আপনার জন্যে সব সময়ই খোলা রইলো। যখন খুশি, যাবেন। কোন অছিলা অজুহাতের দরকার হবে না। বুঝলেন সাহেব? এবার আমি চলি।

দিরহামগুলো আমার হাতে দেবার সময় ওর চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো আমার হাতের তালুর ওপর দু-এক মুহূর্ত নিশ্চল নিথর হয়ে থেমেছিলো বোধহয়। আমার ধমনীতে রক্তপ্রবাহের গতিবেগ উদ্দাম হতে থাকলো। সাধারণ সৌজন্য-সূচক দু-একটা কথা বলে রাস্তায় নেমে পড়লো সে। ও বুঝতে পেরেছে পাখী জালে পড়েছে। তাই সে আর তিলমাত্র অপেক্ষা করলো না।

আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে একটু পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখা গেলো অদূরে হেঁটে চলেছে সে। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেই চলতে লাগলাম। হঠাৎ এক সময় লোকজনের ভীড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলো সে। এদিক ওদিক উঁকি বুকি মেরে তাকে খুঁজছি, এমন সময় বোরখা পরা অচেনা একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে।

—মালিক, মেহেরবানী করে আমার মালকিনের বাড়িতে একবার যাবেন? আপনার সঙ্গে তার দু'একটা কথা আছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম। অচেনা অজানা জায়গা। মেয়েটিকে চিনি না। কে তার মালকিন, তাও জানি না। হঠাৎ তার কথায় যাবোই বা কেন? বললাম, আমি তো তোমাকে চিনি না মেয়ে। আর তোমার মালকিনই বা কে? আমার সঙ্গে তার কি দরকার? আমি যেতে পারবো না।

—সে কি সাহেব, এর মধ্যে সব ভুলে গেলেন? একটু আগেও তার সঙ্গে দোকানে বসে কত গল্প করলেন? আমি তো তার সঙ্গেই ছিলাম। আমার মনিব উনি।

এবার বুঝলাম। বললাম, চলো।

একটু এগোতেই দেখলাম, একটা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি। আমাকে দেখে ইশারায় দেওয়ালের ওপাশে অপেক্ষাকৃত একটু নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়াতে বলে নিজেও এগিয়ে গেলো সেখানে।

মেয়েটি মুখের নাকাব সরিয়ে সোজা আমার দিকে তাকালো। তার চোখে মিনতির ভাষা। বললো, তোমাকে দেখা অবধি আমার বুকের মধ্যে কেমন এক কাঁপুনি ধরেছে। সেই কাল থেকে। সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। খানাপিনা ভালো লাগছে না। এরকম কেন হলো আমার? কী করেছো তুমি, সোনা? তুমি কি যাদু জানো?

—আমার তো সেই কথা। আমিও তো তোমাকে দেখা মাত্র ভালোবেসে ফেলেছি। কাল সারারাত শুধু ঘর-বার পায়চারী করে কাটিয়েছি। এক মুহূর্ত ঘুমুতে পারিনি? তুমি কি যাদু জানো?

হাসলো সে। তার কথার প্রতিধ্বনি শুনলো আমার মুখে। সেই জন্যেই বুঝি হাসলো। বললো, এখন বলো মালিক, তুমি আমার বাড়ি যাবে, না আমি তোমার বাড়ি যাবো। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

আমি বললাম, আমি এখানে বিদেশী। এখানে আমার কোন বাড়ি নাই। একটা সরাইখানায় উঠেছি। সেখানে তো আর তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায় না। হরেক রকম লোকের আনাগোনা সেখানে। সেখানে প্রাণ খুলে মনের কথা বলা যায়? তার চেয়ে তোমার যদি অসুবিধে না থাকে, আমি যেতে পারি তোমার বাড়ি।

—কিচ্ছু অসুবিধে নেই, সোনা। কিন্তু আজ না। কাল দুপুরের নামাজের পরে একটা খচ্চরে চড়ে আসবে আমার বাড়ি। হাব্বানিয়াহর মোড়ে এসে জিজ্ঞেস করবে সিনডিক রবাক-এর বাড়ি কোনটা। আবু সামাহ বললেই বেশী লোকে চিনবে। ওটাই আমার গরীবখানা। যাবে কিন্তু। তোমার জন্যে না খেয়ে বসে থাকবো আমি। যদি না যাও, কিচ্ছু খাবো না, এই বলে রাখলাম।

ওর ছেলে মানুষী কথাগুলো শুনতে ভারি ভালো লাগলো। ওর ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কথা বলা, ওর আদর আব্দার আমাকে এক অন্য জগতে নিয়ে চলে গেলো। বললাম, যাবো—নিশ্চয়ই যাবো। না গেলে আমি যে মরে যাবো, সুন্দরী।

খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতেই ফিরে আসি সরাইখানায়। কিন্তু কেন জানি না, সে রাতেও ঘুম এলো না। সারা রাত তার কথা ভেবে, তার ছবি এঁকে এঁকে কেটে গেলো। সকালে গোসলখানায় ঢুকে আচ্ছা করে সাফা করলাম সারা শরীর। দামী সিল্কের পোশাক পরলাম। একপাত্র সরাব নিয়ে নানারকম খাবার দিয়ে নাস্তা সারলাম। সারা গায়ে দামী আতর ছড়ালাম।

দুপুর হতে না হতেই রুমালের খুঁটে পঞ্চাশটা সোনার মোহর বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই বাব জাবিলার মোড়। সেখানে গিয়ে একটা সুন্দর দেখে খচ্চর ভাড়া করলাম। ছোকরাটাকে বললাম, হাব্বানিয়াহ-র মোড়ে চল্।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম। ছোকরাটাকে বললাম, দেখে আয় তো, আবু-সামার বাড়ি কোন্‌টা।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলো সে। বললো, চলুন, ঐ যে বাড়িটা দেখছেন লাল রঙের—ওই বাড়িটা।

বাড়ির সামনে এসে সোনার একটা সিকি মোহর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছোকরাটাকে বললাম, কাল সকালে এসে আমাকে আবার নিয়ে যাবি।

মোহরটা কপালে ঠেকিয়ে ছোকরাটা বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, কত্তা। আমি ঠিক সময়ে এসে হাজির হবো।

কড়া নাড়তেই দু'টি অল্প বয়েসী খুবসুরৎ লেড়কী দরজা খুলে দাঁড়ালো। অপূর্ব সুন্দরী। ডানাকাটা পরীর মতো।

—ভিতরে আসুন মালিক, আমাদের মালকিন আপনার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন। সারা রাত পায়চারী করে কাটিয়েছেন। আপনার সুরৎ চিন্তায় তার খানাপিনা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। আপনিই তাকে খুশি করতে পারবেন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখি, বিশাল আঙ্গিনা। আর তার চার পাশে সাতখানা ঘর। সাতটা দরজা। আর চোদ্দটা জানালা। নানারঙের ফুলের গাছে আঙ্গিনাটা ভরা। মাঝখানে একটা নিরবধিনির্ঝর ফোয়ারা। তাকে ঘিরে একটা শান বাঁধানো বিরাট চৌবাচ্চা।

গোটা বাড়িটাই শ্বেতপাথরের তৈরি। দেওয়ালে টাঙানো নামী শিল্পীর দামী দামী ছবি। পারস্য গালিচায় মোড়া মেঝে। মেহগনি কাঠের আসবাব পত্রে সুন্দর করে সাজানো গোছানো। সোফা কোচ টেবিল চেয়ার ইত্যাদি। আমি গিয়ে বসলাম একটা সোফায়।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছাব্বিশতম রজনী।

শাহরাজাদ বলতে থাকে। তারপর, শাহজাদা শুনুন ঃ

সেই কাইরোর খ্রীষ্টান দালাল তার কাহিনী বলে চলেছে, আর চীনের সুলতান সাগ্রহে তা শুনছে।

আমি দেখলাম, সেই সুন্দরী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। নানারকম মণিমুক্তার অলঙ্কারে



সেজেছে সে। পরনে ঢাকাই মসলীন। সাত প্যাঁচে জড়িয়েছে। তবু মনে হয়, একেবারে নগ্ন। তার গ্রীবা, স্তন, কটি, নিতম্ব, জঙ্ঘা, উরু সব পরিষ্কার স্বচ্ছ। প্রসাধন পরিচ্ছন্ন মুখাবয়ব, কাজল আর সুর্মা টানা চোখে তাকে আজ এক অপরূপ লাস্যময়ী রমণী করে তুলেছে। আমার কাছে এসে গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। আমার মুখটা চেপে ধরলো ওর কবোষ্ণ বুকে। তারপর মুখটা নামিয়ে আমার ঠোঁটে রাখলো ওর ঠোঁট। বললো, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে আজকের এই দিনটা।

আমি বললাম, আমারও। জীবনে আজ এই প্রথম তোমার ভালোবাসা পেলাম। ভালোবাসা যে কি বিষম বস্তু আগে বুঝিনি। নারীকে চেয়েছি দেহের প্রয়োজন। দাম দিয়ে কিনেছি। মজা লুটেছি। তারপর ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আজ দু'দিন থেকে আমার সব কেমন ওলোটপালোট হয়ে গেছে। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার চোখে ঘুম নাই, আহারে রুচি নাই।

সে বললো, আমারও সেই দশা। আমিও তো এর আগে কারো ভালোবাসা পাইনি।

আমার শাদী হয়েছিলো সুলতানের প্রিয়পাত্র এক আমীর-এর সঙ্গে। পয়সাকড়ি প্রতিপত্তির কিছুই অভাব ছিলো না সেই বৃদ্ধের অভাব, ছিলো শুধু একটা জিনিসের। যা না থাকলে মেয়েদের কাছে সে একটা হতভাগা মাত্র। আমি ভালোবাসার স্বাদ বুঝিনি। আজ আমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে তুমি। আমিও উজাড় করে দেবো সব।

টেবিলে নতুন কাপড় বিছিয়ে খানা সাজানো হলো। মোরগ মসাল্লাম, তন্দুরী রুটি, সব্জী আর হালওয়া আমরা দু'জনে বসে খুব তৃপ্তি করে খেলাম, আমার 'ভালোবাসা' আদর করে দু-এক টুকরো মাংস আমার মুখে পুরে দিলো। আমিও দিলাম তাকে।

একটা তামার গামলায় হাত মুখ ধুলাম আমরা। পরিচারিকা এসে গোলাপজল পিচকারী করে দিলো আমাদের মুখে। তুরস্কের তোয়ালে দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিলো আমার ভালোবাসা।

এর পর আমরা নিভৃতে জানালার পাশে বসে সামনের ফুলবাগিচার মনোহর শোভা দেখতে দেখতে অনেক হৃদয়ের কথা বিনিময় করলাম। যে কথা কাউকে বলিনি, যে কথা কাউকে বলা যায় না সেই সব অতি গোপন কথা বললাম, শুনলাম।

তারপর আমরা আরো কাছাকাছি হয়ে দেহে দেহ মেলালাম। নতুন খেলায় মেতে উঠলাম দু'জনে। ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। সন্ধ্যাও এক সময় গভীর রাত্রি হয়ে যায়। আমরা দু'জনা দু'জনের মধ্যে হারিয়ে গেছি। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মোমের বাতি গলতে গলতে এক সময় ফুরিয়ে যায়। আবার নতুন বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। আবার জ্বলে জ্বলে শেষ হয়। আবার জ্বলে ওঠে বাতি। দু'জনে দু'জনের বাহু পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকি। যতক্ষণ না ভোর হয়। জীবনে এমন মধুযামিনী এর আগে কখনও আসেনি আমার।

সকালে উঠে সরাইখানায় ফিরে আসি। আসার আগে সেই রুমালে বাঁধা পঞ্চাশটা সোনার মোহর তার বালিশের নিচে চাপা দিয়ে রেখে এলাম।

বিদায় নিয়ে আসার সময় তার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের সেই কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারি না।—আবার কবে দেখা হবে, আমার জান।

—আজ রাতেই আবার আসবো।

সরাইখানায় নেমে খচ্চরটার সহিস ছোকরাকে বলে দিয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলায় সে যেন এসে আবার আমাকে নিয়ে যায়।

সরাইখানায় এসে গোসল করে নাস্তা খেলাম। তারপর ভাবলাম তাগাদায় বেরুতে হবে। কিছু টাকা চাই। আজ রাতে যাবো আবার আমার প্রিয়ার কাছে। সুতরাং নাস্তা সেরে বাজারের পথে বেরুলাম। আদায়পত্র করে সরাইখানায় ফিরে এসে দেখি আমার টেবিলে বিরাট জামবাটীতে ভর্তি ভেড়ার মাংসের কোর্মা এবং অনেকখানি ভালো ভালো মিঠাই-মণ্ডা রাখা আছে. বাজারে বেরুবার আগে বলে গিয়েছিলাম বাজারের সবচেয়ে সেরা দোকান থেকে সে যেনো এই খাবারগুলো নিয়ে এসে রাখে। আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো আমার প্রেয়সীর বাড়ি। রুমালের খুঁটে আবার পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা বেঁধে খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে সেই ছোকরার খচ্চরের পিঠে চেপে আবার গিয়ে নামলাম তার বাড়ির গেটে।

সে দিন দেখলাম আগাগোড়া বাড়িটা ঝাড়পোছ করা হয়েছে। আরও সুন্দর করে সাজানো-গোছানো হয়েছে ঘরদোর। আমাকে আরও ভালো ভাবে আদর অভ্যর্থনা করার সব ব্যবস্থাই ভারি চমৎকার মনে হলো আমার।

আমাকে দেখা মাত্র ছুটে এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সে আদর করতে থাকলো,

সোনা, সারাটা দিন কী ভাবে যে কাটিয়েছি, কী বলবো। তোমাকে না দেখতে পেলে আমি আর এক মুহূর্ত বাঁচবো না।

টেবিলে খানা পিনা সাজানো হলো। আমার প্রিয়া আমার সাকী আমায় সরাবের পাত্র মুখে তুলে ধরলো। আমি একটা চুমুক দিলাম। এক টুকরো মাংস তুলে নিয়ে আমার মুখে পুরে দিলো। আমি গিলে ফেললাম।

সুরার নেশায় যত না নেশা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি নেশা ধরায় প্রিয়ার বাহুডোর। মনে হয় 'এ জগতে তুমি ছাড়া আর কিছু নাই কেহ নাই গো'।

সারাটা রাত দু'জনে দু'জনের বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে রইলাম। সকাল হতেই উঠে পড়ি। আমার খচ্চর আসবে। সরাইখানায় যেতে হবে। তারপর আবার তাগাদায় বেরুতে হবে। আবার চাই টাকা। পঞ্চাশটি সোনার মোহর। সন্ধ্যাবেলা রুমালের খুঁটে বাঁধা মোহরগুলো বালিশের তলায় রেখে ফিরে এলাম সরাইখানায়।

সারারাতের অনিদ্রা অত্যাচারের ফলে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। সে দিন আর সকালে তাগাদায় বেরুতে পারলাম না। সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমুলাম। বিকালের দিকে স্নান টান সেরে তৈরি হলাম। নফরটাকে পাঠালাম দোকানে। মুরগীর বিরিয়ানী, চাঁপ, হালওয়া, আপেল, আঙ্গুর বেদানা নিয়ে এলো সে। সন্ধ্যার আগে খচ্চর নিয়ে এলো ছেলেটা। খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে

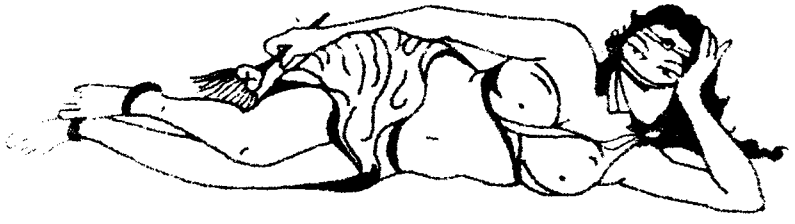

পৌঁছলাম প্রেয়সীর বাড়ি। সাদর অভ্যর্থনা করে পালঙ্কে বসালো সে। দু'জনে মিলে খানা পিনা সারলাম। তারপর সারা সন্ধ্যা অনেক আদর-সোহাগ-এর পর্ব চললো। রাত বাড়ে। দেহের উত্তেজনাও বাড়তে থাকে। একে অনের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। মোমবাতি গলে গলে ফুরিয়ে যায় এক সময়। আবার নতুন মোম জ্বলে ওঠে। তাও এক সময় শেষ হয়। আবার। আবার। এইভাবে রাত্রি অবসান হয়। অনিদ্রা-অবসন্ন দেহটা টেনে নিয়ে ফিরে আসি সরাইখানায়। রুমালের খুঁটে বাঁধা পঞ্চাশটা সোনার মোহর রেখে আসি ওর বালিশের তলায়।

এই ভাবে রাতের পর রাত তার বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে দিন কাটতে থাকে। অবশেষে একদিন সকালে উঠে বুঝতে পারলাম, আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমার সম্বল বলতে আর কানা-কড়িও নাই।

কি করবো, কোথায় যাবো, কোথায় টাকা পাবো--সেই চিন্তা আমাকে পাগল করে তুললো। বাজারে গিয়ে লাভ নাই। সেখানে আমার কোনও কিছু পাওনা নাই। একটু এগুতেই দেখলাম, কতকগুলো ছেলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে কি যেন দেখছে। কাছে গিয়ে দেখি, একটা তাগড়াই ঘোড়ার পিঠে এক সিপাই। লড়াই এর সাজে সজ্জিত। এমন দৃশ্য শহরের সাধারণ মানুষ সচরাচর দেখতে পায় না। তাই এতো ভীড়। আমিও ওদের সামিল হয়ে পড়লাম। ভীড়ের চাপে পড়ে সিপাই-এর গায়ে গিয়ে লেপটে পড়ি। সেপাই-এর ভেবে আমার হাত ঠেকলো। শক্ত মতো বটুয়া আছে বুঝতে পারলাম। জানি না কি হতে কি হয়ে গেলো, টুক করে তুলে নিলাম সেটা। হয়তো আমার হাতে পয়সা কড়ি ছিলো না বলেই লোভটা সামলাতে পারলাম না। কিন্তু বিপদ

এড়াতে পারলাম না। পর মুহূর্তেই সিপাইটা চিৎকার করে উঠলো, আমার টাকা? আমার বটুয়া?

আশে পাশের যারা ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিলো, সকলের মুখের ওপর একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলো সে। আমি ভীড় ঠেলে বেরোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা আর হলো না। সিপাই-এর দস্তানা পরা হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসিতে পড়ে গেলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছি আমি। বুঝতে পারলাম, সিপাইকে ছেঁকে ধরেছে সবাই। —কেন মারলে ওকে। একটা অসহায় ছেলের গায়ে হাত তুললে কেন?

সিপাই বললো, লোকটা চোর। আমার জেব থেকে টাকার থলে তুলে নিয়েছে।

একজন রুখে এলো, মিছে কথা। খানদানী চেহারার ছেলে, দেখছোনা! ও তোমার জেবে হাত ঢোকাবে? তোমার ভুল হয়েছে।

সিপাই তখনও বলছে, না, আমি ভুল করিনি। ও-ই নিয়েছে আমার বটুয়া।

কিছুলোক আমার পক্ষে সিপাইকে ডাঁটছে। আবার কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে চলে যাচ্ছে। এমন সুন্দর একটা ছেলে—চুরি করেছে!

কেউ আবার মন্তব্য করে, কি যে দিন কাল হলো, মানুষের মুখ দেখ চেনার উপায় নাই—কে কেমন?

জনতার আক্রোশ ক্রমশই বাড়তে থাকে। সিপাই প্রায় কোণ ঠাসা হয়ে পড়ে। এমন সময়, আমার নসীব খারাপ, সেই পথ দিয়ে দারোগা সাহেব যাচ্ছিলো। এমন একটা জমায়েৎ দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, এতো জটলা কিসের?

জনতার একজন এগিয়ে এসে নালিশ জানালো, এই সিপাইটা এই ছেলেটাকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে।

সিপাইটা বললো, আমীর সাহেব, লোকটা চোর। আমার জেব থেকে টাকার বটুয়া তুলে নিয়েছে।

দারোগার প্রশ্ন, তুমি কি হাতে নাতে ধরেছো?

—জী না।

—আর কেউ দেখেছে তোমার জেবে হাত ঢোকাতে? জনতা নিরুত্তর। সিপাইটা বললো, না।

—তবে? কী করে বুঝলে, ও তোমার জেব মেরেছে?

—আমার জেবে একটা নীল রঙের বটুয়া ছিলো। আর তার মধ্যে কুড়িটা সোনার মোহর ছিলো, হুজুর।

দারোগা বললো, ওকে তাল্লাসী করে দেখো।

আমার পকেট থেকে সেই নীল রঙের বটুয়া পাওয়া গেলো। দারোগা সাহেব নিজে বটুয়া খুলে দেখলো। হ্যাঁ কুড়িটাই মোহর আছে।

দারোগা সাহেব ক্রুদ্ধ। আমাকে জেরা করতে লাগলো, সত্যি করে বলো, চুরি করেছো?

আমি আর কি বলবো। মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন আমি যাই বলি না কেন, কোন সুফল হতে পারে না। আমার অস্বীকারে দারোগার ক্রোধ বাড়বে বই কমবে না। তাই কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু তাতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো সে। —এখনোও বলো, তুমি চুরি করেছো কি না।

আমি বললাম, জী হুজুর।

দারোগা তখন তার লোকজনকে বললো, ওর হাত দু'খানা কেটে ফেলো।

চুরি করার একমাত্র সাজা হাত কেটে ফেলা। আমার ডান হাতটা কাটা হয়েছে।

এবার বাঁ হাতটাও কাটা হবে। এমন সময় সেই সিপাইটা দারোগার কাছে আমার বাঁ হাতটা না কাটার জন্যে আর্জি পেশ করলো। সিপাই-এর দৌলতেই এ হাতটা রক্ষা পেয়ে গেছে।

দারোগারা চলে যাবার পর উপস্থিত জনতার কয়েক জন আমাকে, দয়াপরবশ হয়ে, হেকিমি দাওয়াখানায় নিয়ে গেলো। ওষুধপত্র লাগিয়ে বেঁধে দিলো হেকিম। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে শরীরের। বেশ দুর্বল হয়ে পড়লাম। কে একজন এক পাত্র সরাব এনে দিলো আমাকে। এক চুমুকে টেনে নিলাম। একটু পরে চাঙ্গা হলো শরীরটা। ডান হাতের ওপর রুমালটা জড়িয়ে নিয়ে দাওয়াখানা থেকে পথে নামলাম।

আমার 'ভালোবাসার' কাছে যাবো। কিন্তু এই হাত নিয়ে তার কাছে দাঁড়াবো কি করে? কী বলবো তাকে? ভেবে কিছু কূল কিনারা করতে পারলাম না। এক পা এক পা করে কখন যে তার বাড়ির সামনে এসে পড়েছি, বুঝতে পারিনি।

আমাকে দেখে ছুটে এলো সে। সন্ধ্যা বেলায় আসার কথা, অথচ সকালেই এসে গেছি। অপ্রত্যাশিত পাওয়ার আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো আমার প্রেয়সী। আমি বিষণ্ন বিবশ হয়ে ঘরে গিয়ে পালঙ্কে শুয়ে পড়লাম। সে আমার পাশে এসে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো—কি হয়েছে, সোনা, তোমাকে এমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন? অন্যদিন কেমন সেজেগুজে আসো। কিন্তু আজ তোমার জামাকাপড়ও কেমন কুচকে গেছে, মাথার চুলগুলো এলো মেলো—কী হয়েছে বলতো?

আমি বললাম, শরীরটা ভালো নেই, বড্ড মাথা ধরেছে।

—টিপে দেবো?

আরো কাছে এগিয়ে আসে সে। আমার মাথাটা তুলে নেয় ওর কোলে।

আমি বলি, না, থাক। তেমন কিছু না। ও এমনি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েমানুষের চোখে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ও বললো, না সোনা, তুমি লুকিয়ে রাখছো। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। তোমাকে এমন মন-মরা হয়ে থাকতে কখনও দেখিনি। আমার কাছে খুলে বলো, সোনা। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

—কিছু ঘটেনি। আমার শরীরটা ভালো নাই। তুমি এখন যাও, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

আমার বলার ঝাঁজে আহত হলো সে। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। —বুঝেছি, আমাকে আর ভালো লাগছে না তোমার। এই ক' দিনেই আমি ফুরিয়ে গেছি তোমার কাছে।

আমি মহা ফাঁপরে পড়লাম। কি বলে, কি করে ওর কান্না থামাই। কি করে বোঝাই, ওসব কিছু না, ভালোবাসাতে কোন চিড় খায়নি।

—তোমার ওসব কথা মনে এলো কি করে? তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে ভালোবাসিনি সোনা।

—না না না। ও কথা বলে আমাকে বোঝাতে পারবেনা। তোমার চোখ দেখে আমি বুঝেছি। আমার ওপর আর কোনো আসক্তি নাই তোমার। তোমাকে খুশি করার মতো আর কিছুই নাই আমার।

আমার কোন কথাতেই কান দিলো না সে। সারাটা দুপুর, সারাটা বিকাল কেঁদে ভাসালো। সন্ধ্যার আগে অন্য দিনের মতো খাবার সাজানো হলো। আমার কাছে এসে ডাকলো, ওঠো, খাবে এসো।

আমি বললাম, আমার খিদে নেই। তুমি খেয়ে নাও। আমি পরে খাবো'খন।

এই কথায় ভীষণ রেগে গেলো সে। —খাবে তো শিগ্গির উঠে এসো। না হলে সব উল্টে দেবো, বলছি।

অগত্যা বাধ্য হয়ে খাবার টেবিলে যেতে হলো। বাঁ হাত দিয়ে খাবার তুলে মুখে দিতেই অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করে, সেকি? তোমরা ডান হাতে কি হয়েছে? দেখি?

আমার রুমালে বাঁধা হাতটা তুলে ধরলো সে। আমি বললাম, একটা ফোঁড়া উঠেছে, তাই বেঁধে রেখেছি।

সে বলে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি। খাওয়ার পর ছুরি দিয়ে মুখটা ছাড়িয়ে দেবো, দেখবে পুঁজ রক্ত বেরিয়ে গেলে, আরাম পাবে।

আমি বলি, সবে উঠেছে, এখনও পাকেনি। আমার চোখে জল এসে গেলো। যার কাছে হৃদয়ের কোন কথা গোপন রাখিনি, আজ তার কাছে অনর্গল মিথ্যে বলে যাচ্ছি আমি। আমার চোখে জল দেখে সে মনে করলো ফোঁড়ার ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছি। বললো, একটু সরাব খেয়ে নাও, ব্যথাটা কমে যাবে।

একপাত্র সরাব তুলে ধরলো আমার মুখে। এক চুমুকে খেয়ে নিলাম। আরও এক পাত্র ভরে দিলো—পরে আরও এক পাত্র। নেশা বেশ ধরে গেলো। ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে এলো চোখ। আমাকে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো। মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমে গলে গেলাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই ডান হাতটা তুলে দেখলাম। আমরা ঘুমের সুযোগে সে হাতটা খুলে দেখে আবার বেঁধে রেখেছে। হেকিমের হাতের বাঁধা থেকে সে বাঁধা অন্য রকম। লজ্জায় দুঃখে ওর মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না। ও কিন্তু কিছু বললো না, কিছু প্রশ্ন করলো না। শুধু এক পেয়ালা সরাব আমার মুখের সামনে তুলে ধরলো। কোন কথা না বলে এক চুমুকে খেয়ে নিলাম সবটুকু। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এবারে চলি, অনেক বেলা হয়ে গেলো।

সে এবার পথ রোধ করে দাঁড়ালো, না, যাওয়া হবে না। কোথায় যাবে তুমি?

—যেদিকে দু-চোখ যায়। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তোমাকে আর জড়াতে চাই না। ভাগ্যের অন্বেষণে বেরুবো। দেখি, কি হয়।

সে বললো, এখন তোমার হাতের এই অবস্থা। ভালো করে সেবা শুশ্রূষা দরকার। অন্য কোথাও গেলে তা হবে না। এখানেই থাকতে হবে তোমাকে।

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ছোট ছেলের মতো কেঁদে উঠলাম,—আমি চোর। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি।

ও আমার মুখে হাত চাপা দিলো, চুপ, কেউ শুনে ফেলবে। আমি কাল রাতেই তোমার হাত খুলে দেখেছি। চুরি করার একমাত্র সাজা হাত কেটে দেওয়া। কিন্তু আমি ভেবে পেলাম না, সোনা, তুমি কেন চুরি করতে গেলে?

—আমার আর কিছুই নাই। সব শেষ করে দিয়েছি।

মেয়েটি কোন কথা বলতে পারলো না। সব দোষটাই তার। প্রতি সন্ধ্যায় সে এসেছে। সারারাত স্ফূর্তি করেছে। মদ মাংসে অনেক পয়সা গেছে। তাছাড়া রোজ পঞ্চাশটা করে মোহর দিয়ে গেছে তাকে। এইভাবে ব্যবসার সব টাকা পয়সা খুইয়ে সে পথের ভিখিরী।

—তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। এখানেই থাকো। আমার জন্য তোমার আজ এই অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য ভুলে তুলে আমাকে নিয়ে মত্ত হয়ে গিয়েছিলে। বোকার মতো দু'হাতে পয়সা উড়িয়েছো, আমিও তোমাকে পেয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। তোমার কিসে ভালো হবে, তা আমার দেখা উচিত ছিলো। তা না, আমি তোমাকে সব কাজ কাম ভুলিয়ে আমার কাছে ধরে রেখেছিলাম। আজ তুমি সর্বস্বান্ত, শুধু আমার জন্যে। আর আমার

জন্যেই তোমার হাতটা গেছে। এই দুঃখ আমি কোথায় রাখবো, সোনা! কি দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করবো!

আমি ওকে বুকে টেনে নিই। তোমার কি দোষ? আমি তো আর ছেলেমানুষ নই। আমার নির্বুদ্ধিতার ফল আমাকে ভোগ করতে হবে।

—না না না। সে হতে পারে না। তুমি আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না। দুনিয়াতে এমন কোন শক্তি নেই, তোমার থেকে আমাকে আলাদা করে রাখবে। আমি আজই এখুনি সব ব্যবস্থা পাকা করে দিচ্ছি। তোমাকে আমি শাদী করবো। আমার যা আছে সব তোমাকে দেবো, তুমি আবার ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। আমরা সুখে দুঃখে ঘর সংসার করবো।

আমি হতবাক হয়ে রইলাম। সত্যিকারের ভালোবাসা না থাকলে এ কথা কেউ বলতে পারে না। অথচ ওকে আমি গোড়া থেকেই ভুল বুঝেছিলাম। টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলাম।

মৌলভী আর সাক্ষী ডাকা হলো। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় আমরা শাদী করলাম। ও তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি আমার নামে দান-পত্র করে দিলো। —তোমার মানেই আমার। এই বিশাল সম্পত্তির বোঝা আমি আর বইতে পারছি না। আজ থেকে তুমি আমার আইনসম্মত স্বামী। তোমার হাতেই সব তুলে দিলাম। আর আমার শাদীর দেন মোহর? সে তো তুমি সোনা, অনেক দিন ধরে জমা করে দিয়েছো আমার কাছে।

রাতের খানা পিনা শেষ করে আমাকে নিয়ে গেলো সে তার সিন্দুকের কাছে। এক এক করে সব দেখালো, তার টাকাপয়সা। হীরা জহরৎ, অলঙ্কার। আমার দেওয়া মোহরগুলো দেখলাম, তেমনি রুমালের খুঁটেই বাঁধা আছে। সে বললো, আজ থেকে এইসব তোমার। এই নাও চাবি।



আবার আমি নতুন জীবন পেলাম। হাসি গানে ভরে—উঠলো আমাদের জীবন। নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করলাম। কিন্তু আমার বিবির মুখে অনেক হাসি হল্লার মধ্যেও, এক করুণ বেদনার ছাপ অনুভব করতাম আমি। অনেকরাতে ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকতো, আমার জন্যে—শুধুই আমারই জন্যে ডান হাতটা গেলো। আমার মতো হতভাগীর মরণ হয় না—কেন...

আমি তাকে জাগিয়ে তুলি, সোনা, কি সব ভুল বকছো। আমার একটা হাত গেছে, তার জন্যে তুমি দিন রাত অতো কষ্ট পাও কেন? আর একটা হাত তো আমার আছে? আর সব চেয়ে বড়ো—তুমি তো আছো। আমার যদি এ হাতটাও কাটা যেতো, তোমাকে যখন সারা জীবনের মতো পেয়েছি, আমার কোন দুঃখ থাকতো না। আমি হয়তো প্রাণেই বাঁচতাম না, যদি তুমি আমাকে না এমনিভাবে কাছে টেনে নিতে। কোন মন খারাপ করো না, সোনা। যা গেছে তা গেছে। যা আছে, যা পেয়েছি তাই নিয়ে হেসে খেলে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবো আমরা।

কিন্তু সারাটা জীবন আর একসঙ্গে কাটাতে পারলাম না। কি কালব্যাধিতে ধরলো তাকে—কত বড় হেকিম দেখলাম, কত দামী দামী দাওয়াই পত্র খাওয়ালাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো সে। যতই তাকে হৈ চৈ করে মাতিয়ে রাখতে চেষ্টা করি, ততই যেন সে আরও মুষড়ে পড়ে। বুঝতে পারলাম, আমার হাতটা কাটা যাওয়ায় যে-আঘাত পেয়েছে সে, তা আর সামলাতে পারছে না।

ঘুসঘুসে জ্বর হতে লাগলো। সারাদিন রাত ছাড়ে না। খুক খুক করে কাশে। বুকে ব্যথা। একদিন কাশতে কাশতে রক্ত উঠলো মুখ দিয়ে। হেকিম বললো, ক্ষয় রোগ। সারা বুকটা ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। বাঁচানো শক্ত।

বাঁচানো গেলোও না। এর মাসখানেক বাদে একদিন সকালে আমাকে শোকের সায়রে ভাসিয়ে দিয়ে বেহেস্তে চলে গেলো সে।

তার মৃত্যুর পর তার সমস্ত ধন সম্পত্তি আমার হাতে এলো। এতো অর্থ নিয়ে আমি কী করবো? টাকা পয়সা বা হীরে জহরৎ ছাড়াও আর যে সব জিনিসপত্র ছিলো সেগুলো এক এক করে বিক্রী করে দিলাম। পঞ্চাশ মণ ক্ষীরার বীজ ছিলো ঘরে। আপনাকে দিয়ে বিক্রী করালাম। দিনের পর দিন কথা দিয়েও আপনার কাছে টাকাটা নিয়ে যেতে পারলাম না। তার কারণ আমি তখন অন্যান্য জিনিসপত্র, জমিজমা, বিষয়আশয় সব বেচে দেবার ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এতোদিনে সব কাজ শেষ হয়ে গেলো। আজ আমার সময় হয়েছে তাই আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু আমার একটা নিবেদন আছে। আমার এখন অনেক টাকা। এতো টাকা নিয়ে আমি কি করবো, ভেবে পাচ্ছি না। আপনার কাছে যে টাকাটা গচ্ছিত আছে সেটা আমি আর ফেরৎ নিতে চাই না, ওটা আপনাকে দিলাম। আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করে ধনবান হোন, এই আমি চাই।

যুবক বললো, এই হলো আমার জীবনের কাহিনী। এই জন্যে আজ আমি আপনার বাড়িতে বাঁ হাত দিয়ে খানা খেলাম।

তারপর, জাঁহাপনা আমি সেই যুবককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, তোমার এই অনুগ্রহ আমার চিরকাল মনে থাকবে।

সে বললো, ওসব কিছু মনে রাখার দরকার নাই। আজ আমি এতো বিত্তবান, আপনার ঐ সাড়ে চার হাজার দিরহাম আমার কাছে কিছুই না। আপনি যদি আমার সঙ্গে ব্যবসায় আসেন, খুব খুশি হবো। আমি এখন বাগদাদে কারবার শুরু করেছি। আপনি তো শুনলেন বাগদাদ আমার জন্মভূমি। কাইরো এবং আলেকজান্দ্রা থেকে মাল নিয়ে গিয়ে বাগদাদে বিক্রী করছি। দারুণ মুনাফা। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, তাহলে কারবারটা আরও বড় করে বাড়াবো।

আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম। কাইরো আর আলেকজান্দ্রা থেকে মালপত্র নিয়ে গিয়ে বাগদাদে বিক্রী করে মোটা লাভ করতে লাগলাম। সে আমাকে লাভের আধাআধি বখরা দেয়। এইভাবে আমাদের কাজ-কারবার বেশ ভালোই চলছে। এখন আবার এসেছি মালপত্র কিনতে। কাল রাতে একটু মৌজ করে আস্তানায় ফিরছিলাম। পথের মধ্যে কুঁজোর মরা লাশটা নিয়ে ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, হুজুর।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

সাতাশতম রজনী।

শাহরাজাদ শুরু করে। শুনুন জাহাপনা ঃ সেই খ্রীষ্টান দালাল তার কাহিনী শেষ করে বললো, আমার বিশ্বাস, হুজুর, কুঁজোর এই মৃত্যুর জন্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের হাত নাই। নিয়তি লেখা ছিলো, তাই সে মারা গেছে।

সুলতান মাথা নেড়ে বলে, না না, ওসব ছেঁদো কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমি তোমাদের সবাইকে এক এক করে ফাঁসী দেবো। আমার দরবারের এমন মজার বয়স্যকে তোমরা হত্যা করেছো, তোমাদের কাউকে ছাড়বো না।

তখন সুলতানের বাবুর্চি এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, হুজুরের আজ্ঞা হলে আমার কাহিনী দরবারে পেশ করতে পারি।

সুলতান বললো, বেশ, বলো।

বাবুর্চি বললো, আমার কাহিনী ঐ খ্রীষ্টান দালালের কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি

চমৎকার। শুনে যদি জাঁহাপনার ভালো লাগে, এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তবে সকলের দোষ মাফ করে দেবার প্রার্থনা জানাচ্ছি।

সুলতান বললো, আচ্ছা—কি রকম মজার কাহিনী—তা আগে শোনাও দেখি।

বাবুর্চি তার কাহিনী শুরু করলো। শুনুন জাঁহাপনা ঃ

গত রাতে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে শাদীর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, অনেক গুণী-জ্ঞানী লোকের সমাগমে আসর জমজমাট। কোরান পাঠ শেষ হলে খানার টেবিল সাজানো হলো। নানারকম মাংসের হরেক রকম মুখোরোচক খানা, সব্জীর বিরিয়ানী হালওয়া ফল ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু একটা খানা ছিলো রসুনের বিরিয়ানী। যাকে আমরা বলি 'জিরবাজা'। রসুনের সঙ্গে নানারকম মশলাপাতি ও শাকসব্জী দিয়ে চালের তৈরী এই বিরিয়ানী বিয়ে শাদী উৎসবের এক বাহারী খানা। আমরা—অভ্যাগত নিমন্ত্রিতরা সবাই খুব তৃপ্তি করে খেতে লাগলাম। শুধু একজন বললো, আমাকে মাফ করবেন, আমি ঐ রসুনের 'জিরবাজা' খাবো না।

আমরা বার বার অনুরোধ করলাম, একটু খেয়ে দেখুন, অপূর্ব হয়েছে।

—আমি জানি, খেতে খুব ভালো হয়। কিন্তু আমি খাবো না, তার কারণ আছে। এই 'জিরবাজা' খাওয়ার জন্যে আমাকে একবার অনেক আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছে। না, আপনারা খান, আমি খাবো না!

আমরা আর তাকে খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, কী হয়েছিলো, কী কারণে তাকে আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছিলো।

যুবকটি বললো, আমি হলফ করেছি, 'জিরবাজা' কখনও খাবো না আমি। আর যদি কখনো খাই, তার আগে এবং পরে চল্লিশবার সোডা, চল্লিশবার পটাশ এবং চল্লিশবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

গৃহস্বামী হেসে বললো, এ আর এমন কি কথা, এই কে আছিস, সাহেবের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা কর।

সঙ্গে সঙ্গে নফর চাকররা জল, সোডা, সাবান ইত্যাদি নিয়ে এলো।

আমরা অবাক হলাম। প্রথমতঃ খুব ধীর মন্থর গতিতে খাচ্ছিলো সে, এতৎসত্ত্বেও, অন্যান্য সবই খেলো, কিন্তু ঐ রসুনের 'জিরবাজা'য় হাত দিলো না। অথচ আমরা বুঝলাম, খাওয়ার লোভটা ষোল আনা আছে।

আমরা অবাক হলাম। প্রথমতঃ খুব ধীর মন্থর গতিতে খাচ্ছিলো সে, আর দ্বিতীয়তঃ তার বুড়ো আঙুলটা কাটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হায় আল্লাহ, আপনার বুড়ো আঙুলটা কাটা কেন? না জন্মের থেকেই ঐ রকম? না কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিলো?

যুবকটি বললে, তা এক রকম দুর্ঘটনাই বলতে পারেন? তবে কোন রকম যন্ত্রে কেটে যায়নি।

বাঁহাতটা তুলে দেখালো। দেখলাম, সে হাতের বুড়ো আঙুলটাও একই ভাবে কাটা। এরপর পা দু'খানা দেখালো সে। কি আশ্চর্য, পায়ের বুড়ো আঙুল দু'টোও কাটা। এইসব দেখে তখন খানাপিনা আমাদের মাথায় উঠেছে। হাঁ করে চেয়ে আছি ওর দিকে? একজন জিজ্ঞাসা করলো, কী ব্যাপার? কী করে আপনার হাত পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো কাটা গেছে? আর কেনই বা খানা খেতে বসার আগে এতোবার করে হাত ধুলেন। জানতে ইচ্ছে করছে। যদি আপত্তি না থাকে, বলুন।

আমার বাবা খলিফা হারুন-অল রসিদের সময় বাগদাদের এক নামজাদা সওদাগর ছিলো। সুরারসিক হিসাবে বাবার খুব নাম ডাক। দুনিয়ার যেখানে যতো সেরা সরাব তৈরি হতো, বাবা আনাতেন, এবং ইয়ার দোস্ত নিয়ে মৌজ করতেন। গান-বাজনার শখ ছিলো খুব। দেশ বিদেশের নামকরা বাঈজীরা আসতো মুজরো করতে। বাবা এসব ব্যাপারে

দরাজদিলের মানুষ ছিলো। কিন্তু তার ফলে যা হয়, তার মৃত্যুর পর দেখলাম, পর্বত-প্রমাণ ঋণের বোঝা এসে চেপেছে আমার ঘাড়ে। বাবার শেষকৃত্য সমাধা হতে না হতেই দরজায় এসে দাঁড়ালো পাওনাদাররা। আমি তাদের প্রত্যেককে বললাম, পিতৃঋণ রাখবো না। যেমন করে হোক পরিশোধ করবোই। তবে ভাই, সময় দিতে হবে। তোমরা প্রতি সপ্তাহে আসবে। ব্যবসায় যা লাভ হবে, নিয়ে যেও।

কেনা বেচার ব্যবসা শুরু করলাম। প্রতি সপ্তাহে যা লাভ হয়, খরচ খরচা বাদ দিয়ে দেনা শোধ করি। এইভাবে একদিন সব দেনা শোধ করে দিলাম। এর পর থেকে যা লাভ হতে লাগলো তা দিয়ে মূলধন বাড়িয়ে কারবারটা আরও বড় করে ফেললাম।

একদিন আমার দোকানে বসে আছি, দেখলাম জমকালো সাজে সেজে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে একটা খচ্চরের পিঠে চেপে এসে দাঁড়ালো আমার দোকানের পাশে।



তার সামনে পিছনে দু'জন খোজা পাহারাদার। বাজারে ঢোকার জন্যে সে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। একজন খোজাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে ঢুকতে যাবে এমন সময় খোজাটা বললো, মালকিন, বাজারের এই পথটা দিয়ে ঢুকবেন না। জায়গাটা ভালো না। কিন্তু তার কথা কানে তুললো না সে। হন হন করে ভিতরে ঢুকে গেলো। একটার পর একটা দোকান ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলো। কিন্তু কারো দোকানই আমার দোকানের মতো তেমন সাজানো গোছানো নয়। শেষে আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। বললো, দামী দামী শাড়ি কি আছে, দেখান তো।

কি মিষ্টি কণ্ঠ। কি অপূর্ব চেহারা। চোখ ফেরানো যায় না। আমি শশব্যস্ত হয়ে দোকানের সেরা সেরা কাপড় দেখাতে থাকি। কিন্তু একটাও পছন্দ হলো না তার। বললো, আর কিছু নাই।

আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি পাশের দোকানগুলো খুলবে। ওদের যা আছে তাও এনে দেখাবো। যদি পছন্দ হয়, নেবেন।

অন্য দোকান না খোলা পর্যন্ত আমার দোকানেই বসে রইলো সে। স্বভাবতই দু'চারটে কথাবার্তাও হলো। মেয়েটি বেশ রসালো কথাবার্তা বলতে পারে।—তা মেয়েদের পোশাকের দোকান করেছেন, আর মেয়েরা কি পছন্দ করে কি চায় তা জানেন না?

আমি বিনীতভাবে বলি, জী আমার বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা কম, পুঁজিপাটা তেমন নাই—তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে তো মেলামেশা করিনি কখনও, কি করে জানবো তারা কি চায়।

চোখের বাণ ছুঁড়লো সে।—কেন, বিয়ে শাদী করেননি?

—জী না, তেমন সময় সুযোগ এখনও হয়ে ওঠেনি।

এই সময় পাশের দোকানগুলো খুলে গেলো। অনেক দামী দামী বাহারী শাড়ি এনে দেখালাম তাকে। তার থেকে বেছে বেছে খান কয়েক শাড়ি পছন্দ করলো সে। প্রায় পাঁচ হাজার দিরহাম দাম হবে। সে বললো, এগুলো বেঁধে দিন।

কাপড়গুলো বেঁধে তার খোজা নফরের হাতে দিতেই দোকান থেকে বেরিয়ে খচ্চরের পিঠে চেপে চলে গেলো সে। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। টাকার কথা বলতে পারলাম না। সেও দিলো না, বা বললো না, কবে দিয়ে যাবে। অথচ অন্য দোকানের মাল। তাদের বলে এলাম, এক সপ্তাহ বাদে টাকা দেবো।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। কিন্তু না এলো মেয়েটি, না পাঠালো দাম। অথচ

চেহারা-চরিত্র, বেশভূষা, আদব কায়দা দেখে মনে হয়েছিলো বড়ঘরের দুলালী। কিন্তু আমার টাকাটার কি হবে? ঠিকানাপত্রও কিছু জানি না যে গিয়ে তাগাদা করবো। পাশের দোকানদাররা টাকার তাগাদা করলো। আমি আর এক সপ্তাহের সময় নিলাম।

আমার জোর বরাত, পরের সপ্তাহের শেষ দিনে সে আবার এলো আমার দোকানে। আমার হাতে একটা সোনার অলঙ্কার তুলে দিয়ে বললো, স্যাকরার কাছে এটা বেচে আপনার দামটা নিয়ে নিন। আর আমাকে আরও কয়েকটা কাপড় দেখান।

সোনার জিনিসটা বেচে আমার কাপড়ের দাম হয়ে গেলো। টাকাটা দিয়ে পাশের দোকান থেকে আরও দামী দামী কতকগুলো কাপড় এনে দেখালাম তাকে। কতগুলো শাড়ি পছন্দ করলো। দশ হাজার দিরহাম দাম হলো। কিন্তু সেদিনও সে দাম দিয়ে গেলো না। বা কবে দিয়ে যাবে তাও বলে গেলো না। আমিও বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। দাম চাইতে পারলাম না। এতো ভারি মুসকিল হলো। গতবারে ছিলো পাঁচ হাজার এবারে বাকী বেড়ে হলো দশ হাজার। আর যদি না আসে? যদি না দিয়ে যায় দাম? তাহলে? তাহলে তো দেনার দায়ে আমার দোকান-পাট লাটে উঠবে!

রাতে শুয়ে ঘুম আসে না। যদি মেয়েটা আর না আসে? গল্প কাহিনী শুনেছি, ঠগদের কত বিচিত্রভাবে প্রতারণা করার কায়দা। মেয়েটা তার সুন্দর রূপ যৌবন আর বাদশাহী চালবোল দিয়ে আমার হাতে হারিকেন ধরিয়ে গেলো না তো?

এক এক করে চার সপ্তাহ কেটে গেলো। টাকার তাগাদায় অস্থির করে তুলেছে আমাকে। আর পারা যায় না। রূপের মোহে ভুলে একি করলাম আমি। এখন আমার দোকানের মাল জলের দামে বেচে দেনাশোধ করতে হবে। এবং সেই ভাবেই নিজেকে তৈরি করছি, এমন সময় মেয়েটি একদিন এলো। আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। একটা থলে আমার সামনে এনে রাখলো। বললো, দাড়ি-পাল্লা নিয়ে এসে ওজন করে দেখুন, কত আছে।

হিসেব-পত্র করে দেখলাম, যা দাম তারচেয়ে বেশ বেশী আছে। আমাকে বললো, ওটা আপনার কাছে রাখুন। খুশিতে ভরে গেলো মন। আহা, এই মেয়েটাকে আমি ঠগ জোচ্চোর ভেবেছিলাম! এমন সুন্দর রূপ যৌবন—এমন নবাবী চালচলন আর কখনও দেখিনি কোন মেয়ের। বুকের মধ্যে কি যেন অভাব বোধ করতে লাগলাম। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে শাদী করবেন না?

আমি বলি, তেমন ভাগ্য কি আর করে এসেছি।

—কেন, আপনার এমন সুন্দর চেহারা—মেয়েরা দেখে তো পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনি ছাড়া কোন মেয়েই তো এমন আপন করে কথাবার্তা বলে নি কখনও!

মেয়েটি মুখ টিপে হাসলো। আমার বুকে আগুন ধরে গেলো। ওর রূপের এক দারুণ আকর্ষণ আমাকে টানতে লাগলো। নিজেকে আর বুঝি ধরে রাখতে পারি না।

দোকান ছেড়ে উঠে বাইরে এলাম। মেয়েটি বসে রইলো। ওর খোজা নফরটাকে আড়ালে ডেকে এনে এক-মুঠো দিনার গুঁজে দিলাম ওর হাতে। বললাম, তোমার মালকিনকে আমার খুব ভালো লেগেছে। ভালোবেসে ফেলেছি। এখন তোমাকে আমার হয়ে তার কাছে মহব্বৎ জানাতে হবে।

সে খুব হাসলো। বললো, আমাদের মালকিন আপনার প্রেমে মশগুল হয়ে পড়েছে। আপনাকে দেখার জন্যে, আপনার সঙ্গে দু'টো কথা বলার জন্যেই শুধু সে আসে আপনার কাছে। এতো যে শাড়ি কাপড় কেনা, সে সবই অছিলা। যা শাড়ি গহনা আছে তার,

রোজ একখানা করে পরলে, সারা জাবনে একবারের বেশী দু'বার পরতে হবে না কোন শাড়ি। শুধু আপনাকে দেখতেই সে আসে এখানে।

আমি যখন খোজাটার সঙ্গে কথা বলছিলাম, মেয়েটি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে গেলো একবার। একটু পরে যখন আবার দোকানে এলাম মেয়েটি হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী শলাপরামর্শ হলো?

—শলাপরামর্শ কিছু না। আপনার নফরটাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কোথায় থাকেন আপনারা?

—তার জন্যে অতোগুলো পয়সা দিতে হলো?

খোজাটাকে যে বকশিস দিয়েছি, তাও ওর চোখ এড়ায়নি। আমি বললাম, ও কিছু না। ওকে একটু খুশি রাখার জন্যে দিলাম। আপনি আমার এতো বড় খদ্দের। সে যাতে অন্য দোকানের পয়সা খেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে না যায়।

মেয়েটি এবার ভুরু কুঁচকে হাসলো।—কেন, আমি চলে গেলে আপনার খুব ক্ষতি হবে নাকি?

—ক্ষতি না হোক, লাভতো কিছু হবে না। লাভ করার জন্যেই তো দোকান সাজিয়ে বসা।

মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়ালো।—অনেক দেরি হয়ে গেছে, আজ চলি। পরে আর একদিন আসবো।

আমি বললাম, একটা কথা বলবো বলবো করেও বলার সাহস হয়নি। আপনার খোজাকে বলেছি। আমার হয়ে সে আপনাকে বলবে। আপনি যেন তার কোন অপরাধ নেবেন না।

—ঠিক আছে। কিন্তু এমন কি কথা যা সামনাসামনি বলতে পারলেন না?

মেয়েটি আর জবাবের জন্যে দাঁড়ালো না।খচ্চরের পিঠে চেপে চলে গেলো।

রোজই ভাবি, সে অথবা তার নফর আসবে। কিন্তু কেউ এলো না। কি জানি কি হলো অহরহ তার কথাই ভাবি। রাতে শুয়ে ঘুম হয় না। কিছু খেতে ভালো লাগে না। কাজ কামে মন বসতে চায় না।

আরও কয়েক দিন পরে খোজাটা এসে খবর দিলো, তার মালকিন অসুস্থ। আমি জানতে চাইলাম, কিন্তু তোমার এই মালকিনটি কে?

—খলিফা হারুন-অল-রসিদের পেয়ারের বেগম জুবেদার পালিত কন্যা সে। বেগমসাহেবা তাকে দত্তক নিয়ে মানুষ করেছে। বড়, আদরের দুলালী। তার কোন আদর আব্দারই এড়াতে পারে না। কিছুদিন আগে সে তার মাকে বলেছিলো, 'মা, এইভাবে একা-একা ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে আর ভালো লাগছে না, তুমি যদি মত করো তবে খোজাদের নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়ে আসতে পারি।' বেগমসাহেবা মেয়ের কথা ঠেলতে পারেনি। প্রথম দিন বাজারে এসে আপনার কাছ থেকে পোশাক আশাক কেনাকাটা করে নিয়ে গেলো। মা মেয়ের পছন্দসই সওদা দেখে খুব খুশি হলো। তারপর থেকে বাইরে বেরুনোর আর কোন বাধা রইলো না। কয়েকদিন আগে শাহজাদী বেগমসাহেবাকে তার মনের ইচ্ছার কথা বলেছে। আপনাকে দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছে জেনে বেগমসাহেবা বলেছে, আমি নিজে ছেলেকে দেখবো আগে—আমার যদি পছন্দ হয় তবেই শাদী দিয়ে দেবো। এখন সাহেব, আপনি বলুন, বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে চান কিনা?

আমি বললাম, আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। এখন বলো, কিভাবে, কবে, কোথায় তার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

খোজা বললো, আজ সন্ধ্যায় আপনি টাইগ্রীসের ধারে বেগম জুবেদা সাহেবার যে

বড় মসজিদ—ওখানে নামাজ পড়তে যাবেন। নামাজ শেষ করে ওখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। তারপর যা করার আমি করবো।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম, ঠিক আছে।

খোজা বিদায় জানিয়ে চলে গেলো।

সন্ধ্যাবেলায় টাইগ্রীসের উপকূলের সেই মসজিদে গেলাম নামাজ পড়তে। নামাজ শেষ করে রাতের মতো ওখানেই শুয়ে পড়লাম। ভোর হতে দেখি একটা ছোট্ট পানসি নৌকা এসে ভিড়লো মসজিদের ঘাটে। বাক্স আর খোজা ক্রীতদাসে ভর্তি।নৌকা থেকে কয়েকটা বাক্স নামানো হলো ঘাটে। ক্রীতদাসেরা সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলো মসজিদের এক পাশে। একটু পরে দেখলাম, আমার পরিচিত সেই খোজা এবং তার পাশে আমার মানসী সেই শাহজাদী। আমার পাশে বসলো। তার ফন্দী মতলব সব বুঝিয়ে বললো আমাকে। তারপর আদর করলো অনেক। অনেকক্ষণ ধরে। পরে বললো, এবার তোমাকে বাক্সে পুরে তালা বন্ধ করে নিয়ে যাবো।

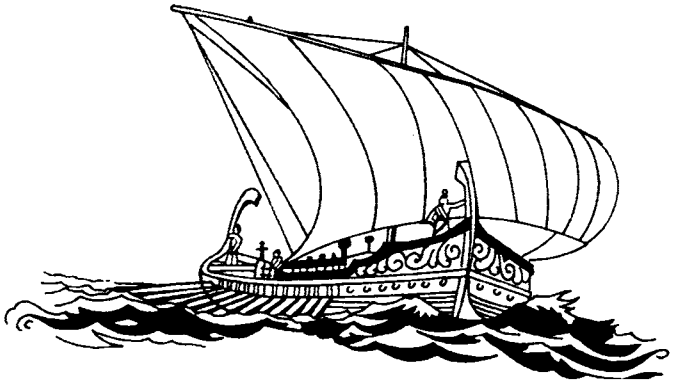

আমি বাক্সের ভিতরে গিয়ে বসলাম। আমাকে তালা বন্ধ করে নৌকায় নিয়ে গিয়ে তুললো খোজা। আবার যখন বাক্স খুলে বার করা হলো, দেখলাম, আমি এসে পড়েছি প্রাসাদের হারেমে। দামী পোশাক আশাক এনে দিলো সেই খোজা। নতুন সাজে সাজলাম। একটা সোফায় বসানো হলো আমাকে। এমন সময় ঘন্টা বেজে উঠলো। দেখলাম, হারেমের কুড়িজন ক্রীতদাসী দু'টি সারিতে ভাগ হয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে পড়লো। সবারই বয়স কুড়ির কাছাকাছি। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। ক্ষীণ কটি উন্নত বক্ষা।

দুই সারি ক্রীতদাসীদের মাঝখান দিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো বেগম জুবেদা। চোখ ঝলসানো সাজপোশাক-এ সজ্জিতা। রত্নালঙ্কারের ভারে নুয়ে পড়েছে তার দেহ।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার কাছে এসে ইশারায় বসতে বললো আমাকে। তারপর আমার নাম, ধাম, বংশগোত্র, পেশা সব এক এক করে জেনে নিলো। আমার জবাবে খুশি হলো সে। বললো, তাহলে আর সময় নষ্ট করে লাভ নাই। দশ দিনের মধ্যে শাদীর সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলবো।

তারপর আমার দিকে চেয়ে জুবেদা বললো, শোনো, সাহেব, মেয়ে আবার বড় আদরের দুলালী। তোমার সঙ্গে তার শাদী দেবো। কিন্তু একটা কথা, তাকে কোন কষ্ট দিও না। সে আমি সহ্য করতে পারবো না। দশ দিন পরে তোমাদের শাদী হবে। এই দশ দিন তুমি এই প্রাসাদেই থাকবে।

দশ দিন ধরে প্রাসাদের এক মনোরম কক্ষে আরামেই কাটালাম। এর মধ্যে আমার

মানসীর সঙ্গে দেখা হলো না একবারও। কিন্তু পরিচারিকারা আমার দেখাশুনা করতো। তাদের মারফতে সব খবরাখবর পেতে থাকলাম।

জুবেদা খলিফার সম্মতি পেলো। তিনি যৌতুক হিসাবে দশ হাজার সোনার মোহর পাঠালেন আমাকে। জুবেদা দিলো পঞ্চাশ হাজার দিনার। কাজী এবং সাক্ষী এলো। শাদীর কবুলনামা লেখা হলো। সারা প্রাসাদ আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। শাহজাদীর সঙ্গে শাদী হয়ে গেলো আমার।

উজির আমির ওমরাহরা সবাই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলো সেদিন। প্রকাণ্ড সামিয়ানায় খানাপিনার সে কি বিরাট আয়োজন। এরে আগে কখনও চোখে দেখিনি। কত সব সুন্দর সুন্দর খাবার, বিরিয়ানী, মাংস, চাঁপ, হালওয়া, ফল, মিষ্টি, সরবৎ—এলাহী ব্যাপার। আমিও ওদের পাশে বসে খেলাম। নানারকম খানার মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় জিরবাজা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। খেলাম খুব তৃপ্তি করে। বোধ হয় লোভে লোভে বেশ কিছুটা বেশীই খেয়ে ফেলেছিলাম। খানাপিনা শেষ করে রুমালেই হাতটা পুছে ফেললাম। এতো খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো যে, উঠে গিয়ে হাত মুখ ধোয়ার কষ্টটা আর স্বীকার করতে মন চাইলো না তখন।

রাত্রি গভীর হতে থাকে। উৎসবের আসর তখন জমজমাট। হাজার খানেক মোমবাতি জ্বালানো হলো। আমাকে ঘিরে শুরু হলো নাচ গান। সাতবার সাতরকম জমকালো সাজে সেজে এসে পাত্রী প্রদক্ষিণ করলো শাদীর বাসর। উপস্থিত অভ্যাগতরা সোনার মোহর দিতে লাগলো থালায়। সারা বাসরকক্ষ তখন পরিপূর্ণ। শাদীর অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হলো এক সময়। গুলাব জলের পিচকারী করা হলো সবাইকে। এবার এক এক করে বিদায় নেবার পালা। আসর ফাঁকা হয়ে আসে। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের কামরায়। মনোহর করে বাসর শয্যা রচনা করা হয়েছে। এইখানে আমাদের মধু যামিনী হবে। পরিচারিকারা পাত্রীকে নিয়ে এলো। শাদীর প্রথামত বিবস্ত্রা করা হলো তাকে। তারপর আমার পাশে পালঙ্কে শুইয়ে রেখে চলে গেলো তারা।

দেখলাম, সবাই চলে গেছে—শুধু আমি আর সে শুয়ে আছি পাশাপাশি। গভীর আলিঙ্গনে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো।—তুমি রসুন খেয়েছো। ওঃ কি বিশ্রী গন্ধ! বাবা, মরে গেলাম।

আর্তনাদ করে উঠলো সে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কামরা থেকে ছুটে এলো দাসীরা।—কি হলো, শাহজাদী?

শাহজাদী তখন হাত পা ছুঁড়ছে, এই অসভ্য জংলী জানোয়ারটা রসুন খেয়েছে। কি বিশ্রী গন্ধ, আমার বমি আসছে। আমি কি আগে জানতাম, লোকটা এমন একটা বনমানুষ! তোরা আমাকে এই গাধার বাচ্চার হাত থেকে বাঁচা। ওর কাছে থাকলে আমি নির্ঘাত মরে যাবো। হায় আল্লা আমার একি হলো, এমন শয়তান বদমাইস একটা জানোয়ারকে শাদী করলাম আমি।

শাহজাদী ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমি কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আমাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলো, চুপ করো, তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। কেন তুমি রসুন খেয়েছো? কেন ভালো করে হাত সাফা করোনি? তুমি কি ভেবেছো, এর পরেও তোমার কোলে শোব আমি?

রাগে গর গর করতে করতে ঘরের এক পাশ থেকে একখানা বেতের চাবুক এনে সপাং সপাং করে এলোপাথাড়ী পেটাতে লাগলো আমাকে। যন্ত্রণায় ছটফট করে পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। চাবুকের একটা বাড়ি এসে লাগলো আমার দুই জঙ্ঘার মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গালিচার উপর লুটিয়ে পড়ে গেলাম।

অনেকবাদে জ্ঞান হলো আমার। চোখ খুলে দেখলাম, শাহজাদী তখন চাবুক হাতে পালঙ্কে বসে রয়েছে। একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি। চারপাশে ক্রীতদাসীরা ঘিরে আছে আমাকে। শাহজাদী হুকুম করলো, ওকে নিয়ে যাও। কোটালের হাতে তুলে দিয়ে বলো, লোকটা রসুন খেয়ে

হাত সাফা করেনি। আমার নাকে গন্ধ লেগেছে। কোটাল যেন ওর হাতখানা—যে হাত দিয়ে ও 'জিরবাজা' খেয়েছিলো—কেটে ফেলে।

শাহজাদীর রায় শুনে তখন আমার বুকে কাঁপুনি ধরে গেলো। শাহজাদীর সহচরীরা আমার ওপর দয়াপরবশ হয়েই বোধহয়, অনুরোধ জানাতে লাগলো, এবারের মতো ওঁকে মাফ করে দিন। এবার তো প্রথমবার। পরে আবার যদি কখনও এমন হয়, তখন যা খুশি সাজা দেবেন।

আমার তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। এতো লঘু দোষে এমন গুরু দণ্ড? 'জিরবাজা' খেয়ে হাত না ধোয়ার জন্যে এই সাজা?

শাহজাদী বললো, ঠিক আছে, তোমরা যখন বলছো এবারের মতো ওর হাতখানা না হয় কাটবো না। কিন্তু তা বলে বেকসুর ছেড়ে দিতে পারবো না। এমন একটা চিহ্ন করে দেবো যার ভয়ে, বাছাধন আর জীবনে 'জিরবাজা' খেতে চাইবে না।

এই বলে সহচরী দাসীদের সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে। শাদীর প্রথম রাতে, বাসর শয্যায় আমি পড়ে রইলাম একা।

দশদিন পরে ফিরে এলো আমার কাছে। সঙ্গে সহচরী ও দাসীবৃন্দ। তর্জনী নাচিয়ে নাচিয়ে বলতে লাগলো, কি, কেমন? আর 'জিরবাজা' খাবে কখনও? দাঁড়াও, আজ তোমাকে এমন শিক্ষা দেবো যাতে আর রসুনে কখনও হাত না ঠেকাও।

তারপর ইশারা করতেই ক্রীতদাসীরা আমাকে জাপটে ধরে জোর করে গালিচার উপর শুইয়ে ফেললো। শাহজাদী হুকুম করলো, রসি দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলো ওর।

আমার হাত পা বাঁধা হলো। একজন একখানা চকচকে ধারালো ছুরি দিয়ে আমার হাতের আর পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো কেটে ফেললো। তাই আপনারা আজ আমাকে এইরকম দেখছেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। সে আমার ক্ষতস্থানে রক্ত বন্ধ করার ঔষুধপত্র লাগিয়ে বেঁধে দিয়েছিলো। যখন জ্ঞান ফিরে এলো আমি চিৎকার করে উঠলাম, আল্লাহ সাক্ষী আর কখনও 'জিরবাজা' খাবো না। আর যদি কখনও খাই, খাওয়ার আগে এবং পরে চল্লিশবার সোডা, চল্লিশবার পটাশ আর চল্লিশবার সাবান দিয়ে হাত সাফ করবো।



সুতরাং বন্ধুগণ, আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না। আপনারা যখন আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন, আমি তখন খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ আমি তার কাছে হলফ করেছি। যদিও আজ সে বেঁচে নাই, তবু আল্লাহর নামে কসম খেয়েছি—আমি ও জিনিস আর মুখে তুলবো না। এই 'জিরবাজার' জন্যে আমার বুড়ো আঙ্গুলগুলো হারিয়েছি একদিন।

বাবুর্চি বলতে থাকে, শুনুন জাঁহাপনা, এরপর সেই বাগদাদের তরুণ সওদাগরকে প্রশ্ন করলাম, এর পর আপনার বিবির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কিরকম রইলো?

যুবকটি বললে, আমি যখন আল্লাহর নামে দিব্যি করলাম, আর কখনও 'জিরবাজা' খাবো না, তখন সে বেশ নরম হলো। আমাকে ক্ষমার চোখে মেনে নিলো। এর পর আমরা একসঙ্গে সহবাস করেছি অনেক দিন-রজনী।

এইভাবে প্রাসাদ পরিবেশে কাটলো বহুদিন। শাহজাদী—আমার বিবি বললো, এখানে তো অনেকদিন কাটালে। ঘরজামাই হয়ে থাকবে নাকি চিরকাল? তার চেয়ে বাইরে কোথাও একটা ইমারৎ কিনে নাও। আমি টাকা দিচ্ছি।

পঞ্চাশ হাজার সোনার মোহর দিয়ে একটা বিরাট বাড়ি কিনলাম। শাহজাদীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামানপত্র এবং তার যাবতীয় বিষয়সম্পদ নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। সুচারু সুন্দর করে সাজালাম সারা বাড়িটা। কিন্তু এত সুখ আমার কপালে সইলো না। বছর না ঘুরতেই সে মারা গেলো। শোকে দুঃখে ভেঙে পড়লাম। উদাসী মন বিবাগী হলো। বাড়ি ঘরদোর, বিষয় সম্পত্তি সব বেচে দিয়ে একদিন পথে বেরিয়ে পড়লাম। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। কোথাও মন টিকে না। অবশেষে সুদূর পরবাসে আপনাদের এই দেশে এসে বাসা বেঁধেছি। আল্লাহ জানেন, এখানেই বা কতদিন থাকবো।

জাঁহাপনা, বাবুর্চি বললো, এই হলো সেই বাগদাদের তরুণ সওদাগরের কাহিনী। এর পর সেই নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবাই যে যার ঘরের দিকে চললাম। আমি ফিরে গেলাম আমার বাড়ি। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর পার হয়ে গেছে। তারপর এই কুঁজোটার মরা লাশ নিয়ে যা যা কাণ্ড ঘটে গেছে সে তো আপনার সবই জানা।

চীনের বাদশাহ গম্ভীর মুখে বললো, হুম্, তোমার গল্প কিন্তু এমন কিছু আহা মরি নয় হে, বাপু। এর চেয়ে এই কুঁজোর মরার ব্যাপারটা আরও অনেক বেশী অদ্ভুত। তোমাদের দু'জনের কারো কাহিনীই আমাকে অবাক করতে পারেনি। কিন্তু কুঁজোর মরার ঘটনা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেছি! সুতরাং তোমাদের কারো নিষ্কৃতি নাই। সবাইকে ফাঁসীতে ঝুলাবো।

এই সময়ে সেই ইহুদী হেকিম এগিয়ে এলো। বাদশাহকে কুর্নিশ করে বললো, শাহেনশাহ, আমার কাহিনীটা মেহেরবানী করে শুনুন। আমার বিশ্বাস, ওদের চেয়ে হাজার গুণ ভালো লাগবে আপনার। এমন কি, কুঁজোর মরার ঘটনার চাইতেও বেশী অবাক হবেন আপনি।

বাদশাহ বললো, ঠিক আছে, যদিও আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি, তবু শোনাও দেখি।

ইহুদী হেকিম তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

আমার তরুণ বয়সে এই অদ্ভুত কাহিনীটা শুনেছিলাম। তখন আমি দামাসকাসে থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে গবেষণা করি। তার আগে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমি পাশ করেছি।

একদিন ওখানকার সুবাদার সাহেবের পেয়াদা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো। একটা বিশাল প্রাসাদ। তার মাঝখানের প্রশস্ত কক্ষে দামী পালঙ্কে শুয়েছিলো এক যুবক। অসুস্থ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

কোনো কথা বললো না সে। শুধু চোখের ইশারায় কি যেন বলতে চাইলো। আমি বললাম, হাত দেখি—

বাঁ হাতটা বের করে আমার সামনে তুলে ধরলো। আমি একটু অবাক হলাম, কিছুটা বা অপমানিতও। এমন সুন্দর শিক্ষিত এক তরুণ, সাধারণ সভ্য আদব-কায়দাও জানে না? যাই হোক মনে মনে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না। বাঁ হাতের নাড়ি দেখে ঔষুধ লিখে দিলাম। পরদিন আবার আমাকে যেতে হলো। তারপর দিনও। এই ভাবে দশ দিন ধরে তার চিকিৎসা করে মোটামুটি সারিয়ে তুললাম। সুবাদার সাহেব আমার ওপর খুশি হয়ে অনেক ইনাম দিলেন। এবং দামাসকাসের সদর হাসপাতালের বড় হেকিমের পদে সসম্মানে বহাল করলেন আমাকে। আমি তাদের গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত হলাম। তাই রোজই তাকে দেখতে যাই। কিন্তু আমার মনে একটা খট্‌কা রয়ে গেলো, কেন সে রোজই বাঁহাত বাড়িয়ে দেয়। দশ দিন পরে ওকে দরজা জানলা বন্ধ করে গরম জলে গা পুছিয়ে দিতে লাগলাম। কিন্তু এই কাজটা করা বেশ শক্ত। ঐ সময় কোন রকমে বাইরের হাওয়া গায়ে লাগলে বা গা মোছাবার সময় জলকণা গায়ে লেগে থাকলে উপকারের বদলে উল্টে অপকারের সম্ভাবনা বেশী। সুবাদার সাহেব বললো,

আমি যেন নিজে সব ব্যাপারটা তদারক করি। সুতরাং নফরচাকররা তাকে যখন হামামে নিয়ে গেলো, আমাকেও সঙ্গে যেতে হলো। প্রথমে তার সমস্ত জামা কাপড় খুলে ফেলা হলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ওর ডানহাতটা নেই—কাটা। তার সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ। যুবক বললো, আপনি অবাক হচ্ছেন? তা হবারই কথা। কিন্তু এমনটা আমার জন্ম থেকে ছিলো না। কি করে হলো সে কাহিনী পরে বলছি। হামাম থেকে বেরিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম নিচের বড় ঘরটায়। ওখানে সাজানো হয়েছিলো আমাদের সন্ধ্যাবেলার খানাপিনা।

যুবক বললো, চলুন আমরা ওপরের ঘরে গিয়ে বসি। আরও নিরিবিলি। কী, আপত্তি নাই তো?

আমি বললাম, না না, আপত্তি কিসের?

তখন সে বাবুর্চিকে বললো, একটা ভেড়ার কাবাব করে, ওপরে পাঠিয়ে দাও। আমরা আজ রাতের খানা ওপরেই খাবো।

একটু পরে খানসামা এসে খাবার সাজিয়ে দিলো। আমরা খেতে খেতে নানারকম টুকিটাকি খুচরো আলাপ সারলাম। তারপর আমি বললাম, এবার আপনার কাহিনী শোনান।

তখন যুবক তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

আমার জন্ম মসুল শহরে। খানদানী পরিবার হিসাবে আমাদের খুব নাম-ডাক ছিলো সেখানে। আমার ঠাকুরদার দশ ছেলে। তার মধ্যে আমার বাবাই সব চেয়ে বড়। তার জীবদ্দশাতেই দশ ছেলের বিয়ে-শাদী দিয়ে গিয়েছিলো সে। কিন্তু একমাত্র আমার বাবা ছাড়া, অন্য কাকাদের কোন সন্তানাদি ছিলো না। সেই কারণে, আমার কাকারা আমাকে দারুণ ভালোবাসতো। কোন সময়ই চোখের আড়াল করতে চাইতো না।

এক জুম্মাবারে আমি গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে মসুলের বড় মসজিদে নামাজ পড়তে। নামাজ পর্ব শেষ হলে সবাই চলে গেলো, কিন্তু আমার বাবা আর কাকারা রয়ে গেলো সেখানে। একটা বিরাট কম্বল পেতে বসে ওরা সবাই নানা কথাবার্তা বলতে লাগলো। কাকারা বললো, আমরা ঠিক করেছি বাণিজ্য করতে বেরুবো। অনেক জায়গার কথা উঠলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, মিশরে যাবো। মিশরের প্রধান শহর কাইরো নীল নদের তীরে। নীলের অনেক মনোরম দৃশ্যশোভার গুণকীর্তন করলো ওরা। যারা বহুদেশ ঘুরেছে। তাদের মতে নাকি মিশরের মতো সুন্দর দেশ সারা দুনিয়ায় নাই। মিশরের জল হাওয়া খুব ভালো। ওখানকার প্রকৃতির শোভা নীলনদের ধারে ফুলের সমারোহ মানুষকে সকল শোকসন্তাপ ভুলিয়ে অন্য জগতে নিয়ে যেতে পারে।

বাড়িতে ফিরে ভাবতে লাগলাম, এমন সুন্দর দেশ যদি না-ই দেখলাম, এ জীবন বৃথা। কাকারা যাবে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যাবো না—আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল্যে। দিন কয়েকের মধ্যেই কাকাদের যাবার আয়োজন শেষ হয়ে এলো। আমি বাবার কাছে গিয়ে বায়না ধরলাম। কাকাদের সঙ্গে কাইরো যাবো। বাবা প্রথমে রাজি হলো না, অত দূর-দেশ, কী জানি কী হয়। কিন্তু আমার চোখে জল দেখে আর না করতে পারলো না। বললো, যাও, কিন্তু অত দূরে না গিয়ে দামাসকাস অবধি গিয়ে বেড়িয়ে এসো।

কাকারা বললো, তাই হবে। শেষে একদিন মসুল ছেড়ে দামাসকাসের পথে রওনা হলাম আমরা। প্রথমে এলাম আলেপ্পো শহরে। সেখানে দু-এক দিন কাটাবার পর এসে পৌঁছলাম এই দামাসকাস শহরে। দামাসকাস আমাকে মুগ্ধ করলো। সারা শহরটা গাছপালা বাগ-বাগিচায় ভরা। আর কাছেই স্রোতস্বিনী নদী। আমি একটা সরাইখানায় উঠলাম। শহর থেকে একটু দূরে। আর কাকারা শহরের ভিতরে ঢুকে গেলো। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বাণিজ্য। আর আমার ইচ্ছা প্রাণ ভরে দেখবো শুধু প্রকৃতির শোভা।

কাকারা বাণিজ্য সারলো। মসুল থেকে যা যা এনেছিলো তার কিছুটা বিক্রী করলো দামাসকাসে। আর দামাসকাসের কিছু বাহারী জিনিস কিনে নিলো কাইরোর বাজারে বেচার জন্যে। আমি ওদের বললাম, জানি না কাইরো হয়তো আরও সুন্দর, আরও ভালো, কিন্তু কাকা, দামাসকাসের শোভা আমার বড় ভালো লেগেছে। এখানকার তরুলতা, এই নদী, এই আকাশ বাতাস ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। তোমরা যাও। আমার যদি ভালো না লাগে পরে যাবো তোমাদের কাছে।

কাকারা, বললো, তাহলে তোর সওদাপত্র যা আছে তার দাম নিয়ে নে। আমার যতগুলো সওদা ছিলো প্রতিটির জন্যে পাঁচ দিরহাম লাভ সুদ্ধ সব টাকা দিয়ে গেলো তারা।

নদীর ধারে মাসে দু'দিনারে একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া করলাম আমি। আগাগোড়া বাড়িটা শ্বেতপাথরে তৈরি। সামনে ফুলের বাগিচা। জলের ফোয়ারা। এক কথায় অপূর্ব। মাত্র দু-দিনারে এমন বাড়ি ভাবা যায় না। খুশিতে মন ভরে গেলো। মনের আনন্দে মদ মাংস খাই, আর প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গান গাই।

একদিন বাইরের রোয়াকে একটা আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত হয়ে সরাবে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছি, আর নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা চেয়ে চেয়ে দেখছি। এমন সময় এক সুন্দরী যুবতী সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালাম তাকে। ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। বোরখাটা খুলে এক পাশে রাখলো। তার রূপের জেল্লায় চোখ আমার ঝলসে গেলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠলো সে।

—সাহেবের বিবি কোথায়? তাকে দেখছি না তো?

—এখনও বিয়ে শাদী করিনি।

—ওমা সে কি? এই জোয়ান বয়স। মেয়েমানুষ ছাড়া রাত কাটাও কি করে গো?

—তা আর কি করবো? শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনি।

মেয়েটি চোখের বান ছুঁড়ে বলে, আহা, তোমার মতো নাগর পেলে সব মেয়েই বর্তে যাবে।

আমি বসেছিলাম খাটে। চেয়ার ছেড়ে আমার পাশে এসে বসলো সে। একেবারে গা ঘেঁসে। কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। একেবারে অচেনা অজানা এক সুন্দরী যুবতী। একটু সরে বসার চেষ্টা করি। কিন্তু মেয়েটি আমার হাত চেপে ধরে। আহা ঢং দেখে বাঁচি না, পেটে খিদে মুখে লাজ!

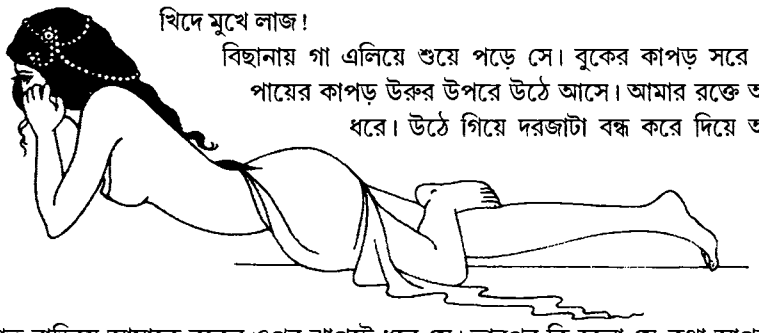

বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে সে। বুকের কাপড় সরে যায়। পায়ের কাপড় উরুর উপরে উঠে আসে। আমার রক্তে আগুন ধরে। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকের ওপর ঝাপটে ধরে সে। তারপর কি হলো সে-কথা আপনাকে বলতে পারবো না।

আমি বললাম, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তার পর কী হলো, বলো।

যুবক বলতে থাকে, আমি তার রূপের সমুদ্রে ডুবে গেলাম। অনেকক্ষণ পরে বিছানা

ছেড়ে উঠলাম আমরা। হামামে ঢুকে ভালো করে স্নান করলাম দু'জনে। তারপর টেবিলে কাপড় পেতে খানা সাজালাম। মাংসের কাবাব, কোপ্তা, মোরগ মসাল্লাম, তন্দুরী, মিষ্টি, ফল আর দামী সরাব।

অনেকক্ষণ ধরে পুরো এক বোতল সরাব দু'জনে মিলে খেলাম। নেশা বেশ জমে উঠলো। খানাপিনা শেষ করে খাটে এসে শুয়ে পড়লাম আমরা। সে রাতের স্মৃতি আমি ভুলবো না কোনও দিন। সেই আমার জীবনের প্রথম সহবাস-রাত্রি। বেহেস্তে কি সুখ আছে জানি না, কিন্তু সে-রাতে যে সুখের স্বাদ পেয়েছিলাম তা আর কোনও দিন পেলাম না।

সকালে ও যখন বিদায় নেবে, দশটা সোনার মোহর দিতে গেলাম তাকে। দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে সে বললো, টাকা? টাকা নিয়ে আমি কি করবো? ও সব তুচ্ছ জিনিসে আমার প্রয়োজন নাই। আমি চাই—তোমাকে।

—আমি তো তোমারই গোলাম হয়ে গেছি, বিবিজান।

—আহা, গোলাম হতে যাবে কেন, তুমি আমার দিল্‌কা কলিজা।

তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গভীর আশ্লেষে চুম্বন করলো আমাকে। বললো, আজ চলি, সাহেব। তিনদিন বাদে আবার আসবো। সে দিনের যা খরচ—সব কিন্তু আমার। কী, রাজি?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, ঠিক আছে, তাই হবে।

—তা হলে, সোনা, এই টাকাটা রাখো। গতকাল যেমন খানাপিনার ব্যবস্থা করেছিলে, তেমনি ব্যবস্থা করে রেখো। আমি চারদিনের দিন বিকেলে আসবো।

দশটা সোনার মোহর বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। আমি অবাক হলাম। মোহরগুলো নিলাম হাত পেতে।

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আমার নিচের ঠোঁটে একটা ঠোনা মেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলাম তার চলে যাওয়া। বুকের মধ্যে কেমন হু হু করে উঠলো। মনে হতে লাগলো, ও বুঝি আমার কলিজাটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলো।

ঠিক চারদিনের দিন বিকেল বেলায় আবার এলো সে। ঘরে ঢুকেই বোরখাটা খুলে ছুঁড়ে দিলো। সেদিন আরও জমকালো সাজে সেজে এসেছে। সোনার জরিতে কাজ করা স্বচ্ছ মসলিন পরেছে। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ প্রতিটি খাঁজ একেবারে স্পষ্ট পরিষ্কার চোখে পড়ছে। তার ঐ মোহিনী রূপের আগুনে আমার পৌরুষ—আমার যৌবন ঝলসে গেলো। নিজেক আর ধরে রাখতে পারলাম না। দু'হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরলাম ওকে। একটা চুমু খেয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলাম।

টেবিলে খানাপিনা সব সাজিয়েই রেখেছিলাম। গতদিন যা যা খেয়েছিলাম সেদিনও ঠিক তাই-ই ছিলো। দু'জনে মিলে মৌজ করলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর নেশা যখন বেশ জমে উঠেছে—খানাপিনা সেরে শুয়ে পড়লাম। আর একটা সুখ-সম্ভোগের রাত্রি কেটে গেলো আমার। আমার জীবনের দ্বিতীয় সহবাসরজনী। পরদিন সকালে, আবার চলে গেলো সে। সেদিনও বলে গেলো, চারদিনের দিন আবার সে আসবে।

এবং এলো তাই। খানাপিনা সাজিয়ে বসে আছি। সূর্য ডোবার একটু আগে এসে হাজির হলো সে। আরও জমকালো সাজ। আবার মৌজ করে খানাপিনা সারলাম। সারারাত বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকলাম। মোমবাতি জ্বলে জ্বলে গলে গলে এক সময় ফুরিয়ে গেলো। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে যাবার আগে আমাকে একটা প্রশ্ন করলো সে—আচ্ছা প্রিয়তম, সত্যি করে বলো তো, আমাকে তোমার কেমন লাগলো—এই তিন দিনে?

আমি অবাক হই? দুম্ করে এ ধরনের এক প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলাম না।—কেন, একথা জিজ্ঞেস করছো কেন, বিবি জান? তোমাকে পেয়ে আমি বেহেস্তের চাঁদ হাতে পেয়েছি। আমার জীবন সুধা পাত্রে ভরিয়ে দিয়েছো তুমি। তোমাকে ছাড়া আমি আর বাঁচতে পারবো না, সোনা।



সে বললো, আমি কি সত্যিই দেখতে খুব সুন্দর। তুমি কি আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে 'ভালোবাসা' করছো?

—তোমার চেয়ে সুন্দরী কে আছে জানি না, কিন্তু আমার চোখে তোমার চেয়ে রূপবতী নারী আমি আর কখনও দেখিনি।

—দেখোনি তো? ঠিক আছে, পরের দিন দেখাবো। আর একটা মেয়েকে নিয়ে আসবো সেদিন। সে, দেখবে, আমার চেয়ে আরও সুন্দরী। দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না।

আমি বললাম, হতে পারে। কিন্তু তাতে আমার কী? আমি কেন তার রূপে পাগল হতে যাবো?

—দেখা যাবে।

এই বলে সে কুড়িটা মোহর আমার হাতে গুঁজে দিলো।—এটা রাখো। চারদিনের দিন বিকেলে আসবো আমরা। ঐ মেয়েটাকে সঙ্গে করে আনবো। সরাব আর খানা একটু বেশি করে ব্যবস্থা রেখো। তিনজনে মৌজ করে খাবো। খুব হাসি মজাক, হৈ হল্লা করে সারারাত কাটাবো আমরা।

আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই হবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, দেখো, নতুন মানুষের খাতির যত্নে যেন ত্রুটি না হয়।

আমি বললাম, আগে আসুক, তারপর দেখে নিও, কী রকম অভ্যর্থনা করি।

ঠিক চারদিনের মাথায় যথাসময়ে এলো ওরা। সঙ্গের মেয়েটির বয়স আরো কম। মনে হয় ষোলর বেশি হবে না। এতো রূপ যে কোন মেয়ের হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মনে হলো বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী।

তিনজনে মিলে হৈ-হল্লা করলাম খুব। প্রাণভরে সুরা পান করলাম। নেশায় মাতোয়ারা হলাম। তারপর খানাপিনা করে রাতের মতো শোবার তোড়জোড় করতে থাকলাম। শুতে যাবার আগে এক চক্কর সরাব নিলাম আমরা। আমি নিজে ঢেলে দিলাম ওদের দু'জনকে। নতুন মেয়েটির হাতে মদের গেলাম তুলে দেবার আগে আমার ঠোঁটে ছুঁইয়ে দিলাম। আমার প্রেয়সীর তা সহ্য হলো না। বুঝলাম, ভীষ চটে গেছে। কিন্তু মুখে প্রকাশ করলো না। বরং শুধু বললো, কি গো সাহেব, তোমার জন্যে নতুন চিড়িয়া ধরে আনলাম। তা তার সঙ্গে একটু কথাটথা বলো। একটু আদর সোহাগ করো। কেন, তোমার মন ওঠেনি নাকি? এমন রূপসী! তোমার ভালো লাগলো না?

আমি বলি, ভালো লাগবে না কেন? খুবই ভালো লেগেছে। তা এত ভালো জিনিস কি সবারই পেটে সহ্য হয়?

—হবে হবে। একটু চেখেই দেখো না?

আমি ভীষণ বোকা। তার এই কথায় একেবারে গলে গেলাম।—তুমি যদি বলো, চেখে দেখতে পারি।

—বাঃ, এই তো পুরুষের মতো কথা। নাও, আজ রাতে এ তোমার শয্যাসঙ্গিনী হবে। ওকে নিয়ে শুলে, খুব খুশি হবো আমি।

নির্বোধের মতো আমি বললাম, তোমার কথা তো ঠেলতে পারবো না। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

সে রাতে আমাদের দু'জনের শোবার ব্যবস্থা হলো খাটে। আর আমার প্রেয়সী বিছানা করে নিলো নিচে।

আমার রক্তে তখন কামনার অধীর উত্তেজনা। নতুন নারী সম্ভোগের বাসনায় তাল মান জ্ঞান খুইয়ে বসেছি। নিচে শুলো সে। আর খাটের ওপরে নতুন মেয়েটির দেহটাকে নিয়ে আমি মেতে উঠলাম পুতুল খেলায়। এইভাবে কতক্ষণ কেটেছিলো জানি না। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো দেখি, আমার বাঁহাতের বাহুটা রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম, খোয়াব। চোখদু'টো ভালো করে রগড়ে আবার তাকালাম। না, স্বপ্ন নয়, সত্যি রক্ত। শুধু আমার হাতে নয় বালিশের তোয়ালেও লালে লাল। পাশে ঘুমন্ত মেয়েটাকে জাগাবার জন্যে ওর কপালে হাত রেখে নাড়া দিই। আর কি বলবো, সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাটা গড়িয়ে মেজের ওপর পড়ে গেলো। আমার যে তখন কি অবস্থা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। এমন বীভৎস ব্যাপার চোখে দেখা তো দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারিনি কখনও। ভরে সারা শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে—এখন কি করি! নিচে তাকিয়ে দেখি, সে মেয়েটি নাই। উঠে হামাম দেখলাম। না, সে নাই। চোখ পড়লো, বাইরে যাবার দরজার হুড়কো খোলা। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজানো। বাইরে এলাম। না, কোথাও নাই। সদর দরজাটা দেখলাম, হাট করে খোলা। বুঝতে বাকী রইলো না, কার কাণ্ড। কিন্তু এখন আমি কি করি? লোক জানাজানি হয়ে গেলে কোটাল এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে আমাকে। মেয়েটার ঠিকানা জানি না, কি জবাবদিহি করবো কোটালের কাছে। ভাবতে ভাবতে একটা উপায় পেলাম। ঘরের মাঝখানকার মেজের কয়েকখানা পাথর তুলে ফেললাম। মাটি খুঁড়ে একটা লম্বা গর্ত করে তার মধ্যে মেয়েটার লাশ আমার পরনের কাপড়চোপড়, বিছানার চাদর আর তোয়ালে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলাম। শ্বেতপাথরের টালিগুলো যেমনভাবে লাগানো ছিলো হুবহু সেইভাবেই লাগিয়ে দিলাম।

অন্য জামা কাপড় পরে বাইরে এলাম। বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমি কিছুদিনের জন্যে বিদেশে যাচ্ছি। কাজ হয়ে গেলেই ফিরে আসবো। এই নিন আগাম এক বছরের ভাড়া। অন্য কোন ভাড়াটেকে যাতে ভাড়া না দিয়ে দেন সেই জন্যে বারোমাসের পুরো ভাড়া চব্বিশ দিনার দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

বাড়িওলা খুশি হয়ে বললো, আপনার যখন খুশি ফিরবেন। বাড়ি আপনারই রইলো।

সেই দিনই আমি কাইরো রওনা হয়ে যাই। ওখানে আমার কাকারা আছে। তাদের সঙ্গে দেখা করে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেবো।

কয়েক দিনের মধ্যে কাইরো পৌঁছে গেলাম। কাকারা আমাকে দেখে মহাখুশি হলো। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। টাকা কড়ি যা ছিলো দামাসকাসে ফুরিয়ে গেছে। এখন এখানে এসে কাকাদের সঙ্গে দেখা না হলে মহা বিপদে পড়তাম। কাকারা আমার খাওয়া দাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। খাই দাই আর ঘুরে ঘুরে মিশরের শোভা সৌন্দর্য দেখে বেড়াই।

কিছুদিন বাদে কাকারা বললো, আমাদের কাজ-কাম সব শেষ। এবার দেশে ফিরে যাবার পালা।

আমি বললাম, কিন্তু আমার আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছে এখানে। অনেক কিছু দেখার বাকী। ওরা বললো, তা থাক, না—বার বার তো আসা হবে না। ভালো করে দেখে যা।

কাকারা আমাকে বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দেশে চলে গেলো। আমি ছোটখাটো কেনা বেচার সওদা করি, আর খাই দাই ঘুরে বেড়াই। এইভাবে তিনটি বছর কেটে গেলো। প্রতি বছরই দামাসকাসের বাড়িওলাকে ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশেষে ঠিক করলাম দেশে ফিরে যাবো। তখন কাকাদের সঙ্গে যাইনি, তার কারণ, কাকাদের সঙ্গে দামাসকাসে থামতে হতো। এবং আমার বাসায় গিয়ে উঠতো তারা। কিন্তু এখন, এই তিন বছর পরে আমার ধারণা হলো, লোক সব ভুলে গেছে। তাই দামাসকাসে এসে বাড়িওলার সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে বাড়ির চাবিটা দিয়ে তিনি বললেন, এই নাও তোমার চাবি। যেখান যা রেখে গিয়েছিলে, দেখো, সব ঠিকঠাক আছে কি না।

শোবার ঘর খুলে ঢুকলাম। দেখলাম, সবই যথাযথ ঠিকই আছে। শুধু ধুলো বালি জমে গেছে সারা ঘরময়, বিছানাটা ঝেড়ে বিছাবার জন্য তোষকটা তুলতেই অবাক হলাম। একটা জড়োয়া হাঁসুলী হার। বেশ ভারি। বুঝতে দেরি হলো না, সেই রাতে মেয়েটি শুতে যাবার আগে হারটা খুলে তোষকের তলায় রেখে দিয়েছিলো। সন্ধ্যাবেলায় তার গলায় এই হারটাই দেখেছিলাম, মনে পড়লো।

হাতে টাকা পয়সা কম ছিলো, এতখানি সোনা হাতে পেয়ে খুশিই হলাম। কিন্তু তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, এ সবই শয়তানের খেলা।

পথশ্রমে তখন আমি বড় ক্লান্ত। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে শরীরটা ঝরঝরে হলো। জড়োয়া হারটা জেবে পুরে বাজারের দিকে চললাম। ভাবলাম, আজই ওটাকে বেচে দেবো। এ জিনিস কাছে রাখার বিপদ আছে। বাজারে গিয়ে একটা দালালের গদিতে ঢুকলাম। সোনা রূপার দালালী করাই তার পেশা। হারটা তার হাতে দিয়ে বললাম, এটা বিক্রী করবো।

সে আমাকে সাদরে বসালো। বললো, মেহেরবানী করে একটু বসুন সাহেব। আমি মহাজনের ঘরটা ঘুরে আসি। হারটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো সে। আমি বসে রইলাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে সে ফিরে এলো। বললো, আমি ভেবেছিলাম খাঁটি সোনা, আর আসল মুক্তোর তৈরি। কিন্তু জহুরী সাহেব বললো, ঝুটো মুক্তা, আর নকল সোনা। ফ্রাঙ্কফুটের তৈরি নকলি মাল। আসল হলে এক হাজার দিনার দাম হতো। কিন্তু এ জিনিসের দাম এক হাজার দিরহামের বেশী হবে না।

আমি বললাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি একটা মেয়েকে ভোলাবার জন্যে এই ঝুটো হারটা কিনে দিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটা মারা যাবার আগে আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে যায় ওটা। যাই হোক, যা দাম পাওয়া যায় তাতেই বিক্রী করে দিন। আর যত তাড়াতাড়ি পারেন টাকাটা এনে দিন আমাকে। অনেক কাজের তাড়া আছে। এখুনি যেতে হবে।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

আঠাশতম রজনী।

সে বলতে থাকে ঃ

সেই ইহুদী হেকিম তার কাহিনী বলে চলেছে ঃ

যখন সেই যুবক দালালটাকে বললো, যা দাম পাওয়া যায় নিয়ে এসে দিন তাড়াতাড়ি, দালালের সন্দেহ হলো। নির্ঘাৎ চোরাই মাল। তা না হলে, এক কথায় ঝুটো বলে মেনে নিলো কি করে। হয় সে কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছে, নয় সে চুরি করে এনেছে।

যুবকটি বলতে থাকে ঃ

দালালটা বললো, আপনি আর একটু বসুন, সাহেব। আমি এখুনি বিক্রী করে দাম নিয়ে আসছি।

আমি বসে রইলাম টাকার জন্যে। কিন্তু টাকা পেলাম না, পেলাম হাত কড়া। কয়েকজন সিপাই এসে ঘিরে ফেললো আমাকে। হাতে কড়া পরিয়ে ধরে নিয়ে গেলো কোটালের কাছে।

আমাকে দোকানে বসিয়ে লোকটা সোজা গিয়েছিলো ওদের বড় দালালের কাছে।

তাকে বলতেই সে খবর দেয় কোতোয়ালীতে।

কোটাল আমাকে প্রশ্ন করলো, এ হার কার?

—জী আমি একটি মেয়েকে উপহার দিয়েছিলাম। সে মারা যাবার পর আমার বিবির হাতে আসে হারটা।

—কম দামে কিনে ছিলে? কোথা থেকে কিনে ছিলে? বললাম, ঠিক মনে নাই। তবে হাজার দুই দিরহাম হবে। কিনেছিলাম কাইরোর এক মনোহারী দোকান থেকে।

কোটাল সাহেব হো হো করে হেসে উঠলো। —বাঃ চমৎকার বানিয়ে বলতে পারো তো, যাদু। হারটার আসল দাম কতো তা এখুনি টের পাবে।

এই বলে সপাং সপাং করে চাবুকের ঘা বসাতে লাগলো আমার সর্বাঙ্গে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম। কোটাল থামলো না। —আগে বল্ কোথায় পেয়েছিস? কোথা থেকে চুরি করেছিস।

—আজ্ঞে চুরি করিনি।

আবার সপাং করে চাবুকের ঘা পড়ে আমার পিঠে। —চুরি করোনি, সোনার চাঁদ। তবে কি করে এলো তোমার হাতে? এতো দামী জিনিস পেলে কোথায়? উজির আমির ছাড়া এ গহনা কার ঘরে থাকে?

বুঝলাম দালালটা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। উপায়ন্তর না দেখে, আর একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বললাম তাকে।

—হারটা আমি চুরি করেছি।

—কোথা থেকে?

—বড় দালালের গদি থেকে।

অনেক ভেবে এই মিথ্যে কথাটা বললাম। না হলে দারোগার মার থেকে রেহাই পাবো না। সত্যি কথা বলার বিপদ ছিলো। কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে পড়বে। চুরি ছেড়ে খুনের দায়ে পড়বো। এখানে হয়তো একটা অঙ্গ যাবে। কিন্তু খুনের আসামীর সাজা প্রাণদণ্ড।

কোটাল সাহেব সিপাইদের বললো, ওর ডান হাতখানা কেটে ফেলো।

কোটালের হুকুমে আমার ডান হাতখানা কাটা হলো। তারে আগেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কে যেন আমার মুখে কি একটা দাওয়াই ঢেলে দিলো। তারপর জ্ঞান ফিরে আসে।

আস্তে আস্তে উঠে বাসায় ফিরে এলাম। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলো এই মুখরোচক খবর। বাসায় ঢোকার মুখেই দেখি বাড়িওলা দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, সারা শহরে টি টি পড়ে গেছে। তুমি বাপু, অন্য বাড়ি দেখো, এখানে আর রাখতে পারবো না তোমাকে। আগাম যা দিয়ে রেখেছো কাল হিসেব করে ফেরৎ দিয়ে দেবো।

কাতর অনুনয় করে বললাম, কালই কোথায় যাবো। আমাকে দু'একটা দিন সময় দিন, বাসা খুঁজে নিশ্চয়ই চলে যাবো।

বাড়িওলা চলে গেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ব্যথায় টনটন করছে হাতটা। চোখে জল এসে গেলো, হায় আল্লাহ একি হলো আমার। এই কাটা হাত নিয়ে কি করে দেশে যাবো

আমি। মসুলের কোন লোক কি বিশ্বাস করবে আমার কোন বানানো কথা। সব দেশের লোকই জানে, চুরি করলে হাত কাটা যায়। এই একমাত্র সাজা।

ভেবে কোন কূল-কিনারা করতে পারলাম না। বাসা খুঁজতেও বেরুলুম না। পথে বেরুলেই লোকে ছিঃ ছিঃ করে থু থু ফেলবে। আর এই অবস্থায় কে আমাকে বাসা ভাড়া দেবে? সুতরাং সে-চেষ্টা না করে না খেয়ে, না নেয়ে, খোদা ভরসা করে ঘরেই পড়ে রইলাম। এইভাবে তিনটে দিন কেটে গেলো। ভাবলাম, আজ হোক কাল হোক, বাড়িওলা আবার আসবে। আমার আগাম টাকা ফেরৎ দিয়ে, ঘরের সামান-পত্র রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে আমাকে বের করে দেবে। দেয় দিক। কি আর করবো। আর ভাবতে পারি না। যা হয় হবে। তখনকার কথা তখন ভাববো। কিন্তু মন মানে না। যত রাজ্যের ভাবনা এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাকে।

হঠাৎ কিসের শব্দে তন্দ্রা কেটে যায়। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে জাঁদরেল ফৌজি আবসার। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে বললো, সুবাদার সাহেবের হুকুমে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।



ফৌজরা এসে আমাকে বেঁধে ফেললো। সুবাদারের দরবারে দাঁড় করানো হলো আমাকে। দেখলাম সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে আমার বাড়িওলা আর সেই দুই দালালকেও দেখলাম। সুবাদার সাহেব বললেন, কোটোয়ালের কাছ থেকে শুনলাম, এই হাঁসুলী হারটা তুমি নাকি এই দালালটার দোকান থেকে চুরি করেছো। কিন্তু হারটার মালিক তো এই দালাল নয়। এটা আমার মেজো মেয়ের হার। আজ তিন বছর আগে একদিন বড়মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে যায়, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। এখন তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, সত্যি কথা কি, বলতো? আমি তোমাকে কোন সাজা দেবো না। আজ তিনটি বছর ধরে দামাসকাসের প্রতিটি কোণে কোণে আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু তার কোন হদিস করতে পারিনি। আজ এই হারটা আমার হাতে এসেছে। এখন বুঝতে পারছি, সে আর জান-এ বেঁচে নাই।

সুবাদার সাহেবের কথা শুনে আমার পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগলো। এবার আর বাঁচার কোন আশা নাই। মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু দুনিয়াতে অবাক করার মতো ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে। সুবাদারসাহেব ফৌজদারকে বললেন, শিকল খুলে দাও।

আমাকে বন্ধন মুক্ত করা হলো। সুবাদার সাহেব তার আরও কাছে ডাকলেন আমাকে। তারপর বড় দালালের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লোকটা মিথ্যেবাদী শয়তান। মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে তোমার হাতটা কাটিয়েছে। ওকে আমি জেলে ভরবো। এই বেচারার কাটা হাতের উপযুক্ত খেসারৎ দাও। এবং এক্ষুণি আমার সামনে। না হলে তোমাকে আমি শূলে দেবো। বুঝেছো শয়তান। দালালী করা তোমার জন্মের মতো ঘুঁচিয়ে দেবো।

সুবাদার সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একেবারে মুখোমুখি। দরবার ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হুকুম দিলেন। এমনকি সুবাদারের ব্যক্তিগত রক্ষীও রইলো না সেখানে। আমাকে আদর করে পাশে বসালেন তিনি। বললেন, আচ্ছা বাবা এবার বলোতো সত্যি কথাটা কি? আমি জানি তোমার দ্বারা কোন খারাপ কাজ সম্ভব নয়। তোমার চোখ, তোমার চেহারা সে কথা আমাকে বলে দিয়েছে। তোমার একটুও ভয় নেই। আমি বাঁচালে তোমার কোন ক্ষতিই কেউ করতে পারবে না এখানে। সুতরাং নির্ভয়ে বলো। তা সে যত অপ্রিয়ই হোক, আমি শুনতে চাই। আর তোমার সাজার ভয়? সে তো তোমাকে আগেই বলেছি, কোন ভয় নাই। কোন সাজা তোমাকে দেবো না।

আমি কেঁদে ফেললাম, আপনি আমাকে যে সাজাই দিন, কোন কথা না ছুপিয়ে আগাগোড়া সব খুলে বলবো আপনাকে।

তারপর প্রথম মেয়েটির কথা বললাম। সে আমার সঙ্গে যা যা করেছিলো সব বললাম। তার পরে কবে দ্বিতীয় মেয়েটাকে আনলো এবং তার সঙ্গে আমাকে এক খাটে শুতে দিয়ে সে নিচে শুয়ে পড়লো এবং গভীর রাতে খুন করে পালিয়ে গেলো—সবিস্তারে সব বললাম।

আমার কথা শুনতে শুনতে সুবাদার সাহেব মাথাটা নিচু করে রুমালে মুখ ঢাকলেন। ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন অনেকক্ষণ ধরে। আমি আর কী সান্ত্বনা দেবো তাঁকে। চুপ করে বসে রইলাম। রুমালে চোখ মুছে বললেন, সেই প্রথম মেয়েটি আমার বড় কন্যা। ছোটবেলা থেকেই সে খারাপ হয়ে যায়। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। না বলে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতো। আমি তাকে নানাভাবে শাসন করেছি, ভয় দেখিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই তাকে ভালো করা গেলো না। শেষে আমার ছোটভাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কাইরোয়। আমার ভাইপোর সঙ্গে শাদী দিয়ে দিলাম। আশা, যদি সে ভালো হয়। কিন্তু নসীব খারাপ, বছর না ঘুরতেই ওর স্বামী মারা গেলো। তখন আর কোন উপায় না দেখে আবার তাকে এখানে—আমার কাছে নিয়ে এলাম।

এখানে আসার পর দেখলাম, আরও খারাপ হয়ে গেছে সে। মিশরে থাকাকালে ওখানকার মেয়েদের সঙ্গে মিশে, তাদের সব খারাপ দোষগুলোই সে বেশ রপ্ত করে ফেলেছিলো। তুমি তো মিশরে ছিলে, নিশ্চয়ই জানো, মিশরের মেয়েদের মতো বদ-চরিত্রের মেয়েমানুষ সারা দুনিয়ার কোথাও নাই। কামনার বিকৃতি তাদের রক্তের কণায় কণায়। নানা ছল চাতুরি দিয়ে ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে পথে বসাতে তারা ওস্তাদ। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পারে না এমন কোনও কাজ নাই। দরকার হলে নিজের ছেলেকে খুন করতে পারে। কোনও যুবককে চোখে ধরলে তার আর নিস্তার নাই। সে যতো চরিত্রবান ছেলেই হোক, ছলাকলা দেখিয়ে, যেন-তেন-প্রকারেন, তাকে জাহান্নমে টেনে নামাবেই। মিশরের মেয়েদের সব গুণই সে আয়ত্ত করে ফেলেছিলো।

এখন বুঝতে পারছি মিশর থেকে আসার পর সে তোমাকেই তাক করেছিলো। পর পর চারবার তোমার ঘরে গিয়েছিলো সে। তা যাক, তাতে আমার আর দুঃখ ছিলো না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আর ভালো করা যাবে না নিশ্চিত হয়ে ওকে আমি খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু চিন্তা হলো যখন দেখলাম, আমরা মেজো মেয়েটাকেও সে খারাপের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কড়া শাসনে চোখে চোখে রাখতাম মেজোটাকে। যাতে সে তার দিদির সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করে। কিন্তু আমি নানা কাজের লোক, অন্দরমহলে বসে থাকলে তো আমার চলে না। হরদম সুবা-র কাজে এখানে ওখানে চলে যেতে হয় আমাকে। সেই ফাঁকে বড় মেয়েটা মেজোটাকে নিয়ে এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়ে। তুমি তো বাবা জানো, মেজোর কি কচি বয়স ছিলো। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই একটু বেশী কৌতূহলী হয়। নতুন কোন কিছু জানার দিকে, নতুন কোন কিছুর স্বাদ পাওয়ার জন্যে ভীষণ লোভ হয়। দেহে প্রথম যৌবনের জোয়ার আসে। সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। সেই জন্যেই খুব কড়া নজর রাখতে হয় এই সময়। নজর আমার কড়াই ছিলো। কিন্তু বড় মেয়ের কারসাজীর কাছে আমার হার হয়ে গেলো। এই বয়সে কামনার আগুন একবার জ্বালিয়ে দিতে পারলেই হলো। তারপর আর তাকে নিরস্ত করা শক্ত। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে মেজোটাকে নিয়ে সে মাঝে মঝে বাড়ির বাইরে গিয়ে রাত কাটাতো।

একদিন সকালে মহাল থেকে ফিরে এসে শুনলাম মেজো মেয়েটা বাড়ি নাই। বড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললো, কাল বিকেলে ওকে

নিয়ে আমি বাজারে গিয়েছিলাম, দু-একটা মনোহারী জিনিস কিনতে। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে কোথায় সে হারিয়ে গেলো আর খুঁজে পেলাম না আব্বাজান।

প্রথমে ভেবেছিলাম, বড়টা ওকে কোন ছেলের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো আজই ফিরে আসবে। কিন্তু আমার ধারণা যে ভুল তা আজ তোমার এবং বড়মেয়ের কথা থেকে জানতে পারলাম। সেদিন বিকেলে সে তাকে সঙ্গে করে তোমার বাসায় গিয়ে উঠেছিলো। বরাবরই লক্ষ্য করেছি, মেজোর অসাধারণ রূপ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। সে নিজেও কিছু কম সুন্দরী না, কিন্তু মেজোর মতো অতোটা না। ওর সামনে যদি মেজো মেয়ের রূপের প্রশংসা করতো কেউ, তার ওপর ক্ষেপে লাল হয়ে উঠতো। অথচ মেজোকে ছেড়েও থাকতো না সে। সারা দিন রাত তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া গল্পগুজব করতো। মনে হতো, ওরা যেন বোন নয়—দুই সখী।

তোমার বাসাতে অযাচিত ভাবে তাকে নিয়ে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিলো। হত্যা করা। মেজোর রূপ সে সহ্য করতে না পেরে আগে থেকেই মতলব এঁটে রেখেছিলো—কিভাবে কোথায় তাকে খুন করবে। আজ যখন মেজো মেয়ের হাঁসুলী হারটা তাকে দেখালাম, তখন সে সব কথা কবুল করেছে আমার কাছে। তোমার মুখ থেকে শুনে বুঝলাম, সে যা বলেছে সবই ঠিক।

তাকে আর ফিরে পাবো না, বাবা। সারা জীবন শোকের আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হবো আমি। আর বাবা, তোমার কি দুর্ভাগ্য দেখো, বিনা দোষে তোমার হাতখানা কাটা গেলো। তাও তো আর ফেরৎ হবে না। এই-ই হয়। নিয়তির লেখা কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তাই বলছি, মনে কোন ক্ষোভ রেখো না, বাবা। আবার নতুন করে জীবন শুরু করো।

আমি বললাম, কিন্তু এই কাটা হাত নিয়ে আমি দেশে ফিরবো কী করে? লোকে তো বিশ্বাস করবে না আমার কথা। আমি দেশে যেতে পারবো না।

আমিও তোমাকে এখানেই ধরে রাখতে চাই, বাবা। আমার তিন মেয়ে। কোন ছেলে নাই। তুমি আমার ছোট মেয়েকে শাদী করে আমার কাছেই থাকো। আমার ছেলের অভাব পূরণ করো। রূপে সে মেজো মেয়ের চেয়েও সুন্দরী। আর গুণে সে সকলের সেরা। অমন মেয়ে লাখে একটা মেলে।

আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। বললাম, আপনি যা বলবেন তাই করবো। শুধু একটা কথা, খবর পেলাম, মসুলে আমার বাবা গত হয়েছেন। আমরা পাওনা বিষয় সম্পত্তিগুলো সব বেচে দিতে চাই।

তিনি বললেন, আজই আমি আমার লোকজন সঙ্গে দিয়ে একজন বড় আবসার পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানে। তোমার যা ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে সে নিয়ে আসবে। তোমাকে কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না।

এর পর সুবাদার সাহেবের ছোট মেয়েকে শাদী করে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছি। আমার বিবি বড় ভালো মেয়ে। জান দিয়ে ভালোবাসে আমাকে। আর সুবাদার সাহেব—আমার শ্বশুর যে কি চোখে দেখে আমাকে সে তো আপনি এই ক'দিনে ভালো করেই জেনেছেন।

ইহুদী হেকিম বলতে থাকে, যুবকের কাহিনী আমি অবাক বিস্ময়ে শুনছিলাম এতক্ষণ। এবার বললাম, যেভাবে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছো তা সত্যিই রোমাঞ্চকর। তবে সবই সম্ভব হয়েছে সুবাদার সাহেবের মতো এমন ভালো মানুষের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটেছিলো বলে।

জামাতার অসুখ সেরে গেলে সুবাদার সাহেব খুশী হয়ে আমাকে প্রচুর অর্থ এবং নানা শৌখিন জিনিসপত্র উপহার দিলেন।

হাতে অনেক টাকা পয়সা এসে গেলো। দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। দুনিয়ার নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে জাঁহাপনা, আপনার সলতানিয়তে এসে বড় ভালো লেগেছে। তাই এখানে একখানা বাসা ভাড়া করে বসবাস করছি। হঠাৎ কাল রাতে এই কাণ্ড। কে বা কারা এই কুঁজোটার লাশ আমার বাসায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলো। তার পরের ঘটনা তো আপনার সবই জানা, হুজুর।

চীনের সুলতান তখন মাথা দুলিয়ে বললো, হুঁ, তোমার গল্পটা মন্দ নয়। কিন্তু কুঁজোর মরার ঘটনার চেয়ে অবাক করার মতো কিছু না। নাঃ, তোমাদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। ফাঁসী তোমাদের দেবোই।



এই সময় সেই দর্জি এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানালো। দুনিয়ার মালিক জাঁহাপনা, আমি আপনাকে আমার কাহিনী শোনাতে চাই। আপনি মেহেরবানী করে একটু ধৈর্য করে শুনবেন এই আমার আর্জি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমার আগের তিনজন কেন, সারা জিন্দেগীভর যতো কাহিনী কিস্‌সা এতাবৎকাল আপনি শুনেছেন, সে-সবের চেয়ে সেরা, মজাদার এবং সবচেয়ে অবাক করার মতো আমার এই কাহিনী।

সুলতান মাথা দুলিয়ে বললেন, ঠিক আছে, এতো করে যখন বলছো, শুনবো তোমার কাহিনী। যদি সত্যিই ভালো লাগে, যদি সত্যিই অবাক হই, তবে তোমাদের চারজনকেই বেকসুর খালাস করে দেবো। আর যদি তা না হয়, তবে কারো রক্ষা নাই। মনে রেখো, ফাঁসীতে ঝুলাবো।

দর্জি তার কাহিনী শুরু করে ঃ

আপনি মেহেরবান, সারা দুনিয়ার বাদশাহ, আমার কাহিনী পেশ করছি, অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরে শুনে আমাকে কৃতার্থ করুন ঃ

এই হতভাগ্য কুঁজোর মৃত্যুর আগে আমি এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে শহরের অনেক গণ্যমান্য এবং আমার মতো অতি সাধারণ মানুষের সমাগম হয়েছিলো। যেমন—দর্জি, নাপিত, ধোপা, ছুতোর, মুচি, মুর্দাফরাস এবং আরও অনেক জাতের লোক।

একটা বিরাট বাড়ির প্রকাণ্ড মহলে আয়োজন করা হয়েছিলো এই উৎসবের। সকাল হতে না হতেই আমন্ত্রিতরা এসে জড়ো হতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো সমস্ত কক্ষ। কিন্তু উৎসবের আসল হোতা গৃহস্বামী তখনও অনুপস্থিত। আমরা সবাই তার প্রতীক্ষায় বসে আছি। এমন সময় এক প্রিয়দর্শন তরুণকে সঙ্গে করে গৃহস্বামী প্রবেশ করলো। তরুণের সাজ ফিটফাট কেতাদুরস্ত। দেখে মনে হয় বাগদাদবাসী। অন্তত তার সাজপোশাকের ধরন আর বাহার দেখে তাই মনে হয়।

আসরে ঢুকেই বাগদাদী কায়দায় সালাম জানালো সবাইকে। আমরাও জানালাম আলেকুম সালাম। দেখতে সে সুঠাম সুন্দর সুপুরুষ, কিন্তু আহা, একটা পা খোঁড়া।

সবাইকে সালাম জানিয়ে খুশি খুশি ভাব নিয়ে এসে বসলো আমাদের পাশে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কি জানি কি হলো, সারা মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো তার। এবং ঘর

থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে আমরা তাকে আটকালাম। কী ব্যাপার, কিছুই তখন বুঝতে পারছি না। গৃহস্বামী বললেন, কিন্তু কী আমার ত্রুটি হলো, এভাবে চলে যাবে কেন, বাবা, খুলে বলো, না হলে বুঝবো কী করে?

আজ আপনার নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এমন একজন এখানে উপস্থিত আছে যাকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। আল্লাহর নামে দিব্যি করেছি, জীবনে তার আর মুখদর্শন করবো না, এক সঙ্গে বসবো না বা এক সঙ্গে খানাপিনা করবো না। সেই জন্যে আমি নীরবে আসর ত্যাগ করে চলে যেতে চাই। আপনার অভ্যাগত আমন্ত্রিতরা কেউ আহত অপমানিত হোক, তা আমি চাই না। এই কারণে তার নামও আপনাদের বলতে চাই না।

গৃহস্বামী বললো, কিন্তু তুমি আমাদের আজ এক মুসাফীর মেহমান, যে কারণেই হোক, তোমাকে আমরা এইভাবে চলে যেতে দিতে পারি না। যতো অপ্রিয় হোক, সব কথা খুলে বলো। আমরা শুনবো। কে সেই লোক, তাকে দেখাও; কেনই বা তোমার এতো গুস্‌সা?

তখন সেই তরুণ এক নাপিতকে দেখিয়ে বললো, এই লোকটার জন্যে আমি ল্যাংড়া হয়েছি। এর জন্যে আমি দেশত্যাগী হয়ে এই সুদূর চীন দেশে চলে এসেছি। একটা উদ্দেশ্য তার আর মুখ-দর্শন করবো না জীবনে। সে আমার জীবনের এক ধূমকেতু—অভিশাপ। আল্লার নামে দিব্যি করেছি, তার সঙ্গে একসাথে বসবো না, একসাথে খানা-পিনা করবো না। কিন্তু এমনই আমার মন্দভাগ্য এই দূর প্রবাসে এসেও তাকে এড়াতে পারলাম না। আমার আগেই সে এখানে এসে হাজির।

এই কথা শুনে সেই নাপিতের মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেলো। মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রইলো। কোনও প্রতিবাদ করতে পারলো না।

আমরা সবাই সেই তরুণকে চেপে ধরলাম। শোনাতে হবে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। আমরা শুনতে চাই।

তখন সেই খোঁড়া তরুণ তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

আপনারা শুনে হয়তো খুশি হবেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার বাবা বাগদাদের সেরা এক সওদাগর ছিলেন। অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও আচার বিনয় বিদ্যা সব গুণেরই অধিকারী ছিলেন তিনি। এবং আমিও তার কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলাম। আমার শিক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার পরই তিনি দেহ রাখলেন। এবং আমি একাই তার বিশাল বিষয় সম্পত্তির মালিক হলাম।

তখন থেকে খানাপিনা শখ-শৌখিনতা আমার বেড়ে গেলো। দামী দামী সাজপোশাকে সেজে থাকতাম। ভালো ভালো খানা খেতাম। মোট কথা বিলাসিতার ত্রুটি ছিলো না কিছুই। কিন্তু একটা ব্যাপার ছাড়া। কোন মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াতাম না আমি। কেন জানি না, মেয়েছেলে দেখলেই আমার গা রি রি করে উঠতো।

একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম, এক দঙ্গল মেয়ে আসছে। ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের এক অন্ধ গলিতে ঢুকে পড়ি। একটা বাড়ির রোয়াকে বসে তাদের পার হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বসে আছি, হঠাৎ আমার সামনের বাড়ির দোতলার একটা জানলা খুলে গেলো। একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখলাম। জানলার কার্নিশের ওপরে রাখা ফুলগাছের টবে জল দিতে লাগলো সে। অসাধারণ তার রূপ আর যৌবন। অমন রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি। নারী সম্পর্কে এত বিরূপতা নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেললাম তাকে। মেয়েটি যতক্ষণ জানলার পাশে ছিলো অপলক ভাবে শুধু দেখতে থাকলাম তাকে। মেয়েটি কিন্তু আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফুলের গাছে জল দিতে থাকলো। একটু পরে জল দেওয়া শেষ হলে আবার জানলাটা বন্ধ করে দিলো। আমি কিন্তু বসেই রইলাম। আবার যদি খোলে। তাহলে আবার দেখতে পাবো তাকে। কিন্তু না, সন্ধ্যা অবধি বসে রইলাম। আর খুললো না। বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এলাম। বুকের মধ্যে কেমন হুহু করে যেতে লাগলো। যতই মনকে শান্ত নিরস্ত করতে চেষ্টা করি ততই আরো বেশী করে তার কথা মনে পড়ে। তার রূপ, তার যৌবন আমাকে আকর্ষণ করতে থাকে।



দিন যায় রাত্রি আসে। না পাওয়ার বেদনা বাড়তেই থাকে। শেষে এমন হলো, যদি না তাকে পাই, আমার জিন্দগীই বরবাদ হয়ে যাবে। খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না। এ কি যন্ত্রণা! শুধু ভাবি তার কথা অহরহ। সব কাজকর্ম ডকে উঠলো। তা উঠুক। কোন দিকে তখন আমার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি আবার যাই ঐ বাড়ির সামনে। রোয়াকে গিয়ে বসে থাকি। কিন্তু জানলা আর খোলে না সে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই। শুধু একবার জানলাটা সে খুলুক। দেখে নয়ন সার্থক করে চলে যাই। কিন্তু না, জানলা আর খোলে না। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, দেখলাম খচ্চরের পিঠে চেপে সুলতানের কাজী নফরচাকর পরিহত হয়ে এসে ঐ বাড়ির দরজায় নামলো। দরজাটা খুলে গেলো। সবাই ঢুকে গেলো ভিতরে। তারপর আবার বন্ধ হয়ে গেলো দরজা। বুঝলাম বাড়িটা কাজী সাহেবের।

আর অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। ঘরে ফিরে এসে শয্যা নিলাম। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলাম। মানসীর চিন্তায় শুকিয়ে যেতে লাগলো শরীর। আমার নফরচাকর দাসদাসী চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমার কোন কঠিন অসুখ করেছে ভেবে বড় হেকিমকে ডেকে আনবে কিনা জানতে চাইলো। আমি তাদের বারণ করলাম, আমার কোন অসুখ করেনি। এ অসুখ কোন হেকিম কবিরাজ সারাতে পারবে না।

একদিন আমি বিছানায় শুয়ে আছি, এক বৃদ্ধা মহিলা এলো আমার ঘরে। চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, বাবা, তোমার শরীর যে দিনদিন হাড়ডিসার হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ মানুষ, এভাবে নেতিয়ে পড়ে থাকলে তো মরে যাবে। ওঠ। খাও দাও, মৌজ করো। দেখো, মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে।

প্রতিদিনই আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী অনেকেই আমাকে দেখতে আসে। অনেকেই অনেক জ্ঞান দিয়ে যায়। সব শুনি। কিন্তু কিছুই কানে ঢোকে না। ভাবলাম এও সেই রকমই সমবেদনা জানাতে এসেছে। কিন্তু না, বৃদ্ধা এসেছিলো অন্য উদ্দেশ্যে। ঘর থেকে অন্য সবাই বিদায় নিলে সে আরও একটু এগিয়ে এলো আমার কাছে। গলাটা খাটো করে বললো, তোমার অসুখটা কি জানি বাবা। তা সব খুলে বলো দিকিনি, আমি কি করতে পারি, দেখবো।

আমি তাকে সব কথাই বললাম। বৃদ্ধা বললো, কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, মেয়েটার বাবা হচ্ছে বাগদাদের কাজী। ভীষণ রাশভারী লোক। যাই হোক, মেয়ে আর বাবা এক বাড়িতে থাকলেও আলাদা মঞ্জিলে, আলাদা মহলে বাস করে। কাজী থাকে নিচতলায়, আর মেয়ে থাকে ওপরে। যদিও মেয়ের মহলে কোন নফরচাকর বা কেউই যেতে পারে না, একাই থাকে, তবু বাড়ির পাহারা চৌকির এমন কড়া বন্দোবস্ত একটা মাছি ঢুকতে পারবে না। যাই হোক, বাবা, তুমি কিছু ভেবো না। উপায় আমি একটা বের করবোই। ওঠ, নাওয়া খাওয়া করো। তুমি না পুরুষ মানুষ।

বৃদ্ধার কথায় বুকে বল পাই, আশা হয়, হয়তো সে কোন ব্যবস্থা করে দেবে। খুশি মনে উঠে পড়ি। খাওয়াদাওয়া কাজ কামে মন দিই। বাড়ির সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

পরদিন বৃদ্ধা আবার আসে। আমি ভাবি কোন সুখবর আছে। কিন্তু তার মুখ দেখে সে আশা নিভে যায়, বৃদ্ধা বলে, বাবা, আমি পারলাম না। মেয়েটি আমাকে অনেক গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলো। তার কাছে প্রস্তাব রাখতেই সাপের মতো ফুঁসে উঠলো সে। বললো, এক্ষুণি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। তোমার মতো শয়তান মেয়েছেলের সঙ্গে আমি আর একটাও কথা বলতে চাই না। তুমি আমাকে খারাপ পথে নামাতে চাও। তোমাকে এমন শাস্তি দেবো জীবনে ভুলতে পারবে না।

আমি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াই নি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু আমিও দমবার পাত্রী নই। যেমন করে হোক রাজি তাকে করাবোই, বাবা।

বৃদ্ধার এই নিরাশ কথা শুনে আমি আবার শয্যা নিলাম। নাওয়াখাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো।

দিনকয়েক বাদে আবার এলো সেই বৃদ্ধা। এবারে সে খুশিতে ডগমগ। বললো, কই গো বাছা, আগে মেঠাই মণ্ডা নিয়ে এসো। তারপর সুখবর দেবো।

আমি বললাম, তা দাদী কত মেঠাই খেতে পারো? যত পারো খাওয়াবো। শুধু খাবে কেন, যা খুশি চাও দেবো।

বৃদ্ধা বলে, গতকাল আবার গিয়েছিলাম বাবা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তার কাছে গিয়ে বললাম, বাছা, তোমার জন্যে আমার জানের কলিজা, আমার চোখের মণিকে হারাবো। সে আর বাঁচবে না।

আমার কথায় মেয়েটি আঁৎকে উঠলো, কেন কি হয়েছে দাদী। আমার জন্যে বাঁচবে না কেন? আমি তার কি ক্ষতি করেছি?

—তুমি তো সজ্ঞানে কিছু কর নি, বাছা। তোমার এই আগুনের মতো রূপ যৌবন দেখে পাগল হয়ে গেছে ছেলে। নাওয়াখাওয়া বন্ধ করেছে। হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে শরীর। তা আর বেশী দিন বাঁচবে না। হেকিম কবরেজ এ রোগ সারাতে পারবে না—একমাত্র তুমিই পারো তার মুখে হাসি ফোটাতে।

বুঝলাম কাজ হলো। মেয়েটির চোখে মুখে আশঙ্কা ভয়ের ছাপ ফুঠে উঠলো। কিন্তু ছেলেটি কে? তাকে কি আমি চিনি? দেখেছি কখনও?

সে আমার নিজের ছেলে না হলেও তার বাড়া। তার কষ্ট দেখে আমার পাঁজর ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে সে তোমাকে দেখে গেছে। তুমি জানলা খুলে ফুলের গাছে জল দিচ্ছিলে, তখন সে তোমাদের সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে তোমাকে দেখেছিলো। আর সেই থেকেই তোমার প্রেমে পাগল। ক'দিন আগে তোমার কাছে এই জন্যেই এসেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথা ভালো করে না শুনেই তাড়িয়ে দিলে। সেই কথা শোনার পর থেকে বাছা আমার আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। এখন এমন অবস্থা, বাঁচানো দায়। যদি বাঁচে তোমার দয়াতে বাঁচতে পারে। আর না হলে আল্লাহ ভরসা।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলো মেয়েটির। বললো, আমার—আ-মা-র জন্যে সে আজ মৃত্যু শয্যায়?

—তা ছাড়া আর কী বলবো? এখন যদি তোমার দয়া হয়—সে বাঁচতে পারে। ভেবে দেখো, যা বলতে চাও বলো। আমি গিয়ে তাকে বলবো।

—তুমি আর দেরি করো না দাদী। শিগ্গির গিয়ে তাকে খবর জানাও, আমি তার ব্যথায় সমব্যথী। কাল জুম্মাবার। নামাজের পরে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকবো আমি। সে যেন

ঐ সময় অবশ্যই আসে। আমার বাড়ির আমার ঘরের দরজা খোলা থাকবে। ঘণ্টাখানেক তার সঙ্গে কাটাতে পারবো। কিন্তু তাকে বলে দিও, তার বেশী দেরি যেনো সে না করে। তা হলে আব্বাজান নামাজ সেরে এসে পড়বে।

বৃদ্ধার কথা শুনে লাফিয়ে উঠি আমি। সব শোক দুঃখ উবে যায় মুহূর্তে। আনন্দের চোটে মোহরে-ভর্তি আমার বটুয়া সুদ্ধ ধরে দিই তার হাতে। এমন সুখবর যে এনেছে তাকে আমার না দেওয়ার কী আছে?

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন উল্লসিত হলো আমার মুখে হাসি দেখে। খানাপিনা হৈ হল্লায় সারা বাড়ি আবার সরগরম হয়ে উঠলো।

সারাটা রাত অধীর আগ্রহে কাটালাম। কখন সকালে হবে। কখন নামাজের সময় আসবে—শুধু সেই চিন্তা। সকালবেলায়ই সেজেগুজে বসে রইলাম। বৃদ্ধা আবার এলো।—রাতে ঘুম হয়েছিলো, বাবা? শরীর ভালো আছে?

আমি বললাম ঘুম আর কী করে আসে। তবে শরীর মন বেশ ভালো আছে।

বৃদ্ধা বললো, এক কাজ করো, হামামে গিয়ে আচ্ছা করে গোসল করো। সাবান দিয়ে হাতমুখ সাফা করে নাও। দেখো, সুরৎ আরও চেকনাই হবে। এখনও অনেক সময় আছে।

আমি ভাবলাম, তাই তো! এতদিন নাওয়া খাওয়া করিনি। চেহারাটা কালি পড়ে আছে। এইভাবে কি অভিসারে যায় কেউ? নফরকে ডেকে বললাম, একটা নাপিত ডেকে নিয়ে আয়, ভালো করে কামিয়ে তারপর হামামে ঢুকবো। দেখিস যাকে তাকে ধরে আনিস নি। এমন নাপিত আনবি যে ভালো করে চুল ছাটতে জানে। দেখে যেনো কেউ হাসি মজাক না করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার নফর একটা নাপিত ডেকে আনলো। আপনারা, এখন ঐ যে লোকটা দেখছেন, এ সেই নাপিত—আমার জীবনের অভিশাপ।

ঘরে ঢুকেই সে আমাকে সালাম জানালো। আমিও জানালাম। তবে সে বললো, আল্লাহ আপনার সকল দুঃখ শোক কাটিয়ে দেবেন। আপনি আবার খুশিতে মেতে উঠবেন। আল্লাহ আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

আমি বললাম, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

নাপিতটা বলতে লাগলো, মালিক, আপনার জন্যে মস্ত একটা সুখবর এনেছি, দারুণ সুখবর। আর শুধু সুখবরই বা বলি কেন আপনার শরীর স্বাস্থ্য মন মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠবে এমন দাওয়াই। আপনি তো জানেন মালিক, আল্লাহর পয়গম্বর ইবন-আব্বাস বলে গেছেন, প্রতি জুম্মাবার নামাজের আগে যে ব্যক্তি ক্ষৌরকর্ম করে সারাটা সপ্তাহ তার খুব ভালোভাবে কাটে। সত্তরটা নানা ধরনের বিপদ-আপদ কাটাতে তার বেগ পেতে হয় না। তবে এও তিনি বলে গেছেন, জুম্মাবারে যে ব্যক্তির রক্তপাত হয়, নানারকম দুর্ঘটনা দুর্বিপাকে পড়ে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

আমি বিরক্ত হই। সক্কালবেলা জ্ঞান দিতে লাগলো লোকটা। এখন কী এসব ভালো লাগে আমার। বললাম, ওহে নাপিত কুলপতি এবার তোমার বচন থামাও। আমার মাথাটা এগিয়ে দিচ্ছি। একটু অনুগ্রহ করে ভালো ভাবে চুলটা ছেঁটে দাও। আমার তাড়া আছে, একটু জলদি করো।

নাপিতটা উঠে দাঁড়ালো। একটা কাপড়ে বাঁধা যন্ত্রপাতির বাণ্ডিল খুলে ধরলো। ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, শান, জলের খুরি, বুরুশ, সাবান ইত্যাদি। আমি ভাবলাম ও বুঝি ক্ষুর কাঁচি বের করছে। কিন্তু না ক্ষুরের বদলে বের করলো একখানা জ্যোতিষ দর্পণ। অদ্ভুত ধরনের দেখতে

সাতমুখওলা একখানা আর্শি। ঘর ছেড়ে প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালো। মাথার উপরে জ্যোতিষ দর্পণখানা তুলে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন করে করে কি সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করলো। তারপর এসে বললো শুনুন, আজ হিজরী সন সাতশো তেষট্টি সালের দশই শকর শুক্রবার। আজকের দিনে যে যে কামনা-বাসনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবে, সব মনোস্কামনা পূর্ণ করবেন তিনি। জ্যোতিষ শাস্ত্র আমার নখদর্পণে। মঙ্গল আর বৃহস্পতি একঘরে এসেছেন আজ। এখন সাতটা ছয় মিনিট। এই সময় ক্ষৌরকর্ম-এর পক্ষে উত্তম। শুধু বিধি সম্মতই না, এই সময়ে যে ব্যক্তি ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করে তার বহুদিন-আকাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট অচিরে সিদ্ধ হয়। জ্যোতিষ গণনায় আমি দেখতে পাচ্ছি, আজ আপনি কোন প্রিয়া-সন্নিধানে যাবার উদ্যোগ করছেন। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য, এই অভিসার আপনার পক্ষে ভালোও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। সেই রূপসীর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার পর কী কী ঘটনা ঘটবে আমি তা জানি, কিন্তু সে-সব কথা বলা আমার গুরুর বারণ আছে। তাতে আমার বিদ্যার অহঙ্কার প্রকাশ পাবে। সুতরাং ও ব্যাপারে এখন কিছু বলবো না।

আমি অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠি, দোহাই তোমার, একটুখানি চুপ কর। আমি তোমার বকবকানি শুনতে ডাকিনি। এখন দয়া করে চুলটা ছাঁটবে? আর একটাও বাণী ছাড়বে না। নাও, এসো।



নাপিতটা আহত হলো। আমার মাথার পাশে এগিয়ে এসে বললো, আপনার যেমন অভিরুচি তাই হবে মালিক। তবে একথা জেনে রাখুন, হুজুর, যদিও চুলদাড়ি কাটাই আমার পেশা এবং জাতেও আমি নাপিত, তবু জানবেন শুধু একটা নাপিতই আমি নই। জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার অগাধ পড়াশুনা আছে। এমন কোষ্ঠী বিচার করে দেবো, এমন নিখুঁতভাবে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে দেবো তাজ্জব হয়ে যাবেন আপনি। কতদূর দেশ থেকে আমার কাছে লোক আসে। আমাকে হাত দেখায়। কোষ্ঠী-বিচার করায়। আর শুধু জ্যোতিষ কেন, আমার মতো কবরেজ ক'টা আছে এই বাগদাদ শহরে। কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি আমি সারিয়ে দিই ধন্বন্তরী গাছগাছড়ার জড়িবড়ি দিয়ে। আর কাটা-ছেঁড়াতেই বা আমার জুড়ি কোথায়, কে আছে? এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল সাহিত্য কি না জানি আমি। সব বিদ্যা আহরণ করা হয়ে গেছে আমার। সেরা সেরা কাব্য গাঁথা আমর সব কণ্ঠস্থ। আমি আপনাকে কতকগুলো ভবিষ্যৎবাণী করে দেবো তার সবগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে। আমার গণনাও কখনও ভুল হয়নি। কখনও ভুল হয় না। আপনি আপনার একখানা ঠিকুজি কুষ্ঠী বানিয়ে নিন। তাতে আমি লিখে দেবো আপনার ভাগ্যলিপি। আপনি মিলিয়ে নেবেন অক্ষরে অক্ষরে। আমি আপনার ভালোর জন্যই বলছি, মালিক। আপনি ভাববেন না আমার অন্য কোন মতলব আছে। আমি আপনার কাছে কোন টাকা পয়সা চাই না শুধু চাই আপনি ঠিক পথে চালিত হোন। আপনার কল্যাণ হোক। আপনার বিপদ আপদ যাতে কেটে যায় সে জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে আপনাকে সৎ পরামর্শ দিতে চাই। যদি ইচ্ছা করেন সারা বছর ধরে আপনার কাছে প্রতিদিন এসে আপনার প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মর বিধান দিয়ে যেতে পারি। থাক, আর বেশী বাক্য ব্যয় করবো না। এবার আপনার ক্ষৌর কর্ম সম্পাদন করে দিচ্ছি। আপনি যদি চান প্রত্যহ এসে আপনার ক্ষৌরকর্মও

আমি করে দিয়ে যাবো। ভাববেন না কোন পারিশ্রমিক-এর লোভে একথা বলছি। একটা কানাকড়িও নেবো না এজন্যে।

এবার আমি আর ধৈর্য রাখতে পারি না।—তুমি কি আমাকে পাগল করে দেবে? মনে হচ্ছে তোমার ক্ষুরটা দিয়ে তোমার গলাটা আমি কেটে নামিয়ে দিই। হায় আল্লাহ, একি ফেরে পড়লাম আমি।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো, প্রভাত সমাসন্ন।

গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

ঊনত্রিশতম রজনী।

শাহরাজাদ কাহিনী শুরু করে ঃ

তারপর শুনুন জাঁহাপনা, সেই তরুণ খোঁড়া যখন নাপিতের বক্তৃতায় অধৈর্য হয়ে তাকে বললো, ক্ষুরটা দিয়ে তোমার গলাটা নামিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। নাপিত তখন বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললো, আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন, মালিক। কিন্তু একটা জায়গায় আপনি মস্ত ভুল করছেন। আপনার ধারণা আমি অহেতুক বেশী কথা বলি, কিন্তু মোটেও তা ঠিক না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথা আমার মুখ থেকে বেরুবে না। এজন্যে অনেকেই আমাকে মৌনমানুষ বলে বিদ্রূপ করেন। আমার আরও ছটি ভাই আছে। একবার যদি তাদের পাল্লায় পড়েন আপনি, প্রাণ আপনার অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাদের সবারই গুণের কথা আমি এক এক করে বলছি। বড়জনের নাম অল-বাকবুক—মানে ভরা কলসী থেকে জল ঢালার সময় যে শব্দ হয়। দ্বিতীয় জনের নাম অল-হাদ্‌দার অর্থাৎ উটের আওয়াজ। আর তৃতীয় জনের নাম বক্‌বক্—কথাটার অর্থ—মোরগের ডাক। চতুর্থ জন অল-কুজ-যুসবান—মানে কলসী ঠোকার শব্দ। পঞ্চম জনের নাম অল-আসার—তার মানে উট পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। আর ষষ্ঠ জনের নাম সাক-কাসিক—তার অর্থ হলো, গুগুলি ফাটানোর শব্দ। আর সপ্তম ব্যক্তির নাম সামিত—তার মানে হলো, মৌনব্রতী—এই অধম।

নাপিতের এই নতুন বক্তৃতা শুনতে শুনতে সারা শরীর গুলিয়ে গেলো আমার। আমি চিৎকার করে উঠলাম, এই, কে আছিস, এই নাপিতটাকে একটা সিকি দিনার দিয়ে এখান থেকে বিদেয় কর। আমি আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারছি না। আমার চুল ছাঁটার সাধ মিটে গেছে।

আমার কথা শুনে নাপিত বললো, মালিক, আপনার হয়তো ধারণা হচ্ছে আমি খুব অবান্তর কথাবার্তা বলে চলেছি। কিন্তু আদৌ তা ঠিক না। আমি নিজে তো বলিই না, অন্যে কেউ বললে তা সহ্যও করতে পারি না। আপনি গোড়াতেই মস্ত ভুল করেছেন। আপনার এখানে এসেছি আমি এক গভীর উদ্দেশ্যে নিয়ে। মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্যে। কোন অর্থের লোভে আসিনি। আমার দ্বারা আপনার যদি কোন উপকার হয়, নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। তাই বলে তার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করবো—সে আমি ভাবতেও পারি না। ছিঃ ছিঃ! আমি যখন আপনার কোন কাজেই আসিনি, তখন পারিশ্রমিক নেবো কিসের জন্যে? আপনি ভাবতে পারলেন কি করে সে কথা? এহেন অবস্থায় আপনার কাছ থেকে একটা কানাকড়িও যদি গ্রহণ করি মহাপাতকের কাজ হবে আমার পক্ষে। আল্লাহর দরবারে গিয়ে কী জবাবদিহি করবো আমি? না না, আপনি আমাকে কোনও পয়সাকড়ি নিতে হুকুম করবেন না। আমি ভেবে দুঃখ পাচ্ছি, আপনি আমার কদর বুঝতে পারলেন না। কিন্তু আপনি আমার মূল্য বুঝতে পারলেন না বলে আমিও যে আপনার মূল্যায়ন করতে পারবো না তা তো ঠিক না। আমি জানি, আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র। আপনার পিতার মতো উদার মহৎ ব্যক্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। তার মহত্বের কথা

যখন ভাবি, চোখে জল আটকে রাখতে পারি না। আহা, তিনি আমাকে কতো না স্নেহ করতেন! তিনি ছিলেন সত্যিকারের গুণী ব্যক্তি। গুণের কদর বুঝতেন। তার মতো বোদ্ধা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমার প্রকৃত মূল্য। একদিন তার কাছে এসে দেখি, দেশ-বিদেশের বহু আদর্শ ব্যক্তি তাকে ঘিরে আছেন। কিন্তু আমাকে দেখামাত্র সবাইকে ছেড়ে দিয়ে পাশে ডেকে বসালেন। বললেন, 'আমার বাঁ হাতে একটা ফোড়া উঠেছে। তা থেকে আজ আমার কিছু রক্তপাত ঘটেছে। দেখো তো হে, জ্যোতিষ, কোন অমঙ্গল হবে কিনা! তার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্যোতিষ দর্পণ বের করলাম। সূর্যের উচ্চতা মেপে দেখলাম। এবং গণনা করে জানতে পারলাম সে দিনে সেই সময়ে রক্তপাতে দারুণ অমঙ্গলের আশঙ্কা। মারাত্মক কোন বিপদের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক, আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি আপনার গ্রহ-শান্তি করে দেবো। আজ বেলা বারোটা বত্রিশ মিনিট একুশ সেকেণ্ড গতে আপনার ফোড়া কাটার প্রশস্ত সময়। ওই সময়ে কেটে পুঁজরক্ত সব বের করে দাওয়াই লাগিয়ে দেবো। আপনি নিরাময় হয়ে উঠবেন। তারপর উপযুক্ত সময় সমাগত হলে আল্লাহর নাম করে ফোড়াটায় ছুরি বসালাম। আমার অব্যর্থ অস্ত্রোপচারে ফোড়া সেরে গেলো। আপনার পিতা মহাখুশি হয়ে আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন।

নাপিতটা যখন তার নিজের গুণ-কীর্তনে খৈ ফোটাচ্ছে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না।—আমার বাবা আজ স্বর্গে গেছেন, তার মতো নিরাহঙ্কার নিরীহ বোকা-সোকা মানুষকে তুমি যে কি ভাবে জগ দিয়েছো তা বুঝতেই পারছি।

নাপিত বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে একটু করুণার হাসি হাসলো।—গেছে, এক্কেবারে গেছে। এই কাম-জ্বরে আপনার মাথার ইসকুরুপগুলো সব ঢিলে হয়ে গেছে, মালিক। আপনার কথাবার্তা কেমন সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। তা আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেবো। খোদার আশীর্বাদে সব বিদ্যা আমার নখদর্পণে। এখন শুধু একটা কথা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। স্বয়ং আল্লাহর বাণী। পবিত্র ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে ঃ 'অন্যের দোষ ক্ষমা করে, যে নিজের ক্রোধ সংযত রাখে, আল্লাহ তার সহায় থাকেন।' আল্লাহর এই বাণী প্রত্যেক নামাজের পর একশো আটবার জপ করবেন। দেখবেন, আপনার দিব্যজ্ঞান লাভ হবে। আপনি আমাকে যে সব কটূবাক্য বলেছেন সে জন্য আমার কাছে কোন ক্ষমা চাওয়ার দরকার নাই। কারণ, আমি নিজগুণে ওগুলো তখনই ভুলে গেছি। এ কান দিয়ে শুনে ওকান দিয়ে বের করে দিয়েছি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছে, মালিক। আজ আপনি এতো অধৈর্য উতলা হয়ে পড়েছেন কেন? এতো আপনার স্বভাবজাত নয়! আপনি জেনে রাখুন, আপনার প্রাজ্ঞ পিতা আমার উপদেশ ছাড়া কোন নতুন কাজে হাত দিতেন না। 'যে ব্যক্তি গুণীজনের উপদেশ গ্রহণ করে, তার কখনও কোনও বিপদ হয় না।'—খোদার এই বাণী সব সময় জপ-মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করবেন। দুনিয়াতে উপদেশ দেওয়ার লোকের অভাব নাই। কিন্তু উপদেশ দেবার যোগ্যতা ক'জনের আছে? আমি তো সারা দেশ চুঁড়ে একমাত্র আমাকে ছাড়া আর কোন যোগ্য ব্যক্তি পাইনি। এর অবশ্য কারণ আছে—আমার মতো সবজান্তা পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ মানুষ তো আর ঝুড়ি ঝুড়ি মেলে না। লাখে একটা—তাও দেখা যায় না। যাই হোক, আর কথা বাড়াবো না, বুঝতে পারছি, আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। এখুনি আপনি চিৎকার করে উঠবেন। কিন্তু আমাকে দেখুন, আমার কোন বিকার নাই। আমার ধৈর্য অসীম। আল্লাহ এই জিনিসটা আমাকে দরাজ হাতে ঢেলে দিয়েছেন। আমার কী দরকার ছিলো বলুন, আপনাকে এতো ভালো মূল্যবান উপদেশ দেবার? শুধু একটাই কারণ। সে হচ্ছে আপনার পিতা। তিনি আজ নাই। কিন্তু তাঁর কথা স্মরণ করে, আপনার প্রতি উপদেশবাণী দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব বলে মনে করি।

—উফ্, আল্লাহ, আমি অসহায়ের মতো কেঁদে ফেলি, একি অসহ্য অত্যাচার। আমি তোমাকে চুল ছাঁটতে ডেকে এনে মহা অপরাধ করেছি, এবার ক্ষমা দাও নাপিত প্রবর। তোমার অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমি ভক্ষণ করেছি। সোনারচাঁদ, এবার তুমি কেটে পড়ো বাবা। আর সোজা আঙ্গুলে যদি ঘি না ওঠে, তবে এই যে গামছা দেখছো, এটো তোমার গলায় দিয়ে...

রাগে দাঁত কড় মড় করে আমি লাফিয়ে উঠি। ইচ্ছে করে লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিই কিন্তু আমার মাথায় তখন সাবান জলের ফেনা।

কিন্তু সে ব্যাটা আমার এই রাগ উত্তেজনা, গ্রাহ্যই করলো না। তখনও একটানা বলে চলেছে, আমার মনে হচ্ছে, আপনি কিছু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেই কারণে আমার প্রতি ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করছেন। কিন্তু আমার মতো প্রবীণ প্রাজ্ঞব্যক্তির এ সব তুচ্ছ ব্যাপার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওসবে আমার কিছু এসে যায় না। আর তা ছাড়া মনে করার কী আছে? প্রেম-জ্বরে আপনার মাথা তো একটু গড়বড় হয়ে গেছে। ঐ ধরনের ভুলবকা স্বাভাবিক। যাই হোক আপনার এখন কাঁচা বয়স। ঠিক মতো চিকিৎসা করলে নির্ঘাৎ সেরে যাবে। এবং আমিই সারিয়ে দেবো। ছোটবেলায় আপনার সেই মাদ্রাসা যাওয়ার কথা মনে পড়ে, মালিক? আমি আপনাকে কাঁধে করে মাদ্রাসায় দিয়ে-নিয়ে আসতাম। আর আপনি আমার কাঁধ থেকে নেমে ছুটোছুটি করার জন্যে আমাকে এস্তার কিল চড় লাথি মারতেন। রাগে দাঁত কড়মড় করতেন। মনে আছে? আপনার আজকের চেহারা দেখে আমার সেইসব কথা মনে পড়ছে।

আমি এবার কাতর অনুনয় করে বললাম, তুমি আমার নাপিত সোনা ভাই, এবার আমাকে ক্ষান্তি দাও। আজ আমার একটা জরুরী কাজ আছে। এখুনি যেতে হবে। তোমার দু'খানা হাতে ধরে বলছি, আজকের দিনের মতো তুমি আমাকে রেহাই দাও। আর যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে...

এই বলে আমার গায়ের দামী শালখানা দু'ফালা করে ছিঁড়ে ফেললাম। রাগে চোখ দু'টো আমার ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিলো, লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর নাকটা কামড়ে দিই। সত্যি সত্যিই ও আমাকে পাগল করে দেবে।

লোকটা এবার একটু থমকে গেলো। এক মুহূর্ত। তারপর ক্ষুরটা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে, বাঁ হাতে আমার মাথাটা চেপে ধরে ক্ষুর চালাতে লাগলো। মাত্র কয়েকগাছি চুল কামানো হয়েছে। ক্ষুরটা তুলে ধরে বলতে লাগলো, 'শয়তান ভর না করলে অধৈর্য আসে না।'

কিন্তু এসব দর্শনের কথা আপনাকে শুনিয়ে কী লাভ? আমার ওপর আপনার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তাই আমি যা বলবো, আমি যা করবো সবই আপনার কাছে বিষবৎ মনে হবে। হতে বাধ্য। কারণ এও গভীর দর্শনেরই কথা।

আমি বলি, মাথাটা কামাবে তো কামাও। না হলে ছাড়ো। তোমার বকবকানীতে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেলো। এরকম যদি আর কিছুক্ষণ চালাও, আমি অক্কা পাবো। আর আমার যদি মৃত্যু ঘটে, তার জন্যে একমাত্র তুমিই দায়ী হবে, এই বলে রাখলাম।

নাপিত বললো, এবার বুঝলাম আপনার খুবই তাড়া আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—ভীষণ ভীষণ ভীষণ তাড়া আছে। তোমাকে তো সেই তখন থেকে হাজার বার বলছি—তাড়া আছে। তাড়াতাড়ি কামিয়ে দাও।

নাপিত বলতে থাকে, কিন্তু কে আপনাকে বলেছে, আপনার তাড়া আছে? তাড়াতাড়ি করার পরামর্শ কে দিয়েছে আপনাকে? সে কথা তো আমি বলবো! আমি বলে দেবো, তাড়াতাড়ি যেতে হবে কি হবে না? অহেতুক তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করা উচিৎ না, তাতে ক্ষতিই বেশী হয়। করলে পরিণামে অনুতাপ করতে হয়। আমাদের পীর মহম্মদ বলেছেন, 'তামাম

দুনিয়াতে যা কিছু সুন্দর দেখবে, তার সবই সমাধা হয়েছে খুব ধীর-মন্থর গতিতে' কিন্তু আপনি বলছেন, আপনার খুব তাড়া আছে। কি এমন আপনার কাজ—যার জন্যে তাড়াহুড়া করতে চাইছেন? আমি শুনলে আপনাকে সৎ উপদেশ দিতে পারবো। বলতে পারবো প্রকৃতপক্ষে তাড়াহুড়া করে সে-কাজ আপনার করার প্রয়োজন আছে কি নাই। আপনার মাথা কামানো বন্ধ রেখে আপনাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছি বলে গোঁসা করবেন না, মালিক। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, আর কয়েকঘণ্টা বাদে আপনার ভালো সময় আসছে।

এই বলে সে তার হাতের ক্ষুরটা নিচে নামিয়ে রাখলো। এবং সেই জ্যোতিষ-দর্পণখানা তুলে নিলো। আবার উঠানে গিয়ে সূর্যের দিকে মেলে ধরলো। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে কি ছাইপাশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকলো। আমার আর সহ্য হয় না। এ কি আপদ জুটেছে আমার ঘাড়ে! ওই বস্তুটার মধ্যে একটা চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো তো তাকিয়েই রইলো। কিন্তু আর একটা চোখ তার আমার দিকেই ছিলো। সূর্যের উচ্চতা মেপেটেপে আমার কাছে ফিরে এসে বললো, নাঃ, এখন তো আপনার কোন তাড়াহুড়ার কাম নাই। দুপুর বেলা নামাজের সময় আপনার কামের পক্ষে প্রশস্ত সময়। তার আগে তাড়াহুড়া করে কোন লাভ নাই, কত্তা। মাথাটা ঠাণ্ডা করে বসুন। এখনও পাক্কা তিন ঘণ্টা দেরি আছে। আমার গণনা অভ্রান্ত।

আমি বললাম, দোহাই তোমার, আর বক বক করো না। আমার গা গুলিয়ে যাচ্ছে। হয়তো এখুনি বমি করে দেবো।

নাপিত এবার তার ক্ষুর তুলে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। খুব আস্তে আস্তে অল্প একটু মাথা কামালো। বুঝলাম, ইচ্ছে করেই সে মন্থরগতিতে ক্ষুর চালাচ্ছে। একটুক্ষণ পরে আবার তার পাঁচালী শুরু হলো, আপনার অধৈর্য দেখে সত্যিই আমি দুঃখিত, সাহেব। আপনি যদি আমাকে সব খুলে বলতেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম। আমার কাছে কোন কিছু গোপন রাখা আপনার উচিৎ নয়, মালিক। আপনি তো জানেন, আপনার বাবা আমার পরামর্শের কতো মূল্য দিতেন?

লোকটার হাত থেকে নিস্তার পাবার আশা না দেখে বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হলো, আজ নামাজের সময় আমাকে পৌঁছতে হবে আমার মানসীর বাড়ি। নামাজ শেষ হওয়ার আগেই তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে কেটে আসতে হবে। না হলে। ওর বাবা বাড়ি এসে আমাকে দেখলে আর রক্ষা থাকবে না। তাই তোমার কাছে আমার মিনতি, একটু তাড়াতাড়ি কামিয়ে দাও। আর কথার ফুলঝুরিটা একটু থামাও। অহেতুক কৌতূহল একটু চেপে রাখো। আরও যদি জানতে চাও তো বলি, আমার এক বন্ধু আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। তার বাড়ি গিয়ে খানাপিনা সারতে হবে। তারপর সেখানে যাবো। সে-জন্যেও খানিক আগে বেরুতে হবে আমাকে।

—নি-ম-ন্ত্র-ণ! নাপিত যেন কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ করলো। —ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, মালিক। আমি তো এক্কেবারে ভুলে বসে আছি। আজ রাত্রে আমার বাসায় ক'জন বন্ধুকে খেতে বলেছি। কিন্তু এতোটা বেলা হলো, একেবারে ভুলে গেছি, বাজারহাট কিচ্ছু করা হয়নি। কি বে-ইজ্জতের ব্যাপার হবে বলুন তো?

আমি বললাম, কিচ্ছু ভাবনার নাই। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজ তো আমার নিমন্ত্রণ—আমি বাড়িতে খাবো না। কিন্তু রোজ যেমন খানাপিনা হয় আজও তেমনি সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। মাংস মদ প্রচুর আছে। তোমার যা দরকার এখান থেকে নিয়ে যেও। কিন্তু একটা কথা, আর একটুও দেরি করো না, নাপিত ভায়া। আমাকে তাড়াতাড়ি কামিয়ে ছেড়ে দাও।

—খোদা আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন, আপনি শতায়ু হবেন, মালিক। তা কি কি খানাপিনা তৈরি হচ্ছে, সাহেব? একটু চাখাবেন?

—পাঁচ রকমের খানা পাকানো হয়েছে। ডিমের আপেল, পায়রার দোপিয়াজী—তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে আঙ্গুরের পাতা আর লেবুর রস; মাংসের চাঁপ, সরু দাউদখানি চালের বিরিয়ানী—তার মধ্যে সরু সরু করে কাটা বিলাতী বেগুন, আর মাংসের বটি, ছোট ছোট পেঁয়াজের ঝোল। এছাড়া আছে দশটা তন্দুরী মুরগী—আর একটা ভেড়ার মাংসের কোর্মা। আর আছে দুই থালা ভর্তি হালুয়া, লাড্ডু, পেড়া। আরও আছে। মাখন, মধু, পনির। আপেল, আঙ্গুর, কলা, শশা, তরমুজ, ক্ষীরা।

টসটস করে জল গড়িয়ে পড়লো নাপিতের জিভ দিয়ে।—একটু চাখাবেন, মালিক?

বাবুর্চিকে ডেকে বললাম, আজকের খানা যা তৈরি আছে, নিয়ে এসো এখানে।

একটু একটু করে সব খাবারগুলো চেখে দেখলো নাপিত।—বাঃ, চমৎকার, এমন খানা অনেককাল খাইনি। তা সরাব কি রেখেছেন, মালিক?

—ছ'টা বড় বড় ঝুড়ি ভর্তি আছে নানাজাতের সরাব। আমি এখনও খেয়ে দেখিনি, তেমন। ওগুলোও তুমি সব নিয়ে যাও। আমি আবার পরে আনিয়ে নেবো।

নাপিত এবার গদ গদ হয়ে উঠলো, আপনার মতো এতো মহৎ এমন দিলদরিয়া মানুষ এক আপনার বাবাকে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। তা সাহেব, কিছু গোলাপজল, আতর, ধূপ, খানিকটা ফুল পেলে আরও ভালো ভাবে মেহেমানদের আপ্যায়ন করতে পারতাম।

আমি বললাম, ঠিক আছে, তাও দেবো, সব বাড়িতেই আছে। কিন্তু এখন আগে এসো তো, আমাকে কামিয়ে দাও। চাকরকে ডেকে বললাম, যে বাক্সটায় আতর, ধূপটুপ আছে ওটা এনে দে নাপিতকে।

চাকর নিয়ে এলো। নাপিত আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, ওরে বাস্, কি বাহারী বাক্স। তা নফরভায়া, বাক্সের ডালাটা একটু খোল তো, দেখি কি কি আছে?

আমার চাকরটা বাক্সের ডালা তুলে ধরলো। হাতের জ্যোতিষদর্পণ খানা পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে একটা একটা করে বাক্সের যাবতীয় জিনিসপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলো। আর আমি তখন আধকামানো মাথা নিয়ে অসহায় আহম্মকের মতো বসে রইলাম। উপায় নাই—পড়েছি ধূর্ত নাপিতের হাতে...আমি তখন নিজের বোকামীর জন্যে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছি। আর নাপিত ব্যাটা কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একটা করে জিনিস তুলছে আর নাকের কাছে ধরে আঘ্রাণ নিচ্ছে। এমন জোরে নিশ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকতে লাগলো, মনে হলো, নাক দিয়েই খেয়ে ফেলবে সব। আমার মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। এমন মানসিক অত্যাচারের চেয়ে কেউ যদি দু'ঘা ডাণ্ডার বাড়ি দিতো আমার মাথায়, তাও বুঝি এতোটা মারাত্মক হতো না।

অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে ক্ষুর হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো নাপিত প্রবর। এক যোজন লম্বা প্রশস্তি গাইলো আমার। তারপর মাথা কামাতে আরম্ভ করলো। একটুক্ষণ পরেই আবার তার কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠলো, খোদা হাফেজ, আজকের এই বদান্যতার জন্যে খালি আপনাকে সুক্রিয়া জানালে তো আমার কর্তব্য শেষ হয় না, মালিক। আসল ধন্যবাদ পাওয়া উচিত আপনার পিতার। তারই দৌলতে আজ আপনার এই বিপুল বৈভব। তাই তো আপনি দরাজ হাতে দান করতে পারলেন। তা হলে, আপনিই ভেবে দেখুন কত্তা, প্রকৃতপক্ষে ধন্যবাদটা কার পাওনা? সে যাই হোক, আজকের দিনে আপনি যে অনুগ্রহ করলেন তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। আমার নিমন্ত্রিত মেহেমানরা আজ চোব্য চোষ্য করে খেয়ে তৃপ্তি পাবে। তারা সবাই আমার মতো গরীব-সরীব মানুষ। এতো ভালো ভালো খানা-পিনা তাদের না খাওয়ালেও কেউ অখুশি হতো না। তা বলে মনে করবেন না, আমি তাদের খাটো করে দেখছি। তাদের প্রত্যেককে

আমি দারুণ ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। গরীব হলে কি হবে, মানুষ হিসাবে কেউ তারা ছোট না। তাদের নাম ধাম বললে হয়তো আপনি চিনতেও পারবেন। একজনের নাম জানতুত—ঝাড়ুদার মেথর। আরেকজন সিলাত—বাজারে মুরগীর মাংস বেচে। অন্য একজন সালিয়াহ গম-আটার দোকানদার। আরও একজন—তার নাম আকরাশাহ—সব্জী বিক্রি করে। হামিদ—ভিস্তিওলা আর গোয়ালা আবুমাকারিস।

স্বভাবতই সবাই আমার মতো মেকদারের মানুষ। এরা এতো ভালো খানা কল্পনা করবে কি করে মালিক? তবে লোক হিসাবে সবাই খাসা। আর আপনি জানেন, বাজে লোকের সঙ্গে আমি আলাপ রাখি না। এরা সবাই আমারই মতো—বড় সজ্জন। খুব কম কথা বলে। অহেতুক কোন কৌতূহল নাই। পর নিন্দা পরচর্চার ধার ধারে না। তবে হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলে মৌজ করে সরাব খেতে ভালোবাসে সবাই। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গায়, নাচে। ওদের নাচ গানের খ্যাতি সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়েছে। যদি কিছু মনে না করেন তবে ওদের দু-একটা নামকরা গান আপনাকে গেয়ে শোনাতে পারি। আর নাচও আমি মন্দ জানি না। গানের সঙ্গে নাচটাও তা হলে দেখুন একবার।

ঝাড়ুদার জানতুত যে গানটা গায় আর তার সঙ্গে যে নাচটা নাচে সেটা আগে দেখাই ঃ

ও আমার দরদিয়া বন্ধুরে
তোমার ঠ্যাং কেন খোঁড়া?
তোমার তরে বসে আছি
এসো বসো, মদ খাও থোড়া।

কোমরটা হেলিয়ে দুলিয়ে এক অদ্ভুত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে নাচের নামে কায়দা কসরৎ করতে লাগলো নাপিত। রাগও হয় হাসিও পায়। কিন্তু এখন তো ওকে চটালে চলবে না। যে কোন ভাবে আধ কামানো মাথাটা আমার শেষ করাতেই হবে।

কিন্তু সে তখন জানতুত ছেড়ে হামিদ-কে ধরেছে। হামিদের নাম করে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলো। গায়ে বিচুটি ঘসে দিলে যে ভাবে দাপাতে থাকে মানুষ, সেইভাবে দাপাতে লাগলো সে। আর মাঝে মাঝে আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তারিফ চাইতে লাগলো।—হামিদের নাচের এই আড়-খেমটা তাল আমি হুবহু রপ্ত করে ফেলেছি কত্তা। দেখুন, এক্কেবারে নিখাদ নিখুঁত।

আমি বললাম, হ্যাঁ খুঁত ধরতে পারবে তেমন সমঝদার আদমী সারা বাগদাদে খুঁজ পাওয়া যাবে না। খুব ভালো—চমৎকার। কিন্তু আরো ভালো আরও চমৎকার হবে, এবার যদি দয়া করে তুমি থামো।

নাচ না থামিয়ে নাপিত বলে, হামিদের গানটা শুনুন সাহেব। বড় মজাদার ঃ



আমার বিবি—কালো কুচ্ছিত কুত্তা,
খানা চাইলে মারে আমায় গোত্তা।
তবু তারে আদর করি, পায়ে ধরি,
বিবি বলে, পান খাবো, আনো আগে দোক্তা।

আমার কোন প্রতিবাদই কানে তুললো না সে। একের পর এক নাচ আর গানের তাণ্ডব চলতে লাগলো।

অনেক বাদে নাচ গান থামিয়ে সে এক প্রস্তাব পেশ করলো, আজ রাতে আপনি আমার বাসায় আসুন কত্তা। নাচ গান দেখবেন, খানা করবেন। দেখবেন, আপনার এতো দিনের জ্বরের দুর্বলতা কেটে যাবে। আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। মেজাজ শেরিফ হয়ে যাবে।

আমি বললাম, তোমার আমন্ত্রণের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আজ তো হবে না, নাপিতভায়া। আজ আমার অনেক কাজ। এর পরে একদিন তোমার বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবো।

নাপিত বললো, কাজ কাম সেরে না হয় একটু রাত করেই যাবেন। আমার বন্ধুদের নাচ গান দেখে আপনি ভীষণ আমোদ পাবেন। অতোগুলো গুণী লোক আজ এক জায়গায় হবে—

আমার তখন রাগে সারা শরীর জ্বলছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না ওর এই সব নচ্ছার-পনা। বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ অতোগুলো গুণী জ্ঞানী লোকের সমাগম হবে। সেখানে না গেলে তো জিন্দগীই বরবাদ হয়ে যাবে। ওসব ন্যাকাপনা রাখো তো। এবার তোমার কাম সারো, তারপর কেটে পড়ো। আর একটাও কথা তোমার শুনতে চাই না আমি।

নাপিত একটু দমে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে, কিন্তু আপনি নারাজ হচ্ছেন কেন সাহেব? শুধু একটুক্ষণের জন্যে আমার বাসায় আপনার পায়ের ধুলো দিতে অনুরোধ করছি। এইটুক অনুরোধ রাখতে পারেন না, মালিক! আপনি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কখনও মেশেননি তাই বুঝতে পারছেন না কী মজাদার মানুষ তারা। একবার যদি আলাপ করেন তো জীবনে আর ছাড়তে চাইবেন না। বার বার যেতে হবে তাদের কাছে।

আমি বলি, ঠিক আছে, একদিন তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করবো আমার বাড়ি। সেদিন খুব মৌজ করে খানাপিনা হবে। সে-দিনই আলাপ সালাপ করবো। আজ নয়, আজ আমার সময় হবে না।

নাপিত মাথা নেড়ে আমার কথার তারিফ করলো।—ভালো, খুব ভালো হবে মালিক। সেই ভালো হবে। তাহলে আপনি বসুন একটু। আমি আপনার দেওয়া এই খানপিনাগুলো বাড়িতে রেখে এক্ষুণি আসছি। আর আসার পথে আমার বন্ধুদের সুখবরটা দিয়ে আসি। আপনার বাড়িতে আপনি তাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন। এতো বড় সুখবরটা তাদের না শুনিয়ে আর থাকতে পারছি না। আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আমি যাবো আর আসবো।

আমি চিৎকার করে উঠি, আগে আমাকে কামিয়ে দাও। তারপর যেখানে খুশি যাও। কিন্তু আমাকে না কামিয়ে এক পা নড়তে পারবে না। আমাকে কামিয়ে দ্বিয়ে খানাপিনা নিয়ে বাড়ি যাও। তোমার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মৌজ-কর। আর আমি আমার কাজে যাই।

—কিন্তু মালিক আপনি একা একা যাবেন, সে তো হতে পারে না। আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, আমি যেখানে যাবো সেখানে আমাকে একাই যেতে হবে। অভিসারে কেউ সঙ্গী নিয়ে যায় না। আমার মানসীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো কি করে?

নাপিত বললো, কিন্তু আমার ভয় হয়, আপনার বিপদ আপদ হতে পারে। নতুন জায়গা, কিছু বলা তো যায় না। আমাকে সঙ্গে নিলে আপনার কোনও চিন্তার কিছু থাকবে না।

—না সে হয় না।

নাপিত বলে, আপনি বুঝতে পারছেন না, কত্তা। এই বাগদাদ শহরে এমন সব ফাঁদ আছে তার মধ্যে একবার ঢুকলে আর বেরুতে পারবেন না। নির্ঘাৎ মৃত্যু। আর বড় বড় ফাঁদগুলো মেয়েদের দিয়েই পেতে রাখে ওরা। আমাদের সুলতানের আবসাররা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়। কারুর কোন খেয়াল নাই, কোথায় কি ঘটছে। সব অপদার্থ নপুংশক।

আমি এবারে ক্ষেপে গেলাম।—ওসব বুজরুকি থামাও। আমার মাথাটা কামাবে কিনা বলো? না হলে ক্ষুর দিয়ে তোমার নাকটা কেটে দেবো এবং এক্ষুণি।

এই বলে হাতটা বাড়িয়ে ক্ষুরটা নিতে যাই। এই প্রথম দেখলাম সে চুপ করলো,

কাছে এগিয়ে এসে মাথায় ক্ষুর চালাতে লাগলো। মাথাটা যখন কামানো শেষ হলো, দেখলাম নামাজের সময় পার হয়ে গেছে। সুতরাং আমার মনের অবস্থা তখন বুঝতেই পারছেন। কিন্তু কী আর করা যাবে। চলে যাওয়া সময় তো আর ফেরানো যায় না।



আমি বললাম, খুব করেছো। এখন খাবারদাবার নিয়ে রওনা হও। আমার সব মাটি হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি ওগুলো রেখে ফিরে এসো। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

নাপিত বললো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মালিক, আমাকে বিদায় করার জন্যেই একথা বলছেন আপনি। আমি বেরিয়ে গেলেই আপনি টুক করে কেটে পড়বেন। কিন্তু তা করবেন না, সাহেব। আমি যতক্ষণ না ফিরি আপনি বাড়ি থেকে বেরুবেন না। তাতে অনেক বিপদ আপদ ঘটতে পারে। একা যদি চলে যান, আর যদি কোন বিপদ ঘটে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবেন না।

—ঠিক আছে, যাবো না, শুধু একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

আমি তার কাঁধে মাথায় তুলে দিলাম খাবারদাবার। কিন্তু বেচারী তার ভারে নুয়ে পড়লো। শেষে দু'জন কুলি ডেকে তাদের মাথায় চাপিয়ে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো নাপিত।

নাপিত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হামামে ঢুকে গোসল সেরে সেজেগুজে একাই বেরিয়ে পড়লাম আমি। একটু এগোতেই নামাজের আজান ভেসে এলো কানে। আমি রুদ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম। একটানা দ্রুত দৌড়ে এসে পৌঁছলাম সেই কাজীর বাড়ির দরজায়। দরজা খোলাই ছিলো। আমি একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিলাম ভেতরটা। তার পর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সেই বৃদ্ধা ভিতরে অপেক্ষা করছিলো। আমাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে গেলো।

কিন্তু কিসের যেন সোরগোল কানে এলো। আমি যখন দৌড়তে দৌড়তে আসি সেই সময় রাস্তার আশে পাশের অনেক লোক হাঁ করে আমাকে লক্ষ্য করছিলো। তাদের অনেকেরই ধারণা হতে পারে আমি কোন ছিনতাই চোর। মনে হলো কয়েকজন আমার পিছু ধাওয়া করে আসছিলো। এখন কাজী সাহেবের বাড়িতে ঢুকে পড়ায় তারা বোধ হয় নিশ্চিত হয়ে গেছে—আমি চোর ছাড়া আর কেউ নই।

ক্রমশই গোলমাল বাড়তে থাকলো। বেশ বুঝতে পারলাম, কাজীসাহেবের বাড়ির অন্ধ গলিটার মুখে অনেক লোকের জটলা হচ্ছে। কেউ বলছে, চোরটা কাজীসাহেবের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কেউ বলছে, না, পালিয়েছে। এমন সময় কাজীসাহেব স্বয়ং এসে হাজির হলেন। এই সময়ে এতো লোকের ভীড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে।

আমি আর আমার মানসী জানলার ফুটোয় চোখ রেখে দেখলাম কাজীসাহেব খচ্চরের পিঠ থেকে নামলেন। তার সঙ্গে জনাদশেক নিগ্রো প্রহরী। আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেই ব্যাটা নাপিত।

কাজী সাহেবের কথার কেউ জবাব দেয় না। ক্রমশ ভীড় বাড়তে থাকে। আমি দেখলাম, কাজী সাহেব এসে বাড়ি ঢুকলেন। আর আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কাজী সাহেবের মেয়ে বললেন, তোমার কোন ভয় নাই, আব্বাজান আমার ঘরে কদাচিৎ আসেন। আর যদি আসেনও, তোমাকে লুকিয়ে রাখার এখানে অনেক জায়গা আছে।

নাপিতটা যখন বুঝতে পারলো কাজীর বাড়ির অন্দরে আমি ঢুকে পড়েছি সে তখন চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। নিজের জামা কাপড় ছিঁড়েখুঁড়ে চিৎকার করতে লাগলো।

—ওগো, কে আছো, তোমরা, আমার মালিককে বাঁচাও। কাজীসাহেব তাকে মেরে ফেললো।

ক্রমশই রাস্তার লোক আরও বেশী ভিড় জমাতে থাকে। একজন প্রশ্ন করে, কী, কী হয়েছে?

নাপিত তখন হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।—আমার মালিক কাজীর বাড়ি ঢুকেছে। কাজী তাকে বেদম মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছে। আমার মনে হচ্ছে এতক্ষণে সে আর বেঁচে নাই। তোমরা সবাই এসো ভাই, আমার মালিককে উদ্ধার করে দাও।

—কিন্তু তোমার মালিককে কাজী সাহেব মারবেন কেন? কী করেছেন তিনি?

কিন্তু সে কথার জবাব দিলো না নাপিত। ইনিয়ে বিনিয়ে সেই একই কথা, তোমরা সবাই মিলে চলো, কাজীর কাছে যাই। জবাব দিতে হবে তাকে,কেন সে মেরে ফেলেছে আমার মালিককে?

তখন জনতা বিক্ষুব্ধ। তাই তো, একটা মানুষকে মারতে মারতে মেরেই ফেলেছে একেবারে। কী অন্যায় কথা। কাজী হয়েছে বলে কি হাতে মাথা কাটবে নাকি? এসো, সবাই মিলে কাজীর কাছে যাই। এর জবাব চাই আমরা।

হুড়পাড় করে জনতা কাজীর দরজার সামনে এসে চিৎকার করতে লাগলো।—কই, কে আছো দরজা খোল। দরজা খোল, খোল বলছি, না হলে তুড়ে দেবো।

দমাদম ইঁট পাটকেল লাঠি ডাণ্ডা পড়তে লাগলো দরজার ওপর। কাজী সাহেব হতবাক। একি অদ্ভুত সব কাণ্ড। নামাজের আগেও তিনি দেখে গেছেন, সব ঠিক ছিলো। হঠাৎ এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসব কি ব্যাপার? দরজার দিকে এগিয়ে যান তিনি। নিগ্রো পাহারাদাররা বাধা দেয়, সাহেব দরজা খুলবেন না। ওরা হয়তো আপনার ওপরেই চড়াও হবে।

—আমার ওপর চড়াও হবে? কেন, আমার অপরাধ?

—সে বিচার তো জনতার মানুষ করে না। আগে তারা হাতের সুখ মেটায়। আফশোষ করতে হয় পরে করে।

কাজী সাহেব বললেন, সে যাই হোক, দরজা খুলে দাও। ওরা কি বলতে চায়, আমি শুনবো।

একটা নিগ্রো নফর দরজা খুলে দেয়। কাজী সাহেব দেখলেন সারা গলিটা লোকে লোকারণ্য। এমন হৈ হল্লা—কে যে কি বলতে চায় কিছুই বোঝা যায় না। কাজী সাহেব বললেন, তোমরা শান্ত হও। একজন এসে বলো, কী তোমাদের বক্তব্য?

নাপিত এগিয়ে গেলো। বললো, আপনি আমার মালিককে মেরে ফেলেছেন কেন তার জবাব চাই।

—কে তোমার মালিক। আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আর কেনই বা তাকে আমি মেরে ফেলবো। কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

—তা বুঝতে পারবেন কেন? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন, এদিকে যে সব ফাঁক হয়ে গেলো সে দিকে তো আর হুস ছিলো না কাজী সাহেবের।

এক নিচুতলার মানুষের মুখে এ ধরনের অশালীন উক্তি শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কাজী সাহেব।

—ওসব বুজরুকী রাখো। সভ্য ভব্য ভাবে কথা বলো। ভুলে যেও না কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো।

নাপিত তখন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বললো, না না, তা আর ভুলবো কি করে? আমরা যে মহামান্য কাজীসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সে কথা কি ভুলতে পারি?

কাজী সাহেব দেখলেন, জনতা ফুঁসছে। তিনি একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে অপেক্ষাকৃত নিম্ন গলায় প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মালিকটি কে? আমার বাড়িতে তার কী প্রয়োজন?

নাপিত এবার বিদ্রূপের ঢং-এ জবাব দেয়, আহা ন্যাকা, দেশসুদ্ধ লোক জানে, আপনার মেয়ের সঙ্গে সে মহব্বৎ করছে, আর আপনি জানেন না? আপনার বাড়িতে সে ফি দিন আসে। আপনার মেয়ের সঙ্গে রাত কাটায়। তারপর আপনাকে কলা দেখিয়ে আপনারই নাকের ডগা দিয়ে পার হয়ে যায়। আপনি বলতে চান, এ সবের আপনি কিছুই জানতেন না? আর যদি জানতেনই, তবে গোড়া থেকে তা বন্ধ করেন নি কেন? কেন আগে নিজের মেয়েকে শাসন করেন নি? পরের ছেলের গায়ে হাত তোলা খুবই সোজা, না? কাজী হয়েছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আমাদের মালিককে মারার মজা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে আসুন, চলুন আপনাকে যেতে হবে খলিফার কাছে। আপনার বিচার তিনিই করবেন।

কাজী সাহেব লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারেন না। ছি ছি মান-ইজ্জত সব গেলো। মেয়ের চরিত্র নিয়ে কি জঘন্য সব কথা শুনতে হলো তাকে। কিন্তু সব মিথ্যা—মিথ্যা। তার মেয়েকে সে খুব ভালো করেই জানে,এরকম সে কিছুতেই হতে পারে না। আর তাছাড়া তার বাড়িতে ঢোকার একটাই দরজা। সে দরজায় কড়া পাহারা থাকে।

নাপিতকে বললেন, খলিফার কাছে যাওয়ার আগে একবার আমার বাড়িটা ভালো করে খুঁজে পেতে দেখে নাও তোমরা। কোথাও তোমাদের মালিকের লাশটাস পাও কিনা।

এবার আমি প্রমাদ গুণলাম। এখুনি উঠে আসবে তারা। তারপর আমার যে কি দশা হবে—আর ভাবতে পারলাম না। কাজীসাহেবের মেয়ে আমাকে অভয় দিতে লাগলো। কিচ্ছু ভয় নাই। তোমাকে আমি ঐ বাক্সটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছি। ওর মধ্যে চুপটি করে বসে থাকো। ওরা এলেও খুঁজে পাবে না তোমাকে।

উপায়ন্তর না দেখে ঘরের এক পাশে রাখা সেই কাঠের বাক্সটার মধ্যেই ঢুকে বসে পড়লাম। ডালাটা সে বন্ধ করে দিলো।

হুড়মুড় করে জনতার পঙ্গপাল ঢুকে পড়লো বাড়ির অন্দরে। এঘর ওঘর আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলো সকলে। বুঝতে পারলাম, উপরে আমাদের ঘরেও ঢুকেছে কিছু লোক। নাপিতের গলা শোনা গেলো। কাজীসাহেবের মেয়েকে প্রশ্ন করছে, এঘরে আর কে আছে?



—আর আবার কে থাকবে? আমি একাই থাকি, একাই আছি।

—কেন তোমার পেয়ারের নাগর? সে আসেনি?

—না। কেউ আসেনি আমার ঘরে।

মেয়েটির কথা শুনে অন্য সবাই বেরিয়ে গেলো। কিন্তু ধূর্ত নাপিত ঘরের এদিক ওদিক উঁকিঝুকি দিয়ে খুঁজতে থাকলো। এক সময় আমার বাক্সের পাশে দাঁড়ালো। আমার তখন ধড়ে আর প্রাণ নাই। ডালাটা একটু তুলে ধরলো সে। আমার চোখে চোখ পড়তেই আবার বন্ধ করে দিলো। বুঝতে পারলাম, বাক্সটা কাঁধে তুলে নিলো সে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে একেবারে বড় রাস্তায় এসে ধপাস করে ফেলে দিলো। আমার তখন প্রাণ যায় যায়। বাক্সের ডালাটা মাথায় ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েই টপকে বেরিয়ে পড়ি। আর এই বাক্সটা থেকে বেরুতে গিয়ে উল্টে পড়ে যাই, রাস্তায়। সেই সময় আমার এই পায়ে ভীষণ চোট লাগে। তার ফলেই আজ আমি ল্যাংড়া।

সে-যাই হোক, রাস্তায় পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়িয়েই জেবে যা ছিলো মুঠো করে বের করে রাস্তায় ছুঁড়ে দিলাম। কিছু লোক হুমড়ি খেয়ে পড়লো সেই পয়সাকড়ির লোভে। আর কিছু মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো তখন। আমি পড়ে যাওয়ায় অনেকেই করুণা পরবশ হয়ে আমাকে ধরে তুলতে এগিয়ে এসেছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে চোঁ দৌড় দিতেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারা।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

ত্রিশতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার তার কাহিনী শুরু করে ঃ

তারপর শাহজাদা শুনুন, সেই দর্জি তার গল্প বলে চলেছে।

তখন সেই তরুণ ল্যাংড়া আমাদের উৎসবের আসরে তার জীবনের সবচেয়ে করুণ কাহিনী বলছে, আর আমরা উপস্থিত অভ্যাগতরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছি ঃ

আমি বাক্স থেকে বেরুতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেলাম। সেই পড়াতেই এমন চোট লাগলো—যার ফলে আজ আমার এই দশা। পা-টাই জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেলো।

যাই হোক, জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই আমি আমার জেবের টাকা পয়সা রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাতে থাকলাম। পিছনে শুনতে পেলাম সেই নাপিতের কণ্ঠস্বর। শুনুন ভাই সাব, আর কোন ভয় নাই, আমার মালিককে পেয়ে গেছি। যাক, আল্লার মর্জিতে তিনি বেঁচে গেছেন।

—কিন্তু বাক্সের মধ্যে ঢুকেছিলো কেন সে?

জনতার প্রশ্ন। নাপিত বললো, আমরা চেঁচামেচি চিৎকার করাতে কাজীর লোকজন আর তাকে সাবাড় করতে পারেনি। এই বাক্সটার মধ্যে পুরে রেখেছিলো। আমরা না ঢুকলে, বাক্সটা না আনতে পারলে, পরে নির্ঘাৎ কোতল করতো তাকে। যাক বাবা, জানে বেঁচে গেছে। আমি ভাবছি, আমার এই উপস্থিত বুদ্ধি না থাকলে আজ কি সর্বনাশই না হতো।

আমি তখন একটানা দৌড়ে চলেছি। প্রাণ ভয়ে। কিন্তু নাপিত আমার পিছু ছাড়ে না। সে-ও দৌড়াতে দৌড়াতে আসতে থাকে। তারঃস্বরে চিৎকার শুনতে পাই।—ও সাহেব, শুনুন, থামুন। আজ আমি না থাকলে ওরা আপনাকে আস্ত কবর দিয়ে দিতো। আপনাকে তখনই উপদেশ দিয়েছিলাম, আমাকে না নিয়ে কোথাও বেরুবেন না, তা আমার কথা শুনলেন না বলেই আপনার এই দশা হলো। তাও আপনার ভাগ্য ভালো সময় মতো আমি এসে পড়েছিলাম। তাই প্রাণটা বাঁচাতে পেরেছি। না হলে আজ আপনার বাঁচার কোন পথ ছিলো না। সেই জন্যেই বলি আমার কথা মেনে চলবেন আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনার বাবা কখনও আমার উপদেশ ছাড়া কোন কাজে পা বাড়াতেন না। কিন্তু আপনি এইভাবে দৌড়াচ্ছেন কেন? এখন আর কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। আপনি দাঁড়ান, আমার কথা শুনুন।

আমি একটুক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম। নাপিত আরো নিকটতর হলে বললাম, আল্লাহর দোহাই, তুমি আমাকে রেহাই দাও। তোমার জন্যেই আমার পাটা গেছে। এবার কি আমাকে জানেও মারতে চাও।

আবার দৌড়াতে লাগলাম। এগলি ওগলি দিয়ে এঁকে বেঁকে শেষে বাজারের কাছে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম। এই দোকানের মালিক আমার

বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোক। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। যখন বাবা বেঁচেছিলো। আমাকে খুব স্নেহ করেন।

সারা শরীর ঘামে নেয়ে গেছে। শুধু হাঁপাচ্ছি আমি। দোকানের মালিক আমার এই অবস্থা দেখে অবাক হলেন। উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে, বাপজান, এমন করে হাঁপাচ্ছো কেন?

আমি বললাম, বলবো, সব বলবো আপনাকে। আগে আমাকে দোকানের ভিতরে একটুক্ষণ লুকিয়ে রাখুন। না হলে ও ব্যাটা এখুনি এসে ধরে ফেলবে আমাকে।

দোকানী বললো, কী বলছো সব? কে তোমাকে ধরে ফেলবে? কী করেছো তার? এসো, ভেতরে এসো।

আমি তখন আগাগোড়া সব ঘটনা খুলে বললাম তাকে। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, তোমার কোন ভয় নাই, আমার দোকানের ভেতর ঢুকতে পারবে না সে। আর তোমার পা যতদিন না ঠিক হচ্ছে তুমি এখানেই থেকো। আমি দাওয়াইপত্র ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব। তোমার বাবা আমার প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তোমার কোনও অনাদর অযত্ন হবে না, বাবা।

আমি ওখানেই রয়ে গেলাম কয়েক দিন। পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে গেলো। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলাম। হেকিম এলো। দাওয়াই দিলো। ফোলা ব্যথাও কমলো একদিন। কিন্তু পা-টা একেবারে ঠিক হলো না। এখনও মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাফেরা করি।

এই ঘটনার পর এই নাপিত সম্পর্কে দারুণ এক আতঙ্ক আর ঘৃণা হলো মনে। লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। শয়তানের অসাধ্য কিছুই নাই। তাই ঠিক করলাম, দেশান্তরী হবো। যে-দেশে এই দুষ্ট নাপিত বাস করছে সে-দেশের ধারে কাছেও থাকবো না। ব্যবসা বাণিজ্য ছোট করে বেচে দিলাম অনেকখানি। বাকী যা রইলো, আমার এক বন্ধুকে দেখাশোনার ভার দিয়ে একদিন বিদেশ যাত্রা করলাম। ঠিক করলাম, এই বাগদাদ ছাড়িয়ে এমন এক দূর দেশে চলে যাবো, যেখানে অন্তত এই নাপিতের মুখদর্শন করতে হবে না। আল্লাহর কাছে ওর সর্বনাশ প্রার্থনা করেছি। নাপিত আমার যে সর্বনাশ করেছে তার প্রতিফল যেনো সে পায়। সবংশে নির্বংশ হয় যেনো।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, দুর্গম গিরি, কান্তার মরু আর দুস্তর পারাবার পেরিয়ে চলে এলাম আপনাদের মুলুকে—এই চীন দেশে, ভাবলাম চিরদিনের মতো অব্যাহতি পেলাম সেই অপয়া ধূর্ত শয়তান নাপিতের হাত থেকে; কিন্তু হায় আল্লাহ, এখানে এসেও তার মুখই আমাকে দেখতে হলো আজ! আর এক মুহূর্ত আমি অপেক্ষা করবো না এখানে, আপনাদের এই দেশে। একদিন যেমন আমার নিজের দেশ পরিত্যাগ করে আপনাদের দেশের পথে পা বাড়িয়েছিলাম তেমনি আজ আবার আপনাদের দেশ ত্যাগ করে অন্য কোনও অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো।

এই কথা বলে আর ক্ষণ-মাত্র অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে।

আমরা সবাই তখন সেই নাপিতের দিকে ফিরে চাইলাম। মুখ নামিয়ে চুপ করে বসেছিলো সে। আমাদের একজন প্রশ্ন করলো, ছেলেটি যা বলে গেলো তা কি সত্যি? আর যদি সত্যি হয় তাহলে জিজ্ঞেস করি, এমন সর্বনাশ তার কেন করেছিলে, বাপু? এইভাবে তার জিন্দেগীটা বরবাদ করে দিয়ে তোমার লাভ কি হয়েছে?

নাপিত এবার সোচ্চার হয়ে উঠলো।—আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি তার ভালো বই মন্দ ভাবিনি কখনও। আমার কথা যদি সে শুনতো, তার এই দশা হতো না কখনও। আর এ-ও ঠিক, একটা পা-এর ওপর দিয়ে রক্ষা পেয়ে গেছে। আমি সেদিন না থাকলে, আমার উপস্থিত বুদ্ধি খরচ না করলে জানে মারা যেতো সে। এ জন্যে তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। তা না, সে

আমাকে শাপ-শাপান্ত করে গেলো। আল্লাহ ওপরে আছেন, তার চোখ ফাঁকী দেওয়া যায় না। তিনি সবই দেখেছেন।

আপনারা এখানে সবাই গুণীজন উপস্থিত আছেন। আপনারাই বলুন, আমি কি বাজে বকবক করি? না, এতক্ষণ বসে আছি, শুনেছেন তেমন কোনও কথা? আমি আজে বাজে অবান্তর কথাও বলি না, অবিবেচকের কাজও করি না কিছু। হ্যাঁ, তা যদি বলেন, সে ব্যাপারে ওস্তাদ আমার ছয় ভাই। আমি আমার নিজের কথা প্রথমে বলছি, তারপরে বলবো আমরা ছয় ভাই-এর কাহিনী। আপনারাই বিচার করে দেখবেন, আমি কতো জ্ঞানী, উদার বিচক্ষণ এবং সাবধানী। সবচেয়ে বড় কথা, আমি যে কতো মিতবাক, সেটা আপনারা এক্ষুণি প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

দর্জি বলতে থাকে, আমরা সবাই সাগ্রহে চুপ করে বসে রইলাম, আর নাপিত তার কাহিনী শুরু করলো।

আপনারা তো শুনেছেন, আমি বাগদাদের অধিবাসী। আমি যখন বাগদাদ পরিত্যাগ করে আসি তখন বাগদাদের সুলতান ছিলেন অল-মুসতানসির বিল্লাহ। খুব ধার্মিক বাদশাহ।

তার সলতানিয়তে কখনও কোন অনাচার অবিচার ছিলো না। সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতো। সুলতান সবাইকে, বিশেষ করে গরীব-দুঃখীদের বড় ভালোবাসতেন। জ্ঞানী গুণীর সমাদর করতেন খুব।

একদিন খলিফা খবর পেলেন, শহরের কাছেই দশজন সমাজ-বিরোধী খুনী ছেনতাই-এর আস্তানা আছে। মাঝে মাঝেই তারা হানা দিয়ে গৃহস্থ মানুষের ধনসম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। সুলতান তার ছোটা সুবাদারকে বললেন, আমার দেশে এই সব রাহাজানী এ আমি বরদাস্ত করবো না। যেমন করেই হোক তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসো।

একদিন বিকালবেলা টাইগ্রীসের উপকূলে বেড়াতে বেরিয়েছি। দেখি, একটা ছোট নৌকায় দশজন লোক চেপেছে। নৌকাটা ছাড়বে বলে নোঙর তুলছে। আমি ভাবলাম, এরা সবাই সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছে। আমিও সঙ্গী হই তাদের। আপনারা জানেন, আমি খুব অল্প কথার মানুষ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও মুখে আসে না। সেই কারণে, তাদের কাছে কোনও অনুমতিও চাইলাম না। অহেতুক কথা বাড়বে। সোজা গিয়ে উঠে বসলাম নৌকায়। নোঙর ততক্ষণ তোলা হয়ে গেছে। এমন সময় একদল সিপাই এসে ঘিরে ফেললো নদীর পাড়। সঙ্গে স্বয়ং দারোগা সাহেব। তার হুকুমে আমাদের সবাই-এর হাতে হাত কড়া, পায়ে বেড়ি পরানো হলো। গলায় শিকল বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেলো সোজা সুলতানের দরবারে। সারাটা পথ কেউ কারো সঙ্গে একটি কথাও বললো না। আর আমার কথা তো স্বতন্ত্র। আমি তো প্রয়োজনেই কারো সঙ্গে কথা বলি না। তা আবার ওদের সঙ্গে কি খোশ গল্প করবো?

আমাদের দেখা মাত্র খলিফা জল্লাদকে হুকুম করলেন, এক্ষুণি এই খুনী বদমাইশ দশজনের গর্দান নাও। সুলতানের সামনে আমাদের সবাইকে হাঁটুগেড়ে বসতে বললো জল্লাদ। আমরা সুবোধ বালকের মতো হাঁটু গেড়ে বসে গলা বাড়িয়ে দিলাম। জল্লাদ তখন তার ফিনফিনে পাতলা তরবারী দিয়ে এক কোপে এক একজনের মুণ্ডু কেটে নামিয়ে দিলো। এইভাবে দশজনের মাথা মাটিতে পড়ে গেলো। বাকী রইলাম আমি। আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন, সুতরাং সুলতান আর কি করে মারবেন। তা না হলে সারির সব শেষেই বা আমাকে দাঁড় করাবে কেন? যাই হোক, দশজনের ধড় মুণ্ডু আলাদা করার পর জল্লাদ তরবারী রেখে দিলো। আমি অবাক। অবাক সকলেই। সুলতান অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ওকে বাদ দিলে কেন?

—জী হুজুর, আপনার যেমন হুকুম তাই করেছি।

—আমি তো তোমাকে সবারই গর্দান নিতে বললাম। তা ওকে বাদ দিলে কেন?

—নফরের গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, আপনি দশজনের জান নিতে বলেছেন, আমি তামিল করেছি। আপনি গুণে দেখুন, হুজুর, দশটা কাল্লা আছে কিনা।

সুলতান এবং সবাই গুণে দেখলেন, হ্যাঁ জল্লাদ ঠিকই বলেছে। হুকুম হয়েছিলো দশজনের প্রাণদণ্ড। দশজনকেই কোতল করেছে সে।

সুলতান বিস্ময় প্রকাশ করলেন।—তবে? তবে এ লোকটা কে? কোথা থেকে এলো সে। এই, এদিকে সামনে এসে দাঁড়াও। কে তুমি? এই খুনী ডাকাতদের দলে এলে কি করে?

আমার স্বভাব কম কথা বলা। তাই এতক্ষণ চুপ করেছিলাম। এবার সুলতান যখন জিজ্ঞেস করলেন, বাধ্য হয়ে তখন আমাকে মুখ খুলতেই হলো। বললাম, ধর্মাবতার, আমি খুব কম কথা বলি বলে লোকে আমাকে সীমিত বলে ডাকে। আপনি যখন আপনার জল্লাদকে হুকুম করলেন 'এই দশজনের গর্দান নাও' আমি তখন জানতাম আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু যেহেতু আমি মৌনব্রতী মানুষ, সেই জন্যে আপনি ভুল করছেন জেনেও আমি কোন বাক্য উচ্চারণ করতে পারিনি। কারণ বিনা প্রয়োজনে অহেতুক কথা বলা আমার স্বভাব নয়। আর শুধু কম-কথা বলাই না, আমার আরও বড় গুণ অযথা অন্যের ব্যাপারে কখনও নাক গলাই না। আমার প্রগাঢ় জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসায় সবাই পঞ্চ-মুখ। আমার জাত ব্যবসা ক্ষৌরকর্ম করা। আমরা সাত ভাই। এবার এখানে এদের সঙ্গে কি করে এলাম, সে-কথা বলি। আজ বিকালে নদীর ধারে বেড়াবো বলে টাইগ্রীসের উপকূলে গিয়েছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম এই দশজন একটা ছোট নৌকায় চেপেছে। নৌকাটা ছাড়বো ছাড়বো করছে এমন সময় আমি ঠিক করলাম ওদের সঙ্গে নৌকা বিহারে যাবো। আমি নৌকাতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার লোকজন আমাদের গ্রেপ্তার করে ফেলে। আমি তখন বুঝলাম লোকগুলো ডাকাত। কিন্তু যেহেতু আমি মৌনব্রতী মানুষ সেই কারণে আপনার লোকজনদের বা আপনাকে আমি কোন কথা বলিনি। আমি যে নিরপরাধ, নির্দোষ—তা প্রমাণ করার কোনও চেষ্টা করিনি। সারাটা পথ কারো সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বলিনি। সেই কারণে আমার সঙ্গে যে আর কারা গ্রেপ্তার হয়েছিলো, কী তাদের পরিচয় কিছুই জানি না।

এইভাবে আমি আপনার দরবারে এসে পড়েছি। আপনার জল্লাদকে যখন হুকুম করলেন গর্দান নিতে, তখনও আমি আমার অসীম ধৈর্য এবং সাহসের পরিচয় দিয়ে চুপ করেছিলাম। আমার মতো সৎসাহসী এবং ধৈর্যবান ব্যক্তি আপনি খুব বেশী পাবেন না, হুজুর। এবং আমি জানতাম আমার সততা, আমার সহনশীলতা, আমার অসম-সাহসিকতা এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি আমাকে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করে দেবে।

সুলতান আমার কথায় প্রসন্ন হলেন। এবং দরবার কক্ষে সর্বসমক্ষে আমার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।—তোমার মতো মিতবাক, বিদ্বান, বিচক্ষণ পরোপকারী, নির্ভীক সাহসী ব্যক্তি বিরল।

অথচ একটু আগে, নাপিত বলতে থাকে, আপনারা শুনলেন সেই ল্যাংড়া যুবক আমার নামে কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে গেলো। আমি নাকি বাজে বকবক করি। আমি নাকি তার পা-খানা ল্যাংড়া করার একমাত্র গোঁসাই।

সুলতান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, প্রাজ্ঞ সেখ নাপিত প্রবর, তুমি তো বললে, তোমার আরও ছয় ভাই বর্তমান। তা তারা সবাই কেমন? তোমারই মতো স্বল্পভাষী, বিচক্ষণ জ্ঞানীগুণী তারা?

—না, না, হুজুর, আমি বললাম, একদম না। তারা সবাই আমার থেকে এক্কেবারে আলাদা। আশমান জমিন ফারাক। তাদের সঙ্গে তুলনা করে আপনি আমাকে খাটো করলেন,

জাঁহাপনা। তাদের অবিবেচকের মতো আনতাবড়া কথা বলা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, কাপুরুষতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা সর্বজন বিদিত। তাদের মতো চরিত্রহীন হীনমন্য, পরছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর জঘন্য মানুষ খুব বেশী পাওয়া যায় না। দেখতে বেঁটে বামন। আমার চেহারা দেখছেন হুজুর, কেমন লম্বা চওড়া জাঁদরেল, কিন্তু ওরা একজন খোঁড়া, একজন কানা, একজনের মুখ পোড়া, আর একজন একেবারেই অন্ধ, আমার পঞ্চ ভ্রাতার নাকটা নাই আর ষষ্ঠজন কানে শুনতে পায় না।



আপনি ভাববেন না, জাঁহাপনা, এতোটুকু বাড়িয়ে বলছি আমি। এক এক করে তাদের গুণের কথা সব বলছি আপনাকে, শুনলেই বুঝবেন ওদের সঙ্গে আমার কতো ফারাক।

নাপিতের প্রথম ভাই বাকবুকের কাহিনী ঃ

আপনি তো শুনেছেন, জাঁহাপনা, আমার বড় ভাই বাকবুক ল্যাংড়া। তাকে সবাই বাকবুক বলে ডাকে, তার কারণ—সব সময় মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের করে—ঠিক যেনো মনে হয়, ভরা কুঁজো থেকে জল ঢালা হচ্ছে।

এক সময়ে বাগদাদ শহরে দর্জির কাজ করতো। একটা ছোট্ট দোকানে সেলাই-এর কাজ করতো সে। দোকান ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলো এক বিরাট সওদাগরের কাছে। সেই বাড়িরই উপরতলায় থাকতো তার বাড়িওলা। আর নিচে ছিলো একটা কলুর ঘানি। আর তার বলদ রাখার একটা ছাপরা।

একদিন আমার ভাই বসে কাজ করছিলো তার দোকানে। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়লো, ওপর তলার কড়িডোরে দাঁড়িয়ে একটি বিবি একমনে রাস্তার লোকজন দেখছে। পরে জেনে ছিলো বাড়িওলার বিবি সে। তার হরিণ চপল চোখ আর পিনোদ্ধত বক্ষ দেখে ওর মনের মধ্যে ভালোবাসা আঁকুপাঁকু করতে থাকে। একেবারে প্রথম দর্শনেই প্রেম। সারাদিন আর সূচে সুতো ভরলো না। এক ফোঁড় সেলাই করতে পারলো না সারাদিন। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে রইলো। আবার যদি সে কড়িডোরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু না, সেদিন আর এলো না তার মানসী। পরদিন খুব সকালে এসে দোকান খুললো। সূচ সুতো নিয়ে বসলো। কিন্তু চোখ তার চাতালে। কখন করিডোরে এসে দাঁড়াবে সে, নয়ন স্বার্থক হবে। এই আশায় ঘন ঘন তাকাতে লাগলো। ফলে সারাদিনে যতবার কাপড়ে না সূচ ফুঁড়লো তার চেয়ে বেশীবার বিঁধলো তার আঙ্গুলে। কিন্তু সেদিনও সারা দিনে তার দেখা মিললো না। এইভাবে আরও কয়েকটি দিন কেটে গেলো, কিন্তু তার আর দেখা পাওয়া গেলো না। সে আর কড়িডোরে এসে দাঁড়ালো না। এদিকে কাজকামও কিছুই এগোলো না। রোজগার পাতির নামে লবডঙ্কা। ফলে যা হবার তাই হলো। বাজারহাট হয় না। হাড়ি না চড়ার হাল।

বাড়িওলার বিবিটা ইচ্ছে করেই এই নাচানোর খেলায় মেতেছিলো আমার ভাই-এর সঙ্গে। সে চেয়েছিলো, দুই দিক থেকে সে তাকে দেওলিয়া করে দেবে। প্রথমত তার রুজিরোজগার বন্ধ করা, দ্বিতীয়ত তার বুকে ভালোবাসার আগুন ধরিয়ে দেওয়া। এক ধরনের মেয়ে আছে—যারা পুরুষদের নাচিয়ে তাদের কাজকাম নষ্ট করে আনন্দ পায়। সে ছিলো সেই জাতের ছোঁড়া-নাচানো ছেনাল।

একদিন বাকবুক তার দোকানে বসে আছে খদ্দেরের আশায় এমন সময় মেয়েটি

এসে দাঁড়ালো করিডোরের সামনে। অদ্ভুতভাবে এক চোখ ছোট করে হাসলো। এই না দেখে আমার নির্বোধ ভাই-এর বুকে আগুন ধরে গেলো। সে ভাবলো, মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু সে তো জানতো না, এই ধরনের মেয়েদের এটা একটি ফাঁদ ফেলার কায়দা। এর আগেও সে এইভাবে একটু হেসে, একটু চোখ মেরে বহু ছেলের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

পরদিন সকালে বাড়িওলা নেমে এলো। হাতে তার এক থান রেশমী কাপড়। বললো, আমার কয়েকটা কোর্তা করে দিতে হবে।

দর্জি তো হাতে স্বর্গ পেলো। বললো, নিশ্চয়ই করে দেবো। মাপটা দিয়ে যান।

সারাদিন ধরে কুড়িটা কোর্তা বানালো সে। সন্ধ্যেবেলা বাড়িওলা এলো। কোর্তাগুলো দেখে খুব খুশি। বললো, বাঃ খুব সুন্দর হয়েছে। তা কতো দিতে হবে?

এমন সময় করিডোরে এসে দাঁড়ালো সেই মেয়েটি। চোখের ইশারা করে, আর হাত নেড়ে জানালো, মজুরী নিও না।

তখন বাকবুক গদগদ হয়ে বললো, না না, সে কি! আপনার নিজের ব্যবহারের জন্যে ক'টা কোর্তা বানিয়ে দিলাম, তার জন্যে মজুরী নিতে পারি? না না, সে হয় না।

সেদিন আমার ভাই-এর হাতে একটা কানাকড়িও নাই। বাড়িতে সবাই উপোষ করে আছে। দুপুরে তার নিজেরও খাওয়া হয়নি। অথচ নিজের কাজের ন্যায্য মজুরীটা হাত পেতে নিতে পারলো না—এমনই রামছাগল। সে ভাবলো, তার স্বামীর পোশাক সে বিনি পয়সায় বানিয়ে দিয়েছে বলে মেয়েটি তার ওপর আরও প্রসন্ন হবে। কিন্তু বোকাটা জানে না, এটা তাদের স্বামী-স্ত্রীর যুক্তি করা চাল।

পরদিন সকালে আবার এলো বাড়িওলা। বগলে এক বোঝা কাপড়। বললো, কোর্তাগুলো ভারি সুন্দর বানিয়েছো, ভায়া। কিন্তু ওর সঙ্গে মানান-সই পাতলুন না হলে তো পরে সুখ নাই। তাই পাতলুনের কাপড় কিনে এনেছি। যে ক'টা হয়, বানিয়ে দাও।

বাকবুক বললো, বিলক্ষণ, খুব ভালো মানাবে কোর্তার সঙ্গে। আজই করে দিচ্ছি।



সারা দিন না খেয়ে না দেয়ে, খুব যত্ন নিয়ে কুড়িটা পাতলুন বানালো সে। বাড়িওলার অপেক্ষায় না থেকে নিজেই নিয়ে গেলো সে ওপর তলায়। বাড়িওলা দেখে খুব প্রশংসা করলো, তোমার হাত বড় চমৎকার। এমন সূক্ষ্মকাজ সবাই করতে পারে না। তা তোমার মজুরী কতো? কী দিতে হবে বলো?

এমন সময় দরজার পাশে দু'টো চোখ উঁকি দিলো। বাড়িওলার বিবি এসে দাঁড়িয়েছে। ভাই-এর আমার অবস্থা তখন কাহিল। সারাদিন যার চিন্তায় সে বিভোর, একবার চোখে দেখার জন্যে হা পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে ওপরে, সে এখন তার এতো কাছে, একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি চোখের ইশারা করে, ঘাড়নেড়ে বোঝালো, নিও না, কোন পয়সাকড়ি নিও না। হাতে একটা দিরহাম নাই। সেই জন্যে সারা দিন নাস্তা পানিও করতে পারেনি সে। পয়সার বড় প্রয়োজন। কিন্তু মেয়েটার ইশারায় সব গোলমাল হয়ে যায়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, না না, এর জন্যে আপনাকে কিছু দিতে হবে না। গায়ে গতরে খেটে আপনার একটু উপকারে আসতে পেরেছি। তাতেই আমি ধন্য।

বাড়িওলা টাকা বের করে ওর হাতে দিতে যাচ্ছিলো। বাকবুকের আপত্তি দেখে টাকাগুলো আবার জেবে ভরে ফেললো। সবটাই পূর্ব-পরিকল্পিত সাজানো ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রী

দু'জনে মিলে সাট করে তাকে নাস্তানাবুদ করছে। আমার গর্দভ ভাই কিন্তু সে-সব বুঝতে পারে না।

বাড়িওলা বললো, তুমি আমাদের জন্য এতো করছো, আমার বিবি বলছেন, এর একটা প্রতিদান দেওয়া দরকার। টাকা পয়সা যখন হাত পেতে নেবেই না, অন্য কীভাবে তা পুষিয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে উনি একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তাঁর হয়ে আমি তোমাকে বলছি। আমাদের বাড়িতে একটা এদেশীয় ঝি আছে। বয়স অল্প, দেখতে ভারি সুন্দর। একেবারে ডাগর। তোমার সঙ্গে খুব ভালো মানাবে। আমার বিবি চান, তুমি মেয়েটাকে শাদী করো। তাহলে তো তুমি আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে থাকবে।

বাকবুক ভাবলো, এ-সব তার বিবির চাতুরির খেলা। ওই মেয়েটার সঙ্গে তার শাদী হলে বাড়ির অন্দরে ঢোকার অবাধ গতি হয়ে যাবে তার। তার পর তার সঙ্গে আচ্ছা-সে মহব্বৎ করতে আর বাধা কোথায়? বাড়িওলার বিবির এই কৌশল দেখে বাকবুক অবাক হয়। মেয়েছেলের কি বুদ্ধি! স্বামীকে কলা দেখিয়ে তার সঙ্গে প্রেম করবে, তার জন্যে কি চমৎকার মতলব সে এঁটেছে। বাকবুক বললো, আপনারা দু'জনেই যখন চান, আমার কোনও অমত নাই।

পর দিন বিনা আড়ম্বরে শাদী হয়ে গেলো। নিচের ঘানি ঘরে ওদের বাসর শয্যা পাতা হয়েছিলো। কারণ দোকান ঘরটা ছোট। ঘানির ঘরটা অনেক বড়। সার রাত যাতে তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারে সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। মনে অনেক আশা নিয়ে বাসর ঘরে গেলো আমার ভাই। কিন্তু সদ্য শাদী করা বিবি তার বিমুখ। বললো, আজ কিছু হবে না, আজ আমার শরীর খারাপ হয়েছে। মেয়েদের শরীর খারাপ হলে শোয়া দূরে থাক, পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় বসতেও হয় না। তাই আজ রাতে একাই তুমি থাকো এখানে। আমি ওপরে শোবো।

এই বলে পাত্রী উপরে পার হয়ে গেলো। আর আমার ভাই মনের দুঃখে একলা শুয়ে রইলো সেই ঘানি ঘরে, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলো চেঁচামেচি চিৎকারে। ঘানি ঘরের মালিক রেগে আগুন। আমার হুকুম ছাড়া আমার কারখানায় ঢুকেছো। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

এই বলে সে আমার ভাই-এর ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলো ঘানির জোয়ালে, আজ ব্যাটা তোকে দিয়েই টানাবো। নে ধর, খুব জোরে জোরে ভালো করে টানবি, না হলে পিটিয়ে লাট করে দেবো।

সপাং করে চাবুকের ঘা পড়লো পিঠে।—কথা কানে যাচ্ছে না। আমার খদ্দেররা এসে পড়বে এখুনি। তাদের তেল দিতে হবে। আর নবাব পুত্তুর চলেছেন গজেন্দ্র গমনে। এইভাবে ঘানি টানলে সারা দিনে কতটুকু তেল বেরুবে? আমার একটা খদ্দেরও যদি ফিরে যায়, তোর পিঠের ছাল চামড়া আমি তুলে দেবো। এখনো বলছি, বাপের সুপুত্তুরের মতো পা চালিয়ে টানো, তা না হলে দেখছো এই চাবুক—তোমার পিঠে ভাঙ্গবো।

এই বলে আবার সপাং সপাং করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো তার পিঠে—পাছায়। মারের চোটে বাঁই বাঁই করে টেনে ঘোরাতে লাগলো ঘানি। সারাটা দিন একটানা। তারপর বিকালে যখন ছাড়া পেলো, শরীরের আর কিছু নাই। মরার মতো অসাড় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলা দোকানে। সারা গা হাত পা ব্যথায় টনটন করছে। চাবুকের ঘায়ে কেটে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে পিঠে-পাছায়।

বাড়িওলা এসে অনেক দুঃখ জানালো, আহা-হা একি হয়েছে তোমার দশা! আমি ভাই বাড়ি ছিলাম না, তাই এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। যাক যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা

নাই। মনে কোন দুঃখ করো না ভাই। এটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই না। আমি থাকলে এমনটা ঘটতে পারতো না।

বাড়িওলা মনে মনে হাসলো। ব্যাটার প্রেম করার সাধ মেটাচ্ছি।

বাড়িওলা দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেলে চাকরানীটা এলো। বললো, মালকিন শুনে তোমার দুঃখে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। এতো বড়ো মারাত্মক ভুল কি করে হলো এই নিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করেছে।

চাকরানীটা চলে গেলে এলো সেই শাদীর সাক্ষী। গতকাল সে শাদীর কবুল নামায় একমাত্র সাক্ষী সেজেছিলো। বাকবুককে বললো, তা ভাই সাব, শাদীর প্রথম রাতটা কাটলো কেমন? দেখে মনে হচ্ছে, পাত্রী তোমাকে সুখের সায়রে ডুবিয়ে রেখেছিলো। তা হবে না কেন বলো? অমন কচি বয়স। আর কি মজবুত শরীরের বাঁধুনী। একেবারে ভরা যৌবন। অমন ডবকা মেয়েকে নিয়ে রাত কাটালে শরীর তো এমন নেতিয়ে পড়বেই। তা ভালো তা ভালো, দেখে খুব খুশি হলাম। তোমার মধু-যামিনী বড় মধুর কেটেছে।

বাকবুক আর কি বলবে। চুপ করে সব শুনলো। আর মনে মনে জ্বলতে লাগলো—মধুযামিনী!

সাক্ষী বললো, মেয়েটা সত্যিই খুব ভালো। দেখো, শুধু গত রাতই না, জীবনের প্রতিটি রাত্রিই সে তোমাকে মধু ঢেলে দেবে। তার ভালোবাসায় ভরে যাবে তোমার জীবন।

বাকবুক তখন রাগে ফুঁসছে। মনে হতে লাগলো, এই ধাপ্পাবাজ লোকটাকে একটা লাথি মেরে দোকান থেকে নিচে ফেলে দেয়। কিন্তু পারে না। শুধু চিৎকার দিয়ে ওঠে, থামো, তোমার ওই সব মন ভোলানো কথায় আমার জ্বালা জুড়াবে না। ফুলশয্যা, মধুযামিনী? শালা, সারাদিন ধরে আমাকে কলুর ঘানি টেনে মরতে হয়েছে—আর উনি এসে আমাকে রঙের রসের বাক্যি শোনাচ্ছেন। দূর হও তুমি, আমার দোকান থেকে। তোমাদের জন্যেই আমার আজ এতো কষ্ট। তোমরা সব শালা, শয়তান, বদমাইশ!

লোকটা এবারে থতমত খেয়ে যায়। একটু পরে বলে, তা সবই নসীবের খেলা। তোমার ভাগ্য মন্দ। তা না হলে প্রথম শাদীর রাত এই ভাবে কাটে কখনও? আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটার রাশিচক্র তোমার সঙ্গে এক্কেবারে উল্টো। মোটেও খাপ খাবে না। তুমি এক কাজ করো, ওকে তালাক দিয়ে দাও।

—বলা তো খুব সোজা। কিন্তু বলি, তালাক দিতে গেলে যে আক্কেল সেলামী লাগবে সেটা দেবে কে? তুমি দেবে? দূর হও তুমি আমার সামনে থেকে। তোমাদের শয়তানীর জন্যেই আজ আমার এই দশা।

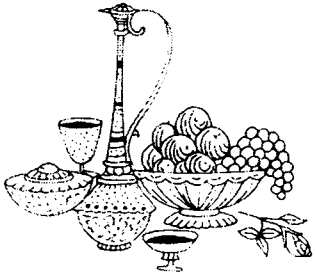

লোকটা চলে যাওয়ার একটু পরে আবার এলো সেই চাকরানীটা। ফিসফিস করে বললো, আমার মালকিন তোমার প্রেমে পাগল, সে বলছে তোমাকে কাছে না পেলে সে গলায় দড়ি দেবে। আমার ডর লাগছে, তুমি যদি রাজি না হও, সে তো তবে আত্মঘাতী হবে। আজ রাতে আমাদের মালিক বাড়ি ফিরবে না। কি যেনো কাজে বাইরে গেছে। তুমি যদি মেহেরবানী করে একটিবারের জন্যে তার ঘরে যাও, তোমাকে পেলে তার সব জ্বালা যন্ত্রণা মিটে যাবে। একটিবার সে তোমাকে কাছে পেতে চায়, আদর করতে চায়। আজ রাতটা তোমাকে খাটে নিয়ে খুব মৌজ করে আনন্দ

করতে চায়। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তুমি একবার করিডোরের দিকে চেয়ে দেখো। সে দাঁড়িয়ে আছে, কখন তুমি একবার চোখ তুলে তাকাবে, সে তোমাকে প্রাণ ভরে একবার দেখবে—শুধু এই আশায়।

বাকবুক বিগলিত হয়ে গেলো। উপরে তাকাতেই দেখতে পেলো, তার প্রিয়া তার মানসী সাশ্রু নয়নে দাঁড়িয়ে আছে তারই দিকে চেয়ে। চোখে চোখ পড়তেই সে দু' হাত এক করে কাতর কাকুতি জানাতে লাগলো। আকারে প্রকারে জানালো, আজ রাতে মালিক বাড়ি থাকবে না, তুমি আমার ঘরে এসো। সারা রাত আমরা এক সঙ্গে কাটাবো। আরও বোঝালো, আমার এই দেহ, আমার এই দিল্, সে শুধু তোমারই জন্যে। তোমাকে কাছে নিতে পারি না বলে এ যৌবন আমার বিফলে চলে যাচ্ছে।

এর পরে আর কোন ক্ষোভ থাকে না। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মনে হয়, সব ক্লান্তি সব ব্যথা-কষ্ট নিমেষে জল হয়ে গেলো। ঘাড় নেড়ে জানায়, যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। আজকেই হবে আমার সত্যিকারের বাসর-রাত—মধুযামিনী...

মনে স্ফূর্তি নিয়ে আবার কাজে মন দিলো। মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলো। আজ রাতে সে যাবে অভিসারে। তার প্রিয়া প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে তার পথ চেয়ে। তারা আজ একসঙ্গে খানা পিনা করবে। তারপর তার এতোকালের সাধ আজ সে প্রাণ ভরে মেটাবে। তাকে নিয়ে সারা রাত ধরে কতো গল্প করবে, কতো আদর করবে। গোপন মিলনের বাসনায় দেহ-মনে এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগে।

কিন্তু ওদিকে ওপরতলায় বাড়িওলা আর তার বিবি তখন নতুন ফন্দী আঁটছে। লোকটার আহম্মকী ভেবে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে দু'জনে। স্বামীটা বললো, দেখো বিবি, আজ রাতে লোকটা যখন তোমার ঘরে আসবে তখন কি করবো বলো তো? আমার মনে হয়, তার আগে কোতোয়ালিতে একটা খবর দিয়ে রাখা ভালো।

বিবি বললে, সে জন্যে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, যা করার আমিই করবো। ভালোবাসার সখ ওর চিরজন্মের মতো ঘুঁচিয়ে দেবো।

তাদের এই বদ মতলবের কোন কিছুই জানতে পারলো না সে। রাত যখন একটু গভীর হয়ে এলো, চাকরানীটা এসে তাকে উপরে নিয়ে গেলো। বাড়িওলার বিবি ওকে সাদরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো।—তোমার পথ চেয়েই বসে আছি, সোনা। তোমাকে দেখার জন্যে বুকের মধ্যে আঁকুপাঁকু করছে। শুধু ভাবছি, কখন রাত হবে, কখন আমার স্বামী হতচ্ছাড়াটা বিদেয় হবে। তোমাকে কাছে পাবো। আমার দেহের জ্বালা জুড়াবো।

আর থাকতে পারে না বাকবুক। মেয়েটার ভালোবাসার কথায় তার শরীর গরম হয়ে ওঠে। চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে যায় তার দিকে। ছলনাময়ী নারী তখন তাকে নিরস্ত করে।—না, না, এখন না। আগে একটু বসো। খানাপিনা করি। তারপর সারা রাত ধরে তুমি আর আমি—শুধু ভালোবাসা করবো।

মেয়েটির কথায় শক-খাওয়া খরগোসের মতো আবার ফিরে এসে বসে পড়ে চেয়ারে। মনে মনে লজ্জা পায়। তাই তো, রাতভর যাকে নিয়ে শুয়ে কাটাব, এখনই তাকে দলামলাই করার জন্যে অধৈর্য হচ্ছে কেন সে?

এমন সময় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো তার স্বামী—বাড়িওলা। তার সঙ্গে দু'জন নিগ্রো। দমা দম কয়েকটা ঘুসি মেরে নিচে ফেলে দিলো আমার ভাইকে। তারপর আষ্টেপিষ্টে বাঁধলো, রশি দিয়ে। চাবুকের ঘায়ে কেটে সারা শরীরে রক্ত ঝরতে লাগলো। কিন্তু এখানেই শেষ না, মার খেতে খেতে সে যখন অচৈতন্য, ওকে কাঁধে করে নিয়ে গেলো ওরা কোতোয়ালিতে। কোটালের কাছে।

দুশো ঘা বেত লাগানো হলো তার পিঠে। তারপর একটা উটের পিছনে বেঁধে সারা শহর টেনে ঘোরাবার হুকুম দিলো কোটাল। উটের পিছনে বাঁধতে যাওয়ার সময় বিকট চিৎকার করে পা ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলো উটটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাই আমার ছিটকে পড়ে সাত হাত দূরে।



সেই সময়ই তার পায়ের একটা হাড় ভেঙে যায়। সেই থেকে সে ল্যাংড়া—লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামান্য চলা-ফেরা করতে পারে। কোটাল তাকে কিছুকালের জন্য শহর থেকে বহিষ্কারও করে দিয়েছিলো। এখন সে আবার ফিরে এসেছে। আমার কাছেই আছে। বিশেষ চলাফেরা করতে পারে না। কাজ কামই বা করবে কি করে। আমার ঘাড়েই খায়।

খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ আমার ভাই-এর এই কাহিনী শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বাহবা দিয়ে বললেন, বাঃ সেরা তোমার কাহিনী। আর চমৎকার তোমার গল্প বলার কায়দা।

আমি বললাম, জাঁহাপনা, এতো শুধু আমার এক ভাই-এর বোকামীর কাহিনী শোনালাম। আমার আর সব ভাইদের কীর্তি কাহিনী যদি শোনেন আরও মজা লাগবে আপনার। এবং তখন বুঝতে পারবেন, আমার ভাইদের থেকে কতো ভিন্ন আমার স্বভাব প্রকৃতি কতো আমার বিচক্ষণতা এবং কতো আমি মিতভাষী?

খলিফা বললেন, সে আমি এখনই বেশ বুঝতে পারছি। যাই হোক, এক এক করে তোমার সব ভাইদের কাহিনীগুলো বলো। শুনতে ভারি আমোদ লাগছে।

এবার আমার দ্বিতীয় ভাই অল-হাদ্দারের কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

নাপিত বলতে থাকে ঃ

তাকে সবাই অল-হাদ্দার নামে ডাকতো। তার কারণ উটের মতো গলাটাকে একবার সামনে বাড়িয়ে দিতো এবং পরক্ষণেই আবার পিছনে টেনে নিতো। আর মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ তুলতো, মনে হতো উটের ডাক। তার মুখটা ছিলো পোড়া কয়লার মতো। দেখতে বড় বিশ্রী। অহেতুক মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে যে কতরকম কাণ্ডকারখানা করেছে তার সীমা সংখ্যা নাই। তার একটা ঘটনার কথা শোনাই আপনাকে।

একদিন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় এক বৃদ্ধা এসে তার কাছে একটা প্রস্তাব করলো, শোনো বাছা তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তুমি সেটা শুনতেও পারো, আবার নাও শুনতে পারো। সবই তোমার খুশি।

হাদ্দার বললো, বেশ তো, বলো না শুনছি।

বৃদ্ধা বললো, বলবো, আমার প্রস্তাব শোনার পর তোমার যদি মনে হয়—তুমি তাতে রাজি হতে পারো, অথবা গররাজীও হতে পারো। কিংবা চিন্তা করে দেখতে পারো রাজি হতে পারো কি পারো না।

হাদ্দার বললো, ঠিক আছে। বলো, শোনার পর বলবো, রাজি হবো কি হবো না।

বৃদ্ধা বললো, একটি শর্ত আছে, বাবা। আমার প্রস্তাব শুনে, অযথা ফালতু কোন প্রশ্ন করবে না। আনতাবড়ী কোন কথাবার্তা বলবে না।

হাদ্দার বললো, ঠিক আছে, তাই হবে। এবার বলো।

বৃদ্ধা বললো, তোমাকে আমি এক সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যার মনোহর দৃশ্য দেখলে তুমি আর ফিরে আসতে চাইবে না। কুলকুল করে নদী বয়ে চলেছে। চারদিকে ফলেফুলে ভরা নানা জাতের লতা গুল্ম বৃক্ষ। ঝর্না দিয়ে ঝরে পড়ছে সরাব। আর চারদিকে বেহেস্তের পরীর মতো খুবসুরৎ সব মেয়ে—গান গাইছে নাচছে আর আনন্দে এ-দিক ও দিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তুমি যাওয়ামাত্র তোমাকে ঘিরে ধরবে তারা। তোমাকে আদর করবে। চুমু খাবে। তারপর সারারাত তোমাকে নিয়ে শুয়ে থাকবে। তোমাকে আমি সেই স্বপ্নের দেশে, সেই প্রমিলা সঙ্গমে নিয়ে যাবো—কিন্তু একটা শর্ত তোমাকে মানতে হবে।

আমার ভাই হাদ্দার অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু দুনিয়াতে এতো মানুষ থাকতে আমাকেই বা সেখানে নিয়ে যেতে চাও কেন? আমার মধ্যে কী গুণ দেখলে?

—আমি তো তোমাকে আগে বলেছি, বাছা, অহেতুক ফালতু প্রশ্ন করবে না বা অযথা কৌতূহল জানাবে না। আমি যা বলি, শোনো, কোনও প্রশ্ন করো না।

আর একটি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে। প্রাসাদটা বাইরে থেকে দেখতে যতো না সুন্দর ভিতরটা তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রাসাদের দোতলায় উঠে এলো তারা। সেখানে দেখলো, চারটি পরমাসুন্দরী মেয়ে মেজের গালিচায় বসে সুর করে গান করছে। কি অপূর্ব তাদের কণ্ঠ। কি মিষ্টি।

মেয়েদের মধ্যে যে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী সে উঠে এসে স্বাগত জানালো তাকে। এক পেয়ালা সরাব এনে ধরলো তার ঠোঁটে। আমার ভাই খেলো। আরও এক পেয়ালা ভরে এনে দিলো সে। সে পাত্রও টেনে নিলো হাদ্দার। এবার মেয়েটি সরে এসে তার গলাটা এক হাতে চেপে ধরে আর এক হাতে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিলো তার গালে।

আমার ভাই খুব রেগে ওঠে। উঠে চলে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু বৃদ্ধা চোখের ইশারা করে বলে, না যেও না, বসো।

হাদ্দার ভাবলো, সে বৃদ্ধার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই আবার বসে পড়ে। মেয়েটি তাকে থাবড়াতে লাগলো, চিমটি কাটতে লাগলো, শেষে এলোপাথাড়ী কিল আর লাথি মারতে থাকলো। বাকী তিনটি মেয়েও কিন্তু চুপ করে বসে রইলো না। একজন মাথার চুল ধরে টানতে লাগলো, আর একজন কান দু'টো মলতে থাকলো আর অন্যজন তার ধারালো নখ বসিয়ে দিলো তার গালে।

এই সব অসহ্য কাণ্ডকারখানা যখন চলছে, বৃদ্ধা কিন্তু তখন বলছে ধৈর্য ধরে চুপচাপ বসে থাকো বাছা। কোনও কথা বলো না, কোনও প্রতিবাদ করো না।

আমার ভাই হাদ্দার অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিলো। একটা কথাও বললো না। এতো চড়চাপড় লাথি খেয়েও কোনও রা-টি করলো না। অবশেষে প্রথম মেয়েটি হাদ্দারকে তুলে দাঁড় করিয়ে তার জামা পাতলুন সব খুলে নিলো। একেবারে ন্যাংটো করে ফেললো তাকে। তারপর একটা সোনার পিচকারী এনে তার সারা গায়ে গোলাপ জল পিচকারী করে দিলো। এবং বললো, আমি কোনও দাঁড়ি গোফওয়ালা মানুষকে সহ্য করতে পারি না। তারা যখন চুমু খায় তখন আমার নরম গালে বিশ্রী খোঁচা লাগে। তুমি যদি আমার সঙ্গে ভালোবাসা করতে চাও তবে আগে তোমার ঐ বিশ্রী দাড়ি গোঁফগুলো কামিয়ে এসো।

সেই বৃদ্ধা তখন হাদ্দারকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ক্ষুর দিয়ে তার দাড়ি গোঁফ আর ভুরুটুরু সব কামিয়ে দিলো। তারপর লাল আর সাদা রঙের ডোরা কেটে দিলো তার সারা মুখে। পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এসে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়াতেই মেয়েগুলো ওর ওই

চেহারা দেখে প্রথমে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হো হো করে হেসে মেজেতে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।

প্রথম মেয়েটি উঠে এসে বললো, মালিক তোমার অপরূপ রূপে আমি মুগ্ধ। এবার একটু নাচো।



হাদ্দার বুঝলো তামাশা করছে। ক্ষুব্ধ হয়ে সে ফিরে দাঁড়ালো। কিন্তু মেয়েটি সামনে এসে ওর দুটি হাত ধরে কাছে টেনে বললো, রাগ করলে? কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার এই মন ভোলানো রূপে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। এবার একটু নাচো। তারপর আমরা ভালোবাসা করবো।

অতঃপর এক টুকরো রেশমী কাপড় কোমরে জড়িয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাচলো সে। উদ্দাম নৃত্য। তার আসুরিক কায়দায় হাত-পা চালনার ফলে ঘরের ফুলদানী মদের ঝারি, গেলাস অনেক কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি হলো।

নাচ তখনও চলছে, প্রথম মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। এবং এক এক করে সব জামা কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। আর এমন অঙ্গভঙ্গী করতে থাকলো, যা দেখে আমার ভাই-এর অবস্থা তখন তুঙ্গে। সারা শরীর শির শির করতে থাকে। মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। চোখ দু'টো ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে যায়। এসব কি দেখছে সে? এসব কি করছে মেয়েটা। উফ! সে আর চাইতে পারছে না। হাদ্দার নাচ থামিয়ে দিলো।

বৃদ্ধা বললো, মেয়েটা ছুটবে, তোমাকে কিছুতেই ধরা দিতে চাইবে না। কিন্তু তোমার কাজ হবে, যেন তেন-প্রকারেন তাকে ধরে ফেলা। এটাই এখানকার রীতি। মেয়েটা এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে সে-ঘরে তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে। তোমার একমাত্র লক্ষ্য—তাকে ধরা। ধরতে পারলেই সে তোমার অঙ্কশায়িনী হবে।

মেয়েটি দৌড় শুরু করে, আর হাদ্দার তাকে ধরার জন্যে তার পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে। মেয়েটি বাঁই বাঁই করে ছুটে দু-দুবার ঘুরে এলো সারা মহল, কিন্তু হাদ্দার তাকে ধরতে পারলো না।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একত্রিশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়। শাহরাজাদ বলে, তারপর শুনুন শাহজাদা, চীন-সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে সেই দর্জি তার কাহিনী বলে চলেছে ঃ

নাপিত তার দ্বিতীয় ভাই অল-হাদ্দারের নির্বুদ্ধিতার সেই কাহিনী শোনাচ্ছে বাগদাদের সুলতান সমীপে ঃ

হাদ্দার তখন উন্মত্ত হয়ে ধাওয়া করে চলেছে সেই মেয়েটির পিছনে পিছনে। মেয়েটি হাসছে, আর কায়দা করে তাকে পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছে।

বাকী তিনটি মেয়ে মজা পেয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। ধরি ধরি করেও যখন ধরতে পারছে না, হাততালি দিয়ে উঠছে।

মেয়েটি এবার সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে পালায়। ছেলেটি যায় পিছনে পিছনে। এঘর ওঘর তাড়া করে ছুটতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারে না। একবার

মেয়েটি পাশের একটা ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে হোচট খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়। হাদ্দার ভাবে, এইবার আর সে পালাতে পারবে না। ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঘরের ভিতরটা মিশমিশে কালো—অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। হাদ্দার অন্ধের মতো হাতড়ায়। কোথায় গেলো মেয়েটা? এপাশ ওপাশ হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। কিন্তু চোখে কিছু দেখা না গেলে খুঁজে পাবে কি করে? অন্ধকারের মধ্যে তাই আন্দাজে চলতে চলতে এক সময় বিপত্তি ঘটে। বুঝতে পারেনি কার্নিশে পা পড়তেই উল্টে গিয়ে পড়লো নিচে রাস্তায়। একটা মুচির দোকানের সামনে। দোকানের মালিক বেরিয়ে এসে দেখে, একটা কিম্ভুত কিমাকার লোক—সম্পূর্ণ উদোম, দাড়ি গোঁফ ভুরু কামানো সারা মুখে লাল সাদা রঙের ডোরা কাটা, যেন একটা জোকার—উপর থেকে পড়ে গেছে। দোকানী ভাবলো, লোকটা চোর বদমাইশ। সবাই মিলে বেদম পেটালো। অতোটা উপর থেকে পড়ে গেছে, তার উপর চামড়ার চাবুকের পিটানি সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়লো হাদ্দার। তখন সেই মুচি তাকে একটা গাধার পিঠে চাপিয়ে কোতোয়ালিতে নিয়ে এলো। কোটালের প্রশ্নের জবাবে মুচি বললো, লোকটা বোধ হয় আমাদের উজির সাহেবের বাড়ি ঢুকেছিলো চুরি করতে। কিন্তু অন্ধকারে ঠাওর করতে না পেরে খোলা বারান্দার কার্নিশে পা দিতেই আমার দোকানের সামনে পড়ে যায়।

কোটাল তাকে দুশো ঘা বেত-এর সাজা দিয়ে শহর থেকে বের করে দেয়। আমি খবর পেয়ে গোপনে আমার ভাইকে ঘরে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছি। তার নির্বুদ্ধিতার দোষে সে আজ পঙ্গু। আমি আমার সহজাত উদারতায় তাকে আশ্রয় দিয়েছি। এখন সে আমার ঘাড়েই খায়।

কিন্তু জাঁহাপনা, আমার তৃতীয় ভাই-এর কাহিনীটা একটু অন্যরকম, বলছি শুনুন।

তৃতীয় ভাই বাকবক-এর কাহিনী।

বাগদাদের ভিখিরিদের সে পাণ্ডা। একেবারে পুরোপুরি অন্ধ। একদিন ভিক্ষেয় বেরিয়ে চলতে চলতে এক বিরাট বড়লোকের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো।—কই গো, কে আছো?

আমার এই অন্ধ ভাই বাকবক-এর ভিক্ষে করার কায়দা একটু অন্যরকম। প্রথমে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে শুধু ওই একটি কথা-ই উচ্চারণ করবে, 'কই গো, কে আছো'। দরজা খোলার আগে সবাই একবার জিজ্ঞেস করে, 'কে'? কিন্তু আমার ভাই আর 'রা'টি কাড়বে না। ভিজে বিড়ালের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেননা, বেশিরভাগ লোকই, যদি বুঝতে পারে ভিখিরি, দরজা না খুলে বলে দেয়, 'এখানে কিছু হবে না, বাছা, অন্য জায়গায় দেখো।' ও সেই জন্যেই দরজা খোলার আগে কোনও কথা বলে না। এর ফল কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বেশ ভালো হয়। অন্ধ লোককে সামনে দেখলে স্বভাবতই আমরা একটু বেশী মাত্রায় করুণা পরবশ হয়ে পড়ি।

সে-দিনও সে সেই বড়লোকের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে যথারীতি একটা হাঁক দিলো, কই গো, কে আছো?

একটু পরে উপরতলা থেকে আওয়াজ এলো, কে?

আমার ভাই কিন্তু দারুণ সেয়ানা। কোন জবাব দিলো না। আবার প্রশ্ন এলো, কে? কে ওখানে? কথা বলছো না কেন?

কিন্তু তখনও ভ্রাতা আমার নিরুত্তর। একটু পরে সশব্দে দরজাটা খুলে গেলো।—কে?

এবার বাকবক করুণ কাকুতি কণ্ঠে বলে, আমি অন্ধ নাচার, বাবা। আপনাদের দয়াতে বেঁচে আছি। এক মুঠো ভিক্ষে চাই।

লোকটি কাছে এগিয়ে এসে বললো, দেখি তোমার একখানা হাত!

আমার ভাই বাড়িয়ে দিলো তার ডান হাতখানা। লোকটা বললো, আমার সঙ্গে এসো।

এই বলে সে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে অনেক সিঁড়ি ভেঙে তিনতলার ছাদের ওপরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো তাকে। আমার অন্ধ ভাইটি ভাবলো, লোকটা বোধ হয় খুব ধর্মপ্রাণ। ভালোমন্দ অনেক কিছু খাওয়াবে তাকে।

কিন্তু ওর খোয়াব কেটে গেলো। লোকটা বললো, তোমাকে যখন বারবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কে? কে?' তুমি সাড়া দিলে না কেন? কেন আমাকে তিনতলা থেকে নিচে নামালে? কেন আমাকে দিয়ে দরজা খোলালে? কেন? আমি কি তোমার নফর। তোমাকে এই তিনতলা থেকে নিচে ফেলে দেবো আমি—শয়তান কাঁহাকা। যাও ভাগো, আর কোনও দিন এরকম বেয়াদপি করবে না।

বাকবক মুখ কাঁচুমাচু করলো। কোন জবাব দিলো না। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলো। কিন্তু নসীবে যা লেখা আছে তাকে সে এড়াবে কি করে। দোতলা থেকে একতলা নামতে গিয়ে লাঠি হড়কে পড়ে গেলো সে। তারপর গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে পড়লো। সারা শরীর ব্যথায় টনটন করতে লাগলো। মনের দুঃখে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। এমন সময় তার আর দু'জন সঙ্গী এসে জুটলো। তারাও অন্ধ। ভিক্ষে করে খায়। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে যাচ্ছে শুনে, কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি গো, ওস্তাদ কি হলো? অমন কাতরাচ্ছো কেন?

বাকবক তার দুঃখের কাহিনী বললো। তারা শুনে সমবেদনা জানায়। বলে, আজ তোমার নসীব খারাপ, আজ আর ভিক্ষে করে কাজ নাই, বাসায় ফিরে যাও।

বাকবক বলে, আমিও তাই ভাবছি, বাসাতেই ফিরে যাবো। ঘরে যা জমানো টাকা আছে তার থেকে কিছু বের করে দু'খানা রুটি কিনে খাবো। কিন্তু আমার সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। তোমরা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো। না হলে যেতে পারবো না। ওরা বললো, ঠিক আছে চলো, তোমার রুটি তরকারী কিনে এনে দেবো।

ওরা যখন এই সব কথা আলোচনা করছে সেই সময় একটা চোর ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। অন্ধদের কথা শুনে তাদের পিছু পিছু চলতে লাগলো সে। তিন অন্ধ এসে বাকবকের ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। পা টিপে টিপে চোরটাও ঢুকে পড়লো। বাকবক বললো, দরজাটা বন্ধ করে দাও। তারপর ভালো করে হাতড়ে দেখো, আমাদের পিছনে অন্য কোন লোক ঢুকে পড়েছে কিনা। উপর থেকে একটা সিকে ঝুলছিলো, ওটা ধরে চোরটা উপরে উঠে গিয়ে টঙ্গে বসে থাকলো। অন্ধ যখন হাতের লাঠি দিয়ে ঘরের চারপাশ হাতড়ে দেখে নিশ্চিন্ত হলো, না, কোনও বাইরের লোক ঢোকেনি, বাকবক তখন তার লুকিয়ে রাখা জমানো টাকার থলেটা বের করলো। তিনজনে মিলে গুনলো। দশ হাজার দিরহাম। এগুলো সে সারাজীবন ধরে ভিক্ষে করে জমিয়েছিলো। বাকবক তার থেকে কয়েকটা দিরহাম নিয়ে একজনকে বললো, আমাদের জন্যে তিনখানা রুটি আর একটু শব্জী নিয়ে এসো। সবাই বসে খাই। তারপর আমি শুয়ে পড়বো। মনে হচ্ছে হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে। ব্যথায় টনটন করছে সারা শরীর।

অন্ধটা রুটি আর শব্জী নিয়ে এলে তিনজনে মিলে খেতে বসলো। এমন সময় চোরটা খুব সন্তর্পণে নিচে নেমে এসে, ওদের পাশে বসে রুটির কোনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো।

আমার ভাই-এর কান খুব ভালো। বুঝতে পারলো, আরও একজনের চোয়ালের শব্দ হচ্ছে। চিৎকার করে উঠলো, চোর চোর, পাকড়াও।

এই বলে সে হাত দু'খানা এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগলো। চোর দেখলো বেগতিক—উঠে পড়ে পালাতে যাবে, বাকবকের হাতে ধরা পড়লো তার পা দু'খানা। গড়মড় করে চেপে

ধরতেই ধড়াস করে পড়ে গেলো লোকটা। তখন ওরা তিনজনে মিলে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে লাগলো। চোর তখন প্রাণ ভয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু না, ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছে তারা।

বাকবক চিৎকার করতে লাগলো,—চোর চোর চোর। কে আছো, মুসলমান ভাইসব, ছুটে এসো, চোর চোর—

বাকবকের সঙ্গে ওর দুই সঙ্গীও সমানে 'চোর চোর' বলে আওয়াজ তুলতে থাকে। পাড়পড়শীরা ছুটে এলো।

—কী ব্যাপার, কি হয়েছে?

চোরটা তখন তার চোখ দু'টো বন্ধ করে অন্ধের ভান করে বলে, দেখো তো ভাই সব, আমরা চারজন একসাথে ভিক্ষে করি। এতোকাল ধরে আমার ভাগে দশ হাজার দিরহাম জমেছে। সেই টাকাটা আজ নিতে এসেছিলাম। তা টাকা তো দেবেই না, আবার উল্টে চোর চোর বলে চেঁচাচ্ছে। তোমরা আমাদের থানাতেই নিয়ে চলো।, ভাই সব। কোটালসাহেব এর ন্যায্য বিচার করবেন। আমার ভাগের ন্যায্য পয়সা আমি পাবো না?

চোরের কথা শুনে আমার ভাই-এর আক্কেল গুড়ুম। বলে কি ব্যাটা! পাড়াপরশীরা বললো, তাই ভালো, চলো তোমরা কোতোয়ালিতে চলো। যা করার কোটাল সাহেবই ব্যবস্থা করবেন।

চারজনকেই কোতোয়ালিতে নিয়ে এলো তারা। দশ হাজার দিরহামের থলেটা নিয়ে এসে দিলো কোটাল সাহেবের হাতে।

প্রথমে চোরটাই জবান-বন্দী দিতে উঠলো। চোখ দু'টো তার তখনও বন্ধ। বললো, হুজুর টাকাটা আমার ভাগের ন্যায্য পাওনা। কিন্তু ওরা আমাকে দেবে না। আমাকে চোর সাব্যস্ত করে আপনার হাতে তুলে দেবে এই ছিলো তাদের ফন্দী। আপনি ধর্মাবতার, ন্যায্য বিচার করুন।

বাকবক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সব মিথ্যে কথা, হুজুর। ও লোকটা চোর। আমরা তিনজন যখন ঘরে ঢুকি, আমাদের পিছু নিয়ে সেও ঢুকে পড়েছিলো। কোটাল মহা ফাঁপড়ে পড়লো। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, এমন সময় চোরটা প্রস্তাব করলো, হুজুর আমি বলি কি, আমাদের সবাইকে পিটুনি লাগান। তা হলে, মারের চোটে বাছাধনরা কবুল করতে পথ পাবে না।

কোটাল ভাবলো, হুঁ, লোকটা তো ঠিকই বলেছে। পিটানিই এখানে একমাত্র ওষুধ। একজন সিপাইকে বললো, লাগাও চাবুক।

চোরটা সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো, আমাকে দিয়েই শুরু করুন, হুজুর।

চাবুকের কয়েক ঘা পিঠে পড়তেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো চোরটা। চোখ দু'টো খুলে কোটালের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে লাগলো।

কোটালের চোখও ছানা বড়া—সে কি! তুমি না অন্ধ?

—আজ্ঞে, কেউ আমরা অন্ধ নই। ওটা আমাদের ভিক্ষের সাজানো মূলধন। অন্ধ সাজলে লোকের মনে দয়া মায়া একটু বেশি হয়। এমনি ভিখিরিদের চেয়ে আমরা অনেক বেশি রোজগার করি।

—তাজ্জব ব্যাপার, কোটাল বললো, বাকী তিনজন? ওরাও কি তোমারই মতো?

—জী হুজুর। কেউই অন্ধ না। বিশ্বাস না হয় চাবুক চালান। দেখবেন, চোখ খুলতে পথ পাবে না, বাছাধনরা। অন্ধ সেজে শুধু পয়সাই বেশি রোজগার হয় না, আরও কিছু ফাও মেলে।

কোটাল প্রশ্ন করে, কী রকম?

—অন্ধ সেজে বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে গেলেও কারো কোনও আপত্তি থাকে না। বাড়ির কর্তারা ভাবে, আহা, বেচারী অন্ধ। চোখে দেখতে পায় না। তা যাক না অন্দরে। ওর জন্যে তো মেয়েদের আব্রু নষ্ট হবে না।

কিন্তু মেয়ে-মহলে ঢোকার পর যখন আমরা চোখ খুলে দিই, মেয়েরা খুব অবাক হয়। হাতে স্বর্গ পায়। কারণ, সারাজীবন ধরে কোনও পরপুরুষের মুখ দেখার, সঙ্গ পাওয়ার সৌভাগ্য হয় না তাদের। আমাদের দিয়ে প্রাণের সাধ মিটিয়ে নেয় তারা। এই সব ক্ষেত্রে ভিক্ষের মাত্রাটা অনেক বাড়িয়ে দেয় মেয়েরা।

কোটালের হুকুমে বাকবক আর তার দুই সঙ্গীর পিঠে চাবুক পড়তে থাকে। কিন্তু চোখ আর খোলে না তারা। কোটাল ভাবে, ব্যাটারা একেবারে রাম ঘুঘু। মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তিনজন। একেবারে বেহুঁশ। কিন্তু তবুও চোখ খোলে না। কোটালের হুকুমে ওদের তিনজনকে শহরের বাইরে ফেলে দিয়ে আসে সেপাইরা। বাকবকের টাকার থলে থেকে আড়াই হাজার দিরহাম চোরটাকে দিয়ে কোটাল বলে, যা ভাগ। এগুলো ওদের তিনজনের জন্যে রইলো।

চোর তো মহাখুশি হয়ে চলে যায়। কোটাল কিন্তু বাকী টাকাটা নিজের জেবে পুরে ফেলে।

আমি যখন খবর পেলাম, আমার প্রাণের ভাই বাকবককে মেরে অজ্ঞান করে শহরের বাইরে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে, আমি আর থাকতে পারিনি। সবারই অলক্ষ্যে তাকে ঘরে এনে সেবা-যত্ন করে সারিয়ে তুলি। এখন সে অনেকটা সুস্থ। কিন্তু তাকে আর ভিক্ষে করতে পাঠাই না। আমার রোজগারেই সে খায়। এখন জাঁহাপনা, আপনিই ভেবে দেখুন, আমি কতো উদার, কতো মহৎ।

খলিফা অল-মুসতানির বললেন, একশোবার। তোমার মতো উদার, পরোপকারী, মিতবাক, দূরদর্শী ব্যক্তি আমি খুব কম দেখেছি। আমি তোমাকে খুশি হয়ে একশো দিনার পুরস্কার দিচ্ছি। ওটা নিয়ে তুমি বাড়ি যাও।

আমি বললাম, কিন্তু হুজুর আপনি আমার বাকী তিন ভাই-এর কথা শুনবেন না? খুব সংক্ষেপেই বলছি। কারণ, আপনি তো জানেন, জাঁহাপনা, বেশী বকবক করা আমার ধাতে সয় না।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে, শোনাও।

নাপিতের চতুর্থ ভাই অল-কুজের কাহিনী।

নাপিত বলতে শুরু করে : আমার এই ভাইয়ের নাম যুশবান-অল-কুজ। তার অর্থ হলো—কাঁসার কুঁজো ঠোকার আওয়াজ। এক সময়ে বাগদাদের খুব নাম করা কষাই ছিলো সে।



বেছে বেছে সেরা ভেড়া কিনে আনতো। তার চেকনাইওলা গোস-এর প্রশংসা করতো সবাই। শহরের যত বড় বড় খদ্দের সব ভীড় করতো তার দোকানে। তার মতো ভালো মাংস আর কেউ দিতে পারতো না। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই সে অনেক পয়সা বানিয়ে ফেলে। কিন্তু পয়সা সকলের ভাগ্যে চিরদিন সহ্য হয় না।

একদিন এক সাদা দাড়িগোঁফওলা বৃদ্ধ তার দোকান থেকে খানিকটা মাংস কিনলো। সদ্য তৈরি ঝকঝকে রূপোর দিনারে দাম মিটিয়ে চলে গেলো। আমার ভাই অল-কুজ পয়সাগুলো নেড়ে চেড়ে উল্টেপাল্টে দেখলো—সবগুলোই রূপোর এবং আনকোরা নতুন ঝকঝকে। অল-কুজ পয়সাগুলো আলাদা একটা বাক্সে ফেলে রাখলো। এমন সুন্দর পয়সা খরচ করতে মায়া হয়। বৃদ্ধ রোজই দোকানে আসে। রোজ মাংস কেনে, আর রোজই একই ধরনের ঝকঝকে আনকোরা রূপোর দিনার দিয়ে যায়। অল-কুজ যথারীতি সে-গুলো সেই বাক্সে ফেলে রাখে। ভাবে, পরে বেশ

কিছু টাকা জমে গেলে ভালো দাম দিয়ে একজোড়া লড়াই-এর ভেড়া কিনবে সে। (এক সময় বাগদাদের ভেড়ার লড়াই-এর খুব নামডাক ছিলো। বহু দূর থেকে লোকে দেখতে আসতো)।

অবশেষে একদিন টাকাটা গুণবে বলে বাক্সটা খুলে দেখলো টাকা পয়সা কিচ্ছু নাই। আছে শুধু কতকগুলো গোলগোল সাদা কাগজের টুকরো। অল-কুজের মাথায় বাজে ভেঙে পড়ে। একি সর্বনাশ করে গেছে লোকটা। যাদুমন্ত্র করে টাকার বদলে কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। নিজের গাল নিজেই থাবড়াতে লাগলো। মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো। চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনে অনেক লোকজন জড়ো হতে লাগলো। তাদের সবাইকে বললো, বৃদ্ধটা কি সর্বনাশ তার করে গেছে। কিন্তু তার এই আজগুবি গল্প বিশ্বাস করতে চাইলো না কেউ। এমন সময় ভীড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালো সেই বৃদ্ধ। আর তখনই অল-কুজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগলো, এই সেই শয়তান, জোচ্চোর—আমাকে ঠকিয়ে সাদা কাগজ দিয়ে ভালো ভালো মাংস নিয়ে গেছে।

বৃদ্ধের দাড়ি গোঁফ খামচাতে থাকে অল-কুজ। বৃদ্ধ কিন্তু শান্ত ভাবে চুপচাপ সহ্য করতে লাগলো তার এই মারধোর। কোন বাধা দিলো না। শুধু আস্তে খুব আস্তে আস্তে বললো, ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে।

অল-কুজ বলে, ছাড়বো? চলো তোমাকে কোতোয়ালিতে নিয়ে গিয়ে কোটালের হাতে তুলে দেবো। লোক ঠকানোর মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ তখনও বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, তাতে তোমার ভালো হবে। না হলে তোমার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। আমি তোমাকে নগদ পয়সা দিয়েছি—মাংস নিয়েছি। এর মধ্যে ঠকাবার কি প্রশ্ন থাকতে পারে?

—নগদ পয়সা দিয়েছো? এগুলো পয়সা? ঠগ, জোচ্চোর কোথাকার।

বৃদ্ধ তেমনিভাবেই বলে, ওসব ঝুট কথা বলে লোক হাসাচ্ছো কেন? আমি কাগজের টুকরোগুলো দিয়েছি আর তুমি তার বদলে আমাকে ভালো ভালো মাংস দিয়েছো? এ কথা বিশ্বাস করবে কেউ? জিজ্ঞেস করো, এখানে যারা হাজির আছেন?

কিন্তু কেউ বিশ্বাসসূচক সম্মতি জানালো না। বরং বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো, তা কি করে সম্ভব? তুমি কি পয়সাকড়ি বাজিয়ে নাওনি?

অল-কুজ বললো, আপনারা বুঝছেন না, ও ব্যাটা যাদুকর। ঠগ, প্রতারক।

বৃদ্ধ বললো, প্রতারক আমি, না তুমি? ভেড়ার মাংস বলে দিনের পর দিন মানুষের মাংস বিক্রী করছো—তুমি লোক ঠকাচ্ছো, না আমি ঠকাচ্ছি?

উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেলো সে কথা শুনে। একটুক্ষণের মধ্যেই গুঞ্জন উঠলো।—সেকি? মানুষের মাংস খাইয়েছে আমাদের?

বৃদ্ধ বলল, হ্যাঁ। মানুষের মাংস বিক্রী করেছে সে। আর ভেড়ার চেকনাই মাংস বলে বেশীদাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন আপনারা।

—মিথ্যে কথা, অল-কুজ চিৎকার করে ওঠে, আমার মাংস সাচ্চা ভেড়ার মাংস। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে ভেজাল মাংস বিক্রী করি আমি, সারাজীবন গোলাম হয়ে থাকবো তার। আমার সর্বস্ব দিয়ে দেবো তাকে।

বৃদ্ধ হাসলো, অত বাহাদুরী করো না, এখুনি আমি তোমার গুমোর ফাঁক করে দেবো।

এই বলে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে অল-কুজের ভিতরের কামরায় ঢুকে পড়লো। এখানে সে ভেড়া জবাই করে ছালচামড়া ছাড়িয়ে মাংসের বড় বড় খণ্ড তৈরি করে। বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলো, এই দেখুন ভাই সব, যে মাংসের খণ্ডগুলো টাঙানো

আছে তার মধ্যে এইগুলো ভেড়ার আর এইগুলো মানুষের। কিন্তু ঐ নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন ঘরের ঐ কোণে তিনটি মানুষের মাথা।

সবাই দেখে শিউড়ে উঠলো। একজন তো অজ্ঞান হয়ে পড়েই গেলো মাটিতে। জনতার রুদ্র-রোষে তখন আমার ভাই-এর যে কি দশা—আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, জাঁহাপনা। কিল চড় লাথি যে যে-ভাবে পারলো মারতে থাকলো। আমার নিরপরাধ ভাই কিছুতেই বোঝাতে পারলো না, এ সব তোমরা বিশ্বাস করো না। লোকটা যাদুকর। তোমাদের সবাইকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। মেরেই তারা ক্ষান্ত হলো না। হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলো কোতোয়ালিতে। কোটাল শুনে তিনশো বেতের ঘা সাজা দিলো তাকে। বেচারী অল-কুজ! মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। কোটাল তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলো তাকে। উন্মত্ত জনতা যখন তার ওপর চড়াও হয়ে কিল চড় ঘুসি চালিয়েছিলো সেই সময় তার বাঁ চোখে একটা প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগে। ফলে চোখটা কানা হয়ে যায়।

মনের দুঃখে অল-কুজ অন্য এক অচেনা দেশের অচেনা শহরে চলে গেলো। একটা রাস্তার মোড়ে বসে জুতো সারানোর কাজ করতে থাকে। সারাদিন খেটে কোন রকমে পেটের খাবার জোগাড় হয়।

একদিন ওই রাস্তার মোড়ে বসে জুতো সেলাই করছে, এমন সময় 'হট যাও হট যাও' রব উঠলো। অল-কুজ তাকিয়ে দেখে, একদল পল্টন ঘোড়া ছুটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। লোক মুখে শুনলো, সুলতান শিকারে যাচ্ছে, তাই তার পল্টনরা ভিড় হটাচ্ছে। একটু বাদেই দেখা গেলো, বিরাট একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে সুলতান আসছেন। তার সামনে পিছনে সশস্ত্র পল্টনবাহিনী। মোড়ের মাথায় এসে বাঁ চোখে ঠুলী পরা অল-কুজের ওপর চোখ পড়তেই চিৎকার করে ওঠে সুলতান।—হায় আল্লাহ একি দেখলাম আমি। কানা লোক দেখলে যে অযাত্রা হয়। সুলতানের আর শিকারে যাওয়া হলো না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরে চললেন। বলে গেলেন, এই অপয়া অযাত্রা লোকটাকে শায়েস্তা করো।

সুলতানের হুকুম শোনামাত্র তার দেহরক্ষীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ী ডাণ্ডা মারতে লাগলো। বেচারী অল-কুজ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান



ফিরলে কোনরকমে বুকে হেঁটে হেঁটে আস্তানায় ফিরে আসে। হাড়গোড় সব ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। সে শুধু ভাবতে লাগলো, কী তার অপরাধ? কেন তাকে ওরা অমনভাবে মারলো? একজনকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাই বলতে পারো, কেন আমাকে ওরা এইভাবে মারলো?

লোকটি রাজদরবারে চাকরী করে। বললো, সে কি। তুমি জানো না? আমাদের সুলতান কোনও কানা লোককে সহ্য করতে পারেন না। বিশেষ করে সে আবার যদি বাঁ চোখ কানা হয়। সুলতানের বিশ্বাস, বাঁ চোখ-কানা লোক দেখলে সব শুভ কাজ পণ্ড হয়ে যায়। সেই

জন্যে তার হুকুমই আছে বাঁচোখ কানা লোক নজরে পড়া মাত্র হত্যা করবে। তা তোমার তো অনেক বরাত জোর, তা না হলে জানে বাঁচলে কি করে তুমি?

লোকটির একথা শুনে অল-কুজ শঙ্কিত হয়। হয়তো পল্টনগুলো ভেবেছিলো, সে মরে গেছে, তাই তারা ফেলে দিয়ে চলে গেছে। অল-কুজ ঠিক করলো, আর এক মুহূর্ত এ শহরে থাকবে না, যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। জুতো সেলাই-এর যন্ত্রপাতিগুলো বেঁধেছেঁদে নিয়ে সেইদিনই রাতের অন্ধকরে গা ঢাকা দিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। চলতে চলতে এমন এক শহরে এসে পৌঁছলো যেখানে কোন সুলতান বাস করে না।

বেশ কয়েকটা দিন ভালোয় ভালোয় কাটলো। মনে হলো জায়গাটা মন্দ না। একদিন বিকালবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলো সে। পাহাড়ের পাদদেশে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি নির্জন। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজে চমকে উঠলো অল-কুজ। মনে হলো তীর বেগে ছুটে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার। ভয় হলো তার, হয়তো বা পল্টনবাহিনী। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলো সে। কিন্তু নিজেকে লুকোবার মতো একটা জুতসই জায়গা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হঠাৎ চোখে পড়ে অদূরেই একটা পোড়ো বাড়ি। দরজা জানলা সব হাট করে খোলা। সোজা গিয়ে বাড়িটার অন্দরে ঢুকে পড়লো। বারান্দায় একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকে, ঘোড়সওয়ারগুলোর গতিবিধি। হঠাৎ দুটি লোক পিছন দিকে চেপে ধরলো তাকে।—এইবার বাছাধন, যাবে কোথায়? তিন তিনটে দিন আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছো? শালা, কিছুতেই ধরতে পারি না। একেবারে পাঁকাল মাছের মতো হাতের নাগাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছো। এবার? এবার কি হবে। দমাদ্দম ঘাকতক কিল চড় বসিয়ে দিলো তারা। বললো, চল ব্যাটা, চল কোতোয়ালিতে। কেমন প্যাদানী দেবে কোটাল সাহেব, দেখবি চল?

হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চললো তারা। আমার ভাই-এর কোন প্রতিবাদই কর্ণপাত করলো না। কোতোয়ালিতে নিয়ে গিয়ে সোজা একেবারে কোটালের হাতে। অল-কুজ তার দুর্ভাগ্যের কথা, তার দেশান্তরী হওয়ার কথা সবিস্তারে বললো কোটালের কাছে। কিন্তু সে কথায় কোনও কাজ হলো না। হুকুম হলো, ন্যাংটো করে চাবুক লাগাও।

জামা-কাপড় খুলতেই কোটাল দেখলো লোকটার সারা শরীরে চাবুকের আর ডাণ্ডার কালো কালো দাগ। হো হো করে হাসলো সে।— পুরোনো পাপী। এর আগেও অনেকবার কোতোয়ালের জল খেয়েছো, দেখছি। তা এই নিয়ে ক'বার হলো?

অল-কুজ বলতে চায়, না হুজুর, চুরি আমি জীবনে কখনও করিনি। কিন্তু মার খেয়েছি প্রচুর, কবুল করছি। কিন্তু কিভাবে কেন খেয়েছি সে-কাহিনী তো আপনাকে বললাম। আপনি বোধহয় খেয়াল করে শোনেননি।

—চোপরাও বদমাইশ চোর। মার খেয়ে খেয়ে সারা গায়ে চাবুক ডাণ্ডার কালসিরা পড়ে গেছে, আর বলে কিনা চুরি করেনি। কোতোয়ালের লোক-এর সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে তো? তাই জন্যে তারা তোমাকে শুধু শুধু ধরে ঠেঙিয়েছে! লাগাও চাবুক।

কোটালের হুকুমমাত্র সপাং সপাং করে চাবুকের ঘা পড়তে থাকে। অল-কুজ আর সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এক এক করে গুণে গুণে একশো বেতের ঘা তাকে সহ্য করতেই হয়। এর পর উটের পিছনে বেঁধে সারা শহরের পথে পথে ঘোরানো হলো তাকে। কোটাল বললো, এবারের মতো অল্পে ছেড়ে দিলাম। পরে যদি শুনি আবার চুরি করতে ঢুকেছিস কারো বাড়ি, তা হলে আর জান থাকবে না তোর।

আমার ভাই-এর হেন দুরবস্থার কাহিনী শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সবার অলক্ষ্যে বাগদাদ শহরে আমার বাসায় নিয়ে এলাম তাকে। সেই থেকে সে আমার

কাছেই থাকে, খায়। মার খেয়ে খেয়ে তার শরীরের হাড়গোড় কিছু আস্ত নাই। কাজ কাম করার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে আমি ছোট ভাই হয়ে তাকে তো আর ফেলে দিতে পারি না। অন্য লোকে হলে হয়তো পারতো। কিন্তু আমার মতো উদার এবং মহৎ মানুষের পক্ষে তা পারা তো সম্ভব নয় জাঁহাপনা।

খলিফা অল মুসতানসির বিল্লাহ বললেন, তা তো ঠিকই। তা এবার কি তুমি তোমার পঞ্চম ভাই-এর কথা শোনাবে? না, আরও একশো দিনার বকশিস নিয়ে বাড়ি রওনা হবে?

—না হুজুর, আমার পঞ্চম ভাই অল-আসার-এর অসাধারণ কাহিনী আপনাকে শোনাতে না পারলে সোয়াস্তি পাবো না।

নাপিতের পঞ্চম ভাই অল-আসারের কাহিনী।

নাপিত বলতে থাকে, আমার এই ভাই-এর দেহের তুলনায় পেটটা বেশ মোটা। মনে হয়, একটা ছোটখাটো জয়ঢাক। নড়াচড়া করতে পারে না বললেই চলে। সারা দিন সারা রাত শুয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। যাকে বলে পিপু-ফিশু গোছের। আমাদের বাবা যখন মারা যান, প্রত্যেক ভাই-এর জন্যে একশো দিরহাম নগদ রেখে যান। অল-আসারের মাথায় হাজারো রকম ব্যবসার ফিকির ঘুরতে থাকে। কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে ভেবে পায় না। অবশেষে ঠিক করলো কাচের বাসনপত্র কেনাবেচার কারবার করবে। এতে পরিশ্রম কম। মহাজনের ঘর থেকে কিনে নিয়ে এসে রাস্তার উপর বসে পড়লেই হলো। পথ চলতি লোকের নজরে পড়বে। যার দরকার ঠিকই কিনবে।

সুতরাং একশো দিরহাম পুঁজি সম্বল করে অল-আসার কাচের বাসন-এর সওদাগর বনে গেলো। রোজ বিকালে মস্ত একটা ঝুড়িতে সাজিয়ে রাস্তার মোড়ে বসে পড়ে। সুর করে হাঁকে—লে লে বাবু ছে আনা, যা লিবে তাই ছে আনা। চমকদার ছে আনা... ইত্যাদি ইত্যাদি নানারকম ছড়া বিচিত্র সুরে আওড়াতে থাকে।

কিন্তু ক্রেতার চেয়ে শ্রোতার ভিড়ই বেশী হয়। একদিন জুম্মাবার দুপুরবেলায় শুয়ে শুয়ে আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখছিলো সে ঃ

আমি আমার পুরো পুঁজিটা কাচের বাসনের কারবারে লাগিয়েছি। নিশ্চয়ই মালগুলো দু'শো দিরহামে বিক্রী হবে। সেই দু'শো দিরহাম দিয়ে আবার বাসনপত্র কিনে আনবো। সেগুলো বেচে চারশো পাবো। সেই চারশো দিয়ে বাসন এনে আরও চারশো লাভ করবো। এইভাবে প্রতি দফায় দ্বিগুণ হতে থাকবে আমার মূলধন। শেষে যখন বেশ মোটামুটি লাভ হবে তখন একটা দোকান ভাড়া নিয়ে আতরের ব্যবসা শুরু করবো। শুনেছি আতরের ব্যবসায় অনেক লাভ। একশো দিনারের আতর নাকি পাঁচশো দিনারে বিক্রী হয়। এইভাবে লাভের অঙ্ক যখন বেশ মোটা হয়ে দাঁড়াবে তখন তা দিয়ে বিশাল একখানা ইমারৎ কিনবো আমি। অনেক দাসদাসী হাতী ঘোড়া কিনবো। দামী দামী গালিচা পর্দায় ঘর দোর সাজাবো। মেহগনি কাঠের বাহারী আসবাবে ঘর ভরে দেবো। ভালো ভালো খানাপিনার ব্যবস্থা হবে। নাচ গানের আসর বসাবো। শহরের নামী বাঈজীরা আসবে মুজরো করতে। নামকরা উজির আমীরদের কন্যার সঙ্গে আমার শাদীর কথাবার্তা চলতে থাকবে। কিন্তু প্রধান উজিরের নিচের কোন অমাত্যের মেয়েকে আমি শাদী করবো না। তাও সে-মেয়ে রূপে গুণে দুনিয়ার সেরা হওয়া চাই। এছাড়া আমার ইজ্জত খাটো হয়ে যাবে। আমার যদি পাত্রী পছন্দ হয় তবে দেন মোহর হিসাবে নগদ এক হাজার মোহর দেবো তাকে। কিন্তু আমার প্রস্তাবে যদি সেই উজির গররাজি হয় তা হলে জোরজবরদস্তি করে তার নাকের ডগা দিয়ে মেয়েকে তুলে নিয়ে আসবো আমার প্রাসাদে। দশটা বাছাই-করা

খোজা কিনবো। এমন জাঁকজমক সাজে সেজে-গুজে থাকবো শাহ-সুলতানরা ভিরমি খেয়ে যাবে। আমার ঘোড়ার জীন-লাগাম একটা দেখার মতো জিনিস হবে। শহরের সেরা জহুরীকে ডেকে নানারকম হীরা চুনী পান্না মুক্তো বসিয়ে সাজাবো। বাদাবী মরুভূমির বিখ্যাত একটা ঘোড়া কিনে আনবো অনেক দাম দিয়ে। তারপর অসংখ্য ক্রীতদাস সমভিব্যাহারে শহর পরিক্রমায় বেরুবো। রাস্তার দু' ধারে লোক দাঁড়িয়ে পড়বে। আমাকে দেখবে বলে। রাস্তার দু' পাশের বাড়ির জানলা খুলে যাবে। মুখের নাকাব সরিয়ে মেয়েরা দেখবে আমাকে। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি গিয়ে পৌঁছবো প্রধান উজিরের প্রাসাদে। উজির শশব্যস্ত হয়ে উঠে এসে অভ্যর্থনা জানাবে। নিজের আসনে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসাবে। আর নিজে দাঁড়িয়ে থাকবে কোরবাণীর খাসীর মতো। কারণ আমি তার কন্যার পানি প্রার্থী। আমার দুই নফরের প্রত্যেকের হাতে থাকবে হাজার মোহরের রেকাবী। একটা রেকাবী আমার শাদীর দেন মোহর। আর একটা রেকাবী শ্বশুরকে আমার সদিচ্ছা-উপহার। উজির দেখে আমার দিল দরিয়া মেজাজের তারিফ করবে। টাকাটা যে আমার কাছে কোনও ব্যাপারই না, এমনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভরে রেকাবী দু'খানা এগিয়ে দেবো উজিরের দিকে। খুশিতে গদ গদ হয়ে হাত পেতে গ্রহণ করে ধন্য হয়ে যাবে সে। এর পর বেশ ভারিক্কি চালে বেরিয়ে আসবো আমি। উজির আমায় জোড় হাতে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবে। আমার প্রাসাদে ফেরার প ব পাত্রীর সখীরা আসবে তার শুভেচ্ছা বাণী বহন করে। আমি তাদের প্রত্যেককে নতুন পোশাক এবং মোহর বকশিস দেবো। এতে আমার মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু উজির যদি কোন উপহার সামগ্রী পাঠায়, আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাকে বোঝাতে হবে, পরের দ্রব্যে আমার কোনও লোভ নাই। আমিই ঠিক করবো আমার শাদীর তারিখ। এবং শাদীর সব খরচ আমার। তাদের কোন খরচ-পত্র করতে দেবো না। এবং আমি সেটা সগর্বে তাদের জানিয়ে দেবো। শাদীর আসরে নামকরা মুজরো দলের নাচ গান হবে। এবং সে সব খরচও আমার। সারা বাড়িটা দামী পারস্য গালিচায় মুড়ে দেবো। আর ফুলে ফুলে ভরে দেবো সব মহল। দামী আতরের খুশবুতে মেতে উঠবে গোটা প্রাসাদ। আমার সাজপোশাক হবে সবচেয়ে সেরা—খানদানী। শাহনশাহ সিংহাসনে বসার সময় যে সাজে সেজে যান, ঠিক সেইরকম। শাদীর আসরটা সাজানো হবে ছবির মতো করে। আমার হবু বিবি যখন তার হীরা জহরতের অলঙ্কার পরে এসে দাঁড়াবে আমার সামনে, মনে হবে, বেহেস্তের কোনও এক হুরী নেমে এসেছে বুঝি। তার রূপের জেল্লায় জেল্লায় আলোময় হবে যাবে সারা মহল। মনে হবে, রমজানের পূর্ণচাঁদের মেলা। আমি কিন্তু ধীর স্থির হয়ে বসে থাকবো। না তাকাবো পাত্রীর দিকে, না তাকাবো এদিক ওদিক। যাতে সবাই ভাবে, আমি একজন দারুণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। আমার বিবি আমার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকাবে। তার মনমোহিনী রূপ আর দেহের সুবাস আমাকে বিচলিত করবে কিন্তু আমার মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাবে না। এমন ভাব দেখাবো, যেন এমন কিছুই না, এমন রূপ যৌবন আমি আকছার দেখেছি। আমার পাত্রী আমার চার পাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তারপর এক সময় সে বলবে, মালিক আমি এসেছি, আমি তোমার বিবি, আমাকে গ্রহণ করো। আমি তোমার দাসী হয়ে থাকবো। কিন্তু আমার কোনও ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাবে না দেখে সে ভীত, বিচলিত হবে। ভাববে তাকে বুঝি আমার মনে ধরেনি। কাতর অনুনয় করে

বলবে, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো, আমাকে বসতে বলবে না? ঘরের অন্য সব মেয়েরা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু একটি কথাও বলবো না আমি। সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেলে মাত্র এক পলকের জন্যে তার দিকে চেয়ে থাকবো। কিন্তু ঐ একবারই। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে গুরুগম্ভীর হয়ে বসে থাকবো। ক্রীতদাসীরা পাত্রীকে নিয়ে যাবে। পোশাক পালটাবার জন্যে। সেই ফাঁকে আমিও আরো জমকালো আরো দামী শাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে ফিরে আসবো। আমার পাত্রীও নব সাজে সেজে এসে দাঁড়াবে। আরো দামী, আরো বাহারী সাজ। আগের রত্নালঙ্কার খুলে রেখে নতুন অলঙ্কার পরে আসবে। পুরো জড়োয়া গহনা। অসংখ্য তারার মতো রত্নরাজি ঝকমক করতে থাকবে। আরো দামী খুশবুতে ভরে যাবে সারা বাসরকক্ষ। পাত্রীর সখীরা আমাকে বার বার অনুরোধ জানাবে—একবার যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার রূপ যৌবন তার সাজসজ্জা, অলঙ্কার আভরণ। কিন্তু আমি নির্বিকার—উপরের দিকে চোখ রেখে কড়িকাঠ গুণতে থাকবো। যতক্ষণ ধরে শাদীর বাসরের এই সব আচার অনুষ্ঠান চলতে থাকবে, আমি একটিও কথা বলবো না, একটিবারও চেয়ে দেখবো না তাকে।

এই সময় রাত্রি হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

বত্রিশতম রজনী।

শাহরাজাদ বলে, শুনুন জাঁহাপনা, নাপিত তার পঞ্চম ভাই-এর কাহিনী বলে চলেছে ঃ

অল-আসার দিবাস্বপ্ন দেখছে ঃ

...এইভাবে বাসরঘরের সব আচার অনুষ্ঠান শেষ হলে আমি আমার এক নফরকে ইশারা করবো। একটা সোনার রেকাবী করে পাঁচশো সোনার মোহর নিয়ে এসে ধরবে আমার সামনে। মুঠো মুঠো নিয়ে সারা ঘরময় ছুঁড়ে দেবো আমি। উপস্থিত যে সব গাইয়ে নাচিয়েরা ছিলো এবং যতো নফর ভৃত্য—সব হুমড়ি খেয়ে পড়বে। যে যা পারবে কুড়িয়ে নেবে। পাশের ঘরেই আমাদের ফুলশয্যা রচিত থাকবে। মেয়ের সহচরীরা তাকে এবার নিয়ে যাবে সে ঘরে। আমি যাবো বেশ কিছুক্ষণ পরে। পালঙ্কে মখমলের গদিতে দামী রেশমী চাদর পাতা। বাঘ-সিংহ, নর্তক নর্তকী—নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূচী কর্ম করা এই চাদরখানা কিনে আনা হবে পারস্যের এক বড় সওদাগরের দোকান থেকে। আতর আর আগরবাতির গন্ধে সারা ঘর ভরপুর। আমার প্রবেশে পাত্রীর সহচরীরা দু' সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে কুর্নিশ জানাবে। আমি গিয়ে বসবো সোফায়। আর পাত্রী বসে থাকবে পালঙ্কে। কিন্তু একবারও দৃষ্টি বিনিময় হবে না আমাদের। আমার সঙ্গে যাতে মেয়েরা ফাজিল রসিকতা না করতে পারে সে জন্য দারুণ গাম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকবো আমি। এক গ্লাস গুলাবী সবরৎ এনে ধরবে আমার সামনে। হাতে নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিয়ে খেতে থাকবো। আমার বিবি অধৈর্য হয়ে উঠবে। সে চাইবে, আমি তার পাশে গিয়ে বসি। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে আমার যে কোন মোহ নাই সেটা বোঝাবার জন্যে আমি নিরাসক্ত ভাব দেখিয়ে সোফাতেই বসে থাকবো। আমার বিবি যদি গোড়াতেই বুঝতে পারে আমি তার রূপে পাগল, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। সারাটা জীবন সে আমাকে তার পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখবে। সেই জন্যে কষ্ট হলেও শাদীর রাতে আমাকে মুখখানা এঁটে বসে থাকতেই হবে। কিছুতেই বুঝতে দেবো না, তাকে দেখে আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। এর পর পাত্রীর মা—আমার শাশুড়ী এসে আমার কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলবে, 'বাবা আমার মেয়েকে কি তোমার পছন্দ হয়নি? একটা কথাও বলছো না, একটু হাসিও দেখছি না মুখে? কিন্তু বিশ্বাস করো, বাবা, অমন ভালো মেয়ে হয় না। যেমন রূপ তেমনি তার গুণ। রূপ চোখেই দেখতে পাচ্ছো কিন্তু গুণের কথা তো ক্রমশঃ জানতে পারবে? আজ শাদীর রাত, তোমরা একটু হাসি হল্লা

করো, তবে তো ভালো লাগবে; আমার আহ্লাদ হবে?' আমার শাশুড়ীর এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আমাকে টলাতে পারবে না। একটি কথাও উচ্চারণ করবো না। আমার শাশুড়ী মাতা এবারে শঙ্কিত হয়ে পড়বে। তাহলে হয়তো সত্যি সত্যিই মেয়ে পছন্দ হয়নি জামাই-এর। সে এবার আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলবে, 'তা হলে কি বাবা, সে তোমার উপযুক্ত হবে না, মনে করছো? কিন্তু আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি বাবা, আমার মেয়ে অপাপবিদ্ধ শিশু। ও এখনও কোন পুরুষের ছায়া মাড়ায়নি। তাকে তোমার ভালো লাগবেই। যাও বাবা, পালঙ্কে যাও তার কাছে, তোমাকে সব দিক দিয়ে খুশি করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে। রাতটা তার সঙ্গে কাটাও, তাহলেই বুঝতে পারবে তার আচার ব্যবহার আদব কায়দা। আমি নিজে হাতে করে তাকে শিখিয়েছি সব। যে-সব গুণ থাকলে একটা নারী তার পুরুষের চোখে আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে তার সবটাই সে খুব ভালো করে জানে। যাও, ওঠো, তোমার প্রতীক্ষাতেই বসে আছে সে। যেভাবে তাকে চাইবে সেইভাবেই পাবে—আমি সেইরকম করেই তাকে গড়েছি।' আমার শাশুড়ী উঠে গিয়ে এক গেলাস সরাব ঢেলে তার মেয়ের হাতে দেবে। গেলাসটা হাতে নিয়ে আমার হাতে তুলে দেবে সে। লক্ষ্য করবো, সরাবের গেলাসটা আমার হাতে দেবার সময় হাতটা তার ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকবে। তার দিকে না তাকিয়েই হাতটা বাড়িয়ে গেলাসটা নেবো। আর তার হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে আমার হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে এক অভূতপূর্ব শিহরণ খেলে যাবে। কিন্তু মুখে তার কোন ভাব প্রকাশ করবো না। আমার সামনে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। তার রূপ যৌবনের গমক আর সাজপোশাকের বাহার দেখে মনে হবে, কোন এক শাহজাদী দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। তার গাল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়বে। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলবে, 'মালিক, মেহেরবানী করে আমার গোস্তাকি মাফ করুন। আমার প্রতি একটু সদয় হোন। আমি আপনার দাসানুদাসী।' সে আমার আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসবে। আমার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দেবে। আমি কিন্তু তখন ভীষণ ক্রুদ্ধ হবো। হাতখানা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াবো। এই সব ন্যাকামী একদম বরদাস্ত করবো না। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেবো তার গালে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ছল করবো। আমার সামনে বসে পড়ে পা-দু'টো জড়িয়ে ধরতে যাবে। জোর-সে এক লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে দেবো তাকে...

স্বপ্নের ঘোরে এমন জোরেই অল-আসার লাথি ছুঁড়লো যে, পায়ের কাছে কাচের বাসনের ঝুড়িটাতে লেগে একেবারে উল্টে গেলো। আর সব বাসনপত্র মাটিতে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে সারা মেজেয় ছড়িয়ে পড়লো।

আমি যদি সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকতাম, হুজুর, ওকে ধরে আমি পেটাতাম। অতগুলো টাকার জিনিস, সারা পুঁজিটা এক নিমেষে সব নষ্ট করে ফেললো। এত বড় আহম্মক কে আছে, এইরকম আকাশ কুসুম কল্পনা করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে?

অল-আসার নিজের গালে নিজে থাপ্পড় দিতে থাকলো। জামা কাপড় ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে লাগলো। হায় হায়, তার সারা পুঁজিটা খতম হয়ে গেলো। এখন সে কি করবে, উপোষ করে মরতে হবে তাকে। পাড়াপড়শীরা ছুটে এলো। কেউ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। আবার কেউ বা তার অলীক কল্পনার কাহিনী শুনে হেসে লুটিয়ে পড়লো।

মনের দুঃখে ভাই আমার কাঁদছে—তার এত সাধের ব্যবসা এক পলকে নষ্ট হয়ে গেলো। এমন সময় সামনের পথ দিয়ে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা দাসদাসী সমভিব্যহারে খচ্চরের পিঠে চেপে মসজিদে যাচ্ছিলো। তার সাজ পোশাক তার চেহারা দেখে মনে হয়, খুব বড়লোক খানদানী ঘরের মেয়ে সে। একটা নফরকে বললো, দেখে আয়তো, ওই লোকটা অমন করে কাঁদছে কেন?

একটু পরে নফরটা ফিরে তার মালকিনকে বললো, আকাশকুসুম কল্পনা করতে

করতে বিভোর হয়ে পড়েছিলো। এবং সেই সময় পায়ের এক লাথি মেরে তার সমস্ত পুঁজিতে কেনা কাচের বাসনপত্র ভেঙে ফেলেছে সে। অল-আসারের অলীক কল্পনার পুরো কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ দিলো নফর। তখন সেই মহিলা বললো, তোমার সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে ওকে দিয়ে এসো। এবং বলে এসো, আবার যেন সে নতুন করে ব্যবসা আরম্ভ করে।

নফরের সঙ্গে পাঁচশো সোনার মোহর ছিলো। মালকিনের হুকুমে সবটাই অল-আসারকে দিয়ে এলো সে। অল-আসার তো আশমানের চাঁদ হাতে পায়। 'ওরে বাবা, এতো টাকা! এ যে রাতারাতি বড়লোক।

প্রথমে একটা সুন্দর দেখে বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলো অল-আসার। এবার জাঁকিয়ে ব্যবসা করতে হবে। নানারকম ব্যবসার ফিকির খুঁজতে লাগলো। এতো টাকা হাতে পেয়েছে। এবার সে বড় রকমের একটা লাগসই ব্যবসায় নেমে পড়বে। একদিন ঘরে শুয়ে শুয়ে এই সব ভাবছে, এমন সময় সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে এক অচেনা বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধাটি বললো, বাবা, আজ জুম্মাবার, দুপুরের নামাজের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু আমি এখনও বাড়ি পৌঁছতে পারলাম না। নামাজটা তোমার এখানে সেরে নিতে পারি?

অল-আসার বললো, নিশ্চয়ই। আপনি ভিতরে আসুন। হাত মুখ ধুয়ে নিন।

অল-আসার তাকে কলঘরে নিয়ে গিয়ে বললো, আপনি এখানে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন।

একটু বাদে আমার ঘরে এসে একটা মাদুর বিছিয়ে তার নামাজ শেষ করলো। আমার ভাই ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধার প্রতি প্রসন্ন হয়ে দু'টো মোহর তার হাত দিয়ে বললো, এটা রাখুন।

কিন্তু বৃদ্ধা হাত পেতে নিলো না। বললো, না বাবা, পয়সায় আমার প্রয়োজন নাই। তোমার কাছেই রাখো ওটা তোমার অনেক কাজে দেবে। তোমার উদারতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ তোমার ভালো করবেন। আর তোমার যদি একান্তই প্রয়োজন না থাকে এই পয়সার, তা হলে যার কাছে থেকে হাত পেতে নিয়েছিলে তাকেই তা ফেরৎ দিয়ে দিতে পারো।

বৃদ্ধার কথায় অবাক হয় অল-আসার।—সে কি! আমার সব কথা এই বৃদ্ধা কি করে জানলো? বললো, যে মহিলাটি দয়া করে আমাকে এতোগুলো মোহর দিয়ে গেলেন তার সঙ্গে আমার এক পলকেরও পরিচয় হয়নি। আপনি কি জানেন তাকে? একটি বার তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?

বৃদ্ধা বললো, সেই সুন্দরী মেয়েটি তোমাকে ঐ টাকাগুলো দিয়েছিলো কেন জানো? দিয়েছিলো তোমার বয়স দেখে। আহা মেয়েটা, ধন দৌলতের কোন অভাব রাখেননি আল্লাহ, কিন্তু একটা জায়গায় মেরে দিয়েছেন। মেয়েটির স্বামী পুরোপুরি ধ্বজভঙ্গ। একটা ভরা যুবতী মেয়ে—তার কী দুর্ভাগ্য বলো? ধনদৌলত দিয়ে সে কি করবে। তার যৌবনটাই তো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যাক্ আর দেরি করো না বাছা। তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবো বলেই এসেছি। ঘরে তালা দিয়ে, চলো বেরিয়ে পড়ি। সোনার মোহরগুলো ঘরে রেখে যেও না। কোমরে বেঁধে নাও। কি জানি চোর-ডাকাতের কথা তো কিছু বলা যায় না।

খুশিতে মন নেচে উঠলো। সেই দিন থেকে তাকে দেখার তার সঙ্গে একটু আলাপ করার সাধ ছিলো। কিন্তু নাম ঠিকানা কিছুই জানতাম না, কি করে কোথায় গিয়ে তার দেখা পাবো? আল্লাই তার সন্ধান করে দিয়েছেন। তা না হলে এই বৃদ্ধাই বা তার কাছে আসবে কেন?

পথে যেতে যেতে বৃদ্ধা বললো, অনেককাল থেকে আমি তার চাকরী করছি। আমাকে দিয়ে অনেক নিষিদ্ধ গোপন কাজ সিদ্ধি করে নিয়েছে। তোমাকে শুধু একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, তার কাছে গিয়ে কথা বলবে খুব কম। যেটুকু বলবে, খুব হিসেব করে ধীরে সুস্থে বলবে।

কথার চেয়ে কাজই সে বেশী ভালোবাসে। তুমি যদি তাকে খুশী করতে পারো, বাবা, তা হলে তো তোমার পোয়া বারো। তার মতো রূপসী মেয়েকে হাতের মুঠোয় তো পাবেই, সেই সঙ্গে তার বিষয় আশয়, ধনদৌলত সবই তোমার কব্জায় এসে যাবে।

আমার ভাই তো আনন্দে দিশাহারা। এবার আর কে পায় তাকে। তোফা কাটানো যাবে সারাটা জিন্দগী। একটা বাড়ির দরজায় এসে অদ্ভুত কায়দায় কড়া নাড়লো বৃদ্ধা। একটা গ্রীক পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিয়ে একটু মুচকী হাসলো। ভিতরে ঢুকে এগোতেই একটা রেশমী পর্দা ঝোলানো দরজা—ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। মেঝেয় দামী গালিচা পাতা। চারপাফশ সোফা সেঠি সাজানো। এক ধারে মখমলের গদি বিছানো পালঙ্ক। একটু পর আর একটা দরজার পর্দা ঠেলে একটি মেয়ে ঢুকলো। তার রূপ যৌবনের বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্য নয়, জাঁহাপনা। এক কথায় বেহেস্তের হুরী। রূপের ছটায় সারা ঘর আলো হয়ে যায়। বিমুখ হয়ে চেয়ে থাকে আমার ভাই। মেয়েটির কোন লজ্জাশরম বলে কিছু নাই। কোন কথাবার্তা বলার আগেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমার ভাই-এর গা ঘেঁসে বসে গলাটা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো সে। অল-আসারের সারা দেহে অপূর্ব এক শিহরণ ধরিয়ে দেয়। এবার মেয়েটি পালঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আমার ভাই তখন উন্মত্ত হাতীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটির ওপর।



প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মেয়েটি আবার দরজা খুলে দেয়। আমার ভাইকে বলে, তুমি একটু বসো, আমি এখুনি আসছি। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবে না।

মেয়েটি চলে যেতেই যমদূতের মতো এক নিগ্রো এসে ঢুকলো। এক হাতে তার শাণিত ছোরা, আর এক হাতে চাবুক।



—এই শুয়ার কা বাচ্চা, এখানে কেন এসেছিস? কে তোকে নিয়ে এসেছে, বল?

অল-আসার কি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বলা আর হলো না। নিগ্রোর আধমনি একটা ঘুষি এসে লাগলো ওর চোয়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পড়ে গেলো গালিচার ওপর। এলোপাথাড়ী চাবুক মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেললো তাকে। তারপর ছোরার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। আমার ভাই তো তখন অচৈতন্য। অসাড় মরার মতো পড়ে রইলো। নিগ্রোটা বোধ হয় ভাবলো, খতম হয়ে গেছে। ওর কোমর থেকে মোহরের থলেটা ছিঁড়ে নিয়ে ঘর থেকে উধাও হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো এক নিগ্রো যুবতী। এক থালা নুন হাতে নিয়ে। অল-আসার-এর ক্ষতগুলোর গর্তে নুন পুরে দিতে থাকলো সে। এমন সময় সেই বুড়িটা নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো, ওরে বাবারে। আমার সোনার বাছার এ হাল কে করলো রে! অতগুলো সোনার মোহর ছিলো। সবগুলো কে নিয়ে গেলো রে। ওরে বাবারে, আমার কী হলো রে!

শয়তান বুড়িটা তখন আমার ভাই-এর পা দু'টো ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে উঠানে নামিয়ে আনলো। উঠানের ওপাশে এক কোণের দিকে একটা খুপরী ছিলো। অল-আসার-এর লাসটা সেই খুপরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে এলো। প্রতিদিন এ বাড়িতে যারা ঢোকে, তারা আর জান নিয়ে বেরুতে পারে না। নিগ্রোটার হাতে প্রাণ হারাতেই হয়। নিগ্রো মেয়েটা

ক্ষতর গর্তে নুন ভরে দেয়, আর বুড়িটা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লাসটা রেখে আসে এই খুপরীর মধ্যে। নুনের জন্যে লাসগুলো পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় না।

দু'দিন বাদে অল-আসারের যখন জ্ঞান ফিরে এলো দেখে সে লাসের গাদার ওপর শুয়ে আছে। প্রতিদিন যত লোককে মারা হয় তাদের সবাইকে ছোট্ট এই খুপরিতেই ভরে রাখতে গেলে একটার উপরে আর একটা লাস গাদা করে রাখতেই হবে। তার আশে পাশে আরও অনেকগুলো গাদা লক্ষ্য করলাম। আল্লাহর কি অপার দয়া, আমার ভাই কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলো। তার একটা কারণ বোধহয়, হিড় হিড় করে টেনে এনে লাসের গাদার ওপরে তুলে ফেলার সময় ওর ক্ষত থেকে নুনগুলো সব ঝরে গিয়েছিলো। এবং তার ফলেই শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে যেতে পারেনি। জমাট বেঁধে বন্ধ হয়ে গেছে।

রাত্রি তখন অনেক। ওপরের শার্সি দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। অল-আসার ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু সারা শরীর টনটন করছে। খুব কষ্ট হয়। শরীর কাঁপতে থাকে। তবু মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে। লাসের গাদার ওপরে দাঁড়াতেই শার্সির পাল্লাটা নাগালে পায়। খুব সন্তর্পণে খুলে ফেলে, সেই ফাঁক দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দিয়ে বাইরে নেমে পড়ে।

আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা বাড়ি যায় অল-আসার। একেবারে নিজের বাড়ি। আমি তাকে মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে খুব তাড়াতাড়িই সারিয়ে তুললাম। আমার দাওয়াই এমনই—যে রোগ দু-মাসে সারার কথা দু'দিনে সেরে যাবেই।

যাই হোক মনে তার দারুণ প্রতিহিংসা। বদলা সে নেবেই। সেই বুড়ি, সেই নিগ্রো, সেই নিগ্রি (নিগ্রোর স্ত্রী) সেই বারবণিতা—কাউকে বাদ দেবে না সে। বিলকুল সাফ করে ফেলবে।

এক কেতা-দুরস্ত পারসী সাহেবের মতো করে দাড়ি গোঁফ ছাঁটলো। আজানুলম্বিত এক শেরোয়ানী মাথায় জুলফি-টুপী পরলো। বুকে গুঁজলো একটা লাল গোলাপ। সারা গায়ে ছিটালো পারসী খুশবু।

সেই বাড়িটার অদূরে দাঁড়িয়ে দরজাটার দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে বুড়িটা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ চলতে থাকে। অল-আসার-এর কাছে আসতেই একেবারে পারসী কেতায় আদাব জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মাজী, এদিকে কোন স্যাকরার দোকান আছে বলতে পারেন?

বলার ঢং, উচ্চারণ সবই পারসীয়। বুড়িটার চোখ চিক চিক করে ওঠে। লোকটা এদেশী নয়। বিদেশী মক্কেলদের ট্যাঁকে মোটা মাল-কড়ি থাকে। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো, ওর ট্যাঁকে গোঁজা একটা মোটাসোটা থলে। বললে, কেন বাবা, স্যাকরার দোকানে কী দরকার?

অল-আসার বলে, না মানে, একটা মাল বিক্রী করে ন'শো সোনার দিনার পেয়েছি। তা ওজন করে দেখবো আমাদের পারসী টাকায় কতো টাকা হবে।

বুড়ি এবার চোখ দু'টো বড় বড় করে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলে। সে আর এমন অসুবিধা কী? আমার সঙ্গে এসো, ভালো দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। এক পয়সার হেরফের হবে না।

বুড়ির পিছনে পিছনে চলে অল-আসার। শেরওয়ানীর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে অনুভব করে দেখে ছোরাটা। দরজার সামনে এসেই সেই অদ্ভুত কায়দায় কড়া নাড়ে বুড়ি। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দাঁড়ায় সেই গ্রীক পরিচারিকা। সেই চেনা মুচকী হাসি। একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বসায় সেই গালিচা পাতা সোফা-সেঠি সাজানো ঘরে। একটু পরেই আসে সেই মেয়েটি। হাসে। দরজা বন্ধ করে গা ঘেসে বসে পড়ে। আচমকা চুমু খায়। তারপর ধরতে গেলেই পালিয়ে গিয়ে পাশের পালঙ্কে শুয়ে পড়ে। অল-আসার উত্তেজিত হয়। ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব—সব একই ঘটনার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। ঘণ্টাখানেক বাদে মেয়েটি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

সেই একই ঢং-এ বলে, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি। আমি না আসা পর্যন্ত যেও না কিন্তু।' মেয়েটি বেরিয়ে যাবার আগেই খুলে রাখা শেরওয়ানীটা গায়ে চাপিয়ে নেয় অল-আসার। আর একবার অনুভব করে দেখে—ছুরিটা ঠিক আছে কিনা। মেয়েটা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্যের মতো হুঙ্কার ছেড়ে ঘরে ঢোকে সেই নিগ্রোটা। এক হাতে শাণিত ছোরা, অন্য হাতে চাবুক। মুখে সেই একই প্রশ্ন, এই শুয়ার কা বাচ্চা, কেন এখানে ঢুকেছিস? কে তোকে এনেছে বল?

অল-আসার বলে, সেকি, ঐ তো তোমার পিছনে যে সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করো না; ও-ই আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলো তোমার ঝিটার হাতে। নিগ্রোটা চিৎকার করে পিছন ফিরে তাকায়। আমার পিছ—

কথা আর শেষ করতে পারে না। পিছনে কে—দেখার জন্যে ঘাড় ঘোরাতেই ক্ষিপ্রবেগে ছুরিটা বের করে প্রচণ্ড জোরে এক কোপ বসিয়ে দেয় অল-আসার। নিগ্রোর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। ঘাড়টা দু'খানা হয়ে মাথাটা ঝুলে পড়ে। এমন সময় এক থালা নুন নিয়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় নিগ্রি মেয়েটা। তার গলাতে আর এক কোপ। ধর মুণ্ডু আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ে যায়। এর পর ছুটে আসে গ্রীক মেয়েটি। তাকেও সাবাড় করে ফেলে এক কোপে। সব শেষে বুড়িটা ছুটে আসে খদ্দেরের লাসটা সরিয়ে ফেলার জন্যে। তার চুলের মুঠি ধরে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিচে, ওরে শয়তানী, বুড়ি খানকী, তোমার দালালী খাওয়ার শখ আমি জন্মের মতো মিটিয়ে দিচ্ছি।

সোজা ওর বুকের মধ্যে গেঁথে দিলো ছুরিখানা। টুকরো টুকরো করে কাটলো তার হাত পা মুণ্ডু। তারপর রক্তমাখা ছুরি হাতে খুঁজতে লাগলো সেই মেয়েটাকে। দু'দিনই যার দেহটা তাকে অনেক সুখ দিয়েছিলো।—সেই মেয়েটার তাজা খুন এখন চেখে দেখবে সে। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেলো। কয়েক ঘর ছাড়িয়ে একটা ঘরের চৌকির তলায় লুকিয়ে কাঁপছিলো। অল-আসার টেনে বের করলো তাকে। মেয়েটা ঢং জানে। পা-দু'টো জড়িয়ে ধরে সে-কি কান্না।—তুমি আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করো, সাহেব। এখানে এতকাল এরা আমাকে বন্দী করে রেখেছে। আমি যা নই সেই কাজ আমাকে দিয়ে করিয়েছে। আমি অবলা মেয়েছেলে। কি করবো বলো, পালাতে পারিনি। চব্বিশ ঘণ্টা দরজায় পাহারা। আসলে আমি কিন্তু অনেক খানদানী ঘরের মেয়ে। আজ বিপাকে পড়ে এই জাহান্নমে এসে পড়েছি।

আমার ভাই অল-আসার তখন মেয়েটিকে তুলে বসালো। হাজার হলেও সে তার শয্যাসঙ্গিনী। দু'দণ্ডের শান্তিও তো দিয়েছিলো। ওর কান্নায়, মনটা কিছু নরম হয়ে আসে। বলে, কী করে এখানে এলে? কে নিয়ে এলো?



—কে আবার! ঐ শয়তান দালাল বুড়িটা। যে তোমাকে ভুলিয়ে এনেছিলো। যে ফিদিন কত মক্কেলকে ভুলিয়ে এনে তাকে জানে প্রাণে মারে। আমি এক খানদানী বংশের মেয়ে। আমাদের বাড়িতে ঝি-এর নকরী নিয়ে কাজে ঢুকেছিলো ঐ বুড়িটা। কথাবার্তা কি মিষ্টি। একদিন আমার এক আত্মীয়ের শাদীর নিমন্ত্রণ ছিলো। মা বাবা বললেন, 'বুড়িমাকে নিয়ে যাও। সকাল সকাল ফিরে আসবে।' আমি আর বুড়ি রাস্তায় বেরুলাম। কিন্তু আমি তো আর পথঘাট চিনি না। কি করেই বা চিনবো? পথেঘাটে একদমই বেরুই না। বুড়ি বলেছিলো, সারা বাগদাদ তার নখদর্পণে। ঠিকানা জানা থাকলে সব জায়গায় সে যেতে পারে। তাই ভরসা করে মা-বাবা তাকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছিলো। তাছাড়া বুড়ি মানুষ, কথায়

বার্তায় তো চৌকস, দু'দিনেই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো তাদের। বুড়ি কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিয়ে গেলো না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে তুললো এই ডেরায়। এই গোলক ধাঁধায় একবার যে ঢুকেছে তার আর বেরুবার পথ নাই। আমিও বেরুতে পারলাম না। নিগ্রোটা আমার উপর বলাৎকার করে আমার সতীত্ব শেষ করে দিলো। তারপর খাঁড়া উঁচিয়ে ভয় দেখাতে লাগলো—সে যা বলবে অক্ষরে অক্ষরে না মানলে আমার গর্দান নেবে। জানের ভয়ে আমাকে গণিকা হতে হলো। এছাড়া আমার বাঁচার কোন উপায় ছিলো না।

আমার ভাই অল-আসার জিজ্ঞেস করলো,—এতদিন ধরে তো বহু লোকের সর্বনাশ করেছে ব্যাটা। অনেক পয়সা লুঠ করেছে। তা সে-সব পয়সাকড়ি, সোনাদানা সব কোথায়?

মেয়েটি গলা খাটো করে বললো, সব-সব আছে সাহেব। ওই পাশের ঘরে, সিন্দুক ভর্তি। সোনার মোহর ঠাসা। দেখবেন, চলুন।

—চলো, যাই দেখি—

মেয়েটির পিছনে পিছনে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। সিন্দুকটা খুলতেই চোখ ঝলসে যায়।

মেয়েটি বললো, চলুন, এগুলো নিয়ে আমরা এখান থেকে পালাই। এতো টাকা। সারা জীবন খুব আরামে কাটাবো আমরা দু'জন।

অল-আসার-এর চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। এত টাকা! এত টাকা নিয়ে সে—মানে তারা কি করবে? ভাবতে পারে না। মেয়েটি বলে, দাঁড়াও আমি কতকগুলো বস্তা নিয়ে আসি।

বারোখানা বস্তায় ভর্তি করা হলো সোনার মোহরগুলো। এক একটা বস্তা কি পেল্লাই ভারি। নড়ানো যায় না। মেয়েটি বলে, কী করে নেবে। বারোটা কুলীর কম হবে না।

অল-আসার বলে, তুমি দাঁড়াও, আমি কুলী ডেকে আনছি।

রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে কুলীর সন্ধানে। কিন্তু বারোটা কুলী এক সঙ্গে জোগাড় করতে একটু বেশীই দেরি হয়ে গিয়েছিলো। কুলীগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে, বামাল সুদ্ধ পাখী পালিয়েছে। কিন্তু পালালো কি করে? খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেলো—পিছন দিকে একটা খিড়কীর দরজা আছে।

মেয়েটা যদিও সোনাদানা সবই নিয়ে পালিয়েছে, অল-আসার দেখলো, ঘরে তবুও অনেক দামী দামী সাজ-পোশাক, আসবাব এবং আরো অনেক সামানপত্র রয়ে গেছে। তার দামও অনেক। একটা জীবনের পক্ষে সে সম্পদ যথেষ্ট। এগুলো বেচে যা পাওয়া যাবে তা দিয়ে ব্যবসা করলে দিব্যি ভালোভাবে চলে যাবে তার। কিন্তু এসব জিনিস সে নিয়ে যাবে কি করে। ঠিক করলো, আজ থাক, কাল সঙ্গে গাড়ি এনে বোঝাই করে নিয়ে যাবে। সেদিনের মতো সদর দরজায় তালা দিয়ে চলে গেলো অল-আসার।

পরদিন সকালে গাড়িঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হলো আবার। কিন্তু সামানপত্র আর ওঠানো হলো না। তার আগেই প্রায় জনা বিশেক সিপাই ঘিরে ফেললো সারা বাড়িটা। অল-আসার গ্রেপ্তার হলো। কোটাল বলতে থাকে, আমি সব শুনেছি। কীভাবে কতগুলো মানুষকে তুমি খুন করেছো। এবং সেখান থেকে টাকাকড়ি সব লোপাট করেছো।

অল-আসার চিৎকার করে ওঠে, কোটাল সাহেব? এ আপনি কী বলছেন? এক মিনিট ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো আগে শুনুন, তারপর আপনার যা অভিরুচি করবেন।

কোটাল বললো, বেশ বলো।

তখন অল-আসার গোড়া থেকে সব কাহিনী বিস্তারিতভাবে খুলে বললো। একটুও বাদ দিলো না—বা গোপন করলো না। তারপর কোটালকে একটা প্রস্তাব দিলো সে।—এখন শুনুন কোটাল সাহেব, আসল মাল কড়ি তো মেয়েটা নিয়ে পালিয়েছে—তবু এখনও যা

জিনিসপত্র আছে তার দামও নেহাৎ কম না। আমি বলি কি, এসবই তো এখন বেওয়ারিশ মাল। সরকার জানতে পারলে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাবে। তা সরকারের হাতে তুলে দিয়ে কী লাভ? আসুন আমরা দু'জনে ভাগাভাগি করে নিই। এতে মুফতে আমিও কিছু পেয়ে যাবো, আপনি পাবেন।

অল-আসার-এর প্রস্তাব শুনে কোতোয়াল রেগে কাঁই!—কী এতবড় কথা? অন্যের সম্পত্তি আমি হাতিয়ে নেবো? আমি ঘুষ খাবো? সরকার আমাকে বেতন দেয় না? এই কে আছিস্, লোকটাকে রাতের অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে এই সলতানিয়তের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসবি। এ রাজ্যে তোমার মতো অসৎ লোকের জায়গা হবে না। নির্বাসনই তোমার যোগ্য সাজা।

কোটাল আমার ভাইকে সেইদিনই রাতের অন্ধকারে অন্য দেশে পাচার করে দিয়ে আসে। তার কারণ, সে কোনও ভাগ দিতে চায় না, সে কোনও সাক্ষী রাখতে চায় না। আমি খবর পেয়ে আমার ভাইকে গোপনে ফিরিয়ে আনি আমার কাছে। কোতোয়াল টের পেতে পারে এই আশঙ্কায় তাকে ঘর ছেড়ে বেরুতে দিই না। আমার আশ্রয়েই রেখেছি তাকে। আমার রোজগারেই সে খেয়ে পরে বেঁচে আছে।

এই হলো অল-আসারের কাহিনী।

খলিফা কোনও মন্তব্য করলেন না। কোনও বাহবা দিলেন না। নাপিত বললো, আর একটিমাত্র ভাই-এর কাহিনী শুধু বাকী আছে। খুব সংক্ষেপে একটানা বলে শেষ করে দিচ্ছি, জাঁহাপনা।

নাপিতের ষষ্ঠ ভাই শাক্কাশিক-এর কাহিনী।

তাকে সবাই শাক্কাশিক বলে ডাকতো। তার কারণ ওর গলার স্বরটা ছিলো ভাঙ্গা কাঁসীর মতো। তার মতো গরীব দুঃখী এ সংসারে আর কেউ ছিলো না। নিজের রোজগারের অন্ন সে কোনও দিনই খায়নি। অন্যের দুয়ারে চেয়ে চিন্তে খেয়েই তার দিন কাটতো। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমাদের প্রত্যেক ভাইকে একশো দিরহাম করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে-টাকাও সে কোনও কাজে লাগাতে পারেনি। এক ছেনতাই দলের পাল্লায় পড়ে এক দিনেই তা নষ্ট হয়ে যায়।

শাক্কাশিক ছিলো একটা হাঁদা বোকা মানুষ। তার এই বোকামীতে মজা পেতো অনেকেই। বিশেষ করে বিত্তবানরা। আর তার এই নির্বুদ্ধিতায় মজা পেতো বলেই অনেক বড় লোকের বাড়িতে সে পাত পেড়ে খেতে পেতো।

এক দিন শাক্কাশিক দু'মুঠো খাবার-এর প্রত্যাশায় দরজায় দরজায় ঘুরতে ঘুরতে দিনান্তে এক বিরাট বড়লোকের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। প্রাসাদের মতো বাড়ি। অনেক লোকজন দাসদাসী পরিপূর্ণ। সদর দরজার প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গা, এতো পেল্লাই এই বাড়িটা কার?

প্রহরী জবাব দেয়, সে কি সেখ, জানো না! এতো সেই বারমাকী সাহেবদের বাড়ি। এককালে কত নাম ধাম ছিলো। খলিফার দরবারে এরা বংশানুক্রমে উজিরের পদে বহাল থাকতো। এখন যিনি মালিক, বৃদ্ধ হয়েছেন। দরবারের কাজে ইস্তফা দিয়ে বিশ্রাম করছেন। ছেলেপুলে কেউ নেই। একা। তা তোমার কি চাই?

শাক্কাশিক বলে, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। যদি কিছু খানাপিনা পাওয়া যায়...

প্রহরী বলে, যাও না, ভিতরে যাও। মালিক আমাদের খুব ধর্মাত্মা। কারো দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারেন না।

প্রহরীর কথায় আশা হয়। এক পা এক পা করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সামনের

বিশাল প্রাঙ্গণে ফুলের বাগিচা। মাঝখানে একটা জলের ফোয়ারা। নানা জাতের পাখীর কলরবে মুখর হয়ে আছে সারা কুঞ্জবন।

শ্বেত পাথরের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসে শাক্কাশিক। প্রশস্ত বারান্দা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে এক বিরাট কক্ষে। দামী গালিচায় মোড়া ঘরের মেজে। বাদশাহী আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো—ঝকঝকে তকতকে। একটা আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ। শাক্কাশিককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই তোমার?

শাক্কাশিক বলে, আজ সারাদিন কিচ্ছু খাওয়া হয়নি। যদি মেহেরবানী করে কিছু খেতে দেন—

বৃদ্ধ আহত হলেন, সে কি? আমার তো ধারণা ছিলো, এই বাগদাদ শহরে কেউই অভুক্ত থাকে না। ভালো হোক, মন্দ হোক, সাধ্য মতো খানপিনা সকলেই পায়। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—আমার ধারণা তো ভুল। এসো, এখানে বসো, আহা রে, সারাটা দিন অভুক্ত রয়েছো, আর আমি ভুরি ভোজ করে দিব্যি শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছি।

বৃদ্ধ তার একজন নফরকে ডেকে হাত মুখ ধোয়ার জল দিতে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে সাবান, জল এলো। বৃদ্ধ বললো, নাও, আর দেরি করো না, মুখ হাত ধুয়ে নাও, আমরা দু'জনে এক সঙ্গেই খাবো। আজ তুমি আমার মেহেমান।

এরপর নফর চাকররা নানারকম উপাদেয় খানা এনে সাজালো টেবিলে। বৃদ্ধ বললেন, নাও এসো, খানাপিনা তৈরি। এবার বসা যাক।

বৃদ্ধ কিন্তু কিছুই খেলেন না। শুধু খাবার-এর থালাগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাত মুখে ঠেকালেন। খাওয়ার অভিনয় করে পরমানন্দে চিবুতে থাকলেন, আর মাঝে মাঝে, 'বাঃ কি চমৎকার' বলে তারিফ করতে থাকেন। শাক্কাশিক বুঝতে পারে না, কী ব্যাপার? দারুণ খিদে পেয়েছিলো, গ্রোগ্রাসে খেতে থাকলো সে। বৃদ্ধ বললেন, এই শাহী কোপ্তাটা খেয়ে দেখো, ভারি স্বাদের হয়েছে। আমি একটা নিগ্রো মেয়ে রাঁধুনী রেখেছি—পাঁচশো মোহর দিয়ে। বড় ভালো রাঁধে মেয়েটি।



শাক্কাশিক খেয়ে তারিফ করলো, চমৎকার। এতো ভালো রান্না সে কোথাও খায়নি।

—আহা-হা, ওই মোরগ মোসাল্লামটা খাচ্ছো না কেন, ও জিনিস কোন সুলতান বাদশাহর বাড়িতে পাবে না।

আমার ভাই এক এক করে সবই উদরস্থ করতে থাকে। বৃদ্ধ এবার আপেল-ডিমের থালাটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, সবগুলো খেতে পারবে। মাত্র চুয়াল্লিশটা আছে। তোমার মতো বয়সে আমি একশো চুয়াল্লিশটা খেতাম।

শাক্কাশিক বলে, দেখি, চেষ্টা করে দেখি।

একটা একটা করে মুখে পুরে নেয়। এইভাবে থালাটা শূন্য করে ফেলে। বৃদ্ধ খুব খুশি হয়, তুমি তো বেশ খাইয়ে লোক আছো হে। তোমার মতো লোককে খাইয়ে সুখ আছে। আজ থেকে তুমি আমার এখানেই থাকবে—খাবে। আমি যতদিন বাঁচি। সেই থেকে আমার ভাই সেখানেই থেকে গেলো। বৃদ্ধ আরও বিশ বছর জীবিত ছিলেন। এই বিশটা বছর তাঁকে আর অন্য কোথাও যেতে হয়নি।

কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে, যেহেতু তার অন্য কোন ওয়ারিশ ছিলো না, কোতোয়াল তার সব-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে শাক্কাশিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিলো।

মনের দুঃখে ভাই আমার মক্কার পথে যাত্রা করে। মনের বাসনা, জীবনের বাকী দিনগুলো আল্লাহর নাম গান করে সেখানেই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক।

তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে মরুপ্রান্তর পার হওয়ার সময় দুর্ধর্ষ আরব্য-দস্যুদের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হলো সবাই। পয়সাকড়ি যার কাছে যা ছিলো তা নিয়ে ক্রীতদাস করে নিয়ে গেলো। দলের সর্দার তার নিজের বাড়ির নফর করে রাখলো শাক্কাশিককে। মাঝে মাঝেই তার উপর অত্যাচার চালাতো সে। বলতো, ওহে নবাব পুত্তুর হাত চালিয়ে কাজ কাম করো, মনে হচ্ছে, কোন দেশের আমীর ওমরাহ ছিলে তুমি। মাল-কড়ি অনেক আছে বুঝি দেশে। তা নিয়ে এসো না, তোমাকে ছুটি করে দেবো।

শাক্কাশিক বলে, এক কানা কড়িরও মুখ দেখিনি কখনও। সারাজীবন পরের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছি। কোথায় পাবো টাকা পয়সা?

দস্যু সর্দার বিশ্বাস করে না, থু করে থুথু ফেলে বলে, মিথ্যুক, তাহলে থাক, এখানেই পচে মর।

সর্দারের বৌটা ছিলো খুব সুন্দরী। বয়সে কাঁচা-ডাগর। যেমন তার রূপ তেমনি তার উদ্দাম যৌবন। সর্দার বেরিয়ে গেলেই বৌটা আমার ভাই-এর কাছে ঘেঁসে আসতো। গায়ের কাপড় ফেলে দিয়ে বলতো, আহা চোখটা তুলে দেখো না। আমার এই রূপ এই ভরা যৌবন ওই বুড়ো সর্দারটা এর কি মর্ম বুঝবে, বলো। তুমি জোয়ান মর্দ—তোমার হাতের পরশ পেলে আমার গায়ে ফুল ফুটবে গো। আহা, লজ্জা কি, এসো না!

শাক্কাশিকের হাত ধরে টানতে থাকে মেয়েটা। কিন্তু ভাই আমার ওসব ব্যাপারে একেবারেই হাঁদা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, নানা, আমার ওসব ভালো লাগে না।

মেয়েটা ঠোঁট ওলটায়, তোমার মতো একটা জোয়ান পুরুষ, ইচ্ছে করে না, কি গো! তুমি কি হিজরে নাকি?

এইভাবে আরো কিছুদিন কাটে। সর্দার বেরিয়ে গেলেই মেয়েটা ওর কাছে আসে। জামা কাপড় খুলে ফেলে শাক্কাশিককে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাই আমার অন্য ধাতুতে গড়া। কিছুতেই উত্তেজিত করতে পারে না তাকে। একদিন বৌটা এসে বললো, তুমি যদি আমার কথা শোনো, তাহলে তোমাকে পালাবার ব্যবস্থা করে দেবো আমি। দেখো, ভেবে দেখো আমার কথা।



শাক্কাশিকের মনে তখন একটা কথাই ঘোরাফেরা করে। মুক্তি পেতে হবে। যেভাবেই হোক, এই কয়েদখানা থেকে পালাতেই হবে তাকে। বৌটার কথায় ভরসা হয়। ওকে খুশি করতে পারলে পালাবার পথ করে দিতে পারে বোধহয়। অনেক ভেবেচিন্তে একদিন রাজি হয়ে গেলো শাক্কাশিক। মেয়েটা তো হাতে স্বর্গ পায়। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কে শুয়ে পড়ে। মেয়েটি তাকে খুব আদর করতে থাকে—চুমু খায়। একটা পুরুষকে জাগ্রত করার সব কৌশলই জানা আছে তার। শাক্কাশিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। দেহের রক্তে নাচন শুরু হয়। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। এখনি ঝড় উঠবে। এমন সময় যমদূতের মতো দরজার সামনে এসে খাড়া হয় সেই দস্যু সর্দার। এ সময়ে তার আসার কথা নয়। কিন্তু শাক্কাশিকের নিয়তির লেখা বুঝি এইরকমই ছিলো। ডাকাতটা হুঙ্কার ছাড়ে, তোর ঘাড়ে কটা মাথা, রে? আমার বৌ-এর সঙ্গে—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। এসো বাছাধন তোমাকে একটু শিক্ষা দিই।

এই বলে কোমরের শাণিত ছোরা বের করে প্রথমে শাক্কাশিকের ঠোঁট দু'টো কেটে নিলো।—আহা-হা ওই ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলে, বাছাধন?

যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে শাক্কাশিক। কিন্তু ডাকাতটা তখন পিশাচের হাসিতে ফেটে পড়ছে।—আহা, এতেই এত কাতর হলে চলবে কেন, এবার যে তোমার আসল অঙ্গটা কেটে নেবো। সারাজনম আর যাতে অসভ্যতা করতে না পারো তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

তারপর কি বলবো, জাঁহাপনা, সেই শয়তান ডাকাতটা আমার ভাই-এর পুরুষাঙ্গটাও কেটে ফেললো। শাক্কাশিক তখন অচৈতন্য। ডাকাতটা ভাবলো মরে গেছে। একটা উটের পিঠে চাপিয়ে উটটাকে পাহাড়ের পথে পাঠিয়ে দিলো। পাহাড়ে ওঠার পথে উটের পিঠ থেকে হড়কে পড়ে যাবে সে।

মক্কা যাত্রীরা এই পাহাড়ের পথ ধরেই যায়। তাদের কেউ কেউ চিনতে পেরেছিলো আমার ভাইকে। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই। নিজের কাছে নিয়ে আসি। আমার দাওয়াই-এর গুণে ওর ক্ষত সারতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু একেবারে অক্ষম হয়ে পড়ে আছে। আমার কাছেই থাকে। আমার ঘাড়েই খায়।

নাপিত বললো, এক এক করে আমার ছটি অপদার্থ অপরিণামদর্শী, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ভাইদের কাহিনী আপনাকে শোনালাম জাঁহাপনা। এবার আপনিই বিচার করে দেখুন, আমি কত বিচক্ষণ, কত জ্ঞানী, মহৎ পরোপকারী উদার আর স্বল্পভাষী।

খলিফা-অল-মুসতানসির বিল্লাহ ঘাড় নেড়ে বললেন, তোমার মতো সর্বগুণসম্পন্ন মানুষ দুনিয়াতে বিরল। তাই আমি আর তোমাকে এই ছোট্ট বাগদাদ শহরের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাই না। তোমার মতো বিচক্ষণ, উদার, পরোপকারী মানুষ দুনিয়ার বহু দেশেই নাই। আমার নির্দেশ, আজই—এক্ষুণি তুমি বাগদাদ ছেড়ে দুনিয়া সফরে বেরিয়ে পড়ো।

দুনিয়ার মানুষ তোমার সাহচর্য পেলে অনেকভাবে উপকৃত হবে।

এই বলে তিনি আমাকে সেইদিনই বাগদাদ থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। আমি তাই নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষে আপনাদের এই চীন দেশে এসে হাজির হয়েছি। আসার আগে হলফ করে এসেছি, যতদিন না খলিফা মুসতানসির বিল্লাহ মারা যাবেন ততদিন আর বাগদাদের মাটিতে পা রাখবো না। তিনি খলিফা হতে পারেন, কিন্তু গুণীর কদর বোঝেন না। আর এই ল্যাংড়া যুবকের উষ্মার কথাও সব শুনেছেন আপনারা। এবার বিচার করুন, আমি কি সত্যিই বেশী কথা বলি? আমার তো বিশ্বাস, আমার মতো মিতভাষী মানুষ আর দ্বিতীয় নাই। আর দূরদর্শিতার কথাই ধরুন—আমি তো সেই যুবককে পই পই করে বারণ করেছিলাম, এখন আপনি কোন নতুন কাজে যাবেন না। সময়টা খারাপ চলছে। কিন্তু আমাকে অগ্রাহ্য করে সে গেলো। পরিণামে কি বিপত্তি বলুন? সময় মতো আমি সেখানে না গেলে মেয়েটির বাবা কাজী সাহেবের হাতে তার প্রাণটাই খোয়া যেত। আমার জন্যে সে যে একটামাত্র পা-এর ওপর দিয়েই বেঁচে গেলো, সে জন্যে ধন্যবাদ তো দিলো না? আজকালকার দুনিয়াটাই এইরকম। যার আপনি উপকার করবেন, সেই আপনাকে বাঁশ দেবে।

নাপিতের এই সুদীর্ঘ কাহিনীর কচকচানী শেষ হলে আমরা উপস্থিত অভ্যাগতরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উফ্! লোকটা কি বকবকই না করতে পারে। আর বলে কিনা—অল-সামিত—একেবারে স্বল্পবাক! কি হামবড়াই ভাব। সে নাকি সেই সওদাগর ছেলেটিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। লোকটা ডাহা মিথ্যুক, শয়তান, বদমাইশ। তার হঠকারিতার জন্যেই ছেলেটির পা-টা খোঁড়া হয়ে গেছে। সে যদি চুল কামানোর সময় ঐ রকম বক বক করে ফালতু সময় নষ্ট না করতো তাহলে, যথা সময়েই সে মেয়েটির কাছ থেকে ফিরে আসতে পারতো। তার

দোষেই সে ঠিক সময়ে যেতে পারেনি। দেরি করে পৌঁছলেও সে কিছুতেই কাজীর হাতে ধরা পড়তো না। কিন্তু অনর্থক হৈচৈ বাঁধিয়ে খুঁচিয়ে সবাইকে জানানোর জন্যেই যত বিপত্তি ঘটলো। আমাদের মনে হতে লাগলো, দর্জি বলতে থাকে, নাপিতটা শয়তানী করেই ঐ কাণ্ডটা করেছিলো।

সবাই রাগে ফুঁসতে লাগলো। নাপিতটাকে শায়েস্তা করা দরকার। তার জন্যেই আমরা আজ এক মুসাফীর মেহমানকে হারালাম। ঠিক করা হলো, ওর সঙ্গে আমরাও কেউ খানাপিনা করবো না। ওকে পাশের একটা ঘরে চ্যাংদোলা করে তুলে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা মেরে দেওয়া হলো। ঘরটায় অসংখ্য ধাড়ী ইঁদুরের আড্ডা। এঘরে আমরা যখন খানা খাচ্ছি তখন তার কান্না আর চিৎকার কানে আসতে লাগলো, ওরে, বাবারে, আমাকে খেয়ে ফেললো রে। আমরা সে দিকে কর্ণপাত করলাম না। খুব মৌজ করে সরাব খেলাম। আকণ্ঠ খানা খেলাম। তারপর বিকেলবেলা বিবির জন্যে খানিকটা খাবার বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

বিবি আমার রেগে আগুন।—সারদিন তুমি আমাকে একা বাড়িতে ফেলে মজা করতে বেরিয়েছো। আমি এই দৈত্য পুরীতে একা একা কাটাই কি করে? তোমার কি কোনও আক্কেল বুদ্ধি নাই? আজই—এক্ষুণি যদি আমাকে নিয়ে বেড়াতে না যাও তা হলে, এই আমি চললাম কাজীর কাছে। তোমাকে তালাক দেবো।

আমি খুব শান্ত মেজাজের লোক, কোন সময়ই চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি সইতে পারি না। অশান্তি আমার ভালো লাগে না। তাই বললাম, নাও চলো, কাজীর কাছে আর গিয়ে কাজ নেই, এখন চলো একটু বেড়িয়েই আসি।

সুতরাং আমরা সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত নানা জায়গায় ঘুরলাম—দেখলাম। তারপর যখন বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখা হয়ে গেলো এই কুঁজোটার সঙ্গে। খুব টেনেছিলো সে। একেবারে বেহেড মাতাল অবস্থা। মনের আনন্দে আবোল তাবোল বকছে কখনও বা বেসুরোভাবে দু-একটা পরিচিত গানের কলি গাইছে। আবার কখনও বা বিনা কারণেই হো হো করে হাসছে। পথ চলতি মানুষের কোর্তার কোনা টেনে দিয়ে পালাচ্ছে। আবার কখনও বা ধেই ধেই করে নাচছে। আমার বিবি এবং আমি দু'জনে মিলে ঠিক করলাম, লোকটাকে বাড়ি নিয়ে গেলে বেশ মজা হবে। মদের নেশায় বিভোর সে। সুতরাং লজ্জা-শরমের বালাই নাই—প্রাণ খুলে নাচ গান হল্লা করে মাতিয়ে রাখবে।

কুঁজোকে বলতেই এক কথায় রাজি হয়ে গেলো। সেদিন ঘরে কিছু খাবার দাবার ছিলো না। আসার পথে দোকান থেকে প্রয়োজন মতো কিনে নিলাম। আমার বিবি পর পুরুষের সামনে বের হন না। কিন্তু কুঁজোকে তিনি কোনও মানুষ জ্ঞান করলেন না। একটা পুতুল বলে মনে হয়েছিলো তার। সুতরাং সকলে মিলে এক সঙ্গে খেতে বসলাম। কুঁজোটা তার কলা-কৌশল দেখাতেই মত্ত। মদের নেশায় খানার দিকে তার তখন নজর নাই। আমার বিবি এক টুকরো মাছ তার মুখে পুরে দিলো—জোর করেই। কুঁজোটা কিছুতেই মুখে নেবে না, আমার বিবিও ছাড়বে না। এই জোর করে খাওয়ানোর মধ্যেও বেশ একটা মজা পাচ্ছিলো সে। কিন্তু বিপদ হলো ওখানেই। একটা মাছের টুকরো জোর করে গিলতে গিয়ে আটকে গেলো গলায়। আর সেটা উগরে নিচে না নিতে পারায় সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে গেলো।

আমরা তো ভয়ে অস্থির। আমার বিবি তখন তাকে কোলে নিয়ে চললো হেকিমের কাছে। আমিও গেলাম সঙ্গে। হেকিমের বাড়ির সিঁড়ির ধাপে তাকে বসিয়ে রেখে চলে আসি আমি।

এর পরের কাহিনী তো আপনি হেকিম, বাবুর্চি ও খ্রীষ্টান দালালের জবানীতেই

শুনেছেন। এখন বলুন, জাঁহাপনা, যে কাহিনী আপনাকে শোনালাম—সেই ল্যাংড়া তরুণ সওদাগর, সেহ নাপিত আর তার ছয় ভাই-এর কাহিনী কি আপনার এই কুঁজোর আশ্চর্যজনক মৃত্যুর কাহিনীর চেয়ে আরো অদ্ভুত না?



চীনের সুলতান তারিফ করে ঘাড় দোলালেন, নিশ্চয়ই। তোমার কাহিনী আরও তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে আমাকে? কিন্তু সেই নাপিতটা কোথায়? তাকে আমি দেখতে চাই। তার মতো অদ্ভুত মানুষ তো আমি দেখিনি কখনও! তাকে যদি আনতে না পারো তোমাদের চারজনের কাউকেই ছাড়বো না।

দর্জি বললো, এ আর এমন বেশি কথা কি জাঁহাপনা। আপনার লোকজন আমার সঙ্গে দিন, আমি এক্ষুণি আপনার সামনে তাকে হাজির করে দিচ্ছি।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। যা লোকজন দরকার নিয়ে যাও। ধরে হোক, বেঁধে হোক, যেভাবে পারো তাকে নিয়ে এসো। নাপিতকে নিয়ে আসার পর কুঁজোকে কবর দিতে হবে। তার সমাধির উপর আমি একটা স্মৃতিসৌধ বানাবো। সে আমার বড় প্রিয় বয়স্য ছিলো।

সুলতানের লোক-লস্কর নিয়ে দর্জি গেলো নাপিতের সন্ধানে। ঘণ্টাখানেক বাদে নাপিতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো তারা। সুলতান দেখলো, নাপিতের বয়স প্রায় নব্বই হবে। দাড়ি গোঁফ সবই দুধের মতো সাদা। কান দু'টো ফুটো করা। নাকটা ভীষণ চোখা। চোখ দু'টো হাতীর মতো একেবারে খুদে। সুলতান তাকে দেখে হেসে খুন।

—ওহে নাপিত, তোমার কাহিনী শুনে আমি ভারি মজা পেয়েছি। তাই তোমাকে সামনাসামনি দেখার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার লোকজন হয়তো তোমাকে ধরে বেঁধে এনে অনেক কষ্ট দিয়েছে। যাই হোক কিছু মনে করো না। শুনেছি তুমি খুব স্বল্পভাষী লোক। তা তোমার মজার মজার কাহিনীর দু'একটা আমাকেও শোনাও।

নাপিত বললো, তা হুজুর মিথ্যে কিছু শোনেননি। গল্প আপনি যতো শুনতে চান শোনাবো। সাত দিন সাত রাত অনর্গল বলে যেতে পারি। তাতে আমার কোন ক্লান্তি নাই। কিন্তু তার আগে হুজুর, আমাকে বলুন, এই খ্রীষ্টান, এই মুসলমান, এই ইহুদী আর কুঁজোর লাস—এরা সব এখানে কেন? কী ব্যাপার? আপনি শুনেছেন, আমি একেবারে স্বল্পভাষী। এবং কোন কিছু জানার জন্যে অহেতুক কৌতূহল আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না। তবুও আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, এরা সব এখানে কেন?

সুলতান বললেন, এসব ব্যাপারে তোমার এতো আগ্রহ কেন, নাপিত? এদের কাহিনী শুনে তুমি কী করবে?

নাপিত বললো, আমার দূরদৃষ্টি দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা ভুলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্যেই, আমি মিত-বাক হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। এবং আপাতদৃষ্টিতে আপনার মনে হতে পারে—আমি অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করছি, কিন্তু এই কৌতূহল অহেতুক নয়, তাও আপনাকে আমি প্রমাণ করে দেবো।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, শোনো।

কুঁজোর মৃত্যু থেকে শুরু করে খ্রীষ্টান দালালের ফাঁসীর হুকুম পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী নাপিতকে শোনানো হলো।

নাপিত সব শুনেটুনে বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়তে লাগলো।—তোমাদের কেউ কুঁজোর মুখের কাপড়টা সরিয়ে দাও, দেখি—

একজন কাপড়টা সরিয়ে নিলো। নাপিত কুঁজোটার মৃতদেহর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিবিষ্ট মনে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকলো। অনেকক্ষণ ধরে। তার চোখ মুখ গলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর এক সময় তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে হো হো করে হাসতে লাগলো। মুখের ভাবখানা—সব সমস্যার জলের মতো সমাধান করে ফেলেছে সে।—হুম্, মারা সে সত্যিই গেছে। দুনিয়াতে এমন কোনও হেকিম বদ্যি নাই, যে ওকে আবার বাঁচাতে পারে। কিন্তু আমি পারি। আমি ওকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারি।

সুলতান সহ দরবারের সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। এমন অদ্ভুত কথা কি কেউ শুনেছে কখনও। মরা মানুষ আবার বেঁচে উঠবে?

সুলতান বললো, দর্জি তোমার সম্বন্ধে অনেক মজার কথাই আমাকে শুনিয়েছে, কিন্তু এমন আজগুবি ব্যাপার তুমি ঘটাতে পারো, তেমন তো কোনও আভাষ পাইনি।

নাপিত বললো, আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? না হওয়ারই কথা। যাই হোক, এক্ষুণি আপনার সামনেই দেখিয়ে দিচ্ছি। কী করে আবার কুঁজোটা বেঁচে ওঠে, একবার দেখুন।

কোমরে গোঁজা সন্নাটা হাতে নিয়ে কুঁজোর কাছে এগিয়ে গেলো। এক হাত দিয়ে মুখটা হাঁ করিয়ে অন্য হাত দিয়ে সন্নাটা ঢুকিয়ে দিলো মুখের ভিতর। কয়েক মুহূর্ত। সন্নাটা বের করলো। তার মুখে মাছের একটা টুকরো।

সঙ্গে সঙ্গেই, কি আশ্চর্য কুঁজোটা চোখ মেলে তাকালো। তাজ্জব ব্যাপার। এ-ও সম্ভব। মরা মানুষ বেঁচে উঠলো?

সুলতান হতবাক। হতবাক সকলেই। অবাক বিস্ময়ে সবাই চেয়ে দেখে কুঁজোটাকে—চেয়ে থাকে নাপিতের মুখের দিকে।

নাপিত তখন নির্বিকার। এমন ভাব—যেন বিশেষ কিছুই হয়নি। এ আর এমন কি—আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে পারে সে।

সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। খোদার পয়গম্বর ছাড়া এমন অলৌকিক ঘটনা কে ঘটাতে পারে? মুহূর্তের মধ্যে নাপিত সম্পর্কে সকলের ধারণা আমূল পাল্টে গেলো। কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী না হলে এরকম ঘটনা কি করে সম্ভব? নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে স্বয়ং এখানে পাঠিয়েছেন।

সুলতান বললেন, জীন্দগীতে অনেক আশ্চর্য ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তুমি আজ যা দেখালে নাপিত, তার জবাব নাই। এরকম তাজ্জব ঘটনা একমাত্র আল্লাহর পয়গম্বর ছাড়া আর কেউ ঘটাতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, তিনিই তোমাকে পাঠিয়েছেন। আমার দরবারের প্রিয়তম বয়স্য এই কুঁজো। এর বিয়োগে আমার দরবারে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিলো। তুমিই আবার আলো জ্বালিয়ে দিলে। আমার মুখে হাসি ফোটালে। সবই তাঁর অপার লীলা। তিনিই তোমাকে পাঠিয়েছেন। না হলে, দর্জির সঙ্গেই বা তোমার দেখা হবে কেন? আর সেই বা বলবে কেন তোমার অলৌকিক গুণের কাহিনী? দর্জির মুখে শোনার পর থেকে আমার কিন্তু বার বারই মনে হচ্ছিলো, তোমার ভেতরে এমন একটা কিছু গুণ আছে যা অন্যের চোখে ধরা পড়ছে না। তুমি এলে তাই প্রিয় বয়স্যর প্রাণ রক্ষা পেলো। সে নিশ্চিত মারা গেছে—আমরা তার শেষকৃত্য করবো বলে তৈরি হচ্ছিলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহ সমাহিত করা হতো। শুধু তোমার কল্যাণে আমরা আবার তাকে ফিরে পেলাম। এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি ঘটতে পারে?

সুলতান তার মহাফেজখানার প্রধানকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লিখে সযত্নে রেখে দাও। ভাবীকালের মানুষ পড়ে এর থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

এর পর দর্জি, ইহুদী হেকিম, বাবুর্চি এবং খ্রীষ্টান দালালকে মূল্যবান সাজপোশাক ও স্বর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃত করে বিদায় দিলেন সুলতান। কুঁজোকেও নানা পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত করে আবার দরবারে বসালেন। আর নাপিতকে দিলেন হীরা জহরৎ বসানো সোনার জ্যোতিষ দর্পণ, সোনার কাঁচি, সোনার ক্ষুর। তাছাড়া নানারকম দামী দামী সাজপোশাক দিয়ে বললেন, আজ থেকে তুমি আমার সভার আর এক বয়স্য হলে। তোমাকে আমি আমার ব্যক্তিগত ক্ষৌরকার নিযুক্ত করলাম।

শাহরাজাদ একটুক্ষণের জন্য থামলো। এখানেই এ কাহিনীর শেষ। কিন্তু শাহজাদা, এর চেয়েও চমৎকার কাহিনী আছে। আপনি শুনে আরও তাজ্জব বনে যেতে পারেন।

বাদশাহ শারিয়ার বললো, কী সেই কাহিনী?

মধুমিতা এবং আলী নূরের কাহিনী এবার শোনাবো আপনাকে। এ কাহিনী আরও মজাদার আরও চমৎকার।

এক সময়ে বসরাহর সিংহাসনে সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান অল-জিনি অধিরূঢ় ছিলেন। দীন দুঃখীদের প্রতি দরদ ছিলো তার অপরিসীম। তার মতো ধর্মপ্রাণ সুলতান সে সময়ে খুব কমই ছিলো।

সুলতানের দুই উজির। একজনের নাম সাবীর পুত্র মইন আর একজন কা-কনের পুত্র অল-ফাদল। তিনি ছিলেন খুব দয়ালু, সৎ এবং জ্ঞানী। যে কেউ যে কোনও সমস্যা নিয়ে হাজির হলে তিনি তা ধৈর্য সহকারে শুনতেন এবং তার যথাযোগ্য সমাধান করে দিতেন। কিন্তু অন্য উজির মইন ছিলেন ঠিক তার উল্টো। কোনও লোককেই সহ্য করতে পারতেন না। বিনা কারণে চটে যেতেন। এবং লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড বিধান করতেন।

প্রজারা মইনের প্রতি যেরূপ অপ্রসন্ন ছিলো, সেই রকমই ভালোবাসা ভক্তি ছিলো অল-ফাদলের প্রতি।

একদিন মহম্মদ ইবন সুলেমান শুনলো, বসরাহর বাজারে ভালো ভালো ক্রীতদাসী এসেছে। অল-ফাদলকে ডেকে সুলতান বললেন, তুমি নিজে যাও, দেখে শুনে একটা খুবসুরৎ ক্রীতদাসী কিনে নিয়ে এসো। দেখতে শুনতে এমন হওয়া চাই, যেন সবাই তারিফ করে। সবার সেরা হওয়া চাই। শুধু দেখতে সুন্দর হলেই চলবে না, স্বভাব চরিত্র খুব ভালো হওয়া দরকার।

এমন একটা কাজের ভার তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেওয়া হচ্ছে দেখে মইন ক্ষুব্ধ হয়। একটু রাগত স্বরেই বললেন, কিন্তু জাঁহাপনা, আপনার যেমন পছন্দ সেরকম একটা ক্রীতদাসী কিনতে গেলে দশ হাজার মোহরের কমে পাওয়া যাবে না।

সুলতান মইনের এই গায়ে পড়ে কথা বলায় বিরক্ত হন। খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন, কোষাগার থেকে দশ হাজার মোহর অল-ফাদলকে দাও।

খাজাঞ্চী মোহর নিয়ে এসে দিলো। সুলতান বললেন যাও অল-ফাদল, বাজারে যাও। যা বললাম ঠিক সেইরকম হওয়া চাই।

সুলতানের হুকুম শিরোধার্য করে অল-ফাদল বাজারে চলে গেলেন। সব দালালদের ডেকে জানালেন তাঁর চাহিদা। দালালরা শুনে বললো, কিন্তু হুজুর সেরকম ক্রীতদাসী তো এ বাজারে নাই। এখন যা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা সেরা দাম হতে পারে বড়জোড় হাজারখানেক দিনার।

অল-ফাদল বললেন, ঠিক আছে, খুঁজে পেতে দেখো, যা ভালো পাও নিয়ে এসো।

সারাদিন খুঁজেও তেমন কোন মেয়ে পাওয়া গেলো না, যা হাজার দিনার দিয়ে কেনা যায়। দালালরা বললো, হুজুর এই মাসের শেষে একটা চালান আসবে। সেই চালানে কিছু

ভালো মেয়ে পাবেন। তার মধ্যে থেকে বাছাই করে নিলে হয়তো সুলতানের পছন্দ হতে পারে।

অল-ফাদল ফিরে গেলেন। সুলতানের কাছে আরও কিছু সময় প্রার্থনা করে বললেন, আপনি আর কয়েকটা দিন সময় দিন আমাকে। এই মাসের শেষে ভালো ভালো মেয়েছেলে আসার কথা আছে।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে অপেক্ষা করবো। কিন্তু তোমাকে যা বলেছি—দুনিয়ার সেরা মেয়ে হওয়া চাই।

কিছুদিন পরে এক দালাল এসে বললো, হুজুর, আপনি যা চাইছেন, সেইরকম একটা মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অল-ফাদল বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারো আমার প্রাসাদে নিয়ে এসো তাকে। আমি আগে দেখবো, তারপরে সুলতানকে দেখাবো।

ঘণ্টাখানেক বাদে একটি মেয়েকে সঙ্গে করে সেই দালাল হাজির হলো অল-ফাদলের প্রাসাদে। মেয়েটি বেশ লম্বা এবং তন্বী। সরু কোমর সুগঠিত স্তন, কাজল কালো টানাটানা চোখ। আপেলের মতো সিঁদুরে, মসৃণ চিবুক। মুখে তার হাসি লেগেই আছে। আর হাসলে পরে গালে এক অদ্ভুত সুন্দর টোল খায়। গায়ের রং দুধে আলতায়। মেয়েটা কারণে অকারণে খিলখিল করে হাসতে থাকে। দাঁতগুলো ওর ধবধবে সাদা মুক্তোর মতো। আঙ্গুরের মতো টসটসে ঠোঁট। গুণ গুণ স্বরে গানের কলি ভাঁজছিলো সে। আহা, কি মিষ্টি তার কণ্ঠ।

অল-ফাদল ভাবেন, এমন রূপের হাট, সুলতান দেখলে নির্ঘাৎ পছন্দ করবেন। একেবারে ভরা যৌবন—ডাঁসা পেয়ারা।

অল-ফাদল জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

—আনিস-অল-জালিস।

নামের মানে—মধুমিতা। দেখে এবং তার কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হলেন উজির। দালালকে জিজ্ঞেস করলেন, কী দাম?

দালাল বললো, ওর মালিক বলেছে দশ হাজার দিনার। আমার মনে হয় দামটা এমন কিছু বেশী বলেনি সে।

উজির বললেন, ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো। ওর মালিককে ডেকে নিয়ে এসো। টাকাটা আমি ওর হাতে দেবো।

দালাল নিয়ে এলো মেয়েটার মালিককে। উজির দেখলেন, লোকটি বয়সে বৃদ্ধ। কিন্তু বড় সৌখিন। জাতে পারসিক অল-ফাদল জিজ্ঞেস করলেন, কতো দাম নেবে মেয়েটার?

লোকটি বললে, সুলতান যদি ইচ্ছা করেন, বিনামূল্যেই দিতে পারি। তবে দাম যদি জিজ্ঞেস করেন, দশ হাজার মোহরই নেবো। তাকে আমি নবাব বাদশাহদের যোগ্য মানুষ করেছি। আরবী এবং পারসী সাহিত্যে তার ভালো দখল আছে। অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, আইন, সমাজবিদ্যায় তার তুল্য পারদর্শী খুব কমই পাবেন হুজুর। আমি তার লেখাপড়া বিষয়ে কোনও কার্পণ্য করেনি। তার চরিত্রে কোন খুঁত খুঁজে পাবেন না। আচার ব্যবহারে সে সকলের মনে জয় করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমি রাখি। সবচেয়ে বড়, তার রসবোধ। এমন সূক্ষ্ম রস-জ্ঞান অনেকেরই হিংসার বস্তু। এবং এই কারণেই তার নাম মধুমিতা।

উজির বললেন, তোমার কোন কথাই অবিশ্বাস করছি না। এই নাও, দশ হাজার মোহরই দিলাম, গুণে দেখো।

পারসিক লোকটি টাকাগুলো গুণতে গুণতে বললো, আপনাকে একটা কথা বলি, মেহেরবানী করে আজই ওকে সুলতানের সামনে দাঁড় করাবেন না। পথশ্রমে ও ভীষণ

ক্লান্ত। ওর রূপের জেল্লা কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে। দশটা দিন ওকে আপনার কাছে রাখুন। একটু বিশ্রাম করুক। স্নানটান সেরে নতুন সাজপোশাক পরুক। তারপর দেখবেন আজ যা দেখছেন তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী হয়ে উঠবে সে। তখন সুলতান তাকে দেখলে আপনার ওপর আরো খুশি হবেন।

বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য মনে হলো উজিরের। নিজের প্রাসাদের একটা সুসজ্জিত কক্ষে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

উজির অল-ফাদলের একটি পুত্র ছিলো। তার মতো রূপবান যুবক সচরাচর চোখে পড়ে না। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। সুঠাম দেহের গড়ন। টানাটানা চোখ উন্নত নাসিকা প্রশস্ত ললাট। ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল।

ছেলেটির নাম আলী নূর। মধুমিতা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। কত টাকায় কেনা হয়েছে এবং কার জন্যে কেনা হয়েছে তার কোনও খবরই সে রাখে না।

উজির মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, আজ থেকে দশ দিন তুমি এইখানেই থাকবে। পথের ক্লান্তি কাটিয়ে নাও। তারপর তোমাকে সুলতানের সামনে নিয়ে যাবো। কিন্তু একটা কথা, তোমাকে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি। আমার একটি ছেলে আছে—পাজি বদমাইশ। কিন্তু দেখতে সুন্দর সুপুরুষ। তুমি কিন্তু নিজেকে খুব শক্ত করে রাখবে। তার মোহে নিজেকে বিলিয়ে দিও না। তাহলে সুলতানের কাছে আমি বে-ইজ্জত হবো। সে এমনি যাদু জানে, মেয়েরা তাকে দেখলেই মজে যায়। আমার পুত্র এ মহল্লার একটি মেয়েকেও আস্ত রাখেনি। মেয়েগুলো আপনা থেকেই পতঙ্গের মতো উড়ে পড়ে তার রূপের আগুনে। আমার শ্রীমান তাদের প্রত্যেককে দগ্ধ করে মারে। এই তার কাজ। তুমি খুব সাবধানে থাকবে। ঘরের দরজা খুলে একা বাইরে যাবে না। খোজাকে বলে রেখেছি, তোমার পাশেই থাকবে সে। তোমার যা প্রয়োজন, তাকে বলো, সেই সব করে দেবে। তোমার গলার আওয়াজ যেন ঘরের বাইরে না যায়। একবার যদি সে জানতে পারে তুমি আছো এখানে, তাহলে আর রক্ষে নাই। সে তোমার সামনে এসে দাঁড়ালে তাকে আর কোনও চেষ্টা চরিত্র করতে হবে না, তুমি নিজেই তোমার নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

মধুমিতা বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, আপনি যা বললেন তাই হবে।

কিন্তু বিধির লিখন কে করে খণ্ডন! পরদিন মধুমিতা গোসলের জন্যে বামন-খোজার সঙ্গে হামামে গেলো। আতর মেশানো জলের ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করলো। সারা গায়ে সাবান মাখিয়ে দিলো খোজা। এমন বিলাসবহুল গোছলের কথা শোনেওনি কখনও। আজ প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। নতুন সাজ-পোশাক পরে হাতে মেহেদী, নখে পালিশ পায়ে আলতা, কপালে টিপ, চোখে সুর্মা কাজল লাগিয়ে হামাম থেকে বেরিয়ে এলো সে। উজির সামনে থাকলে চিনতেই পারতেন না তার এমন রূপের বাহার খুলেছে তখন। খোজারা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো উজিরের বিবির কাছে। এই তিনি প্রথম দেখলেন মেয়েটিকে। উজিরের বিবি মধুমিতাকে দেখামাত্র এগিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন। পালঙ্কে নিয়ে গিয়ে বসালেন, তোমার রূপের আলোয় দেখো কেমন ঘর ভরে গেছে। এত রূপ তুমি কোথায় পেলে মধুমিতা? এমন যার নিজের রূপ, কি দরকার তার এত সাজে?

মধুমিতা বিগলিত হয়। রূপের প্রশংসা করলে কে না মুগ্ধ হয়? বলে, আপনি মা। মা-এর চোখে মেয়ে চিরদিনই সুন্দর। আল্লাহ আপনাকে সুখে রাখুন, মা।

আলী নূর-এর মা মধুমিতার জন্যে শরবৎ আর মিষ্টি আনতে বললেন। শরবৎ মিষ্টি এলো। মধুমিতা খুব তৃপ্তি করে খেলো। আলী নূরের মা বললেন, মা, তুমি একটু বিশ্রাম করো, আমি হামামে যাচ্ছি গোছল সেরে আসি।

দুটি বামন খোজাকে পাহারায় বসিয়ে তিনি তার পরিচারিকাদের সঙ্গে নিয়ে হামামে চলে গেলেন। খোজা দু'টোকে বলে গেলেন, ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।



নূরের মা চলে গেলে মধুমিতা সাজ-পোশাক ছেড়ে বিবস্ত্রা হয়ে পালঙ্কে শুয়ে পড়লো। একটুক্ষণ পরে নূর এসে ঢুকলো প্রাসাদে। বাইরে থেকে ফিরে প্রথমে সে মা এর সঙ্গে দেখা করে। এটা তার চিরকালের অভ্যাস। মা-এর ঘরের দরজার সামনে আসতেই দেখে দুটি বামন-খোজা পাহারা দিচ্ছে। নূর জিজ্ঞেস করে, কিরে তোরা আজ এখানে?

—জী হুজুর মা-জী হামামে গেছেন, তাই—

—মা-জী হামামে গেছেন, তা তোরা এখানে বসে কি করছিস।

—আমাদের ছোটা মালকিনকে পাহারা দিচ্ছি, হুজুর।

—ছোটা মালকিন? সে আবার কে?

—জী, মধুমিতা, নতুন এয়েছেন। কেন, হুজুর, আপনি জানেন না? উজির সাহেব—আপনার বাবা দশ হাজার মোহর দিয়ে কিনে এনেছেন আমাদের সুলতানের জন্য।

নূর ঘরের ভিতরে ঢুকতে যায়। খোজা দু'টো বাধা দেয়। বলে, আপনি ঢুকবেন না হুজুর। আমাদের গর্দান যাবে। মালকিন আমাদের বারণ করে গেছে, ঘরে যেন কাউকে ঢুকতে না দিই। যাবেন না হুজুর। যাবেন না—

কিন্তু নূর কি ওদের কথায় কর্ণপাত করার পাত্র? দরজা ঠেলে সে ঢুকবেই। আর তাকে বাধা দেয় কার সাধ্য? বাইরে কার সঙ্গে খোজা দু'টো কথা বলছে—মধুমিতা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। এ নিশ্চয়ই আলী নূর। উজির তাকে এই আলী নূর সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে গেছেন। ভীষণ বাজে ছেলে সে। তার সঙ্গে সে যেন কোনমতেই কথা না বলে। তার সামনে না যায়। সারা বাগদাদের একটা মেয়েও তার সতীত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তার হাত থেকে। কী এমন চেহারা যা দেখে মেয়েরা পাগল হয়ে স্বেচ্ছায় নিজের দেহ বিলিয়ে দেয়? মধুমিতার দেখতে ইচ্ছে হয়। তবে এও ঠিক উজির সাহেব তাকে যা নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে সে। আর তাছাড়া, এ পর্যন্ত কত সুপুরুষ ছেলেকেই তো দেখেছে। তারা সবাই তার রূপের আগুনে পুড়ে মরতে চেয়েছে। তারাও তো অনেকেই সুপুরুষ ছিলো। কিন্তু মধুমিতাকে কেউ টলাতে পারেনি। আর আলী নূর এমন কি কন্দর্পকান্তি যে তাকে দেখে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। মধুমিতা ভাবে, আচ্ছা দেখাই যাক না! সে যদি নিজে ঠিক থাকে তবে একটা আলী নূর কেন, হাজারটা এলেও তার কিছু করতে পারবে না। পালঙ্ক থেকে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটা পাল্লা একটু ফাঁক করে দেখে। মধুমিতার সারা শরীরে কেমন যেন শিহরণ খেলে যায়। একি! এমন রূপ কোনও পুরুষ মানুষের হয়? নূর এর চোখে চোখ পড়তেই তার সব তালগোল পাকিয়ে যায়। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। দেহ অবশ হয়ে আসে। কাম-বাণে জর্জরিত হয় সারা শরীর। মধুমিতা বুঝি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। দরজাটা বন্ধ করে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু হাত ওঠে না।

নূরও অপলক চোখে দেখতে থাকে মধুমিতাকে। এমন নিখুঁত সুন্দরী সে তো সারা বসরাহতে একটাও দেখেনি। কত হাজার রূপসী নিজে থেকে এসে তার সামনে বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের যৌবন বিলিয়ে দিয়েছে তার পায়ে। তাদের মধ্যে, কাউকেই তো মনে করতে পারছে না, এর পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে। এযে শালা একেবারে ডানা কাটা হুরী। দরজা

ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে আলী নূর। ভীত শশকের মতো মধুমিতা ছিটকে সরে যায় ঘরের এক কোণে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে থাকে। না না, সে কিছুতেই দেখবে না তাকে। উজিরের কাছে সে কথা দিয়েছে, নূর-এর সঙ্গে কথা বলবে না। তার হাতে ধরা দেবে না।

নূর এগিয়ে আসে।—কি গো সুন্দরী, মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আহা, অমন চাঁদের মতো সুরৎ—একটু দেখাও। প্রাণভরে দেখে জীবন সার্থক করি।

মধুমিতা তখন কি করবে বুঝতে পারে না। হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে নূরকে দেখে। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। লোকটা কি জাদু জানে নাকি? তা না হলে সে কেন বলতে পারছে না, তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। কেন বলতে পারছে না, তোমার বাবাকে আমি কথা দিয়েছি, তোমার সঙ্গে কথা বলবো না, তোমার মুখ দেখবো না। মধুমিতা চেষ্টা করে কিন্তু মুখে কথা সরে না। আস্তে আস্তে পালঙ্কে গিয়ে বসে। নূর সামনে এসে দাঁড়ায়। থুতনিটা তুলে ধরে বলে, আমি দেখতে এতই খারাপ, মুখটা নিচু করে আছো কেন? দু'টো কথা বলতেও আপত্তি? তাহলে আর কি উপায়। চলেই যাই।

নূর বেরিয়ে যাওয়ার ছল করে ফিরে তাকায়। মধুমিতা এবার খপ করে ওর হাত ধরে ফেলে। নূর ওর চোখের দিকে তাকায়। মধুমিতার চোখে করুণ মিনতি। মুখে কোনও কথা বলে না। চোখের ইশারায় বলে, পাশে বসো।

নূর হাসে। গা ঘেঁসে বসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঠোটে ঠোঁট চেপে ধরে। মধুমিতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না, ছাড়িয়ে নিতে চায়ও না। সারা শরীরে এক অভূতপূর্ব পুলক জাগে। সেও দু'হাত দিয়ে নূরকে আরও শক্ত করে চেপে ধরে বুকে। ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। নূর এবার ওকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। মধুমিতা বলে, দাঁড়াও। আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।



আলী নূর উঠে এসে খোজা দু'টোর মুখের সামনে দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা। খোজা দু'টো হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, মালিক আপনি বেরিয়ে আসুন,আপনার বাবা জানতে পারলে আমাদের গর্দান যাবে। মালিক, বেরিয়ে আসুন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নূর আর মধুমিতা তখন অমৃত সায়রে সাঁতার কাটছে। খোজা দু'টো কাঁদতে কাঁদতে বেগম সাহেবের হামামের দিকে ছুটে যায়। নূরের মা তখন হামাম-এ ঢুকেছেন। দাসী পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে তিনি স্নান পর্ব সারছেন। খোজা দু'টো হামামের দরজায় করাঘাত করতে থাকে। 'মা-জী শিগ্গির বেরিয়ে আসুন, সর্বনাশ হয়ে গেছে।' কিন্তু বেগম সাহেবা তখন বেরুবেন কি করে। তার গায়ে সাবান ঘসছে দাসীরা। এখনও স্নানের অনেক বাকী। একজন পরিচারিকা এসে দরজাটা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞেস করে, এই মুখপোড়ারা, অতো চেল্লাছিস কেন? জানিস না, বেগম সাহেবা এখন বে আব্রু, গোছল করছেন?

একটা খোজা বলে, কিন্তু মেরে জান, এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

মেয়েটি এবারে মারমুখো হয়ে বেরিয়ে আসে, কে তোর 'মেরে জান' রে হতচ্ছাড়া?

—আহা অতো চটছো কেন সুন্দরী? না হয় মুখেই একটা কথা বললাম, তা বলে কি আর সত্যি সত্যিই তুমি আমার বিবিজান হতে পারো নাকি। আল্লাহ সাধ দিয়েছেন ষোলআনা—সাধ্য দেয় নি এক কণা।

—আহা দুঃখু করিস নি, অমন করে দুঃখু করিস নি রে। আমি আল্লাহকে বলে দেবো, সে যেন পরের জন্মে তোকে একটা রাম পাঁঠা বানিয়ে পাঠায়। তা হলে তোর কি মজা হবে বল? সারা দিন রাত শুধু পাঠি পাল দিয়ে দিয়ে বেড়াতে পারবি। সাত জন্মের সাধ এক জন্মেই মেটাতে পারবি।

খোজাটা চটে যায়, এই—ভালো হবে না বলছি। গালাগাল করছো কেন?

—গালাগাল? ওমা, গালাগাল আবার কখন করলুম রে, বাঁদর?

—গালাগাল করলে না? এই তো এক্ষুণি রামপাঁঠা বললে!

—ওঃ এই কথা। রামপাঁঠা কি একটা গালাগাল হলো? আর এই বাঁদর বললাম, বাঁদরটা গালাগাল হলো না? ওটা বুঝি আদর হলো, নারে হাঁদা।

খোজাটা এবারে কেঁদে ফেলে। দাঁড়াও বেগম সাহেবাকে বলে কেমন পিটানী খাওয়াই তোমাকে। আমাকে রামপাঁঠা বলেছো, আমাকে বাঁদর বলেছো।

মেয়েটা এবার খিল খিল করে হাসে। —আর কিছু বলিনি তোকে? ওরে মাথা মোটা তোকে যে আমি মুখপোড়া, হতচ্ছাড়া, হাঁদা বললাম সেগুলো তাকে বলবি নি?

খোজাটা মাথা চুলকায়, একটু ফিক করে হেসে বলে, কি যে বলো, মেরে কলিজা, ওগুলো তো তুমি আমাকে আদর করে বলো।

মেয়েটা এবার মারতে হাত ওঠায়। মেরেই ফেলবো, তোকে আদর করতে যাবো কেন র‍্যাঁ—ছুঁছো? তার আগে জহর মুখে পুরতে পারবো না। তা যাক, কেন ডাকছিলি, বল।

খোজাটা দাঁতে জিভ কাটে। হেই বাবা, সব ভুলে মেরে দিয়েছি। ওদিকে তো কম্মো ফতে হয়ে গেলো।

মেয়েটা বুঝতে পারে না খোজাটার এই হেঁয়ালী। ভুরু কুঁচকে বলে, কিসের কম্মো ফতে হলো রে, কি বলছিস?

—মধুমিতা...

—মধুমিতা? মধুমিতা কী?

মধুমিতার কম্মো ফতে করে দিয়েছে এতক্ষণ—

নিজের গাল নিজেই থাবড়াতে লাগলো খোজাটা। যে কথা বলার জন্যে সে ছুটে এসেছিলো, মেয়েটার সঙ্গে আশনাই করতে গিয়ে, সেই আসল কথাই সে ভুলে গেছে।

মেয়েটা এবারে অবাক হয়। সে কি রে? কে—?

খোজাটা বলে, ছোটা মালিক।

মেয়েটার মুখটা হা হয়ে যায়, আলী নূ-র্-র্...

এক মুহূর্ত। তার পরই চিৎকার করে ভিতরে ছুটে যায়, বেগম সাহেবা—তাড়াহুড়া করে কোন রকমে সাজপোশাক করে ছুটে এলো বেগমসাহেবা। মধুমিতা তখন অসাড় অবসন্ন দেহে এলিয়ে পড়ে আছে পালঙ্ক শয্যায়। বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন, নূর? সে কোথায়।

—চলে গেছে।

—তাকে তুমি ঘরে ঢুকতে দিলে কেন, মা? তোমাকে না তোতা পাখীর মতো পড়িয়ে গেলাম, যেই আসুক ঘরে ঢুকতে দেবে না?

—আমি দিই নি, মা। সে জোর করে ঢুকেছে।

—তারপর কী হলো?

মধুমিতা চুপ করে থাকে। বেগম সাহেবা গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করেন। বলো, সে কি সর্বনাশ করে গেছে।

মধুমিতা বলে, সবই করে গেছে—আমার সবই নিয়ে গেছে সে।

তুমি কেন রাজি হলে, মা। এখন যদি উজির শোনেন, কী হবে?

—আমি কি করবো বলুন, আমি তাকে বারণ করেছিলাম কিন্তু আমাকে সে অন্যভাবে বোঝালো।

—কী ভাবে?

মধুমিতা বলে, আমি তাকে বললাম, তোমার বাবা আমাকে সুলতানের জন্যে দশ হাজার মোহর দিয়ে কিনে এনেছেন।

সে বললো, আগে সেই রকমই ঠিক ছিলো। কিন্তু সুলতান নাকি আমাকে গ্রহণ করবেন না। তাই উজির সাহেব ঠিক করেছেন আপনার ছেলেকে উপহার দেবেন আমাকে।

—আর তুমি সেই কথা বিশ্বাস করলে?

মধুমিতা কেঁদে ফেলে, আপনি বিশ্বাস করুন, মা। সে এমনভাবে বললো যাতে বিশ্বাস না করে পারলাম না। তাছাড়া আমি তো বাঁদী। হুকুম তামিল করাই আমার কাজ।

বেগম সাহেবা তখন রাগে ক্ষোভে দুঃখে নিজের গাল নিজে থাবড়াতে লাগলো।—এখন আমি কি করি। উজিরকে আমি কী বলবো? তাঁর মতো শান্তশিষ্ট মানুষ হয় না। কিন্তু অন্যায় তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। তাছাড়া সুলতানের এই অসম্মান তিনি তো কিছুতেই সহ্য করবেন না। ছেলেকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবেন।

এমন সময় উজির ফাদল ঘরে ঢুকলেন। —কী ব্যাপার তোমরা এমন কান্নাকাটি করছো কেন? কী হয়েছে?

বেগম সাহেব কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আগে তুমি খোদার নামে হলফ করে কথা দাও আমি যা বলবো তার বাইরে কিছু করবে না। তা হলে কোনও কথা গোপন করবো না। সব খুলে বলবো। আর আমাকে কথা দিয়ে যদি তা না মানো তাহলে আমার মরা মুখ দেখবে।



উজির ফাদল খোদার নামে দিব্যি করে বললো, তুমি যা বলবে তার বাইরে আমি কিচ্ছু করবো না, বেগম। তুমি নির্ভয়ে বলো।

তখন বেগম সাহেবা আগাগোড়া সব ঘটনা খুলে বললেন তাকে। তার বদমাইশ ছেলে কিভাবে মধুমিতার ঘরে ঢুকে তাকে ধাপ্পা দিয়ে তার সর্বনাশ করে পালিয়েছে শুনে উজির মাথা চাপড়াতে লাগলেন। —হায় হায় একি হলো আমার। এখন আমি কি মুখ নিয়ে সুলতানের কাছে দাঁড়াবো? রাগে দুঃখে নিজের জামার কাপড় ছিঁড়ে ফেড়ে কুটি কুটি করতে লাগলেন।

বেগম সাহেবা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। —নিজেকে শক্ত সংযত করো। এই বিপদের সময় ভেঙে পড়লে তো চলবে না। আমি তোমাকে দশহাজার মোহর দিয়ে দেবো। নগদ যা আছে নাও, এবং বাদবাকী আমার গহনাপত্র বিক্রী করে দশ হাজার মোহর পূরণ করে সুলতানকে ফেরৎ দিয়ে দাও।

উজির বললেন, একি কথা বলছো নূর-এর মা। তুমি কি শুধু টাকার কথাই ভাবছো? টাকাটা আমার কাছে কিছুই না। আমি ভাবছি আমার ইজ্জতের কথা। সুলতানের কাছে কি বে-ইজ্জত হবো, একবার ভাবো। হয়তো সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে আমার গর্দানও নিতে পারেন।

বেগম বললেন, কিন্তু সুলতানরা মধুমিতার কথা এখনও জানেন না। তাকে তো চোখে দেখেন নি তিনি। সুতরাং মধুমিতাকে যে তার হাতে তুলে দিতে হবে তার কি কোন মানে আছে। আমি তোমাকে দশ হাজার মোহর দিচ্ছি। তুমি বরং অন্য একটা মেয়ে কিনে দাও তাকে।

এতে তোমার জান প্রাণ ইজ্জত সবই ঠিক থাকবে। মধুমিতা যেমন এখানে আছে তেমনি থাক। ছেলেটাও বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছে। মধুমিতার রূপে তোমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে। এবং ছেলেদের বশ করার মতো রূপ তার আছে।

উজির বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু নূরের মা, এটা তুমি বুঝছো না কেন চারদিকে শত্রুর অভাব নাই। সুলতানের আর এক উজির মইন আমার খুঁত ধরার জন্যে ওৎ পেতে আছে। পাপ কখনো চাপা থাকে না। একদিন যখন তার কানে যাবে এই সব কথা সুলতানকে জানাতে কসুর করবে না। আমার কিভাবে সর্বনাশ হয় সেই পথই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এই সময় রাত্রি অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ তার গল্প থামায়।

পরদিন তেত্রিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার শুরু করে শাহরাজাদ।

তারপর শুনুন জাঁহাপনা, উজির ফাদল তার বেগমকে বললেন, তুমি বুঝতে পারছো না নূর-এর মা, উজির মইন জানতে পারা মাত্র সুলতানকে ভাঙ্গানী দিতে আরম্ভ করবে। 'জাঁহাপনা আপনি যাকে আপনার একান্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত উজির বলে মনে করেন, সে কি চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে একবার শুনুন। আপনি যে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাকে দিয়েছিলেন, সেই টাকায় সে দুনিয়ার সেরা একটি বাঁদী কিনেছিলো। কিন্তু তার পুত্র-এর খুব পছন্দ হওয়ায় তার ভোগের জন্য উজির ফাদল নিজের প্রাসাদেই তাকে রেখে দেয়। এবং বলে, সুলতানের তো হাজারটা বাঁদী রক্ষিতা আছে, তাদের দলে পড়ে মেয়েটার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। আর বুড়ো সুলতান এই ষোড়শী যুবতীকে খুশিই বা রাখবে কি করে। এই বলে মেয়েটিকে ছেলে নূর-এর হাতে তুলে দিয়ে নিজের জেব থেকে টাকা দিয়ে আর একটা বাঁদী আপনার জন্যে যোগাড় করে এনে দিয়েছে। কিন্তু সে-মেয়ের নখের যোগ্য এ বাঁদী। এই হলো আপনার একান্ত বশংবদ প্রিয়পাত্র উজির অল-ফাদলের কীর্তি-কাহিনী। মইন তোমার ছেলের গুণের কথাও বলতে ছাড়বে না। সে যে সারা বাগদাদের তামাম কুমারী মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে এ কথা সে ফলাও করে বলবে। এবং মধুমিতা যে এখনও আমার প্রাসাদে নূর-এর অঙ্কশায়িনী রক্ষিতা হয়ে দিন কাটাচ্ছে তাও সে জানিয়ে দেবে। তখন? তখন কী হবে? সুলতান আমাকে গভীর বিশ্বাস করেন। তিনি হয়তো ভাববেন, মইন হিংসার জ্বালায় এসব মিথ্যে বানিয়ে বলছে। কিন্তু মইন-এর শয়তানী তো আমি জানি বেগম, সে তখন সুলতানকে বলবে, 'ঠিক আছে আপনার যদি বিশ্বাস না হয় আমাকে হুকুম দিন তাকে ফাদল-এর প্রাসাদ থেকে এক্ষুণি তুলে এনে হাতেনাতে ভজিয়ে দিচ্ছি।' সুলতান তখন কি বলবেন? তিনি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলবেন, 'ঠিক আছে যাও, নিয়ে এসো দেখি।' মইন তখন লোক লস্কর নিয়ে এসে আমার বাড়ি তল্লাশী করে মধুমিতাকে তুলে নিয়ে যাবে সুলতানের কাছে। তখন তোমার এই মধুমিতা কি সুলতানের জেরার সামনে সত্যি কথা না বলে পার পাবে। আর মধুমিতার মুখ থেকে যখন শুনবেন তিনি, আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। এই দাঁওটাই মইন খুঁজবে। সে তখন সুলতানকে বিষিয়ে দেবে, 'জাঁহাপনা আপনি যাকে একবিন্দু অবিশ্বাস করেন না, সে আপনার সঙ্গে কি সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে দেখুন। এবং আমি যে কতো অনুগত এবং হিতৈষী নোকর তাও আপনি প্রমাণ পেলেন।' এরপর আমার ওপর সুলতানের আর কোন আস্থা থাকতে পারে না। এতকাল ধরে যে মান ইজ্জত আমার তৈরি হয়েছিলো তাসের ঘরের মতো এক ফুৎকারে তা ধসে পড়ে যাবে। এবং সুলতান আমার প্রাণদণ্ডের বিধানও দিতে পারেন।

বেগম-সাহেবা তাকে বললেন, কবে কি ঘটবে না ঘটবে আগে থেকেই তুমি অতোশতো ভাবছো কেন? আমি তুমি নূর আর মধুমিতা এই ক'জন ছাড়া ঘটনাটা কেউ জানে না।

জানবেও না। সুতরাং তোমার মইনই বা জানবে কি করে? আর সুলতানের কানেই বা বিষ সে ঢালবে কি করে? তুমি কিছু ভেবো না, কেউ জানবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, তিনিই সব বিপদ কাটিয়ে দেবেন।

বেগমের কথায় উজির ফাদল কিছুটা শান্ত হন। কিন্তু পুত্র নূরের প্রতি ক্রোধ তার কমে না একবিন্দু।

আলী নূর অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। সে যখন মধুমিতাকে নিয়ে সুখের সায়রে ভাসছে সেই সময়ে, খোজা দু'টো চিৎকার করতে করতে হামামের দিকে ছুটে যায়। হামাম থেকে তার মা ফিরে আসার আগেই মধুমিতার মধু নিগড়ে খেয়ে ক্ষিপ্রবেগে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যায় সে। বুঝতে পারে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে। অনেক রাতে ফিরে সে নফর চাকরদের কাছেই সব শুনে নিলো। গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে মেয়ে মহলে তার মা এর ঘরে গিয়ে ঢোকে। হাজার হলেও মায়ের মন, কোথায় গেলো, ফিরবে কি ফিরবে না এই চিন্তায় ঘর বার করছিলো। ছেলেকে কাছে পেয়ে ধড়ে প্রাণ এলো। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো। —এতরাত অবধি কোথা ছিলি, বাবা?

নূর বলে আব্বাজান খুব চটে আছেন, তাই না মা?

যে গুণধর ছেলে তুমি। বাপের মুখে চুনকালি দেবে। আর বাপ তোমাকে চুমু খাবে। যাও একবার তার সামনে, কোতল করে ফেলবে।

নূর বললো, আমি এখান থেকে একেবারে চলে যাবো।

—সে কি, বাবা। না না, অমন কথাটি মুখে এনো না। তোমার কিছু ভয় নাই। হারেম ছেড়ে বাইরে যাবার দরকার নাই। তোর বাবার যতদিন না রাগ পড়ছে আমার ঘরে আমার কাছেই থাক। তিনি তো খবর না দিয়ে এ মহলে কখনও আসেন না।

সেই রাত থেকে নূর তার-মা-এর মহলেই রাত্রিবাস করতে লাগলো। মধুমিতা থাকে পাশের কামরায়। সারাটা রাত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাটায়।

একদিন বেগম সাহেবা উজির ফাদলকে বললেন, আর কত দিন ক্রোধ নিয়ে থাকবে। ছেলে তো শুনবে কোনদিন দেশত্যাগী হয়েছে। তখন? তখন খুব সুখ হবে তোমার? আমি বেঁচে বর্তে থাকি তা কি তুমি চাও না।

উজির বাধা দিয়ে বলেন, আহা কী হলো? কী সব অলুক্ষণে কথাবার্তা বলো? তা কী করতে হবে বলো?

—ছেলে তোমার ভয়ে ভয়ে সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। অনেক রাতে এসে আমার ঘরে ঢোকে। ছেলে বড় হয়েছে। এখন কি আর সেই ছোটবেলার শাসন চলে? আজ রাতে তুমি আমার ঘরে থাকবে। ছেলে এলে তাকে ভালোভাবে বোঝাবে। এবার তাকে বদখেয়াল ছাড়তে হবে। বিয়ে শাদী করে সংসারী হতে হবে। মধুমিতা মেয়েটা বড় ভালো। অমন সুন্দরী মেয়ে তো তুমি সারা দুনিয়া ঢুঁড়েও যোগাড় করতে পারবে না। আর তোমার ছেলে তাকে ভালোওবাসে প্রাণ দিয়ে। ওর সঙ্গে শাদী দিলে ছেলে তোমার ঘরে থাকবে। তা হোক না পয়সা দিয়ে কেনা বাঁদী। অনেক খানদানী ঘরের ছুঁচোর কেত্তন তো আমার জানতে বাকী নাই। বাইরে সতীপনা দেখায়। ভিতরে ভিতরে চাকর-নফর দিয়ে কাম সারে।

উজির বিরক্ত হয়। আঃ নূরের মা, তোমার মুখে কিছু আটকায় না!

বেগমের পরামর্শ মতো রাত্রিবেলা উজির তার ঘরে যায়। অনেক রাতে আলী-নূর ঢুকতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। —বদমাইশ বেত্তমিজ আজ তোকে খুনই করে ফেলবো। বাঁদর ছেলে, আমার মান-ইজ্জৎ সব ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছো তুমি!

বেগম সাহেবা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে চেপে ধরেন উজিরের হাত। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। ছেলেটাকে খুন করবে?

—হ্যাঁ আমি ওকে খুনই করবো। ও যদি নিজেকে না শুধরায়, না ভালো হয়, অমন ছেলে থেকে আমার দরকার নাই।

বেগম বলেন, তুমি শান্ত হও। আমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভালো পথে নিয়ে আসবো। ছেলেমানুষ ভুল না হয় করেইছে। তাকে তো বোঝাতে হবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। তা না করে যদি আগেই এমন সাজা দাও কী ফয়দা হবে। ছেলেটা মরে গেলে আর ফেরৎ পাবে?

নূর বাবার পায়ের উপর পড়ে ছিলো। এবার মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে বললো, আব্বাজান, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি আর কোনোও খারাপ কাজ করবো না। আপনার অবাধ্য হবো না।

উজির-এর মন নরম হয়। ছেলেকে টেনে তুলে পাশে বসান। —বাবা, এখন তুমি বড়ো হয়েছো, ভালো-মন্দ বুঝতে শেখো। লোকে তোমার নামে বদনাম দিলে বাবা হয়ে আমি সহ্য করি কি করে? এবার বিয়ে শাদী করে সংসারী হও। তুমি যে মধুমিতাকে ভালোবাসো তাতো কখনও বলোনি। মেয়েটি বড়ো ভালো। তার মতো রূপ ও গুণের মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি। তুমি যদি আমাকে কথা দাও তাকে নিয়ে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করবে তাহলে মধুমিতার সঙ্গে তোমার শাদী দিয়ে দেবো। কিন্তু একটা কথা, শাদীর পরে অন্য কোনও বদখেয়াল আমি বরদাস্ত করবো না। তাকে ঘরে ফেলে রেখে অন্য কোনও মেয়েকে নিয়ে বেলেল্লাপনা করতে পারবে না। তাকেই তোমার সারা জীবনের একমাত্র সঙ্গী করে রাখতে হবে। তাকে ঘরে রেখে আর কোনও মেয়েকে শাদী করে আনতে পারবে না।

আলী নূর বললো, না, আব্বাজান, তা হবে না। মধুমিতাকে ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে আমি ভালোবাসতে পারবো না। আমি ভালো হতে চাই। আপনি শাদীর ব্যবস্থা করুন।

সারা প্রাসাদে আনন্দের হিল্লোল উঠলো। আলী-নূর-এর সঙ্গে মধুমিতার শাদী হবে। উজির অল-ফাদল দশ হাজার মোহর দিয়ে অন্য একটা বাঁদী কিনে এনে সুলতানকে দিলেন। মহাজাঁকজমক করে নূর ও মধুমিতার শাদী হয়ে গেলো। এ খবর কিন্তু চাপা থাকলো না। দুষ্ট মইন সব খবরই জানতো। কিন্তু সুলতানের সামনে মুখ খুলতে সাহস করলো না। মইন ভাবলো, অল ফাদল সুলতানের সুনজরে আছে, এ সময় তার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে গেলে কোন কাজ হবে না। বরং সুলতান তার উপর ক্ষিপ্ত হতে পারেন। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। সুতরাং সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই শ্রেয়।

সেই সুযোগ একদিন এসে গেলো। অল-ফাদল অসুখে পড়লেন। এবং সে অসুখ থেকে আর সেরে উঠতে পারলেন না তিনি। মাত্র দু'দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করলেন। মৃত্যুর আগে পুত্র নূর-কে ডেকে বললেন, বাবা আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। আমি চললাম। তোমার বয়স অল্প তাই ভয় হয়, দেখে শুনে ঠিক পথে চলতে পারবে কিনা। আল্লাহর উপর ভরসা রেখো। সৎভাবে জীবন যাপন করো। তারপর নসীবে যা আছে তাই হবে। সবাইকে একদিন যেতেই হবে। চিরকাল এখানে কেউ থাকার জন্যে আসে না। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, এবার আমার যাবার পালা। তাই মনে কোনও শোক ক'রো না। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, মধুমিতা বড় ভালো মেয়ে। সে শুধু রূপসীই না, তার মতো বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ মেয়ে আমি দেখিনি। সংকট কালে তার পরামর্শ নিও। সে তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান করে দেবে। আল্লাহ একমাত্র সহায়। তিনি ছাড়া অন্য কোনও পথ নাই। তাঁর প্রতি তোমার যেন ভক্তি থাকে, এই আমার একমাত্র ইচ্ছা।

বসরাহ শহরে শোকের ছায়া নেমে এলো। উজির অল ফাদল দেহরক্ষা করেছেন। সারা শহর ভেঙে পড়লো উজিরের প্রাসাদের সামনে। আবাল বৃদ্ধ নারী চোখের জল ফেলতে লাগলো, তার মতো এমন একজন দীন দুঃখীর বন্ধুকে হারিয়ে আজ তারা শোকাহত।

যথাযোগ্য আড়ম্বরে পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করলো নূর। আমির ওমরাহ এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শোক মিছিলে সামিল হলেন। নূর কোনও কার্পণ্য করলো না। প্রচুর অর্থব্যয়ে উপযুক্ত মর্যাদায় সমাহিত করা হলো তার পিতার মর-দেহ। সবাই বাহবা দিলো। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান।

বাবার অবর্তমানে নূর শোকে ভেঙে পড়লো। আর সেই আগের মতো হৈ হল্লা করে বেড়ায় না। নিজের প্রাসাদেই মন মরা হয়ে পড়ে থাকে। ভালো করে খায় না, কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চায় না।

একদিন নূর তার ঘরে বসে বাবার স্মৃতিচারণ করছে এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। তারই সমবয়েসী একটি যুবক এসে ঘরে ঢুকলো। তার বাবার বন্ধুর ছেলে। নূর-এর সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা আছে। ছেলেটি বললো, দোস্ত, এতো ভেঙে পড়ছো কেন? মা-বাবা কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। কেউই এ সংসারে চিরদিনের জন্যে থাকতে আসেনি। সবাইকে একদিন ঐ পথে যেতে হবে। এর জন্যে শোক করো না বন্ধু। এই-ই দুনিয়ার নিয়ম। একে সহজভাবে মেনে নিয়ে নিজের দায়দায়িত্ব পালন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আল্লাহর পয়গম্বর এই রকম নির্দেশই আমাদের দিয়ে গেছেন। এবার সব ঝেড়ে ফেলে, আবার হাসো গাও।

নূর কিন্তু বিষণ্ণতা কাটাতে পারে না। বন্ধুর কথার জবাবে কি বলবে তাও ঠিক করতে পারে না।

বন্ধু বলে, এক কাজ করো, একদিন সব ইয়ার-দোস্তদের নিমন্ত্রণ করো। খুব হৈ হল্লা করে খানাপিনা করো। দেখবে সব শোক তাপ কেটে যাবে, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

আলী নূর ভাবলো, কথাটা মন্দ বলেনি সে। এই গুমোট ভাবটা কাটাবার জন্যে একটু হৈ হল্লা করা দরকার। নূর এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা জনা দশেক। একেবারে জীগরী দোস্ত যাকে বলে। এমন একদিন ছিলো, সারা দিনরাত তাদের সঙ্গে কাটিয়েছে সে। কথায় বলে না, এক গেলাসের ইয়ার। সেই রকম দশ জন বন্ধুকে খানাপিনার নিমন্ত্রণ করে একটু আনন্দ স্ফূর্তি করে মনের ভার লাঘব করবে ঠিক করলো।

বন্ধু বললো তা হলে আর দেরি কেন, আজ সন্ধ্যা বেলাতেই বসা যাক একসঙ্গে?

আলী বলে, সেই ভালো। তাই ডাকো।

সেদিন বিকেল থেকে বৈঠকখানার বড় কামরাটা ভালো করে সাজানো হলো। খাবার টেবিলে পাতা হলো পাট ভাঙ্গা ধবধবে সাদা কাপড়। টেবিলের মাঝে মাঝে বাহারী ফুলদানী বসানো হলো। আতর আর গুলাব জল পিচকারী করে খুশবু ছড়ানো হলো সারা ঘরে। সুগন্ধী আগর আর বেলোয়াড়ী ঝাড়ে বাতি জ্বালানো হলো। যেন কোন উৎসব আসর।

এক এক করে বন্ধুরা এলো সবাই। দশজনই কেতা দুরস্ত সাজে সেজে গুজে এসে বসলো টেবিলে। দামী সরাবের পাত্র পূর্ণ করে দিতে লাগলো বাবুর্চি, সাজিয়ে দিলো, কোপ্তা, কাবাব, চাঁপ, তন্দুরী, মোরগ মসল্লাম এবং আরও অনেক বাদশাহী খানা। খুব মৌজ করে সরাব পান করলো সকলে। খুশির মেজাজে ঝলমল করে উঠলো সারা প্রাসাদ। অনেক দিন বাদে নূর যেন আবার নূতন জীবন—আগের সেই মধুর জীবনের স্বাদ ফিরে পেলো। অনেক রাত অবধি চললো এই খানাপিনার উৎসব। যাবার সময় বন্ধুদের প্রত্যেককে দামী পোশাক উপহার দিলো আলী-নূর।

আবার হাসি গানে ভরে উঠলো আলী নূরের জীবন। প্রায় প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির বৈঠকখানায় আসর বসে। কোনদিন আমীর ওমরাহদের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করে। আবার কোনদিন এসে জমায়েত হয় বসরাহর বিখ্যাত সওদাগররা। সবাইকে সাদর অভ্যর্থনায় স্বাগত জানায় নূর। খানাপিনার আসর সরগরম হয়ে ওঠে। যারাই তার প্রাসাদে আসতে লাগলো, প্রত্যেককে দামী দামী উপহার সামগ্রী বিতরণ করতে থাকলো সে। মধুমিতার কিন্তু গোড়া থেকেই খুব অমত ছিলো। সে বলতো, তোমার বাবা বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এসব করতেন, তাঁর সাজতো। কিন্তু তুমি তার ছেলে, উজির আমীর কিছুই হতে পারোনি, কিন্তু এইভাবে তার জমানো টাকা পয়সাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছো, সেটা কি ঠিক হচ্ছে?



নূর আহত হয়। বলে দেখো, আমি উজিরের ছেলে, দীন ভিখিরির মতো আচার ব্যবহার তো আমার পোষায় না। এসব না করলে মান ইজ্জত থাকে কি করে?

মধুমিতা বলে, তোমার যতদিন পয়সা আছে কিছুর অভাব হবে না। কিন্তু বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও একদিন শেষ হয়। তারপর কী করবে? তার চেয়ে বলি কি—এসব বন্ধ রেখে একটা কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করো। এখনও যা আছে তা দিয়ে মোটামুটি একটা ভালো ব্যবসাই দাঁড় করাতে পারবে। ব্যবসাতে লাভ হলে সেই টাকা দিয়ে তাদের আদর আপ্যায়ন করো না? তাতে তুমি বিপদে পড়বে না, কিন্তু এখন যা করছো, এতো আত্মহত্যার সামিল।

কিন্তু মধুমিতার এসব পরামর্শ তার ভালো লাগলো না। বললো তুমি বুঝতে পারছো না, মিতা, এইসব নামজাদা বড়লোকদের সঙ্গে দহরম-মহরম থাকলে তবেই ভালো মুনাফার ব্যবসা করতে পারবো। তা না হলে, ছোটোখাটো দোকানপাট করে কি এমন ফয়দা উঠানো যাবে? আর তাছাড়া ইয়ার বন্ধুদের হাতে রাখলে বিপদে আপদে তারা তো পাশে এসে দাঁড়াবে।

মধুমিতা ভাবে, নূর এক রঙিন স্বপ্নে বিভোর। এখন কোনও কথাই তার ভালো লাগবে না। খোয়াব যখন কেটে যাবে, তখন সে বুঝতে পারবে, দুনিয়া কি আজব জায়গা।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আসর বসে, আলী-নূর-এর প্রসাদে। ইয়ার বন্ধুরা এসে হৈহল্লা করে খানাপিনা করে। ভালো ভালো উপহার সামগ্রী নিয়ে চলে যায়। এইভাবে একদিন জমানো টাকা সব শেষ হয়ে আসে। বাবুর্চি এসে বলে, মালিক, আজকের খানাপিনার ব্যবস্থা কি করে হবে? টাকা পয়সা যা ছিলো সবই ফুরিয়ে গেছে।

আলী নূর চিন্তান্বিত হয়। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুরা এসে জড়ো হতে থাকে। কিন্তু খানাপিনা গান বাজনার কোন ব্যবস্থা না দেখে তারা অবাক হয়। নূর এগিয়ে আসে।—তোমরা আজ ভাবছো, কেন কোনও আয়োজন করা হয়নি। তবে শোনো, বন্ধুরা, আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে তার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিলো সবই আমি খরচ করে ফেলেছি। আজ আমি নিঃস্ব। হাতে একটা পয়সা নাই যে তোমাদের কোন আদর আপ্যায়ন করি। এখন ভাবছি, সবই তো শেষ হয়ে গেলো, এর পর কি করে চালাবো। তোমরা দশজন আমার জীগরী দোস্ত—প্রাণের বন্ধু। তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও—কি করা যায়।

একজন বন্ধু বললো, কাল থেকে ভাই, আমার বিবির খুব জ্বর। আমাকে এখুনি যেতে হবে। শুধু তোমাকে এই কথাটা জানাবার জন্যেই এসেছিলাম।

আর একজন বলে, আজ রাতে আমার বড়ভাই-এর ছেলের ছুন্নৎ। আমাকে সেখানে হাজির থাকতেই হবে। আর ভাই দেরি করতে পারছি না। আজকের মতো চলি। পরে আবার দেখা হবে, কেমন?

এইভাবে এক এক করে সব বন্ধুই তাদের 'ভীষণ জরুরী' কাজের অছিলায় কেটে পড়লো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নূর দেখলো তার বৈঠকখানা ফাঁকা—একা বসে আছে সে।

একটু পরে মধুমিতা এসে নূর-এর ঘাড়ে হাত রাখলো। গভীর চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলো সে। মধুমিতার স্পর্শে সম্বিত ফিরে পায়।

—কী ভাবছো?

নূর বলে, আর কি ভাববো, মিতা, আমার কিছু নাই শুনে সবাই চলে গেলো।

—এমনটা যে ঘটবে, সেতো তোমাকে অনেক আগেই আমি বলেছিলাম। যতক্ষণ তোমার ট্যাক ভারি থাকবে ততক্ষণ তারা তোমাকে ঘিরে থাকবে। আর যখন বুঝতে পারবে, তুমি ফতুর হয়ে গেছো, তোমার একমাত্র বিশ্বস্ত কুকুর ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তখন তোমার চোখে সোনালী রঙ। আমার কথা তোমার ভালো লাগেনি। কিন্তু সোনা, এখন বুঝতে পারছো, এই বাঁদীর কথা বাসী হলে মিঠা লাগে।

আলী-নূর বলে, তুমি তো জানো মিতা, আমি আমার সর্বস্ব খরচ করে দিয়েছি আমার বন্ধুদের মনোরঞ্জনের জন্যে। তারা আমার কাছে যে যা চেয়েছে কখনও বিমুখ করিনি। দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছি বাবার যত সব মূল্যবান সংগ্রহ। আজ এই বিপদের দিনে তাদের কাছে গিয়ে যদি দাঁড়াই তারা কি আমাকে সাহায্য করবে না?

—না করবে না, মধুমিতা জোর দিয়ে বলে, কেউ করবে না। যারা এতোদিন ধরে মুঠো ভরে নিয়ে গেলো আজ তাদের কাছ থেকে কানাকড়ি সাহায্য তুমি পাবে না। এই ভবিষ্যৎবাণী তোমাকে আমি অনেক আগেই করেছিলাম।

নূর মাথা নেড়ে বলে, না না, মিতা তুমি সবাইকে একই ছাঁচে ঢেলে দেখো না। আমার বন্ধুরা তেমন হবে না। আমি তো তাদের ছোটবেলা থেকে জানি। আমার দোস্তরা আমার জন্যে জান কবুল করতেও কসুর করবে না।

—তোমার বন্ধুদের তুমি ছোটবেলা থেকে জানো, আর আমি তাদের চোখেও দেখিনি কখনও। কোনও আলাপ পরিচয় নাই। তবুও আমি তোমাকে যা বলে দিলাম, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।

পরদিন সকালে আলী-নূর বন্ধুদের কাছে গেলো। উদ্দেশ্য, কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। না হলে এমন অবস্থা—হাঁড়ি চড়বে না। প্রথমে এক বন্ধুর দরজায় কড়া নাড়তেই একটি নিগ্রো দাসী এসে খুলে দিলো, কাকে চান?

—তোমার মনিবকে বলো গিয়ে আলী-নূর এসেছে।

মেয়েটি ভিতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললো, মালিক বললেন, তিনি বাড়ি নাই।

সরল অবোধ মেয়েটির কথা শুনে হাসি পায়। আহা, বেচারী। ওকে যা বলতে বলে দিয়েছে—তাই সে আওড়ে দিলো। নূর কিন্তু ওর বন্ধুর এমত ব্যবহারে আহত হয়। বাড়িতে থেকেও সে এইভাবে ছলনা করলো তার সঙ্গে। এই তার এতকালের প্রাণের বন্ধু, কি আর করবে, হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলো আর এক বন্ধুর বাড়ি। নূরের আশা, তার এ বন্ধু নিশ্চয়ই ঐ অকৃতজ্ঞ বেজন্মাটার মতো হবে না। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। এক এক করে দশটি বন্ধুর দরজা থেকেই শূন্য হাতে ফিরে আসে সে।

মধুমিতা বলে, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম মালিক, কেউ হাত ওলটাবে না। ওরা হচ্ছে সু-সময়ের বন্ধু, অসময়ে কেউ কারো নয়। যাকগে, এখন তো বাঁচার পথ দেখতে হবে। প্রাসাদে যা কিছু আসবাবপত্র আছে সব বেচে দাও। কি হবে এই সব দামী দামী আসবাব দিয়ে?

আলী নূর তাই করলো। কিন্তু বসে খেলে আর কতদিন চলে? কোনও দোকানপাট বা ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই করতে পারলো না। ফলে, সে টাকাও একদিন ফুরিয়ে গেলো। আলী-নূর তার অদৃষ্টের কথা ভেবে চোখের জল আর রাখতে পারে না। মধুমিতা এসে ওকে জড়িয়ে ধরে।—তুমি কাঁদছো সোনা? কেঁদো না, তোমার চোখের জল আমি সইতে পারবো না। আমার কথা শোনো, তুমি তো জানো সারা আরব দুনিয়ার মধ্যে আমি সবচেয়ে সেরা সুন্দরী। সুলতানের ভোগের জন্য তোমার বাবা আমাকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনে এনেছিলেন। আমাকে তুমি বাজারে নিয়ে চলো, বেচে দাও। আমার বিশ্বাস, এখনও তুমি সেই দামই পাবে। সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। সোনা, যেখানেই থাকি, আর যত দূরেই থাকি, তোমার আমার ভালোবাসায় চিড় খাবে না কোনোদিন। যদি আল্লাহর ইচ্ছা থাকে, আবার তবে আমরা দু'জনে দু'জনকে ফিরে পাবো।

আলী-নূর বলে, না-না-না, সে কিছুতেই হয় না, হতে পারে না। আমি তোমাকে এক পলক না দেখলে বাঁচতে পারবো না।

মধুমিতা সান্ত্বনা দেয়, কষ্ট হবে জানি, কিন্তু পারতেই হবে তোমাকে। এছাড়া আমরা দু'জনেই তো মরবো।

উজির অল-ফাদলের পুত্র আলী-নূর তখন জীবনধারণের উপায়ন্তর না দেখে মধুমিতাকে বাজারে নিয়ে গেলো। বসরাহর ওই ক্রীতদাসী বাজার তামাম আরবের মধ্যে সেরা। দেশ বিদেশ থেকে অনেক সুন্দরী রূপসী মেয়ের আমদানী হয় এখানে। বহু দূর দূরান্তর থেকে বাদশাহ, উজির আমীররা আসে মেয়ে কিনতে। একদিন মধুমিতাকেও আনা হয়েছিলো এই বসরাহর বাজারে। দশ হাজার মোহরে বিক্রি করে দিয়েছিলো তার মনিব। সুলতানের সেবাদাসী করার জন্যে উজির অল-ফাদল কিনেছিলেন এক দালালের কাছ থেকে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আজ আবার সে এসেছে এই বসরাহর বাজারে। বিক্রি হতে। আজকের বিক্রেতা তারই শাদী করা স্বামী আলী-নূর। আর দালাল সেই একই।

আলি-নূরকে দেখে এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানালো লোকটা।—তা হুজুর, আপনি? কিরকম লেড়কী চাই বলুন, হুজুর।

আলী-নূর বলে, কিনতে চাই না, বিক্রি করতে এসেছি।

দালালটা অবাক হয়। আলী-নূর তাকে কাছেই একটা কাফেখানায় নিয়ে যায়। একটা কামরায় বোরখা ঢেকে বসেছিলো মধুমিতা। নূর বলে, নাকাবটা সরিয়ে সুরৎটা একটু দেখাও। দালাল এসেছে।



নাকাব সরাতেই চমকে ওঠে দালাল। একি! এ যে সেই মধুমিতা? আপনার বাবার কাছে দশ হাজার মোহরে বিক্রি করেছিলাম একদিন। কিন্তু এ বাঁদীকে আপনি পেলেন কী করে মালিক। এ তো সুলতানের খাস বাঁদী।

আলী-নূর মুখে তর্জনী চেপে চুপ করতে বলে দালালকে। কাফে-র বাইরে এনে বলে, ও যে মধুমিতা, ওকে যে সুলতানের বাঁদী করার জন্যে কেনা হয়েছিলো, এসব কথা তুমি ফাঁস করবে না, এই আমার অনুরোধ। আসল ব্যাপার কী, সব তোমাকে খুলে বলছি আমি। কিন্তু চারদিকে আমার শত্রুর অভাব নাই। খুব গোপনে কাজ সমাধা করে দিতে হবে। আজ আমি বড় অভাবে তাকে বিক্রি করতে এনেছি। সে আমার প্রাণের বিবিজান। তার অদর্শনে আমি বাঁচবো না। কিন্তু তার কষ্টও আমি সহ্য করতে পারবো না। সে অন্য ঘরে যাক। সুখে সম্পদে থাক। সে কথা ভেবেও আমি খানিকটা সান্ত্বনা পাবো।

দালাল দুঃখ করে, সবই নসীবের খেলা, হুজুর। আল্লাহ যখন যাকে যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকতে হবে। একদিন আপনার বাবার দয়ায় কতো মানুষের প্রাণ বেঁচেছে। আপনি তার ছেলে—দু'বেলা দু'মুঠো খাবার-এর জন্যে আজ আপনাকে কি করতে হচ্ছে। যাক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সবচেয়ে বেশী দামে যাতে বিক্রী হয় তার আমি কোসিস করবো।

বাজারের ঠিক মাঝখানে একটা শান বাঁধানো চবুতরা আছে। দালালরা এই চবুতরার উপরে দাঁড়িয়ে তাদের পণ্যের গুণ কীর্তন করতে থাকে। তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেশ বিদেশের সওদাগররা—যারা নীলাম ডাকতে এসেছে, সবাই সেখানে জড়ো হয়। এক এক করে মেয়েদের নাকাব খুলে দেখানোর পালা চলে। তারপর ডাক শুরু হয়। একজনের দামের চেয়ে অন্যজন বেশী দাম হাঁকে। তার চেয়ে আরও কিছু বেশী দিতে চায় কেউ। তাকেও হটিয়ে দিয়ে আর কেউ হয়তো আরও বেশী দাম বলে। এইভাবে চলতে থাকে নীলামের ডাকাডাকি। সব শেষে যার দাম বেশী হয়, তাকেই দেওয়া হয় সেই মেয়ে।

মধুমিতাকেও এনে দাঁড় করানো হলো সেই চবুতরার উপরে। তার পাশে দাঁড়িয়ে দালালটা তার গুণগান করতে থাকে।—এমন মেয়ে তামাম দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে বেহেস্তের হুরী। আসমানের চাঁদ। আপনারা হয়তো এখানে আরও অনেক মেয়ে দেখেছেন, কিন্তু মুড়ি মিছরি এক করে গুলিয়ে ফেলবেন না। আমি যে মেয়েকে এখানে খাড়া করেছি, তার যেমন রূপ তেমনি তার গুণ। রূপে গুণে এমন লেড়কী আর একটাও নাই এই বসরাহর বাজারে। সারা বছরে তো অনেক মেয়েই আসে এ বাজারে—আপনারা দেখেছেন, কিন্তু আজ যাকে দেখলেন, তেমন মেয়ে কি আপনাদের চোখে পড়েছে কখনও? যাক, আমি আমার মালের গুণকীর্তন করতে চাই না। আপনারা সমঝদার আদমী—জহুরী, নিজেরাই চিনতে পারবেন। এখন আসুন মালিক, আপনারা নীলামের ডাক দিন।

এক সওদাগর এগিয়ে এসে ডাকলো, চার হাজার মোহর। আর একজনের ডাক শোনা গেলো, সাড়ে চার হাজার। দালালটা হো হো করে হেসে উঠলো, আসলী হীরা, সাড়ে চার হাজার—মাত্র সাড়ে চার হাজার? তা আপনারা খদ্দের, এক পয়সাও বলতে পারেন। কিন্তু এ দামে তো হীরে পাওয়া যায় না সাহেব, হীরে ধোয়া পানি মিলতে পারে।

ঠিক এই সময়ে সুলতানের উজির মইন যাচ্ছিলো বাজারের পথ দিয়ে। দূর থেকে মধুমিতা আর আলী-নূরকে লক্ষ্য করে কাছে এগিয়ে এলো। স্বগতভাবে গজগজ করতে থাকলো, বদমাইশটা সব উড়িয়ে দিয়ে এখন এসেছে শেষ সম্বলটা নীলামে তুলতে। এই মওকা। যেভাবেই হোক, মেয়েটাকে নিতেই হবে। তবেই সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে, প্রতিশোধ নেওয়া হবে—সেই অপমানের।

দালালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো মইনকে।—ফরমাশ করুন হুজুর।

মইন-এর মুখে ক্রুর হাসি। বললো, এই বাঁদীটাকে আমি কিনতে চাই। কী দাম উঠেছে?

দালাল জানালো, এই সবে ডাক শুরু হয়েছে হুজুর। একজন চার হাজার আর একজন সাড়ে চার হাজার মোহর বলেছে। এই সময়ে আপনি এলেন।

মইন বলে, ঠিক আছে, আমি ঐ সাড়ে চার হাজারই দেবো। আর কারো কিছু বলার আছে।

মধুমিতা আজকের নীলামের সেরা বাঁদী। অনেক পয়সাওয়ালা সওদাগররা জড়ো হয়েছে, নীলাম ডাকবে বলে। কিন্তু সুলতানের এই বদমেজাজী শয়তান উজিরটাকে সবাই ভয় করে। তার ইচ্ছেয় বাদ সাধলে, ভিটেমাটি চাঁটী করে ছেড়ে দেবে সে। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আর কেউ মুখ খুলতে সাহস করে না। দালাল বুঝতে পারলো, এত বড় সওদাটা আজ এখানেই

ভেস্তে গেলো। শয়তান মইন যখন একবার হাত বাড়িয়েছে সে থাবা থেকে মধুমিতার আর রেহাই নাই। দালালকে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মইন ধমকে ওঠে।—কী হলো? ক্যাবলার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শুনতে পেয়েছো, বাঁদীটা আমি কিনলাম। চার হাজার দাম, আর তোমার দালালী পাঁচশো, এই মোট সাড়ে চার হাজার দিনার পাবে। দাও মেয়েটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

নূর দাঁড়িয়েছিলো দালালের পাশে। দালাল ফিসফিস করে বলে, মালিক, বরাত খারাপ। নেকড়েটা থাবা বাড়িয়েছে। বোধহয় জলের দরেই ছেড়ে দিতে হবে মধুমিতাকে। শয়তানটা আপনাকে ভালো করেই চিনতে পেরেছে। লোকটা আপনার বাবার সঙ্গে শত্রুতা করেছে সারাজীবন। আপনার বাবার গুণের কদর করতো সুলতান, প্রজা, পারিষদ সবাই। এই অপদার্থ উজিরটা তা কোনোদিনই সহ্য করতে পারেনি। হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরেছে। কোন কাজই সে জানতো না। জানতো শুধু কি করে নিরীহ মানুষ-এর উপর অত্যাচার চালাতে হয়। প্রজারা আল্লাহর কাছে অহরহ তার মৃত্যু কামনা করে। আজ শকুনটার চোখ পড়েছে মধুমিতার ওপর। আপনার বাবার ওপর আক্রোশ করেও তার একগাছি চুলও ছিঁড়তে পারেনি সে। কিন্তু আজ মওকা পেয়েছে। এতকালের বদলা সে আজ নেবে। শয়তানটা বুঝেছে মধুমিতা আপনারই। কিন্তু মালিক, হুসিয়ার করে দিচ্ছি, যেভাবেই হোক, এই নীলামের ডাক খারিজ করে মধুমিতাকে নিয়ে আপনি ঘরে চলে যান। মইন যদি নিয়ে যায় তাকে, সাড়ে চার হাজার কেন সাড়ে চার দিরহাম আপনি আদায় করতে পারবেন না তার কাছ থেকে। আজ তো সে আপনাকে একটা হুণ্ডি ধরিয়ে দিয়ে মধুমিতাকে নিয়ে চলে যাবে। তারপর বলবে, অমুক দিন এসো, টাকা দিয়ে দেবো। আপনি সেদিন গেলে 'আর একদিন এসো' বলে একটা লম্বা তারিখ দিয়ে বিদেয় করে দেবে। সেদিন যখন যাবেন আপনার হাত থেকে হুণ্ডির কাগজটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে আপনাকে ভাগিয়ে দেবে। বেশী কিছু বলতে গেলে ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে ফিরে আসতে হবে। এ-সব আমি বানিয়ে বলছি না, হুজুর। এরকম ভুক্তভোগী লোক বসরাহতে অনেক আছে। তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে আরও ভালো জানতে পারবেন। এখন মালিক, কিভাবে ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায় তাই ভাবুন।



নূর বললো, আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। কী করা যায়, বলো তো?

দালাল বললো, উজিরটা যখন জেদ ধরেছে, মধুমিতাকে সে নিয়ে যাবেই। আর আমিও গরীব সরীব মানুষ, উজির আমীরের হুকুম অমান্য করবো কি করে। তা হলে তো গর্দান নেবে। আপনি উজিরের ছেলে, মালিক। আমি মধুমিতাকে সঙ্গে করে যখন মইন-এর দিকে এগোতে থাকবো আপনি তখন ছুটতে ছুটতে এসে তার হাতটা খপ করে চেপে ধরে চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন—এই নচ্ছার হারামজাদী, কোথায় যাস? তুই কি ভেবেছিলি, তোকে আমি সত্যি সত্যিই বেচে দিতে বাজারে এনেছিলাম। আর যাতে আমার সঙ্গে কখনও মুখে মুখে তর্ক না করিস, সেজন্যে তোকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে ভয় দেখাতে এসেছিলাম। চল, বাড়ি চল শিগ্গির। সোজা হয়ে মুখ বুঁজে থাকবি। না হলে সত্যি সত্যি একদিন কিন্তু এই হাটে বেচে দিয়ে যাবো। চল, এখন বাড়ি চল। দরকার মনে করলে, এক আধটা চড়চাপড়ও দিতে পারেন তাকে। এতে হয়তো পাজী উজিরটা বিশ্বাস করবে, না, আপনি ওকে ভয় দেখাবার জন্যেই বাজারে এনেছিলেন। সত্যি সত্যি বেচার কোনও অভিপ্রায় ছিলো না।

নূর বললো, মতলবটা মন্দ ভাঁজোনি। দেখা যাক, কি হয়।

দালালটা যখন মধুমিতাকে নিয়ে মইন-এর দিকে এগোতে লাগলো, নূর ছুটতে ছুটতে এসে মধুমিতার গালে এক থাপ্পর বসিয়ে দিয়ে হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বলে, এই বজ্জাৎ মাগী, যাচ্ছিস কোথায়? ভাতারের বাড়ি? একেবারে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো। আর যদি কখনও বেয়াদপি করবি তো সত্যি সত্যি একদিন বেচে দিয়ে যাবো। এবারের মতো মাফ করে দিলাম। চল্, বাড়ি চল। তোকে বেচে দেবো, এমন দীন ভিখারী আমি এখনও হইনি।

মইন হুঙ্কার ছাড়ে, কে রে আমরা খাজাঞ্চা? লম্বা লম্বা চাল বোল ঝাড়ছে? ঘরে তো হাঁড়িতে ছুঁচোয় ডন-বৈঠক মারছে, তার অতো আমীরি বুক্‌নি কিসের? আমার কি জানতে কিছু বাকী আছে, ভাবছো? তোমার ঘরে যে একটা কানাকড়ির মালও নাই তা আমার জানা আছে। এখন বাপের সুপুত্তুর হয়ে কেটে পড়ো। ওকে আমি নীলামে ডেকে নিয়েছি। ও আমার।

এই বলে মইন এগিয়ে এসে মধুমিতার হাত ধরতে যায়। আলী-নূর এতক্ষণ লোকটার কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু মধুমিতার দিকে হাত বাড়াতেই মাথাটা কেমন বিগড়ে গেলো। মুহূর্তে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে মইনের উদ্যত হাতটা চেপে ধরে। একটু বাদে ছেড়ে দিয়ে বলে, যান, বাড়ি যান, এদিকে হাত বাড়াবেন না।

তখন মইন রাগে থরথর করে কাঁপছে।—কী? এতো বড় আস্পর্দা। আমাকে ধাক্কা দেওয়া? বাজারে আপনারা সবাই উপস্থিত আছেন, ভাই সব। আপনারা সাক্ষী। কীভাবে সে আমাকে অপদস্থ অপমান করলো, আপনারা স্বচক্ষে দেখলেন। এখন আমি যদি একটা ঘুষিতে ওর মুখটা তুবড়ে দিই, আপনারা কী বলবেন?

বাজারের উপস্থিত জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। তারা বললো, আপনি হুজুর স্বয়ং উজির। আর উনিও কিছু কম না, উজির ফাদল-এর ছেলে। আপনাদের এই বাঘ সিংহের লড়াই-এর মধ্যে আমাদের সাক্ষী মানবেন না। আমরা ইতরজন, ওসব বড় ব্যাপারে মাথা গলাতে চাই না। আপনাদের যা অভিরুচি করুন। ওসব সাতে পাঁচে আমরা নাই।

আলী-নূর মনে ভরসা পায়। প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে জীনসুদ্ধ মইনকে নিচে ফেলে দেয়। তার পর হাঁটুগেড়ে বসে এলোপাথাড়ি ঘুষি চালাতে থাকে ওর মুখে। তাগড়াই জোয়ান ছেলে নূর। মইন-এর বয়স হয়েছে—বুড়ো। সে কেন পারবে নূর-এর সঙ্গে। প্রচণ্ড ঘুষির ঘায়ে মইনের যে কটা দাঁত পড়তে বাকী ছিলো তাও খসে পড়ে গেলো। চোয়াল ফেটে, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। মইন প্রথমে ভেবেছিলো, একাই সে লড়তে পারবে নূর-এর সঙ্গে। কিন্তু নূর-এর এক-একটা আধমণি ঘুষির ঘা খেয়ে সে-ভ্রম নিমেষেই ভেঙে গেলো। তখন সে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে।—কে আছো, বাঁচাও, আমাকে মেরে ফেলে দিলো।

নূর-এর তখন শরীরে অসুরের শক্তি ভর করেছে। দু'হাতে ঘুষি চালাতে থাকে সমানে। বুকে, পিঠে, পেটে তলপেটে—এবং সবশেষে অণ্ডকোষে। আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায় মইন। এতক্ষণ উজিরের প্রহরীরা দাঁড়িয়ে দেখছিলো, এবার তারা এগিয়ে যায় আলী-নূর-এর দিকে। কিন্তু বাজারের প্রতিটি লোক বাধা দেয়, ওসব উজির আমীর-এর লড়াই তোমরা কেন মাথা ঘামাচ্ছো, বাছা। কার সঙ্গে লড়াইটা হচ্ছে জানো? তোমাদের আগের উজির অল-ফাদলের ছেলে আলী নূর। সুতরাং বুঝতেই পারছো, ওদের বিবাদ একদিন মিটে যাবে, আবার গলায় গলায় ভাব হবে। কিন্তু তুমি আমি যেমন ছিলাম তেমনই চাকর নফর হয়েই থাকবো। উজিরের ছেলের গায়ে হাত তোলার জন্যে সুলতানের সাজা ছাড়া ইনাম মিলবে না। এই বুঝে সুঝে আলী নূর-এর গায়ে হাত উঠাবে।

প্রহরীরা জানতো না নূর-এর পরিচয়। যখন শুনলো, অল-ফাদলের ছেলে, দু'পা

এগিয়েছিলো, এবার তিন-পা পিছিয়ে গেলো। আলী-নূর যখন দেখলো, লোকটা আর নড়ে না, তখন সে ঘুষি মারা বন্ধ করে শান্ত হয়। মধুমিতাকে নিয়ে ভীড় ঠেলে হন হন করে বেরিয়ে যায় বাড়ির পথে।

একটু পর মইন-এর জ্ঞান ফিরে আসে। পথের ধুলো আর দেহের রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। সাজপোশাক ছিঁড়েখুড়ে একশা। প্রাসাদে ফিরে এসে সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান-এর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলো শয়তান উজিরটা।—শাহেন শাহ, আপনার সলতানিয়তে আজ আমাকে এইভাবে মার খেতে হলো? আমি আপনার উজির। আমার গায়ে হাত তোলা মানে সরকারকেই বেইজ্জত করা। আপনি ধর্মাবতার, আমি বিচার চাই।

সুলতান হতবাক। তার হুকুমতে বাস করে এমন দুঃসাহস কার হতে পারে? তার উজিরের গায়ে হাত তোলার স্পর্ধা কে রাখে? সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, কী হয়েছে উজির? খুলে বলো তো। এখুনি আমি এর সমুচিত ব্যবস্থা করছি।

মইন তখন ইনিয়ে বিনিয়ে এক চমৎকার মিথ্যে গল্প খাড়া করলো সুলতানের সামনে।—হুজুর আমি বাজারের পথ দিয় যাচ্ছিলাম। দেখলাম, বাঁদীর নীলামের ডাক চলছে। একটা বাঁদী আমার নজরে ধরলো। খুব রূপসী সুন্দরী। আমি ঠিক করলাম, ঐ বাঁদীটা দিয়ে সুলতান সাহেবকে আমি নজরানা দেবো। আপনার হয়তো স্মরণ আছে, জাঁহাপনা, উজির অল-ফাদলকে আপনি দশ হাজার মোহর দিয়েছিলেন একটা সেরা সুন্দরী বাঁদী কেনার জন্য। এই মেয়েটা সেই সুন্দরী বাঁদী। সারা আরবে এরকম আর একটা মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আপনার বিশ্বস্ত উজির অল-ফাদল মেয়েটাকে কেনার পর আর আপনার হাতে তুলে দেয়নি। তার নিজের পুত্র আলী নূরের ভোগের জন্য তার প্রাসাদেই রেখে দিয়েছিলো। আপনাকে যে বাঁদীটা এনে দিয়েছিলো, সে-টা তার পরে কেনা। অল-ফাদল তার নিজের টাকা দিয়ে সেই মেয়েটি কিনে এনে দিয়েছিলো আপনাকে। আজ আলী নূর অভাবের দায়ে মেয়েটাকে বাজারে নিয়ে গিয়েছিলো নীলামে বেচে দিতে। দেখলাম, সাড়ে চার হাজার টাকা দাম উঠেছে। জাঁহাপনার জন্যে আমি ঐ টাকা দিয়ে কিনে নিলাম। কিন্তু আলী নূর আমার কাছে কিছুতেই বেচবে না। আমার মা-বাপ তুলে গালিগালাজ করতে লাগলো। তার বক্তব্য, সে যে কোনও ইহুদী বা খ্রীষ্টান-এর কাছে কম টাকাতেও বেচে দেবে, তবু সুলতানের ভোগ্য পণ্য হতে দেবে না তাকে। তা সুলতান যদি তাকে পাল্লায় ওজন করেও সোনার মোহর দিতে চায়, তবু তাকে দেবে না। আমি তখন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সুলতান ন্যায্য দামে কিনতে চান, তাতে তোমার এত আপত্তি কেন? তার উত্তরে হুজুর, আলী নূর অশ্রাব্য ভাষায় আপনাকে গালিগালাজ করতে লাগলো। আপনি নাকি একটা বুড়ো হাবড়া শয়তান। আপনার হাতে পড়লে মেয়েটার জীবনই বরবাদ হয়ে যাবে। দোষের মধ্যে আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম, সুলতানের নামে এরকম গালিগালাজ করা তার উচিৎ না। সুলতানের কানে গেলে তিনি ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তখন আলী-নূর ক্ষেপে গিয়ে আমাকে খচ্চরের পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে ঘুষি লাথি মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেললো। আমি বুড়ো হয়েছি। অসহায়ের মতো তার হাতে একতরফা মার খেয়ে ফিরে এলাম। আমার লোকজন কিছু করতে সাহস করেনি, কারণ আলী-নূর আপনার প্রিয়পাত্র প্রাক্তন উজিরের পুত্র। জাঁহাপনা, আপনি স্বচক্ষেই দেখছেন, আমার শরীরের এই রক্তারক্তি কাণ্ড। এখন আপনার কাছে আমার নালিশ এর সুবিচার করুন।

সুলতান ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তারপর উজিরকে বললেন, জনা চল্লিশেক ফৌজ নিয়ে হানা দাও অল ফাদলের বাড়ি। যেভাবেই হোক নূর আর সেই মেয়েটাকে আমার সামনে হাজির করো। আর নূর-এর বাড়িঘর দোর বিষয় সম্পত্তি যা আছে—সব বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করে দাও।

মইন এইরকম আদেশই চেয়েছিলো। সুলতানকে কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনার যেরূপ অভিরুচি। আমি এক্ষুণি তাকে গ্রেপ্তার করে আনছি। আর তার বাড়িঘর সব বাজেয়াপ্ত করে দিচ্ছি।

দরবারের এক তরুণ পারিষদ সুলতানের এই হুকুম শোনামাত্র দরবার থেকে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লো। এই ছেলেটি নূর-এর বাবা অল-ফাদলের বড় প্রিয়পাত্র ছিলো। তারই অনুগ্রহে এখানে এক উচ্চপদে বহাল হতে পেরেছে সে। আলী নূর-এর সঙ্গেও তার দারুণ ঘনিষ্ঠতা। রাস্তায় নেমে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো সে। একটানা দৌড়ে এসে নূর-এর প্রাসাদে কড়া নাড়লো। নূর তখন মধুমিতার সঙ্গে আলোচনা করছিলো। মধুমিতা বলছিলো, তুমি আজ যা করেছো, ভেবো না, ওখানেই ব্যাপারটা মিটে গেছে। উজির মইন শুনেছি ভীষণ খারাপ লোক। এই মারের প্রতিশোধ সে নেবেই। এবং সে ক্ষমতাবান লোক। সত্যি মিথ্যে বলে সুলতানকে ভাঙ্গানী দিয়ে তার কাছ থেকে আমাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এনে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর তোমরা নসীবে কি আছে সে আমি ভাবতে পারছি না, সোনা।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ দ্রুততর হয়। মধুমিতা বলে, ঐ শমন এসেছে।

নূর বলে দাঁড়াও, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি যেও না।

মধুমিতা বলে, না, তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি খিড়কীর দরজা দিয়ে পালিয়ে যাও। নিয়ে যেতে চায়, আমাকে নিয়ে যাবে। তুমি পালাও।

নূর বলে, সে হয় না, মিতা, আমি তোমাকে ফেলে পালাতে পারবো না কিছুতেই।

মধুমিতা বলে, ঠিক আছে, আমাকে খুলতে দাও দরজা। তুমি পাশের ঘরে থাকো। আমার কথাবার্তার ধরন বুঝে যা ভালো বোঝ করো।

মধুমিতা দরজা খুলে দেখে, নূর-এর সমবয়সী একটি সুদর্শন ছেলে। —নূর কোথায়? আপনারা এখুনি পালিয়ে যান। শয়তান উজির মইন আসছে গ্রেপ্তার করতে।

নূর এসে দাঁড়ালো। ছেলেটি বললো, আর দেরী করো না নূর। যেখানে পারো এখুনি পালাও। সুলতানের হুকুমে চল্লিশজন ফৌজ নিয়ে মইন আসছে। এই নাও আমার কাছে চল্লিশটা দিনার আছে। এতে কতটা কি হবে জানি না। কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে তোমাদের থাকা চলবে না। ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে। তোমরা বেরিয়ে পড়ো।

মধুমিতা আর নূর সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে শহরের অলিগলি দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে। বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। লোকের চোখে পড়ে যাবে। এক সময় তারা বসরাহর বন্দরে এসে হাজির হলো। সেই সময় একটা জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছিলো বাগদাদে। খালাসীরা হাঁকছে, কে যাবে বাগদাদে, চলে এসো, এখুনি জাহাজ ছাড়বে। নূর আর মধুমিতা গিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজটা ছেড়ে দিলো।

এদিকে মইন ফৌজ নিয়ে অল-ফাদলের প্রাসাদে এসে দেখে, পাখী পালিয়েছে। রাগে জ্বলে উঠলো সে। হুকুম করলো, শহরের প্রান্তে প্রান্তে তল্লাসী চালাও। যেভাবেই হোক পাকড়াও করতেই হবে। উজিরের হুকুমে বসরাহর জনপথে ধূলি উড়তে লাগলো। সারা শহর তোলপাড় করে ফেললো ফৌজরা। যাকে সামনে পেলো, জেরা করলো। যাকে সন্দেহ হলো, গ্রেপ্তার করলো। কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেলো না তাদের। ওরা তখন বাগদাদের জাহাজের পাটাতনে বসে ভীরু কপোত-কপোতীর মতো বসরাহর বিলীয়মান বন্দরের দিকে তাকিয়েছিলো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন চৌত্রিশতম রজনীর মধ্যরাতে আবার কাহিনী শুরু করলো সে।

জাহাজের পাটাতনে বসে দুই কপোত-কপোতী তখন দূরে বিলীয়মান বন্দর বসরাহর দিকে তাকিয়েছিলো।

সারা শহর তোলপাড় করেও আলী নূর আর মধুমিতাকে না পেয়ে মইন ব্যর্থ মনোরথে সুলতানের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো।—জাঁহাপনা, আমি যাওয়ার আগেই সে খবর পেয়ে গিয়েছিলো। কোথায় পালালো কিছুই বুঝতে পারছি না। সারা বসরাহ তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু না, কোথাও পেলাম না। কেউ বলতে পারলো না, কোন্ পথে তারা গেছে।

সুলতান গর্জে উঠলেন, অপদার্থ কোথাকার। এখুনি শহরের সব প্রবেশ মুখে ফৌজ মোতায়েন করো। প্রত্যেকটি মানুষকে ধরে ধরে তল্লাসী করো। পালাবে কোথায়? আমার সারা সলতানিয়তে হুলিয়া জারি করে দাও। যে ধরে দিতে পারবে তাকে মূল্যবান পোশাক আর নগদ এক হাজার সোনার মোহর ইনাম দেওয়া হবে। টাকার লোভে দেখবে ধরিয়ে দেবেই।

কিন্তু কে কাকে ধরিয়ে দেবে? যখন হুলিয়া জারি করে ফিরে এলো মইন, আলী নূর আর মধুমিতা তখন বাগদাদের বন্দরে পৌঁছে গেছে। কাপ্তেনকে অনেক সুক্রিয়া জানিয়ে ভাড়া বাবদ পাঁচটা মোহর গুঁজে দিলো তার হাতে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বাগদাদে নেমে যে দিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায়। চারদিকে শুধু সবুজের সমারোহ। গাছে গাছে ফুল আর পাখীর মেলা। হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে একটা বিরাট বাগানের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা। চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড এক মনোরম বাগিচা। হাজারো রকম ফুলের গাছে চেনা-অচেনা হাজারো রকম ফুলের বাহার! এমন মন ভোলানো দৃশ্য জীবনে দেখেনি নূর। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে দু'জনে। আহ্ কি অপূর্ব। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না, ভেতরটা কত সুন্দর। চারপাশে দেয়াল দিয়ে সারা বাগিচাটা ঘেরা। আর দেওয়ালের মাঝে মাঝে টাঙানো ঝাড়বাতি। মৃদু মিষ্টি সবুজ আলে জ্বলছে। বাগিচার মাঝখানে একটা মস্ত বড় জলের ফোয়ারা। তার চারপাশ দিয়ে অনেকগুলো শান বাঁধানো চবুতরা।

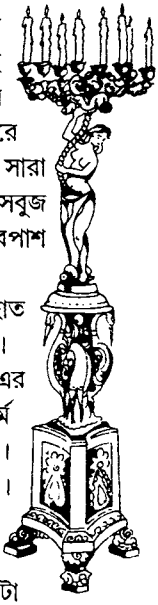

নূর আর মধুমিতা ঠিক করলো রাতটা এখানেই কাটাবে। ঝরনার জলে হাত মুখ ধুয়ে একটা চবুতরার ওপর দু'জনে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওরা জানতো না বাগিচাটা কার। বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রসিদ-এর অবসর বিনোদনের জায়গা এই বিনোদন-বাগিচা। খলিফা যখন শতকর্মে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কিছুদিনের জন্য তখন তিনি এসে কাটান এখানে। বাগানের এক পাশে একটি ছোট্ট হাবেলী। একেবারে নির্জন নিরিবিলি। এখানে দরবারের কোলাহল নাই, আছে শুধু ফুলের গন্ধ, ঝরনার কুলুকুলু, পাখীর কাকলী আর প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য। হাবেলীর প্রধান কক্ষে মোট পয়তাল্লিশটি জানালা। আলো হাওয়ার প্রাচুর্যে ভরা। কক্ষের মাঝখানে একটা সোনার চিরাগদানী। হাজার মোমবাতি জ্বালানো যায়। প্রতিটি মোম সবুজ কাচের আচ্ছাদনে ঢাকা। বছরের বেশী দিনই এঘর অন্ধকারে ডুবে থাকে। আলোর বাহার-এ স্বপ্নপুরী হয়ে ওঠে মাত্র কয়েকটা দিন—যখন খলিফা আসেন। ঘরদোর সাফ করা হয়। আলোর মালায় সাজানো হয় সারা বাগিচা। হাবেলী কক্ষ মনোরম হয়ে ওঠে। একটা শান্ত, মিষ্টি মধুর পরিবেশ গড়ে ওঠে সর্বত্র। খলিফা এসে বসেন পালঙ্কে। আর নিচে গোল হয়ে বসে সব গাইয়ে

বাজিয়েরা, তানপুরাতে সুর বাজে। আর দেশ বিদেশের গুণী গাইয়েরা রাগ-রাগিণীর ইন্দ্রজাল রচনা করে। দুনিয়ার সেরা ওস্তাদ ইশাকও আসেন এই আসরে।

বাগানের মালীর নাম ইবরাহিম। সারাটা জীবন এই বাগানের দেখাশুনা করেই বুড়ো হয়ে গেছে সে। এইখানেই তার ঘর, এইখানেই তার সংসার। এই বাগিচার প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে তার মমতা। প্রতিটি ফুলের গাছে জড়ানো রয়েছে তার আদর মাখা হাতের স্পর্শ। এ বাগিচার প্রতিটি লতাতরুগুল্ম যেন তার এক-একটি সন্তান। বুকের কলিজা। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেয় না সে। বাগিচার ফল ফুল ছিঁড়ে কেউ ছত্রখান করবে, তা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না। এই আশঙ্কায় বাইরের কারুরই প্রবেশ অধিকার নাই। ফটকের বাইরে বড় বড় হরফে সে-কথা লিখেও দিয়েছে সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ দু'টো এখানে এলো কেন? আর বলা নাই কওয়া নাই ঢুকেই সটান নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে শুরু করলো। তাজ্জব ব্যাপার? ওরা কি জানে না, খলিফা তাকে কতখানি ক্ষমতা দিয়েছেন? তার অনুমতি ছাড়া যদি কেউ ঢোকে তাকে যে কোনও সাজা সে দিতে পারে? এ বাগিচায় শুধু খলিফার আত্মীয়স্বজন এবং অভ্যাগত অতিথি ছাড়া আর কারো প্রবেশ অধিকার নাই। আর ঐ যে চবুতরার ওপরে শুয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে—ওখানে আসলে তো বাইরের কোন লোকের বসারই হুকুম নাই। ইবরাহিম রেগে আগুন হয়ে ওঠে। এত বড় আসপর্দা, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি বাছাধনদের। একটা পেঁপের ডাল কেটে চোঙ্গা বানালো।—'ওদের কানের কাছে ডালের নলটা ধরে ঘ্যাক করে এই-সা একটা আওয়াজ দেব—বাছাধনরা ভয়ে শিটকে যাবে।' কিন্তু কাছে যেতে ইবরাহিম কেমন মিইয়ে যায়। আহা, বোধ হয় অনেক পথ হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারিরা। আর তা ছাড়া মাথামুণ্ডু তো সব ঢাকা। না দেখে, না জেনেশুনে এরকম ব্যবহার কি করা ঠিক হবে? কে জানে, হয়তো ভিন্‌দেশের কোনও মুসাফিরও হতে পারে। হতে পারে কোনও আমীর ওমরাহ। নলটা ওদের কানের কাছে ধরেও সরিয়ে নেয়। আগে ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। ইবরাহিম চাদরটা সরিয়ে দেয়। হায় আল্লাহ, এ কি! এতো কোনও সুলতান বাদশাহর ছেলে মেয়ে! এমন রূপ তো সাধারণ মানুষের হয় না! ঘুমে বিভোর হয়ে আছে যেন বাগিচার দুটি ফুল! ইবরাহিম ভাবে, এখন সে কি করবে? এমন সুন্দর চাঁদের মতো দুই নওজোয়ানকে সে চাবকাতে চেয়েছিলো? ইবরাহিম যেন নিজের পিঠেই চাবুকের ঘা খায়।

চাদরটা দিয়ে আবার ওদের মুখ ঢেকে দেয় ইবরাহিম। আলী-নূরের পায়ের কাছে বসে পায়ের ওপর হাত বুলাতে থাকে। আলী-নূর-এর ঘুম ভেঙে যায়। পায়ের কাছে এক বৃদ্ধ। সে তার পায়ে হাত বুলাচ্ছে। লজ্জা পেয়ে পা সরিয়ে উঠে বসে। ওর হাত দু'টো টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বলে, একি করছেন? আপনি বয়সে আমার বাবার চেয়েও বড়। এতে যে আমার পাপ হবে?

ইবরাহিম জিজ্ঞেস করে, কখন তোমরা এলে বাছা, কোথায় তোমাদের ঘর?

আলী নূর বলে, আমরা বিদেশী পথিক। চলতে চলতে রাত হয়ে গেলো। তাই এই বাগিচায় ঢুকেছি, রাত কাটাবো বলে। সকাল হলেই চলে যাবো।

ইবরাহিম বলে, তোমরা মুসাফির, আমার মেহমান। আমি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পড়েছি, তিনি বহু জায়গায় নির্দেশ দিয়েছেন, 'যারা পথশ্রমে ক্লান্ত, যারা পরদেশী তাদের মেহেমান জ্ঞান করে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করবে।' আল্লাহর এই বাণী আমি অবহেলা অবজ্ঞা করবো কি করে, বাবা? তাহলে যে আমার দোজকেও জায়গা হবে না। ওঠ, চলো, আজ তোমরা আমার মেহমান। বাগিচাটা ঘুরিয়ে দেখাই তোমাদের।

আলী নূর বলে, কিন্তু এমন সুন্দর বাগিচাটা কার?

—ধরো, আমারই। আমরা তিন পুরুষ ধরে এই বাগিচা দেখাশুনা করে আসছি। আমার হুকুমেই এখানকার সব কিছু চলে। কেন, তোমাদের কি সন্দেহ হচ্ছে?

নূর বলে, না না, আমি সেকথা বলিনি।

বসরাহতে অনেক সুন্দর সুন্দর বাগিচা দেখেছে আলী নূর। কিন্তু এমন সুন্দর নয়নাভিরাম বাগান সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনও দিন। সদর ফটকটা কি বিশাল। দু-পাশে নানা কারুকার্য করা দু'খানা থাম্বা। তার মাথায় আঙুরের লতার ঘেরা-টোপ। থোকায় থোকায় ঝুলছে টুকটুকে লাল, মিশমিশে কালো জাতের আঙ্গুর। যে দিকে তাকাও, গাছ আর গাছ। দুনিয়ার সবরকম গাছ-এর এক মেলা। আর ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে ডালপালা। কোনটায় বা পাকা, কোনটায় বা ডাঁসা, আবার কোন গাছে সবে ধরেছে গুটি। ডালে ডালে পাখীদের বাসা। দিন শেষে কুলায় ফিরে এখন তারা প্রিয় পরিজনদের সঙ্গে কলমুখর। কেউ বা শিস্ দিচ্ছে, কেউ বা কুহু কুহু তানে গান ধরেছে। নানা জাতের পাখীর নানা বিচিত্র আওয়াজে মুখরিত সারা বাগিচা।

বাগিচার মাঝে মাঝে ফুলের কেয়াড়ী। অনেকটা জায়গা ঘিরে সারি বদ্ধভাবে লাগানো হয়েছে এক একটা জাতের ফুল-গাছ। কোন সারিতে গুলাব, কোনটাতে বেলী, আবার কোন সারিতে চাঁপা। যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, হাস্নু হানা, সূর্যমুখী, ডালিয়া, ক্রিসেমথিমাম—কত দেশী বিদেশী ফুলের কি বিচিত্র সংগ্রহ। চোখ ফেরানো যায় না।

ইবরাহিম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকে। কোন্ গাছটার কি নাম, কোন্ ফুলের গাছ কোন দেশ থেকে আনা হয়েছে—সব বুঝিয়ে বলতে থাকে তাদের। বাগিচা দেখা শেষ করে এবার তারা এসে দাঁড়ায় বাগানের ভিতরে সেই ছোট্ট হাবেলীর সামনে। শিল্পীর আঁকা একটা ছবির মতো। ইবরাহিম ওদের ভেতরে নিয়ে যায়। একটা প্রশস্ত কামরা শ'খানেক লোক বসতে পারে এমনটা জলসাঘর। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে অনেকগুলো হাজারবাতির ঝাড়। আর মাঝখানে একটা সোনার চিরাগ দানী। পারস্য গালিচায় সারা ঘরের মেজে মোড়া। সাটিনের আস্তর দেওয়া অসংখ্য তাকিয়া। আর মাঝে মাঝে বসানো আগরদানী। ধূপের সুমিষ্ট গন্ধে ঘরটা ভরপুর। ঘরটার চারপাশে নীল পর্দা ঢাকা অসংখ্য জানালা। একটা জানালার পর্দা তুলে আলী নূর বাইরে তাকায়। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া—প্রায়পূর্ণ চাঁদ তখন মাথার ওপরে। সারা বাগিচা নরম আলোর বন্যায় ডুবে গেছে। গাছের পাতার ওপর চাঁদের আলোর প্রতিসারণ প্রতি পলে এক অদ্ভুত অভূতপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে চলেছে। আলী নূর আর মধুমিতা প্রাণ ভরে দেখতে থাকে। দুনিয়াতে এত রূপ আছে, এত গন্ধ আছে আগে কখনও বুঝতে পারেনি আলী নূর। আবেশে মধুমিতাকে আরও কাছে টেনে নেয়। বলে, আচ্ছা মিতা বসরাহতে থাকতে প্রকৃতির এই মনোহারী রূপ তো কখনও ধরা পড়েনি চোখে!

মধুমিতা নূরের বুকে মুখ রেখে বলে, কি করে ধরা পড়বে বলো? তখন তো তুমি ফালতু আড়ম্বরের নেশায় মেতেছিলে। এসব জিনিস দেখতে গেলে, মনটাকেও তো সেইভাবে তৈরি করতে হয়। প্রকৃতির রূপ উপভোগ করতে হলে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তুমি তখন মিথ্যার জগতে বিচরণ করছো। কি করে এসব তোমার চোখে পড়বে। আজ তুমি অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ সোনা হয়েছো। তোমার মনে এখন আর সেই অহঙ্কার, ফালতু আড়ম্বর নাই। তাই প্রকৃতির দিকে চোখ ফেরাতে পেরেছো। তাই তার অনিন্দ্য অপার রূপ তোমার চোখে ধরা পড়েছে।

আলী নূর আরও নিবিড় করে চেপে ধরে মধুমিতাকে।—তোমার কতো জ্ঞান মধুমিতা! এসব তুমি শিখলে কোথায়?

মধুমিতা বলে, এ-তো কেউ কাউকে শেখাতে পারে না, সোনা। এ উপলব্ধি করার জিনিস। আর এই উপলব্ধি আসে—অনেক পড়াশুনো করলে।

নূর বলে, জীবনটাই তো হৈ হল্লা করে নষ্ট করে দিয়েছি। পড়াশুনার দিকে নজর দিইনি। ভেবেছিলাম, ঐভাবেই দিন কেটে যাবে। কথায় আছে না। 'মাছ মারবো খাবো ভাত, লেখাপড়া কী উৎপাৎ।' আমার ছিলো সেই দশা। বড়লোকের ছেলে—কাজ কাম বা লেখাপড়া না করলেও তো বড়লোকী চালেই চলতে পারবো। সুতরাং মনে ধারণা ছিলো, লেখাপড়া এক উৎপাত বিশেষ। আজ সে-জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়, মিতা। যদি একটু পড়াশুনা করতাম, বাবা মারা যাওয়ার পর সুলতানের দরবারে একটা ভালো চাকরী পেতাম আমি। চাই কি—কালে উজিরও হতে পারতাম।

মধুমিতা বলে, তা না পারার তো কারণ ছিলো না। উজিরের ছেলে তুমি। তুমিও উজির হবে, এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্যে তো শুধু মেয়ে-বাজী করে বেড়ালে হয় না। সেই সঙ্গে একটু আধটু বিদ্যে-চর্চাও করার দরকার ছিলো। একবার ভেবে দেখো তো, তোমার বাবা কত জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। আর তার এই গুণের জন্যেই তো সুলতান তার কদর করতেন। দেশের লোক শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যদি নির্গুণ হতেন, তাহলে কি সুলতান তাকে অতো ভালোবাসতেন। আদৌ না। বিত্তবানকে লোকে মানে এই কারণে যে, প্রয়োজনে সে তাকে অনুগ্রহ করতে পারে। কিন্তু বিদ্বানকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে—কোনও কিছু টাকাকড়ি পাওয়ার লোভে নয়।

—কই গো বাছারা, খানা খাবে এসো।

ইবরাহিম টেবিলে কাপড় বিছিয়ে খানা সাজিয়েছে। মধুমিতা আর আলী গিয়ে খেতে বসে। খানাপিনার তেমন কোনও আড়ম্বর ছিলো না। রুটি, কিছু মাংস আর সব্জী। আর নানা জাতের ফল ছিলো অনেক। খিদে যথেষ্টই পেয়েছিলো। বেশ তৃপ্তি করেই খেলো দু'জনে। হাত মুখ ধুয়ে আবার এসে বসে তারা জানলার পাশে। আলী নূর প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ। নিজেকে হারিয়ে দিতে চায়। ভুলে যেতে চায় দুনিয়ার কলকোলাহল। হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি। কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পেরেছে সে। আজ সে এক নতুন জাতের মানুষ। অতীতকে সে পিছনে ফেলে এসেছে। তাকে সে মন থেকেও মুছে ফেলতে চায়।

ইবরাহিম দুটি গেলাসে গুলাবী শরবৎ এনে রাখে। প্রতিদিন রাতে খাওয়ার পর মিষ্টি সরাব খাওয়ার অভ্যাস চিরকালের। নূর গ্লাসে চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখে। ইবরাহিম জিজ্ঞেস করে, শরবৎ ভালো হয়নি, মালিক?

—না না, খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু রাতে শোবার আগে শরবৎ খাওয়ার তো কোনও অভ্যাস নাই, তাই ঠিক ভালো লাগছে না।

ইবরাহিম বলে, আমি বুঝতে পারিনি মালিক। এখানে সব ব্যবস্থাই আছে। অনেক দামী দামী সরাব তোমাদের খাওয়াতে পারি—যা কিনা শুধু নবাব বাদশাহদের খানার আসরেই পাওয়া যায়।

ইবরাহিম চলে গেলো। একটু পরে দু'টো গেলাস ভর্তি মদ এনে রাখলো ওদের পাশে। বললে, একশো বছরের পুরোনো, আসলী আলেপ্পোর আঙুর থেকে বানানো।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে আলী নূর মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, একেবারে খাটি আলেপ্পোর সরাব। লোকটা তো বেশ সমজদার! নূর বললো, আপনার খানা বেশ সাধারণ, কিন্তু পিনা তো বহুৎ মজাদার!

ইবরাহিম বললে, কিন্তু মালিক, আমি ওসব আর ছুঁই না। তেরো বছর হলো হজ

করে এসেছি। তারপর থেকে সরাব আমার কাছে হারাম। আমি খাই না, কিন্তু তা বলে কারো ভালো লাগলে খাবে—তাতেও আমার কোনও আপত্তি নাই। আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

চোঁ চোঁ করে সরাব-এর গেলাস দু'টো সাবাড় করে দিলো দু'জনে। কিন্তু নেশা থোড়াই হলো। মধুমিতা বলে, আর খেতে হবে না, এবার শুতে চলো।

নূর-এর এতোকালের অভ্যাস। হঠাৎ কি এক কথায় হুট করে ছাড়া যায়। কিন্তু ছাড়তে তাকে হবেই। পয়সার সংস্থান নাই। কোথায় মিলবে আশ্রয়, কিভাবে জোগাড় হবে, রুটি, সেই চিন্তাই এখন প্রধান। মদ সেখানে বিলাসিতা।

নূর ভাবে, কাল যা হবে, হবে। আজকের এই সুন্দর রাতটা মদের নেশায় মধুর করতে পারলে হতো। ইবরাহিমকে বলে, আপনার এত দামী সরাব আর নষ্ট করতে চাই না। আপনি আমাদের জন্যে আর একটু কষ্ট করবেন?

—কষ্ট আর কী? হুকুম করো, মালিক, কি করতে হবে।

নূর বলে, শুনেছি, বাগদাদে যে-সব দোকানে গুলাব জল বিক্রী হয়, মদও পাওয়া যায় সেখানে। গুলাব জলের বোতলের পিছনে লুকিয়ে রাখে মদের বোতল। একটু বেশী দাম দিলেই বের করে দেয়। তা আপনার যদি কোনও লোকজন থাকে, তাকে পাঠিয়ে একটা বোতল আনিয়ে দিতে পারেন? এই নিন, বোতলের দাম দু' দিনার, আর এই বাড়তি দু' দিরহাম।

ইবরাহিম হো হো করে হেসে ওঠে।—না, মালিক, তার দরকার হবে না। পয়সা তোমার রাখো। সরাব আমি তোমাদের প্রাণ ভরেই খাওয়াচ্ছি। যত পারো খাবে। তার জন্যে, অন্তত আজ রাতে, তোমাদের কানাকড়িও খরচ করতে হবে না। আজ তোমরা আমার মেহমান। আমার সঙ্গে এসো তোমরা।

নূর আর মধুমিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো পাশের একটা ছোট্ট ঘরে। সেখানে আলমারীতে থরে থরে সাজানো সব নানা দেশের নানা জাতের মদ। ইবরাহিম বললো, এই নাও চাবি। যে-টা ইচ্ছা খুলে যত ইচ্ছা খাও। কেউ কিছু বলবে না। খলিফা হারুন-অল-রসিদ-এর জন্যে রাখা আছে এ সব। তাঁর অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার জন্যে তাঁর হুকুমে জোগাড় করে রাখা হয়েছে।

নূর তাজ্জব হয়ে যায়। এতরকম মদ সে জীবনে কখনও দেখেনি। কোনটা সোনার, কোনটা রূপোর ঝারিতে ভরা। আর কত বিচিত্র রকমের কারুকার্য করা সব বোতল! আলী নূর দিশাহারা হয়ে পড়ে। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে?



একটা দুষ্প্রাপ্য মদের বোতল নামিয়ে নিয়ে আসে আলী নূর। কাজ করা সোনার পেয়ালা এনে দেয় ইবরাহিম। খুব মৌজ করে পান করতে থাকে নূর আর মধুমিতা। আস্তে আস্তে নেশা জমতে থাকে। মধুমিতার লাস্যময় ভঙ্গী বড় অপূর্ব। বিশেষ করে মদ পেটে পড়ার পর। তার হরিণীর মতো চঞ্চল আয়ত চোখ দু'টো যখন মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে তখন যে-কোন সংযমী পুরুষের রক্তেও নাচন ধরে।

ইবরাহিম বেশ খানিকটা দূরে দরজার পাশে বসেছিলো। অচেনা পরপুরুষের উপস্থিতি স্বভাবতই মেয়েদের সঙ্কুচিত করে ফেলে। যদিও নেশা বেশ জমে উঠেছে, মধুমিতা তবু তেমন সহজ হতে পারে না। আলী নূরের কাছ থেকে একটু সরে সরে থাকতে চায়। কিন্তু নূর তখন নেশায় মত্ত। মধুমিতাকে কাছে টানতে চায়। বাধা দেয় মধুমিতা, আঃ, দেখছো না, ইবরাহিম রয়েছে।

ইবরাহিম অন্যত্র সরে যেতে পারতো। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াই তার উচিৎ ছিলো। কিন্তু কেন জানি না, চেষ্টা করেও বেরিয়ে যেতে পারে না সে। মেয়েটা এমনিতেই দেখতে ভারি খুবসুরৎ। তার উপর মদের নেশায় মাতোয়ালা হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে সে। তার বিলোল কটাক্ষ, তার জিব দিয়ে ঠোঁট চাটা, তার উঠতে গিয়ে টলে যাওয়া—বৃদ্ধ ইবরাহিমের যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারও একদিন ঐ বয়স ছিলো। তার বিবির কাজলটানা চোখের বাণে সে-ও একদিন কামনার আগুনে জ্বলে উঠতো। নূর-এর মতো সে-ও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে কতোদিন বিবির কাছে ধাক্কা খেয়েছে, 'আঃ ছাড়ো, এখুনি আম্মা এসে পড়বে।'

ভাবতে ভালো লাগে। ফেলে আসা যৌবনের মদির দিনের কথা সব বৃদ্ধেরই ভাবতে ভালো লাগে। মধুমিতাকে অপলক চোখে দেখতে থাকে ইবরাহিম। দেহ থেকে যৌবন বিদায় নিলে তাকে আর ফেরানো যায় না। আর এই না ফেরাতে পারার এক যন্ত্রণা আছে। সেই অক্ষম যন্ত্রণার মধ্যে জন্ম নেয় হিংসার। ইবরাহিম বুঝতেই পারে না, কখন থেকে সে নূর-কে হিংসা করতে শুরু করেছে।

ইবরাহিম বলে, আমাকে লজ্জা করার কি আছে? তোমরা আরও সহজ হও, বাছা। আমার কাছে কোন শরম করো না। তোমাদের আদর ভালোবাসা দেখে বড়ো ভালো লাগছে। বুড়ো হয়েছি আজ। কিন্তু একদিন আমিও তোমাদের মতো নওজোয়ান ছিলাম। আমার নাদান বিবিকে নিয়ে কতো না আনন্দ ফুর্তি করেছি। আজ আবার সেই সব পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছে। বড় ভালো লাগছে। তোমরা অত দূরে দূরে থেকো না, কাছাকাছি হয়ে আদর সোহাগ করো। দেখে চোখ সার্থক করি। রোজ রোজ তো এমন মধুর-মিলন দেখার সৌভাগ্য হবে না।

আলী নূর-এর কথা জড়িয়ে আসে।—আরে বয়স ফয়স-এর কথা গুলি মারো। চুল পাকলেই কি মানুষ বুড়ো হয়? মনে যদি রং থাকে তবে চুলে বা বয়সে কি করবে? আর কেন দোস্ত, দূরে দূরে বসে আছো। এসো, কাছে এসে বসো। আমাদের রসের ভাগীদার হও। এসো।

নূর এমন ভঙ্গী করে দু'হাত বাড়ালো যে, ইবরাহিম আর কাছে না এসে পারে না। নূর আর মধুমিতার অদূরে এসে বসলো। মধুমিতা গালিচার ওপর চিৎপাট হয়ে শুয়েছিলো। এবার উঠে বসে ইবরাহিমের দিকে চোখ মেলে তাকালো। নূর একটা পেয়ালায় মদ ঢেলে তুলে ধরে ইবরাহিমের দিকে। এক যাত্রায় পৃথক ফল আর কেন হবে? নাও দোস্ত, একটু খাও, মৌজ করো। তবে তো মজাটা জমবে!

ইবরাহিম বলে, না না, ওসব আমি তেরো বছর হলো ছেড়ে দিয়েছি। দু'বার মক্কা গিয়ে হজ করে এসেছি। ওসব আমার চলে না। তোমরা খাও, মৌজ করো, তাই দেখেই আমার আনন্দ।

নূর মদের পেয়ালা হাতে টলতে টলতে এগিয়ে আসে। আরে আজ রাতে একটু খেলে কোন দোষ হবে না। আর তা ছাড়া তুমি তো সাধ করে নিজে খাচ্ছো না, আমরা তোমার মেহমান। মেহমানকে খুশি করার জন্যে নিয়ম ভঙ্গ করলে কোনও দোষ হয় না।

নূর এতই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, পেয়ালাটা আর ধরে রাখতে পারলো না। গালিচার ওপর পড়ে গেলো।

—কুছ পরোয়া নাই, আবার দিচ্ছি ভরে।

কিন্তু পর পর তিনবারই কাপ ভর্তি মদের পেয়ালা পড়ে যায় তার হাত থেকে। নিজেও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। গড়িয়ে শুয়ে পড়ে গালিচায়। এবার মধুমিতা এগিয়ে এসে, নূর-এর হাত থেকে পেয়ালাটা কেড়ে নিয়ে এক পেয়ালা মদ ভরে তুলে ধরলো ইবরাহিমের মুখের সামনে।—তুমিই দেখো, বন্ধু, এক সঙ্গে নেশা করতে করতে এইভাবে বেহেড হয়ে গেলে ভালো লাগে কারো। রোজ রোজ এই একই ব্যাপার! আমার আর সহ্য হয় না। সাহেব

তো চোঁ চোঁ করে এক বোতল সাবাড় করে দিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। এখন আমি—আমি কি একা একা বসে নেশা করবো? সে কি ভালো লাগে কারো? মদের নেশায় এখন গাইতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তুমিই বলো ইবরাহিম, আমি কি কড়িকাঠকে গান শোনাবো? ওর এই অবস্থায় আমার কি আর নাচতে ইচ্ছে করবে? অথচ নেশা করে যদি একটু নাচ গানই না করলাম তা হলে অত কষ্ট করে ওসব শিখে কি ফয়দা?

তখন ইবরাহিমের সামনে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেলো। একমাত্র মধুমিতার লাস্যময় আব্দারটাই বড় হয়ে উঠলো। হাত বাড়িয়ে মদের পেয়ালাটা নিয়ে বললো, শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়েই আমি আজ খাবো, দাও।

—আঃ, বাঁচালে আমায়, কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, ইবরাহিম।

একটার পর একটা পেয়ালা পূর্ণ করে দিলো মধুমিতা। আর ইবরাহিম চোঁ চোঁ করে টেনে নিলো। এক সময় সে বলে, আর না, থাক। অনেক খেয়েছি, আর বেশী খেলে আমার নেশা হয়ে যাবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। মধুমিতার আব্দার এড়াতে পারে না সে।—এই আর এক পেয়ালা। আর দেবো না।

ইবরাহিম হাত বাড়িয়ে নেয়। এই সময় আচমকা লাফিয়ে উঠে বসে নূর হো হো করে হাসতে থাকে।

এমন সময় রাত্রি ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পঁয়ত্রিশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়।

তারপর শুনুন জাঁহাপনা, ইবরাহিম যখন মধুমিতার আব্দারে আরও এক পেয়ালা মদ হাতে নিলো, নেশার ভান করে পড়েছিলো, নূর তড়াক করে উঠে বসে বললো, কি গো সাধু মহাপুরুষ, আমি তখন অমন করে সাধলাম, খেলে না। বললে, হজ করে এসেছো। তেরো বছর ছেড়ে দিয়েছো। আর এখন দেখি চোঁ চোঁ করে টানছো। কী ব্যাপার? না, মেয়েছেলের নাকি সুরের আব্দারে গলে গেলে!

ইবরাহিম লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে আসে।—না, মানে তুমি বেহেড হয়ে ঢলে পড়লে—মেয়েটা একা একা মদ খাবে—তাই একটু... কিন্তু তোমার বিবি যে আমাকে একেবারে আস্ত একটা মাতাল করে ছাড়বে তা তো বুঝতে পারিনি।

আলী নূর আর মধুমিতা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ইবরাহিম হাসতে পারে না। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মধুমিতা বলে, থাক, ঢের হয়েছে, ওকে আর লজ্জা দিওনা।

মধুমিতা দু'টি পেয়ালায় মদ ঢালে। একটা নূরকে দেয়, আর একটা সে নিজে নেয়। বলে, ইবরাহিমকে আর দেবো না, ও ব্যাচারির খুব নেশা করিয়ে দিয়েছি আমি।

এরপর আর ওরা ইবরাহিমের দিকে ফিরেও তাকায় না। হাসি গল্পে মশগুল হয়ে একের পর এক পেয়ালা শেষ করতে থাকে। আর ইবরাহিম সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাদের মৌতাত। এক সময়ে আর থাকতে পারে না, বারে, শুধু তোমরাই খেয়ে যাবে, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো? আমাকে দেবে না?

এবার হাসির হুল্লোড় ওঠে। সে হাসিতে ইবরাহিমও সামিল হয়। মধুমিতা মদ ঢেলে এগিয়ে দেয় ইবরাহিমের দিকে।

মধুমিতা বললো, দোস্ত ঘরের মাঝখানের চিরাগ দানীর একটা বাতি জ্বালিয়ে দেবে?

ইবরাহিম তখন নেশায় বুঁদ। বলে, মাত্র একটা? হুকুম করো তো সব আলো জ্বেলে দিতে পারি।

মধুমিতা বলে, না একটা জ্বাললেই যথেষ্ট।

ইবরাহিম একটা একটা করে শ'খানেক বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এলো। আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো সারা কক্ষ।

এক এক করে সব জানলাগুলোই খুলে দিলো আলী নূর। আর প্রতিটি জানলার সামনে জ্বালিয়ে দিলো এক একটা মোমবাতি। সারা বাগানে ছড়িয়ে পড়লো সেই আলোর রোশনাই। ইবরাহিম ততক্ষণে নেশায় বুঁদ হয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে। আলো জ্বালার পর জানলা খোলায় যে কি বিপর্যয় ঘটে গেলো তা আর তখন কেউই জানতে পারলো না।

খলিফা হারুন-অল-রসিদের প্রাসাদ থেকে তার এই বিনোদন-বাগিচা স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক রাতে খলিফা প্রাসাদের গবাক্ষ থেকে দেখলেন, তার বাগিচার হাবেলী আলোয় আলোময়। সেই রাতেই, তখনই, উজির জাফর অল-বারমাকীকে ডেকে পাঠালেন। এই রাত দুপুরে খলিফার তলব! নিশ্চয়ই অভাবনীয় কিছু ঘটেছে। ভয়ে ভয়ে কোরবানীর খাসীর মতো এসে দাঁড়ালো। খলিফা বললেন, ওহে উজির, তোমরা কি সবাই মিলে বাগদাদ শহরটাকে উচ্ছন্নে দিতে বসেছো? নাকে তেল দিয়ে দিব্যি তো ঘুমচ্ছো। এদিকে যে কি সব কাণ্ড-কারখানা চলছে, তার খবর রাখো? আমার বিনোদন বিহার আলোয় ঝলমল করছে। নাচ-গান মদের ফোয়ারা ছুটছে। কী ব্যাপার, আমি কি মরে গেছি?

জাফর বিনীতভাবে বলে, জাঁহাপনা, আপনাকে এই সব আজগুবি খবর কে এনে দিয়েছে। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কি ঘটা সম্ভব?

—কে বলবে? আমি নিজে চোখে দেখেছি। বিশ্বাস না হয়, ওপরে যাও, দেখে এসো, এখনও আলো জ্বলছে। দরজা জানলা সব হাট করে খোলা রয়েছে।

জাফর দেখে ফিরে এসে বললো, এ হুজুর ঐ বুড়ো ইবরাহিমের বদমাইশি। লোকটা পয়সার লোভে ভাড়া খাটাচ্ছে। গত সপ্তাহে বুড়োটা আমার কাছে এসেছিলো। তার ছোট ছেলেটার সুন্নৎ। কিছু টাকা দরকার। তা আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। হুট করে চাইলেই তো আর টাকা পাওয়া যায় না।

খলিফা বললো, খুব অন্যায় করেছো, জাফর। লোকটা আমার বহুকালের পুরনো চাকর। কিন্তু বড্ডো গরীব। তার দরকারে কিছু টাকা তো দেওয়াই কর্তব্য। তা আমাকে না জানিয়ে তাকে শুধু হাতে ভাগিয়ে দিলে কেন?

জাফর মাথা হেঁট করে। —আমার দোষ স্বীকার করছি, হুজুর। আমি আপনাকে জানাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু নানা কাজের ঝামেলায় একেবারে ভুলে গেছি।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে, এ যাত্রা আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। কিন্তু ইবরাহিমের এই কাজের সময় তাকে কিছু টাকা পয়সা দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য। আর শুধু দু'টো পয়সা ছুঁড়ে দিলেই কি সব হয়? সে আমার এতকালের পুরনো লোক। তার সুখে দুঃখে আমারও তো সামিল হওয়া দরকার। আমি ঠিক করেছি তার কাছে একবার যাবো। তার এই উৎসবের দিনে আমাকে পেলে খুব খুশি হবে সে। তাছাড়া কতো রকম লোকের আনাগোনা হয়েছে সেখানে। হয়তো দু-একজন গুণী লোকের সঙ্গেও মোলাকাৎ হয়ে যেতে পারে।

জাফর বললো, আপনি কাল সন্ধ্যাবেলা যেতে চান, হুজুর? কিন্তু ততক্ষণে তার অতিথি অভ্যাগতরা কি আর কেউ থাকবে? আজ রাতে যদি কাজ-কাম হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তো কাল দিনমানেই তারা যে যার ঘরে ফিরে যাবে।

খলিফা বললেন, তাহলে আর দেরি নয়, চলো, এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক।

খলিফা, জাফর আর খলিফার দেহরক্ষী মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে তিন ছদ্মবেশী সওদাগরের বেশ ধরে পথে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে বাগিচার সদর ফটকের সামনে এসে দেখে দরজা খোলা। অন্য সময়, রাতে কেন, দিনের বেলাতেও খোলা থাকে না এ দরজা। আজ নিশ্চয়ই ইবরাহিমের ছেলের সুন্নৎ উৎসব। বাইরের নিমন্ত্রিতরা আসবে যাবে। সেই কারণে এই সদর ফটক খুলে রেখেছে সে।

বাগিচার ভিতরে ঢুকে খলিফা বললেন, এ অবস্থায় ওদের উৎসবের আসরে যাওয়া ঠিক হবে না। তার আগে লুকিয়ে দেখতে হবে ওরা কি করছে।

একটা বাতাবী লেবুর গাছ দেখিয়ে তিনি বলেন, এই গাছটার ওপরে উঠে উঁকি মেরে দেখতে হবে।

মাসরুরের কাঁধে চেপে খলিফা আর জাফর গাছের উপরে উঠে গেলেন। ডালের ওপরে বসে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন। একটা জানলার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলেন, ঘরের মধ্যে তিনটি প্রাণী। তার একজন ইবরাহিম। আর দু'জন খুবসুরৎ যুবক-যুবতী। আহা, কি তাদের রূপ। এমন অপরূপ সুন্দর ছেলে মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু একি! ওরা সবাই সরাবের নেশায় বুঁদ। সবারই হাতে মদের পেয়ালা। ইবরাহিম তো মাথা গোঁজ করে বসে আছে। মেয়েটি গুণগুণ করে গান ধরেছে। আর ছেলেটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তারিফ জানাচ্ছে। খলিফা বললেন, আমি ভেবে পাচ্ছি না, জাফর, এরা কারা। মনে হচ্ছে বিদেশী মুসাফির। কিন্তু এখানে এলো কি করে?

জাফর কোনও জবাব দিতে পারে না। খলিফা বললেন, এই অবস্থায় ওদের সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই না, জাফর?

জাফর বলে, কিন্তু না গেলে, এই গাছের ডালে বসে কি করে হদিস পাবেন, হুজুর?

এমন সময় ওঁরা দেখলেন, ইবরাহিম বলছে, এমন নেশা করে একটু গান বাজনা না হলে কি জমে? মালকিন, তুমি কি বাজাতে জানো?

মধুমিতা বললো, জানি, কিন্তু বাজাবার কি আছে এখানে?

ইবরাহিম বলে, আছে আছে, খুব ভালো যন্ত্র আছে। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ইবরাহিম। একটু বাদে একটু ফ্লুট নিয়ে এলো হাতে করে। খলিফা জাফর-এর দিকে তাকান। —কী এতবড় স্পর্ধা? ওস্তাদ ইশাক যে ফ্লুট বাজান সেই ফ্লুট নিয়ে এসেছে বুড়োটা! আমি এসব কিছুতেই বরদাস্ত করবো না, জাফর। এ-ও আমি বলে রাখছি, বাজনা যদি বেসুরো হয়, তোমাদের সবাইকে কোতল করবো আমি।



জাফর বললো, আর যদি সুর তাল ঠিক থাকে? তবে কি করবেন, জাঁহাপনা?

—তবে? তবে ওদের সবাইকে ছেড়ে দেবো। শুধু তোমাকে শূলে চড়াবো।

—হায় আল্লাহ, মেয়েটা যেন বেসুরোই বাজায়।

খলিফা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন? এরকম প্রার্থনা করছো কেন?

জাফর বলে, মরতে হয় সবাই মিলে এক সঙ্গে মরাই ভালো।

খলিফা তারিফ করলেন।

মধুমিতা ফ্লুটে অপূর্ব সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করতে থাকে। খলিফা মুগ্ধ হন। বাঃ, রীতিমতো গুণী মেয়ে, হে। এমন মন-মাতানো মধুর সুর বহুকাল শুনিনি।

জাফর বলে, তা হলে আশা হচ্ছে, জাঁহাপনার ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে।

খলিফা এবং জাফর দু'জনেই গাছ-এর উপর থেকে নামলেন। খলিফা বললেন, না, জাফর, আর তো ধৈর্য রাখতে পারছি না। এবার তো দেখতে হয়, ওরা কারা। এমন গুণীজনের সমাগম হয়েছে আমার হাবেলীতে। একটু আলাপ-সালাপ করা দরকার।

জাফর বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, আপনার কি এ সময় ওদের সামনে যাওয়া ঠিক হবে? মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে ইবরাহিম। আপনাকে দেখা মাত্র ওর নেশা-ফেসা কেটে পানী হয়ে যাবে। হয়তো বা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে মরেই যাবে লোকটা। আর ঐ দুই যুবক-যুবতী ওরা তো বুঝতেই পারবে না, এই এতো রাতে কেনই বা আপনি ওখানে গেলেন, আর কেনই বা ইবরাহিম ওভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো?

খলিফা বললেন, তা যা বলেছো। ঠিক আছে, তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি ওদিকটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

জাফর আর মাসরুর দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। খলিফা এগিয়ে গেলেন।

বাগানের ওপ্রান্তে একটা বিরাট পুকুর। নালা কেটে টাইগ্রীস থেকে জল এনে ভরাট করা হয় এই পুকুর। ফলে ছোট বড় নানা জাতের মাছে ভর্তি থাকে সারা বছর। আর এই মাছের ওপর জেলেদের ভীষণ লোভ। দাও পেলেই বাগানে ঢুকে জাল ফেলে মাছ চুরি করে পালায়। সেই কারণে বাগানের সবগুলো দরজাই বন্ধ করে রাখে ইবরাহিম। কিন্তু আজ তার ছেলের সুন্নৎ, তাই সদর ফটকটা হাট করে খোলা। আর এই মওকায় করিম জেলে ঢুকে পড়ে বাগানে। চুরি করে মাছ ধরায় সারা বাগদাদে তার জুড়ি নাই। আরও মজার ব্যাপার, যার পুকুরের মাছ চুরি করে, তার কাছেই সে বিক্রি করে যায়। খলিফা দূর থেকে লক্ষ্য করেছিলেন, সদর দরজা দিয়ে ঢুকে জাল কাঁধে করে কে যেন পুকুরের দিকে চলে গেলো। তখন তিনি জাফর আর মাসরুরকে সেখানে দাঁড় করিয়ে পুকুরের দিকে চলে এলেন। খলিফা দেখলেন, সেই করিম জেলে। জালটা দু'হাতে দোলাতে দোলাতে ছত্রাকারে ছড়িয়ে দিলো জলে। স্বগতভাবে বলে, আজ শালা, আচ্ছা মওকা মিলেছে। বুড়োটা সরাব গিলে বেহদ্দ মাতাল হয়ে পড়ে আছে। পুকুরের সব মাছ আজ সাবাড় করে দেবো।

নিস্তব্ধ রাত্রি। বিড় বিড় করে বললেও পরিষ্কার শুনতে পান খলিফা। পা টিপে টিপে আরও কাছে এগিয়ে আসেন তিনি। একেবারে করিমের পিছনে। ফিস ফিস করে ওর কানের কাছে মুখ রেখে বলেন, অতো মাছ কি করবি, করিম?

আঁৎকে ওঠে লোকটা। ফিরে তাকায়। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে, জাঁহাপনা, আপ-নি—

—চুপ! একদম চেঁচাবিনা।

—হুজুর, আমাকে এবারের মতো মাফ করে দেন, আমি আপনার পা ছুঁয়ে কসম খাচ্ছি, আর কক্‌খনো চুরি করতে আসবো না। কি করবো হুজুর, পেট চলে না, ঘরে অনেক লোক—

—ঠিক আছে বাঁদর, এখন জালটা তোল, দেখি কি মাছ পড়েছে।

জালটা গুটিয়ে তুললো করিম। অনেকগুলো বেশ ভালো ভালো মাছ ধরা পড়েছে। খলিফা বললো, চমৎকার! খাসা হবে। নে, এবার তোর জামা পাতলুন খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়া।

করিম বেচারী মুখ কাচুমাচু করে। জী হুজুর—

—'জী হুজুর' কি করে? তোকে না বললাম, ন্যাংটো হয়ে দাঁড়া? তা কথা শুনতে পাচ্ছিস না?

করিম এবার চটপট গায়ের চোগা চাপকান খুলতে থাকে। বাগদাদের সব লোকের কাছে করিমের এই পোশাকটা বহু পরিচিত। কবে যে সে প্রথম পরেছিলো, কেউ বলতে পারে না। ইঞ্চি খানেক পুরু তেল চিটচিটে ময়লা জমেছে। ছিঁড়ে ঝুল্লি হয়ে গেছে। জামাটা খুলতেই গোটা কুড়ি বড় বড় ছারপোকার হুটোপুটি শুরু হয়ে গেলো।

খলিফার চোখ তো ছানাবড়া। সে কিরে করিম। এই সব সঙ্গী-সাথী নিয়ে দিব্যি তো আরামে থাকিস! কামড়ায় না?

—তা হুজুর পরথম পরথম কামড়াতো। এখন আমার সাথে ভাব হয়ে গেছে। আর কামড়ায় না। তা ছাড়া ও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কামড়ালেও টের পাই না, হুজুর।

করিম ভেবে পায় না, জাঁহাপনা কেন তাকে উলঙ্গ করলেন। হয়তো চুরি করার সাজা হিসাবে গায়ে এমন কোনও দাগ কেটে দেবেন যা তার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু না, করিম দেখলো, খলিফা স্বয়ং নিজেও সব সাজ-পোশাক খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেন,—

—এবার করিম, তুই আমার পোশাকগুলো পর। আর আমি তোরগুলো পরছি।

করিম হাঁদার মতো হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখে। খলিফা হারুন-অল-রসিদ—দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা,—দীন হতে দীন জেলে করিমের শতচ্ছিন্ন ময়লা নোংরা সেই পোশাক দেহে ধারণ করলেন। খলিফার নির্দেশে করিমও তার সাজ পোশাক পরে নিলো। খলিফা বললেন, বাঃ বেড়ে হয়েছে তো দেখতে। একেবারে সুলতান খলিফা হারুন-অল-রসিদ—উফ! ওরে করিম, একি হলো রে, ব্যাটারা যে কুট কুট করে কামড়াচ্ছে, আর তির তির করে ছুটে বেড়াচ্ছে—!

জেলে বলে, ও কিছু না, জনাব। এখুনি সয়ে যাবে। নতুন মানুষ পেয়েছে, একটু তাজা রক্ত চুষে সেলাম জানাচ্ছে আপনাকে। পেট পুরে গেলে আর কামড়াবেনা।

খলিফা বলে, বলিস, কিরে? পেট পুরে গেলে—? আমি খলিফা হারুন-অল-রসিদ আর আমারই রক্ত চুষে খাচ্ছে? এত বড় স্পর্ধা?

হুজুর ক্ষান্ত হোন। এখন আপনি ওদের প্রজা। ওরা এখন শাহেন শাহ। ওটা ওদের জন্মগত অধিকার।

খলিফা খুশি হয়ে বলে, বাঃ তুই তো ব্যাটা রসিক আছিস। নে এই আংটিটা দিলাম তোকে। ঐ মাছগুলো রেখে তুই এখন পালা।

মাছগুলো করিমের একটা থলেয় ভরে নিয়ে জাফরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জাফর খলিফাকে করিম বলে ভুল করলো, হ্যাঁরে করিম এই রাতে বাগানে ঢুকেছিস কী মতলবে? জানে বাঁচতে চাস তো শিগ্গির পালা। খলিফা এসেছেন এখানে।

জাফর-এর কথা শুনে খলিফা হো হো করে হেসে উঠলেন। জাফর তো অবাক! —জাঁহাপনা, আপনি?

খলিফা বললেন, তাহলে ছদ্মবেশটা বেশ লাগসই হয়েছে, বলো? ইবরাহিম চিনতে পারবে না তাহলে?

জাফর বলে, আমিই চিনতে পারিনি, তা ইবরাহিম চিনবে কি করে, হুজুর?

—ঠিক আছে। তোমরা এখানেই থাকো। আমি আসছি।

খলিফা সোজা ঢুকে পড়লেন হাবেলীর ঘরে। বাইরের মানুষের পায়ের শব্দে ইবরাহিম সজাগ হয়ে ওঠে, কে রে?

খলিফা সামনে এসে ইবরাহিমকে আদাব জানায়।

—ওঃ তুমি? এতো রাতে এ বাগানে ঢুকেছিস কেন রে চোর বদমাইস, নচ্ছার? খলিফা মুখ কাচু মাচু করে মাছের থলেটা সামনে রাখে, আপনার জন্যে ক'টা মাছ এনেছি, জনাব?

ইবরাহিম হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, মাছ? আমারই পুকুরের মাছ চুরি করে আমারই কাছে এনেছো বিক্রি করতে?

আজ্ঞে, বিক্রি করতে আনি নি, যদি মেহেরবানী করে গ্রহণ করেন—

মধুমিতা এগিয়ে আসে, দেখি দেখি, কি মাছ?

সদ্য ধরা জ্যান্ত মাছগুলো বের করে দেখান খলিফা। খলখল করে লাফাতে থাকে। নূর বলে, বাঃ জমবে ভালো। ভাজা মাছ মদের সঙ্গে তোফা চাট।

ইবরাহিম খলিফাকে ধমকে ওঠে, তা হাঁদারাম, মাছগুলো ভেজে আনতে পারোনি? ওনারা কি তোমার এই কাঁচা মাছগুলো কামড়ে কামড়ে খাবেন?

খলিফা শশব্যস্ত ভাবে বলে, আমি এক্ষুণি ভেজে এনে দিচ্ছি, জনাব।

ইবরাহিম বলে, যা, ওপাশে রসুই ঘরে তেল মশলা সব আছে। বেশ কড়া করে ভেজে আনবি।

খলিফা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শুনতে পেলেন, ওরা তিনজনে চেঁচিয়ে বলছে, খুব জলদি, আচ্ছা-সে কড়া করে ভেজে নিয়ে আয়।

জাফরের কাছে ফিরে এসে খলিফা হাসতে হাসতে বললেন, জাফর, বিলকুল চিনতে পারেনি ইবরাহিম। আমাকে দেখে রেখে আগুন। চোর বদমাইশ নচ্ছার বলে আদর অভ্যর্থনা করলো। তারপর নবাবী চালে হুকুম করলো, 'জলদী, মাছগুলো আচ্ছা-সে কড়া করে ভেজে নিয়ে আয়।' কিন্তু জাফর, ছেলেটা আর মেয়েটাকে দেখে বনেদী খানদানী ঘরের নওজোয়ান মনে হলো। শুধু ভাবছি, ইবরাহিমের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক?

জাফর বললো, মাছগুলো আমার হাতে দিন জাঁহাপনা, আমি ভেজে এনে দিচ্ছি।

না না, সব মাটি হয়ে যাবে। ইবরাহিম যদি রসুই ঘরে এসে দেখতে চায়—আমি কি দিয়ে কি করে মাছগুলো ভাজছি তা হলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। তুমি এখানেই থাকো। আমি রসুইখানা থেকে ভেজে নিয়ে উপরে যাচ্ছি।

রসুইখানায় ঢুকে মাছগুলো কাটলেন, ধুলেন, নুন, হলুদ, মশলা, দিয়ে মাখলেন তিনি। উনুনে কাঠ দিলেন, কড়াই-এ তেল ঢেলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। টগবগ করে যখন ফুটে উঠলো তেল, মাছগুলো কড়াই-এ ছেড়ে দিলেন। এক্কেবারে পাকা বাবুর্চির মতো নিখুঁতভাবে করে যেতে থাকলেন সব। এক পিঠ ভাজা ভাজা হয়ে এলে উল্টে দিলেন। এইভাবে মাছের টুকরোগুলো লালচে হয়ে এলে উনুন থেকে নামালেন। বাগান থেকে দু'টো পাতিলেবু আর একখানা কলা পাতা এনে ভাজা মাছগুলো ওপরে নিয়ে এলেন তিনি।



আলী নূর, মধুমিতা আর ইবরাহিম তিনজনে মিলে মাছগুলো সব সাবাড় করে দিলো। নূর বললো, বাঃ, বেড়ে ভেজেছো তো হে? তোফা হয়েছে। এই নাও, তোমার বকশিস।

তিনটি দিনার বের করে খলিফার হাতে দিলো সে। দু'হাত একত্র করে ইনাম নিলেন খলিফা। কপালে ছুঁইয়ে মুদ্রা তিনটি চেপে কপালের সঙ্গে সেঁটে দিলেন। অর্থাৎ 'তোমাদের ইনাম মাথায় করে নিলাম', খলিফা গদগদ হয়ে হাত জোড় করে বললেন, একটা কথা বলবো, হুজুর।

আলী নূর অবাক হয়। লোকটার কি তিন দিনারে মন ওঠেনি? কিন্তু সনজার তাকে মাত্র চল্লিশটা দিনার দিয়েছিলো আসার সময়। তাছাড়া তার নিজের কাছে একটা পয়সাও ছিলো না। তা থেকে জাহাজের কাপ্তেনকে পাঁচটা দিনার দিতে হয়েছে ভাড়া বাবদ। তিন দিনার

ওকে দিয়েছে। এখন আর সাকুল্যে বত্রিশটা রইলো তার কাছে। বিদেশ বিভুঁই-এ সামান্য এই বত্রিশ দিনারে কদিন চলবে? আলী নূর বলে, কি বলবে বলো।

খলিফা বলেন, জী হুজুর, যদি মালকিন একটা গান শোনান—ওঁর বাজনা শুনে বড্ড ভালো লেগেছে।

মধুমিতা বললো, কি গান শুনতে চাও, বলো, কি ধরনের গান তুমি ভালোবাসো?

—বেগম সাহেবা কি সব রকম গানই জানেন?

—সবই তো শিখেছিলাম এক কালে, খেয়াল, ঠুংরী, কালোয়াতী, কাওয়ালী—কি শুনবে বলো?

খলিফা অবাক হয়। মেয়েটা বলে কি? খেয়াল ঠুংরী! —তা যদি একখানা দরবারী কানাড়া শোনান তো খুব ভালো হয়। অনেক দিন শুনিনি।

মধুমিতা বলে, তুমি তো মাছ ধরে খাও। দরবারী বুঝতে পারবে?

খলিফা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন, আমাদের জাত ব্যবসা মাছ ধরা ঠিকই কিন্তু আমার বাবা ছিলেন সাধক লোক। গানের সাধনায় তিনি অনাহারে জীবন পাত করেছেন। মাছ ধরা ফেলে রেখে তানপুরা নিয়েই মেতে থাকতেন। আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, বাবার কোন গুণই পাইনি। তবে শুনতে ভালোবাসি, ভালোলাগে।

এতকাল পরে একজন সমজদার পেয়ে মধুমিতা খুশি হয়। দরদ দিয়ে দরবারী কানাড়া গাইতে শুরু করে। সত্যিকারের গুণী মেয়ে। সেই নিশুতিরাতে কানাড়ার নিখুঁত তাল মান লয় এর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন খলিফা। ওস্তাদ ইশাকের পরে এত ভালো গান বহুদিন শোনেন নি তিনি। গভীর আবেশে মাথাটা ঝুঁকে আসে।

ইবরাহিম ঠেলা মারে, এই চোট্ঠা, ঘুমিয়ে পড়লি না কিরে।

খলিফা হকচকিয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, না জনাব, শুনছিলাম।

—কচু শুনছিলে। এসব গানের তুই কি বুঝবি রে?

মধুমিতার গান শেষ হয়ে আসে। খলিফা দু'হাতে তালি বাজিয়ে বাহবা জানায়। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। আল্লাহ আপনাকে সুখে রাখবেন। এমন গান আপনি কোথায় পেলেন, মালকিন। শুনলে দিল্-এ আর কোনই দুঃখ দর্দ থাকে না।

নূর বলে, বুঝলাম আমার বিবির গান তোমার খুব পছন্দ হয়েছে। তা এক কাজ করো, ওসব কালোয়াতী গান ফান তো আমি বুঝি না। আমি ওর কদরও করতে পারি না। তুমি ওকে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাও। প্রাণ ভরে গান শুনবে? কি বলো? না না, আর কোনও ওজর আপত্তি শুনবো না, জেলে, আমি তোমাকে বরাবরের জন্যে ওকে তোমায় দান করে দিলাম।

শেরওয়ানীটা কাঁধে ফেলে গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ায় আলী নূর। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। মধুমিতার কাতর কণ্ঠ শুনে থামে। মুখ ফেরায়। মধুমিতা বলে, প্রাণনাথ, তুমি আমাকে এইভাবে একা ফেলে চলে যাচ্ছো, একটুও তোমার মায়া হচ্ছে না। আর চিরকালের মতোই যখন যাচ্ছো দু'টো মিষ্টি কথাও কি বলে যাবে না, একটুখানি সবুর করো, প্রাণেশ্বর, একটি কথা শুনে যাও।

খলিফা কিছুই আন্দাজ করতে পারেন না। ছেলেটি দুম করে মেয়েটাকে ছেড়ে পালাতেই বা চাইছে কেন? তবে কি সে ওর শাদী করা বেগম নয়। কাউকে কি ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে? নূরকে লক্ষ্য করে বললেন, শুনুন মালিক, আমি আপনার বাবার চেয়েও হয়তো বড় হবো। আমার কাছে গোপন করবেন না, খুলে বলুন, কি আপনাদের দুঃখ, কি আপনাদের অভাব অভিযোগ। আমি গরীব জেলে। দিন আনি দিন খাই। তবু যদি বুঝি, আমার সাধ্যমতো

উপকার করতে কোসিস করবো। আপনি কি ভয় করছেন, এখানে কোতোয়ালের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে আপনাকে এই লেড়কীর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে? ওসব আপনি বিলকুল ভাববেন না। কোতোয়াল তো কোন ছার, তার বাবার বাবার সঙ্গে আমার দহরম মহরম আছে। আমার এক ইশারাতে ছেড়ে দিতে পথ পাবে না বাছাধনরা। তা সত্যিই কি ভাগিয়ে এনেছেন, হুজুর?

নূর বলে, না না, ওসব নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নাই। আমি কোনও বে-আইনি কাজ-ফাজ করিনি। সমস্যা তা নয়। এককথায় তো তোমাকে সব বোঝানো যাবে না, জেলের পো। অনেকটা সময় লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, শোনো, গোড়া থেকেই বলি, আমাদের দুঃখের কাহিনী—। তা একরকম ভালোই হবে। বলতে বলতে রাতটাও কাবার করে দিতে পারবো।

নূর যখন তাদের কাহিনী বলা শেষ করলো, রাত্রি তখন আর বেশি বাকী নাই। খলিফা বললেন, সবই তো শুনলাম। এখন কি করতে চান বলুন মালিক।

নূর বলে আল্লাহর পথ অবারিত, খোলা আছে। যে দিকে দু' চোখ যায়, চলে যাবো।

খলিফা বলেন, শুনুন, জনাব, আমি যদিও এক দীন হীন সামান্য জেলে। তবু ছোটবেলায় বসরাহর সুলতানের সঙ্গে একই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিলো। সে সুবাদে তার কাছে আমি একখানা খৎ লিখে দিচ্ছি। আমার মনে হয়, আমার চিঠি দেখলে আপনাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন তিনি।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইলো।

ছত্রিশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

করিমের ছদ্মবেশী খলিফা বললেন, ছোটবেলায় বসরাহর মাদ্রাসায় আমি ওখানকার সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান অল-জিনির সহপাঠী ছিলাম। পড়াশুনায় আমার খুব মেধা ছিলো। সে তুলনায় সুলেমান বেশ কাঁচা। কোরাণের পাঠ সে কিছুতেই মনে রাখতে পারতো না। মৌলভী ছিলেন ভীষণ কড়া। তার ভয়ে সবাই যুযু হয়ে থাকতো। আমি তাকে মুখে মুখে মুখস্থ করিয়ে দিতাম। ফলে আমাদের দোস্তী বেশ জমে উঠেছিলো। সুলতানের সন্তান সে, তাই কালে সুলতানই হলো। আর আমি, সামান্য জেলের ছেলে, আমার জাত-ব্যবসাতেই জীবনপাত করতে থাকলাম। তবু সেই ছোটবেলার বন্ধুত্বে কিন্তু এতটুকু ঘুন ধরেনি। এখনও দেখা হলে, সব ভুলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সে যে অত বড় সলতানিয়তের একজন সুলতান, ভুলে যায় সে কথা। কোনও অহঙ্কার, দম্ভ আমি দেখিনি। আমি হয়তো খুবই কম জবাব দিই, কিন্তু সে নিয়মিত আমাকে চিঠি লেখে, খবর নেয়।



নূর বলে, যাই হোক, আল্লাহর নাম নিয়ে লিখে দাও একটা চিঠি। হয়তো কাজে দিতে পারে।

ইবরাহিম কাগজ দোয়াত কলম এনে দিলো। গালিচায় হাঁটু গেড়ে বসে একখানা চিঠি লিখলেন খলিফা।

॥ এলাহি ভরসা ॥

আমি—আব্বাস বংশের অন্যতম পুত্র মাহদি তস্য পুত্র হারুন-অল-রসিদ। আমার অন্যতম সলতানিয়তে নিযুক্ত সুলতান মহম্মদ-ইবন সুলেমান জীনির প্রতি এই হুকুমনামা পাঠাইতেছি ঃ

এই পত্রবাহক আলী নূর, তোমার প্রাক্তন পরলোকগত উজির অল-ফাদলের পুত্র।

এই পত্র পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সিংহাসন থেকে নেমে এসে আলী নূরকে

সিংহাসনে অধিরূঢ় করিবে। এতকাল যে অধিকার তোমাকে দিয়াছিলাম অদ্য হইতে তাহা খারিজ করিলাম। এবং আলী নূরকে প্রদান করিলাম।

পত্র পাঠ আমার হুকুম তামিল করিবে। আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন।

এর পরে খলিফা হারুন-অল-রসিদ সহি ও টিপ সহি দিয়ে কাগজখানা ভাঁজ করে আঁঠা লাগিয়ে বন্ধ করে দিলেন। নূরের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি আর দেরি করবেন না, জনাব। সকাল হয়ে এসেছে, এখুনি বেরিয়ে পড়ুন। বন্দরে জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

নূর ভাবলো ক্ষণকাল। লোকটা গুলতাপ্পি দিচ্ছে না তো? শেষে সুলতানের হাতে ধরা পড়ে বে-ঘোরে প্রাণটা যাবে? ঠিক আছে, আল্লাহ নাম নিয়ে বেরিয়ে তো পড়া যাক। তারপর পথের মাঝে দেখে নেওয়া যাবে, কি লেখা আছে খতে। নূর বললো, তা হলে ওই কথাই রইলো, মধুমিতা এখানেই রইলো। আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। যাই বসরাহতে। যা ঘটে এসে বলবো।

আলী নূর বেরিয়ে যেতেই ইবরাহিম গর্জে ওঠে, শয়তান ঠগবাজ, দু' পয়সার মাছ খাইয়ে তিন তিনটি মোহর নিলি জগ দিয়ে। তাতেও তোর আশ মিটলো না? আবার যাদু করে ছেলেটাকে ভাগিয়ে দিয়ে মেয়েছেলেটাকেও ভোগ করতে চাস? সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। সমান সমান ভাগ দিতে হবে আমাকে। না হলে ছাড়বো না। তিন মোহরের আদ্দেক আর মেয়েটার আদ্দেক আমার চাই। মেয়েটাকে আগে আমি ভোগ করবো, তারপর তোকে দেবো। তা না করে তোমার হাতে ছেড়ে দেবো, আর তুমি শালা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে? ওটি হচ্ছে না।

ইবরাহিমের এই নোংরা কথা শুনে আপাদমস্তক জ্বলে যায় খলিফার। উঠে গিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে তুড়ি বাজাতেই তীরবেগে ছুটে আসে মাসরুর। ঝাঁপিয়ে পড়ে ইবরাহিমের উপর। জাফর-এর সঙ্গেই ছিলো খলিফার সাজ-পোশাক। ক্ষিপ্র হাতে জেলের পোশাকটা খুলে ফেলে দিয়ে নিজের আসল বেশে রুদ্র মূর্তিতে দাঁড়ালেন ইবরাহিমের সামনে।

ইবরাহিমের প্রথম মনে হয়েছিলো খোয়াব। কিন্তু মুহূর্তে তার ভুল ভাঙ্গলো। দারুণ দুঃখ লজ্জা ভয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো, নিজেই নিজের হাত কামড়াতে থাকলো।

খলিফা খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, এসব কী? আর কখনও এরকম বে-শরম বাত মুখে এনো না। বুড়ো হয়ে মরতে বসলে এখনও মেয়ে মানুষের লোভ গেলো না? যাও, এবারের মতো মাফ করে দিলাম।

তারপর মধুমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে সুন্দরী, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, আমি কে? আর এখানে কেন? চলো, আমার প্রাসাদে যাই।

মধুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে তার থাকার জন্যে একটা বিলাসবহুল শয্যাকক্ষের বন্দোবস্ত করলেন খলিফা। খোজা, দাসী, পরিচারিকারা ব্যস্ত হয়ে উঠলো মধুমিতার পরিচর্যায়। খলিফা নিজে এসে দেখলেন তার ঘর, পালঙ্ক, শয্যা প্রভৃতি। বললেন, আলী নূর শিগ্গিরই ফিরে আসবে। সে যে কদিন না আসে, তুমি আমার অঙ্কশায়িনী হয়ে থাকবে, কেমন রাজী?

মধুমিতা স্মিত হাসে। বড় মিষ্টি করে হাসতে জানে মেয়েটা। বলে, আলী নূর তো জাঁহাপনার হাতেই সমর্পণ করে গেছে আমাকে। এখন তার যা মর্জি হবে।

খলিফা বলেন, কিন্তু আলী নূর তো এক জেলের হাতে দিয়ে গিয়েছিলো। সে যদি এসে দেখে, হাতবদল হয়েছে, আমাকে কোতল করবে না তো?

মধুমিতা রসিকা মেয়ে। কোন জবাব দেয় না। একথার জবাব হয় না। শুধু হাসে। অনর্গল হাসতে থাকে। আর তার এই হাসির ঝরনায় মুক্তো কুড়াতে থাকেন খলিফা হারুন-অল-রসিদ।

এদিকে আলী নূর বসরাহয় পৌঁছে ছুটে যায় সুলতানের প্রাসাদে। কিন্তু প্রহরী

ঢুকতে দেবে না। আলী নূর চিৎকার করতে থাকে। সুলতান মহম্মদ সুলেমান শুনতে পায়। একজনকে বলে, কে চেঁচাচ্ছে, দেখো তো। লোকটাকে নিয়ে এসো।

আলী নূর দরবারে এসেই সোজা সুলতানের সামনে গিয়ে চিঠিখানা বাড়িয়ে দেয়। সুলতান বিরক্ত হয়। লোকটাতো ভীষণ বেয়াদপ। সুলতানকে কুর্নিশ না করেই সে দরবারে ঢুকে পড়লো। অবাক হয়েছিলো সবাই। এমন ঘটনা তো দেখা যায় না। কিন্তু চিঠি খানা পড়া মাত্র সুলতানের মুখের চেহারা পালটে গেলো। বারবার তিনবার চিঠিখানা মাথায় ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানালো।

—খলিফার আদেশ আমার শিরোধার্য। আল্লাহর পয়গম্বর খলিফার হুকুম আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। কই কে আছো, এখুনি চারজন কাজীকেই ডাকো। আর ডাকো আমার সব আমীর ওমরাহদের। তাদের সামনে আমি এই সিংহাসন ছেড়ে দেবো খলিফার মনোনীত এই যুবককে।

তখুনি সবাই এসে হাজির হলো। সুলতান তার পদত্যাগ পত্র সই করতে যাবে এমন সময় উজির মইন এসে বাধ দিলো, এ আপনি কি করছেন হুজুর! ক্ষান্ত হোন।

সুলতান তাকে খলিফার হুকুমনামা খৎখানা দেখালো। চিঠিখানা পড়ে খলিফার টিপসই আর সই-এর অংশটুকু ছিঁড়ে ফেলে বললো, জাল। স্রেফ জাল, হুজুর। লোকটা একটা মস্তবড় জালিয়াৎ। খলিফার সই জাল করেছে। তা না হলে, আপনি ভাবুন, খলিফা কখনও একখানা সাদা কাগজে এইভাবে চিঠি লিখতে পারেন। তার সব চিঠিতেই তো প্রাসাদের ছবি আঁকা থাকে। আর তা ছাড়া চিঠি বয়ে নিয়ে আসবে তার দরবারের দূত। সঙ্গে থাকবে পাইক বরকন্দাজ, সিপাই, সান্ত্রী। এ চিঠি বিলকুল জাল, হুজুর। আপনি ওকে কয়েদ করুন। খলিফার কাছে খবর পাঠান। তারপরেই দেখবেন, আসল কথা জানা যাবে।

সুলতান মাথা নাড়ে, ঠিক। ঠিক বলেছো মইন। তোমার দেখছি একটু একটু বুদ্ধি হয়েছে। লোকটা একেবারে ফেরেববাজ! ওকে কয়েদখানায় আটকে রাখো। আমি খলিফার দরবারে লোক পাঠাচ্ছি।

মইন চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে মুখে পুরে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিলো।

সুলতান বললো, আহা, তুমি অতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন মইন?

—হবোনা! লোকটা ঠগ, জোচ্চোর, পাজি, বদমাইশ? খলিফা তো দূরে থাক, ও কখনো তার উজির জাফর-এর কাছে পৌঁছতে পেরেছে? ও একটা শয়তান। ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আপনি হুকুম করুন, হুজুর, আমি ওর দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করছি। আর নাহলে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি এমন শিক্ষা দেবো, যা সে জীবনে ভুলতে পারবে না। আচ্ছা এক কাজ করুন, হুজুর। লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে দরবারের কোন পারিষদকে পাঠিয়ে দেন বাগদাদে। তাহলেই আসল ঘটনা টের পাওয়া যাবে। তারপর বাছাধনকে আমি চিঠি জাল করা বের করে দেবো।

মইন-এর যুক্তিতর্কে সুলতানের ক্রমশ স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, লোকটা সত্যিই জালিয়াৎ। হুকুম দেয়, ওকে আচ্ছা করে বেত লাগাও। যতক্ষণ না কবুল করে, চালাও বেত।

আলী নূরকে পিছমোড়া করে বেঁধে, মাটিতে ফেলে বেতের ঘা মারা হতে লাগলো। বেচারী নূর কিছুক্ষণের মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সুলতান হুকুম দিলো, এবার কয়েদখানায় পুরে রাখো। পরে আবার দেখা যাবে।

মইন এসে কয়েদখানার সর্দারকে বলে গেলো। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় বেত চালাবে, যতদিন না পর্যন্ত স্বীকার করে—

সৌভাগ্যক্রমে কয়েদখানার সর্দার ছিলো উজির-অল-ফাদলের বিশেষ প্রিয়পাত্র। নূরকে ফিসফিস করে বললো, মালিক, আপনার বাবার নোকর ছিলাম আমি। তার নুন

খেয়েছি। আমি আপনাকে যতটা পারি বাঁচাবো। আপনি শুধু মরার মতো পড়ে থাকবেন—যাতে উজিরটা সন্দেহ করতে না পারে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, সকাল বিকাল আপনার ওপর অত্যাচার চালাতে হবে। আপনাকে দিয়ে স্বীকার করাতেই হবে, আপনি একটা জালিয়াৎ। কিন্তু হুজুর, আমি তো জানি, আপনার দ্বারা অমন নোংরা কাজ করা সম্ভব নয়। আপনি একেবারে ওদিকে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। মইন এলে কোন সাড়া দেবেন না।

চল্লিশ দিন কেটে গেলো। সর্দার প্রতিদিন সকাল-বিকাল উজিরের কাছে খবর পাঠায়। বেত মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলেছে তাকে। কিন্তু কিছুই সে কবুল করেনি।

একচল্লিশ দিনের দিন বাগদাদ থেকে নানা ধরনের মূল্যবান উপহার সামগ্রী এলো বসরাহর সুলতানের কাছে। সুলতান কিছু অনুমান করতে পারলো না, কি ব্যাপার! যারা বয়ে নিয়ে এসেছিলো বাগদাদ থেকে, তারাও কিছু বলতে পারলো না। খলিফার হুকুমে উজির তাদের পাঠিয়েছেন এখানে। ব্যস। এর বেশী কিছু জানে না তারা। সুলতান চিন্তিত হলো। এতকালের মধ্যে বাগদাদ থেকে তো কোন উপহার সামগ্রী আসেনি। বরং বাগদাদেই ফিবছর ভেট পাঠাতে হয় তাকে। তবে? কিছুই ভেবে পায় না সে। আমীর ওমরাহদের কাছে পরামর্শ চাইলো—এই উপহারের কি অর্থ?

পারিষদরা বললো, খলিফা এ উপহার পাঠিয়েছে ঐ যুবক নতুন সুলতানের জন্যে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই শুভেচ্ছা উপহার পাঠানো হয়েছে।

মইন বললো, এখনও আপনি ওকে কেন জ্যান্ত রেখেছেন হুজুর? আপনি কি জানেন না, শত্রুর শেষ রাখতে নাই।

—তুমি ঠিক বলেছো, মইন। শত্রুর শেষ রাখতে নাই। এখুনি ওর গর্দান নাও।

মইন তখন সারা শহরে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিলো; সুলতানের হুকুমে উজির অল-ফাদলের পুত্র জালিয়াৎ আলী নূর-এর গর্দান নেওয়া হবে। যারা এই দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চায়, সকাল দশটার সময় দরবার প্রাঙ্গণে হাজির হতে পারে।

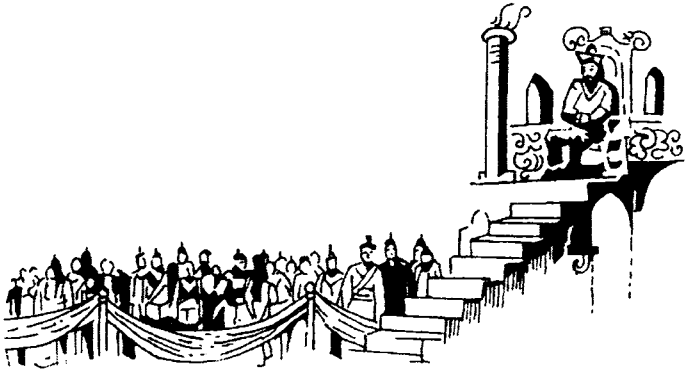

সকাল থেকে দলে দলে লোক এসে ভীড় জমাতে লাগলো দরবার প্রাঙ্গণে। হায় হায় করতে লাগলো সকলে। মইন এলো কয়েদখানার সামনে। সঙ্গে দশ জন প্রহরী। সর্দারকে বললো, আলী-নূরকে দাও। আজ ওর গর্দান নেওয়া হবে।

সর্দার বললো, আজ চল্লিশ দিন ধরে বেতের ঘায়ে সে তো এমনিতেই আধমরা হয়ে পড়েছে। আজ আবার তার গর্দান নেবার হুকুম হলো কেন?

মইন বললো, তা আমি কি করে বলবো? সুলতানের হুকুম, তামিল করতে হবে।

কয়েদখানার দরজা খুলে দেয় সর্দার। মইন চিৎকার করে ওঠে, এই জালিয়াতের বাচ্চা জালিয়াৎ, এদিকে বেরিয়ে আয়। আজ তোর মউৎ হাজির।

আলী নূর বেরিয়ে আসে। চলো, কোথায় যেতে হবে। তবে এও জেনে রাখো মইন, আল্লাহ উপরে আছে, তোমার শয়তানী তিনি সবই দেখছেন। আমার হাত থেকে রক্ষা পেলেও তার হাত থেকে রেহাই পাবে না তুমি।

—থামো, রাখো তোমার বুকনী। এবার চলো হাড়িকাঠ তৈরি।

মইনের হুকুমে প্রহরীরা তাকে একটা খচ্চরের পিঠে বাঁধলো। কিন্তু এগোতে সাহস করলো না। উত্তাল জনস্রোত তখন ধেয়ে আসছে কয়েদখানার দিকে। সবারই কণ্ঠে একই ধ্বনি, আমাদের নতুন সুলতান আলী নূরের মুক্তি চাই—মুক্তি চাই। আলী নূর জিন্দাবাদ। উজির মইন মুর্দাবাদ। আমাদের সুলতান—আলী নূর আলী নূর। আলী নূর হুকুম করো, মইনের মাথা গুড়িয়ে দিই—গুঁড়িয়ে দিই। এই রকম নানা ধ্বনি দিতে দিতে জনতা এগিয়ে আসতে থাকে।

আলী নূর চিৎকার করে বলে, ভাইসব ধৈর্য ধর, শান্ত হও। পাপীর শাস্তি আল্লাহ দেবেন।

একদল যুবক চিৎকার করে ওঠে, মইনের মুণ্ডু চাই। ব্যাটাকে কেটে টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

আলী নূর শান্ত করার চেষ্টা করে, না না, অমন কাজ করো না তোমরা।

মইন হুঙ্কার ছাড়ে, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বর্শা উঁচিয়ে ধরো। এগিয়ে চলো।

জনতার মধ্যে খচ্চরটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রহরীরা। আলী নূর সবাইকে স্বাগত জানাতে থাকে। এই ভাবে প্রাসাদ প্রঙ্গণে এনে হাজির করা হয় আলী-নূরকে। হাড়িকাঠ তৈরি। জল্লাদও প্রস্তুত। হাতে হার শাণিত তরোয়াল।

এবার শয়তান মইন চিৎকার করে ওঠে, তোমরা সবাই দেখো, এবার জালিয়াৎ নূরকে কোতল করা হচ্ছে। জল্লাদকে উদ্দেশ্য করে বলে, আর দেরি করছো কেন? সুলতানের হুকুম তামিল করো।

জল্লাদ এগিয়ে আসে। নূরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, আমি আপনাদের আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। যা হুকুম হবে আমাকে তাই করতে হবে। আপনার বাবা আমাকে স্নেহ করতেন। আহা, তার মতো মানুষ হয় না। আপনি শেষবারের মতো সুলতানের কাছে আর্জি পেশ করুন না, মালিক। দেখুন হয়তো তিনি মকুব করে দিতে পারেন।

আলী নূর চিৎকার করে বলতে থাকে, তোমরা কে আছো কোথায়, শোনো, আমি কোন দোষ করিনি, তবু আমার প্রাণদণ্ডের বিধান হয়েছে। এত বড় অবিচার আল্লাহ সহ্য করবেন না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন।

প্রাসাদের ওপর থেকে মইন মুখ বাড়িয়ে বলে, জল্লাদ, এখনও তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো?

এই সময় কে একজন এক এক গেলাস জল এনে দিলো নূরের হাতে। জলের গেলাসটা মুখে তুলেছে, এমন সময় মইন নেমে এসে এক ঝটকায় জল-সুদ্ধ গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। এবার জল্লাদকে ধমক দিয়ে বলে, কি হচ্ছে কি এসব, শুধু সময় নষ্ট করছো কেন?

জল্লাদ এবার নূর-এর চোখ বেঁধে দিলো। জনতা সমস্বরে গর্জে উঠলো। উজির মইন মুর্দাবাদ।

হঠাৎ অশ্বখুরের শব্দে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো সব কলকোলাহল। শুধু শোনা যেতে লাগলো, খট্-খট্-খট্-খট্ আওয়াজ। বুঝতে বাকী রইলো না, এক বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী প্রাসাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ধুলি-বালিতে অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক। সুলতান

গবাক্ষপথে মুখ বাড়ালেন। দেখতে পেলেন, বিশাল এক ফৌজি বাহিনী টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ধেয়ে আসছে। পুরভাগে খলিফার উজির জাফর অল বারমাকী। সুলতান বললেন, মইন, নিচে যাও দেখে এসো কে আসছেন? মনে হচ্ছে, খলিফার সৈন্যবাহিনী নিয়ে উজির জাফর নিজে এসেছেন।

মইন বললো, আপনি কি করছেন হুজুর। জল্লাদকে হুকুম দিন, সে যেন আর এক পলকও দেরি না করে। নূরের কাল্লা নামিয়ে দিন।

সুলতান বলে, থামো তুমি। তোমার বুদ্ধিতে অনেক লাভ হয়েছে। এবার যা বলছি শোনো। উজির জাফরকে অভ্যর্থনা করে নামাও, আমি যাচ্ছি।

মইন নিচে নেমে গেলো। সুলতানও নামলো একটু পরে।

উজির জাফর তার আগমনের উদ্দেশ্য সবিস্তারে বর্ণনা করলো সুলতানের কাছে :

আলী নূরকে খৎ লিখে খলিফাই পাঠিয়েছিলেন। তার পর তিনি যথারীতি নানা কাজের মধ্যে সে কথা আর মনে রাখেন নি। রাখার কোনও দরকারও বোধ করেন নি। খলিফার হুকুম কেউ অমান্য করতে পারে, সে তো কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আলী নূর এখানকার সুলতান হয়ে দিব্যি সুখে প্রজাপালন করছে। আলী নূর তার বাঁদী মধুমিতাকে খলিফার হেফাজতে রেখে এসেছে। কথা ছিলো, বসরাহর সিংহাসনে বসে সে তাকে নিয়ে গিয়ে হারেমের প্রধান বেগম করে রাখবে। খলিফাকে বলে এসেছিলো, সে যতদিন না ফেরে ততদিন মধুমিতাকে তিনিই যেন ভোগ দখলে রাখেন। মধুমিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মাত্র একটি দিন কাটিয়েছেন খলিফা। তারপর তিনি অন্য দিকে মন ফিরিয়ে নিয়েছেন। এক মাস কাল কেটে গেছে। মধুমিতার কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। খলিফার স্বভাবই ঐরকম। এই মুহূর্তে তিনি যা করলেন, পরের মুহূর্তে আর তা স্মরণ করেন না। আবার নতুন কোনও সমস্যা নতুন কোনও কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। এই ভাবে আলী নূর এবং মধুমিতা দু'জনেই তাঁর মনের পর্দা থেকে সরে গিয়েছিলো। একদিন খলিফা প্রাসাদের ভিতরে ঢুকছেন, এক করুণ কান্না ভেসে এলো কোন এক কামরা থেকে। ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।—কে কাঁদে?



একজন পার্শ্বচর বলে, হুজুর, মধুমিতা।

—মধুমিতা? খলিফা অবাক হন, সে কে? সে কেন আমার প্রাসাদে?

পার্শ্বচর বলে, আজ্ঞে আপনি মধুমিতাকে ভুলে গেছেন?

—ভুলে যাবো? আমি কি চিনতাম যে ভুলে যাবো? ও নামের কোন মেয়েকে তো আমি মনে করতে পারছিনে।

—আজ্ঞে সেই যে—আলী নূর? তার বাঁদী।

—তা আলী নূরের বাঁদী আমার প্রাসাদে কেন? আর আলী নূরই বা কে?

তখন তাঁকে সেদিন রাত্রের সব কাহিনী আবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়। তখন তিনি লাফিয়ে ওঠেন। ওঃ হো হো, বিলকুল ভুলে গেছি। মেয়েটা আজ একমাস ধরে একা একা আছে। একবারও দেখাশুনা করিনি। অথচ আলী নূর বিশ্বাস করে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলো। তোমরাও এমন হতভাগা একবার মনে করিয়ে দিতে পারোনি?

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন খলিফা। খলিফাকে দেখে মধুমিতার কান্নার রোল আরও উচ্চগ্রামে ওঠে। পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি জানায়, একটি বার আলী নূরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন, জাঁহাপনা। আমি আর তাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না। এতদিন হয়ে

গেলো, সে ফিরে এলোনা। একটা খবর পাঠালো না। এ তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই তার কোন বিপদ আপদ ঘটেছে। তার জীবনে আসার পর থেকে একটি দিনও সে আমাকে ছেড়ে থাকেনি। আমাকে না দেখলে যে মানুষটা এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, আজ এক মাস হয়ে গেলো, সে কেমন করে আছে, আপনি আমাকে একটি মাত্র দিন সম্ভোগ করেছিলেন, তারপর আর কোন খোঁজ করেন নি আমার।

খলিফা বললেন, আমি নানা কাজের মানুষ, ভুলে যেতে পারি। কিন্তু তুমি? তুমি তো আমাকে তলব করতে পারতে সুন্দরী।

—বাঁদীর কি সে অধিকার থাকে? আমি তো আর হারেমের বেগম নই?

খলিফা বললেন, অধিকার কি কেউ হাতে তুলে দেয়? ওটা আদায় করে নিতে হয়। যাক ওসব কথা, এখন হুকুম করো সুন্দরী, বান্দা হাজির।

চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে সে-এক অপূর্ব মোহিনী রূপে তাকালো মধুমিতা।

—একটা মাস আমার চোখে ঘুম নাই। আলী নূর-এর একটা খোঁজ পাওয়ার জন্যে মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে, জাঁহাপনা। আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি, একটিবার তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিন।

সেইক্ষণেই জাফরকে তলব করলেন খলিফা। জাফর এসে দাঁড়ালে বললেন, দেখো, প্রায় একমাস আগে আমার খৎ নিয়ে বসরাহয় গেছে আলী নূর। তারপর থেকে তার আর কোনও খবর নাই। আমার মনে হচ্ছে, ওখানকার সুলতান বিদ্রোহী হয়েছে। আলী নূরকে সে হত্যা করেছে। আমার হুকুম সে অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু এও বলে রাখছি, জাফর, আলী নূরের যদি কেউ ক্ষতি করে তাকে রেহাই দেবো না। তা সে যেই-ই হোক। আমার প্রাণের বন্ধু হলেও নিস্তার পাবে না আমার হাতে। আমার ইচ্ছা, তুমি আর এক মুহূর্ত এখানে বিলম্ব না করে, লোক-লস্কর যা প্রয়োজন নিয়ে, বসরাহর পথে রওনা হয়ে যাও। আমি জানতে চাই মহম্মদ সুলেমান কী ধরনের আচরণ করেছে আলী নূরের সঙ্গে।

উজির জাফর বললো, খলিফার নির্দেশে আমি এসেছি আপনার কাছে। এখন বলুন, আলী নূর কোথায়? এবং কীভাবে তাকে রাখা হয়েছে। আর এই বিশাল জন-সমুদ্র দেখছি, এরাই বা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কেন? খলিফার হুকুম আছে, আলী নূরের ওপর যদি কেউ অত্যাচার করে থাকে তাকে আমি হত্যা করবো।

আলী নূরকে বধ্যভূমি থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে হুকুম করলো সুলতান। জাফর কিন্তু আলী নূরের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো না। সুলতান আর তার উজির মইনকে গ্রেপ্তার করলো। এবং ঘোষণা করে দিলো, এখন থেকে আলী নূর হবে বসরাহর সুলতান।

মহাসমারোহে আলী নূরকে বসরাহর সিংহাসনে বসালো জাফর। তিনদিন ব্যাপী চললো উৎসব আনন্দ। চতুর্থদিন সকালে আলী নূর জাফরকে বললো, ধর্মাবতারকে দেখার জন্যে মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জাফর বললো, ঠিক আছে, নামাজের পরই আমরা বাগদাদে রওনা হবো। মহম্মদ সুলেমান আর মইনকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবো বন্দী করে। খলিফা নিজেই ওদের বিচার করে যা সাজা দেবার দেবেন।

আলী নূরকে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদে পৌঁছে, সর্বাগ্রে খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো জাফর। খলিফা তাঁর তলোয়ারখানা আলী নূরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, নাও ধরো, তুমি নিজে হাতে কেটে নামিয়ে দাও ওই শয়তান মইনের মাথাটা।

আলী নূর হাত পেতে নিলো তলোয়ারখানা। মইনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। মইন তখন দু'হাত জোড় করে কাতরভাবে বলতে থাকে, আলী নূর, তুমি তো জানো, আমি জন্মগত

ভাবেই দুষ্ট চরিত্রের লোক। সারা বসরাহতে আমার কোন সুনাম ছিলো না। প্রতিটি মানুষ আমাকে খারাপ বলেছে। প্রতিনিয়ত আমার মৃত্যু কামনা করেছে। আমি জানি, তারা কিছু অন্যায় বলেনি। সত্যিই আমি খারাপ। আর সেই জন্যেই তোমার ওপর অত অত্যাচার নির্যাতন করেছি। তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রও করেছিলাম। সবই আমার মন্দ চরিত্রের ফল। কিন্তু আলী নূর, তুমি? তুমি তো সর্বজন পূজ্যপাদ উজির অল ফাদলের সুযোগ্য পুত্র। খানদানী বংশের রক্ত আছে তোমার শিরায়। জ্ঞানত তোমার দ্বারা কারো ক্ষতি কখনও হয়নি। এবং আমার বিশ্বাস, হতে পারে না। তোমার মতো উদার এবং মহৎপ্রাণ কি আমার তুল্য অধম আচরণ করতে পারে? আমি খারাপ, দুষ্ট, শয়তান—আমি তোমাকে বিনা দোষে হত্যা করতে পারি। কিন্তু তুমি তো সৎবংশের ছেলে। তুমি কি আমাকে দোষী জেনেও হত্যা করতে পারো?

এই কথা শুনে আলী নূর খলিফার পায়ের কাছে তলোয়ার নামিয়ে রেখে বললো, আপনি মার্জনা করুন, জাঁহাপনা। মইন আমাকে কথার প্যাঁচে ঘায়েল করে ফেলেছে। আমি পারবো না।

খলিফা চিৎকার করে উঠলেন, মাসরুর?

বান্দা হাজির, জাঁহাপনা।

—ওই শয়তানটার মাথা ধড় থেকে নামিয়ে দিবি—এক কোপে।

খলিফা এবার আলী নূরকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার বলো, তুমি কি চাও?

আলী নূর কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জাঁহাপনা, সলতানিয়তে আমার লোভ নাই। আমি সুলতান হতে চাই না। বসরাহর সুলতান হয়ে আমি কি করবো? তার চেয়ে আপনি অনুমতি করুন, যতদিন বাঁচি, আপনার কাছে কাছেই যেন থাকতে পারি।

খলিফা বললেন, তাই হবে। তুমি খুশি হলেই আমি খুশি।

আলী নূর আর মধুমিতার জন্যে একখানা সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন খলিফা। নানা প্রকার দামী দামী আসবাব পত্রে সাজিয়ে দিলেন প্রাসাদকক্ষ। প্রতি মাসে নিয়মিত এক হাজার দিনার মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিলেন। আলী নূরকে করে নিলেন তার দরবারের অন্যতম পারিষদ। আর মহম্মদ সুলেমানকে ক্ষমা করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন বসরাহর সিংহাসনে। বলে দিলেন, ভবিষ্যতে যেন আর সে ঐ রকম বদমাইশ উজির নিযুক্ত করে প্রজাদের সর্বনাশ না ঘটায়।

এরপর তারা সবাই যে যার মতো সুখেসচ্ছন্দে দিনকাটাতে লাগলো।

শাহরাজাদ বলে, এ কাহিনীর এখানেই শেষ। কিন্তু জাঁহাপনা মনে করবেন না এর চেয়ে মজাদার গল্প আমার জানা নাই। এবার আপনাকে ঘানিম ইবন আয়ুব আর তার বোন ফিৎনার কাহিনী শোনাবো।

বাদশাহ শারিয়ার বললো, বেশ বলো, শুনি।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে :

এক সময় এক নামজাদা সওদাগর ছিলো—তার নাম আয়ুব। আয়ুবের দুটি সন্তান। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম ঘানিম আর মেয়ের নাম ফিৎনা। দু'জনেই দেখতে শুনতে বড় চমৎকার। যেমন তাঁদের ধবধবে ফর্সা গায়ের রং তেমনি তাদের চাঁদপনা গড়ন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আয়ুব মারা যাবার সময় তার বিশাল বিষয় সম্পত্তি.....

এমন সময় রাত্রি ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাইত্রিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে বলতে শুরু করে :

ছেলে মেয়েদের জন্যে বিশাল বিষয় সম্পত্তি রেখে আয়ুব একদিন মারা গেলো। দুই ভাই বোন দেখলো, একশো গাঁট সিল্কের কারুকার্য করা মূল্যবান কাপড় আর একশো বয়াম গুলাবের নির্যাস। এগুলো সবই বাগদাদে পাঠাবার জন্যে বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গিয়েছিলো। সেখানকার বাজারে বিক্রি করা হবে—এই ছিলো উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়ুব তার এই অর্ধসমাপ্ত কাজটুকু আর শেষ করে যেতে পারলো না।

তরুণ ঘানিম ঠিক করলো, বাগদাদে যাবে। বাবার ব্যবসাই মন দিয়ে করবে। বাগদাদে বাবার বহুকালের ব্যবসা। ওখানে বাবার বহু চেনাজানা আছে। নিজের পরিচয় দিয়ে সামনে দাঁড়ালে সকলেই সাধ্য মতো সাহায্য করবে—এই ভরসায় মা ও বোনকে রেখে একদিন বাগদাদের পথে রওনা হয়ে গেলো সে।

বাগদাদে এসে সব আগে সে একখানা বাড়ি ভাড়া নিলো। শোবার ঘরখানা বেশ ঝকঝকে তকতকে। দামী আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো। সঙ্গে লাগোয়া গুদোমঘরটা বেশ বড়সড়। উটের পিঠ থেকে নামিয়ে ঘরে ভরলো মালগুলো। তারপর তালাচাবি বন্ধ করে শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লো ঘানিম। শহরের যে যে অঞ্চলে বড় বড় দোকানপাট আছে, ঘুরে ঘুরে দেখলো। সবারই সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ পরিচয় করলো। তার বাবার পরিচয় দিতে অনেকেই বেশ খাতির যত্ন করলো। সবারই কাছে তার বাসার ঠিকানাপত্র রেখে এলো। উদ্দেশ্য, যার প্রয়োজন বাসাতে এসেও মালপত্র দেখেশুনে সওদা করে নিয়ে যেতে পারে।

পরদিন সকালে খানদশেক শৌখিন কাজ করা সিল্কের থান নিয়ে সে বাজারে এলো। বাহারী কাজ দেখে প্রথম দোকানদারই পছন্দ করে কিনে নিলো। ঘানিম দেখলো প্রতি থানে দু' দিনার লাভ পেয়েছে সে। পরদিনও আবার কয়েকটা থান নিয়ে বাজারে গেলো। সেগুলোও চটপট বিক্রি হয়ে যায়।

এইভাবে একটা বছর কেটে গেলো। ঘানিমের কাপড়ও যেমন বাজারের সেরা, তেমনি তার গুলাবের নির্যাসও ষোলআনা খাঁটি। কোন মালই পড়ে থাকলো না। এক এক করে সব বিক্রি হতে লাগলো। এবং ভালো লাভ দিয়েই বিক্রি হলো।

একদিন বিকেলে বাজারে গিয়ে ঘানিম দেখলো, সব দোকানপাট বন্ধ। এমন কি বাজারে ঢোকার সদর ফটকটাও তালা দেওয়া। কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারে না সে। আজ তো কোন পরবের দিন না। তবে? তবে কেন সব বন্ধ! একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করতে বললো, বাজারের খুব নামজাদা এক দোকানের মালিক মারা গেছেন আজ। তাকে নিয়ে সবাই মিলে মিছিল করে গেছে গোরস্থানে। ঘানিম ভাবলো, তারও যাওয়া উচিত। কারণ ব্যবসাদারদের এই সব সৌজন্য খুব দরকার।



গোরস্থানের পথে দ্রুত হেঁটে চললো সে। কিছু দূর যেতেই দেখলো, বড় মসজিদের সামনে নামানো হয়েছে মৃতদেহটা। একটু পরে প্রার্থনা শেষ হলে আবার উঠানো হলো শব। ঘানিমকে পেয়ে দোকানদাররা খুব খুশি হলো। বিদেশী হয়েও সে তাদের কাজের সময় এসেছে।

কবর দেওয়া শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেলো। ঘানিমের ভয় করতে লাগলো। বাসাতে তার দ্বিতীয় কোন লোক নাই। অথচ চোর ডাকাতের উপদ্রব যথেষ্টই আছে। যদি তার ঘরের তালা ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায় সব মালপত্র। ঘানিম দ্রুত পা চালিয়ে বাসার দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে আর এগোতে সাহস

পায় না। সামনে একটা বাদাবন পেরুতে হবে। শেয়াল, পেঁচা, হোদল প্রভৃতি নানারকম জন্তুজানোয়ারের ডাক শুনতে পেলো। ঘানিম দাঁড়িয়ে পড়ে। অচেনা অজানা জায়গা। রাতের বেলায় এদিকে সে কখনও আসেনি। না জানি কোন বাঘ ভাল্লুকের আস্তানায় গিয়ে পড়বে সে। দারুণ ভয় করতে লাগলো তার। এখন সে কি করবে? কী করে পৌঁছবে তার বাসায়? আর তাছাড়া যাবেই বা কোথায়? কালো লম্বা মতো কি একটা বস্তু যেনো তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঘানিম ভয়ে একপা একপা করে পিছু হটতে থাকে। তারপর পিছন ফিরে চোঁ দৌড়। দৌড়ে যে কোথায় যাবে তার হদিস জানা নাই। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই দৌড়তে দৌড়তে এক সময় একটা ছোট্ট গোরস্থানে এসে ঢুকে পড়ে। একটু আগে সে তার মালপত্রের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলো। এখন কিন্তু সে-সব চিন্তাভাবনা উবে গেছে। আপন প্রাণ বাঁচানোর সমস্যাই এখন সবচেয়ে বড় তার কাছে।

কোন এক বড়লোক পরিবারের ব্যক্তিগত সমাধিক্ষেত্র। গুটি কয়েক মাত্র কবর। মাঝখানে বেশ বড় রকমের একটা গম্বুজ। পাশেই একটা নারকেল গাছ। আর এ পাশে শান বাঁধানো একটা চবুতরা। ঘানিম রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেবে বলে চবুতরার উপরে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। উঠে গিয়ে ফটকের দরজাটা বন্ধ করে এসে আবার শুয়ে পড়ে। তবু ঘুম আসে না। একটু পরে দেখতে পেলো, একটা লণ্ঠনের আলো শহরের প্রধান ফটক ছাড়িয়ে ক্রমশ ঘানিমের দিকেই আসছে। ভয়ে শিউরে উঠে সে। কি করবে কোথায় লুকোবে ভেবে পেলো না। এখন যদি দরজা খুলে বাইরে পালাতে যায়, নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবে ওদের হাতে। উপায়ন্তর না দেখে নারকেল গাছ বেয়ে উপরে একেবারে মাথায় উঠে গেলো সে। আলো আরো নিকটবর্তী হলে গাছের মাথায় বসে ঘানিম দেখলো, তিনটি নিগ্রো। একেবারে দৈত্যের মতো দেখতে। একটা বিরাট বড় বাক্স দু'জনে মাথায় করে বয়ে আনছে। আর একজনের হাতে একটা লণ্ঠন আর একখানা কোদাল। ফটকের সামনে এসে লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে একটা নিগ্রো আশ্চর্য হয়ে বললো, কী ব্যাপার, সবাব। সন্ধ্যাবেলা আমরা দেখে গেলাম দরজা খোলা। আর এর মধ্যে ভিতর থেকে বন্ধ করলো কে?

সবাব জবাব দিলো, তাই তো, আমার মনে হচ্ছে, কাফুর ভিতরে লোক আছে।

তৃতীয় নিগ্রোটার নাম বুখাইৎ। বললো, তোমাদের যেমন বুদ্ধি! মালিক দরজা খুলে রেখে দেবে তোমাদের? আর তোমরা এসে দিব্যি মরাটা তুলে ফলার করো আর কি?

অপর দু'জন বলে, দ্যুৎ, আবোলতাবোল বকছিস খালি। মালিকের খেয়েদেয়ে কাজ নাই সে এই গোরস্থানের দরজা বন্ধ করতে আসবে।

বুখাইৎ বলে, বিশ্বাস না হয় ভিতরে ঢুকে দেখো, নিশ্চয়ই কেউ পাহারায় আছে। আর এও ঠিক আমাদের হাতের আলো দেখার পর সে নারকেল গাছের মাথায় উঠে লুকিয়ে পড়েছে।

ঘানিম ভাবলো আর কোন বাঁচার উপায় নাই। এখুনি ওরা ভিতরে ঢুকবে। নারকেল গাছে উঠে তাকে হিড় হিড় করে টেনে নামাবে। তারপর? তারপর আর ভাবতে পারে না সে। ঐ তিনটি সুদানী নিগ্রোর হাতে তার জানটা আজ যাবে। একমাত্র আল্লাই ভরসা। তিনি ছাড়া আর কেউই বাঁচাতে পারবে না।

দুই নিগ্রো সবাবকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, সবাব তুই দেওয়ালটা টপকে ওপারে গিয়ে দরজা খুলে দে। তোকে সবচেয়ে চর্বিওলা মাংসগুলো দেবো।

সবাব বললো, আমাকে কি তোমরা এতোই হাঁদা পেয়েছো? তার চেয়ে এসো একসাথে মিলে বাক্সটাকে দেওয়ালের মাথায় তুলে ওপারে ফেলে দিই।

কিন্তু অন্যজন রাজি হলো না।—না না সে হয় না। বাক্সটাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

সবাব মাথা নাড়ে, তা ভাঙ্গতেও পারে বটে। আবার ওদিকটাও ভাবো। আমরা

হয়তো ভেতরে ঢুকে দেখলাম আর এক মস্তান তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে আমাদের জন্যেই বসে আছে। তখন তাদেরও ভাগ দিতে হবে।

—তুই একটা আস্ত গাধা। যত সব বিদঘুটে কল্পনা—

ওরা দু'জনে দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে ফটক খুলে দিলো। সবাব আলো দেখালো আর ওরা দু'জনে বাক্সটাকে টেনে ভিতরে ঢুকিয়ে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, কি শালা লম্বা পথ, ফুরাতে আর চায় না।

বোঝা গেলো অনেকটা পথ বাক্সটা বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। তারপর কসরৎ করে দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকেছে। তাই তাদের হাঁপ ধরে গেছে। একজন বললে, দাঁড়াও আগে একটু জিরিয়ে নিই। তারপর গর্ত খোঁড়া যাবে 'খন। এখন সবে মাঝ রাত্তির। সকাল হতে ঢের বাকী।

আর একজন বললো, তা এই মাঝ রাতে শুয়ে শুয়ে তো আর জিরোনো ঠিক হবে না। শালা ঘুমিয়ে পড়লেই চিত্তির। এক্কেবারে সকাল হয়ে যাবে।

আর একজন বললে তার চেয়ে গল্প বলো, নিজের নিজের খোজা হবার কাহিনী এসো বলি আমরা তিনজন। তাতে আয়েসও হবে, গল্পও শোনা যাবে—অথচ ঘুমও আসবে না।

বাকী দু'জনে সায় দিয়ে বললো, খুব ভালো বলেছো। আজ আমরা নিজের নিজের কাহিনী বলবো। কি করে আমরা খোজা হলাম সেই কাহিনী।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি প্রায় শেষ। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

আটত্রিশতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে।

সেই তিনজন সুদানী নিগ্রো তাদের খোজা হওয়ার কাহিনী বলবে বলে ঠিক করলো। প্রথমে শুরু করে সবাব।

আমার তখন বয়স মাত্র পাঁচ। সেই সময় বাগদাদের বাজারে এনে বিক্রি করে দিয়ে যায় আমার মা-বাবা। সুলতানের প্রাসাদের দ্বাররক্ষী আমাকে কিনে নিয়েছিলো। তার নিজের একটি তিন বছরের মেয়ে ছিলো। আমি যেমন ঘরদোরের কাজ করতাম, তেমনি তার খেলার সাথীও ছিলাম আমিই। আমি তাকে গান শোনাতাম, নাচ করাতাম, মজার মজার গল্প করতাম। মোট কথা সে ছিলো আমার নিত্য সহচরী।

এইভাবে আমার বয়স যখন বারো, তখন ওর দশ। একদিন আমি একটা বাগানে নির্জন নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলতি দিয়ে পাখী তাক করছিলাম। এমন সময় মেয়েটি এসে পিছন থেকে আমার চোখ চেপে ধরলো। আমি তখুনি বুঝেছি। কিন্তু না বোঝার ভান করে ওর হাতটা চেপে ধরে বললাম, কে?



কিন্তু মেয়েটা জবাব দেয় না। আমার পিঠের সঙ্গে ওর বুকটা আরও সেঁটে আরও শক্ত করে চেপে ধরে আমার চোখ দু'টো। আমি ওর সারা হাত দু'টো বাহু পর্যন্ত হাত বুলাতে থাকি। কি নরম আর মসৃন সুডৌল ওর বাহু। আমার পিঠে ওর বুকের ছোট ছোট স্তন দুটি পিষ্ট হতে থাকলো। কেমন যেন শিহরণ খেলে গেলো আমার শরীরে। বোধহয় মেয়েটারও ঐ একই দশা হয়ে থাকবে। সেও আমাকে ছাড়ে না। আমিও তাকে ছাড়তে চাই না।

এইভাবে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। এবার আমি ওর বাহু ছাড়িয়ে গলায় হাত বুলাতে থাকি। তারপর হাতখানা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে।

এমন সময় মেয়েটা খিল খিল করে হেসে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে দৌড় মারে। কিন্তু বেশী দূর যায় না। একটা বিরাট মোটা গাছের গুড়ি পড়েছিলো, তার ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ে সে। আমিও ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। তারপর শুরু হয় ধস্তাধস্তি। কামড়া কামড়ি, খামচাখামচি। ও আমার ডান হাত-এর বাহুতে এমন জোরে দাঁত বসিয়ে দিলো যে রক্ত বেরিয়ে গেলো। আমি ছেড়ে কথা কইবার ছেলে নই। দিলাম ওর ঠোঁটটা কামড়ে। ও আমাকে এলোপাথাড়ী কিল চড় ঘুষি মারতে লাগলো। আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। ওর ছোট্ট নরম হাতের মার আমার বেশ আরামই লাগছিলো। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটলো। আমি আলতো করে ওর কোমরটা আমার দেহের কাছে টেনে নিতেই আবার ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আরও ক্ষিপ্রতায় ওর বুকে হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরলাম সেমিজটা। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেলো। সেই প্রথম দেখলাম ওর দেহে সবে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করেছে। লজ্জায় ও দু' হাত দিয়ে বুকটা ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো। আমি তখন হাসছি। ওর চোখে দেখলাম এক আদিম হিংস্রতা। এক মুহূর্ত। তারপরে ও ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। ওর এই আচমকা আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিলাম না। টাল সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর আমার ইজেরটা ধরে এমন জোরে একটা হ্যাঁচকা টান মারলো যে, পড়াৎ করে ছিঁড়ে ওর হাতের মধ্যে চলে গেলো একটা টুকরো। আর সেই মুহূর্তে নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। অপলক চোখে দেখতে থাকলো আমার ছেঁড়া ইজেরটার দিকে। আমিও নির্বাক নিশ্চল। তারপর আকাশে ঝড় উঠলো। কালো মেঘে ঢেকে গেলো সারা দুনিয়া। ভয় হলো এখনই প্রবল বর্ষণ শুরু হবে। হলোও তাই। সেই প্রথম বর্ষণেই সব ভেসে গেলো।

বাড়ি ফিরে গেলো সে ভয়ে ভয়ে। জামা ছেঁড়া, রক্তের দাগ। ওর মার সন্দেহ হলো। ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝলো মেয়ে সর্বনাশ করে এসেছে। মায়ের কাছে কিছুই গোপন করতে পারলো না সে। ওর মা আমাকে কিছু বললো না। কারণ বকাবকি করতে গেলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে। তা ছাড়া মেয়েটার বাবা ছিলো ভীষণ কড়া লোক। হয়তো আমার সঙ্গে তার মেয়েকেও কেটে ফেলবে। ওর মা শাদীর পাত্র খুঁজতে লাগলো। একটা নাপিতের ছেলের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই কথাবার্তা হয়েছিলো। এবার পাকাপাকি শাদীর তারিখ ঠিক হয়ে গেলো।

মেয়ে বায়না ধরলো, আমি সঙ্গে না গেলে সে শাদী করবে না। তখন ঠিক করা হলো আমাকে খোজা করে মেয়ের সঙ্গে পাঠানো হবে। একদিন নাপিত ডেকে আমাকে খোজা করা হলো। এর মাসখানেকের মধ্যেই শাদী হয়ে গেলো তার। ওর দেখাশুনা করার জন্যে আমিও গেলাম ওর শ্বশুর বাড়ি। সেইখানেই আমার জীবনের বেশী সময় কেটে গেছে। তারপর একে একে মেয়েটির মা বাবা এবং স্বামী মারা গেলো। আমি চাকরী পেলাম সুলতানের প্রাসাদে। সেই থেকে ওখানেই আছি। এই হলো আমার খোজা হওয়ার কাহিনী। এবার কাফুর, তুমি শোনাও তোমার কিস্‌সা।

কাফুর বলতে থাকে :

আমার বয়স তখন সবে আট। ঐ বয়সেই আমি মহা ধড়িবাজ হয়ে উঠেছিলাম। আমার মতো অসৎ এবং মিথ্যেবাদী সে তল্লাটে ছিলো না কেউ। এমন কায়দা করে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতাম, শুনে লোকের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেতো। তবে একটা গুণ ছিলো আমার। আমি যখন তখন মিথ্যা কথা বলতাম না। বছরে মাত্র একটাই মিথ্যে বলতাম। এবং সেইটে বড় জব্বর। তার জন্যে আমার কতো মালিকের কতো যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই।

এইভাবে একবার এক মালিকের সঙ্গে মিথ্যে রসিকতা করতে গিয়ে আমি আমার পুরুষ অঙ্গ হারিয়ে খোজা হয়েছিলাম। সেই কাহিনীই এখানে সংক্ষেপে শোনাচ্ছি তোমাদের।

তখন আমি এক সওদাগরের হেপাজতে। ক্রীতদাস কেনাবেচাই তার ব্যবসা। আমার আগের মালিক তার কাছে বিক্রি করে গেছে। এবার সে আমাকে নীলামে তুললো। দাম উঠলো ছয়শো দিরহাম। আমার নতুন মালিক সওদাগরের হাতে গুণে গুণে ছয়শো কুড়ি দিরহাম দিলো। কুড়ি দিরহাম দালালী। সওদাগর আগেই বলে দিয়েছিলেন, কাজে কর্মে আমি দারুণ চৌকস। শুধু একটাই দোষ আমার, বছরে মাত্র একবার মিথ্যে কথা বলা। এই দোষের কথা জেনেশুনেই আমার মালিক আমাকে কিনে নিয়ে এলো। নতুন জামাকাপড় দিলো। ভালো দেখে শোবার আস্তাবল দিলো। মোট কথা খাওয়া পরার ব্যবস্থা বেশ ভালোই করেছিলো। মালিক আমাকে ভালোভাবে কাজ করার জন্যে অনেক বোঝালো। মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ, দোজকে যেতে হয়। সুতরাং কোন কারণেই যেন আমি মিথ্যে কথা না বলি। কিন্তু ওদের ভালো কথা কি আর আমার ভালো লাগে। মুখে বললাম, না না, আর কখনো মিথ্যে বলবো না, কিন্তু মনে মনে শয়তানী প্যাঁচ খুঁজতে থাকলাম। এই ভাবে ছ' মাস কেটে গেলো। মালিক ভাবলো তার উপদেশে কাজ হয়েছে। আমি সুবোধ বালক হয়ে গেছি।

একদিন সকালে মালিক বললো, কাফুর, চল আজ এক জায়গায় যাবো। অনেক লোক আসবে। খানাপিনা, নাচ, গান খুব হবে সেখানে।

মালিক আমাকে শহরের বাইরে, অনেক দূরে এক বাগানবাড়িতে নিয়ে গেলো। এক এক করে মালিকের বন্ধুবান্ধব আসতে শুরু করলো। মালিক আমাকে বললো, কাফুর, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে রে। এখন কী করা যায়?

আমি বললাম, কী করতে হবে বলুন?

—তুই আমার খচ্চরটা নিয়ে বাড়ি চলে যা। আলমারীর মাথায় দশ জোড়া তাস কিনে রেখেছি। ওগুলো জলদি নিয়ে আয়। তা না হলে, আসর জমবে না।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি ছুটে যাবো আর ছুটিয়ে আসবো।

খচ্চরটা ছুটিয়েই বাড়ি চলে এলাম। হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। মালকিন, তার দুই মেয়ে, দুই ছেলে সবাই ছুটে এলো।

—কী ব্যাপার কাঁদছিস কেন?

আমি কোন জবাব দিই না। আরও জোরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকি।

ওরে বাবারে, কি হবে রে, কি করে আমি সে কথা বলবো রে।

এবার আমার মালকিন, চিৎকার করে উঠলো—কাফুর! কি হয়েছে বল।

—মালিক মারা গেছে।

—মালিক মারা গেছে—!

—হ্যাঁ মালকিন, মালিক মারা গেছে।

ছেলে মেয়ে বউ সবাই এক সঙ্গে কঁকিয়ে উঠলো, কি হয়েছিলো? কি করে মারা গেলো?

আমি তখন বানিয়ে বললাম।—বাগান বাড়ির পাঁচিলের ওপর উঠে একটা সরবতী লেবুর ডাল থেকে লেবু পাড়তে উঠেছিলো মালিক। হঠাৎ বেসামাল হয়ে নিচে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ। এখন কি হবে, মালকিন?

কান্নার রোল উঠলো সারা বড়িতে। পরনের জামাকাপড় ছিড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগলো সবাই। ঘরের দামী দামী বাসনপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাঙ্গতে লাগলো। চেয়ার, টেবিল, আলমারী সব বাইরে বের করে পিটিয়ে পিটিয়ে ভাঙ্গা হলো। খাট পালঙ্ক লেপ তোষকে

আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। দেওয়ালে আলকাতরা লেপে দেওয়া হলো। মোট কথা, বাড়ির মালিক মারা গেলে যা যা করে শোকপ্রকাশ করতে হয় তার কিছুই বাদ রাখা হলো না।

এর পর চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বোরখা খুলে, মাথার চুল এলোমেলো করে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় ছুটতে থাকলো। দু' পাশের বাড়ির লোকজন বেরিয়ে এসে সমবেদনা সান্ত্বনা জানাতে লাগলো।—কি করবে বাছা, সবই আল্লাহর খেলা। তাঁর বিধান মেনে নিতেই হবে।

মালকিন বললো, ওরে কাফুর আমাকে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে চলরে বাবা। গোর দেবার আগে তাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসি।

পাড়া পড়শীরা বললো, অপঘাতে মারা গেছে। কোতোয়ালীতে খবর পাঠানো দরকার। কোতোয়াল সাহেব না যাওয়া পর্যন্ত কবর দেওয়া যাবে না।



মালকিনকে সঙ্গে নিয়ে তারা কোতোয়ালের উদ্দেশে রওনা হলো। আর সেই ফাঁকে আমি গেলাম বাগান বাড়িতে।

শাহরাজাদ দেখলো রজনী অতিক্রান্ত। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

ঊনচল্লিশতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

খোজা কাফুর তার কাহিনী বলছে ঃ

মালকিন যখন কোতোয়ালের উদ্দেশে রওনা হলো আমি তখন চলে গেলাম বাগানে। সারা গায়ে কাদামাটি মেখে কিম্ভূতকিমাকারের মতো সাজলাম। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে হাজির হলাম মালিক-এর সামনে।

—ও মাগো, ও বাবাগো, আমার কি হলো গো? আমার মালকিন, আমার ছোট্ট দুই মালকিন, আমার ছোট দুই মালিক—ও বাবা গো, কি করে বলবো এসব কথা—

আমার মালিক কিছুই বুঝতে পারে না। ছোঁড়াটা কি বলে?—কীরে কি হয়েছে কাঁদছিস কেন?

—সব শেষ হয়ে গেছে মালিক, সব খতম—

—কী সব শেষ হয়ে গেছে রে? কী সব যাতা বলছিস? তোর কি মাথাটাথা সব খারাপ হয়ে গেলো নাকি?

—হয়নি। কিন্তু এবার হয়ে যাবে। ওরে বাবা, একসাথে অতোগুলো মানুষ—? না না, আমি বলতে পারবো না, আমি বলতে পারবো না—

আমি মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম।

মালিকের এবার ভয় হলো।—কাফুর! কি হয়েছে বাবা, তাড়াতাড়ি বল।

মালিক, আমি এখান থেকে বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের বাড়ির সামনে হাজার হাজার লোক। এমন সব চেঁচামেচি—কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করলেও কেউ কিছু জবাব দেয় না।

মালিক অধৈর্য হয়ে ওঠেন, কাফুর? মোদ্দা কথাটা কি—তাই আগে বল, বাঁদর। তারপর শুনবো তোর ভ্যানতারা।

মালিক, লোকজন দেখে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি তখন। লক্ষ্যই করিনি যে আমাদের গোটা বাড়িটাই ধসে পড়ে গেছে।

—বলিস কিরে? কারো লাগে টাগে নি তো?

—না তেমন কিছু না, তবে মরে গেছে।

—মরে গেছে? কে মরে গেছে? তোর মালকিন?

—জী হাঁ।

—তো ছোট দুই মালকিন? তারা?

—জী, তারাও মারা গেছেন।

এবার বিকট এক চিৎকার দিয়ে ওঠে মালিক।—তোর ছোট দুই মালিক? তারা বেঁচে আছে তো?

—জী না। তারাও চাপা পড়ে মারা গেছে। বাড়ির একটা জনপ্রাণী বাঁচেনি। গরু, ছাগল, মুরগী সব—সব দেওয়াল চাপা পড়ে শেষ হয়ে গেছে।

মালিক এবার দু'হাতে মুখ ঢেকে ধপাস করে মাটির উপর বসে পড়লো। ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। দাড়ি উপড়াতে থাকলো। জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

—হায় আল্লাহ আমি কি পাপ করেছিলাম, এইভাবে আমাকে সাজা দিলে? আমার বিবি আমার আদরের মেয়ে আমার জানের কলিজা ছেলে—সব তুমি কেড়ে নিলে? এই কি তোমার বিচার মালিক?

উপস্থিত বন্ধুবান্ধব অভ্যাগতরা মালিককে সান্ত্বনা দিতে থাকে, কি করবে বলো, কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। ওঠ, চলো, ঘরে যাই। তাদের ইন্তাকালের কাজ কাম সমাধা করতে হবে তো। বিপদের দিনে ভেঙে পড়লে তো চলবে না, ভাই। নিজেকে শক্ত করো। খোদা যা করে, তাকে মেনে নিতেই হবে।

মালিককে টেনে তোলে তারা। মদ খাওয়া মাতালের মতো টলতে থাকে সে। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে বাড়ির দিকে নিয়ে আসতে থাকে। এমন সময় অদূরে শোনা গেলো কান্নার রোল। মনে হলো বিরাট একটা শোক মিছিল এগিয়ে আসছে বাগানবাড়ির দিকে। মিছিল আরো কাছে এলে দেখা গেলো তার পুরোভাগে রোরুদ্যমানা মালকিন। বোরখা নাই। এলোমেলো অবিন্যস্ত চুল। ঠিক একটা পাগলীর মতোন।

মালিক অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে। মালকিনের পিছনে তার দুই মেয়ে আর দুই ছেলে। সবাই হাহুতাশ করে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সবারই সাজপোশাক ছিন্ন ভিন্ন। চুল উস্কোখুস্কো। মালকিন এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।—ওগো, তুমি বেঁচে আছো?

ছেলেমেয়েরা বাবাকে জড়িয়ে ধরলো, আব্বাজান, তোমার লাগেনি তো?

মালিক কিছুই বুঝতে পারে না। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।—কেন, লাগবে কেন? কি হয়েছে আমার?

মালকিন বলে, সে কি? তুমি নাকি পাঁচিলের উপর থেকে পড়ে মরে গেছো?

—মরে গেছি? আমি? আমি তো শুনলাম বাড়ি ধসে পড়ে তোমরা সবাই মারা পড়েছো?

—বাড়ি ধসে পড়ে? আমরা সবাই মারা গেছি? কে? কে? তোমাকে এসব ডাহা মিথ্যে খবর দিয়েছে, বলো তো?

—কেন? তোমার গুণধর চাকর কাফুর। সেই তো কাঁদতে কাঁদতে এসে বললো, তোমরা কেউই বেঁচে নাই।

মালকিন এবার বুঝতে পারলো, সব আমার শয়তানী।—ব্যাটা, শয়তান, ছুঁচো এত বড় বদমাইশ! এইরকম ডাহা মিথ্যে কথা কেমন নিখুঁত করে সাজিয়ে বলেছে। অবিশ্বাস করার উপায় ছিলো না।

মালিক এসে আমাকে এক ঘুষি মেরে নিচে ফেলে দিলো। পাশে একটা শাবল পড়েছিলো, সেটা তুলে নিয়ে তেড়ে এলো আমার দিকে, হারামী বাচ্চাটাকে আজ মেরেই ফেলবো।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি আমাকে মারছেন কেন?

—মারবো না তো কি সোহাগ করবো, বাঁদর কোথাকার।

কিন্তু সওদাগরের কাছ থেকে যখন আমাকে কিনে আনেন তখন একটা শর্তের কাগজে আপনি সই করে এসেছেন, মালিক। সওদাগর আপনাকে সব খুলেই বলেছিলো। কাজে কামে আমার কোন গাফিলতি নাই। দোষের মধ্যে একটাই বছরে একটা শুধু মিথ্যে বলা। আপনি সব শুনেও আমাকে কিনে নিলেন। সওদাগরের সঙ্গে আপনার চুক্তি হয়েছে। কাজ কাম ঠিক মতো না করলে আপনি আমাকে সাজা দিতে পারেন। কিন্তু মিথ্যে কথা বললে বছরে প্রথমবার আমাকে কোনও সাজা দিতে পারবেন না। প্রত্যেক বছরে একবার মাত্র আমি মিথ্যা কথা বলবো এবং তার জন্যে আপনার যা-ই ক্ষয়ক্ষতি হোক, আপনাকে মেনে নিতে হবে। এই ছিলো আপনার শর্ত।

কাফুর-এর কথা শুনে মালিক শাবলটা নামিয়ে রাখে।—তা বলে এই রকম মিথ্যে রসিকতা? এতে তো মানুষের জীবন সংশয় ঘটতে পারে।

ঘটতে পারে ঘটবে। আপনাকে তো কিছু গোপন করা হয়নি। আর তাছাড়া আমার মিথ্যে কথাটা তো এখনও পুরো বলা হয়নি মালিক। সবে অর্ধেক হয়েছে। আরও অর্ধেক এখনও বাকী।

মালকিন চোখ বড় বড় করে বলে, ওরে বাঁদর, এই তোর আধখানা রসিকতা। তা হলে পুরোটা কি, সোনার চাঁদ? দাঁড়াও তোমার বাকী রসিকতাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

কোতোয়াল পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। তার হুকুমে সিপাই আমাকে সপাং সপাং করে বেতের চাবুক চালাতে থাকলো। এর পর আমার আর জ্ঞান নাই। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখি আমার পুরুষাঙ্গটা কাটা। ওষুধ লাগিয়ে তুলো কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

মালকিন বললো, বাকী অর্ধেক রসিকতাটা এ-ই—বুঝলে বাঁদর। আমার শখের ঘরদোর, খাট, পালঙ্ক, আসবাবপত্র সব তুমি নষ্ট করে দিয়েছো। সেই কারণে আমিও তোমার জীবনের আসল জিনিসটাই ছেঁটে বাদ করে দিয়েছি।

এর পর মালিক আমাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে দিলো। সাধারণ নফর চাকরদের চেয়ে খোজাদের বাজার দর অনেক বেশী। এইভাবে দু' বছর চার বছর বাদ বাদ আমি নানা মালিকের হাত বদল হতে হতে একদিন খলিফার হারেমে এসে পড়লাম। তারপর থেকে এখানেই রয়ে গেছি।

কাফুর বললো, এই হলো আমার খোজা হওয়ার ইতি বৃত্তান্ত।

অন্য দু'জনে কাফুরের পিঠে গাঁট্টা বসিয়ে দিয়ে বললো,—শালা মাইরি, একেবারে হাড়ে হারামজাদা। এমন রসিকতা—জান কয়লা করে ছেড়ে দেবে!

এবার বুখাইতের পালা।

বুখাইত বললো, শোনো ভাই, আমার দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। কিন্তু রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে কাজ হাসিল করে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। তাই আজ আর তোমাদের সে কাহিনী শোনাবার সময় নাই। ভালোয় ভালোয় কাজ কাম শেষ করে নাও। তারপর ফিরে গিয়ে বলবো। সংক্ষেপে শুনে রাখো, আমি আমার মালকিনের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিলাম আর ব্যভিচার করেছিলাম তার ছেলের সঙ্গে। সেই অপরাধের সাজা আমি পেয়েছি।

যাক, ওসব কথা পরে শুনো, এখন এসো গর্ত খুঁড়ি।

কোদাল দিয়ে মাটি কেটে বাক্সটার মাপে একটা বেশ বড় সড় গর্ত খুঁড়লো ওরা। তারপর দু'জনে ধরে বাক্সটা নিচে নামিয়ে দিলো। আর একজন উঁচু করে আলো ধরে রাখলো। এর পর তিনজনে মিলে মাটি চাপা দিয়ে, গোরস্থান থেকে বেরিয়ে হন হন করে হেঁটে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ঘানিম নারকেল গাছ থেকে নেমে এলো। হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে সরিয়ে বাক্সটাকে টেনে উপরে তুললো। একটা পাথরের চাঁই দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে তালাটা ভেঙে ফেললো। ডালাটা তুলতেই মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেলো। ফুটফুটে ফর্সা ডানাকাটা পরীর মতো সুন্দরী এক যুবতী। ঘুমিয়ে আছে। তার পরণে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা দামী সিল্কের সাজপোশাক। গলায় সাতনরী জড়োয়া হার। নাকে হীরের নাকছাবি। মাথায় টায়রা। বাহুতে তাগা। বাজুতে বাজবন্ধ। কোমরে বিছা। পায়ে মল। আগাগোড়া শরীরটা সোনা হীরা জহরতে মোড়া। ঘানিম ভাবে এতো কোনও সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই কোনও সুলতান বাদশাহর শাহজাদী! বুকে হাত রেখে অনুভব করলো, মরা নয় জীবন্ত। ঘুমিয়ে আছে। মানে নাকে ওষুধ ধরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। একটা বিশ্রী ওষুধের আরক এসে ঘানিমের নাকে লাগে, মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। ঘুম ঘুম আমেজ আসে। কিন্তু নাকে কাঠি দিয়ে জোরে জোরে হেঁচে নিজেকে ঠিক করে নেয়। মেয়েটার গায়ে নাড়া দেয়। কিন্তু অঘোর ঘুমে সে কাতর। ঘানিম ভাবে, কি করে ওর ঘুম ভাঙ্গানো যায়—নাকের ফুটোর ভিতরে সুড়সুড়ি দিতে থাকে। মাথাটা এদিক ওদিক নাড়িয়ে নাকটা সরিয়ে নিতে চায়। তারপর জোরে জোরে হাঁচতে থাকে। ঘানিম দেখলো, একটা বড় ডেলা নাক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। অজ্ঞান করার ওষুধ। এইবার ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো মেয়েটি। ওষুধের বড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঘানিম। ওরে বাস, একটা হাতীর নাকে গুঁজেও দিলেও তা বিশঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে।

চোখ মেলে তাকালো বটে, কিন্তু তখনও তন্ময়ভাব কাটলো না, স্বগতভাবে বিড়বিড় করে কি সব বলতে থাকে। সব কথা বোঝা যায় না। দু-একটার অর্থ উদ্ধার করতে পারে ঘানিম। ওঃ কি গরম, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া করো, আমাকে একটু পানি দাও। কোথায় রে, কোথায় গেলি সব? কাছে আয় ও সীতারা, ও বাজিয়া, কাছে আয়, হাওয়া কর। কইরে, তোরা সব গেলি কোথায়? কথা বলিস না কেন?

কিন্তু কেউ জবাব দিলো না। জবাব দেবার মতো একমাত্র ঘানিম ছাড়া তো সেই গোরস্থানে দ্বিতীয় কোন মানুষ নাই। এবার বড় বড় চোখ মেলে তাকালো সে। এপাশ ওপাশ উপরে নিচে সব ভালো করে দেখে চিৎকার করে উঠলো।—এখানে, এই গোরস্থানে আমাকে কে নিয়ে এলো? আমার প্রাসাদের হারেম? আমার খাট পালঙ্ক, দাসী, খোজা তারা সব কোথায় গেলো? হায় আল্লাহ কে আমার এই সর্বনাশ করলো?

এতক্ষণ ঘানিম চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো ওকে। বললো, সুন্দরী, আমার নাম ঘানিম ইবন আয়ুব। তোমার কোনও ভয় নাই। যদিও তুমি তোমার প্রাসাদের অন্দরমহল থেকে এই গোরস্থানে এসে পড়েছো, তবু ভরসা রাখো, তোমার কোন ক্ষতি আর কেউ করতে পারবে না। আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমার ভালো-বই মন্দ করবো না। আল্লাহর অপার মহিমা, তা না হলে আজ রাতে আমিই বা এখানে আসবো কেন? তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তোমাকে বাঁচাতে—উদ্ধার করতে। আমি আল্লাহর বান্দা। তোমারও গোলাম। তুমি যা হুকুম করবে আমি তাই তালিম করবো।

মেয়েটি দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে লাগলো। ভাবলো, বুঝি বা খোয়াব। কিন্তু না, সে তো জেগেই আছে।

—আমি কি করে এখানে এলাম, বলো তো।

তখন ঘানিম আদ্যোপান্ত সব খুলে বললো। মেয়েটি বললো, ঠিক আছে, আমি যেমন বাক্সের মধ্যে ছিলাম সেইভাবেই আমাকে শুইয়ে রেখে ডালা বন্ধ করে দাও। একটা খচ্চর ভাড়া করে নিয়ে এসে তোমার ঘরে নিয়ে চলো। আমি তোমাকে আমার সব কাহিনী খুলে বলবো সেখানে।

তখন সবে সূর্য উঠছে। ঘানিম মেয়েটিকে বাক্সে ভরে গোরস্থান থেকে বেরিয়ে পড়ে। একটু পরে একটা খচ্চর ভাড়া করে নিয়ে আসে। চালকটার সঙ্গে ধরাধরি করে বাক্সটা চাপিয়ে দেয় খচ্চরের পিঠে।

সারাটা পথ ঘানিম ভাবতে ভাবতে আসে, নিশ্চয়ই কোনও সুলতান বাদশাহর পরিবারের মেয়ে সে। তার গায়ে খুব কম করে হলেও দশ হাজার দিনারের গহনা আছে। নানারকম কল্পনার জাল বুনতে বুনতে এক সময় তার বাসার দরজায় এসে হাজির হয়।

এইসময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে যায়।

চল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়।

তারপর শুনুন জাঁহাপনা, খচ্চরের পিঠ থেকে বাক্সটা নামিয়ে ঘানিম ঘরে নিয়ে যায়। ডালা তুলে মেয়েটিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। ঘরের চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে সে। মেজেটা দামী গালিচায় মোড়া। দরজা জানলায় সিল্কের কাজ করা পর্দা। পালঙ্কে মখমলের শয্যা। কুর্নিশ কেদারায় ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। পালঙ্কের একপাশে বসে বলে, শোনো ঘানিম, আমার বড় খিদে পেয়েছে। একটু কিছু খেতে দাও।



ঘানিম বাজারে গিয়ে দুম্বার চাঁপ, শাহী হালওয়া, পেস্তার বরফী, বাগদাদী লাড্ডু কিছু আঙ্গুর আপেল কলা, আর এক ঝারি মদ নিয়ে এলো। আর নিয়ে এলো কিছু সুগন্ধী ফুল। খানাপিনার এই আয়োজন দেখে মেয়েটির চোখ খুশিতে নেচে ওঠে। রেকাবী করে সাজিয়ে দিলো ঘানিম, নাও, খাও।

—বারে, আমি একা খাবো নাকি? তুমিও বসো।

ঘানিম বলে, বেশ বসছি।

অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে ঘানিম বসলো ওর পাশে। মেয়েটির কিন্তু মোটেই পছন্দ হলো না। একেবারে ঘানিমের গা ঘেঁসে এসে বসলো সে। —অত দূরে দূরে বসছো কেন? খিদে পেয়েছে বলে তোমাকে সুদ্ধ খেয়ে ফেলবো নাকি?

ঘানিম মাথা নিচু করে হাসে। জবাব দিতে পারে না—না, মানে—মানে—

—আর মানে মানে করতে হবে না। নাও, খাও। একটা মাংসের টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে ঘানিমের মুখে পুরে দেয়।

মেয়েটির চাঁপার কলির মতো আঙ্গুলগুলোর ছোঁয়া ওর ঠোঁটে লাগে। পলকে সারা শরীরে কি যেন এক শিহরণ খেলে যায়। নিজের মা বোন ছাড়া এই প্রথম সে এক অচেনা অন্য মেয়ের এত কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

মেয়েটি এবার ওর মুখটা তুলে ধরে। আহা লজ্জা কেন তোমার!

ঘানিম কোনও কথা বলে না। ওর চোখ দু'টো হাসে।

—বারে, আমি তো আজ তোমার ঘরে মেহেমান। আমাকে আদর যত্ন করো।

—কেন, কোন দোষ ত্রুটী হয়েছে নাকি, কোন—

—আলবৎ হয়েছে, খানাপিনা এনে সামনে ধরলেই সব হয়ে গেলো? খাইয়ে দেবে না—?

ঘানিম তাড়াতাড়ি রেকাবী থেকে এক টুকরো মাংস তুলে ওর মুখে পুরে দিতে যায়। কিন্তু অনভ্যাসের ফলেই হোক, বা হাতটা কেঁপে ওঠার জন্যেই হোক, মেয়েটির কামিজের ওপর পড়ে যায়।

—দিলে তো? দিলে তো মাটি করে! এখন আমি কি করি? তোমার ঘরে আছে নাকি বাড়তি কামিজ?

—আমার ঘরে? আমার ঘরে মেয়েদের কামিজ আসবে কি করে?

—আচ্ছা, কি করে আসে তাও বুঝি জানো না?

—না তো—

শাদী করলেই আসে। খালি কামিজ কুর্তাই আসে না, ঝোলের সঙ্গে মাংসও এসে পড়ে।

ঘানিম-এর সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে।—না, এখনও আমি শাদী করিনি। তুমি আমার জীবনে প্রথম নারী। এর আগে পরনারীর সামনে দাঁড়াইনি কখনও।

আহা-হা-হা, চুক চুক। তা হলে তো দারুণ গোস্তাকি করে ফেলেছি। তোমাকে আমি ছুঁয়ে দিয়েছি। না বাবা, তা হলে সরেই বসি।

মেয়েটি সরে যাবার ভান করে। ঘানিম এবার ওর একখানা হাত চেপে ধরে বলে, আমি কি তাই বলেছি নাকি?

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসে।—তবে কি বলেছো, চাঁদ?

সে-কথার জবাব না দিয়ে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে কামিজটায় ঘসে ঘসে ঝোলের দাগ তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তেল-হলুদের দাগ শুধু জলে ওঠে না।

মেয়েটি বলে, ছাড়ো তো। থাক দাগ। একটু আধটু দাগফাগ থাকা ভালো, বুঝলে। তোমার মতো অত সফেদ হলে আরও বিপদ।

এর পর ওরা দু'জনে খানাপিনা সারে। মৌজ করে মদ খায়। মদের নেশায় মদির হয়ে আসে মেয়েটির চোখ। ঘানিমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। ছেলেটির সারা শরীরে এক অপূর্ব পুলক জাগে। এ অনুভূতি তার জীবনে এই প্রথম। অপলক চোখে মেয়েটিকে দেখে। কি তার রূপ! কি তার যৌবন!

মেয়েটি হাসে। অপূর্ব সে হাসি। বলে, কী? কি দেখছো?

—তোমাকে। কি সুন্দর তুমি। আকাশের চাঁদ তোমার মতো এত সুন্দর না।

—ও বাবা, এ যে কবিতা গো।

—তোমাকে দেখলে, কবিতা আপনা থেকেই আসে।

—তা শোনাও না একটা।

—পরে শোনাবো। এখন বাঁশী বাজাবো, শুনবে।

—শোনাও।



নেশায় মেয়েটির চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসে। আর নিবিড় করে ঘানিমের কোলের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দেয়।

—একটু ছাড়ো। বাঁশীটা বের করে নিয়ে আসি। আমার বাক্সে আছে।

—না থাক, এখন ছাড়বো না তোমাকে। বাঁশী পরে শুনবো। তুমি আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। বড্ডো ঘুম পাচ্ছে।

ঘানিম ওর কপালে হাত রাখে। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটতে থাকে। আর একভাবে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে তার নিটোল নিখুঁত রূপলাবণ্য। কি সুন্দর টানাটানা হরিণ কালো চোখ। আপেলের মতো টুকটুকে গাল, পাকা আঙুরের মতো ঠোঁট। ওর সারা মুখে হাত বুলিয়ে অনুভব করতে থাকে কোমল মসৃণতা। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠে বসে।—এই বুঝি তোমার মাথায় হাত বুলানো হচ্ছে—সাহেব?

ঘানিম লজ্জা পায়। নিজের অজান্তে কখন হাতটা নেমে এসেছিলো ওর গালে ঠোঁটে। মেয়েটি বলে, আর একটু সরাব দাও, সব নেশা কেটে গেছে।

ঘানিম আবার দু' পেয়ালা সরাব ঢালে। এক পেয়ালা তুলে দেয় মেয়েটির হাতে। নিজে নেয় এক পেয়ালা। এইভাবে সারাটা দিন মদ খেয়ে গান গেয়ে, খুশির বন্যায় দু'জনে গা ভাসিয়ে দেয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। আবার বিকেলও ফুরিয়ে রাত্রি নেমে আসে। মোমের আলোয় এক অপূর্ব মাদকতা আছে। ঘানিম আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। আরও কাছে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমু খেতে চায়। কিন্তু মেয়েটি খিল খিল করে হেসে দু-হাত পিছিয়ে সরে যায়।—এখনি নয়গো বন্ধু, এখনি নয়। আরও কিছু ধৈর্য ধরো। রজনী গভীর হোক। আজ সারা রাত তোমাকে আমি অমৃতসায়রে ভাসিয়ে রাখবো। এখনি নয়, আমাকে আরও একটু নেশা করতে দাও। তুমিও আরও উদ্দাম হও। তোমার চোখে এখনও দেখতে পাচ্ছি না সিংহের বিক্রম। নাও, আরও একটু সরাব খাও।

নিজের পেয়ালাটা ঘানিমের মুখে তুলে ধরে। এক চুমুকে সবটুকু টেনে নিয়ে বলে, কেন, আমাকে কি পুরুষ বলে মনে হচ্ছে না।

—সারাদিন হয়নি। এখন একটু হচ্ছে। অতো শান্তশিষ্ট হয়ে লজ্জায় লাল হয়ে বসে থাকলে কি কোনও মেয়ের ভালো লাগে। পুরুষ পুরুষের মতো হবে। তোমার দাঁতের দংশনে আমার ঠোঁটে রক্ত ঝরবে, তোমার হাতের থাবায় আমার যৌবন জর্জরিত হবে, তবে না তুমি সার্থক পুরুষ! তুমি আমাকে জাগাবে, না, মেয়ে হয়ে আমি তোমাকে সারাদিন ধরে জাগালাম।

ঘানিম বলে, জীবনে এই প্রথম তুমি আমার যৌবনে রং ধরালে। প্রথম প্রথম একটু শরম হবে না?

—ও, তাই বুঝি! পরে তা হলে একেবারে বে-শরম বেহায়া হয়ে যাবে?

—কি যে বলো!

—বুঝেছি বুঝেছি। দেখতে মনে হচ্ছে, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানো না। আসলে তুমি একটা জাগুয়ার।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীরতর হয়। দু'জনেই তখন মদের নেশায় বিভোর। ঘানিমকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি। ঘানিমও তার ডাকে সাড়া দেয়। দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে শুয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। মেয়েটি এবার হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু ঘানিম শঙ্কিত হয়। না না, এই ভালো। এর বেশী আর কিছু চাই না আমি। আজকের রাতটা তোমাকে বুকে নিয়েই কাটাতে চাই।

—কিন্তু, সোনার চাঁদ, এত অল্পে তো আমি তুষ্ট হবো না।

—আজ আমাকে ক্ষমা করো। আজ আর এর বেশী না।

মেয়েটি আদর করে ঘানিমকে ঠোনা মারে, বোরখা পরে থেকো।

ঘানিম ওর বুকের মধ্যে মুখ লুকায়।—দিন কি শেষ হয়ে যাচ্ছে নাকি? তুমি তো আমারই আছো। আমারই থাকবে।

—কি করে বুঝলে?

—কেন, তুমি চলে যাবে?

—ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হবে। ওরা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

ঘানিম উঠে বসে।—দুনিয়াতে এমন কোনও শক্তি নাই আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

—আহা, কি আমার বীর পুরুষ গো! একটা মেয়ের সামনে মুখ তুলে তাকাতে পারে না, তা আবার বড়াই।—চলো, অনেক রাত হলো। এবার খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া যাক। শুয়ে শুয়ে আজ আমার সব কাহিনী বলবো। তখন জানবে আমার পরিচয়।

খানাপিনা সেরে দু'জনে দু'জনকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। ঘানিম বলে, কই, বলবে বলেছিলে? বলো তোমার কাহিনী?

মেয়েটি বলতে থাকে ঃ খলিফা হারুন-অল-রসিদের আমি খুব পেয়ারের বাঁদী। তিনি আমাকে সোহাগ করে কুৎ-অল-কুলুব বলে ডাকেন। খুব ছোট থেকে খলিফার প্রাসাদে আমি মানুষ হয়েছি। খলিফার যত বাঁদী রক্ষিতা আছে আমি তাদের সকলের সেরা। আমাকে খুশি রাখার জন্যে খলিফার চেষ্টার অন্ত নাই। আমার জন্যে গোটা একটা মহল তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। সুন্দর সুন্দর বারোটা দাসী আমার পরিচর্যায় দিন রাত ব্যস্ত থাকে। হীরে জহরৎ আর দামী দামী সাজপোশাকে সাজিয়ে তিনি আমাকে পটের বিবি বানিয়ে রেখেছিলেন। প্রায় প্রতি রাতেই তিনি আমার ঘরে আসতেন। তাঁর খাস বেগম জুবেদার এটা সহ্য হতো না। হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতো। অনেক দিন থেকে আমাকে দুনিয়া থেকে সরাবার তাকে খুঁজছিলো সে। কাল রাতে সেই মউকা মিলে গেছে। খলিফা আজ দু'দিন হলো বাইরে গেছেন। একটা সুবায় তার প্রজারা নাকি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

আমার বারোজন দাসীর মধ্যে দু-একজন জুবেদার প্রিয় পাত্রী ছিলো। মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তাদের হাত করেছিলো। কাল রাতে শোবার আগে অভ্যাস মতো এক গেলাস সরবৎ খেয়েছিলাম। একটু পরেই আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগলো। দাসীটাকে বলেছিলাম, এমন কেন হলো?

সে আমাকে বোঝালো, ও কিছু নয়, ঘুমিয়ে পড়ো মালকিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার মনে কেমন সন্দেহ ঘনিয়ে এলো। নিজেকে শক্ত করে বসে রইলাম। কিন্তু ওষুধের ক্রিয়া এড়াবো কি করে? মাথাটা ঢলে পড়তে থাকে। জোর করে নিজেকে সোজা রাখার চেষ্টা করি। একটু পরে ঐ দাসীটা এসে আমার মুখটা তুলে ধরে বললো, কই চলুন মালকিন, শোবেন চলুন।

আমি আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পালঙ্কে শুয়ে পড়লাম। কেমন একটা বিশ্রী গন্ধে সারা শরীর গুলিয়ে যেতে লাগলো। তখনও আমার চৈতন্য লুপ্ত হয়নি। সবই শুনতে পাচ্ছি। সবই বুঝতে পারছি। অথচ হাত-পা নাড়তে পারছি না। কোনও কথা বলতে পারছি না। মনে হতে লাগলো, আমি মরে যাচ্ছি।

শুনতে পেলাম, জুবেদা আমার ঘরে এসে ঐ দাসীটাকে বলছে, সবাব, কাফুর আর বুখাইৎকে বলে রেখেছি। ওদের কাঠের বাক্সটা নিয়ে এখানে আসতে বলো।

বুঝতে পারলাম, একটু পরে ঐ তিন খোজা আমাকে ধরাধরি করে একটা বাক্সের মধ্যে শুইয়ে দিলো। জুবেদা বললো, যা নিয়ে যা। আমাদের গোরস্থানে কবর দিয়ে রাত থাকতে থাকতে ফিরে আসবি।

আমি সবই শুনতে পেলাম, সবই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে কথা বলতে পারলাম না। পারিনি, একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। জুবেদা যদি বুঝতে পারতো ওষুধে কাজ হয়নি, হয়তো আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতো।

এর পরের ঘটনা তো তোমার সবই জানা। আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা না হলে, তুমি এক বিদেশী, নিশি রাতে মানুষের অগম্য ওই গোরস্থানেই বা যাবে কেন? আর আমাকেই বা উদ্ধার করবে কেন?

এখন আমি ভাবছি, খলিফা লড়াই থেকে ফিরে এসে যখন দেখবেন আমি নাই, তখন কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে!

কুৎ-অল-কুলুবের কাহিনী শুনে ঘানিম ঘামতে থাকে। সর্বনাশ! এ কাকে নিয়ে এসে সে ঘরে তুলেছে? ধর্মাবতার খলিফার রক্ষিতা! তাকে ছোঁয়াও তো মহাপাপ! ঘরের এক প্রান্তে গিয়ে একটা টুলের উপর বসে থাকে। কুৎ-অল-কুলুব বুঝতে পারে না। ডাকে, তুমি দূরে সরে গেলে কেন, সোনা?

—না না, সে হয় না। তুমি খলিফার বাঁদী। তোমার দিকে হাত বাড়ালে সে হাত আমার পঙ্গু হয়ে যাবে। খলিফা সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর।

কুৎ-অল-কুলুব উঠে এসে ঘানিমের হাত ধরে। দূর বোকা ছেলে, ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তো আছি। চলো, শোবে চলো।

ঘানিম কিন্তু সত্যিই শঙ্কিত হয়েছে। বাদশাহর রোষানলে দগ্ধ হতে পারে সে। সামান্য এক সওদাগর হয়ে সে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছে। কুৎ-অল-কুলুবের ডাকে আর সাড়া দিতে পারে না ঘানিম। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নেশা কেটে যায়। খলিফার প্রিয় পাত্রীকে সে তার অঙ্কশায়িনী করতে চেয়েছিলো।

—না, না, তুমি পালঙ্কে শুয়ে পড়ো। আমি নিচে শোবো।

—তাই হয় নাকি। চলো, এক সাথে শোবো।

কিন্তু ঘানিম রাজী হতে পারে না। সারারাত একরকম বসেই কেটে যায়।

ভোর না হতেই ঘানিম বাজারে বেরিয়ে গেলো। কুৎ-অল-কুলুব তখনও নিদ্রামগ্ন। বাজার গিয়ে নানারকম দামী দামী খাবারদাবার কিনলো। সুলতান বাদশাহরা যে সব দুষ্প্রাপ্য সরাব খায় তারই একটা কিনলো কুৎ-অল-কুলুবের জন্য। তার ঘরে আজ মহামান্য অতিথি—তার মনোরঞ্জনের জন্য দামী আতর, বাহারী ফুল, সুগন্ধী আগরবাতি প্রভৃতি নানা শৌখিন জিনিসপত্র কিনে যখন বাসায় ফিরলো, বেশ বেলা হয়ে গেছে। কুৎ-অল ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। ঘানিমকে দেখে ছুটে এলো, কখন তুমি কোথায় গেলে, আমি ভেবে আকুল, এতে দেরি হলো কেন?

—এই একটু বাজারে গিয়েছিলাম।

কুলির মাথা থেকে সামানপত্র নামাতে নামাতে বলে, আমার ঘরে সুলতানের খাস বাঁদী—এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়? আদর যত্নের ত্রুটি হলে যে গর্দান যাবে।

কুৎ-অল রাগ করে।—তুমি আমাকে এত পর পর ভাবো?

ঘানিম টেবিলে নাস্তা সাজাতে থাকে। কুৎ-অল সামনে এসে রুখে দাঁড়ায়।—ওসব রাখো বলছি, আগে আমার কাছে এসো। না হলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেব বলছি। আমি কি তোমার এখানে খানাপিনা করতে এসেছি? যে কটা দিন থাকবো, আমি আর তুমি এক হয়ে থাকবো। কোথাও যেতে পারবে না।

ঘানিমকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিতে চায়। কিন্তু ঘানিম উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি তোমার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস। তুমি খলিফার 'ভালোবাসা'। ওসব ভাবাও আমার পাপ।

—কি বললে? দাসানুদাস? আজ্ঞাবহ। তা হলে আমি আদেশই করছি—আমার বুকে এসো।

ঘানিম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।—দেখো, ঘানিম, আমি খলিফার খাস বাঁদী—আমার হুকুম, কাছে এসো। তা না হলে তোমার গর্দান যাবে।

—গর্দান তো বাড়িয়েই আছি। ইচ্ছে হয় নিতে পারো। কিন্তু ওকথা বলো না। আমি পারবো না।

কুৎ-অল উঠে এসে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, ঘানিমের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দেয়। রক্ত ঝরে পড়ে।—ওগো সাধু মহাপুরুষ, এবার তোমার খোলসটা ছাড়ো। আমি যে আর সইতে পারছি না। সিংহের মতো একবার ঝাঁপিয়ে পড়ো, সোনা।

ঘানিম বলে, প্রভুভক্ত কুকুর কখনও সিংহ হতে পারে না, কুৎ-অল। আমাকে ক্ষমা করো।

আমার কথা না শুনলে তো তোমার ক্ষমা নাই, ঘানিম। আমাকে চটিও না, বলছি। তোমার ভালো হবে না।

ঘরের এক প্রান্তে গিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে ঘানিম। কুৎ-অল এগিয়ে আসে। মাথায় হাত বুলায়।—রাগ করলে? ঠিক আছে, চলো, নাস্তা সেরে নিই।

ঘানিমের হাত ধরে দু'জনে টেবিলে এসে বসে। আর একটাও কথা হয় না। নীরবে আহার পর্ব শেষ হয়। ঘানিম কেমন মনমরা হয়ে যায়। বাঁশীতে করুণ সুর বাজাতে থাকে। কুৎ-অল অবাক হয়। এমন বেহাগের সুর অনেককাল সে শোনেনি। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে। আস্তে আস্তে উঠে এসে ঘানিমের কাঁধে হাত রাখে।—কোথায় শিখেছো?

—আমার বাবা খুব গুণী লোক ছিলেন। দামাসকাস শহরে গাইয়ে বাজিয়ে মহলে তাঁর বেশ নাম ছিলো। সেই সুবাদে অনেক নামজাদা ওস্তাদের আনাগোনা ছিলো আমাদের বাসায়। যা কিছু শিখেছি, তাদের কল্যাণেই।

গান বাজনার মধ্য দিয়ে সারা দিন কেটে যায়। রাতের আহার শেষ করে ঘানিম নিজের জন্য নিচে আলাদা বিছানা করে নেয়। এবার কুৎ-অল চিৎকার করে ওঠে, তোমার এই ফালতু গোঁড়ামী রাখো তো। যতক্ষণ তোমার ঘরে আছি, আমি তোমার। তুমিও আমার। এর মধ্যে খলিফার কথা মনে রেখো না। এসো, আমার কাছে এসো। এক সাথে শোবো আমরা। আজকের রাত হবে, আমাদের মধুযামিনী।

ঘানিম রাজী হয় না।—না, তা হতে পারে না, কুৎ-অল।

কুৎ-অল মিনতি করে, তোমার দু'টো পায়ে পড়ি, ঘানিম আমার কথা শোনো। তোমাকে না পেলে আমি এক ফোঁটা ঘুমুতে পারবো না।

ঘানিম রাজী হয় না, সে হয় না, কুৎ-অল।

কুৎ-অল কেঁদে ফেলে, অমন করে 'না' করো না, সোনা। আমার দেহ-মন তোমাকে চাইছে। এসো, কাছে এসো। শুধু একটা চুমু। আর কিছু চাই না।

কুৎ-অল অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

এইভাবে একটা মাস কেটে যায়। খায় দায় আর বিরহ বেদনার গান গায়। কুৎ-অল-এর আসল পরিচয় জানার পর থেকে ঘানিম নিজেকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখে।

এদিকে খলিফার খাস বেগম জুবেদা খবর পায়, লড়াই শেষ করে খলিফা বাগদাদে ফিরে আসছেন। প্রাসাদের সবচেয়ে পুরনো এক বুড়ি দাসী ছিলো জুবেদার প্রিয় পাত্রী। কুমন্ত্রণা দিতে তার জুড়ি নাই। জুবেদা তাকে জিজ্ঞেস করে, খলিফা তো ফিরে আসছেন। এখন কি হবে?

—কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি তোমাকে ফিকির বাৎলে দিচ্ছি। ছুতোরকে দিয়ে একটা কাঠের পুতুল বানিয়ে নাও। আমাদের প্রাসাদে একজন ভালো কারিগর আছে। খুব সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাতে পারে। তাকে ডেকে তুমি বলে দাও, সে ঠিক কুৎ-অলের মতো দেখতে একটা

পুতুল বানিয়ে দেবে। প্রাসাদের চত্বরে একটা কবর খুঁড়ে পুতুলটাকে গোর দিয়ে রাখো। হ্যাঁ, একটা কথা, কুৎ-অল যে সব দামী দামী হীরে জহরৎ পরে থাকতো সেইভাবে সাজাতে হবে তাকে। খলিফার যদি সন্দেহ হয়, যদি বলেন, কবর খোলো, আমি তাকে দেখবো। সেই জন্যে পুতুলটাকে দামী দামী রত্নালঙ্কারে সাজাতে হবে। খলিফা যদি কবর খুলে দেখেনও, ঐ সব মূল্যবান অলঙ্কারাদি দেখে তার আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

জুবেদা বলে, আর যদি খলিফা বলেন, আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখবো, তখন?

—তখন তুমি বলবে, কুৎ-অল-এর মৃতদেহ বিবস্ত্র করে কবর দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে আছে, নিজের বিবি হলেও ন্যাংটো করা মেয়েছেলের মৃতদেহ কোনও পুরুষ স্পর্শ করতে পারে না।

—সাব্বাস্! তোমার কি বুদ্ধি!

জুবেদা সেই বুড়ি দাসীকে দামী দামী সাজপোশাক এবং স্বর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃত করলো। বুড়ির কথা মতো কাঠের তৈরি নকল কুৎ-অল-কুলুবকে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হলো।

এর দু'দিন পরে খলিফা ফিরে এলেন। প্রাসাদে ঢুকতে গিয়েই দেখলেন, প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে এক বিরাট সমাধি। প্রাসাদের কর্মচারী নফর চাকর খোজা দাসদাসী সকলের পরনেই কালো পোশাক। অন্দর মহলে গেলেন। খাস বেগম জুবেদাও শোকের পোশাকে সজ্জিতা। সারা প্রাসাদে থমথমে ভাব। কারো মুখে কথা নাই। কুৎ-অল-কুলুবের মহলে গেলেন। দাসী পরিচারিকারা অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলো। কুৎ-অল নাই। সারা মহল ধূপ আর আতরের গন্ধে ভরপুর। চারপাশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো মোমের বাতি গলছে। জুবেদা কাঁদতে কাঁদতে বলে, কুৎ-অল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

খলিফাকে সঙ্গে করে সমাধির পাশে নিয়ে গেলো জুবেদা।—আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কবর খুঁড়িয়ে বাদশাহী মর্যাদায় তাকে গোর দিয়েছি।

খলিফা কোনও কথা বলতে পারলেন না। কুৎ-অল-এর এই আকস্মিক মৃত্যু তাকে মুহ্যমান করে ফেলেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। তার উপর এই গভীর শোকসংবাদ। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শয্যা নিলেন।



সারা দিন সারা রাত মড়ার মতো পড়ে রইলেন। কারো সঙ্গে দেখা করলেন না। খানাপিনা কিছুই খেলেন না। শুধু ভাবতে লাগলেন, অমন সুন্দর সুস্থ কুৎ-অল হঠাৎ মারা গেলো কি করে। যতই ভাবেন, সন্দেহ ঘনীভূত হয়। সকালে উঠে জাফরকে ডেকে বললেন, কবর খোলার ব্যবস্থা করো, আমি একবার কুৎ-অলকে শেষবারের মতো দেখতে চাই।

জুবেদার বুক কেঁপে উঠলো। বুড়ি দাসী তাকে অভয় দেয়, কিচ্ছু ভেবো না, মা। নিজেকে শক্ত করো। খলিফার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। যা বলেছি, মনে থাকে যেন।

খলিফার নির্দেশে কবর উন্মুক্ত করা হলো। মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি দেখলেন, প্রায় স্বচ্ছ দামী কফিনে মোড়া কুৎ-অল-কুলুবের মৃতদেহ। দেখলেন তার সারা অঙ্গে সেই সব হীরে জহরতের অলঙ্কার। পলকে সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেলো। বললেন, ঠিক আছে, কবর ঠিক করে রাখো।

জাফরকে নির্দেশ দিলেন, সাত দিন সাত রাতব্যাপী কবরের সামনে কোরান পাঠ হবে। ব্যবস্থা করো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

একচল্লিশতম রজনী।

আবার কাহিনী শুরু হয়। শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

খলিফার ইচ্ছানুসারে কুৎ-অল-কুলুবের নকল সমাধির পাশে সাত দিন সাত রাতব্যাপী কোরান পাঠ হতে থাকলো। সব কাজকাম মুলতুবি রেখে খলিফা দরবার কক্ষের একখানা সাধারণ চৌকির ওপর মাদুর বিছিয়ে শুয়ে রইলেন। জাফরকে বলে রাখলেন, কেউ যেনো তাকে বিরক্ত না করে।

খলিফার মাথা ও পায়ের কাছে বসে দুই পরিচারিকা পরিচর্যা করতে থাকে। পানাহার পরিত্যাগ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকেন খলিফা। কোরানের পবিত্র বাণী শুনতে শুনতে পার্থিব সুখ দুঃখের অনেক উপরে অন্য এক জগতে বিচরণ করতে থাকেন।

হঠাৎ তার কানে আসে, দুই পরিচারিকার একজন বলছে,

ছিঃ ছিঃ কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড ভাই শুভিয়া।

শুভিয়া অবাক হয়, কেন, কেলেঙ্কারী কিসের ভাই নুজা?

—আমাদের খলিফা একটা মিথ্যে কবরের সামনে কোরান পাঠের আসর বসিয়েছেন। আসলে ওটা কুৎ-অল-এর কবর না ছাই।

—তবে? কুৎ-অল গেলো কোথায়?

—তাকে তো বেগম সাহেবা জুবেদা ঔষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে মারার ফন্দী করেছিলেন। সবাব, কাফুর আর বুখাইৎ এই তিনটি খোজা জুবেদা বেগমের খুব পেয়ারের। কুৎ-অলকে অজ্ঞান করে, একটা কাঠের বাক্সে পুরে ঐ তিন খোজাকে দিয়ে সুলতানের খাস কবরখানায় পুঁতে রেখে এসেছিলো। শুভিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তাহলে প্রাসাদের চত্বরে এই কবরখানা কার?

—নকল কুৎ-অল-এর। একটা কাঠের পুতুলকে সাজিয়ে-গুজিয়ে শুইয়ে রেখেছে জুবেদা বেগম।

—তা হলে কুৎ-অলকে জ্যান্ত কবর দিয়ে মেরে ফেলেছে?

—আল্লাহ যাকে রাখেন, তাকে কেউ মারতে পারে? শুনেছি, কুৎ-অল বেঁচেই আছে।

—কোথায়?

—এই বাগদাদ শহরেই এক নওজোয়ান সওদাগরের ঘরে। তার নাম নাকি ঘানিম ইবন আয়ুব।

—তোমাকে এসব কথা কে বললো ভাই, নুজা?

ওই যে বুড়ি দাসীটা। জুবেদা বেগমের পেয়ারের দাসী গো। ওই বুড়িটাই বলছিলো আমাকে। তা ভাই অনেক দিব্যি করিয়ে নিয়েছে। তুমি যেন আমার বলো না কাউকে। বড় ঘরের বড় বড় ব্যাপার। ওসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কি দরকার?

খলিফা লাফিয়ে উঠে বসলেন। দরবার কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, জাফর?

কোরবানীর খাসির মতো জাফর এসে দাঁড়ালো।—ফৌজদারকো বোলাও। এক্ষুণি যত লোক-লস্কর দরকার নিয়ে বেরিয়ে পড়। কে এক ঘানিম ইবন আয়ুব আছে এই শহরে, তাকে ধরে নিয়ে এসো। যেমন করে পারো।

সঙ্গে সঙ্গে জাফর সব কোতোয়ালদের ডেকে পাঠালো। বললো, তোমাদের নিজের নিজের এলাকায় সন্ধান করে দেখো, ঘানিম ইবন আয়ুব নামে এক ছোকরা সওদাগর এই শহরেই কোথাও বাসা ভাড়া করে আছে। গোপনে তার বাসার ঠিকানা সংগ্রহ করে এক্ষুণি আমাকে জানাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘানিমের ঠিকানা সংগ্রহ হলো। আর তিল মাত্র দেরি না করে জাফর-অল-বারমাকী চল্লিশজনের এক ফৌজী বাহিনী নিয়ে ঘানিমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

তখন টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে ঘানিম আর কুৎ-অল সবে আহারে বসেছে। হঠাৎ চারদিক জনরবে মুখর হয়ে উঠলো। কুৎ-অল কান খাড়া করে শুনলো অশ্বক্ষুরধ্বনি। খট খট খটাখট!—ঘানিম! সর্বনাশ হয়েছে। খলিফার সৈন্য বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তুমি পালাও। পালাও।

—কিন্তু তুমি?

—আমার জন্যে কোনও চিন্তা করো না, ঘানিম। যেমন করো পারো, পালাও। তোমাকে ধরতে পারলে আর আস্ত রাখবে না।

ঘানিম কি করবে কিছুই ভাবতে পারে না। বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—কিন্তু পালাবো কি করে? ফৌজ তো বাড়ি ঘেরাও করে ফেলছে।

ক্ষিপ্র হাতে কুৎ-অল টেবিল-মোছা ন্যাকড়াটা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ঘানিমের মাথায় ফেটি বেঁধে দেয়। রসুইখানা থেকে এঁটোকাটার বালতী আর নর্দমা পরিষ্কার করার একটা ঝাড়ু নিয়ে আসে। বলে, শিগ্গির জামা পাতলুন খুলে ফেলো। শুধু ইজেরটা থাক। এই নাও এঁটোকাটার বালতি—মাথায় তোল। আর হাতে ধরো এই ঝাড়ুখানা। যাও গম্ভীর-সে বেরিয়ে হন হন করে কেটে উধাও হয়ে পালাও। ওরা কেউ সন্দেহ করবে না। ভাববে, মেথর। নোংরা পরিষ্কার করতে এসেছিলো। আমার কথা বিলকুল তুমি ভেবো না। আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না ওরা। খলিফার সামনে হাজির হতে পারলে আমার কোনও ভয় নাই। তাকে বশ করার যাদু আমার জানা আছে।

জাফর ঘরে ঢুকে দেখে, কুৎ-অল পালঙ্কে বসে আছে একা। তার সারা দেহ হীরে জহরতের অলঙ্কারে মোড়া। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো জাফর।



কুৎ-অল বলে, নিয়তিই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এখন আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চান, আমি প্রস্তুত।

জাফর বলে, আমার ওপরে হুকুম হয়েছে, ঘানিব-ইবন আয়ুব নামের এক ছোকরা সওদাগরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে হবে। আপনি কি বলতে পারেন, মালকিন, সে কোথায়?

কুৎ-অল বলে, সে তো দিন কয়েক আগে তার দেশের বাড়ি দামাসকাসে চলে গেছে! এর বেশী কিছু আর আমি বলতে পারবো না।

জাফর বিনীতভাবে বলে, আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে চলেন—

নিশ্চয়ই যাবো। যাওয়ার জন্যেই তো আমি তৈরি হয়ে বসে আছি। চলুন।

প্রাসাদে ফিরে এসে জাফর জানায়, ঘানিম কয়েকদিন আগে বাগদাদ ছেড়ে দামাসকাসে ফিরে গেছে। সেখানেই তার দেশ। নিজের বলতে তার মা আর এক বোন আছে।

খলিফা গম্ভীর হলেন। হুম, পালিয়েছে। তা পালিয়ে কোথায় সে যাবে। ধরা তাকে দিতেই হবে।

কুৎ-অল-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘানিমের বয়স কত?

কুৎ-অল বলে, তা মনে হয় চব্বিশ পঁচিশ হবে।

—তা হলে তো ভালোই জমেছিলো, কি বলো?

কুৎ-অল বলে, সে কোনও খারাপ কাজ করেনি।

—চোপ রহ, বেশরম—একটা জোয়ান ছেলের সাথে এক সঙ্গে এতদিন কাটালে, আর কিছু খারাপ কাজ করোনি? এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে—আগুনে ঘি পড়লে জ্বলবে না? মাসরুর! অন্ধকার ঘরে কয়েদ করে রাখো।

—জো হুকুম, জাঁহাপনা।

খলিফা এবার ঘানিমের অনুসন্ধানে মেতে উঠলেন। এক দল অশ্বারোহী ফৌজ পাঠিয়ে দিলেন দামাসকাস শহরে। নিজে হাতে একখানা খৎ লিখে দিলেন।

দামাসকাসের ভারপ্রাপ্ত সুলতান ইবন সুলেমান অল-জেনির প্রতি আব্বাসের পঞ্চম বংশধর খলিফা হারুন-অল-রসিদ-এর হুকুমনামা।

॥ এলাহী ভরসা ॥

আশা করি তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল। মেহেরবান আল্লাহর দোয়ায় সুখে থাকো।

অতঃপর লিখি ঃ

প্রিয় বৎস, তোমার শহরে ঘানিম ইবন আয়ুব নামে এক তরুণ সওদাগর বাস করে। সম্প্রতি সে বাগদাদে এসেছিলো। আমার এক বাঁদীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হওয়া সম্ভব তাই ঘটেছে। কয়েকদিন আগে সে এখান থেকে পালিয়ে আবার দামাসকাসে ফিরে গেছে। আমার বিশ্বাস এখন সে তার মা ও বোনের কাছেই আছে। আমার এই পত্র পাওয়ামাত্র তাকে গ্রেপ্তার করে পাঁচশো ঘা বেত লাগাবে। উটের পিঠে চাপিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করাবে। এবং ঘোষণা করে দেবে, খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অপরাধে এই সাজা তাকে দেওয়া হচ্ছে। এর পর বদমাইশটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর আমি ওর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করবো।

ওর বাড়ি-ঘরদোর ভেঙে চুরে ধূলিসাৎ করে দেবে। ওর মা আর বোনকে উলঙ্গ করে, চৌমাথার মোড়ে তিন দিন তিন রাত্রি দাঁড় করিয়ে রাখবে। তারপর তোমার শহর থেকে বহিষ্কার করে দেবে।

আমার এই হুকুম যথাযথ পালন করবে। খোদা হাফেজ।

তীর বেগে ছুটে চললো অশ্ববাহিনী। বিশ দিনের পথ মাত্র আট দিনে পৌঁছে গেলো। সুলতান মহম্মদ খলিফার চিঠিখানা হাতে নিয়ে সাতবার কপালে ছুঁইয়ে শ্রদ্ধা জানায়। তারপর খুলে পড়ে।

ক্ষণমাত্র দেরি না করে লোক লস্কর সঙ্গে নিয়ে ঘানিমের বাড়ি চড়াও হলো সুলতান। দরজায় কড়া নাড়তেই ফিৎনা দরজা খুলে দেয়। তখন তার মা প্রার্থনায় বসেছিলো। ঘানিম আজ এক বছরের ওপর বাড়ি থেকে চলে গেছে। কিছুদিন আগে বাগদাদ থেকে এক দল সওদাগর ফিরে এসে খবর দিয়েছে ঘানিম নাকি মারা গেছে। সেই থেকে ঘানিমের মা শোকে দুঃখে মুহ্যমান। উঠনের ঠিক মাঝখানে পুত্রের স্মৃতির উদ্দেশে একটা তাজিয়া বানিয়েছে। সারা দিন রাত সেই তাজিয়ার সামনে বসে ছেলের শোকে সে আকুল হয়ে কাঁদে, আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙে।

—ঘানিম কোথায়?

ফিৎনা বলে, সে আজ এক সালের উপর হলো বাগদাদে গেছে। তারপর আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। লোকে বলছে, মারা গেছে।

পুত্রহারা মা-এর অন্তর-ব্যথা অনুভব করে সুলতান। কিন্তু কোনও উপায় নাই। খলিফার হুকুম। অক্ষরে অক্ষরে তামিল করাই তার একমাত্র কর্তব্য। তার ইশারায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘানিমের বাড়ি-ঘর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিলো। মা আর বোনকে উলঙ্গ করে সদর রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো। তিন দিন তিন রাত্রি। তারপর শহর থেকে তাড়িয়ে বের করে দিলো।

এবার ঘানিমের কাহিনী শুনুন জাঁহাপনা। বাগদাদ শহর ছেড়ে বন জঙ্গল ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে ঘানিম। খাওয়া নাই নাওয়া নাই অবিশ্রান্ত একটানা পথ চলে চলে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। উসকুখুস্‌কু চুল, খালি পা, পরণে শুধু একটা ইজের মাত্র। পথে যারা দেখলো, ভাবলো পাগল। এইভাবে এক গ্রামের মসজিদে ঢুকে লুটিয়ে পড়লো। নামাজ পড়তে এসে মৃত-প্রায় যুবককে দেখে গ্রামবাসীদের দয়া হয়। কেউ বললো, ছেলেটার বোধহয় অসুখ করেছে। কেউ বলে, না না, না-খেতে পেয়ে ঐ অবস্থা হয়েছে। একজন দু'খানা রুটি আর মধু এনে খাওয়ালো। শরীর ঠকঠক করে কাঁপছিলো। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। একজন একটা ছেঁড়া জামা এনে পরালো। একটু সুস্থ বোধ করলে গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গো বাছা, কোথা থেকে আসছো?

ঘানিম কোনও জবাব দিলো না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো। সবাই ভাবলো, জ্বরে বেহুঁশ হয়ে গেছে। তখনকার মতো আর কোন প্রশ্ন না করে যে যার কাজে চলে গেলো।

এইভাবে ঐ মসজিদের বারান্দায় একটা মাস কেটে গেলো। গ্রামবাসীরা অনুগ্রহ করে কিছু খাবার দিয়ে যায়। তাই খেয়ে মসজিদের খোলা বারান্দায় পড়ে থাকে। দিনে মাছি আর রাতে মশার কামড়। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো। এদিকে জ্বরও ছাড়ে না। অবশেষে গ্রামের মাতব্বররা ঠিক করলো, এইভাবে এখানে পড়ে থাকলে ছেলেটা মারা যাবে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসা দরকার।

একদল উট যাচ্ছিলো বাগদাদ শহরে। গ্রামবাসীদের অনুরোধে উটের মালিক রাজী হলো। বললো, ঠিক আছে, আমরা ওকে বাগদাদের সদর হাসপাতালের ফটকে নামিয়ে দেব।

গ্রামবাসীরা ঘানিমকে উটের পিঠে ভালো করে বেঁধে দিলো। কিছু দূরে আসার পর উটের পিঠে বাঁধা ঘানিমকে দেখে বোরখা ঢাকা দু'টি পথচারী মেয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আচ্ছা মা, দেখো তো, উটের পিঠে ঐ ছেলেটা—যদিও খুব গরীব সরীব, কিন্তু আমার ভাইজান ঘানিমের মতো দেখতে না?

মা বললো, কি জানি বাপু, কেঁদে কেঁদে চোখ আমার অন্ধ হয়ে গেছে। অত দূরে কি আর নজর যায়! তোর ওসব মনের ভুল ফিৎনা। ঘানিম কি আমার বেঁচে আছে?

দামাসকাসের সুলতান ওদের দু'জনকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দিলে ওরা বাগদাদের পথ ধরে চলতে থাকে। মনে ক্ষীণ আশা, চলতে চলতে একদিন তারা বাগদাদে পৌঁছবে। ঘানিমকে খুঁজে পাবে আবার।

সারা রাত পথ চলার পর ভোরবেলা উটের দল শহরে পৌঁছয়। মালিক দেখলো, এখনও হাসপাতালের দরজা খোলেনি। ঘানিমকে দরজার পাশে বসিয়ে দিয়ে চলে গেলো। ঘানিমের তখনও চৈতন্য নাই। কোথায় সে ছিলো, এখনই বা কোথায় এসেছে কিছুই বুঝতে পারে না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে মরার মতো পড়ে থাকে।

রাত্রির আঁধার কেটে গেলো। সবে রাস্তাঘাটে লোকজন বেরুতে শুরু করেছে। পথচারীদের মধ্যে কেউ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকটার চেহারার সঙ্গে ঘানিমের কেমন মিল খুঁজে পায়? আবার ভাবে, দূর তা কি করে হবে? ঘানিম এখানে আসবে কি করে? একটু পরে বাজারের এক নামজাদা দোকানের মালিক ওকে দেখতে পায়। তার কিন্তু কোনও সংশয় হয় না। কতদিন তার দোকানে গেছে সে। কত আলাপ পরিচয়। কত সওদা করেছে। সে ভাবে, হায় আল্লাহ, ওকে যদি হাসপাতালে ভর্তিও করা হয় রোগের হাত থেকে বাঁচলেও খলিফার রোষ থেকে রেহাই পাবে না। মৃত্যু তার অনিবার্য। ওকে বাঁচাতে হবে। যেভাবেই হোক বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। জেনে শুনে ওকে এইভাবে ফেলে রেখে গেলে আল্লাহর দরবারে সে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে পারবে না। তার নিজের কাঁধে ঘানিমের দেহভার নিয়ে কোনরকমে আস্তে আস্তে

বাড়িতে নিয়ে এলো দোকানী। বিবিকে ডেকে বললে, আজ থেকে এই মেহেমান আমাদের বাড়িতে থাকবে। খুব অসুস্থ। একে সুস্থ সবল করে তোলার দায়িত্ব তোমার।

দোকানী মালিক গরম জল করে ঘানিমের সারা শরীর মুছিয়ে দিলো। নতুন জামা কাপড় এনে পরালো। এক গেলাস দুধ এনে খাওয়ালো। এবার ঘানিম একটু সুস্থ বোধ করে। মনে হয় জ্বরের তোড়টা খানিক কমেছে। ধীরে ধীরে তার সব মনে পড়তে থাকে। বাগদাদ শহর। তার ব্যবসা। তার মা বোন ফিৎনা। তার কুৎ-অল-কুলুব—তার ভালোবাসা।

এই সময়ে রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

বিয়াল্লিশতম রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার গল্প শুরু হয়।

এক গেলাস গরম দুধ খাওয়ার পর ঘানিম কিছুটা সুস্থ বোধ করে। একে একে আবার সব মনে পড়তে থাকে। তার মা বোন। তার ভালোবাসা—কুৎ-অল-কুলুব।

এদিকে কুৎ-অল-কুলুবকে অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রেখেছেন খলিফা। দ্বারে প্রহরারত সেই বৃদ্ধা বুড়ি দাসী। প্রায় একটা মাস কেটে গেছে। খলিফা নানা কাজের ঝামেলায় এসব ঘটনা একেবারেই ভুলে গেছেন। একদিন প্রাসাদে ঢুকছেন, এমন সময় করুণ কান্না ভেসে এলো তার কানে। খলিফার তখন স্মরণ হয়, প্রায় এক মাস আগে কুৎ-অলকে তিনি অন্ধকার ঘরে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। একেবারে ভুলে গেছেন। কেউ মনেও করিয়ে দেয়নি। ধীর পায়ে দরজার পাশে দাঁড়ান। কুৎ-অল-কাঁদছে, ঘানিম, তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে কেন ঘানিম। না হয় আমি সুলতানের কবরখানায় মাটি চাপা পড়েই মরে থাকতাম। এ জীবনে আজ বেঁচে থেকেই বা কি ফয়দা পেলাম। তুমি আমার সঙ্গে সহবাস করোনি সে কথা তো খলিফা বিশ্বাস করলেন না। তবে কেন তুমি নিজেকে অত সংযত করে রাখলে? আলাদা শয্যায় রাত কাটালে। জানি না তুমি বেঁচে আছো কিনা, বেঁচে থাকলেও তোমার রেহাই নাই। খলিফার চর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই থাকো একদিন না একদিন তোমাকে ধরে শূলে চড়াবেনই। তুমি তার মেয়েছেলের ইজ্জৎ রাখার জন্যে নিজেকে বঞ্চিত করে কি যে দারুণ সংযম দেখালে! আমি মেয়েমানুষ, আর কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক আমি বুঝি ঐভাবে অতগুলো নিঃসঙ্গ রাত্রি তোমার কি দুঃসহ যন্ত্রণায় কেটেছে। কিন্তু কি তার ইনাম পেলে ঘানিম? প্রাণদণ্ডের হুলিয়া! আর তোমার মা বোনের বে-ইজ্জৎ? এই তোমার পুরস্কার? তুমি দুঃখ করো না ঘানিম, তোমার সঙ্গে আর আমার কোনওদিন দেখা হবে না। তবে দেখা হবে আর একবার আল্লাহর দরবারে। শেষ বিচারের দিন। সেদিন তুমি এর যোগ্য পুরস্কার পাবে।

এই প্রথম খলিফা উপলব্ধি করলেন, ঘানিম নির্দোষ। নিজের ঘরে ফিরে এলেন। হুকুম করলেন, কুৎ-অলকে নিয়ে এসো।

রোরুদ্যমানা কুৎ-অল এসে দাঁড়ালে খলিফা অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, আমাকে মার্জনা করো সুন্দরী, অনেক মিথ্যা সন্দেহ করে তোমাকে বহুৎ কষ্ট দিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহর দরবারে একটা বড় গুনাহ করে ফেলেছি। কুৎ-অল, তুমি তখন কেঁদে কেঁদে কি সব বলছিলে? যে আমার মেয়েছেলের ইজ্জত রক্ষা করেছে আমি তার ঘরের মা-বোনের ইজ্জৎ নষ্ট করেছি? কে সে?

—ধর্মাবতার সে সে-ই ঘানিম। এক মাসের ওপর আমার সঙ্গে সে এক ঘরে রাত কাটিয়েছে। শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষ। আমার মতো রূপসী মেয়ের পাশে পাশে থেকে নিজেকে ঠিক রাখা কতটা শক্ত আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন হুজুর। কিন্তু একদিনের তরেও তার পদস্খলন হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি আমিই তাকে প্রলুব্ধ করেছি নানাভাবে। কিন্তু

যখনই সে শুনেছে আমি আপনার ভোগ্যা, তারপর থেকে অসাধারণ সংযমে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সে। আপনার প্রতি এই অসীম শ্রদ্ধার সে উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছে। তার মা বোনের ইজ্জৎ আপনি ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছেন। তাদের মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু আপনি রাখেননি।

খলিফা কোনও জবাব দিতে পারেন না। মাথা নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢাকেন।—সত্যি, কুৎ-অল বড় মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। সব ক্ষতি অর্থ দিয়ে পূরণ করা যায়। কিন্তু ইজ্জৎ একবার খোয়া গেলে তার ক্ষতিপূরণ আর কিছুতেই হয় না। তবু বলো, কুৎ-অল, যতটুকু পারি আমি করবো। তোমরা যা চাও তাই আমি দেব।

আমার নিজের জন্যে কিছুই চাইবার নাই, জাঁহাপনা। শুধু আর্জি, ঘানিম নির্দোষ। ওকে কোনও সাজা দেবেন না।

—কিন্তু সাজা দেব কাকে? সারা দামাসকাসে সারা বাগদাদ-এ তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। আমি দেখছি, তাকে যদি খুঁজে পাই, যদিও তুমি আমার বড় আদরের বাঁদী, তার হাতেই তোমাকে তুলে দেব।

—জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন আমি তাকে একবার খুঁজে দেখতে পারি।

—আমার কোনও অমত নাই কুৎ-অল। আজ থেকে ঘানিম তোমার। তাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায় আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের শাদী দিয়ে দেব।

খুশিতে কুৎ-অল-এর মন নেচে ওঠে। সঙ্গে হাজার খানেক দিনার নিয়ে ঘানিমের সন্ধানে বাগদাদের পথে বেরিয়ে পড়ে। প্রথম দিন সারা শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত জনে জনে জিজ্ঞেস করেও কোন সন্ধান পেলো না। পরের দিন সে বাজারের বড় বড় দোকানে ঢুকে খোঁজ করলো। এই সব দোকানে সে তার সওদা বিক্রি করতো। কিন্তু তারাও কেউ কিছু বলতে পারলো না। পরদিন সে গেলো জহুরীদের দোকানে। জনে জনে জিজ্ঞেস করতে করতে এক বৃদ্ধ জহুরী বললো, মা, কয়েকদিন আগে এক বিদেশীকে আমি অসুস্থ অবস্থায় সদর হাসপাতালের ফটক থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। এখন সে আমার বাড়িতে আছে। তবে খুব দুর্বল। খুলে কিছুই বলতে চায় না, তবে মনে হয় কোনও ভালোবাসার ব্যাপারে ঘা খেয়েছে। পয়সাকড়ি সব খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তবে দেখে মনে হয় খানদানী ঘরেরই ছেলে।

কুৎ-অল অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে, দেখুন, আপনার তো এখন কাজের সময়। দোকানপাট ফেলে যেতে পারবেন না। তা যদি আমার সঙ্গে কাউকে দেন—আপনার বাড়িটা সে চিনিয়ে দিত—

শেখসাহেব একটি ছোট্ট বাচ্চাকে সঙ্গে দিলো। ছেলেটি তার বাড়ি চেনে। কুৎ-অলকে সে পৌঁছে দিলো তার বাড়ি। দরজায় কড়া নাড়তেই শেখসাহেবের বিবি দরজা খুলে দেয়। কুৎ-অল-কুলুবকে দেখে চিনতে পারে। মাটি ছুঁয়ে সালাম জানায়। কুৎ-অল তাকে দু'হাত বাড়িয়ে তুলে ধরে।—মা, শুনলাম আপনার ঘরে এক অসুস্থ বিদেশীকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি তাকে একবার দেখতে চাই।

—কিন্তু তাকে দেখেই বা কি করবে মা। জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। সাধ্য মতো চিকিৎসাপত্র করাচ্ছি। কিন্তু জ্বর ছাড়ে না। চেহারা একেবারে কঙ্কালসাড় হয়ে গেছে।

—তা হোক। তবু আমাকে একবার নিয়ে চলুন, আমি দেখবো।

শেখ-এর বিবি কুৎ-অলকে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। একটা পালঙ্কে শুয়েছিলো ঘানিম। জ্বরে বেহুঁশ। প্রথম দর্শনে কুৎ-অল-এর সন্দেহ হয়। না না, এ কেমন করে হবে ঘানিম। ঘানিমের কি সুন্দর স্বাস্থ্য রূপ জৌলুস দেখেছে সে। তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? যাই হোক, শেখের বিবিকে বলে, ওর যেন কোন অযত্ন না হয় মা। এই নিন রাখুন এই টাকাটা। শহরের

সবচেয়ে বড় হেকিমকে ডেকে দেখান। যত দামী ওষুধ দরকার হয় দিন। বাজারের সেরা ফল দুধ ওকে খেতে দেবেন। আরও টাকা আমি দিয়ে যাবো।

কুৎ-অলের সঙ্গে ছিলো হাজার খানেক দিনার। সবটাই সে শেখ-স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে সেদিনের মতো প্রাসাদে ফিরে যায়। সারা রাত ঘানিমের মুখটা কল্পনা করে, আর কল্পনা করে সেই রুগ্ন হাড় জিরজিরে যুবকের মুখ। দু'জনের মুখ এক করে মেলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোথায় যেন খেই হারিয়ে যায়। এক করতে পারে না। এই একটা মাসের মধ্যে মানুষের চেহারা এত পাল্টে যেতে পারে?

পরদিন সকালে সে বাজারে যায়। সেই বৃদ্ধ জহুরীর সঙ্গে দেখা করে। উদ্দেশ্য ছেলেটি সম্পর্কে আরও যদি কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

শেখ বললো, মাজননী, গতকাল তুমি চলে যাওয়ার পর দু'টি গরীব ভিখিরি মেয়েছেলে এসেছিলো আমার দোকানে। দেখেই মনে হলো বিদেশী। নতুন এসেছে শহরে। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, শুধু ভিক্ষে করার জন্যে এই বিদেশে এসেছো? তা মা, জবাবে যা বললো, শুনে মনে হলো, তুমিও যাকে খুঁজছো তারাও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা?

—ঐ যে বললে না? ঘানিম-ইবন-আয়ুব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা কেন খুঁজে বেড়াচ্ছে? কোথায় তারা? কোথা থেকে এসেছে?

শেখ বলে, কেন খুঁজছে তা তো বলতে পারবো না, মা। তবে কোথায় আস্তানা গেড়েছে বলতে পারি। একটু এগুলেই তো ধরমশালা দেখতে পাবে, তারই দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা এসেছে দামাসকাস থেকে?

—দামাসকাস থেকে। তবে তো ওরা ঘানিমের মা আর বোন ফিৎনা।

শেখ বললো, তা হতে পারে। তুমি যদি চাও, ডেকে দিতে পারি।

—একবার ডেকে পাঠালে ভালোই হয়।

শেখ ডাকলো, এই ফুলফুল! ফুলফুল!

সেই ছোট্ট বাচ্চাটা এসে দাঁড়ালো, দেখতো ঐ মুসাফিরখানার দাওয়ায় দু'টি মেয়ে বসে আছে—ডেকে নিয়ে আয়।

বাচ্চাটা ছুটতে ছুটতে চলে গেলো। একটু পরে বোরখা ঢাকা দু'টি মেয়ে এসে দাঁড়ালো কুৎ-অল-এর সামনে।

তাদের পরিচয়পত্র জেনে বুঝলো, তার অনুমান ঠিকই। তারা দু'জনে ঘানিমের মা আর বোনই বটে।

জহুরীর হাতে দিনারের একটা থলে তুলে দিয়ে কুৎ-অল-কুলুব বললো, আমার অনুরোধ, এদের দু'জনকে আপনার বাড়ি নিয়ে এসে আদর যত্নে রাখুন। এই নিন এতে হাজার খানেক দিনার আছে। আরও যা লাগে সব খরচা আমি দেব। কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখবেন, যেন কোনও অযত্ন না হয়।

জহুরী বিগলিত হয়ে বলে, এ-তো আমার কাছে হুকুম। কিচ্ছু চিন্তা করো না, মা। ওরা আদরে থাকবে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন তেতাল্লিশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু করে শাহরাজাদ।

কুৎ-অল জহুরীর হাতে ধরে বললো, এই টাকা পয়সা রইলো। আপনি মেহেরবানী করে ওদের খাওয়া পরার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন।

পরদিন স্বচক্ষে দেখবার জন্য কুৎ-অল-কুলুব সোজা জহুরীর বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। শেখের বিবি তো তাকে মহা খাতির যত্ন করে অভ্যর্থনা করলো। তারপর ঘানিমের মা আর বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। ছিন্ন ময়লা বেশবাস পরিত্যাগ করে আজ তারা নতুন পোশাক পরেছে। গোসল করে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে। কুৎ-অল লক্ষ্য করলে, ফিৎনা দেখতে বেশ সুন্দরী। দীর্ঘ দিনের পথশ্রম, অনাহার অনিদ্রার ফলে ওর আসল চেহারা অনুমান করতে পারেনি। এই কটা দিনেই কেমন সুন্দর চেকনাই লাবণ্য ফুটে উঠেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তাদের সঙ্গে নানা কথা হলো। শেখ-গৃহিণী অবাক হয়। খলিফার পিয়ারী। অথচ এতটুকু অহংকার নাই। যাবার আগে কুৎ-অল জিজ্ঞেস করে, রুগী কেমন আছে?

—ঐ সেই একই রকম।

—কী খেতে দিচ্ছেন?

—হেকিম তো শক্ত কিছু খেতে দিচ্ছেন না। দুধ, মুরগীর ঝোল, আঙুরের, বেদানার রস—এই সব।

—আর ওষুধপত্র?

—সে তো লম্বা ফিরিস্তি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে হচ্ছে। হেকিম বলেছে দিন কয়েকের মধ্যে বাছা আমার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

—তা চলুন, একবার দেখে যাই।

কুৎ-অল ঘানিমের মা বোনকে সঙ্গে নিয়ে রুগীর ঘরে ঢোকে। ঘানিম চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। ঘরের এক পাশে বসে ওরা আবার নানা কথায় মশগুল হয়ে ওঠে। এক সময় ঘানিমের মা জিজ্ঞেস করে। কিছু মনে করো না মা, আমি তোমার মায়ের মতো, কালকেও তোমাকে দেখলাম; আজকেও এখানে দেখছি, কে মা তুমি? আমাদের জন্যে এত করছো?

কুৎ-অল হাসে। শুধু বলে, আমার নাম কুৎ-অল-কুলুব।

এই একটিমাত্র নামেমাচ্চারণে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়। পলকে উঠে বসে ঘানিম। তাকিয়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে তার ভালোবাসা।—আকুলভাবে দু'হাত বাড়িয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, কুৎ-অল-কুলুব—?

ঘানিমের গলার আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে কুৎ-অল। এ কণ্ঠ তার খুব চেনা।—ঘানিম, ঘানিম তুমি, সোনা?

—হ্যাঁ আমি ঘানিম।

কুৎ-অল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। অচৈতন্য হয়ে যায় ঘানিমের মা আর বোনও। একটু পরে কুৎ-অল নিজেকে সংযত করে বলে, অবশেষে আল্লাহর দোয়ায় তোমাকে ফিরে পেলাম। আর এই দেখো, তোমার পাশে তোমার মা বোনও এসে গেছেন।

তারপর কুৎ-অল সব বৃত্তান্ত খুলে বললো। বললো, খলিফা আমার কথা বিশ্বাস করেছেন। তোমার তিনি সন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে দেবেন।

এ কথা ঘানিম বিশ্বাস করতে পারে না। এত দিন সে দুঃখশোকে তাপে মৃত-কল্প হয়েছিলো, এবারে আনন্দ সংবাদে আত্মহারা হয়ে বুঝি প্রাণ সংশয় ঘটবে। একি কথা শোনালো কুৎ-অল। খলিফা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কুৎ-অল-এর সঙ্গে তার শাদী হবে? কুৎ-অলের হাতে একটা চুমু দেয় ঘানিম।

কুৎ-অল বলে, তোমরা একটুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

কুৎ-অল আর দাঁড়ায় না। সোজা চলে আসে প্রাসাদে। তার নিজের জমানো টাকা থেকে একটা থলে ভর্তি করে নিয়ে এসে শেখ-এর হাতে দেয়। বলে, মেহেরবানী করে ঘানিমের মা বোনের জন্যে চার পরস্ত জমকালো দামী পোশাক কিনে নিয়ে আসুন। যত দাম লাগে লাগুক। তার জন্যে ভাববেন না। সেই সঙ্গে নেবেন খানকুড়ি রেশমী রুমাল।

এর পর শেখের বাড়ি ফিরে এসে ঘানিমের মা আর বোনকে ভালো করে গোসল সেরে নিতে বলে। শেখের বিবির হাতে একটা মুঠো মোহর গুঁজে দেয়।—চাকরকে বাজারে পাঠান। ভালো দেখে মুরগী, মাংসের চাপ, শব্জী, আঙুর, আপেল, বেদানা আর খানিকটা দামী সরাব নিয়ে আসতে বলুন। আজ আমি নিজে হাতে খানা পাকাবো। আপনাদের সবাইকে খাওয়াবো।

চাকরটা বাজার করে নিয়ে এলো। নানারকম সুন্দর সুন্দর খানা বানালো কুৎ-অল। সবাইকে নিজে হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালো। সারাটা দিন খুব হৈ হল্লা করে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা প্রাসাদে ফিরে এলো। পরদিন সকালে উঠে আবার সে শেখের বাড়ি এসে হাজির। সারা দিন ধরে খানাপিনা করে আবার ফিরে যায় প্রাসাদে। এইভাবে পর পর চারটে দিন খুব আমোদ করে কাটে। ভালো ভালো খানাপিনা করে ঘানিমের মা আর বোন-এর যেমন চেকনাই খোলে, তেমনি ঘানিমও বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পরদিন কুৎ-অল নিজে হাতে সাজিয়ে দেয় ফিৎনা আর তার মাকে। নতুন সাজপোশাক কিনে এনেছিলো শেখ। সেই দামী দামী পোশাক পরালো দু'জনকে। ঘানিম তার মা আর সুন্দরী বোন ফিৎনাকে সঙ্গে নিয়ে কুৎ-অল খলিফার প্রাসাদে এসে হাজির হয়।

খলিফা তখন তার খাসমহলে বিশ্রাম করছিলেন। ঘানিম, তার মা আর বোন ফিৎনাকে একটা ঘরে বসিয়ে রেখে কুৎ-অল এলো খলিফার কাছে।

—জাঁহাপনা, আমি ঘানিমের সন্ধান পেয়েছি। তার মা আর বোন ফিৎনাও এসেছে বাগদাদে। ওদের সবাইকে নিয়ে এসেছি।

খলিফা খুশি হন।—ঠিক আছে, ওদের নিয়ে এসো আমার কাছে।

ঘানিম, তার মা আর বোন এসে কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়ালো। খলিফা বললেন, তুমি ঘানিম?

—গোলাম হাজির জাঁহাপনা।

খলিফা বললেন, গোলাম কেন, তুমি আমার ভাই। কাছে এসো। ভুল করে আমি তোমাদের অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছি। তোমার মা বোনের ইজ্জৎ ধ্বংস করেছি। জানি না এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি দিয়ে হবে?

ঘানিম বললো, ও কথা বলবেন না, হুজুর। আমি আপনার বান্দা। বান্দা কখনও মালিকের ন্যায় অন্যায় বিচার করতে পারে না।

খলিফা অবাক হন। বাঃ চমৎকার কথা বলে তো ছেলেটি! আদর করে পাশে বসান। বলেন, আমি ঠিক করেছি ঘানিম, আমার পিয়ারের বাঁদী কুৎ-অল-এর সঙ্গে তোমার শাদী দেব।

—হুজুরের হুকুম তামিল করার জন্য বান্দা সর্বদাই প্রস্তুত, জাঁহাপনা।

খলিফা বলেন, আরও একটা প্রস্তাব আছে ঘানিম। একদিন তোমার মার আর এই বোন ফিৎনাকে আমি বে-ইজ্জৎ করেছিলাম। টাকাপয়সার বিনিময়ে সবই পাওয়া যায়। কিন্তু ইজ্জৎ একবার খোয়া গেলে আর ফেরৎ পাওয়া যায় না। সে দিক থেকে আমি অসহায়। কোনও ধন-দৌলত দিয়েই তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবো না। সেই কারণে ভেবেছি, তোমার বোন ফিৎনাকে শাদী করে আমি তাকে বেগমের মর্যাদা দেব। হয়ত বা এতে কিছু সান্ত্বনা পাবো। এখন তুমি পাত্রী পক্ষ, তোমার কি অভিপ্রায়, বলো।

হঠাৎ এইরকম একটা অভাবনীয় প্রস্তাবে ঘানিম হতভম্ব হয়ে যায়। এক মুহূর্ত মুখে

কথা সরে না। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আপনার মতো মহাপ্রাণ মহাপুরুষই একথা উচ্চারণ করতে পারেন। না হলে, যে কারণেই হোক, হাজার হাজার মানুষের কাছে যাকে একদিন বেইজ্জৎ করা হয়েছে, তাকে আজ আপনার হারেমের বেগম করতে চান? এত বড় সম্মান, এত বড় মর্যাদা পাওয়ার কি সে যোগ্যা?

খলিফা বলেন, আমার দোষে সে যে বস্তু একদিন হারিয়েছে তা তো আর তাকে ফেরৎ দিতে পারবো না ঘানিম। তাই আজ তাকে আমি বেগমের মর্যাদা দিয়ে সামান্য একটু ক্ষতিপূরণের সান্ত্বনা পেতে চাই।

ঘানিম বলে, ফিৎনা আপনার বাঁদী হয়ে থাকবে, জাঁহাপনা।

খলিফার হুকুমে তখুনি কাজীকে ডেকে এনে দু'খানা শাদীর কবুলনামা তৈরি করা হলো। একখানা ঘানিম আর কুৎ-অল-কুলুব-এর আর একখানা খলিফা আর ফিৎনার জন্যে। দেন-মোহর হিসাবে খলিফা ফিৎনাকে দিলেন এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। আর ঘানিম কুৎ-এর কানে কানে বললো, আমার দেন-মোহর বাকী রইলো। আজ রাতে দেব, কেমন?

কুৎ-অল-এর সারা মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, অসভ্য কোথাকার।

সেই রাতে মহা ধুমধাম করে দুই জোড়ের শাদী হয়ে গেলো। সারা বাগদাদ শহর আলোর মালায় সাজানো হলো। নাচ গান, হৈ হল্লা, খানাপিনায় মেতে উঠলো শহরবাসীরা। সেই রাতে প্রাসাদের দুই মহলে দুই বাসর শয্যায় খলিফা-ফিৎনা আর ঘানিম-কুৎ-অল মধুযামিনী যাপন করলো।

ঘানিম-কুৎ-অলের জন্যে খলিফা একখানা সুরম্য ইমারৎ বানিয়ে দিলেন। ঘানিম দরবারের এক উচ্চ পদে বহাল হলো। মা এবং বিবি কুৎ-অলকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করতে থাকলো।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা, ঘানিম আর কুৎ-অল-কুলুব-এর কাহিনী শুনলেন। যদি ইচ্ছা করেন, এবার আপনাকে শোনাতে পারি উমর অল-নুমান আর পুত্র দু-অল-মাকান-এর এক বিচিত্র কাহিনী।

বাদশাহ শারিয়ার বলে, বলো, আমি শুনবো।

শাহরাজাদ উমর অল-নুমান আর তার পুত্র দু-অল-মাকান-এর কাহিনী শুরু করে ঃ

খলিফাদের রাজত্ব শেষে বাগদাদে শহরে এক সময়ে উমর অল-নুমান নামে এক বাদশাহ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলো। যুদ্ধবিদ্যায় তার সমকক্ষ সে সময়ে আর দ্বিতীয় ছিলো না। তার বিক্রমের সামনে কোনও সুলতান বাদশাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না। এমন কি সম্রাট সীজারকেও তার বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিলো। সুদূর প্রাচ্যের সমস্ত ভূখণ্ড তার পদানত ছিলো। দুনিয়ার প্রায় সব রাজা বাদশাহর কাছ থেকে নানারকম উপহার উপঢৌকন আসতো। কারণ তারা সদাসর্বদা তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো।



উমর অল-নুমানের একমাত্র পুত্র সারকান মাত্র বিশ বছর বয়সে তার বিস্ময়কর শৌর্যবীর্য দেখিয়ে দুনিয়ার সব সুলতান বাদশাহদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। উমর তাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতো। তার মৃত্যুর পর পুত্র সারকানই সিংহাসনে বসবে এই ছিলো তার একান্ত বাসনা।

উমর-এর চারটি বেগম। তার মধ্যে তিন বেগমের কোন সন্তানাদি হয়নি।

সারকানই একমাত্র সন্তান। এই চার বেগম ছাড়াও উমরের তিনশো ষাটটি রক্ষিতা ছিলো। নানা দেশের, নানা জাতের নানা ধর্মের মেয়ে তারা। সবাই পরমা সুন্দরী যুবতী। উমর প্রত্যেক রক্ষিতার জন্যে খোজা দাসী পরিবৃত আলাদা আলাদা সুসজ্জিত কক্ষের ব্যবস্থা করেছিলো। প্রাসাদের হারেমে তিনশো ষাটটি কক্ষে এই রক্ষিতাদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়েছিলো। প্রতি দিন উমর এক একজন রক্ষিতার ঘরে রাত কাটাতো। তার হারেম বিভক্ত ছিলো বারোটি মহলে। প্রতি মহলে তিরিশটি রক্ষিতার ঘর। প্রতিটি রক্ষিতার ঘরে একটি মাত্র রাত্র অতিবাহিত করতেই এক মাস কাল সময় কেটে যেতো। এইভাবে সে পুরো এক বছরে সমগ্র হারেমের প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে একবার মাত্র সহবাস করতো। কোন রক্ষিতাই এক বছরের আগে দ্বিতীয়বার উমরের দর্শন পেতো না। তার এই ন্যায় বিচারে সব রক্ষিতাই খুব খুশি। দেশের আপামর জনসাধারণ শাহেনশাহর এই অলৌকিক বীর্যবত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো।

একদিন উমরের কাছে খবর এলো, তার অন্যতম রক্ষিতা সফিয়া অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। বাদশাহ তো আনন্দে আত্মহারা। বহুকাল বাদে তার আবার সন্তান হবে। উমর-এর দৃঢ় প্রত্যয়, পুত্র সন্তানই প্রসব করবে তার রক্ষিতা।

যথা সময়ে সফিয়া একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলো। উমর অধীর আগ্রহে দরবার কক্ষে পায়চারি করছিলো। খোজা দূত এসে খবর দিলো, একটি কন্যা সন্তান হয়েছে। বাদশাহ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। কিন্তু উমরের পুত্র সারকান শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যাক একটা মস্ত ফাঁড়া কাটলো। সে-ই একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারবে। আর কাউকে ভাগ দিতে হবে না।

এই সময় শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো। বাদশাহ শারিয়ার দেখলো, রজনী অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

পরদিন পঁয়তাল্লিশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার শাহরাজাদ গল্প শুরু করে ঃ

সারকান ভাবলো, যাক বাঁচা গেলো, সেই একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারবে। আর কাউকে ভাগ দিতে হবে না। সারকান মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো, যদি পুত্র সন্তানও হয় তবু সে-ই অদ্বিতীয় শাহেনশাহ হবে। নব-জাতককে যেন তেন প্রকারেণ ধরাধাম থেকে সে সরিয়ে দেবেই।

কিছুক্ষণ বাদে আবার সেই খোজা দূত এসে সংবাদ দিলো, শাহেনশাহ, মালকিন আরও একটি সন্তান প্রসব করেছেন। এবারেরটি ছেলে।

উমর অল-নুমান আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। খোজাকে সঙ্গে নিয়ে তখুনি সেই রক্ষিতার কক্ষে ছুটে এলো।

গ্রীক সম্রাট উমরকে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলো এই বাঁদীটি। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী সুঠামদেহী এই গ্রীক রমণী সফিয়া নাচে গানে শিক্ষায় দীক্ষায় বিশেষ পটিয়সী। আচার ব্যবহারে কথাবার্তায় একেবারে চৌকস। বছরে একটি মাত্র রাত্রি উমর তার সঙ্গে সহবাস করতো। সেই একটি রাতই সে এমন মধুময় করে তুলতো, যার পুরস্কার স্বরূপ আজ লাভ করেছে জোড়া সন্তান। উমর দেখলো, ছেলেটি দেখতে অবিকল তারই মতো হয়েছে। কিন্তু গায়ের রং রূপ হয়েছে তার মা-এর মতো।

প্রাসাদে আনন্দের হাট বসলো। খানাপিনা নাচ গান হৈ হল্লায় মেতে উঠলো সবাই। উমর নামকরণ করলো। মেয়ের নাম রাখা হলো, নুজাত-অল-জামান আর ছেলের নাম রাখলো দু-অল-মাকান। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। গুলাবজল, আতর, আগরবাতি, মৃগনাভী কস্তুরীর সুবাসে ভরে উঠলো প্রাসাদ। জনে জনে মিষ্টি বিতরণ করা হলো। দীন দুঃখীদের পেট ভরে খাওয়ানো হলো। প্রত্যেককে উপহার দেওয়া হলো নতুন নতুন সাজ-পোশাক।

সমস্ত শহরটা আলোর মালায় সাজানো হলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপন করা হলো তোরণ-দ্বার।

এর পর থেকে প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় উমর খোজা দূতের মাধ্যমে সফিয়া আর তার সন্তানদের সংবাদে পেতে থাকে। উমর নিজে পছন্দ করে হিরে-জহরতের অলঙ্কার বানাতে দিতো। এবং প্রায়ই নিজে গিয়ে দিয়ে আসতো সফিয়ার হাতে। এইভাবে চারটি বছর কেটে গেলো। এবারে সে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলো। তার পরম বিশ্বাসভাজন এক প্রাজ্ঞ শিক্ষককে নিযুক্ত করলো উমর।

সারকান কিন্তু এ সবের কিছুই জানতো না। বাবার এক রক্ষিতা গর্ভবতী শুনে সে প্রাসাদে অবস্থান করছিলো। তার মৎলব ছিলো খারাপ। যদি শোনে পুত্র হয়েছে, যে কোন উপায়ে তার প্রাণ সংহার করবে—এই ছিলো তার পণ। কিন্তু খোজা দূতের মুখে যখন শুনলো, সফিয়া কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তার তিলমাত্র অপেক্ষা না করে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে পরদেশ আক্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলো। দ্বিতীয়বার খোজা এসে যখন খবর দিলো, শুধু কন্যা নয়, সফিয়া আর একটি পুত্র সন্তানেরও জননী হয়েছে, তখন সারকানের অশ্বক্ষুরধ্বনি বাগদাদ ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূর দেশের মানুষের বুকে আতঙ্ক জাগিয়েছিলো। তারপর পুরো চারটি বছর ধরে সে বহু দেশ জয় করেছে। বহু সম্রাট তার পদানত হয়েছে। বশ্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু এদিকে যে তার আর এক অংশীদার গোকুলে বাড়ছে সে-কথা আর কানে পৌঁছলো না।



একদিন উমর অল-নুমান সিংহাসনে বসে আছে, এমন সময় একদল আমীর ওমরাহ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রবেশ করে যথাবিহিত কুর্নিশ জানালো।

শাহেনশাহ, আমরা আসছি রোমের সম্রাট আফ্রিদুন-এর দূত হয়ে। যদি আপনি বিরূপ হন, আমরা বিদায় নিয়ে চলে যাবো। আর যদি আপনার আজ্ঞা হয়, আমরা আসন গ্রহণ করতে পারি। আমাদের সম্রাট রোম, গ্রীস ও ইয়োনিয়ার অধিপতি। কনসতানতিনোপোল শহরে তার প্রাসাদ। সেখানেই তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা তার আজ্ঞা-বহ দাস মাত্র। তিনি আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। সিসারিয়ার দুর্ধর্ষ সম্রাট হারদুব-এর প্রচণ্ড আক্রমণে হাজার হাজার নিরীহ প্রজাবৃন্দ প্রাণ হারাচ্ছে।

উমর জানতে চাইলো, কেন, কি কারণে? ঝুট মুট সে আক্রমণই বা করবে কেন?

—কারণ যা তা হলো এই ঃ

কিছুদিন আগে আমাদের এক আরব সেনাপতি মরুপ্রান্তর অতিক্রম করার সময় এক জায়গায় এক রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পায়। সম্রাট আলেকজান্দার সারা পৃথিবী জয় করে সমস্ত ধনরত্ন এনে লুকিয়ে রেখেছিলো এই জায়গায়। সেই বিপুল বৈভব-এর পরিমাণ করা সম্ভব নয়। হীরা, জহরৎ, মণিমুক্তার পাহাড়। এর মধ্যে তিনটি গ্রহরত্ন ছিলো, যার অলৌকিক গুণে দুরারোগ্য ব্যাধি সারে। বিশেষ করে শিশুদের অসুখে ধন্বন্তরী। আমাদের সেই আরব সেনাপতি এইসব পাথরের গুণাগুণ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলো। সুলতানকে ভেট দেবার জন্যে দু'টো জাহাজ বোঝাই করে সে এই সব ধনরত্ন কনসতানতিনোপোলে নিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু এমনই বরাত, জাহাজ ছাড়ার কিছু পরেই গ্রীক সৈন্যের দামামা শোনা যায়। খবর আসে সিসারিয়ার সম্রাট হারদুব সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের সেনাপতি হারদুবের প্রচণ্ড আক্রমণ

প্রতিরোধ করতে পারে না। যাবতীয় ধনরত্ন লুঠপাট করে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ঐ তিনখানা অলৌকিক পাথরও তার হস্তগত হয়ে পড়ে। আমাদের সম্রাট আফ্রিদুন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠালো। কিন্তু তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিলো হারদুব। আরও এক জাহাজ সৈন্য পাঠানো হলো। তারাও ফিরে এলো না। পরে আরও এক জাহাজ সৈন্য তার দাপটের সামনে দাঁড়াতে না পেরে প্রাণ ভয়ে পশ্চাদাপসরণ করে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের সুলতান দারুণ ক্রুদ্ধ। কিন্তু নিরুপায়। হারদুবের মতো প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটকে দমন করার মতো শক্তি তার নাই। এখন আপনার কাছে এসেছি। আমাদের প্রার্থনা—এই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে আপনি আমাদের সম্রাটকে সাহায্য করুন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার প্রবল পরাক্রম সে সহ্য করতে পারবে না। পরাজয় তাকে স্বীকার করতেই হবে। এই আমাদের সম্রাটের বাসনা। তিনি আপনাকে নানা উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। আপনার আদেশ পেলেই আমরা জাহাজ খালাস করার নির্দেশ দিতে পারি।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

ছেচল্লিশতম রজনী।

আবার সে গল্প শুরু করে।

কনসতানতিনোপোলের সম্রাট আফ্রিদুনের প্রতিনিধিরা বললো, সম্রাট যে সব উপহার পাঠিয়েছেন তার মধ্যে আছে পঞ্চাশটি পরমা সুন্দরী গ্রীসের কুমারী কন্যা। আর পঞ্চাশটি গ্রীসের সুঠাম দেহী নওজোয়ান। সবাই রত্নালঙ্কারে এবং বাহারী সাজপোশাকে সুসজ্জিত। মণিমুক্তা ছাড়া তাদের স্বর্ণালঙ্কারের ওজনই হবে প্রায় এক হাজার কিলো। মেয়েরাও তদনুরূপ রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে এসেছে। এই দুই প্রধান উপহার ছাড়াও আরও সহস্রবিধ সামগ্রী সঙ্গে পাঠিয়েছে। মূল্যায়ন করলে সে সবের দামও কিছু কম নয়।

উমর খুশি হলো। বললো, আমি আপনাদের সম্রাটের উপহার গ্রহণ করলাম।

তারপর উজিরকে নির্দেশ দিলো, এদের যথাযোগ্য আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো। তারপর আমার কাছে একবার এসো, তোমার সঙ্গে কিছু গোপন পরামর্শ আছে।

অভ্যাগত অতিথিদের সৎকারের ব্যবস্থা করে বৃদ্ধ উজির দানদান উমরের নিভৃত কক্ষে ফিরে এলে বাদশাহ বললো, কনসতানতিনোপোলের সম্রাট আফ্রিদুন আমার সাহায্য চায়। এখন বলো, কি করা উচিত?

বৃদ্ধ উজির ধীর শান্তভাবে বলতে থাকে, কনসতানতিনোপোলের সম্রাট বিধর্মী কাফের খ্রীষ্টান। তার প্রজারাও সবাই কাফের। অবশ্য তার শত্রুপক্ষ তারই স্বজাতি। সেও কাফের, বিধর্মী খ্রীষ্টান। সুতরাং সেদিক থেকে আমাদের আপত্তির কিছু নাই। এর ফলে ইসলাম ধর্মের প্রতি কোনও আঘাত আসবে না। আমার পরামর্শ, আপনি আপনার যোগ্য পুত্র সারকানকে পাঠান। সে যুদ্ধবিদ্যায় পরম বিক্রমশালী। তার হাতে সিসারিয়া সম্রাটের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর তাছাড়া আপনার মতো বিশ্ববিজেতা শাহেনশাহকে যদি, সামান্য এক সিসারিয়া সম্রাটকে পরাজিত করতে, বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে হয়, মোটেও তা গৌরবের হবে না। লোকে বলবে, মশা মারতে কামান দাগা। তবে সাহায্য আপনার পাঠানো দরকার। কারণ, তার প্রেরিত উপঢৌকন আপনি গ্রহণ করেছেন। তার প্রতিনিধিদের শর্তই ছিলো, সব শুনে আপনি যদি সম্মত হন তবেই তারা জাহাজ খালাস করে উপঢৌকন নিয়ে আসবে। নচেৎ ফিরে যাবে।

উমর অল-নুমান, ঘাড় নাড়লো, ঠিক-ঠিক বলেছো উজির। একবার যখন তার

উপহার গ্রহণ করেছি, সাহায্য তাকে করবোই। তোমার মতো প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ উজির আমার অহঙ্কার। আজ থেকে তোমাকে আমি আমার সৈন্যবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলাম। আমার পুত্র সারকান তোমার নির্দেশে যুদ্ধ পরিচালনা করবে।

সারকানের কাছে দূত পাঠানো হলো। কয়েক দিনের মধ্যে পুত্র ফিরে এলে উমর জানালো, উজিরকে প্রধানহিসাবে সঙ্গে নিয়ে তুমি সিসারিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও। আমার বাছাই করা দশ হাজার ফৌজ আর তাদের খানাপিনা, প্রয়োজনীয় লটবহর নিয়ে যত শীঘ্র পারো বেরিয়ে পড়ো।

সারকান পিতার আদেশ শিরোধার্য করে বললো, আমাকে মাত্র তিন দিনের সময় দিন, শাহেনশাহ। আমি তার মধ্যে আমার সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে নিচ্ছি।

তিনদিন পরে উমর অল-নুদান দশ হাজার কুর্নিশ গ্রহণ করে সৈন্যবাহিনী সহ পুত্র সারকান এবং বৃদ্ধ উজির দানদানকে বিদায় জানালো।

সারকান বাছাই করা সমর সম্ভার নিয়ে রওনা হলো। বিশ দিনের পথ। সম্রাট আফ্রিদুন তার জন্যে এক বিরাট ছাউনি তৈরি করে রেখেছে। প্রথমে যেখানে গিয়ে ডেরা গাড়তে হবে। বিদায়কালে সুলতান উমর অল-নুদান সাতটা বাক্স ভর্তি মোহর সঙ্গে দিয়েছে। উজির দানদানকে বলে দিয়েছে, এগুলো সে যেন তার নিজের হেপাজতে রাখে।

একুশ দিনের মাথায় সারকান তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হলো এক সুরম্য উপত্যকায়। এখানেই তার জন্যে ছাউনি প্রস্তুত করে রেখেছে সম্রাট আফ্রিদুন। সারকান তার অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলো, এই ছাউনিতে তিনদিন বিশ্রাম নিতে হবে।

এই ছাউনির অদূরেই সম্রাট হারদুবের অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা। সারকান ঠিক করলো, গোপনে গোপনে সব পথঘাট আগে দেখে নিতে হবে। কোনদিক দিয়ে কিভাবে আক্রমণ চালাতে হবে তার জন্যেই এই গোপন অনুসন্ধান দরকার। নিজের দেহরক্ষীদের বিদায় দিয়ে একাই সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। যত দূর যায় শুধু গভীর জঙ্গল। কোন জনবসতির চিহ্ন নাই। এইভাবে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়। সারকান-এর ক্লান্তি আসে। একটা বিশাল বৃক্ষের নিচে ঘোড়াটাকে দাঁড় করায়। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘোড়র পিঠে চেপে থেকেই একটুক্ষণের জন্য সে ঘুমিয়ে নেয়। তারপর আবার এগোতে থাকে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে কান পেতে শোনে, অদূরে নারী কণ্ঠের কলহাস্য। এত রাতে এই গভীর জঙ্গলে নারী কণ্ঠ আসে কোথা থেকে। সারকান ভাবে, নিশ্চয়ই অদূরে কোথাও লোকালয় আছে। কিন্তু না, আশে পাশে কোথাও কোন ঘর বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেলো না। এবার কিন্তু সেই হাসির শব্দ আরও উচ্চতর হতে থাকে। হোহো—হাহা—হিহি এই ধরনের অট্টহাসিতে মুখর হয়ে ওঠে।

সারকান-এর ভয় হয়। নিশ্চয়ই কোন ভৌতিক ব্যাপার। এখন একমাত্র আল্লাহই ভরসা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এসে সেই হাসির শব্দ অনুসরণ করে সারকান হাঁটতে থাকে। চলতে চলতে অবশেষে হাজির হয় এক নদীর ধারে। কুলকুল করে বয়ে চলেছে স্রোতধ্বনি। তার তীরে গাছের ডালে পাখীরা কুলায় ফিরে মিষ্টি মধুর আওয়াজ তুলে গান ধরেছে। যেদিকে তাকায়, দেখে নানা বিচিত্র রঙের ফুলের মেলা।

সারকান দেখলো নদীর ওপারে চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় আবছা আবছা দেখা গেলো বিরাট উঁচু মিনারওয়ালা এক প্রাসাদ। একেবারে নদীর তীরে। নদীর শান্ত জলে তার ছায়া পড়েছে। মনে হলো ঐ প্রাসাদে মানুষের বসতি আছে। এবং ঐ অট্টহাসির আওয়াজ ওখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে।

ক্রমশ চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল হয়। এবার পরিষ্কার দেখা যায়, প্রাসাদের সামনে একখণ্ড সবুজ প্রাঙ্গণ। তার মাঝখানে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীকে ঘিরে বৃত্তাকারে

কলহাস্যরত দশটি যুবতী। এই রূপসীর অট্টহাসিই সে দূর থেকে শুনতে পেয়েছিলো। এবারে তার কথাও শোনা গেলো। পরিষ্কার আরবীতে বলছে ঃ তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তোরা সব অপদার্থ। অমন ন্যাকাপনা করলে কুস্তি লড়া যায় না বুঝলি! কুস্তির জন্যে দেহে তাগদ দরকার। নে আয়, আমাকে হারানো চাই।

একটা একটা করে মেয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু এক একটা প্যাঁচেই এক একজনকে কাত করে ফেলে দেয়। মেয়েগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। শুধু ইজের আর কাঁচুলী পরা সেই তরুণী কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়। দু'হাতে নিজের জঙ্ঘা থাবড়াতে থাবড়াতে আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, এই ওঠ—ওঠ শিগ্গির। আয় লড়বি আয়। কিন্তু কেউ আর সাহস করে না। তখন মেয়েটি ক্ষেপে যায়, কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি। ওঠ বলছি, নইলে কিন্তু বেল্টের বাড়ি দিয়ে পাছা ফাটিয়ে দেব।



ভয়ে ভয়ে একটি মেয়ে উঠে আসে। কিন্তু পলকেই তাকে তুলে আছাড় দেয় সে। এইভাবে এক এক সব কটা মেয়েকেই অতি সহজেই কাবু করে ফেলে। এই সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক বয়স্কা রমণী।—মেয়েগুলোকে নিয়ে কি সব ছিনিমিনি খেলছো। ওরা কি কুস্তি জানে যে ওদের সঙ্গে কুস্তি লড়ছো? এই সব আনাড়ী মেয়েগুলোর ওপর তোমার কায়দা কসরৎ দেখিয়ে কি এমন মজা পাচ্ছো? তার চেয়ে যে কুস্তি জানে তার সঙ্গে লড়ে দেখাও তোমার হিম্মৎ, তবে বুঝি? সত্যিই তুমি যদি কুস্তিই লড়তে চাও এসো, আমার সঙ্গে লড়বে। আমি বুড়ো হয়েছি। তবু তোমাকে একটু শিক্ষা দিতে পারবো।

তরুণীটি মনে মনে বিরক্ত হয়। কিন্তু মুখে প্রকাশ করে না। বলে, বুড়িমা তামাশা করছো, না সত্যি সত্যিই লড়তে চাও আমার সঙ্গে?

—কেন, তামাশা করবো কেন? এসো, সত্যিই একবার দেখে নিই, কতখানি প্যাচ পয়জার তুমি শিখেছো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতচল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু করে ঃ

তখন সেই তরুণী হুঙ্কার ছাড়ে, তবে এসো, কেমন করে তোমার ঘাড় মটকাই একবার দেখে যাও।

এই বলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বয়স্কার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তখন বয়স্কা রমণীটি বলে, দাঁড়াও, কুস্তি লড়তে গেলে তো আর এই জবুথুবু সাজপোশাকে লড়া যাবে না। পোশাক আশাক আগে খুলে ফেলি। তারপর দেখবো, তোমার কত হিম্মৎ।

এই বলে সেই বিশাল বপু কুৎসিৎ রমণী তার সব সাজপোশাক খুলে ছুঁড়ে ফেলে। এমন কি ইজেরটা পর্যন্ত। তরুণীকে উদ্দেশ করে বলে, তুমিই বা কাঁচুলী ইজের পরে রইলে কেন? ওটা ধরে টান দিলে তো এখুনি কুপোকাৎ হয়ে যাবে।

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করলো মেয়েটি। তারপর সেও খুলে ফেললো তার কাঁচুলী আর ইজের। সেই চন্দ্রালোকে সারকান পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করতে পারলো, শ্বেত পাথরে খোদাই করা এক অপ্সরী মূর্তি। আর তার সামনে বীভৎস-দর্শনা কালো কুৎসিত ভাল্লুকীর মতো এক মধ্যবয়স্কা রমণী।

দুই কুস্তিগীর তাক করে গুটি গুটি মুখোমুখি এগোতে থাকে। দু'জনেই নিজের

নিজের জঙ্ঘা থাবড়াতে শুরু করে। সারকান আর হাসি রুখতে পারে না। মনে হয় সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে।

প্রথম পাঁচ থেকে পিছলে বেরিয়ে আসে তরুণী। বয়স্কার ঘাড়টা বাঁ হাতে চেপে ধরে ডান হাতটা চালিয়ে দেয় তার দুই জঙ্ঘার মাঝখান দিয়ে। তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে ঐ বিশাল বপুটা মাথার উপরে তুলে ছুঁড়ে দেয় সাত হাত দূরে। বয়স্কাটি কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে তেড়ে আসে তরুণীর দিকে। আবার তাকে অতি সহজেই তুলে আর এক আছাড় দেয়। এবার আর সে উঠে দাঁড়াতে পারে না। তরুণী এগিয়ে আসে। তার পোশাক-আশাক এগিয়ে দিয়ে বলে, বুড়ি মা, আমার কিন্তু কোনও দোষ নাই। আমি চাইনি। কিন্তু তুমি আমাকে চটিয়ে দিলে, তাই তোমার সঙ্গে লড়তে নেমেছিলাম। যাই হোক, যীশুর দয়ায় তোমার তেমন কোন চোট-ফোট লাগেনি তো! নাও ওঠ।

বয়স্কা কোন কথা বললো না। সাজপোশাক নিয়ে বাগান ছেড়ে ওপাশে চলে গেলো।

সারকান দেখলো তরুণীটি একা পায়চারী করছে। তার দশটি বাঁদী সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে। সারকান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে এক লাফে নদী পেরিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েটি তখন আনমনে অস্তমিত চাঁদের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলো। সারকান পিছনে এসে দাঁড়ায়। আচমকা চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহ সর্ব-শক্তিমান।

তরুণীটি হতচকিত হয়ে ছিটকে সরে যায় খানিকটা। তারপর সারকানের দিকে নজর পড়তেই নদীর দিকে দৌড়ে পালায়। নদীটা চওড়ায় মাত্র ছ'সাত হাত। এক লাফে ওপারে গিয়ে দাঁড়ায়। সুললিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে তুমি, আমাদের এই নিরালা নির্জন প্রাঙ্গণে এসে তলোয়ার হাতে দাঁড়ালে? এমন ভাব করে এসেছো, যেন কোনও বীরপুরুষ, সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে এসেছো। তুমি আসছো কোথা থেকে, আর যাবেই বা কোথায়? সাফ সাফ সত্যি কথা বলো। না হলে ভেবো না এখান থেকে পালিয়ে রেহাই পাবে। আমার এক ডাকে চার হাজার খ্রীষ্টান সৈন্যসামন্ত বেরিয়ে আসবে। আমার নির্দেশেই তারা চলে। এখনও সত্যি করে বলো, তুমি কি চাও? যদি এই অরণ্যে পথ হারিয়ে এখানে এসে থাকো, আমি তোমাকে আবার পথের নিশানা বাৎলে দেব।



—আমি এক বিদেশী মুসলমান মুসাফির, সারকান বলে, না, আমি পথ হারিয়ে আসেনি এখানে। আজ রাতের সঙ্গী হিসাবে গোটা কয়েক তাগড়াই মেয়েছেলে খুঁজতেই বেরিয়েছি। তোমার এই দশটা বাঁদী আমাদের সে-ক্ষুধা মেটাতে পারবে, আশা করি। যদি তোমার অমত না থাকে তবে আমার সঙ্গীসাথীদের আস্তানায় এদের নিয়ে যেতে পারি।

—তুমি একটা মিথ্যেবাদী ভণ্ড সৈনিক। তোমার এসব কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার ধারণা, তোমার অন্য কোনও বদ মৎলব আছে।

ওগো সুন্দরী, যে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারে সেই প্রকৃত সুখ পায়। আর কোনও সুখই সুখ নয়—যার সঙ্গে আল্লাহর নামগান জড়িত থাকে না।

তরুণী তখন বলে, তোমার এসব ভণ্ডামী। আসল কথা চেপে যাচ্ছো। আমি কিন্তু আমার সৈন্যবাহিনী তলব করতে বাধ্য হবো। এখনও সত্যি কথা বলো। তুমি যদি প্রকৃত মুসাফির হও, আমার দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে তুমি যখন দেখতে শুনতে সুন্দর সুপুরষ। তোমাদের রাত্রি সহবাসের জন্যে এই বাঁদীগুলোকে যদি প্রয়োজন হয় স্বচ্ছন্দে দিতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ো। তোমার অস্ত্রশস্ত্র রেখে দাও। আমি যেমন খালি হাতে তেমনি খালি হাতে এগিয়ে এসো আমার কাছে। আমার সঙ্গে এক হাত

লড়তে হবে। আমাকে যদি তোমার পিঠে তুলে নিতে পারো, এই সব বাঁদী তোমার হবে। আমাকেও যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যদি না পারো? লড়াইয়ে যদি আমার হাতে হেরে যাও? তাহলে তোমাকে আমার গোলাম হয়ে থাকতে হবে।

সারকান ভাবে, মেয়েটা পাগল? সে জানে না কার সামনে দাঁড়িয়ে এই সব হাম বড়াই বাত ছাড়ছে। বললো, আমি রাজী। কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেবো না। শুধু হাতে তোমার সঙ্গে আজ কুস্তি লড়বো, এসো। যেভাবে চাও সেইভাবেই লড়বো। চলে এসো। আমি যদি হেরে যাই, তবে মুক্তি পণ হিসাবে যত টাকা চাও আমি দেব। আর তুমি যদি হারো তুমি হবে আমার সুলতানের উপহারের পাত্রী। আল্লাহর পয়গম্বরের নামে হলফ করে বলছি—আমার কথার নড়চড় হবে না।

মেয়েটি বললো, আবার পয়গম্বর কেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যাঁর দৌলতে বেঁচে আছো তাঁর নামে কসম খেয়ে বলো, কথার কোনও এদিক ওদিক করবে না।

সারকান সেইভাবেই হলফ করলো।

তরুণীটি তখন এক লাফে আবার নদীটা পেরিয়ে আসে। উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, এখনও বলছি, ভালো মানুষের ছেলে, মানে মানে কেটে পড়ো। সকাল হতে আর বেশি দেরি নাই। এখনই আমার বাঁদীরা সব জেগে উঠবে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে রোগা পটকা সে-ই তোমাকে তুলে আছাড় দেবে।

এই বলে সে সারকানকে পাশ কাটিয়ে বাগিচার অপর প্রান্তে চলে যায়। সারকান দেখে, মেয়েটি কুস্তির কথাটা বেমালুম চেপে যেতে চাইছে। একটু আগেই সে যে তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেছিলো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও-সব তার বাহানা।

সারকান অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, এই না, পাঁয়তারা করলে তুমি আমার সঙ্গে কুস্তি লড়বে? কই, কি হলো? এখন সুড় সুড় করে কেটে পড়ছো কেন?

মেয়েটি মুচকি হেসে বলে, তুমি কি চাও, আমার হাতে মান ইজ্জত খোয়াবে? ঠিক আছে, আমার কোনও আপত্তি নাই।

সারকান বলে তোমার দরবারে যখন এসেই পড়েছি, তোমাকে একটু সেবা যত্ন না করে যাবো না। আমি তো তোমার দাসানুদাস।

—তা কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলোনি। আচ্ছা, ঘোড়া থেকে নামো। তুমি আমার মেহেমান।

সারকান পুলকিত হয়। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। মেয়েটি তার ঘোড়াটাকে একটা বাঁদীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, ভালো করে দানাপানি খাওয়াবার ব্যবস্থা কর।

সারকান বলে, সুন্দরী, তোমার রূপে যেমন মোহিত হয়েছি, তেমনি তোমার আদর আপ্যায়নও আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে—এই বনবাদাড়ে পড়ে থেকে জীবনটাকে নষ্ট করছো কেন? চলো, আমাদের বাগদাদ শহরে নিয়ে যাবো তোমাকে। দেখবে কত মজা পাবে। কত সুন্দর শহর, চোখ জুড়িয়ে যাবে। আর দেখতে পাবে দুনিয়ার সেরা সব বীরপুরুষ। আর দেখবে, আমার কি খাতির। চলো সুন্দরী, একবার সেই মনভোলানো দেশ বাগদাদেই চলো আমার সঙ্গে।

—হা ঈশ্বর, আমি ভেবেছিলাম, তুমি একজন জ্ঞানীগুণী মানুষ। এখন বুঝলাম তোমার মাথার ইস্‌কুরুপ কিছু নড়বড়ে আছে।

—কেন, কেন?

—তা না হলে অসভ্য বর্বরদের আস্তাবল বাগদাদে নিয়ে যেতে চাও আমাকে। ওখানে শুনেছি বাদশাহ উমর অল-নুমানের হারেমে তিনশো ষাটটি রক্ষিতা আছে। লোকটা নাকি প্রত্যেক রাতে একটা রক্ষিতাকে নিয়ে শোয়। আর সারা রাত ধরে মেয়েটার মাংস ছিঁড়ে

ছিঁড়ে খায়। জানোয়ার কোথাকার। তুমি আমাকে সেই লোকটার থাবার মধ্যে ছুঁড়ে দিতে চাইছো? সারা বছরের মধ্যে একটা রাত সে আমার ঘরে আসবে। পশুর মতো অত্যাচার করে চলে যাবে। তারপর আবার একটা বছর ধরে তার পথ চেয়ে ভিখিরির মতো বসে থাকবো। ঈশ্বর রক্ষা করুন, মরে গেলেও ঐ শয়তানের খপ্পরে পড়তে রাজী নই। আর কখনো ওসব কথা বলে আমাকে লোভ দেখাবার চেষ্টা করো না। এমন কি তুমি যদি স্বয়ং সারকানও হও,তবু তোমার সঙ্গে যাবো না।

—সারকান কে, তুমি জানো?

—জানবো না কেন? বাগদাদের বাদশাহ উমর অল-নুমানের পুত্র। জাঁদরেল যোদ্ধা। তার দাপটে সবাই নাকি থর থর কম্পমান। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সে এসেছে। ছাউনি ফেলেছে আমাদের দেশের সীমান্তে। সম্রাট আফ্রিদুনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করবে আমাদের সম্রাট হারদুবের বিরুদ্ধে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, একাই আমি চলে যাই ওর ছাউনিতে। শয়তানের বাচ্চার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে আসি। সে আমাদের পরম শত্রু। যাক, ওসব কথা, এখন এসো, আমার সঙ্গে এসো।

এই সময়ে রাত্রি অবসান হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটচল্লিশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়।

সারকান বুঝতে পারলো মেয়েটি তার এবং তার সৈন্যদলের ওপর কি রকমটা চটা। ভাগ্যে সে নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলেনি। তা হলে তো এতক্ষণে তাকে সাবাড় করে দিতো। তরুণীর পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চলে সারকান।

একটা বিরাট ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটি বলে, চলো, ভেতরে চলো।

একটা সুসজ্জিত সুরম্য কক্ষে তারা প্রবেশ করে। মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো ঝকঝকে তকতকে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে অনেকগুলো ঝাড়বাতি। সারা ঘরময় মোমের মিষ্টি মধুর নরম আলো আতর আর আগরবাতির সুবাসে মন মেতে ওঠে। সারকান ভাবে সে এক স্বপ্ন পুরীতে এসে পড়েছে। ঘরের এক পাশে একটি বিশাল শয্যা।

মেয়েটি বলে, এখানে শুয়ে বিশ্রাম করো।

সারকান বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। দাসী বাঁদীরা এসে তার চারপাশে বসে পড়ে। মেয়েটি অন্য ঘরে চলে যায়।

অনেকক্ষণ একা একা শুয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েটি আর ফিরে আসে না। সারকান বাঁদীদের জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মালকিন কোথায় গেলো, আর আসবে না?

—না। তিনি ঘুমুতে গেলেন—

সারকান উঠে বসে। ভাবে, কি করা যায়। মেয়েটি তাকে একা ফেলে চলে গেলো?

দাসী বাঁদীরা নানারকম খানাপিনা নিয়ে এলো। সারা রাত কিছু খাওয়া হয়নি। সারকান অনুভব করে, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে তার।

বাঁদীরা সোনার থালায় খানা সাজিয়ে দিয়ে বলে, মেহেরবানী করে একটু কিছু খেয়ে নিন।

সারকান আর অপেক্ষা না করে গোগ্রাসে খেতে থাকে। অপূর্ব স্বাদ। এমন খানা সে বহুকাল খায়নি। বাঁদীরা গোলাপ জল দিয়ে তার হাত মুখ ধুইয়ে দেয়। কেউ তোয়ালে এনে মুছিয়ে দেয় মুখ।

সারকান এবার আবার সৈন্যদের কথা ভেবে চিন্তিত হয়। সেই পাহাড়ী উপত্যকায়

ছাউনিতে তাদের ফেলে রেখে চলে এসেছে। নতুন জায়গা। বিদেশ বিভুঁই। যদি কোন অতর্কিত আক্রমণ হয়? তার বাবার সতর্কবাণী মনে পড়ে। নিজের সৈন্যসামন্ত ছেড়ে কোথাও যাবে না। তাদের সুখেই তোমার সুখ। তাদের দুঃখেই তোমার দুঃখ—এই তোমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হবে। অথচ বাবার সে-নির্দেশ উপেক্ষা করে আজ সে বিলাসব্যসনের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে! ক্রমশই সে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। আরও খারাপ লাগে মেয়েটার এই রহস্যজনক অনুপস্থিতি। না বলে কয়ে তাকে একা ফেলে রেখে মেয়েটা এইভাবে হাওয়া হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি। তাছাড়া মেয়েটার কোনও পরিচয়ই সে জানে না। আর এই সুরম্য-প্রাসাদই বা কোন সুলতান বাদশাহর তাও তার কাছে অজ্ঞাত। এ অবস্থায়, এখানে এইভাবে থাকা কি তার পক্ষে নিরাপদ? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা চোখ খুলতে দেখতে পায়, ঘরের ঠিক মাঝখানে গোটা কুড়ি দাসী বাঁদী পরিবেষ্টিত হয়ে সেই সুন্দরী। চোখ ধাঁধানো জমকালো সজে সজ্জিতা। তার সেই মনোমোহিনী রূপ দেখে সারকানের সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে যায়। ভুলে যায়, কোথায় তার সৈন্যসামন্ত কোথায় তার ছাউনি, কেনই বা এই দূর দেশে সে এসেছে। ভুলে যায় তার বাবার উপদেশ।

মেয়েটি অপরূপ লাস্যময়ী ভঙ্গীতে তার পাশে এগিয়ে আসে।

—তুমিই সারকান? উমর অল-নুমানের পুত্র? তবে আমার কাছে চেপে গেছো কেন? কেন নিজের পরিচয় দাওনি? তুমি না প্রবল পরাক্রান্ত বাদশার ছেলে? তোমার পক্ষে এই ধরনের কাপুরুষের মতো আচরণ কি শোভা পায়?

সারকান বুঝতে পারে, আর লুকিয়ে লাভ নাই। মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে ঢাকা যায় না। তাতে পরিণামে আরও খারাপ হবে।

—তুমি ঠিকই ধরেছো সুন্দরী। আমি সারকান। উমর অল-নুমান আমার বাবা। আমার আর কিছু বলার নাই। এখন তোমার যা অভিরুচি করতে পারো। যদি কিছু সাজা দিতে চাও, মাথা পেতে নেবো।

মেয়েটি এক মুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে সারকানের চোখে চোখ রেখে বলে, তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নাই সারকান, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করবো না। তুমি আমার মহামান্য মেহেমান। ঐ নুন আর রুটি সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তোমার কোনও ক্ষতি তো করবোই না, বরং অন্য কেউ যদি তোমার অনিষ্ট করতে আসে, আমাকে না মেরে তা করতে পারবে না। তোমাকে রক্ষা করার সব দায়দায়িত্ব আমার।

মেয়েটি এসে সারকানের পাশে বসে। একটা গ্রীক বাঁদীকে উদ্দেশ করে কি যেন বলে। সারকান গ্রীক ভাষা জানে না। একটু পরে বাঁদীটা একটা বারকোষে সাজিয়ে নিয়ে আসে নানা ধরনের খানাপিনা। সারকানের সামনে রাখে। মেয়েটি বলে, নাও, নাস্তা করো।

কিন্তু সারকান ইতস্তত করে। কি জানি যদি কিছু বিষটিস খাইয়ে মারে। মেয়েটি বুঝতে পারে। হাসে। বলে, ভয় নাই, জহর খাওয়াবো না। মারলে তোমাকে অনেক আগেই খতম করতে পারতাম। আমার ডেরায় যখন এসে পড়েছো, তুমি যত বড় বীরপুরুষই হও, নিজেকে রক্ষা করতে পারতে না। কিন্তু তা আমি করিনি, করবো না। কারণ তুমি আমার মেহেমান। একবার যখন সে-সম্মান তোমাকে দিয়েছি, নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, এখানে তুমি নিরাপদ।

এই বলে প্রত্যেক রেকাবী থেকে একটু একটু খাবার তুলে নিয়ে মেয়েটি মুখে পুরে।—এবার তো বিশ্বাস হচ্ছে, কোনও বিষ মিশিয়ে দিইনি?

সারকান লজ্জিত হয়। সত্যিই তো সে ঐরকম সন্দেহই করেছিলো? এর পর আর

কোনও দ্বিধা থাকে না। দু'জনে একসঙ্গে বসে আহারপর্ব শেষ করে। নাস্তা শেষে সোনার পেয়ালায় সরাব ঢালে সাকী। বলে, এবার মৌজ করো।

মেয়েটি প্রথমে মদের পেয়ালায় চুমুক দেয়। সারকান লজ্জিত হয়। পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে টেনে নেয়। সুন্দরী বলে, জীবনটাকে জটিল করে না দেখে সহজ সরল করে দেখতে পারলে অনেক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, জানো, মুসলমান। বিশ্বাস করে ঠকা ভালো, কিন্তু অবিশ্বাসের আগুনে দগ্ধ হতে নাই।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ঊনপঞ্চাশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে শুরু করে ঃ সারকান আর সেই মৃগনয়না সুন্দরী মৌজ করতে করতে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। একের পর এক পেয়ালা শূন্য হতে থাকে। নেশা বেশ জমে উঠেছে। একটি বাঁদী উঠে পাশের ঘরে চলে যায়। একটু পরে চারটি মেয়েকে সঙ্গে করে ফিরে আসে। একজনের হাতে দামাসকাসের বাঁশী, একজনের হাতে পারসীয় বীণ আর একজনের হাতে তাতারের চিখারা এবং অন্য মেয়েটির হাতে ছিলো মিশরের গীটার। মৃগনয়না সুন্দরী বাঁশীটা নিজের হাতে নিয়ে মিষ্টি সুরে বাজাতে থাকে। তার সঙ্গে তাল রেখে অন্য মেয়েরা বাজিয়ে চলে বীণ, গীটার আর চিখারা। অপূর্ব এক সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়। সারকান সব ভুলে যায়। ভেসে চলে অজানা অচেনা এক দেশে, যেখানে, আশা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, মোহ, হিংসা দ্বেষ, হানাহানি কাটাকাটি কিচ্ছু নাই। শুধু আছে অমৃত, আর আছে ভালোবাসা।



এক সময়ে বাঁশী থেমে যায়। সুরের রেশ কিছু লেগেই থাকে। সারকান চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। এমন সুরের মুর্চ্ছনা সে শোনেনি কখনও। মনটা কেমন উদাস বাউল হয়ে যায়।

এর পর একটি মেয়ে গ্রীক-সঙ্গীত গায়। গানের ভাষা সারকান বুঝতে পারে না। কিন্তু সুরের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানুষের মুখের ভাষা আলাদা হলেও সুরের ভাষা সর্বত্রই এক।

এর পর মৃগনয়না গান ধরে। তার সুললিত কণ্ঠ সারকানের মনে বসন্ত জাগায়। পৃথিবীতে, এত সুন্দর সুন্দর ফুল আছে, গন্ধ আছে, রং আছে, রূপ আছে, পাখীর কাকলী আর ঝরনার কলতান আছে, এমন প্রাণ মাতানো গান আছে, এত সুর আছে তার এর আগে কখনও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সারকান চোখ মেলে দেখেনি, প্রাণ ভরে আঘ্রাণ করেনি, কান পেতে শোনেনি।

ষোড়শী গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিছু বুঝলে?

সারকান বলে, গানের ভাষা জানি না, সুরের ভাষা বুঝেছি। আমার সমস্ত সত্ত্বা তোমার গানের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সুন্দরী। এমন গান আগে কখনও শুনিনি।

মেয়েটি বললো, এবার আরবী ভাষায় গাইছি, শোনো।

সরাবের নেশা জমে উঠেছিলো বেশ। গান শুনতে শুনতে এক সময় গভীর আবেশে ঘুমিয়ে পড়ে সারকান।

সারা দিন রাতে আর তার ঘুম ভাঙ্গে না। পরদিন সকালে জেগে দেখে চারপাশে দাসী বাঁদীরা বসে আছে কিন্তু সেই হরিণী সেখানে নাই। মতিয়া বললো, আপনার ঘুমে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে সেই জন্যে সারারাত আমরা বসে পাহারা দিয়েছি।

সারকান জিজ্ঞেস করে তোমাদের মালকিন কোথায়?

—তার শোবার ঘরে। তিনি বলেছেন, আপনার ঘুম ভাঙ্গলে তার ঘরে যেন আপনাকে নিয়ে যাই। যাবেন?

—চলো যাই।

মতিয়া সারকানকে সঙ্গে নিয়ে মালকিনের ঘরে আসে। সোনার পালঙ্কে মখমলের শয্যায় শুয়ে ছিলো সে। সারকান যেতেই এগিয়ে এসে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসায়। মতিয়া এনে দেয় কস্তুরী সরবৎ। মৃগনয়না গান ধরে। সারকান সবরৎ-এ চুমুক দেয়। তার পাগল করা গানের সুরে মনে রং ধরে। গানের পর বাজনা, বাজনার পর আবার গান, তারপর আবার বাজনা—নিরবচ্ছিন্ন সুরের লহরী চলতে থাকে।

এক সময়ে গান বাজনা শেষ হয়। ষোড়শী সুন্দরী কাছে সরে আসে।—কাল রাতটা কেমন কাটলো?

সারকান বলে, খানাপিনা তো খুব ভালোই হয়েছিলো। তারপরে তোমাদের অমন সুন্দর গানবাজনা। একেবারে বেহেস্তের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। এক ঘুমে কোথা দিয়ে কি করে রাতটা কেটে গেছে, বুঝতে পারিনি।

সেদিনও খানাপিনা গান বাজনার এলাহী ব্যবস্থা হলো। সারকান সব ভুলে মেতে রইলো সেখানে। এর পর আরও একটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারে না সে। মধুর মুহূর্তগুলো বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

মৃগনয়না বলে, সারকান, তুমি তো যুদ্ধবাজ। তা নিশ্চয়ই দাবা খেলতে জানো?

সারকান বলে, খুব জানি।

দাবার ছক বিছানো হয়। কিন্তু সারকানের আনাড়ী চাল দেখে মেয়েটি হেসে ফেলে। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি লড়াই করো। যেখানে বড়ে চালতে হবে সেখানে চালাচ্ছো ঘোড়া। যেখানে দরকার মন্ত্রী সেখানে পাঠাচ্ছো সেনাপতি? এতে তো এক লহমাতেই মাৎ হয়ে যাবে, সাহেব?

সারকান লজ্জিত হয়। ভুল স্বীকার করে। অনেকদিন অভ্যাস নাই। তা ছাড়া এই প্রথমবার—আচ্ছা, এসো, এবারে তোমাকে হারাবো।

কিন্তু একবার দুবার না, পর পর পাঁচবার সারকানকে হারালো সে।

সারকান হাসে।—তোমার কাছে হেরে যে কি সুখ তুমি কি করে বুঝবে পিয়ারী।

—আহা, না পারলেই ওই বাহানা। এখন খাবে এসো।

টেবিলে খাবার সাজানো হয়েছে। সারকান আর সুন্দরী খেতে বসে। মেয়েরা কেউ বাঁশী, কেউ বীণ, কেউ গীটার আবার কেউবা চিখারা বাজিয়ে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে।

খানাপিনা শেষ করে মৃগনয়নাও গান ধরে। সরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সারকান তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে।

একটু বা তন্দ্রা এসেছিলো। এমন সময় একদল লোকের হুড়পাড় শব্দে সারকানের চৈতন্য ফিরে আসে। উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক বর্ম-শিরস্ত্রাণ পরা জাঁদরেল সেনাপতি। তার হুঙ্কারে সারাঘর কেঁপে ওঠে, সারকান! সারকানকে আমরা হাতের মুঠোয় পেয়েছি। হা-হা-হা—

সারকান ভাবলো, শমন সম্মুখে, পালাবার পথ নাই। তবে কি মেয়েটা তার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করলো? এই যে এত আদর যত্ন খাতির—সবই তার ছলনা? মেয়েটির দিকে তাকালে দেখলো, ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলো, কি চাও? কেন এসেছো এখানে? কে তুমি?

সারকান বুঝতে পারে। না, কোনও ষড়যন্ত্র নয়। টুক করে উঠে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে।

খ্রীষ্টান সেনাপতি জবাব দেয়, মহামান্যা রাজকুমারী, ইরবিজা, আপনি কি এই যুবকের পরিচয় জানেন? ও হচ্ছে সারকান, বাগদাদের বাদশাহ উমর অল-নুমানের পুত্র। দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ। ছদ্মবেশে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে সে আমাদের এই দুর্গে প্রবেশ করেছে। উদ্দেশ্য গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা।

—কার কথা তুমি বলছো?

—আমি এই যুবকের কথাই বলছি, মহামান্য রাজকুমারী। ওর নাম সারকান।

—মিথ্যা কথা। ও একজন বিদেশী মুসাফির। আর তাছাড়া ছদ্মবেশে সে এখানে ঢোকেনি। আমি তাকে ডেকে নিয়েছি। সে আমার মাননীয় মেহেমান। কে তোমাকে বলেছে এসব বাজে কথা।

সেনাপতি সবিনয়ে বলতে থাকে, আপনি আমার ওপর রুষ্ট হবেন না, রাজকুমারী। আমি আপনার বাবার আজ্ঞাবহ দাস। তারই আদেশে সারকানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে এসেছি।

রাজকুমারী ইরবিজা প্রশ্ন করে, তাঁকে এই মিথ্যে খবরটা কে দিলো?

—আমাদের বাঁদী সর্দারণী।

—ওঃ, সেই ধুমসো বুড়ি বাঁদরীটা! বুঝেছি, কাল ওকে তুলে আছাড় মেরেছিলাম বলে আমার নামে লাগিয়েছে।

সেনাপতি বলে, না সে ভুল কথা বলেনি। ও যে সারকান তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। আপনি ওকে আমার হাতে তুলে দিন, এই আমার প্রার্থনা। আপনার বাবা হারদুবের হাতে তুলে দেব তাকে, এই আমার একমাত্র কর্তব্য। সারকানকে খতম করা মানেই আফ্রিদুনকে খতম করা। সম্রাট আফ্রিদুনের ক্ষমতা নাই, সম্রাট হারদুবের একগাছি চুল ছিঁড়তে পারে। তাই সে উমর অল-নুমানের কাছে হাঁটু গাড়তে বাধ্য হয়েছে। এখন সারকানই তার একমাত্র জোর। আমরা যদি সারকানকে শেষ করতে পারি, এ যুদ্ধে জয় আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। তাই আপনার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ, আপনি সরে দাঁড়ান। সারকানকে গ্রেপ্তার করতে দিন।

সিসারিয়া সম্রাট হারদুবের কন্যা ইরবিজার চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়।—কি তোমার নাম আর পরিচয়?

—আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাস, আমার নাম মাসুরা, আমার বাবার নাম মাউসুরা, তার বাবার নাম কাসিরদা। আমি আপনার বাবার পদাতিক সেনাবাহিনীর প্রধান।

ইরবিজা চিৎকার করে ওঠে, শোনো অবাধ্য মাসুরা, কে তোমাকে এখানে আসতে দিলো। আমার নিভৃত মহলে ঢোকার অধিকার কে দিলো তোমাকে? কেন ঢুকেছো? কার হুকুমে ঢুকেছো, জানতে চাই।

—আজ্ঞে, আমাকে তো কেউ প্রতিরোধ করেনি। কেউ বাধা দেয়নি।

—বাধা দেয়নি বলেই তুমি আমার অন্দর মহলে ঢুকে পড়বে? এতবড় স্পর্ধা তোমার কি করে হলো? তুমি জান, এর পরিণাম কী?

মাসুরা বলে, জানি হয়তো আমার প্রাণদণ্ড হবে। তবু আমি সম্রাটের আজ্ঞাবহ দাস। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য। আপনি এই যুবককে আমার হাতে তুলে দিন, রাজকুমারী।

রাজকুমারী ইরবিজা টেবিলে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বলে, ওই মিথ্যেবাদী শয়তানের জাসু হাড়ে হারামজাদী ধুমসো বুড়ি মাগীটার কথা তোমরা বিশ্বাস করলে? ওতো বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলতে ওস্তাদ। একথা একশোবার সত্যি আমাদের এই দুর্গপ্রাকারে একজন অচেনা মানুষকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে বিদেশী মুসাফির। সে আমার মেহেমান। তার সঙ্গে সারকানের কি সম্পর্ক? আর যদি সারকানও হয় তবু সে এখন আমার মাননীয় অতিথি। অতিথির অবমাননা কিছুতেই আমি সহ্য করবো না। দুনিয়াতে এমন কোনও শক্তি নাই তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমার কথা যদি তোমরা না শোনো, তবে আগে আমাকে মেরে ওকে ছুঁতে পারবে, এই বলে দিলাম। এটা জেনে রেখো, ইরবিজা কখনও মেহেমানের অসম্মান বরদাস্ত করে না। যার সঙ্গে বসে নুন রুটি খেয়েছি, তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না। ব্যস্, এর বেশী আর আমার কিছু বলার নাই মাসুরা, এবার তুমি আমার বাবার কাছে গিয়ে যা খুশি নালিশ করতে পারো। তার জবাব আমি তাকেই দেব। দয়া করে এই কথাটা তাকে বলো, ঐ বুড়ি বাঁদী সর্দারণীটা ডাঁহা মিথ্যে কথা বলেছে।

মাসুরা হাত জোড় করে প্রার্থনা জানায়, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, রাজকুমারী। আমি খালি হাতে ফিরে যেতে পারবো না। আপনার বাবা সম্রাট হারদুবের হুকুম, সারকানকে নিয়ে যেতেই হবে।

—মাসুরা, তুমি তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। তুমি আমার মাইনে করা চাকর। তোমাকে রাখা হয়েছে লড়াই করার জন্যে। যখন লড়াই করতে হুকুম করা হবে, তখন জান কবুল করেও তোমাকে তা করতে হবে। কিন্তু এটা লড়াই-এর ক্ষেত্র নয়। এ-সব তর্কসাপেক্ষ ব্যাপারের মধ্যে তোমার নাক না গলানোই ভালো। আর আমার কথা যদি তোমার অমান্য করতেই সাধ হয়, তার ফলও হাতে হাতেই পাবে। আমার এই মহামান্য অতিথিকে যদি তোমার সারকান বলেই সন্দেহ হয়, এবং আমার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তাকে যদি বন্দী করতেই চাও, সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই করবে। এর পরিণতির জন্যে আমাকে দোষারোপ করবে না। আমি তার হাতে এই ঢাল তলোয়ার তুলে দিচ্ছি, তোমারা একে একে এসো, লড়াই করো, হিম্মৎ দেখাও, তারপর ক্ষমতা থাকে তাকে জ্যান্ত অথবা মৃত অবস্থায় সম্রাটের কাছে নিয়ে যাও—আমার কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু একটা কথা সাবধান করে দিচ্ছি। একসঙ্গে একজনের বেশী আসবে না। সেটা কোনও বীরের কাজ নয়। বীরত্ব যদি দেখাতেই চাও, যদি প্রমাণ করতে চাও তুমি আমার বাবা সম্রাট হারদুবের যোগ্য প্রধান সেনাপতি তবে দলবল না নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এসো। দেখবো কার কতটা হিম্মৎ।

মাসুরা বিনীতভাবে বলে, একদিকে আপনার বাবা ক্রুদ্ধ হয়েছেন অন্যদিকে আপনিও ক্রোধান্বিত। এখন আমি উভয় সংকটে পড়েছি কাকে তুষ্ট করি। যাই হোক, আপনার প্রস্তাবই শিরোধার্য করে নিলাম। এক এক করেই হবে আমাদের অসির লড়াই। আমি সেনাদলের প্রধান। আমিই প্রথম লড়বো।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো রাত্রি অবসান হতে চলেছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

পঞ্চাশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হলো ঃ

মাসুরা বললো, আপনি উপযুক্ত কথাই বলেছেন, রাজকুমারী। বীর বীরের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লড়বো। আমি সেনা দলের প্রধান, আমিই প্রথমে লড়তে চাই।

ইরবিজা সতর্ক করে দেয়, কিন্তু তোমার পিছনে যারা আছে তাদের সবাইকে জানিয়ে দাও আমার শর্তের কথা। মনে রেখো, তোমাদের কেউ যদি এই শর্ত ভঙ্গ করে আমি আমার মেহেমানকে রক্ষা করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবো।

মাসুরা বলে, আপনার শর্তে আমরা রাজি, রাজকুমারী।

ইরবিজা একটু হাসলো, বললো, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত ছিলো, মাসুরা। এক নিরস্ত্র যুবককে বন্দী করতে একশোজন-এর এক বাহিনী আনতে হয়েছে? ছি ছি, কি লজ্জা।

ইরবিজা থামের পাশে গিয়ে সারকানকে তার প্রস্তাব জানালো। সারকান বললো, কিন্তু সুন্দরী, একজনের সঙ্গে লড়াই করা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ। এক সাথে অন্তত জনাদশেক লড়িয়ে না পেলে হাতের সুখ হয় না। যাইহোক, তুমি যখন প্রস্তাব দিয়েছো, তাই হবে।

এই বলে সে ঢাল তলোয়ার হাতে হারদুবের প্রধান সেনাপতির দিকে রুখে আসে। সারকানের প্রথম ঘা সে সামলে নিয়ে বসে পড়ে। মাথার উপর দিয়ে তলোয়ারখানা বোঁ করে ঘুরে আসে। এবার সারকান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্রগতিতে আবার এক কোপ মারে। এবারে আর মাসুরা এড়াতে পারে না। ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হয়ে যায়। প্রচণ্ড এক আর্তনাদ করে মাসুরার ধড়টা মেজের উপরে লুটিয়ে পড়ে।

ইরবিজা সারকানের এই বিক্রম দেখে মুগ্ধ হয়। লোক মুখে তার শৌর্য বীরত্বের অনেক গল্প গাথাই সে শুনেছিলো, মনে মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো তাকে। কিন্তু আজ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে সে-শ্রদ্ধা সহস্রগুণ বেড়ে গেলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, কি তার স্পর্ধা, এই মানুষটাকে কাল সে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেছিলো? এবার ইরবিজা চিৎকার করে ওঠে, কই আর কে আছো, এগিয়ে এসো।

মাসুরার এক ভাই আসে। দৈত্যের মতো চেহারা। দাঁত কড়মড় করতে থাকে। একমুহূর্ত। সাঁই করে চালিয়ে দেয় তলোয়ার। কিন্তু সারকানের এক ঘায়ে তার হাতের বাঁট হাতেই ধরা রইলো দ্বিখণ্ডিত তলোয়ার-এর টুকরো নিচে পড়ে গেলো। সারকান এক কোপেই শেষ করে দিতে পারতো। কিন্তু নিরস্ত্রকে আঘাত করা তার ধর্ম নয়। বললো, ওকে একখানা তলোয়ার দাও।

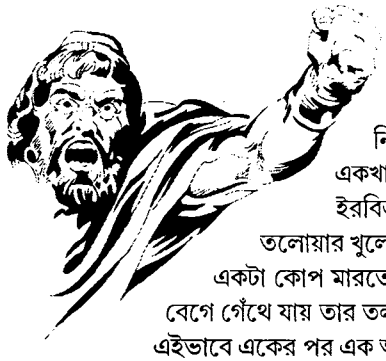

ইরবিজা অবাক হয়। দেওয়ালে টাঙানো একখানা তলোয়ার খুলে এনে মাসুরার ভাই-এর হাতে দেয়। কিন্তু তাক বুঝে একটা কোপ মারতে যায় কিন্তু তার আগে সারকানের তলোয়ার প্রচণ্ড বেগে গেঁথে যায় তার তলপেটে।

এইভাবে একের পর এক আসে। আর সারকানের এক এক কোপে খতম হতে থাকে। এইভাবে জনা পঞ্চাশ শেষ হয়ে গেলো। এবার আর কেউ শর্তের কথা মানলো না। সারকানকে খতম করতে এক সঙ্গে বাকী সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সারকানের বিক্রমের কাছে ইহা তুচ্ছ। সব কচুকাটা করে শেষ করে দিলো।

রাজকুমারী ইরবিজা উল্লাসে ফেটে পড়ে, দেখ, দেখ, আর কেউ বাকী রইলো কিনা।

বাঁদীরা বললো, না, মালকিন আর কেউ নাই। সব শেষে গুণে দেখা গেলো মোট আশীটা লাশ। বাকী জনা কুড়ি আহত হয়ে চৌ-দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেছে।

সারকান তলোয়ারের রক্ত পুঁছে নামিয়ে রাখলো। ইরবিজা এসে গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে সারকানের অধরে ছোট্ট একটি চুম্বন এঁকে দেয়। তারপর ওর হাত ধরে ঘরের

মাঝখানে এনে দাঁড় করায়। নিজের গায়ের শালখানা খুলে বাঁদীর হাতে দেয়। সারকান দেখে অবাক হয়, ইরবিজা রণ-সাজে সজ্জিতা। কোমরে ঝোলানো তরবারীখানা দেখিয়ে বলে, একেবারে খাঁটি ভারতীয় ইস্পাতে তৈরি। তুমি যখন লড়াই করছো, আমি পাশের ঘরে গিয়ে নিজেকে তৈরি করে এলাম। যদি তোমার কোন সাহায্য দরকার হয়। তা তুমি তো একাই একশো। তোমার আবার সাহায্য দরকার হবে কিসে!

এরপর দুর্গ প্রাকারের দ্বার-রক্ষীদের ডেকে ইরবিজা কৈফিয়ৎ তলব করে, আমার হুকুম ছাড়া অন্য লোককে ঢুকতে দিয়েছিলে কেন?

দ্বার-রক্ষীরা জবাব দেয়, সম্রাটের প্রধান সেনাপতিকে বাধা দেবার সাহস পাবো কি করে? সম্রাট যেখানে নিজে তাদের পাঠিয়েছেন, আমরা কি করতে পারি? আপনি আমাদের মালকিন ঠিক; কিন্তু আপনার ওপরে তো তিনি।

ইরবিজা দ্বার-রক্ষীদের এই উদ্ধত জবাবে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, কার ওপরে কে, আমি দেখাচ্ছি।

সারকানকে বললো, এই অবাধ্য প্রহরীদের কোনও প্রয়োজন নাই। ওদের তুমি খতম করো।

সারকানের তলোয়ারের কোপে তারা ধরাশায়ী হয়।

ইরবিজা বলে, এবার তোমাকে আমার নিজের কথা শোনাবো। আমার নাম ইরবিজা সে তো তুমি শুনেছো। আমার বাবা সিসারিয়া সম্রাট হারদুব। আর ঐ যে ধুমসো বুড়িটা—ও হচ্ছে আমার বাবার পুরোনো বাঁদী। একসময় বাবার খুব অসুখ হয়েছিলো, সেই সময় ওর সেবাযত্নে বাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন। সেই থেকে সে বাবার নেক-নজরে আসে। এই দুর্গের দেখাশুনার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হয় তার উপর। কিন্তু আমার সঙ্গে তার কোন দিনও বনিবনাও ছিলো না। আজকের এই ঘটনা সে বাবার কাছে চতুর্গুণ করে লাগাবে, আমি জানি। বাবার মনটা বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। হয়তো বলবে, আমি খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আমার একমাত্র রক্ষা আমি যদি দেশের বাড়িতে চলে যাই। এ ব্যাপারে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

সারকান ভাবে, এই মেয়েটির দৌলতেই আজ সে এতটা বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। তার নিজের বিপদ জেনেও তাকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এখন তার কর্তব্য তাকে রক্ষা করা। সারকান বলে, আমার ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে, তোমার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, ইরবিজা। কিন্তু তুমি কি তোমার বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চাও?

ইরবিজা বলে, এখন তা ছাড়া আর কোনও পথ নাই, সারকান। কারণ এর পরিণাম যা ঘটতে পারে, আমি অনুমান করতে পারি। আমার বাবাকে আমি জানি, তার ক্রোধ বড় মারাত্মক। সেখানে সন্তান-স্নেহ তুচ্ছ। তোমাকে আমার একটা কথা বলার আছে, আশা করি আমার অবস্থা বিবেচনা করে কথাটা তুমি শুনবে।

সারকান বলে, কি কথা বলো, তোমার কথা না শোনার মতো স্পর্ধা আমার নাই, ইরবিজা।

—তুমি আমার কথা শোনো, তোমার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাগদাদে ফিরে যাও।

—কিন্তু ইরবিজা, আমার বাবা উমর-অল-নুমান আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কনসতানতিনোপল-এর সম্রাট আফ্রিদুন আমার বাবার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তোমার বাবা সম্রাট হারদুব তাঁর জাহাজ আক্রমণ করে সব লুঠপাঠ করে নিয়ে যান। সেই জাহাজে অনেক ধনরত্ন বোঝাই ছিলো। এবং তার মধ্যে ছিলো অলৌকিক দৈব-শক্তি সম্পন্ন তিনখানা পাথর।

ইরবিজা বাধা দিয়ে বলে, তাহলে আসল ব্যাপারটা খুলে বলি শোনো। তোমরা তো একতরফাই শুনেছো। এবার আমার কথা শুনলে, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রতি বছর বড়দিনের সময় আমাদের—খ্রীষ্টানদের বিরাট উৎসব হয়। আমরা এই দুর্গে ফি বছর বছরের শেষ সাতটা দিন খুব জাঁকজমক করে আনন্দ উৎসব পালন করে থাকি। নানা দেশের সম্রাটদের নিমন্ত্রণ করা হয়। সপরিবারে তাঁরা আসেন। খুব হৈ-হল্লা, আমোদ প্রমোদ করে তাঁরা আবার দেশে ফিরে যান। একবার এই উৎসবে সম্রাট আফ্রিদুন তার কন্যা সফিয়াকে উপহার স্বরূপ আমার বাবার হাতে সমর্পণ করে যান। তুমি নিশ্চয়ই জানো, সেই সফিয়া এখন তোমার বাবার অন্যতম রক্ষিতা হয়ে বাগদাদের প্রাসাদে রয়েছে। এবং সম্প্রতি সে একটি সন্তানের জননী হয়েছে।

আমার বাবার সঙ্গে তখন তোমার বাবার খুব সদ্ভাব ছিলো। তিনি সফিয়াসহ আর পাঁচটি সুন্দরী গ্রীক কুমারীকে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন তোমার বাবার কাছে। সেই থেকে সে তোমার বাবার প্রাসাদেই আছে।

কিন্তু এদিকে বিপত্তি ঘটে। সম্রাট আফ্রিদুন ভাবলেন, আমার বাবা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে তার কন্যাকে অন্যত্র চালান করে দিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই দারুণ অপমান করে বাবাকে পত্র দিলেন তিনি। চিঠিখানার বয়ান মোটামুটি এই রকম ঃ

বছর দুই আগে তোমার হাতে আমার কন্যা সফিয়াকে সমর্পণ করে এসেছিলাম। আমার আশা ছিলো, যথাযোগ্য রাজসিক মর্যাদায় সে তোমার কাছে থাকবে। কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলাম, তুমি আমার উপহারের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করেছো। এখন সে তোমার কাছে নাই। এক ম্লেচ্ছ যবন সুলতানের হারেমে সে এখন নগণ্য বাঁদী। আমি মনে করি, এ তোমার ঔদ্ধত্য। এবং আমাকে অপমান করার কৌশল মাত্র। আমার পত্র পাওয়া মাত্র আমার কন্যা সফিয়াকে সসম্মানে আমার রাজধানীতে ফেরৎ দিয়ে যাবে। নচেৎ সমুচিত শাস্তি পেতে হবে। আমার এই পত্রের জবাব যদি না দাও, তার পরিণাম আরও খারাপ হবে।

চিঠি পড়ার পর বাবা চিন্তিত হলেন। অহেতুক যুদ্ধ-বিগ্রহ তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু তাই বলে, হত-বীর্য, কাপুরুষ তিনি নন। বাবা দেখলেন, এ ক্ষেত্রে আফ্রিদুনের সঙ্গে কলহ এড়ানো কঠিন। কারণ সফিয়াকে এখন ফেরৎ আনা সম্ভব নয়। সে সম্প্রতি উমর-অল-নুমানের সন্তানের জননী হয়েছে।

আমার বাবা বুঝলেন, ঝামেলা এড়ানো শক্ত। তবু শেষ চেষ্টা করলেন। আফ্রিদুনকে বুঝিয়ে সুজিয়ে চিঠি দিলেন। লিখলেন ঃ সফিয়াকে তিনি ইচ্ছে করে সেখানে পাঠাননি। বাগদাদ-সুলতানকে উপহার পাঠানো হয়েছিলো, পাঁচটি সুন্দরী কুমারী কন্যা। তাদের মধ্যে সফিয়া ভুল করে চলে গেছে। এটা কোনও ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। তবুও তাকে ফেরৎ হয়তো আনা যেতো, কিন্তু এখন সে উমর-অল-নুমানের সন্তানের জননী হয়েছে, আর তা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আফ্রিদুন যেন ব্যাপারটাকে অহেতুক জটিল না করে সহজ স্বাভাবিকভাবে মেনে নেন।

কিন্তু এর ফলে আফ্রিদুন শান্ত তো হলেনই না, বরং আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, কী, এত বড় স্পর্ধা, আমার মেয়ে মুসলমানের হারেমে তিনশো ষাটজনের একজন হয়ে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। আমার বাবার উপর প্রতিশোধ নেবার পাঁয়তারা ভাঁজতে লাগলেন। কিন্তু নামে সম্রাট হলে হবে কি, তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। না আছে ধনদৌলতের জোর, না আছে সেনা বল। অথচ ফুঁকো-আভিজাত্য আর দম্ভ আছে ষোল আনা। যাদের ভেতরটা ফাঁপা, অথচ বড়ফট্টাই বেশী তারা কিন্তু শয়তানের জাসু হয়। যত সব বদবুদ্ধির প্যাঁচ মাথায় ঘুরতে থাকে। আফ্রিদুন ফন্দী করলেন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। তাই তিনি নানারকম উপহার উপঢৌকনের ঘুষ পাঠালেন আপনার বাবার কাছে। আর সেই সঙ্গে বলে পাঠালেন এক আষাঢ়ে গল্প, তার তিনখানা ধনদৌলতে ঠাসা জাহাজ নাকি আমার বাবা লুঠপাঠ করে

নিয়ে গেছেন। এবং তার হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত মেরে শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু আফ্রিদুনের রাজত্বের হাল যাদের জানা আছে তারা একথা কি করে বিশ্বাস করবে। তার এমন কোনও ধনদৌলত নাই যা একটা জাহাজও বোঝাই হতে পারে। আর হাজার হাজার সৈন্য? সে তো তার স্বপ্ন লোকের কল্পনা। তার গোটা রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা সাকুল্যে হাজারখানেক হবে কিনা সন্দেহ। তার মধ্যে হাজার সৈন্য যদি মারাই গিয়ে থাকে তবে নিজের সুরক্ষা ঠিক রাখবে কি করে?

তোমার বাবা অত ঘোর প্যাঁচের মানুষ নন। তিনি আফ্রিদুনের এই চাল বুঝতে পারেননি। ভেবেছেন, বিপদের সময় সাহায্য চাইলে এগিয়ে যাওয়াই বীরের ধর্ম। কিন্তু বীরত্ব আর রাজনীতি তো এক বস্তু নয়, সারকান। তোমার বাবা বিশ্ববিজেতা যোদ্ধা। রাজ্য জয় করতে গেলে বীরত্ব বিক্রমই প্রধান, কিন্তু রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে রাজনীতিজ্ঞ হতে হবে।

আফ্রিদুন তোমার দশ হাজার সৈন্য এনে ফেলেছে তার কব্জায়। এমন ফাঁদে তোমাকে তিনি ফেলবেন, তুমি আর বেরুতে পারবে না। জানো তো বুদ্ধির বলের কাছে দেহের বল তুচ্ছ। আবার সে বুদ্ধি যদি শয়তানের বুদ্ধি হয়। কি ভাবে কেমন করে তোমার সব সৈন্য তিনি রাতারাতি খতম করে দেবেন, তুমি টেরও পাবে না।

তুমি বলছিলে না? তিনটি দৈব শক্তিসম্পন্ন গ্রহরত্ন ছিলো সেই জাহাজে? আসলে ঐ গ্রহরত্ন তিনটি তার কন্যা সফিয়ার কাছেই ছিলো। গ্রীসে যাওয়ার পর সেগুলো সে আমার বাবার হাতে তুলে দেয়। সত্যিই, অবাক হতে হয়, পাথর তিনটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ধারণ করলে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হতে পারে। বাবার অলক্ষ্যে আমি ঐ পাথরগুলো চুরি করে নিয়েছি। সময় মতো তোমাকে দেখাবো একদিন। সে যাকগে, তুমি আর এক মুহূর্ত দেরি করো না। ছাউনিতে ফিরে যাও। সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে পড়ো।

সারকান বলে, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে, ইরবিজা। আমি আর কাল-বিলম্ব করতে চাই না। তোমার এই মূল্যবান উপদেশ না পেলে কী সর্বনাশই যে ঘটতো, ভাবতে শিউড়ে উঠছি। কিন্তু সুন্দরী, তোমাকে এখানে ফেলে রেখে কিছুতেই যাবো না আমি। আজ যা ঘটে গেছে তার পরিণতি বড়ই মারাত্মক। তোমাকে এখানে রেখে গেলে আর আস্ত রাখবে না তোমার বাবা। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। আজই আমরা বাগদাদে রওনা হয়ে যাই।

ইরবিজা এক মুহূর্ত কি ভাবলো।—ঠিক আছে, তুমি তোমার ছাউনি গোটাতে থাকো। লোকলস্কর রওনা করে দাও। আমি তিনদিনের মধ্যেই তোমার কাছে যাচ্ছি। তারপর দু'জনে বাগদাদে রওনা হবো।

ইরবিজা সারকানের বুকে মাথা রেখে কাঁদলো। সারকানের চোখেও জল আসে। বাঁদী ঘোড়া এনে দেয় সারকানকে। বিদায় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছু দূরে যেতেই সারকান দেখে, তিনজন ঘোড়সওয়ার তার দিকে ছুটে আসছে। শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় সে তলোয়ার খুলে বাগিয়ে ধরে। কিন্তু না, কাছে আসতে দেখা গেলো, তার উজির দানদান আর দুই বিশ্বস্ত আমীর। যথারীতি আদব কায়দা দেখিয়ে তারা কাছে এসে দাঁড়ালো। উজির দানদান বললে, কী ব্যাপার আজ তিনদিন ধরে তোমার কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তো দুশ্চিন্তায় ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি। না জানি কী বিপদ হলো। সৈন্যদের মধ্যেও দারুণ আতঙ্ক। তারা বুঝতে পারছে না, তোমার কী হলো।

সারকান তখন আফ্রিদুনের ষড়যন্ত্রের কাহিনী বললো। আফ্রিদুন ফাঁদ পেতেছে। উদ্দেশ্য, তার সৈন্যবাহিনী সাবাড় করা। এই সময়ে ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে আসা ঠিক হয়নি। সারকান বলে, আর দেরি নয়, এখুনি আমাদের ছাউনিতে পৌঁছতে হবে।

তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা ছাউনিতে এসে পৌঁছয়। না, সব ঠিকই আছে। কোনও বিপদ আপদ ঘটেনি। সারকানের হুকুমে তখুনি তাঁবু উঠানো হলো। উজির দানদানকে বললে, আপনি এদের নিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে পড়ুন। আমি এখানে আরও তিন দিন থাকবো। আমার সঙ্গে থাকবে শুধু একশোজন সেনাপতি। বাকী সব আপনি নিয়ে যান।

সৈন্যসামন্তরা খানাপিনা শেষ করে নিলো। ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চরদের দানাপানি খাওয়ানো হলো। তারপর মাত্র একশোজন সেনাপতি রেখে সমস্ত সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে দানদান রওনা হলো।

সারকান দাঁড়িয়ে দূরে পাহাড় শীর্ষে প্রত্যক্ষ করে শ'খানেক ঘোড়সওয়ার তার দিকেই ধাবমান। শত্রুশঙ্কায় সেও তার সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো। কাছে আসতে দেখা গেলো, সারকানের আশঙ্কা অমূলক নয়, সত্যিই একশো যোদ্ধার এক অশ্বারোহী বাহিনী। দূর থেকে হুঙ্কার ছাড়লো তারা, শোনো মুসলমানের ছেলেরা, শান্ত সুবোধ বালকের মতো তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ো। না হলে, মেরী আর জোনের নাম বলছি, একেবারে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।

সারকান অবাক বিস্ময়ে শোনে। ক্রোধে চোখ লাল হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে। চোয়াল কঠিন হতে থাকে।—ওরে খ্রীষ্টানের বাচ্চা, কুকুর, তোদের এত বড় দুঃসাহস, আমারই এলাকায় এসে আমাকেই ধমকাচ্ছিস। ঘাড়ে কটা করে মাথা আছে রে? দাঁড়া এখুনি মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি। এখনও ভালোয় ভালোয় বলছি ভালোয় ভালোয় মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যা। তা না হলে জন্মের সাধ মিটিয়ে দেব এখুনি।

তারপর সারকান তার সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বলে, আল্লাহর নাম করে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শয়তানগুলোকে সমুচিৎ শিক্ষা দিয়ে দাও।

নিমেষে দুই দলে প্রচণ্ড লড়াই বেঁধে গেলো। ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার, অসির সঙ্গে অসির, মানুষের সঙ্গে মানুষের আঘাত প্রত্যাঘাতে কেঁপে উঠলো সারা পাহাড় উপত্যকা। ধূলী বালীতে অন্ধকার হয়ে এলো চতুর্দিক। এইভাবে সন্ধ্যা নেমে আসে। অন্ধকার ছেয়ে যায়। হঠাৎ দেখা গেলো, হানাদাররা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সারকান শুনে খুশি হলো, তার দলের কেউই হতাহত হয়নি।

সারকান তার সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বলে, বন্ধুগণ, আজ আমরা অতর্কিত আক্রান্ত হয়েছিলাম, যাক আল্লাহর দোয়ায় কারুরই তেমন কোন আঘাত লাগেনি। কিন্তু যারা এসেছিলো রাতের অন্ধকারে ফিরে গেলেও কাল সকালে যে আবার হানা দেবে না তার কোনও ভরসা নাই। সুতরাং সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তাঁবুর বাইরে পালা করে পাহারায় থাকো। বাকী সবাই রাতের মতো ঘুমিয়ে শরীরকে চাঙ্গা করে নাও। কাল সকালে আরও বীরবিক্রমে লড়াই করতে হবে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা খুবই ভালো; কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি ভালো, শত্রুর শক্তি খাটো করে না দেখা। আমরা একশোজন, তারাও মাত্র একশোজনই ছিলো, তা সত্ত্বেও আমরা তাদের ঘায়েল করতে পারলাম না। সুতরাং মনে হচ্ছে, তারাও কিছু কম বাহাদুর নয়। যাই হোক, খানাপিনা সেরে রাতের মতো ঘুমিয়ে নাও।

এদিকে খ্রীষ্টান যোদ্ধারা তাদের সেনাপতিকে ঘিরে বলে, আজ তো আমরা কিছু করতে পারলাম না। মনে হচ্ছে অত সহজে ওদের কাবু করা যাবে না।

সেনাপতি বলে, ঠিক আছে, ঘাবড়াচ্ছো কেন? কাল সকালে আবার নতুন কায়দায় আক্রমণ চালাতে হবে। এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নাই। ঘুমিয়ে পড়ো।

পরদিন সকালে সারকান সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে সামনের পাহাড়ের পথে এগোতে থাকে।—মনে হচ্ছে, বাছাধনরা কাহিল হয়ে পড়েছে। তা না হলে এতটা বেলা হয়ে গেলো কারো পাত্তা নাই কেন?

একজন বলে, জানের মায়া তো সকলেরই আছে, হুজুর। জেনে শুনে কে আর মাথা এগিয়ে দিতে আসে। জানে তো আজ গেলে কচু কাটা হতে হবে। কাল ওরা হঠাৎ এসে হানা মেরেছিলো, আজ তো আর তা হচ্ছে না। আমরা রীতিমতো তৈরি। আসুক না, মাথা রেখে যেতে হবে।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমরা বড্ডো বেশী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছো। কে জানে, হয়তো ওদের অন্য কোনও প্যাঁচ আছে। তোমরা এক কাজ করো, এক এক করে এগিয়ে যাও। পাহাড়টার ওপারেই মনে হচ্ছে ওরা ডেরা গেড়েছে। একা পেয়ে হয়তো তেড়ে আসতে পারে। তখন তো আমরা পিছনেই আছি। এইভাবে ওদের ফাঁদে এনে ফেলতে হবে।

সারকানের নির্দেশ মতো একজন ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের পথে উঠে যায়। চিৎকার করতে থাকে, কই হে কে আছো, নেকড়ের বাচ্চারা, বেরিয়ে এসো। তোমাদের যম হাজির।

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো, একটা দড়ির ফাঁস এসে এঁটে গেলো তার গলায়। সারকান সেনাপতি দেখলো, অদূরে ঘোড়ার পিঠে এক বর্ম শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক সুদর্শন যোদ্ধা। ফাঁসের দড়িটা তার হাতের মুঠোয় ধরা। এক ঝটকায় নিয়ে ফেলে দিয়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে গুহার দিকে নিয়ে চললো।

এদিকে সারকান চিন্তিত হলো। আর একজনকে হুকুম করলো, যাও—দেখ, ওর কি হলো। তারও আসতে দেরি দেখে আরও একজন এগিয়ে যায়। এইভাবে সারাদিনে কুড়িজন সারকান সেনাপতি পাহাড়ের ওপারে গিয়ে আর ফিরে এলো না। সারকান অবাক হয়। কী ব্যাপার। তার সব দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। একটার পর একটা গেলো—আর ফিরলো না। দিন শেষ হয়ে এলো। এখনই রাত্রির কালো ছায়া নামবে। এ অবস্থায় আর এগোনো ঠিক হবে না মনে করে তাঁবুতে ফিরে আসে। ক্রোধে সারা শরীর জ্বলতে থাকে। মনে মনে ঠিক করে, কাল সকালে সে এর উপযুক্ত জবাব দেবে। আর অন্য কাউকে নয় নিজেই যাবে পাহাড়ের ওপারে। দেখবে কত বড় লড়িয়েরা সেখানে আছে। সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বলে, তোমরা আজকের মতো বিশ্রাম করো। ঘাবড়াবার কিচ্ছু নাই, কাল আমি নিজে লড়বো ওদের সবার সঙ্গে, দেখি কত বড় বীরপুরুষ তারা। কৈফিয়ৎ চাইবো, কেন তারা আমাদের এলাকার মধ্যে ঢুকেছে। যদি ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে নিতে চায় ভালো, না হলে, লড়াই করার শখ ঘুচিয়ে দেব জন্মের মতো।



পরদিন সকালে সারকান একাই উঠে যায় পাহাড়ের পথে। ওপারে এক উপত্যকায় গিয়ে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে শত্রু শিবিরের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বুঝতে পারলো প্রায় পঞ্চাশজনের এক পদাতিক বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলেছে। প্রত্যেকেই বর্ম-শিরস্ত্রাণ পরিহিত। উদ্যত তরবারী হাতে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়লো। দলের সামনে তাদের প্রধান। উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে। ঘোড়ার লাগাম টেনে সেও দাঁড়ালো। হুঙ্কার দিয়ে পরিষ্কার আরবী ভাষায় বললো, যুদ্ধবাজ সারকান, এবার তোমার মৌৎ হাজির। লড়াই-এর জন্যে প্রস্তুত হও। আমরা দু'জনেই দুই বাহিনীর প্রধান। সম্মুখ সমরে আমাদের মধ্যে যে জিতবে, সব সৈন্যসামন্ত তার বশ্যতা স্বীকার করবে। নাও, আর দেরি কেন, এসো।

সারকানের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। সিংহের মতো গর্জে ওঠে। তলোয়ারে

তলোয়ারে লড়াই শুরু হয়। ইস্পাতে ইস্পাতে ঘর্ষণে ক্ষণে ক্ষণেই আগুনের ফুলকী ঠিকরে বেরুতে থাকে। যাকে বলে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। কেউই কাউকে কাবু করতে পারে না। এইভাবে দিনের আলো ফুরিয়ে আসে। সে দিনের মতো রণে ভঙ্গ দিয়ে যে যার ডেরায় ফিরে যায়।

সারকান অবাক হয়ে ভাবতে থাকে। তার সমকক্ষ বীরপুরুষ তামাম দুনিয়ায় তো কেউ নাই। তবে কেন সে তাকে কাবু করতে পারলো না? তার যে-সব মোক্ষম মার ডাকসাইটে জাদরেল যুদ্ধবাজরাও এড়াতে পারে না, মনে হলো, অতি সহজে সেগুলো পাশ কাটিয়ে গেলো সে।

পরদিনও সারাদিন ধরে চললো তাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। কিন্তু না, সারকান পরাস্ত করতে পারে না। আক্রোশে, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুতে ফিরে যায়। পরদিন আবার তারা রণক্ষেত্রে হাজির হয়। এইদিন খ্রীষ্টান সেনাপতি এক সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে যায়। সারকান তলোয়ার বাগিয়ে ধরে। কোপ মারতে যাবে, এমন সময় হাত তুলে সে থামতে বলে, থামো, তুমি না বিশ্ববিজেতা উমর অল-নুমানের পুত্র সারকান। তোমার মতো বিক্রম বীর নাকি সারা আরব দুনিয়ায় নাই। এই তোমার বীরত্ব! একটা অসহায় নিরস্ত্র নারীর ওপর তলোয়ার চালাতে লজ্জা করে না তোমার।

সারকান হতভম্ব হয়ে পড়ে।

—ইরবিজা—তুমি? আমি তো চিনতেই পারিনি, সোনা?

—হ্যাঁ, আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। যার সঙ্গে আমি যাবো, চিরকাল যার কাছে থাকবো, তাকে একটু বাজিয়ে দেখে নেবো না? কতটা তার হিম্মৎ। এই যে আমার সৈন্যসামন্ত দেখছো, এরা সবাই নারী। এরাই তোমার বিশজন সেনাপতিকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে আমার হাত তুলে দিয়েছে। ভয় নাই। তাদের কোনও ক্ষতি করিনি। বেশ আদর যত্নেই আমার শিবিরে তারা রয়েছে।

সারকান ঘোড়া থেকে নেমে ইরবিজাকে জড়িয়ে ধরে। চুমু খায়।—এইভাবে আমার সঙ্গে লড়াই করলে? যদি আমার একটা মারও ঠেকাতে তোমার পলকমাত্র দেরি হতো, আমি ভাবতে পারছি না সোনা, কি অঘটনই না ঘটে যেতো। আল্লাহ মেহেরবান, তিনিই রক্ষা করেছেন।

ইরবিজা একজনকে নির্দেশ করলো, সারকানের বন্দীদের এখানে নিয়ে এসো। দেখবে, কোনও অসম্মান যেন না হয়।

এর পর তারা দু'জনে দুশো সৈন্যসামন্তের বাহিনী নিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে যায়।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একান্নতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার গল্প শুরু করে।

সারকান ইরবিজার সহচরীদের বলে, তোমরা রণসাজ খুলে ফেলো। নিজের নিজের পোশাকে সেজে নাও।

সারকান তার কয়েকজন সেনাপতিকে বললো, তোমরা তীরগতিতে বাগদাদের পথে পাড়ি দাও। সুলতান উমর অল-নুমানকে সংবাদ দাও আমরা আসছি।

সে রাতটা তারা ওখানেই তাঁবুতে কাটালো। পরদিন সকালে উঠে গোসল এবং খানাপিনা সেরে রওনা হলো।

বিশ দিনের পথ অতিক্রম করে অবশেষে তারা বাগদাদে এসে পৌঁছয়। উজির

দানদান তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করার জন্যে শহরের প্রবেশ মুখে এক হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী দাঁড় করিয়েছিলো। সারা শহর আর তোরণদ্বার আলোর মালায় সাজানো হয়েছিলো।

দরবারে ঢুকেই যথাবিহিত কুর্নিশ জানায় সারকান। উমর অল-নুমান পুত্রকে পেয়ে খুশি হয়। ইরবিজার সঙ্গে সারকানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানায় তার বাবাকে। ইরবিজা সম্রাট হারদুবের কন্যা। তাকে বলতে গেলে, শয়তান আফ্রিদুনের ফাঁদ থেকে বাঁচিয়েছে। তার নানা গুণের কথা বলতে বলতে সারকান-এর বুক গর্বে ফুলে ওঠে। ইরবিজার মতো সর্বগুণসম্পন্না মেয়ে তামাম দুনিয়াতে কোথাও নাই। সারকানকে সে যেমন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, তেমনি তার অসাধারণ রণকৌশল দেখেও সে বিস্মিত হয়েছে। দুনিয়াতে এমন কোন যোদ্ধা নাই যে তার অব্যর্থ অসির আঘাত প্রতিহত করতে পারে, কিন্তু ইরবিজা এমনই দক্ষ যে, সে সব মারের প্যাঁচ অতি সহজেই সে পাশ কাটিয়ে দিয়েছে।

উমর অল-নুমান-এর মনে পাশবিক প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। অনেক দিন সে নতুন মেয়ের স্বাদ পায়নি। সারকানের মুখে ইরবিজার অসাধারণ রূপ আর যৌবনের কথা শুনে ধৈর্য আর বাঁধ মানে না।

—তাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো, আলাপ করতে চাই।

সারকান বাবার অভিপ্রায় আঁচ করতে পারে না। বললো, এখুনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, জাঁহাপনা।

একটু পরে ইরবিজা এসে আভূমি আনত হয়ে উমরকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। সুলতানের ইশারায় দরবার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো সবাই। শুধু রইলো ইরবিজা, খোজা আর উমর অল-নুমান?

উমর প্রশ্ন করে, তোমার নাম কী?

—ইরবিজা।

পরিষ্কার আরবী ভাষায় জবাব দিলো।



—তোমার বাবা?

—সিসারিয়া সম্রাট হারদুব।

—তা হলে তুমি তো খ্রীষ্টান!

—জী হুজুর।

এখানে এসেছো কি অভিপ্রায়ে, সুন্দরী।

এই 'সুন্দরী' সম্বোধনে ইরবিজা বিস্মিত হয়।—আপনি আমাকে ইরবিজা বলেই ডাকবেন, জাঁহাপনা।

—কেন সুন্দরীকে সুন্দরী বলা কি অন্যায়?

—আপনি মহানুভব শাহেনশাহ, আপনার ন্যায় অন্যায়ের বিচার কি আমি করতে পারি? তবে আমি আপনার মেয়ের তুল্য। তাই বলছিলাম—

উমর অল-নুমান-এর অট্টহাসিতে শূন্য দরবার মহল চকিত হয়ে ওঠে।—একই নারী কারো মা, কারো কন্যা, আবার কারো বা ভগ্নী হতে পারে। তা আমার তোমার সম্পর্কটা না হয় পরেই ঠিক করা যাবে। থাক ওসব কথা, শুনলাম আমার ছেলে সারকানকে তুমি খুব সাহায্য করেছো। তোমার বুদ্ধির জোরেই সে আফ্রিদুনের ফাঁদ থেকে কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এবং এ-ও শুনলাম রণ-বিদ্যায় তুমি নাকি পারদর্শী? তা শিখলে কার কাছে?

—আমার বাবা—তিনিই আমাকে হাতে ধরে ধরে সব শিখিয়েছেন। বাবার আমি একমাত্র সন্তান। ছেলে নাই বলে তিনি আমাকে ছেলের মতো করেই মানুষ করেছেন।

উমর অল-নুমান ইরবিজাকে ডেকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আফ্রিদুনের সেই অলৌকিক পাথর তিনখানা নাকি তোমার কাছেই আছে?

—হ্যাঁ হুজুর, আমি সঙ্গে করেই এনেছি।

—একবার দেখাবে?

—নিশ্চয়ই। ওগুলো তো আপনাকে উপহার দেব বলেই নিয়ে এসেছি। আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।

খোজাটাকে বললো, মতিয়াকে বলো, সে যেন আমার হাত বাক্সটা নিয়ে আসে।

মতিয়া একটা ছোট্ট রূপোর বাক্স নিয়ে এসে ইরবিজার হাতে দেয়। বাক্সটা খুলে তার মধ্য থেকে আরও ছোট একটা সোনার বাক্স বের করলো ইরবিজা। এই বাক্সে রাখা ছিলো সেই দৈব-শক্তিসম্পন্ন পাথর তিনখানা। বাক্সটা সুদ্ধ সে উমর অল-নুমানের দিকে এগিয়ে দেয়।—জাঁহাপনা, এই আমার সেলামী—

উমর-এর চোখ নেচে ওঠে। এই মাণিক্যের কথা সে বহুকাল ধরে শুনে আসছে। আজ তার হাতের মুঠোয় এসে গেলো। বাক্সটা সুদ্ধ ইরবিজার হাতখানা সে চেপে ধরে। ইরবিজা অস্বস্তি বোধ করে। বাক্সটা হাতে তুলে দিয়ে প্রায় জোর করেই হাতটা ছিনিয়ে নেয়। উমরের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তলোয়ার-ধরা হলে কি হয়, হাতটা তোমার ফুলের কলির মতো নরম।

ইরবিজার এ-সব কথা ভালো লাগে না। উঠে পড়ে বলে, এবার যদি অনুমতি করেন জাঁহাপনা, আমি তবে আসি?

উমর বলে, তোমার এবং তোমার সহচরী দাসীদের জন্যে আমি প্রাসাদের একটা মহল সাজাতে বলে দিয়েছি। আজ থেকে ওখানেই তুমি থাকবে।

ইরবিজা কুর্নিশ করে বলে, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

খোজা এবং মতিয়াকে সঙ্গে করে সে দরবার ত্যাগ করে নিজের মহলে চলে যায়।

উমর অল-নুমান সারকানকে ডেকে পাঠায়। সারকান এসে কুর্নিশ জানায়। একখানা পাথর এগিয়ে দিয়ে উমর বলে, এটা তোমার কাছে রাখো।

সারকান বলে, আর দু'খানা কি হলো জাঁহাপনা?

উমর বলে, একখানা দেব তোমার বোন নুজাৎকে। আর একখানা রইলো তোমার ছোট ভাই দু-অল-মাকান-এর জন্যে।

—দু-অল-মাকান?

—হ্যাঁ, তোমার ছোট ভাই, নুজাতের সহোদর। তুমি জানো না?

সারকান বলে, জী না। আমি তো শুনেছিলাম, আমার একটা শুধু বোন হয়েছে।

উমর বললো, তুমি নুজাতের কথা শুনেই বাইরে চলে গেছো। কিন্তু তার পরেই সফিয়া আর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। মাকান আর নুজাৎ যমজ ভাই বোন।

সারকানের মুখ কালো হয়ে যায়। এত বড় দুঃসংবাদ শুনবে, আশা করেনি। সারকানকে বিষণ্ণ দেখে উমর বলে, কিন্তু এতে তোমার মন খারাপ করার কি আছে, সারকান! আমি অনেক আগেই ফরমান জারি করে দিয়েছি, তুমিই হবে আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সুতরাং তোমার তো মন খারাপ করার কোনও কারণ নাই।

সারকান নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আল্লাহ ওদের সুখে রাখুন।

আবার কুর্নিশ জানিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে সে ইরবিজার কাছে যায়। সারকানকে চিন্তিত দেখে ইরবিজা জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন, সারকান? কোনও খারাপ খবর আছে নাকি?

সারকান বলে, খারাপ কিনা জানিনা, তবে সুখবর নয়। এতদিন জানতাম আমার একটি ছোট বোন আছে। নুজাৎ। কনসতান্তিনোপোল-এর সম্রাট কন্যা সফিয়া তার মা। কিন্তু আজ শুনলাম সফিয়া একটি পুত্র সন্তানেরও জন্ম দিয়েছে। সে এখন এই প্রাসাদেই সফিয়ার কাছে মানুষ হচ্ছে। কিন্তু এ-ই আমার মন খারাপের একমাত্র কারণ নয়, ইরবিজা। আসল কারণ—তোমাকে বোধহয় হারাবো আমি!

—কী? কি বলছো তুমি সারকান? সব ছেড়েছুড়ে শুধু তোমার জন্যেই এখানে এসেছি। সেই তোমাকেই যদি ছাড়তে হয়, তবে আর এখানে থাকবো কিসের জন্যে? কেন, কি হয়েছে?

সারকান ধীরে ধীরে বলে, তোমাকে দেখে বাবার লোভ হয়েছে।

ইরবিজা চমকে ওঠে। তাহলে তার আশঙ্কা মিথ্যা নয়। উমরের চোখে ইরবিজা দেখেছিলো লালসারই আগুন।—কিন্তু সারকান, এও শুনে রাখো, আমি সম্রাট হারদুবের কন্যা। যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ আছে সজ্ঞানে আমার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না সে। আমার যুযুৎসুর প্যাঁচ তুমি দেখেছো, আমার তলোয়ারের মার তোমার অজানা নাই। প্রয়োজন হলে, সে তোমার বাবাই হোক আর যেই হোক, তার সদ্ব্যবহার করতে কসুর করবো না। ও নিয়ে তুমি কোনও দুর্ভাবনা করো না সারকান। নিজেকে রক্ষা করার মতো ক্ষমতা আমার আছে। আমি তোমার বাবার তিনশ একষট্টিতম রক্ষিতা হয়ে আমার জীবন বরবাদ করে দেব না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো। তাকে খুশি করার তো মেয়ের অভাব নাই। তবু আমার দিকে তার এই লোভ কেন?

—নেশা। নতুন নারী-সম্ভোগের নেশা তার রক্তের কণায় কণায়, যাই হোক, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

এর পর ইরবিজা আর সারকান খানাপিনা করলো। সারকান বললো, আমি দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার দেখা করবো।

সারকান প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই উমর আসে সফিয়ার কামরায়। সফিয়া তার দুই সন্তান নুজাৎ আর দু-অল-মাকানকে নিয়ে প্রাসাদের এই কক্ষে বাস করে। সুলতানকে এই অসময়ে তার কামরায় আসতে দেখে সফিয়া অবাক হয় যেমন, খুশি হয় তার চেয়েও বেশী।

জাঁহাপনা এ-সময়ে বাঁদীকে মনে পড়লো।

উমর বলে, তুমি যে কনসতান্তিনোপল-এর সম্রাট আফ্রিদুনের কন্যা, সে কথা আমাকে আগে বলো নি কেন সফিয়া?

—কেন, তাতে কী?

—তুমি সম্রাটের কন্যা। তোমার যোগ্য সম্মান আমি তোমাকে দিতে পারিনি।

রক্ষিতা করে রেখে তোমার উপর অবিচার করেছি। বেগমের মর্যাদা তোমার প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু তোমার পরিচয় আমি জানতে পারিনি, তাই বাঁদী করে রেখেছি।

—আপনি মহানুভব শাহেনশাহ। আমার তো কোনও অসম্মান অমর্যাদাই আপনি করেন নি। বেগম যে ইজ্জৎ পায় আপনি কি তার চেয়ে কিছু কম ইজ্জৎ করেছেন আমাকে? এই ফুলের মতো দু'টো সন্তান আমাকে উপহার দিয়েছেন। একটা মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে? আপনি মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না, জাঁহাপনা। দুনিয়াতে আমার মতো সুখী, আমার মতো ভাগ্যবতী ক'জন আছে?

সফিয়ার কথায় উমর খুশি হয়। নুজাৎ আর দু-অল-মাকানকে কাছে টেনে আদর করে। সফিয়ার হাতে পাথর দু'খানা তুলে দিয়ে বলে, চিনতে পারছো?

পাথর দু'খানা হাতে নিয়ে সফিয়া বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আর আধখানা কোথায়, জাঁহাপনা?

—সারকানকে দিয়েছি। এ দু'খানা নুজাৎ আর মাকান-এর গলায় পরিয়ে দাও।

সফিয়া খুশি হয়ে বলে, খুব ভালোই করেছেন। ও পাথর কাছে থাকলে কোন অসুখ বিসুখ হয় না। এই পাথর তিনখানা আমার বাবা আমাকে যৌতুক দিয়েছিলেন। আমি সম্রাট হারদুবের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। জানি না আপনার হাতে কি করে এলো?

—তোমার কি ধারণা, সম্রাট হারদুব আমাকে উপহার পাঠিয়েছেন?

—অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু শুনেছি, আমার বাবার সঙ্গে সম্রাট হারদুবের এখন শত্রুভাব চলছে। আর জাঁহাপনা নাকি আমার বাবাকে সাহায্য করতে সারকানের সঙ্গে দশ হাজার সৈন্যসামন্ত পাঠিয়েছিলেন। বুঝতে পারছি না, এই অবস্থায়, হারদুবের হাত থেকে পাথর তিনখানা আপনার হাতে এলো কি করে? তবে কি সম্রাট হারদুব পরাজিত।

উমর জবাব দেয়, না, যুদ্ধ তার সঙ্গে হয় নি।

সফিয়া অবাক হয়, তবে?

—সম্রাট হারদুবের কন্যা ইরবিজা এখন আমার হারেমে। এ পাথর তার কাছেই ছিলো। আমাকে সে উপহার দিয়েছে।

—ইরবিজা? সম্রাট হারদুবের একমাত্র সন্তান? সে আপনার হারেমের বাঁদী হয়েছে?

—একটু বাড়িয়ে বললে সফিয়া। সে আমার হারেমে অবস্থান করছে বটে, কিন্তু বাঁদী বা রক্ষিতা কিছুই সে এখনও হয়নি। হয়নি তবে হবে।

—জাঁহাপনা কি তাকে বেগম করে রাখবেন?

—তোমার আপত্তি আছে?

—না, আপত্তি কেন থাকবে! সে সম্রাট হারদুবের মেয়ে, বেগমের ইজ্জৎই তার পাওনা।

—আর তোমার?

সফিয়া বলে, আমাকে আপনি বাঁদী করেই রাখুন আর রক্ষিতা করেই রাখুন, আমি যে ইজ্জৎ পেয়েছি তাতে আর আমার কোন ক্ষোভ নাই।

উমর বলে, ইরবিজাকে এখনও কোনও প্রস্তাব আমি দিইনি। হয়তো সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করতে পারে।

সফিয়া বিস্ফারিত চোখে তাকায়।—শাহেনশাহ উমর অল-নুমানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস তার হবে কি করে?

উমর বলে, তার মতো তেজস্বী মেয়ের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু সফিয়া, তাকে দেখা ইস্তক আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। অমন রূপ হয়তো তোমাদের অনেকেরই

আছে, কিন্তু ঐরকম উদ্দাম যৌবন আমি কোনও মেয়ের মধ্যে দেখিনি। যেভাবেই হোক তার দেহ আমার চাই-ই। সে যাক, আজ আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে।

—হুকুম করুন জাঁহাপনা।

—হুকুম নয় নয় সফিয়া, আদর আর ভালোবাসার উপহার স্বরূপ তোমার জন্যে নতুন এক প্রাসাদের ব্যবস্থা করেছি। এই রক্ষিতামহলে আর তুমি থাকবে না। তুমি আমার নুজাৎ আর মাকান-এর মা। এখন থেকে তুমি আমার বেগম—তোমার যোগ্য মর্যাদায় তুমি থাকবে তোমার নিজের প্রাসাদে। দেওয়ানকে আমি বলে দিয়েছি, তোমার ঘরদোর মন মতো করে সাজিয়ে দেবে। দাসী বাঁদী খোজা যা দরকার সব চাওয়া মাত্র পাবে। তোমার জন্যে দশ হাজার দিনার মাসোহারা মঞ্জুর করেছি।

আনন্দে সফিয়ার চোখ নেচে ওঠে। গর্বে ভরে ওঠে বুক। মুখে বলে, আপনার ভালোবাসা যখন পেয়েছি, প্রাসাদের বিলাস বৈভবে আর কি প্রয়োজন ছিলো জাঁহাপনা! কিন্তু আপনি দিচ্ছেন, আপনার ভালোবাসার দান আমি মাথা পেতে নেব।

সফিয়াকে প্রাসাদ থেকে অন্য প্রাসাদে সরাবার একটাই উদ্দেশ্য, ইরবিজার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক গড়ে উঠছে তা যাতে সফিয়া জানতে না পারে। প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই উমর এসে উপস্থিত হয় ইরবিজার ঘরে। নানা কথায় তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। বেগম করে রাখবে। সাতমহলা প্রাসাদ বানিয়ে দেবে। হীরে জহরতে ভরে দেবে তাকে। কিন্তু ইরবিজার মন গলাতে পারে না।

—আমি আপনার বেগম হতে আসিনি, জাঁহাপনা। আপনার পুত্র সারকানের সঙ্গী হয়ে থাকতে এসেছি। এতে যদি আপনার অমত থাকে, আমি ফিরে যাবো আমার বাবার কাছে।

উমর বিমর্ষ হয়ে ফিরে যায়। কামনার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। শেষে একদিন উজির দানদানকে বলে ইরবিজার এই প্রত্যাখ্যান আমি তো আর সইতে পারছি না উজির। কিভাবে তাকে পাওয়া যায় তার একটা মতলব বাৎলে দাও।

উজির বলে, সম্রাট হারদুবের রক্ত আছে ওর শরীরে। সহজে সে বশ্যতা স্বীকার করবে, মনে হয় না।

উমর বলে, তবে? তবে কি উপায়?

দানদান ভারিক্কি চালে মাথা দোলায়, অধৈর্য হবেন না জাঁহাপনা। উপায় আমি বাৎলে দিচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় যখন তার ঘরে যাবেন সঙ্গে নিয়ে যাবেন খানিকটা ঘুমের ওষুধ। কায়দা করে সরাবের সঙ্গে খাইয়ে দেবেন। তারপর একটু পরে সে যখন ঘুমে ঢলে পড়বে, আপনি ওর ইজ্জৎ নষ্ট করে দেবেন। তারপর পরদিন সকালে সে বুঝতে পারবে, তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে আপনার ওপর সে রুষ্ট হবে। কিন্তু দেখবেন, আস্তে আস্তে জড়তা কেটে যাবে। পরে সে নিজে থেকেই আপনাকে ডেকে পাঠাবে। কিন্তু একটা কথা, কাল থেকে আর তার ধারে কাছে ঘেঁষবেন না। অপেক্ষা করতে থাকবেন—সে-ই আপনাকে ডাকবে।

—সাব-বা-স্, উমর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, তোমার ফন্দী বেশ চমৎকার, উজির। আমার মনে হচ্ছে, এই চালেই বাজীমাৎ করে দেব।

সন্ধ্যেবেলা উমর এলো ইরবিজার ঘরে। ইরবিজা নিরাসক্তভাবে সুলতানকে স্বাগত জানায়। বলে, বসুন জাঁহাপনা।

উমর বলে, আমি কাল বাইরে যাবো ইরবিজা, তাই আজ তোমার ঘরে একটু বেশিক্ষণ কাটিয়ে যাবার সাধ।

—তা বেশ তো, থাকুন না, যতক্ষণ ইচ্ছে।

—শুধু শুধু আর কতক্ষণ কাটানো যায় বলো, একটু যদি খানাপিনার ব্যবস্থা কর, ভালো হয়।

—এ আর এমন বেশী কি কথা হুজুর। কি খাবেন বলুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

উমর বলে, তোমার যা খুশি, ভালো একটু সরাব দাও, তা হলেই হবে।

সোনার পেয়ালায় দামী সরাব ঢেলে দেয় ইরবিজা। কিন্তু উমর পেয়ালা হাতে নেয় না।—না, না, সে হয় না। আমি একা একা খাবো না। তুমি না খেলে মৌজ হবে কি করে?

ইরবিজা মৃদু আপত্তি জানায়, সরাব খাওয়া আমার তেমন অভ্যেস নেই।

—সে কি? সম্রাট হারদুবের কন্যা, তায় আবার খ্রীষ্টান, সরাব তোমার ভালো লাগে না?

—জী না, উৎসব অনুষ্ঠানে ছাড়া বড় একটা খাই না।

উমর বলে, তা মনে কর না কেন, আজ একটা বিশেষ উৎসবের দিন। কাল আমি বাইরে চলে যাবো। আজ আমাকে না হয় বিদায় সম্বর্ধনাই জানালে।

ইরবিজা আর আপত্তি করে না।—বেশ, আপনি যখন বলছেন, আপনার সম্মানেই খাবো।

আরও একটা পেয়ালায় সরাব ঢেলে নেয় ইরবিজা। নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে টুকটুক করে তিন পেয়ালা সরাব শেষ হয়ে যায়। ইরবিজা বলে, আজ এই পর্যন্তই থাক জাঁহাপনা, আবার যখন ফিরে আসবেন, আবার একদিন আপনার সঙ্গে খাবো।

উমর বলে, কিন্তু মদের আমেজ তো এখনও লাগেনি ইরবিজা।

ইরবিজা বলে, দামী মদ, নেশা ধরতে একটু সময় লাগবে জাঁহাপনা, তা ছাড়া যত মদই খাই না কেন, বেহেড মাতাল আমি কোনও দিনই হই না। এই তো ভালো হাল্কাগুলাবী নেশা—এতেই তো বেশি আনন্দ পাওয়া যায়।

ইরবিজা ভাবে, সুলতানের মাথায় শয়তানী বুদ্ধি খেলা করছে। সরাবের নেশায় তাকে বেহুঁশ করে দিতে চায়। কিন্তু ইরবিজা হাঁদা-বোকা নয়। সবই বুঝতে পারে। এসব পুরোনো কায়দায় তাকে ঘায়েল করা যাবে না।

উমর আবদার ধরে, বেশ আর খাবে না। শুধু আমার অনুরোধে শেষবারের মতো আর এক পেয়ালা। তার অর্ধেকটা আমি খাবো। আর এ পেয়ালাটা আমি তুলে দেব তোমার মুখে। কেমন, রাজি?

অগত্যা ইরবিজা সম্মত হয়। সুলতানের সাধ, তাকে নিজে হাতে মদ ঢেলে মুখে তুলে দেবে।—ইরবিজা মনে মনে ভাবে, তুমি আমাকে যতই তোয়াজ কর, উমর, আমি তোমার খপ্পরে ধরা দিচ্ছি না। নিজে হাতে মদ ঢেলে, মুখে ধরে খাওয়াবো ভাবছো, আমি বুঝি তোমার সোহাগে গলে জল হয়ে যাবো। অত সহজে জল গলবে না, সুলতান। বৃথাই সময় নষ্ট করছো। আর মদ! কত মদ তুমি খাওয়াতে চাও? সারারাত ধরে খেলেও আমার পা টলবে না।

ঠিক আছে জাঁহাপনা, এই-ই শেষবার। আপনি নিজে হাতে ঢেলে দেবেন, শুধু সেই আনন্দেই না করতে পারলাম না।

সোনার ঝারি থেকে সোনার পেয়ালা পূর্ণ করে সরাব ঢাললো স্বয়ং সুলতান উমর অল-নুমান। নিজে আগে চুমুক দিয়ে খায় খানিকটা। শেরওয়ানীর পকেট থেকে ঘুমের বড়িটা বের করে ইরবিজার অলক্ষ্যে টুক করে পেয়ালার মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর পেয়ালাটা ইরবিজার ঠোঁটে ধরে বলে,

—নাও, চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলো।

ইরবিজা কোন আপত্তি করে না। উৎফুল্লও হয় না। নির্বিকার ভাবে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দেয়।

সুলতান-এর চোখে শয়তানীর হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে, বাঃ এই তো কেমন লক্ষী মেয়ে! নাও, চলো, এবার খানা সেরে নিই।

দু'জনে খাবার-এর টেবিলে গিয়ে বসে। নানা রকম শাহী খানায় সারা টেবিল জোড়া। মতিয়া এগিয়ে এসে রেকাবী পেতে দেয়। সুলতান হাতের ইশারায় তাকে বাইরে চলে যেতে বলে।, আজ আমি নিজে হাতে ইরবিজাকে পরিবেশন করবো। আর ইরবিজা খানা সাজিয়ে দেবে আমার রেকাবী ভরে। তোমরা সব বাইরে চলে যাও। কেউ থাকবে না ঘরে।

ইরবিজা দেখলো, সুলতান-এর কথা জড়িয়ে আসছে। মদের নেশা বেশ ধরেছে।—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, জাঁহাপনা, সবাইকে আমি বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। ঘরে আছি এখন শুধু আমি আর আপনি। আমি আপনাকে খাওয়াবো, আর আপনি আমাকে খাওয়াবেন। এর মধ্যে ওরা থাকবে কেন?

—তুমি ঠিক বলেছো, ইরবিজা। তোমার আমার মধ্যে ওরা থাকবে কেন?

ইরবিজা ভাবলো, মদের নেশায় তাকে বেহুঁস করতে এসে বাছাধন যে নিজেই নেশায় বুঁদ হয়ে পড়লো? কিন্তু নেশা হলে কি হবে, এখনও জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। ঘর থেকে সবাইকে বিদেয় করে দিতে চায়। অর্থাৎ একাঘরে উদোম নেশায় আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় ঢলে পড়বো, এই তার বাসনা। ইরবিজার হাসি পায়। মাগীবাজ সুলতানের আশা কত? এক টুকরো মোরগমসাল্লাম ছিঁড়ে নিয়ে সুলতানের মুখে পুরে দেয় ইরবিজা।

—বাঃ বেড়ে, মজাদার পাকিয়েছে তো? তুমি খাও? এই নাও, খাও।

সুলতান নিজে হাতে একটু মাংস পুরে দেয় ইরবিজার মুখে। কিন্তু মাংসটা আর মুখে রাখতে পারে না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে। সুলতান দেখলো, বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ইরবিজার মাথাটা সামনে ঝুলে পড়ে। এবার হয়তো কুর্শি থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। পাঁজাকোলা করে ইরবিজার দেহটা তুলে এনে শয্যায় শুইয়ে দেয় উমর।

খানিক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যায় সুলতান। মতিয়া ঘরে ঢুকে দেখে, ইরবিজা বিবস্ত্রা। মড়ার মতো অসাড় নিস্পন্দ তার দেহটা এলোমেলো শয্যায় নেতিয়ে পড়ে আছে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাছে আসে। বুকে হাত রেখে অনুভব করে—না, বুকের স্পন্দন ঠিকই আছে। তার কোনও হুঁস নাই। মুখ দিয়ে গ্যাজলা উঠছে। কি বিশ্রী ওষুধ খাইয়ে সর্বনাশ করে গেছে। গায়ের জামাকাপড় সংযত করে একখানা শাল চাপা দিয়ে দেয় মতিয়া।

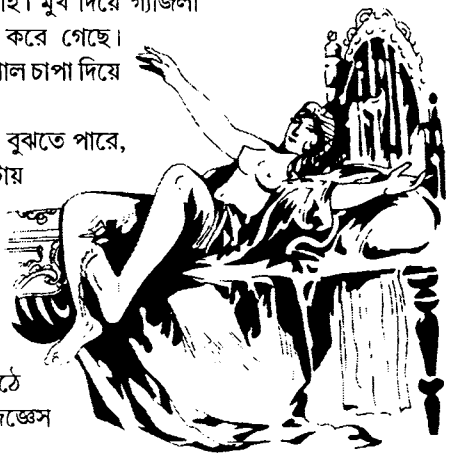

সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেলে ইরবিজা বুঝতে পারে, কাল রাতে কি যেন ঘটে গেছে। তলপেটটায় বেশ ব্যথা হয়েছে। মতিয়া কাছে আসে। ওর চোখে জল।

—কি রে, মতিয়া, কাঁদছিস কেন?

মতিয়া কথা বলে না। ইরবিজাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ইরবিজা বুঝতে পারে না। অবাক হয়। উঠে বসে ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বলতো?

মতিয়া কথা বলতে পারে না। ইরবিজার ছিন্নভিন্ন সেমিজটা আঙুল দিয়ে দেখায়—রক্তের দাগ।

চমকে ওঠে ইরবিজা। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বলতে পারে, শয়তান—

তারপরই হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মতিয়া বলে, গতকাল রাতে আপনাকে সরাবের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে এই সর্বনাশ করে গেছে সুলতান।

ইরবিজা ক্রোধে ফেটে পড়ে। পালঙ্কের বাজুতে মুষ্ঠ্যাঘাত করে বলে, এর বদলা চাই।

কিন্তু কি করে বদলা আপনি নেবেন, মালকিন! সে সুলতান। আর আপনি তারই হারেমে আশ্রিতা।

—আশ্রিতা, কিন্তু আমি তার বাঁদী রক্ষিতা নই। সে ভেবেছে, অত সহজেই পার পেয়ে যাবে? আমার বাবা সম্রাট হারদুব। ওর সলতানিয়তে ঘুঘু চরিয়ে ছেড়ে দেবে সে।

মতিয়া শান্ত করার চেষ্টা করে।—আপনি চুপ করুন, রাজকুমারী। চারদিকে সুলতানের চর আছে। আমাদের কথা শুনতে পেলে বিপদ বাড়বে। তার চেয়ে আমি বলি কি, ঠাণ্ডা মাথায় মতলব আঁটুন। সুলতানকে কি করে এর সমুচিত শিক্ষা দেওয়া যায় তার উপায় ভাবুন।

ইরবিজা মাথা নাড়ে, তুই ঠিকই বলেছিস মতিয়া। মাথা গরম করলে সব ভেস্তে যাবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। আচ্ছা এক কাজ কর, দরবারে খবর পাঠিয়ে দে আমার শরীর খুব খারাপ। এখন আমি কিছুদিন সুলতানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবো না।

ইরবিজা একা একা নিজের ঘরে দিন কাটায়। একমাত্র মতিয়া তার সঙ্গী। আর কারো সঙ্গে দেখা করে না। মাস দুই পরে ইরবিজা বুঝতে পারে, সে সন্তান-সম্ভবা। কান্নায় ভেঙে পড়ে। মতিয়াকে বলে, এখন কি হবে মতিয়া? সারকান শহরে নাই। এখন কি করি আমি।

মতিয়া পরামর্শ দেয়, যেভাবেই হোক, এখান থেকে পালাতে হবে, রাজকুমারী।

—কোথায় যাবো?

—আমরা আবার সিসারিয়াতেই ফিরে যাবো।

কিন্তু বাবা যদি আমার প্রতি বিরূপ থাকেন? তা হলে কি হবে?

মতিয়া বলে, তা থাকতে পারেন না তিনি। আপনি তার একমাত্র সন্তান। মেয়ে বলতেও আপনি, ছেলে বলতেও আপনি। আপনাকে না দেখে তিনি কি সুখে দিন কাটাচ্ছেন, আপনার ধারণা? আর তা ছাড়া সুলতান উমর আপনার উপর বলাৎকার করেছে শুনলে তিনি বাবা হয়ে কখনও চুপ করে থাকতে পারেন? তার ক্রোধে মেদিনী কাঁপে—আপনি কি জানেন না? এই শয়তানীর সমুচিৎ সাজা তিনি উমরকে দিতে কসুর করবেন না।

—তুই ঠিকই বলেছিস, মতিয়া। বাবার রাগ বড় চণ্ডাল? তার প্রতিজ্ঞা বড় মারাত্মক। তিনি যদি একবার পণ করেন, উমর-এর সর্বনাশ করবেন, তা তিনি করবেনই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে—এই প্রাসাদপুরী থেকে পালাবো কি করে! কোনও পুরুষ মানুষের সাহায্য ছাড়া এতটা পথ যাবোই বা কি করে। লোকে সন্দেহ করবে না?

মতিয়া বলে, আপনি একটু ধৈর্য ধরুন রাজকুমারী, আমি ব্যবস্থা করছি। প্রাসাদের দ্বাররক্ষীদের একজন নিগ্রো। পয়সার উপর লোকটার খুব লোভ। ওকে যদি টোপ ফেলা যায় ও গিলবে। আর ও ব্যাটা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে পথে ঘাটে কেউ ধারে কাছে ঘেঁসতে পারবে না।

ইরবিজা বলে ঠিক বলেছিস। নিগ্রো সঙ্গে থাকলে সাধারণ লোক সাত হাত দূরে দিয়ে চলবে। তুই ওকে ভজাবার চেষ্টা কর। বলবি নোকরীর জন্য কিচ্ছু ভেবো না। সারাজীবন সুলতানের প্রাসাদের দ্বাররক্ষী থেকে যা রোজগার করবে তার দশগুণ টাকা তোমাকে একসঙ্গে দিয়ে দেব। শুধু তুমি সিসারিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তারপর তোমার পয়সা কড়ি নিয়ে দেশে গিয়ে বাস করবে। সুলতান উমর তোমার একগাছি চুলও ছিঁড়তে পারবে না।

পরদিন মতিয়া এসে বলে, নিগ্রোটা রাজি হয়েছে, রাজকুমারী। আগামী জুম্মাবার নামাজ শেষ করে সুলতান শিকারে যাবে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা দু'জনে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবো। নিগ্রোটা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে তিনটে খচ্চর নিয়ে। শুধু বলে দিয়েছে, তুমি খুব সাধারণ সাজ পোশাকে সাজবে লোকে দেখে যাতে মনে করে, একটা সাধারণ দাসী বাঁদী।

শুক্রবার দিন সন্ধ্যাবেলা খিড়কীর দরজার পাশে তিনটি খচ্চর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিগ্রোটা। ভাবে; ভালো একটা মওকা পাওয়া গেছে। সম্রাট হারদুবের মেয়ে, খুবসুরৎ লেড়কী। হীরে জহরৎও অনেক পাওয়া যাবে। ভালো করে দেহের ক্ষিদেটাও মিটিয়ে নিতে পারবো।

কিছুদিন ধরেই ইরবিজার শরীরটা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। কিছুই খেতে পারে না। যা খায় বমি হয়ে যায়। সারা শরীর গুলিয়ে যেতে থাকে। মতিয়া বলে, ওতে ভয়ের কিছু নাই। এ সময় ও রকম হয়। আবার কয়েকদিন বাদেই দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে।

—কিন্তু মতিয়া, শরীরে আমি কোনও জোর পাচ্ছি না রে। মনে হচ্ছে ছ'মাসের রুগী।

—এ কোনও অসুখ নয়, রাজকুমারী। পেটে বাচ্ছা এলে প্রথম প্রথম সব মেয়েরই এরকম হয়। নিন তৈরি হয়ে নিন, নিগ্রোটা বোধহয় এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মতিয়া ওকে সাধারণ সাজ পোশাক পরায়। একটা মাঝারি গোছের অতি সাধারণ বাক্সে ভরে সব হীরে জহরতের গয়নাগাটি। সবারই অলক্ষে আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজার কাছে চলে আসে। তিনটে খচ্চর নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো নিগ্রোটা। বলে, বহুৎ দেরি করলেন, লিন, চটপট উঠে পড়ুন।

কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি। আকাশে তখনও চাঁদ ওঠেনি। অন্ধকার পথ। গা ছমছম করে নিগ্রোটা বলে, কোন ভয় নাই, লাগামটা শক্ত করে চুপচাপ বসে থাকুন। কোনও শালা কাছে ঘেঁসতে সাহস পাবে না। আর যদি কেউ হামলা করতে আসে, আমার এক এক কোপে সাবাড় করে দেব সব। মাঝরাত বরাবর আসমানে চাঁদ উঠবে। তখন আর পথ চলতে কষ্ট হবে না।

নিঝুম নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। খচ্চর তিনটের পায়ের শব্দ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই কানে আসে না। মাঝে মাঝে হয়তো বা কোনও রাত জাগা পাখির আওয়াজ, কিংবা শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। অনেক মাঠ ঘাট জঙ্গল পেরিয়ে চলতে থাকে ওরা। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ দেখা গেলো। ইরবিজা বললো, মতিয়া, শরীরটা বড়ই খারাপ করছে রে, রাতের মতো কোথাও বিশ্রাম করলে হয় না?

নিগ্রোটা বললো, এই বাঁকটা পেরোলেই একটা বাগান পাওয়া যাবে। ওখানে গাছের তলায় রাতটা কাটিয়ে লিন। তারপর আবার ভোরবেলা রওনা হওয়া যাবে।

মতিয়া বললো, তাই করো।

একটু পরেই নিগ্রোটা বললো, এইখানে নেমে পড়ুন আপনারা।

ইরবিজা আর মতিয়া নেমে পড়ে। একটা গাছের তলায় চাদর বিছিয়ে মতিয়া বলে, এখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নিন, রাজকুমারী। আমি জেগে আছি।

ইরবিজার শরীর এলিয়ে পড়েছিলো। আর দ্বিরুক্তি না করে শুয়ে পড়লো। মতিয়াও পাশে বসে ঝিমাতে লাগলো। হঠাৎ একটা বিদঘুটে আওয়াজে দু'জনেরই তন্দ্রা ছুটে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে ইরবিজা। দেখে মতিয়া ভয়ে কাঁপছে।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই নিগ্রোটা। দৈত্যের মতো চেহারা। একেবারে উলঙ্গ। মুখে তার শয়তানের হাসি। হাতে শাণিত তলোয়ার।

একা একা শুয়ে শুয়ে রাত কাটবে। তাতো হবে না রাজকুমারী! আজ আমি

তোমার লাগব হবো। কেন, আমাকে দেখে কি পছন্দ লয়! নাকি সতীপনা করছো? তা বাবা সুলতান উমর তো তোমার সতীপনা খতম করে দিয়েছে।

—চোপ রহ, বেয়াদপ!

ইরবিজা গর্জে ওঠে। নিগ্রোটা কিন্তু চুপ করে না। ভয়ও পায় না। বলে আ-হা, অত চটছো কেন, মালকিন। চটে কোনও লাভ নাই। এখানে তোমার কোনও বাপ বাঁচাতে আসবে না। যা বলছি ভালো মেয়ের মতো শোনো। তা না হলে এই যে দেখছো—

ইরবিজা রাগে থর থর করে বলে, শুয়ার কা বাচ্চা! ও দিয়ে আমাকে কব্জায় আনতে পারবি না।

ইরবিজা হাঁপাতে থাকে। একে অসুস্থ শরীর। তায় এই উত্তেজনা। মনে হয় এখুনি বুঝি টলে পড়ে যাবে সে। মতিয়া ওকে জাপটে ধরে। আপনি উত্তেজিত হবেন না, রাজকুমারী। শান্ত হোন। লোকটা যে এমন শয়তান তাতো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি।

নিগ্রোটা আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কই কি হলো? সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না দেখছি।

ইরবিজা উঠে দাঁড়ায়। সারা শরীর কাঁপতে থাকে। একটা পাথরের চাই পড়েছিলো পাশেই। তুলে নিয়ে ছুড়ে মারতে চেষ্টা করে।—শয়তান, ভেবেছিস, তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে সর্বনাশ করবি। তা কিছুতেই হবে না।

যে হাতে একদিন গন্ধমাদন পর্বত উপড়ে ফেলার ক্ষমতা ছিলো, সেই হাতে আজ সে সামান্য পাথরের ঢেলা ছুঁড়তে পারলো না। ব্যর্থতার আক্রোশে দিশেহারা হয়ে ঘুষি বাগিয়ে সে নিগ্রোটার দিকে ছুটে যায়।—মেরেই ফেলবো, হারামজাদাকে।

কিন্তু মারা আর হলো না। নিগ্রোর তলোয়ারের ফলা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেলো তার বুকে। সেই নিশুতি নিস্তব্ধ নির্জন রাতে ইরবিজার রক্তাক্ত দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো।

এইভাবে কুঁড়িতেই বিনষ্ট হয়ে গেলো তার অমূল্য জীবন।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন বাহান্নতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

শাহরাজাদ বলে, নিগ্রোটার হাতে সম্রাট হারদুবের কন্যা ইরবিজা নৃশংস ভাবে নিহত হলো। এইভাবে অকালে বিনষ্ট হয়ে গেলো, ফুলের মতো সুন্দর একটা জীবন।



ইরবিজার যা কিছু ধনরত্ন ছিলো, সব নিয়ে নিগ্রোটা পাহাড়ের পথে উধাও হয়ে গেলো। মতিয়া বসে বসে কাঁদতে থাকে। এমন সময় দেখা গেলো, সারা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এক অশ্বারোহী বাহিনী ছুটে আসছে। আর একটু কাছে আসতেই মতিয়া সৈন্যবাহিনীর সাজ পোশাক দেখে বুঝতে পারলো, সিসারিয়া সম্রাট হারদুবের বাহিনী। মনে কিছুটা ভরসা পায়। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা করতে থাকে। হারদুব এসে থেমে পড়ে। ইরবিজার রক্তাপ্লুত দেহ দেখে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসে।—কে? কে করলো আমার এই সর্বনাশ?

বাগদাদের সুলতান উমর-ইল-নুমানের ক্রীতদাস এক নিগ্রোর হাতে কি ভাবে ইরবিজা নিহত হয়েছে এবং সুলতান উমর তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে কি জঘন্য উপায়ে তার উপর বলাৎকার করেছে, সব সবিস্তারে বললো মতিয়া।

সম্রাট হারদুব রাগে গর্জে ওঠে, হুম্ এতো বড় স্পর্ধা, তোমার উমর! আমার মেয়েকে বাঁদী রক্ষিতা পেয়েছো? এর প্রতিদান তোমাকে পাই পাই করে করে মিটিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে আমার আদরের দুলালীর শেষকৃত্য সমাধা করতে হবে।

সারকানের হাতে হারদুবের একশত সৈন্যসামন্ত নিহত হওয়ার 'পর বাঁদী সর্দারনী সে বুড়িটার মুখ থেকে যখন হারদুব শুনলো, বাগদাদের সুলতান-এর পুত্র সারকান ইরবিজাকে তুক তাক করে ভুলিয়ে তার দেশে নিয়ে গিয়ে উমরের বাঁদী করে রেখেছে, হারদুব তখন এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য এক বিশাল অশ্ব বাহিনী নিয়ে বাগদাদের দিকে ধাবমান হচ্ছিলো। পথি মধ্যে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লো সিসারিয়ার সম্রাট হারদুব তার সেনাপতিদের নির্দেশ দিলো, আগে রাজকুমারীর মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাহিত করতে হবে। তারপর শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করা যাবে।

সুতরাং সম্রাট হারদুব আপাততঃ আক্রমণ স্থগিত রেখে কন্যার মৃতদেহ নিয়ে দুর্গে ফিরে এলো। বাঁদী সর্দারনী বুড়ি কেঁদে আকুল।—হায় হায়, আমার সোনার বাছার এই হাল কে করলো?

সম্রাট হারদুব বলে, কে আবার, সেই সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা—উমর। শয়তানটা আমার মেয়ের উপর বলাৎকার করেছে। আর তারই ক্রীতদাস দিয়ে হত্যা করিয়েছে। এও তোমাকে বলে রাখছি, সর্দারনী, এর প্রতিশোধ আমি নিজে হাতে নেবো। দেখবো, সুলতান উমর কত বড় শাহেনশাহ। বাঁদী সর্দারনী বলে,—সম্রাট আপনি অধৈর্য হবেন না। উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে গেলে কার্য সিদ্ধি হবে না। প্রতিশোধ নিতে হয় ঠাণ্ডা মাথায়। মুসলমানরা বলে, শত্রু যখন সব ভুলে নিজেকে অসতর্ক অরক্ষিত করে রাখবে সেই সুযোগে তাকে আক্রমণ করে কাজ হাসিল করো। দরকার হলে এই সুযোগের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। শয়তানটাকে কি করে সমুচিত শিক্ষা দিতে হয় আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব। সারা পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে তারিফ করবে, হ্যাঁ এর নাম বদলা। আমি ওকে সবংশে নিধন করবো। শুধু আমি যা বলি, ভালো করে শুনুন এবং আমাকে সাহায্য করুন। প্রথমে আপনার সারা সাম্রাজ্য খুঁজে গোটা পাঁচেক সুন্দরী কিশোরী সংগ্রহ করুন। তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্যে সবচেয়ে সেরা জনা কয়েক মুসলমান শিক্ষক দরকার। আপনার সাম্রাজ্যে তার অভাব নাই। এই শিক্ষকগুলোর কাজ হবে এই মেয়েগুলোকে তালিম দিয়ে পাক্কা মুসলমানী আদব কায়দায় গড়ে তোলা। আরব ইতিহাস তাদের নখদর্পনে থাকবে। খলিফাদের চৌদ্দ পুরুষের ঠিকুজি কুষ্ঠি মুখস্থ থাকবে। কথাবার্তা চালচলন আদবকায়দা নাচ-গান খানা-পিনা রীতি-নীতি আচার আচরণ সব এমন ভাবে তাদের রপ্ত করাতে হবে যাতে কেউ না সন্দেহ করতে পারে—তারা খানদানী মুসলমান ঘরের মেয়ে নয়। এই সব শিক্ষা-দীক্ষা দিতে যদি দশ বছরও সময় লাগে, লাগবে। তবু চুল-চেরা নিঁখুত নিখাদ হওয়া চাই। কারণ এই মেয়েগুলোই আমার প্রতিশোধ নেবার একমাত্র হাতিয়ার। আপনি বোধ হয় জানেন সম্রাট, ওই অসভ্য জংলী সুলতানটা দাসী বাঁদীদের সঙ্গে ব্যভিচার করে। শুনেছি, তার হারেমে নাকি বেগম ছাড়াও তিনশো ষাটটি রক্ষিতা আছে। সারা বছর ধরে প্রতি রাতে এই জানোয়ারটা এক একটি রক্ষিতার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এখন আবার সোনায় সোহাগা হয়েছে আমাদের রাজকুমারী ইরবিজা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো একশোটা কুমারী। এখন তারাও ভোগের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানোয়ারটার ভোগলালসার চরম নিবৃত্তি কেমন করে মেটাতে হয় আপনি দেখবেন।

সম্রাট হারদুব-এর মনটা কিছু হাল্কা হয়। বাঁদী সর্দারনীকে সাবাস জানিয়ে বলে আজই তোমাকে পাঁচটা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী কিশোরী পাঠিয়ে দিচ্ছি। এমন মেয়ে পাঠাবো, কালে যাতে তারা রগরগে যুবতী হতে পারে।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

তিপ্পান্নতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার গল্প শুরু হয়।

শাহরাজাদ বলে, তারপর শুনন জাঁহাপনা, সম্রাট হারদুব পাঁচটি সুন্দরী মেয়ে আর তাদের মুসলমানী কেতায় মানুষ করার জন্যে পাঁচজন চৌকস মৌলভী পাঠিয়ে দিলো। বাদী সর্দারনীর তত্ত্বাবধানে থেকে মেয়েগুলোর শিক্ষাদীক্ষার কাজ শুরু হলো।

এদিকে সুলতান উমর-অল-নুমান শিকার শেষে প্রাসাদে ফিরে শুনলো, ইরবিজা নাই। এতো কড়া পাহারা ফাঁকি দিয়ে সে কিভাবে পালাতে পারলো ভাবা যায় না। সুলতান উমর-এর হুঙ্কারে প্রাসাদ কেঁপে ওঠে, আমার প্রাসাদ থেকে সে পালিয়ে গেলো, আর তোমরা তা দেখতে পেলে না? আমি বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র কি তোমরা সব নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়! জবাব দাও। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কারো রেহাই নাই। এক এক করে সবগুলোকে আমি কোতল করবো। কোনদিন হয়তো এসে দেখবো, আমার সিংহাসনটাই চুরি গেছে। আশ্চর্য।

দ্বার রক্ষীরা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। এই বুঝি গর্দান নেবার হুকুম হয়। একজন সাহস করে এগিয়ে আসে, জাঁহাপনা, ইয়ে মানে—আমাদের গিয়ে—ইয়ে মানে—মানে।

—ওরে হতভাগা যা বলবি চটপট বল, 'ইয়ে মানে—ইয়ে মানে' করছিস কেন?

—না মানে হুজুর মানে—আমাদের মানে।

—থাম বেল্লিক, আর মানে মানে করে কাজ নাই। সোজা আরবী ভাষায় বল দিকিনি, কি বলতে চাস?

—মানে হুজুর নিগ্রো—

—কি বললি, আমি নিগ্রো?

—না মানে হুজুর ঐ নিগ্রোটা।

—কোন্ নিগ্রোটা?

—ওই যে হুজুর, দ্বাররক্ষী নিগ্রোটা—ওরই সঙ্গে সাট করে পালিয়েছেন উনি। মানে—গিয়ে সরষের মধ্যেই ভূত।

উমর-অল-নুমান বুঝলো, দ্বাররক্ষী নিগ্রোটার সঙ্গে যোগসাজস করে ইরবিজা পালিয়েছে।

সারকান শহরে ছিলো না। সে-ও ফিরে এসে শুনলো, ইরবিজা নিরুদ্দেশ হয়েছে। সুলতান তার উপর বলাৎকার করেছে। বাবার এই ব্যবহারে সারকান ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। মেয়েদের নিয়ে তার এই ছিনিমিনি খেলা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ইরবিজার জন্যে মনটা হু হু করতে থাকে। বেচারী মনের দুঃখে প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় গেলো? তারই কথায় সে বাগদাদে এসেছিলো। উচিত ছিলো তাকে রক্ষা করা। কিন্তু পারেনি। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। ক্রমশই বাবার ওপর মনটা বিষিয়ে ওঠে। সারকান ঠিক করে, এখানে আর সে থাকবে না। এই প্রাসাদপুরী তার কাছে পাপপুরী বলে মনে হয়।

সুলতান উমর লক্ষ্য করে, সারকান আর সে-সারকান নাই। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, কারো সঙ্গে ভালো করে কথাবার্তা বলে না। সব সময় কেমন মনমরা হয়ে থাকে। একদিন সারকানকে কাছে ডেকে উমর জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বেটা, তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখছি কেন?

সারকান বলে, আব্বাজান, আমি আর এই প্রাসাদে থাকতে চাই না। আপনি আমাকে অন্য কোথাও পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

—কোথায় যেতে চাও?

—আপনার সলতানিয়তের যে-কোন একটা সুবায় আমাকে পাঠিয়ে দিন। আমি সেখানেই গিয়ে থাকবো।

সুলতান উমর বললেন, আমার সুবার মধ্যে সবচেয়ে সেরা দামাসকাস। নানাদিক থেকে দামাসকাসের গুরুত্ব অনেক বেশি। তোমার যদি পছন্দ হয়, ওখানকার সুবাদার হয়ে তুমি যেতে পারো।

সারকানের তখন এমন মানসিক অবস্থা, বাগদাদ ছেড়ে পালাতে পারলে বেঁচে যায়। বললো, আমি রাজি, জাঁহাপনা। আপনি ব্যবস্থা করে দিন, আমি আর বিলম্ব করতে চাই না।

সুলতান উজির দানদানকে নির্দেশ দিলো, সারকান দামাসকাসের সুবাদার হয়ে যাবে। তুমি তার যাত্রার আয়োজন কর।

সারকান দামাসকাসে পৌঁছলে বিপুল সম্বর্ধনা করে স্বাগত জানালো প্রজারা। শহরের বড় বড় রাস্তার মোড়ে তোরণদ্বার তৈরি করা হয়েছিলো। আলোর মালায় সাজানো হয়েছিলো সারা শহর। আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছিলো দামাসকাস।

সারকান বিদায় নেবার পর উমর-অল-নুমান তার কন্যা নুজাৎ আর পুত্র দু-অল-মাকানের খোঁজ খবর নিয়ে জানলো, তারা পড়াশুনা করে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব বললেন, জাঁহাপনা, আমার যা কিছু শেখাবার ছিলো, সবই তাদের শিখিয়ে দিয়েছি। ধর্ম সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানে তারা দু'জনেই যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেছে। আমার বিবেচনায় পুঁথিগত বিদ্যার পাঠ তাদের শেষ হয়েছে।

সুলতান-উমর শুনে খুশি হয়ে মৌলভীকে মূল্যবান বস্ত্রাদি এবং প্রচুর অর্থ পুরস্কৃত করে বিদায় দিলো।

এই সময় নুজাৎ আর দু-অল-মাকান-এর বয়স চৌদ্দ বছর। তাদের বিদ্যাবুদ্ধির কথা বাগদাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লো। বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে লাগলো। গর্বে সুলতানের বুক ফুলে উঠলো।

একদিন কিশোর দু-অল-মাকান প্রত্যক্ষ করলো, একদল হজ যাত্রী বাগদাদ শহরের ভিতর দিয়ে মিছিল করে চলেছে। পার্শ্বচরকে জিজ্ঞেস করতে সে জানলো, ওরা সব ইরাক থেকে আসছে। যাবে মক্কায়। প্রতি বছর মক্কায় যে হজ মেলা হয় সেই মেলায় গিয়ে আল্লাহর নাম গান করবে। তারপর ওরা যাবে মদিনায়—যেখানে পয়গম্বর মহম্মদের সমাধি ক্ষেত্র।

দু-অল-মাকানের নিষ্পাপ কিশোর চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে বলে, আমিও যাবো।

পার্শ্বচর বোঝায়, আপনি তো এখনও নাবালক, হুজুর। সাধারণত, মানুষ সব ভোগ-লালসা বিসর্জন দিতে যায় সেখানে। কিন্তু আপনার তো এখনও জীবনের শুরুই হয়নি। এখনই সেখানে যাবেন কেন?

দু-অল-মাকান কিন্তু সে কথায় ভুলতে চায় না।—না, আমি যাবো। পার্শ্বচর বলে, আপনি সুলতানকে জানান, তিনি যদি মত দেন, গিয়ে দেখে আসবেন।

কিন্তু সুলতান উমরও সেই কথাই বলে, দূর বোকা ছেলে, ওখানে তুই যাবি কেন? সংসারের সবকিছু দেখা শোনা শেষ হলে, সব কামনা বাসনার পূর্ণ হলে তবে মানুষ যায় মক্কায়। সেখানে গেলে সংসার-এর মায়া বন্ধন আর মানুষকে আকর্ষণ করে না।

দু-অল-মাকান তবু বায়না ধরে, না আমি যাবো।

সুলতান দেখলো, ছেলেকে কিছুতেই ভোলানো যায় না। বললো, সেখানে তো তুমি একা একা যেতে পারবে না, বাবা। সামনের বছর আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

মাকান আব্দার ধরে, না, আব্বাজান, তুমি এই বারেই চলো।

উমর-অল-নুমান ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে, এখন আমার হাতে অনেক জরুরী কাজ বাবা। এ বছর যাওয়া হবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সামনের বার নিয়ে যাবো।

—আল্লাহর উদ্দেশে যাওয়ার চেয়ে আবার অন্য কোনও জরুরী কাজ থাকতে পারে নাকি, আব্বাজান?

উমর-অল কি করে বোঝায়, পুঁথিতে যে-সব কথা লেখা থাকে তা-ই সব নয়। কিন্তু ছেলের কথার জুৎসই জবাবও দিতে পারে না। শুধু বলে, এখন তুমি মার কাছে যাও বাবা, আমি তোমাকে পরে নিয়ে যাবো।

কিশোর মাকান কিন্তু শান্ত হয় না। তার মাথায় তখন এক চিন্তা। মক্কা যেতে হবে। আল্লাহর পয়গম্বর মহম্মদের পবিত্র পদধূলি মিশে আছে মক্কার পথে ঘাটে। সেই মাটি মাথায় ধরণ করে সার্থক হবে সে। সারা রাত বিনিদ্র রজনী কাটে। যেভাবেই হোক—মক্কায় সে যাবেই। সকালে বোন নুজাৎকে বলে, আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে দিদি, আমি মক্কায় যাবো। কিন্তু কি করে যাবো রে!

নুজাৎ বলে, আমারও খুব যেতে ইচ্ছে ভাই। কিন্তু বাবা-মা কেউই রাজি হবে না।

মাকান বলে, চল, পালিয়ে যাই।

—পালিয়ে যাবো? কেমন করে?

মাকান বুদ্ধি বাৎলায়, তুই কিছু ভাবিস নি, দিদি। আমি তোকে নিয়ে যাবো। তুই বরং এক কাজ কর। মার বাক্স থেকে কিছু টাকা পয়সা আর কিছু সাজ-পোশাক হাতিয়ে নে। দেখিস কেউ যেন না টের পায়। দু'টো উট ভাড়া করে আমরা হজ-যাত্রীদের মিছিলে সামিল হয়ে যাবো। তাহলেই দেখবি একদিন মক্কায় পৌঁছে গেছি।

নুজাৎ বলে, কিন্তু আমি মেয়েছেলে, সবে আমার যৌবন আসছে। এই সময় পথে ঘাটে অনেক বিপদ-আপদ ঘটতে পারে।

মাকান বলে, তোর মাথায় কিছু বুদ্ধি নাই। তুই আমার সাজ-পোশাক পরে ছেলে সেজে নে। তাহলেই ল্যাঠা চুকে গেলো।

নুজাৎ বলে, ঠিক বলেছিস, ভাই। তোর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

রাত্রে মাকান এসে নুজাৎকে জানায়, কালকের ভোরে আমরা চুপি চুপি বেরিয়ে যাবো শহরে। ওখানে দু'টো উট ভাড়া করে রাখবে আমার নফর। আমি সব ব্যবস্থা করেছি। ইরাক থেকে যে-সব হজ যাত্রীর দল কাল বাগদাদে আসবে তাদের সঙ্গে মিশে যাবো আমরা। কেমন, ঠিক আছে?

নুজাৎ বলে, বিলকুল ঠিক আছে।

এইভাবে দুই কিশোর-কিশোরী একদিন মক্কায় এসে পৌঁছয়। পবিত্র আরাফৎ গিরিশৃঙ্গ এবং মদিনার পবিত্র সমাধি ক্ষেত্র দর্শন করে ওদের মন আনন্দে ভরে যায়।

এবার ঘরে ফেরার পালা। তীর্থযাত্রীরা অনেকেই ফেরার পথে খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, যীশুর জন্মস্থান জেরুজালেম শহরটা দেখে যায়। মাকান বললো, দিদি চল, আমরাও জেরুজালেম দেখে তারপরে দেশে ফিরবো।

কিন্তু তীর্থযাত্রীদের অনেকেই বারণ করেছিলো।

—এই বয়সে এতো ধকল কি তোমাদের সহ্য হবে? পথ বড়ো খারাপ।

মাকান বলে, খারাপ তো কি হয়েছে? কত বুড়ো হাবড়া যাচ্ছে, আর আমরা যেতে পারবো না?

কিন্তু পথ চলতে চলতে মনে হতে লাগলো, না এলেই ভালো হতো। দুর্গমগিরি কান্তার মরু পেরিয়ে চলতে চলতে দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। জন্মাবধি কোন কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস নাই। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। ওরা কেন সইতে পারবে এই দুঃসহ খরতাপের জ্বালা? নুজাতের জ্বর পথের মধ্যেই সেরে গেলো। কিন্তু দু-অল-মাকান দিন দিন কাহিল হয়ে পড়তে থাকে। এইভাবে একদিন ওরা জেরুজালেমে এসে পৌঁছয়। মাকান তখন জ্বরে অচৈতন্য। প্রলাপ বকে চলেছে।



শহরের উপান্তে একটা সরাইখানায় আশ্রয় নেয় তারা। নুজাৎ-এর মনে ভয় ধরে। এই বিদেশ বিভুঁই-এ অসুস্থ ভাইকে নিয়ে সে কিভাবে দেশে ফিরবে?

দিন যায় রাত্রি আসে। কিন্তু মাকান-এর জ্বর বাড়তেই থাকে। হাতে যা পয়সা কড়ি ছিলো ফুরিয়ে এলো। কিন্তু মাকান-এর জ্বর কমে না। নুজাৎ চিন্তায় পড়লো। সাজ্‌পোশাক যা ছিলো এক এক করে বিক্রি করতে লাগলো। কিন্তু তাতে আর কতদিন চলতে পারে? একদিন নুজাৎ দেখলো, বিক্রি করার মতো আর কোন সাজ-পোশাকও অবশিষ্ট নাই। নুজাতের কান্না পায়। হায় আল্লাহ, এ কি বিপদে ফেললে? এখন কি করি? কি করে আমার ভাই-এর মুখে ওষুধ পথ্য দিই? আর কি করেই বা দেশে ফিরবো?

আল্লাহ বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। মাকানের জ্ঞান হলো।—দিদি কাঁদিস নি। আমার জ্বর সেরে যাবে। আমরা শিগ্গিরই দেশে ফিরে যাবো। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে রে। কিছু খাবার দে।

সুলতানের ছেলে আজন্ম ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে লালিত হয়েছে। সে কি করে বুঝবে, খেতে চাইলেই সবাই খেতে পায় না। খাবার কিনতে পয়সার প্রয়োজন হয়। নুজাৎ বলে, কিন্তু ভাই, আমার কাছে তো পয়সাকড়ি কিচ্ছু নাই। কি করে তোকে খেতে দেব? লোকের কাছে ভিক্ষে মাঙবো, তাও পারছি না। যাই হোক, আজকের রাতটা একটু কষ্ট করে থাক। কাল আমি কোনও আমির সওদাগর—কারো বাড়ি গিয়ে ঝি-এর কাজ করেও কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আসবো। সারাটা দিন তোকে ছেড়ে থাকতে আমার মন চাইছে না। কিন্তু কি করবো, ভাই, আল্লাহর বোধহয় এ রকমই ইচ্ছে। জানি না, তিনি কবে আমাদের আবার বাগদাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

পরদিন সকালে নুজাৎ ভাই-এর কপালে চুমু দিয়ে পথে নেমে আসে। কিন্তু কোথায় যাবে, কার বাড়িতে কাজ পাবে কিছুই বুঝতে পারে না। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে।

দু-অল-মাকান সারাদিন অপেক্ষা করে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে গেলো, কিন্তু নুজাৎ ফিরে আসে না। ক্ষিদের জ্বালায় পেটের নাড়ি জ্বলতে থাকে। সারাটা রাত ক্ষিদের দুশ্চিন্তায় বিনিদ্রভাবে কাটে। কিন্তু নুজাৎ ফিরে এলো না। তার পর দিনও সেই ভাবে কেটে যায়। তারও পরের দিন অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু নুজাতের কোনও সন্ধান পাওয়া গেলো না। আজ পুরো দু'টো দিন-রাত্রি মাকান কিছু খায়নি। খিদের জ্বালায় চোখে অন্ধকার দেখছে। কোন রকমে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে দরজার চৌকাঠ অবধি আসে। সরাইখানার একটা চাকরকে বলে, আমাকে একটু বাজারে নিয়ে যাবে, ভাই। আমি আজ দু'দিন খাইনি। খিদের জ্বালা আর সইতে পারছি না।

চাকরটা বলে, কিন্তু সেখানে কে তোমাকে খেতে দেবে?

—যদি কারো দয়া হয়। না হলে এখানে থেকেই বা কি করবো।

চাকরটা ওকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে বাজারের এক পাশে একটা পোড়ো বাড়ির বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে চলে আসে। মুখে আওয়াজ তুলে কারো কাছে ভিক্ষে চাইবে, মাকানের তখন সে অবস্থাও নাই। পথচারীদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। মুখে কিছু বলতে পারে না। শুধু হাতের ইশারা করে জানায়, সে বড় ক্ষুধার্ত, একটু কিছু খেতে চায়।

মাকানেরই সমবয়সী কয়েকটি ছেলে ওর আবেদনে সাড়া দেয়। বাজারের দোকানীদের কাছ থেকে চাঁদা করে পয়সা তুলে মাটির থালা করে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসে। মাকানকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও পেটভরে খেতে পারে না সে। একটুখানি মুখে দিতেই বমি হয়ে যায়। আবার নেতিয়ে পড়ে। খাবার কেনার পর চাঁদার পয়সা তিরিশ দিরহাম বেঁচে ছিলো। অনেকেই বললো, একটা উট ভাড়া করে দামাসকাসের হাসপাতালে পৌঁছে দাও তোমরা। না হলে বাচ্চাটা মরে যাবে। সুলতান উমর-অল-নুমানের সরকারী হাসপাতালে ভালো চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। গরীব দুঃখীদের কোনও পয়সা লাগে না।

সবাই জল্পনা কল্পনা করলো অনেক। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এলো না। দামাসকাস অনেক দূরের পথ। নিজের কাজকাম বন্ধ করে কে আর পরের উপকার করতে ছুটবে? শেষ পর্যন্ত এক এক করে সবাই কেটে পড়লো। শাহেনশাহ উমর অল-নুমানের পুত্র শাহজাদা দু-অল-মাকান সেই পোড়ো বাড়ির খোলা বারান্দার এক কোণে মরার মতো পড়ে থেকে রাত্রি কাটালো। মাটির বাসনে একটু রুটি আর এক ভাড় জল রেখে গেলো ওরা। কিন্তু মাকানের কোনও চৈতন্য নাই। কি করে সে খাবে?

পরদিন সকালে একটা লোক দোকানে দোকানে চাঁদা তুলতে লাগলো। সবাইকে বললো, একটা বাচ্চা, এখানে পড়ে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে—আপনারা যে যা পারেন সাহায্য করুন। আমি ওকে দামাসকাসের সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাবো।

দোকানীরা তো দিলোই। পথচলতি মানুষও দয়া পরবশ হয়ে যার যা সাধ্য সাহায্য করলো। লোকটার উদ্দেশ্য সাধু ছিলো না। একটা উট ভাড়া করে মাকানকে নিয়ে রওনা হলো। বাজার ছাড়িয়ে শহরের শেষ প্রান্তে এসে চাঁদার পয়সাগুলো বের করে গুণে দেখলো। প্রায় দশ দিনারের মতো হবে। শয়তান লোকটা মাকানকে একটা সরকারী হামাম-এর পাশে নামিয়ে দিয়ে স্বগতভাবে বলতে থাকে, এই মরাটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আমার কি ফায়দা হবে। তার চেয়ে থাক, এখানেই মর। আল্লাহ, আমার কোনও দোষ নিও না। ছেলেটার যদি বাঁচার কোনও আশা থাকতো, তবে তোমার নামে কসম খেয়ে বলছি, ওকে আমি দামাসকাসের হাসপাতালে পৌঁছে দিতাম।

এই বলে বদমাইশটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একটু পরে হামামের পাশে একটা লোক এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ—দাড়ি গোঁফ সাদা হয়ে গেছে। এই হামামে সে চাকরী করে। যারা গোসল করতে আসে তাদের গরম জল জোগানই তার কাজ। একটা বিরাট চুল্লী আছে হামামের একপাশে। আর আছে একটা চেলাকাঠের গুদাম। সারাদিন ধরে সে শুধু গরম জল করে যায়। পথচারীরা আসে গোসল করতে। যার দরকার তাকে গরম জল দেয়। এর জন্যে সে সরকারের কাছে বেতন পায়। অবশ্য সে বেতন অতি সামান্য। স্বামী-স্ত্রীর কোন রকমে চলে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ বড় সৎ। কোনো পথচারী স্নান সেরে খুশি হয়ে দু'পয়সা বকশিস করতে এলে নেয় না। বলে, আল্লাহর দোয়ায় আমার কোনও অভাব নাই, জনাব। আমি নিতে পারবো না।

বৃদ্ধ ভাবে, এই সকালবেলা দরজার সামনে একটা মড়া ফেলে গেলো কে?

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তার ভুল ভাঙ্গে। না, ছেলেটা তো মরেনি। হাত পা নাড়ছে যেন মনে হচ্ছে। কাছে গিয়ে নাড়ি ধরে দেখে বৃদ্ধ বুঝতে পারে, এখনও ছেলেটা বেঁচে আছে।

কিন্তু এ অবস্থায় থাকলে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না হয় তো বা। বৃদ্ধ ভাবে, ছেলেটা বোধ হয় খারাপ দলে পড়ে বেশি মাত্রায় হাসিস খেয়েছে। কিন্তু ভালো করে দেখে বুঝতে পারলো, না, নেশা করে বেহেড হয়নি। অসুখে অসুখে দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে না খেতে পেয়েই তার এই মরণাপন্ন দশা। কিন্তু অবাক লাগে তার, এমন ফুলের মতো টুকটুকে সুন্দর ছেলে তো কোনও সাধারণ ঘরের নয়। নিশ্চয়ই কোনও খানদানী পরিবারের ধনীর দুলাল। কিন্তু এ অবস্থায় কে তাকে এখানে ফেলে গেলো? যাই হোক, আগে ওকে সুস্থ করে তোলা দরকার। তারপর জানা যাবে, কেমন করে কোথা থেকে এলো!

মাকানকে বৃদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ি আসে। বিবিকে বলে, দেখো, ছেলেটা বোধহয় না খেতে পেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। আগে একে খাইয়ে ধুইয়ে সুস্থ করে তোলো। মনে হচ্ছে খানদানী ঘরের ছেলে।

বিবি আঁৎকে ওঠে, আহা-হা, এমন সোনার চাঁদ বাছা। একে পেলে কোথায়?

হামামের পাশে চেলা কাঠের গুদামের পাশে কে বা কারা ওকে ফেলে গিয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম মড়া। পরে দেখলাম, না, বেঁচে আছে। কিন্তু ভালো করে আদর যত্ন না করলে বাঁচানো যাবে না। তুমি ওকে দেখো, আমি কাজে চললাম।

বৃদ্ধের বিবি গরমজল করে মাকানের গা হাত পা মুছিয়ে দেয়। এক গেলাস গরম দুধ এনে মুখে ধরে। দুধটুকু খেয়ে মাকান একটু সুস্থ বোধ করে। পরনের নোংরা সাজ-পোশাক খুলে ফেলে বৃদ্ধের বৌ ওকে ধোয়া জামাকাপড় পরায়। গোলাপ জলের পিচকারী করে মুখটা ধুয়ে দেয়। যুঁই-এর আতর এনে ছিটিয়ে দেয় পোশাকে। মাকান ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মন।

এই সময় রজনী অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চুয়ান্নতম রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার কাহিনী শুরু হয়।

বৃদ্ধের বিবির সেবা যত্নে মাকান বিছানায় উঠে বসে। হামাম থেকে ফিরে এসে বৃদ্ধ খুশি হয়ে বলে, বাঃ এই তো দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠেছো। আল্লা মেহেরবান, আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে আর বাঁচানো যাবে না।

আরও তিন দিন পরে মাকান মোটামুটি ভালো হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে এখন কেমন মনে করছো, বাবা?

—একটু একটু গায়ে জোর পাচ্ছি।

বৃদ্ধ দু'হাত তুলে আল্লাহর উদ্দেশে প্রণাম জানায়।—সবই তাঁরই দয়ায়।

বাজারে গিয়ে গোটা দশেক মুরগীর ছানা নিয়ে আসে। বিবিকে বলে, রোজ সকাল বিকাল একটা করে মুরগীর ঝোল করে দেবে। বাছার আমার শরীরে কিছু নাই।

বৃদ্ধের বৌ নিজে হাতে মুরগী মেরে দু-বেলা ঝোল রেঁধে খাওয়াতে থাকে। এই ভাবে আরও কয়েকদিন পরে বৃদ্ধ মাকানকে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন লাগছে, বাবা?

মাকান বলে, বেশ ভালো। আমি তো প্রায় আগের মতোই সুস্থ হয়ে উঠেছি। এখন আর আমার জন্যে আলাদা খানাপিনার কি দরকার। আপনারা যা খান, এবার থেকে তা-ই খাবো।

—কেন বাবা, একথা বলছো? আমরা গরীব বলে? কথাটা ঠিকই। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মাত্র পাঁচ দিরহাম রোজগার করি। চার দিরহাম খরচ করে রোজ একটা করে দিরহাম সঞ্চয় করেছি। সেই থেকে তোমার সেবা যত্ন চলছে। ভেবো না লোকের কাছে

ধারকর্জ করছি। তোমার জন্য খরচ করতে পেরে আমার সারা জীবনের সঞ্চয় করা আজ সার্থক হয়েছে, বাবা।

বৃদ্ধ তার বিবিকে বলে, এবার ছেলেটাকে ভালো করে গোসল করানো দরকার। আমি একটা গাধা ভাড়া করে নিয়ে আসছি। ওকে আজ সরকারী হামামে নিয়ে যাবো।

প্রায় মাসখানেক মাকানের স্নান হয়নি। গায়ে এক পরদা ময়লা জমে গিয়েছিলো। সাবান-ছোবড়া দিয়ে খুব ভালো করে ঘসে মেজে বৃদ্ধ মাকানের সর্বাঙ্গ পরিষ্কার করলো। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ। বৃদ্ধ দেখে অবাক হয়। ভাবে, এমন হাত-পায়ের গড়ন, চাঁদপনা মুখের আদল, এই চাঁপার মতো রঙ এ পেলো কোথায়? স্নান শেষ হলে নতুন দামী পোশাক পরালো তাকে। দেখে মনে হতে লাগলো যেন কোন্ সুলতান বাদশাহর ছেলে।

মাকানকে বাড়িতে নিয়ে এসে প্রথমে গোলাপের সরবৎ খাওয়ালো। তারপর মুরগীর ঝোল দিয়ে রুটি, শাহী হালওয়া, আঙুর বেদানা প্রভৃতি নানা পুষ্টিকর খানা সাজিয়ে দিলো। মাকান লজ্জিত হয়ে বলে, আপনাদের কাছে আমার ঋণের আর অন্ত রইলো না।

বৃদ্ধ বলে, ওসব কথা বলে আমাকে আঘাত দিও না, বাবা। তুমি বিদেশী মুসাফির। তায় অসুস্থ। আল্লাহর নির্দেশ মুসাফিরকে সাধ্যাতীত আদর যত্ন করবে। কিন্তু আমি আর কি করতে পারছি তোমার জন্যে। একটা কথা বাবা কয়েকদিন ধরেই ভাবছি, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভরসা হচ্ছে না।

—কী কথা?

—তোমার আদবকায়দা চেহারা চরিত্র দেখে মনে হয়, তুমি কোনো বড় ঘরের ছেলে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তোমার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে।

মাকান বলে, সবই আপনাকে বলবো। তার আগে আপনি বলুন, কোথায় এবং কবে আমাকে পেয়েছেন?

বৃদ্ধ বলে, একটা হামামের কাঠগুদামের পাশে তোমাকে কে বা কারা ফেলে রেখে গিয়েছিলো। আমি সেই হামামে চাকরী করি। প্রথমে ভেবেছিলাম, তুমি বেঁচে নাই। পরে বুঝতে পারলাম, প্রাণটা তখনও ধিক ধিক করছে। তাই কাঁধে তুলে বাড়ি নিয়ে এলাম। তারপর আমার বিবির চেষ্টায় তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছো। সবই আল্লাহর দোয়ায়।

মাকান বলে, আল্লাহ আপনাদের ভালো করবেন। আচ্ছা, এই জাগায়টার নাম কী?

—জেরুজালেম।

মাকান গম্ভীর হয়ে যায়। এই শহরেরই একটা সরাইখানায় তাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে রেখে তার দিদি একদিন কাজের সন্ধানে বেরিয়েছিলো, আর ফিরে আসেনি। ভাবতে ভাবতে মাকানের চোখে জল আসে। সুলতান উমর অল-নুমান যে তার জন্মদাতা শুধু এইটুকু গোপন করে আর সব কাহিনীই সে বৃদ্ধর কাছে বলে।

বৃদ্ধ সান্ত্বনা দেয়। দুঃখ করো না বাবা। নসীবের লিখন। কেউ তা খণ্ডাতে পারে না।

মাকান জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে দামাসকাস কতদূর।

—পুরো ছ'দিনের পথ। কিন্তু কেন, বাবা?

মাকান বলে, ঠিক করেছি এখান থেকে দামাসকাসেই যাবো।

না, বাবা, না। তোমার এই শরীরে একা সেখানে যাওয়া হবে না। যদি যেতেই চাও, আমি সঙ্গে যাবো। হয়তো আমার বিবিও যেতে চাইবে। যাওয়ার পথটা বড় খারাপ কিন্তু শহরটা বড় সুন্দর। একপাশে কুলকুল করে নদী বয়ে চলেছে। আর সারা শহরটা ফল ফুলের গাছে ভরা—যেন একটা সুন্দর বাগিচা।

এমন সময় বৃদ্ধের বিবি ঘরে এলো।—ওগো চাচার মেয়ে, শুনেছো, ছেলে আমার দামাসকাস যেতে চায়। তা ওকে তো আর একা ছাড়তে পারি না। আমি সঙ্গে যাবো। তুমিও যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?

শেখ-গৃহিণী বলে, ওমা, আমি যাবো না? না গেলে ছেলের দেখ-ভাল কে করবে? শুনেছি, ওখানকার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো ভীষণ বজ্জাত। ওদের সঙ্গদোষে পড়লে বাছার আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ বলে, নাও, তাহলে আর দেরি করে লাভ কী? জামাকাপড় বিছানাপত্র সব গোছগাছ করে নাও। আর চাল ডাল আটা ময়দা যা নেবার সব বাঁধা-ছাঁদা করে ফেলো। আজকালই রওনা হয়ে যাবো। ছ'দিনের পথ।

বৃদ্ধের বিবি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেখে বাকী সব সামানপত্র পঞ্চাশ দিরহামে বিক্রী করে দিলো। তার কিছু টাকায় বৃদ্ধ একটা গাধা কিনে আনলো। তারপর দিনক্ষণ দেখে আল্লাহর নাম নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো ওরা তিনজন।

রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামায়। চুপ করে বসে থাকে।

পঞ্চান্নতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়।

দু-অল-মাকানকে গাধার পিঠে চাপিয়ে বৃদ্ধ আর তার বিবি পিছনে পিছনে হেঁটে চলে। চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কোথাও থেমে একটু জিরিয়ে নেয়। এইভাবে কয়েকদিন



চলার পর এক সন্ধ্যায় দামাসকাসে পৌঁছে গেলো তারা। একটা সরাইখানায় দু'জনকে বসিয়ে বৃদ্ধ বাজারে যায়, কিছু খানাপিনার সন্ধানে।

সেদিন রাতেই বৃদ্ধের বিবির কাঁপিয়ে জ্বর আসে। প্রথমে মনে হয়েছিলো পথশ্রমের ক্লান্তি আর গায়ের ব্যথার জ্বর। কিন্তু পরে বোঝা গেলো, না, এ কালব্যাধি। পাঁচদিনের দিন

ওদের দু'জনকে কান্নার সায়রে ভাসিয়ে সে আল্লাহর দরবারে চলে গেলো। মাকান শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এই সেবিকার সেবা-যত্নেই সে তার প্রাণ ফিরে পেলো, কিন্তু তার প্রাণটা আর কেউ-ই ধরে রাখতে পারলো না। কিশোর মাকান বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেয়, মৃতের জন্য শোক করলে মৃত ফিরে আসে না। তার জন্যে চোখের জল ফেলে তার আত্মার অমঙ্গল কামনা করো না, বাবা। আমাদের সবাইকে একদিন সেখানেই যেতে হবে। কেউ দু'দিন আগে, আর কেউ দু'দিন পরে—এই যা তফাৎ।

তোমার এত জ্ঞান, বাবা। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন। আমরা একদিন সকল শোকতাপ ভুলে তার পায়ের তলায় আশ্রয় নেব। তুমি যা বললে তাই তো একমাত্র সত্য। আমাদের সবাইকে একদিন সেখানেই যেতে হবে। বাঃ, কি সুন্দর কথা। তোমার কথায় মনের দুঃখ অনেকটা হাল্কা হয়ে গেলো, বাবা। আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আর শোক করবো না। চলো, শহরটা একটু ঘুরে দেখি। এই কটা দিন কি উদ্বেগেই কেটেছে! একভাবে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছো। চলো, তোমাকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

বৃদ্ধের হাত ধরে শহরের পথে পথে ঘুরতে থাকে মাকান। এই কোতোয়ালীর সামনে এসে দেখে অনেক লোক জমায়েত হয়ে কি যেন দেখছে। কাছে আসতে চোখে পড়ে অনেকগুলো উট, গাধা, ঘোড়া খচ্চর-এর পিঠে বোঝাই করা বাক্স প্যাটরা, গালিচা এবং আর নানা রকম সওদাগরী সামান পত্র। এক জনকে জিজ্ঞেস করলো, এত জিনিসপত্র সব কার? কোথায় যাবে?

লোকটা জবাব দেয়, এখানকার কোতোয়াল বাগদাদে বাদশাহ উমর-অল-নুমানের কাছে বাৎসরিক ভেট পাঠাচ্ছেন।

মাকানের চোখে জল আসে। কান্না চাপতে পারে না। বৃদ্ধ সান্ত্বনা দেয়, নিজেকে শান্ত করো বাবা। সদ্য তুমি অত বড় কঠিন অসুখ থেকে উঠেছো। আবার শরীর খারাপ হতে পারে। আমি বুঝতে পারছি দেশের নাম শুনে তোমার মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। শান্ত হও, ধৈর্য ধর। আল্লাহ একদিন তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবেনই।

মাকান কাঁদতে কাঁদতে বলে, না, আমি এদের সঙ্গেই বাগদাদে যাবো। দেশের জন্যে আমার ভীষণ মন খারাপ করছে। আর এক মুহূর্তও এখানে ভালো লাগছে না। আপনি আমাকে বিদায় দিন, বাবা। আমি এদের পিছনে পিছনে একদিন বাগদাদে পৌঁছে যাবো।

বৃদ্ধ বললো, তা হয় না, বাবা। তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারি না। ঠিক আছে, আমার আর পিছনের কি টান, আমিও তোমার সঙ্গেই যাবো।

মাকান আনন্দে নেচে ওঠে। —খুব ভালো হবে। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার আর কি চিন্তা।

মাকানকে গাধার পিঠে চাপিয়ে বৃদ্ধ পিছনে পিছনে হেঁটে চলে। মাকান আপত্তি করেছিলো, আমি তো এখন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। বরং আপনি, বুড়োমানুষ, গাধার পিঠে আপনি চাপুন, আমি হেঁটে যাবো।

কিন্তু তার সে আপত্তি টিকে নি। বৃদ্ধ বলেছিলো, পাগল ছেলের কথা শোনো। আমি বুড়ো হলে কি হবে, এখনও সাত জোয়ানের ঘাড় মটকাতে পারি। তুমি এখন চাপো। তারপর তোমার যখন ভালো লাগবে না, নেমে খানিকটা হেঁটে পায়ের জড় ভেঙে নিও। তখন না হয় আমি খানিকক্ষণ চাপবো।

মাকান বলেছিলো, আপনি যা আমার জন্যে করছেন, কোন ভাই-এর জন্যে ভাই তা করে না।

এবার আমরা দু-অল-মাকানের দিদির কথা বলবো।

সুন্দরী কিশোরী নুজাৎ অসুস্থ ভাই মাকানকে সরাইখানায় রেখে কাজের সন্ধানে

রাস্তায় বেরিয়ে আসে। কিন্তু কে তাকে কাজ দেবে, কোথায় যেতে হবে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। এমন সময় সে এক বাদাবী সর্দারের নজরে পরে। তার সঙ্গে ছিলো আরও পাঁচজন সাগরেদ।

তাদের একজনকে ফিসফিস করে সর্দারটা বলে, মনে হচ্ছে, নয়া চিড়িয়া।

সাগরেদটা বলে, হাঁ উস্তাদ, উমর বহুৎ কম, আর দেখতে ভী খুবসুরৎ মালুম হচ্ছে। এই তো দেখুন না, এই দিকেই আসছে। মনে হচ্ছে, কী যেন খুঁজছে। জিজ্ঞেস করুন না, উস্তাদ।

বাদাবীরা কুখ্যাত ডাকাত। মরুভূমির বাদাবী অঞ্চলে এদের বাস। চুরি-ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই এদের একমাত্র পেশা।

নুজাৎ কাছে আসতে সর্দার জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ, ভালো মানুষের মেয়ে, তুমি কি কারো বাড়িতে বাঁধা না, যখন যেখানে পাও, ফুরনের কাজ করো?

অজানা অচেনা এক মেয়ের সঙ্গে এ ধরনের গায়ে পড়ে কথা বলতে আসায় নুজাৎ বিরক্ত হয়। পাশ কাটাবার জন্যে বলে, আমি বড় শোকে তাপে কাহিল হয়ে আছি, আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন না।

সর্দারটা গলায় মধু ঢেলে বলে, কিছু মনে ক'রো না, মা জননী। তোমার মতো আমার ছ'টা মেয়ে ছিলো। আল্লাহ পাঁচটাই কেড়ে নিয়েছেন। এখন মাত্র একটি। একেবারেই নাবালিকা, বাড়িতে একা একা থাকে। দেখাশোনার কোনও লোক নাই। তাই একটি ভালো বংশের আয়া খুঁজতে বেরিয়েছি। তা বাছা, তোমাকে দেখে মনে হলো, তুমি খানদানী ঘরের মেয়ে। হয়তো অভাবের তাগিদে পথে বেরুতে হয়েছে। তা মা, যদি কাজ কামের সন্ধানেই বেরিয়ে থাকো, আমি বলি কি, আমার মেয়েটাকে দেখা শোনার ভার নিয়ে আমাকে একটু নিশ্চিন্ত কর। পারিশ্রমিক যা চাও, দেব। যদি তুমি অন্য কোনও ঘরে কাজে না লেগে থাকো, আমার বাসায় চলো। মা-হারা মেয়েটা আমার বাঁচবে।

নুজাৎ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে, শেখসাহেব, আমি এখানে বিদেশী। আর তাছাড়া, ঘরে আমার একটি অসুস্থ ভাই আছে। আপনার কাজ আমি নিতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যার আগে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। ভাইকে ছেড়ে রাতে কোথাও থাকতে পারবো না আমি।



সর্দার বলে, তাই হবে মা, সন্ধ্যার আগেই আমি ঘরে ফিরি। তখন তুমি চলে যেও। আর যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তোমার ভাইকেও আমার বাড়িতে এনে রাখতে পারি।

নুজাৎ ভাবে, দুনিয়াতে এত সহৃদয় মানুষও আছে? এই বিপদের মুহূর্তে স্বয়ং আল্লাহই বুঝি ছদ্মবেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। নুজাৎ বলে, চলুন।

এইভাবে শিশু-প্রাণ নুজাৎ এক বাদামী দস্যুর কবলিত হয়। এমন নিখুঁত অভিনয় করে সে তাকে ধাপ্পা দিলো বুঝতেও পারে না। তার ঘর, তার নাবালিকা মাতৃহারা কন্যা—সবই তার ধাপ্পা। নুজাৎকে উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে। পিছনে পিছনে আসে তার সাগরেদরা। এবার নুজাৎ বুঝতে পারে, লোকটা একটা ঠগ। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। যদি কেউ সাহায্য করতে ছুটে আসে। কিন্তু বাদাবী সর্দারের উট তখন শহর ছাড়িয়ে নির্জন প্রান্তরে ছুটে চলেছে। সর্দার হুঙ্কার ছাড়ে, এই হারামজাদী চুপ কর—চুপ কর বলছি।

কিন্তু শাহজাদী নুজাৎ চুপ না করে আরও জোরে চিৎকার করতে থাকে, কে আছো, বাঁচাও, বাঁচাও। ডাকাত আমাকে ছেনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে—

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সর্দার। তোর ডাকে কেউ সাড়া দেবে না রে, শয়তানী। চুপ কর। ভালো চাসতো চুপ কর।

নুজাৎ ফুঁসে ওঠে। শয়তান আমি না তুমি? ভালো মানুষ পেয়ে আমাকে ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছো। আল্লাহ তোমাকে দোজকে পুড়িয়ে মারবেন।

—হা—হা—হা। আমাকে না হয় দোজকের আগুনে পুড়িয়ে মারবে, কিন্তু তোকে রক্ষা করুক দেখি, তোর আল্লাহর কত ক্ষমতা। নে চুপ করবি তো কর। তা না হলে এই দেখছিস ছুরি, একবার চেঁচালে টেনে জিভটা কেটে নেব।

নুজাৎ ভয় পায়। কি চকচকে ধারালো ছুরি। লোকটার অসাধ্য কিছুই নাই। সত্যিই যদি তার জিভটা কেটে নেয়? আর তাছাড়া এই নিরালা নির্জন মাঠের মধ্যে কেই বা তাকে উদ্ধার করতে আসবে। চিৎকার করে লাভ হবে না ভেবে নুজাৎ চুপ করে যায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

একটু পরে লোকটা বলে, আমি যখন রেগে যাবো, তখন আমার কোনও কথায় 'না' করো না। তা হলে রাগের মাথায় হয়তো তোমাকেই খুন করে ফেলবো। কিন্তু তাই বলে ভেবো না, মানুষটা আমি খুব খারাপ। তোমাকে ধোঁকা দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ঠিক। কিন্তু কি করবো, এই আমাদের ব্যবসা। এইভাবেই নানা ছলে বলে কৌশলে মেয়েদের জোগাড় করে আনতে হয়। ভেবো না তোমাকে ভোগ করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। ভোগ আমি করবো না, তবে করবে একজন। এবং সে-জন বড় খানদানী আদমী। তোমাকে বহুৎ আদর যত্নে রাখবে। অনেক দাসী বাঁদী থাকবে তোমার। তার ঘরের বিবির মতোই তোমাকে হীরে জহরতে মুড়ে রাখবে। তবে বিবির ইজ্জত দেবে না। তার পেয়ারের রক্ষিতা হয়ে থাকবে। আর আমি? আমি কিছু নগদ বিদায় নিয়ে চলে যাবো আবার কোনও নতুন মেয়ের সন্ধানে। দামাসকাসের বাঁদী হাটে তোমাকে নিলামে তুলবো। দেশ-বিদেশের সুলতান বাদশাহ আমির ওমরাহ সওদাগরের দালাল আসে সেখানে। তারা তোমার দর হাঁকবে। যার দর চড়া হবে তার কাছেই তোমকে বেচে দেব, এই আমাদের কারবার। সুতরাং ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নাই। তোমাকে জলেও ফেলে দেব না শূলেও চাপাবো না। এমনকি তোমার গায়ে কেউ হাতও ছোঁয়াবে না। সব শুনলে তো? এবার ভালো মানুষের মেয়ের মতো কান্না থামিয়ে চুপ কর। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সুলতান উমর অল নুমানের দালালের কাছেই তোমাকে বেচে দেব। তুমি হবে বাগদাদের সুলতানের রক্ষিতা। এমন সৌভাগ্য ক'টা মেয়ের হয়, বলো? শুধু তোমার রূপ আছে বলেই বলছি, সুলতানের অপছন্দ হবে না। আর যদি আমার কথা না শুনে নাকে কাঁদতেই থাক তবে একটা হাড়ে বজ্জাৎ সওদাগরের হাতে তুলে দেব। সে আবার কোথায় চালান করে দেবে তোমাকে, আমি বলতে পারবো না।

নুজাৎ ভাবলো, লোকটা মহা শয়তান। রাগলে একেবারে চণ্ডাল হয়ে যায়। তখন ও সবকিছু করতে পারে। সুতরাং চুপ করে নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলো।

সর্দার বলে, খিদে পায়নি? এই নাও রুটি শব্জী খাও।

লোকটা দু'খানা যবের রুটি আর একটু শব্জী এগিয়ে দেয় নুজাতের দিকে। গতকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিলো। হাত বাড়িয়ে রুটি দু'খানা গোগ্রাসে খেতে থাকলো।

সর্দার হাসে। খিদের বড় জ্বালা। বলে, আর একখানা নেবে?

নুজাৎ মাথা নাড়ে। না আর সে নেবে না। ভাই মাকানের মুখখানা ভেসে ওঠে। খিদের জ্বালায় হয়তো আর সে বেঁচে থাকবে না। দু'চোখ নেমে আসে জলের ধারা।

এক সময়ে সর্দার বলে, আমরা দামাসকাসে এসে গেছি।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখে রাত্রি শেষ হতে চলেছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন ছাপ্পান্নতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

দামাসকাসে পৌঁছে সর্দার নুজাৎকে নিয়ে গিয়ে তুললো এক সরকারী সরাইখানায়। মহামান্য সুলতান উমর-অল-নুমান বিদেশী মুসাফিরদের আশ্রমের জন্য বাব-অল মালিকে বানিয়ে দিয়েছে এই সরাইখানা। নুজাৎ আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। সর্দার ধমকায়। ফের যদি কাঁদিস, মেরে মুখের আদল পালটে দেব। চুপ কর মাগী, চুপ কর। না হলে কিন্তু একটা বদমাইশ ইহুদীর কাছে বেচে দেব, বলছি।

নুজাৎকে সরাইখানার একটা খুপরীতে পুরে শিকল তুলে দিলো লোকটা। বাঁদীহাটে গিয়ে হাঁকতে থাকলো, কই গো কে আছো, এদিকে এসো। জেরুজালেম থেকে একটা ডাগর ছুঁড়ি নিয়ে এসেছি। কে নেবে এসো।

দালাল, সওদাগররা এগিয়ে আসে, কী রকম মাল?

সর্দার বলে, দেখতে খুব-সুরৎ। কিন্তু একটা ঝামেলা আছে। জেরুজালেমে সে তার রুগী ভাইকে ছেড়ে এসেছে। যার কিনতে ইচ্ছে, আগে থেকে শর্ত দিচ্ছি, তার ভাই-এর দায়-দায়িত্বও নিতে হবে তাকে। যদি তোমরা কেউ এই শর্তে রাজি থাকো, আমি খুব সস্তায় ছেড়ে দেব।

একজন সওদাগর জিজ্ঞেস করে, উমর কত?

—একেবারে আনকোরা কুমারী। বিয়ের যুগ্যি, ডাগর। বিদ্যায় বুদ্ধিতে একেবারে চৌকস। দেখতে শুনতে যেমন খুবসুরৎ তেমনি তার খানদানী আদব-কায়দা। ভাইটার অসুখের চিন্তায় কেঁদে কেঁদে শরীরটা এখন কাহিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু বড়ঘরের আদর যত্ন পেলে আবার চেহারা খোলতাই হয়ে উঠবে।

সওদাগর বলে, চলো, দেখাও দেখি। যদি পছন্দ না হয় নেব না কিন্তু। আর যদি তোমার কথামতো সব ঠিক ঠিক মিলে যায়, তবে ন্যায্য দাম পাবে। সুলতান উমর-অল-নুমানের জন্যে কিনবো। তার ছেলে শাহজাদা সারকান এখন এখানকার সুবাদার। আগে তাকে দেখাবো। তার পছন্দ হলে তার কাছ থেকে একটা চিঠি করে নিয়ে বাগদাদে যাবো সুলতানের কাছে। সুন্দরী কুমারী মেয়ের উপর সুলতানের ভারি লোভ। তার যদি মনে ধরে তা হলে ভালো ইনাম পাবে।

বাদাবী সর্দার বলে, ঠিক আছে, আপনার শর্তে আমি রাজি। চলুন, সরাইখানায় দেখবেন চলুন।

নুজাতের দরজার সামনে এসে শিকল খুলে সর্দার ডাকে, নুজায়া, ও নুজায়া?

নুজাতের নামটা বিকৃত করে উচ্চারণ করে সে। নুজাৎ কাঁদতে থাকে। কোনও জবাব দেয় না। সওদাগরকে বলে, বেটি রা কাড়ছে না। যান ভিতরে গিয়ে দেখুন। একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে কথা বের করুন।

সওদাগর ভিতরে ঢুকে নুজাৎকে বলে, আল্লাহ তোমার ভালো করবেন, বাছা।

কোকিল-কণ্ঠী নুজাৎ ধীরে ধীরে বলে, আল্লাহ আমাদের মতো হতভাগীদের দিকে মুখ ফিরে চায় না। আপনারাই তার কৃপা পেতে থাকুন।

নুজাতের জবাব শুনে সওদাগর মুগ্ধ হয়। বাঃ কি সুন্দর কথা। আর কি পরিশুদ্ধ মার্জিত উচ্চারণ!

নাকাবের জাফরী দিয়ে নুজাৎ দেখে বৃদ্ধ সওদাগরকে। মনে হয়, অমায়িক সদাশয়

মানুষ। তাকে, ডাকাতটার হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে। তার বদলে যদি এই সওদাগরের বাঁদী হয়ে থাকতে হয় সে-ও অনেক ভালো। আমার রূপ যৌবন, আমার শিক্ষাদীক্ষা এঁর নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

সওদাগর জানতে চাইলো, তুমি কে? কি তোমার পরিচয়, মেয়ে?

নুজাৎ মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয়, আপনি জানতে চাইছেন, আমি কে? এইটুকু জেনে রাখুন, আমি আপনার শত্রু নই, কোনও ক্ষতি করবো না। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। আমার কপালে যা লিখে দিয়েছেন, হাজার চেষ্টা করলেও তা এড়াতে পারবো না। আমাকে তা মেনে নিতেই হবে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, আপনি আমার ভাগ্য নিয়ন্তা। কিন্তু আমি মনে করি, আপনি উপলক্ষ্য মাত্র।

নুজাতের এই দার্শনিক তত্ত্বকথায় সওদাগর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়। ভাবে তার চেহারা এখনও দেখিনি, কিন্তু মুখের কথা শুনেই আমি অনুমান করতে পারছি, বড়ঘরের মেয়ে সে। বাদশাহ উমর-অল-নুমান-এর সামনে হাজির করলে লুফে নেবেন তিনি। মোটা বকশিস মিলবে। বাদাবী সর্দারকে জিজ্ঞেস করলো, সর্দর সাহেব তোমার মেয়েটা বড় ভালো, কি সুন্দর তার কথাবার্তা, আর নম্র-ভদ্র ব্যবহার। তা কি দাম নেবে ভাই?

কী বললে? নম্র-ভদ্র? ওর মতো দজ্জাল মেয়েছেলে তুমি আর দু'টি পাবে না, সওদাগর। ওর হাড়ে হাড়ে শয়তানী বুদ্ধি। ওকে কিনলে তোমার হাড়মাস জ্বালিয়ে শেষ করবে। বলছো কিনা নম্র-ভদ্র। যাও, আগে বাড়ো, তোমার সঙ্গে আমি সওদাই করবো না।

সওদাগর বুঝলো সর্দারটা ক্ষেপে বোম্ হয়ে আছে। মেয়েটির প্রশংসা সে আদৌ বরদাস্ত করবে না। বললো, ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিলাম, মেয়েটা ভীষণ বজ্জাৎ; মুখরা। আমি ওই বজ্জাত মুখরা মেয়েটাকেই কিনতে চাই। এখন বলো, কি দাম নেবে?

বাদাবী সর্দার নিজে কোনও দাম বলে না। উল্টে জিজ্ঞেস করে, তুমিই বলো, কি দাম দেবে?

সওদাগর বলে, তোমার ছেলের তুমি নামকরণ করবে না করবে পাড়াপড়শী? তোমার মালের তুমি দাম বলবে। আমার পোষায় নেব, না পোষায় কেটে পড়ব। তোমার বিবেচনা যা হয় বলো, তারপর আমি যা পারবো বলবো।

কিন্তু বাদাবী-দস্যু দাম বলতে পারে না। আসলে দাম সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নাই। বলবে কি করে? এ যাবৎকাল যত ছেলে মেয়ে সে চুরি করে এনে বেচেছে তাদের কেউই এমনটি ছিলো না। দেখতে মোটামুটি সুন্দর হলে নেহাৎ খারাপ দাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এ মেয়ের মতো এমন বিদ্যাধরী তো একটাও সে কখনও চোখে দেখেনি। বাঁদী রক্ষিতার রূপ যৌবন দরকার এটা সে ভালো করেই জানে, কিন্তু লেখাপড়া কি কামে লাগে! আর তার কদরই বুঝবে কোন আমির সুলতান? সুতরাং ওগুলো তার গুণ না হয়ে, দোষ বলেও তো গণ্য হতে পারে!

সর্দারকে নিরুত্তর দেখে সওদাগর বলে, দু'শো দিনার দিতে পারি, দেবে?

সর্দার এবার অদ্ভুত হাসে, থাক থাক আর কইয়ো না, আমার উটটা শুনলে হাসবো।

সওদাগর বিরক্ত হয়, হাসির কথা তো কিছু বলিনি সর্দার। তোমার কাছে দাম জিজ্ঞেস করলাম, বললে না। উল্টে আমার কাছে দাম জানতে চাইলে। তা আমার যা মনে হয়েছে, বললাম। এবার তোমার কথা বলো?

বাদাবী সর্দার বলে, না বাপু বিক্রি করে আমার কাজ নাই। তার চেয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে ভুট্টার ক্ষেতে কাজে লাগাবো। আমার উট চরাবে। তাও অনেক সুরাহা হবে।

সওদাগর দেখলো, লোকটা গোঁয়ার। কোন যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। বললো, আহা—অমন গোঁসা করছো কেন শেখ? হাটে যখন এনেছো, বেচবে বলেই এনেছো।

তা দরদাম না হলে কি কেনাবেচা হয়। তোমার মেয়ের গুণের কথা না হয় জেনেছি, কিন্তু মুখের সুরৎ তো এখনও দেখিনি। রূপ না হলে গুণ ধুয়ে জল খাবে নাকি লোকে?

সর্দার ক্ষেপে ওঠে, তা তোমাকে তার চেহারাটা দেখতে কে বারণ করছে। যাওনা, বোরখাটা খুলে দেখে এসো না। চাই কি সাধ হলে সাজ-পোশাক খুলে ন্যাংটো করেও উল্টেপাল্টে দেখতে পারো। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।

—শোভন আল্লাহ, একি কথার ছিরি। মেয়ে মানুষের কেনা বেচার কারবার করি ঠিক। কিন্তু তাই বলে, মান ইজ্জতও কি খুইয়ে বসবো নাকি!

সর্দার বলে, কেন দোষ কী? ময়রা কি সন্দেশ খায় না?

—তোবা তোবা, তোমার মুখের কোনও রাখ-ঢাক নাই, শেখ। একেবারে গোল্লায় গেছো। নাও চলো, আমি শুধু তার মুখের আদলটা দেখবো। বোরখাটা খুলবার দরকার নাই। মুখের নাকাবটা একবার সরালেই যথেষ্ট।

রাত্রির অন্ধকার কেটে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতান্নতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে।

সওদাগর আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে নুজাতের কাছে যায়। নুজাৎ মাথা নত করে স্বাগত জানায়। পাশের একটা কুর্শি দেখিয়ে বসতে অনুরোধ জানায়।

সওদাগর জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি, বাছা?

নুজাৎ এক মুহূর্ত জবাব দেয় না। তারপর সলজ্জ কণ্ঠে বলে, আপনি কি আমার এখনকার নাম জানতে চাইছেন? না, আমার মা-বাবার দেওয়া নাম শুনবেন? তাঁরা আমাকে 'নয়নতারা' বলে ডাকতেন। কিন্তু এখন আমি নিজেকে 'চোখের বালী' বলেই মনে করি।

নুজাতের কথায় সওদাগরের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মেয়েটির মনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে। নুজাৎও অশ্রু সংবরণ করতে পারে না। বলে, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলাম। আজ সায়রে পেতেছি শয্যা।

বাদাবী সর্দার তেড়ে আসে, বলি, এতক্ষণ ধরে গুজগুজ ফুসফুস কি হচ্ছে? চাবুকের ঘায়ে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দেব।

নুজাৎ কাতরভাবে সওদাগরের দিকে তাকায়। —আপনি আমাকে এই পাপ থেকে উদ্ধার করুন, জনাব। আমি আর এই অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না। আমার কথা যদি না শোনেন আজ রাতেই জীবনটা শেষ করে দেব।

সওদাগর বাদাবী সর্দারের দিকে ফিরে বলে, শেখসাহেব, তোমার ভয়ে মেয়েটা শিটকে যাচ্ছে। একটু ক্ষান্ত হও। বলো কি দাম চাও, দেব।



ডাকাতটা চিৎকার করে ওঠে, তোমাকে তো বলেছি, আমি দাম বলবো না। তোমার যা মনে হয় বলো। আমার ইচ্ছে হলে দেব, না হলে দেব না।

সওদাগর এক লাফে দর হাঁকে, পঞ্চাশ হাজার দিনার।

কিন্তু শয়তান ডাকাতটা তাতেও রাজি হয় না। বলে, তামাশা করছো আমার সঙ্গে।

—সত্তর হাজার দিনার।

সর্দার বলে, ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে আমার খরচা হয়েছে নব্বই হাজার।

সওদাগর সর্দারের কথায় রেগে ফেটে পড়ে, ঝুটা বাৎ। তোমার চৌদ্দগুষ্টি মিলে একশো দিনার খেতে পারবে না, তা বলছো, ওর পিছনে খরচ হয়েছে নব্বই হাজার দিনার। যাই হোক, এক লাখ দেব, এই আমার শেষ কথা। রাজি থাকো দিয়ে দাও। না হলে আমি সরকারের দপ্তরে তোমার নামে মেয়ে চুরির নালিশ এবং তুমি তার উপর কি অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছো, তারও সাক্ষী দেব। কোতোয়ালকে যদি তুমি টাকা দিয়ে হাত করার চেষ্টা করো, তবু রেহাই পাবে না। আমি শাহজাদা সারকানের কাছে যাবো। দেখি তোমাকে কে রক্ষা করে।

ডাকাত সর্দার দেখলো, বেকায়দা—সওদাগরের কথায় রাজি হয়ে গেলো। বললো, ঠিক আছে টাকাটা দিয়ে দাও। আমাকে আবার জেরুজালেমে ফিরে যেতে হবে। না জানি ওর ভাইটার কি হলো।

পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে বাদাবী সর্দার উর্ধ্বশ্বাসে উট ছুটিয়ে দেয়। জেরুজালেমে যাবে সে। যার বোনকে বিক্রি করে এক লাখ দিনার পাওয়া গেলো তার ভাইকে পেলে না জানি কত পাওয়া যাবে। যে ভাবেই হোক, তাকে চুরি করতে হবে।

কিন্তু জেরুজালেমে পৌঁছে সে সরাইখানায় গিয়ে শুনলো, ছেলেটা ওখান থেকে চলে গেছে। সারা শহর চষে বেড়ালো, কিন্তু হদিস করতে পারলো না।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন আটান্নতম রজনীর দ্বিতীয় জামে আবার গল্প শুরু হয়।

সওদাগর নুজাৎকে তার নিজের বাসায় নিয়ে যায়। বাজার থেকে বাদশাহী সাজপোশাক কিনে নিয়ে আসে। নুজাৎকে পরতে দিয়ে বলে, পরে দেখো দেখি, কেমন মানায়।

নুজাৎ বেশ পরিবর্তন করে আসে। দেখে সওদাগরের চোখ ঝলসে যায়। বললে, বাঃ, চমৎকার। এবার চলো বাজারে স্যাকরার দোকানে নিয়ে যাবো।

বাজারের সবচেয়ে সেরা জহুরীর দোকানে নিয়ে গিয়ে নুজাতের পছন্দসই গহনাপত্র কিনতে থাকে। কানের জন্য কিনলো এক জোড়া মুক্তা বসানো দুল। এক একখানা মুক্তোরই দাম হাজার দিনার। গলার জন্যে নিলো একটা সাতনরী হার আর মানতাসা। হারটা গলায় পরতে সারা বুক পর্যন্ত ঝলমল করে ওঠে। এইভাবে হাতের বাজুবন্ধ, কোমরের গোট, পায়ের মল, মাথার টিকলী টায়রা—সব আভরণ পরে সে যখন দাঁড়ালো, সওদাগরের মনে হতে লাগলো, যেন কোন এক শাহজাদী।

নুজাৎকে রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে আবার নিয়ে এলো সওদাগর। বললো, তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, বাছা, শাহজাদা সারকানকে কিন্তু বলো না, কত দাম দিয়ে তোমাকে কিনেছি। সে যাতে ওকালতী করে তার বাবা উমর-অল-নুমানের নামে একটা চিঠি লিখে দেয় তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। চিঠি আর তোমাকে নিয়ে বাগদাদে যাবো। ছেলের সুপারিশ থাকলে শাহেনশাহ না করতে পারবেন না। আর একবার যদি তিনি হ্যাঁ করেন, আমি মোটা টাকা মুনাফা পাবো।

নুজাৎ মুখ নিচু করে। দু'গাল বেয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়ে। সওদাগর অবাক হয়। —বাগদাদের নাম শুনে অমন মন খারাপ হয়ে গেলো কেন, বাছা? তোমার কি কোন চেনা জানা আত্মীয় স্বজন কেউ ছিলো সেখানে? ওখানকার কোনও সওদাগরকে কি তুমি চেনো? বলো মা, আমার কাছে লজ্জা করো না, খুলে বলো। বাগদাদের সব বড় বড় সওদাগরই আমার খুব চেনা।

নুজাৎ ঘাড় নেড়ে বলে, না, একমাত্র সুলতান উমর-অল-নুমান ছাড়া আমি সেখানকার আর কাউকে চিনি না।

সওদাগর শঙ্কিত হয়।—তবে কি এর আগে কোনও সওদাগর তোমাকে সুলতানের কাছে পেশ করেছিলো?

—জী না। আমি সুলতানের কন্যার সঙ্গে এক সাথে মানুষ হয়েছি তার প্রাসাদে। এই সূত্রে তিনি আমাকে বড় স্নেহ করতেন। এবং যখনই যা চেয়েছি, নির্দ্বিধায় দিয়েছেন। যদি আপনি মনে করেন, তাঁর কোনও অনুগ্রহ আপনার দরকার একটা কাগজ কলম দিন, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠিটা তার হাতে দিলে, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। শুধু আমার চিঠিটা তাঁর হাতে দিয়ে বলবেন, তার একান্ত অনুগত নুজাৎ দিয়ে পাঠিয়েছে আপনাকে। আর বলবেন, ভাগ্যের ফেরে সে আজ পথহারা পাখির মতো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহু জনের মনোরঞ্জন করতে করতে অবশেষে এখন সে দামাসকাসে তারই পুত্র শাহজাদ সারকানের আশ্রয়ে আছে। এই বলে তাকে আমার সালাম জানাবেন।

নুজাতের কথা শুনে সওদাগরের শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা, প্রাসাদে থাকা কালে তুমি কোরান এর পাঠ শেখোনি।

—আলবাৎ শিখেছি, জনাব। শুধু কোরানই নয়, অঙ্ক, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিদ্যা আহরণ করেছি। নানা বিষয়ে আমি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছি। বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তা পাঠ করে ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। আমার লেখা কাব্য গাথা আজ বাগদাদের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

সওদাগর অবাক বিস্ময়ে নুজাতের কথা শুনছিলেন। উঠে গিয়ে কাগজ কলম আর দোয়াত এনে রাখলো তার সামনে।

নুজাৎ একখানা চিঠি লিখে ভাঁজ করে সওদাগরের হাতে দেয়। চিঠিখানা কপালে ঠেকিয়ে সওদাগর তার কামিজের জেবে রেখে বলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই, তোমাকে যেন তিনি আরও গুণবতী করে রাখেন।

এই সময়ে রজনী অতিক্রান্ত হলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ঊনষাটতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

তারপর শুনুন, জাঁহাপনা, নুজাতের পরিচয় জানার পর কিভাবে যে তাকে আদর করবে সওদাগর ভেবে পায় না।

—মা, চলো তোমাকে হামামে নিয়ে যাই। খুব ভালো করে ঘসে মেজে গোসল করে নাও। সারকানের দরবারে যেতে হবে। এমন সাজগোজ করে যাবে, যাতে এক নজরেই শাহজাদা বলে ওঠেন, বাঃ খাসা।

সওদাগরের কথায় নুজাৎ লজ্জা পায়। মুখ নামিয়ে মৃদু হাসে। খুশির ছোঁয়া লাগে ওর গালে। রক্তরাঙ্গা হয়ে ওঠে মুখ। ঘাড় নেড়ে বলে, চলুন।

আতর, সাবান, তোয়ালে, ছোবড়া, সাজপোশাক সঙ্গে নিয়ে সওদাগর নুজাৎকে নিয়ে এলো শহরের সবচেয়ে সেরা অভিজাত এক হামামে। একটা শরীর সাফা করার মেয়ে ভাড়া করলো।

—দেখো, মেয়ে, মালকিনকে, আচ্ছা করে ঘসে মেজে সাফা করে দেবে। আজ তাকে বাদশাহজাদা সারকানের দরবারে নিয়ে যাবো।

মেয়েটা বলে, আপনি কিছু ভাববেন না জনাব। এক চিলতে ময়লা রাখবো না গায়ে। সাবান ছোবড়ায় ডলে ছাল চামড়া ছাড়া আর সবই তুলে দেব।

নুজাৎ হেসে ওঠে। সওদাগর বলে, না, শুনেছি মেয়েটা সাফাই করার ভালো কায়দা জানে।

স্নান শেষ হলে একটা বিরাট তার্কিস তোয়ালে জড়িয়ে পাশের কামরায় এসে একটা

সোফায় বসে। সামনে টেবিলে রাখা ছিলো, গোলাপের সরবৎ, আঙুর, আপেল, আনার আপেল। অনেক দিন পরে স্নান করে তার শরীরটা বেশ ঝরঝরে তাজা হয়ে ওঠে। সরবৎটা খেয়ে শরীরটা জুড়িয়ে যায়। মেয়েটা বলে, ফলগুলোও খেয়ে নাও, মালকিন, যা ডলাই মলাই হয়েছে খিদে পাওয়ার কথা। সত্যিই মেয়েটা গোসল করানোর কায়দা জানে ভালো। এমন ভাবে তেল মালিশ করেছে, এতদিনের পথের ক্লান্তি ব্যথা বেদনা সব নিমেষেই দূর হয়ে গেলো। নুজাৎ বললো, আমি এত ফল খেতে পারবো না। তুমিও নাও।

দু'জনেও খেয়ে শেষ করতে পারলো না। হামামের বুড়ি দ্বাররক্ষীটাকে অনেকগুলো দিয়ে দিলো। এরপর শুরু হলো প্রসাধনের পালা।

সওদাগর এসে গহনার বাক্স দিয়ে গেলো। একটুবাদে সাজ-পোশাক করে গহনাপত্র পরে যখন সে বেরিয়ে এলো সওদাগর দেখে একেবারে থ। জীবনে বহু মেয়ের বেচা কেনা সে করেছে, কিন্তু এমন রূপের জেল্লা কোনও মেয়ের সে দেখেনি। একটা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে শাহজাদা সারকানের দরবারের পথে রওনা হলো। এমন রূপবতী রমণী দেখার সৌভাগ্য রোজ রোজ আসে না।

দরবারে এসে আভূমি আনত হয়ে সওদাগর সারকানকে কুর্নিশ জানায়।

—আজ হুজুরের দরবারে এক অপূর্ব সুন্দরীকে হাজির করছি। জাঁহাপনা স্বচক্ষে দেখে বিচার করুন। রূপে গুণে এমন অতুলনীয়া মেয়ে এর আগে কখনও দামাসকাসে আসেনি, জাঁহাপনা। দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের মধ্যে সবার সেরা।

—ঠিক আছে আনো, দেখতে দাও।

সওদাগর নুজাতের হাত ধরে সারকানের সামনে নিয়ে আসে। মুখের নাকাব সরিয়ে দেয়। সারকান এর আগে তার বোনকে চোখে দেখেনি। সুতরাং চিনতে পারার প্রশ্ন ওঠে না। নুজাৎকে দেখে শরীরে শিহরণ জাগে। এতরূপ এমন ঢলঢলে যৌবন এর আগে কখনও সে দেখেনি।



সওদাগর গুণকীর্তন করতে থাকে, শুধু রূপটাই সব নয় জাঁহাপনা। গুণেরও অন্ত নাই। এমন কোনও বিদ্যা নাই যা তার অজানা। ইচ্ছে হয়, হুজুর পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, অঙ্ক, ইতিহাস জ্যোতির্বিদ্যা—নানা বিষয়ে জ্ঞান তার অসাধারণ।

সারকান মনস্থির করতে এক মুহূর্তও সময় নিলো না। সওদাগরকে বললো, আমার খাজাঞ্চীকে বলো, সে তোমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবে।

সওদাগর বুকে সাহস করে বলে, হুজুর আমি একে বাদশাহ উমর-অল-নুমানের জন্য এনেছিলাম। তা হুজুরের যদি নিজেরই পছন্দ হয়ে থাকে, আমি আরও খুশি হবো। আমি ভেবেছিলাম, হুজুরকে দেখিয়ে একটা চিঠি করে নেব। আপনার চিঠি পেলে বাদশাহ 'না' করতে পারবেন না। তা এখন বুঝেছি তার আর দরকার হবে না। শুধু শাহজাদার কাছে আমার আর্জি ঃ মেয়ে কেনাবেচাই আমার ব্যবসা। এর জন্য সুলতানকে যে কর দিতে হয় সেই কর থেকে আমাকে রেহাই করে দিন।

সারকান বলে, ঠিক আছে, তাই হবে। এখন বলো, কি ইনাম দিতে হবে? কি দামে তুমি একে কিনেছো?

সওদাগর বলে, হুজুর একলক্ষ দিনারে কিনেছি, আর একলক্ষ দিনারের অলঙ্কার আর সাজ-পোশাকে সাজিয়ে এনেছি।

সারকান খাজাঞ্চীকে বললো, সওদাগরকে টাকাটা দিয়ে দাও। আর ওর দালালী

বাবদ আরও বিশ হাজার, এবং বকশিস হিসাবে দামী দামী সাজ-পোশাক দিয়ে বিদায় করো। আর আমার খাজনা দপ্তরে বলে দাও, আজ থেকে সওদাগর যা বাণিজ্য করবে তার সব কর মুকুব করে দিলাম।

এই সময় রজনী শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ষাটতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে।

সারকানের নির্দেশে শহরের চারজন কাজী এসে হাজির হয়। সারকান বলে, আমি বাঁদীকে কিনেছি। তার সব দায় দেনা থেকে আমি রেহাই দিলাম। এখন আমার ইচ্ছা, ওকে শাদী করে বেগম করবো। তোমরা তার সাক্ষী হবে। কাগজপত্র সব তৈরি করো।

কাজীরা তড়ি ঘড়ি শাদীর হলফনামা তৈরি করে দিলে। সারকান উপস্থিত সকলকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা এবং মূল্যবান সাজ-পোশাক উপহার দিয়ে বিদায় করলো। শুধু রইলো চার কাজী আর সেই সওদাগর। সারকান বলছে, এই বাঁদী শুধু রূপে নয়, নানা বিদ্যায় বিদুষী। এবং অসাধারণ গুণবতী। তোমাদের সামনে সে তার গুণের পরীক্ষা দেবে। বিচার করে বলবে, সওদাগরের গুণকীর্তন কতখানি সত্যি।

একটা বিরাট কক্ষের মাঝখানে পর্দার আড়ালে নুজাৎকে বসানো হয়েছে। পর্দার এপাশে বসেছে শহরের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা। একটু পরে পর্দাটা একটু নিচে করে দেওয়া হলো। মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। নুজাতের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে সকলে। কেউ বলে, বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী। কেউ বলে, হুরীরাও কি এতো সুন্দর হয়! কেউ বা তামাশা করে টিপ্পনি কাটে, ঝাড়বাতিগুলোর আর কি দরকার, এমনিতেই ঘর আলো হয়ে গেছে।

তামাশা নয়, সত্যিই নুজতের রূপের জেল্লায় মেয়েদের চোখ ঝলসে যায়। নুজাৎ উঠে এসে সবাইকে মৃদু সম্ভাষণে স্বাগত জানায়। তার মধুর বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ হয় সকলে। মেয়েরা আদর করে বলে, তোমার রূপের আলোয় সুলতানের ঘর আলো হয়ে উঠবে।

পর্দার এপাশ থেকে সারকান বলে, সুন্দরী, তোমার জ্ঞান গরিমার কথা অনেক শুনেছি। এবার আমাদের কিছু নীতি কথা শোনাও।

নুজাৎ বলে, আপনার আদেশ শিরোধার্য, জাঁহাপনা। আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। আমি প্রথমে বলছি, প্রাথমিক আচরণ বিধির কথা। একটি পরিপূর্ণ জীবনের অর্থ—ক্রম বিকশিত উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলশ্রুতি। আর জীবনের প্রধান উৎসাহ আসে কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকে। বাসনার অতৃপ্ত আগুনে না পুড়তে থাকলে উৎসাহ উদ্দীপনা আসতে পারে না। রাজনীতি, বাণিজ্য, সংসার ধর্ম এবং শিল্পকলা এই চারপ্রকার বিষয়ে মানুষ তার কুশলতা দেখাতে উৎসাহিত হয়ে থাকে।

রাজনীতি—অর্থৎ যে নীতি দ্বারা দেশের শাসনব্যবস্থা মজবুত হয়। জনগণ সুখে সমৃদ্ধিতে বসবাস করতে পারে। দেশের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় থাকে। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা এবং স্থিতি বজায় থাকে। সাধারণ মানুষ সরকারের প্রতি আস্থাবান থাকে।

পারস্যের তৃতীয় শাহ মহামান্য আরদাশির বলেছেন, 'সরকার' 'আস্থা' এরা যমজ বোন। আস্থা হচ্ছে সম্পদ আর সরকার হচ্ছে রক্ষক।

আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, দুনিয়াতে দু'টিমাত্র বস্তু সবচেয়ে ক্ষমতাবান। ন্যায় আর অন্যায়। যখন সবাই ন্যায় ধর্ম মেনে চলে, তখন তামাম দুনিয়া সুন্দর হয়ে ওঠে। আর সবাই যখন অন্যায়ের পথ বেছে নেয়, তখন দুনিয়া কলুষিত হয়ে পড়ে।

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে—প্রত্যেক সুলতানের উচিত আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। তিনি অসি এবং মসির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে নির্দেশ করেছেন। (মানুষের বাহুবলকে তিনি 'অসি' এবং বুদ্ধিবলকে 'মসি'—অর্থাৎ কলম আখ্যা দিয়েছেন।) তা না হলে, অসির যত বিক্রমই থাক মসির কাছে সে পরাজিত হতে বাধ্য। শুধু অসি বলে সিংহাসন রক্ষা করা অসম্ভব। বুদ্ধির কৌশলে সে সিংহাসনের পতন ঘটা বিচিত্র নয়।

বাদশাহ আরদাশির তার বিশাল সলতানিয়ৎকে চার ভাগে বিভক্ত করে শাসনকার্য চালাতেন। প্রতিটি সুবার নিদর্শন হিসাবে এক একটি মোহরাঙ্কিত আংটি ধারণ করতেন। এর ফলে চারটি সুবার শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো। একটি সুবার বিক্ষোভ অন্য সুবায় সংক্রামিত হতে পারতো না। তাঁর এই শাসননীতি ইসলামের শাসন কাল পর্যন্ত সব সুলতানরা মেনে চলেছিলো।

পারস্যাধিপতি মহামান্য শাহেনশাহ কাসরা, তার অন্যতম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পুত্রকে একবার লিখেছিলেন...

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একষট্টিতম রাতে আবার সে বলতে শুরু করে।

পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'বাবা, একটা কথা মনে রেখো, অহেতুক কারো প্রতি করুণা প্রদর্শন করো না। এতে সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে।' আবার এও তিনি লিখেছিলেন, 'কিন্তু যেখানে মার্জনা প্রয়োজন সেখানে রূঢ় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এতে তারা বিদ্রোহী হবে।'

এক আরবীয় দার্শনিক খলিফা আবুজাফর আবদাল্লাহ অল-মনসুর-এর দরবারে একবার বলেছিলেন, 'আপনি যখন অনশন করবেন তখন আপনার কুকুরকেও নিশ্চয় না খাইয়ে আপনার অনুগত করে রাখতে চাইবেন। কিন্তু সাবধান, পথ চলতি মানুষ যেন না তাকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে যায়।' অল-মনসুর দার্শনিকের এ কথায় জীবনে বহুবার বহুভাবে উপকৃত হয়েছিলেন।

খলিফা আবদ্-অল মানিক ইবন্ অল মারবান মিশরে তার সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ, ভ্রাতা আবদ্ অল আজিজকে একবার লিখেছিলেন, তোমার পরামর্শদাতারা তোমাকে কোনও শিক্ষাই দিতে পারেনি। শিক্ষা লাভ করেছো তোমার শত্রুর কাছ থেকে। কি করে নিজের সৈনাবাহিনী আরও শক্তিশালী রাখতে হয় তারা তোমাকে সেই জ্ঞান দিয়েছে।

জ্ঞানবৃদ্ধ খলিফা উমর ইবন খাতাব তাঁর দরবারে যাদের উচ্চপদে বহাল করতেন তাদের প্রত্যেককে হলফনামা দিতে হতো—ভারাক্রান্ত পশুর পিঠে চাপবে না, শত্রুর সামান অপহরণ করবে না, কখনও সাহেবীয়ানা পোশাক পরবে না এবং নামাজ পাঠের সময় বিলম্ব করবে না। তিনি বলতেন জ্ঞানই প্রকৃত ঐশ্বর্য। বিচক্ষণতাই একমাত্র মন্ত্র এবং বিদ্যার্জনের গৌরব।

উমর আরও বলেছেন, তিন প্রকারের রমণী আছে। যে মুসলমান রমণী কেবলমাত্র পতিঅন্ত প্রাণ সে আদর্শ। যে মুসলমান রমণী কেবলমাত্র সন্তানের জন্য স্বামী সঙ্গ চায় সেও ভালো। কিন্তু যে নারী পরপুরুষের সঙ্গে মাতামাতি করে সে অত্যন্ত খারাপ। তার সাহচর্য পরিহার করে চলবে।

উমর বলেছেন, তিন রকমের পুরুষও আছে সংসারে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার বিবেচনা করে কাজে হাত দেয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে নিজে বিচার বিবেচনা করে, এবং পরে অন্যের কাছে পরামর্শ নিয়ে কাজে হাত দেয়। আর নির্বোধরা না করে চিন্তা, না নেয় উপদেশ।

দার্শনিক আলী-ইবন্ তালিব বলেছেন, নারীর ছলাকলা সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। ভুলেও কখনও তাদের পরামর্শ নিও না। কিন্তু সাবধান, তাদের কখনও অখুশি রেখো না, এর পরিণাম আরও খারাপ হয়। তারা জাহান্নমের পথে পা বাড়াতে পারে।

নুজাতের এবম্বিধ-জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনে কাজীরা মুগ্ধ হয়ে বলে, ইয়া আল্লাহ, এমন উপদেশের বাণী আমরাও তো জানি না।

নুজাৎ বলে, মানবতার তিনটি দিক নিয়ে অন্য আর একদিন আলোচনা করবো। আজ আচরণবিধি ও বিচক্ষণতার দ্বিতীয় পর্যায় ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছি ঃ দ্বিতীয় পর্যায়—অর্থাৎ পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতার স্তরে কোনও সাধারণ মানুষ চেষ্টা করে পৌঁছতে পারে না। এখানে পৌঁছতে গেলে জন্মগত গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। এখানে আমি শুধু দু-একটা উদাহরণ খাড়া করবো।

এই সময় রজনীর অবসানে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন বাষট্টিতম রজনীতে আবার বলতে শুরু করে।

নুজাৎ বলে, একদিন খলিফা মুয়াবিয়াহ শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে দেখলেন ল্যাংড়া রসিক আবু বাহর ইবন কাইস জনে জনে ভিক্ষা মাগছে। খলিফা সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বাণীটানী ছাড়ো তো হে।



ল্যাংড়া বললো, ধর্মাবতার, প্রতিদিন আপনি মাথা কামাবেন, গোঁফ ছাঁটবেন, নখ বাড়ছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন, আপনার দাঁত মুখ সাফা রাখবেন। কিন্তু সাবধান, ভুলেও কখনই জুম্মাবারে এসব করবেন না। এই-ই 'পবিত্র' বিধান।

খলিফা বললেন, আচ্ছা আমাকে না হয় বাণী দিলে, এবার জিজ্ঞেস করি, তোমার নিজের সম্পর্কে কি কি বিধান মেনে চলো তুমি?

—আমি হুজুর, এক পা সামনে ফেলার আগে দু পা-ই ভালো করে দেখে নিই।

খলিফা প্রশ্ন করলো, তুমি তোমার জ্যেষ্ঠদের প্রতি কিরূপ আচার-আচরণ করে থাকো?

—আমি বাড়াবাড়ি না করে তাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখাই এবং তারাও তাদের আশীর্বাদ জানাবে, এই প্রত্যাশা করি।

খলিফা, এবার রসের প্রশ্ন করেন, তুমি তোমার বিবির সঙ্গে কি রূপ আচরণ কর, ল্যাংড়াসাহেব?

আবু বাহর লজ্জিতভাবে মুখ নিচু করে। জাঁহাপনা, আমাকে মাফ করবেন, সে কথা আমি বলতে পারবো না।

—আরে বলই না, লজ্জার কি আছে?

ল্যাংড়া দেখলো নিরুপায়। স্বয়ং খলিফার শুনতে সাধ হয়েছে। বলতেই হবে।—শুনুন, জাঁহাপনা, আমার বিবি খুব দুবলা আর কুঁজো। চিৎ হয়ে শুতে পারে না।

সুলতান গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে, তা হলে তো বিপদ।

—কেন, বিপদ কেন, হুজুর?

—চিৎ হয়ে শুতে না পারলে শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ-এ টিকটিকির খেলা দেখে কি করে?

ল্যাংড়া জবাব দিতে দেরি করে না।—জী হুজুর, বিবি আমার উপুর হয়ে শুয়ে নেংটি ইঁদুরের লুটোপুটি দেখতেই ভালোবাসে।

খলিফা ল্যাংড়ার বাক-চাতুর্যে মুগ্ধ হন। তারিফ জানিয়ে বলেন, সাবাস! তোমার কথায় খুব খুশি হয়েছি। বলো, কি চাও? আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চাই।

ল্যাংড়া বলে, সত্যপথে থেকে প্রজাপালন করুন—এই আমার একমাত্র কামনা। আর কিছু চাই না।

এই বলে ল্যাংড়া আবু বাহর আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে খলিফার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

খলিফা আনন্দিত হয়ে বললেন, সমগ্র ইরাকে যদি আর একজনও জ্ঞানী ব্যক্তি না থাকে তাতেও আমার দুঃখ নাই। আবু বাহর একাই একশো।

রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন তেষট্টিতম রাতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

নুজাৎ বলে, খলিফা উমর ইবন অল-খাতাবের শাসনকালে কোষাগারের খাজাঞ্চী ছিলেন বৃদ্ধ মুয়াইকিব। তার মতো ধর্মপ্রাণ সৎব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়। একদিন খলিফা উমরের ছোট ছেলেটি আয়ার হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে বৃদ্ধ মুয়াইকিবের কাছে এসেছিলো। বৃদ্ধ খাজাঞ্চী তাকে আদর করে একটা আনকোরা চকচকে রূপোর দিরহাম হাতে দেয়। এর কয়েকদিন বাদে খলিফা খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন, তোমার নামে এসব কি শুনছি খাজাঞ্চী?

—কী শুনেছেন, জাঁহাপনা?

—কোষাগার থেকে তুমি অর্থ অপহরণ করেছো!

—ইয়া আল্লাহ, একি শোনালেন, হুজুর। সারা জীবনে আমি কারো একটা দিরহাম নিইনি।

—কিন্তু তা হলে আমার বাচ্চাটাকে একটা দিরহাম দিলে কোথা থেকে?

বৃদ্ধ আশ্বস্ত হন।—ও, এই কথা, একখানা খাতা এনে সুলতানের সামনে মেলে ধরে, এই দেখুন জাঁহাপনা, শাহজাদার নামে এক দিরহাম খরচ লিখে রেখেছি।

খলিফা তবু সন্তুষ্ট হতে পারেন না।—কিন্তু কার পয়সা তাকে দিয়েছ? সমগ্র মুসলমান জাতের কাছে ঋণী করে রাখলে তাকে?

মুরাইকিব অবাক বিস্ময়ে খলিফার দিকে চেয়ে থাকে। সারা জীবনে সে নিজেকেই একমাত্র সৎ বলে মনে করে এসেছে। আজ মনে হলো, সুলতান উমরের কাছে তার সততা নিতান্তই নগণ্য।

একদিন অন্ধকার রাতে আসলাম আবু জাইদকে সঙ্গে নিয়ে খলিফা উমর শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে অদূরে একটা আলোর শিখা দেখতে পেয়ে কাছে গেলেন। দেখলেন, এক রমণী রাস্তার একপাশে কাঠ জ্বালিয়ে একটা হাঁড়িতে জল গরম করছে। ছোট ছোট দু'টি রুগ্ন শিশু তার পাশে বসে আছে। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ গা মেয়ে, এই অন্ধকার রাতে রাস্তার উপর বসে কি করছো?

—একটু পানি গরম করছি, বাবা। আমার বাচ্চা দু'টোর খাবার-দাবার কিছুই জোগাড় হয়নি। তাই একটু পানি গরম করে খাওয়াবো। আমার দুঃখের কথা আর কাকে বলবো, খোদাতালা দেখছেন। আমার দুধের বাছারা এক মুঠো দানা পায় না। খলিফাকে একদিন এর জন্যে আল্লার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

খলিফা বলেন, ওগো ভালোমানুষের মেয়ে, তোমার কি ধারণা, তোমাদের এই দুঃখ কষ্ট জেনেও খলিফা চুপ করে বসে আছেন? এত বড় শহরে কে কোথায় না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, না বললে, তিনি জানবেন কি করে?

মেয়েটি এবার ঝাঁঝালো সুরে চটে ওঠে, প্রজাদের সুখ দুঃখের খবরই যদি তিনি না রাখতে পারেন তবে খলিফা হওয়ার অত সাধ কেন?

খলিফা তার কোন জবাব দিতে পারেন না। আসলাম আবু জাইদকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন। ভাঁড়ার থেকে চটপট এক বস্তা আটা আর এক ঝারি চর্বি নিয়ে আসেন। আবু জাইদকে বলেন, ধরো তো জাইদ, আটার বস্তাটা আমার পিঠে তুলে দাও।

আবু জাইদ অবাক হয়।—সে কি জাঁহাপনা, আপনি পিঠে বয়ে নিয়ে যাবেন? কোনও চাকরকে ডাকছি, সে দিয়ে আসবে মেয়েটার কাছে।

—তা হয় না জাইদ।

—তা হলে, আমাকে দিন, আমি পিঠে বয়ে দিয়ে আসছি, জাঁহাপনা!

খলিফা বলেন, তা হতে পারে না জাইদ। আল্লাহর দরবারে শেষ বিচারের দিন, আমার পাপের বোঝা কি তুমি পিঠে বইবে?

খলিফা নিজেই বয়ে নিয়ে গেলেন সেই আটার বস্তা আর চর্বির ঝারি। সেই গরীব মেয়েটির পাশে নামিয়ে নিজেই খানিকটা আটা মেখে পরটা বানাতে লাগলেন। অনেক কসরৎ করে সেই নিভু নিভু আগুনের আঁচে পরটাগুলো ভাজা করে বাচ্চা দু'টো আর তার মাকে পেটপুরে খাওয়ালেন। ওদের খাওয়া শেষ হলে একখানা ঠাণ্ডা চিমসে পরটা নিয়ে খলিফা নিজেও খেলেন। অনেকক্ষণ আগের ভাজা, তখন আর গরম ছিলো না।

বাকী আটা চর্বি সব মেয়েটিকে দিয়ে খলিফা প্রাসাদের পথে রওনা হলেন। আসতে আসতে আবু জাইদকে বললেন, মেয়েটির কথায় আজ আমার চোখের পর্দা সরে গেছে, সব অন্ধকার কেটে গেছে। ও নিজেই একটা জ্বলন্ত আগুনের শিখা।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন চৌষট্টিতম রাতে আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

নুজাৎ নীতি কথা শোনাচ্ছে ঃ

একদিন খলিফা উমর মাঠের পথ ধরে হেঁটে চলেছেন। দেখলেন, এক রাখাল কতকগুলো ছাগল চরাচ্ছে। খলিফা ছেলেটির কাছে গিয়ে বললেন, আমায় একটা ছাগল বিক্রি করবে?

রাখাল ছেলেটি অবাক হয়। বলে, ছাগলগুলোতো আমার নয়, জনাব। আপনি যদি কিনতে চান, আমার মালিকের সঙ্গে কথা বলুন। আমি তার কেনা গোলাম।

খলিফা মুগ্ধ হলেন। দুনিয়াতে অসৎ লোকের ভিড়ে এমন একটা সৎ ছেলের সন্ধান পেলে আনন্দ হওয়ারই কথা। খলিফা বললেন, তোমার মালিকের কাছে চলো। আমি তোমাকেই কিনতে চাই।

—কেন জনাব?

খলিফা বললেন, পথে বেরুলেই রোজ রোজ সৎ মানুষের দেখা মেলে না। আজ তোমাকে দেখে আমি ধন্য হয়েছি। তোমার মালিকের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। আর কোনও ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে তোমাকে দাসত্ব করতে হবে না। তোমার যেখানে খুশি যেতে পারবে। যা প্রাণ চায়, করতে পারবে।

একদিন হাফসা নামে খলিফার এক নিকট আত্মীয় এসে বলে, ধর্মাবতার, শুনলাম, আপনি অনেক ধনদৌলত নিয়ে দেশে ফিরছেন। তা আমি তো আপনার এক শরিক। আমার ভাগের অংশটুকু আমি নিতে এসেছি।

উমর বলে, আল্লাহ আমাকে শুধুমাত্র রক্ষক করে পাঠিয়েছেন। ধন দৌলত যা কিছু আমার বলে মনে করছ, সবই আমার মুসলমান প্রজাদের সম্পত্তি। তার একটি কানাকড়িও

আমার নয়। তাছাড়া প্রজা হিসাবেও তোমাকে কিছু দিতে পারি না। তার কারণ তোমার বাবা আমার সহোদর ভাই। লোকে বলবে, স্বজন পোষণ করছি।

নুজাৎ শুনতে পায় পর্দার ওপার থেকে—বহুৎ খুব বহুৎ খুব আওয়াজ উঠছে। হাততালিতে সারা ঘর ফেটে পড়েছে। নুজাৎ একটুক্ষণ থেমে থাকে। করতালি থামলে আবার শুরু করে ঃ

এবার আমি তৃতীয় পর্যায়ের কথা বলবো। পুণ্যবানরা এই স্তরে পৌঁছতে পারে।

হাসান অল বসরি বলেছেন, মানুষ তার অন্তিম সময়ে এই তিনটি কথা স্মরণ করে দুঃখ পায়। এক—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা। দুই—অপূর্ণ বাসনা। তিন—অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

একদিন সুফিয়াকে একদল লোক জিজ্ঞেস করেছিলো, ধনীরা কি পুণ্যবান হতে পারে?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, পারে। যখন তারা তাদের ধনদৌলত খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়, তখন পারে। আর পারে, যখন সে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করতে পারে। 'আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই দান গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন, এই কথা যে অন্তর থেকে বলে দান করতে পারে—সে পুণ্যাত্মা'।

আবদাল্লাহ ইবন সাদ্দাদ মৃত্যুকালে তার পুত্র মহম্মদকে ডেকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ ধর্মে মতি রেখো, সৎ পথে চলো এবং আল্লাহর প্রতি ভক্তি যেন তোমার অটুট থাকে। আর একটা কথা খুব ভালো করে মনে রেখো, বাবা, সম্পদে সুখ হতে পারে, কিন্তু আনন্দ পাবে না। ভোগে কোনও আনন্দ নাই, ত্যাগেই 'পরম পাওয়া' পেতে পারো।

ধর্মাত্মা আবদ অল আজিজ যখন উমায়াদের অষ্টম খলিফা হয়ে সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি একদিন শহরের বিত্তবানদের ডেকে বললেন, তোমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়সম্পত্তি রেখে বাকী সব সরকারের তহবিলে জমা করে দাও।

খলিফার এই কথা শুনে তারা ক্ষুব্ধ হলো। খলিফার পিসি ফতিমার কাছে গিয়ে নালিশ জানালো। ফতিমাকে খলিফা বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। একদিন রাতে ফতিমা খলিফার শয়নকক্ষে এসে গালিচার একপাশে চুপ করে বসে রইলো।

খলিফা জিজ্ঞেস করেন, কি খবর পিসিমা, কি বলবে, বলো।

ফতিমা বলে, তুমি হচ্ছ ধর্মাবতার খলিফা। তোমার সামনে এসে আগে আমার কথা বলা সাজে না। যা প্রশ্ন করবে, আমি তার জবাব দেব, এইটাই রীতি। আর তোমার অজানা তো কিছুই থাকতে পারে না। কেন এসেছি, তাও তুমি জান।



খলিফা বললেন, আল্লাহ তার পয়গম্বরকে পাঠান, মানুষের মাঝে খুসবু ছড়াতে। এবং মানব ধর্মের উন্মেষ ঘটাতে। নদী যেমন তৃষ্ণার্তকে জল দান করতে করতে বয়ে যায় পয়গম্বর-এর পুণ্য-জীবনও ঠিক তেমনি। তিনি নিজে কিছুই গ্রহণ করেন না। দান করতে করতে চলে যান। তাকে অবলম্বন করে কত লোকে বৈতরণী পার হয়। আর আমার একমাত্র কাজ—এই স্রোতস্বিনী যাতে শুকিয়ে মরুভূমি না হয়ে যায়—তাই দেখা।

এই সময়ে ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন পয়ষট্টিতম রাতে আবার গল্প শুরু হয়।

শাহরাজাদ বলতে থাকে, তারপর শুনুন জাঁহাপনা, পর্দার ওপার থেকে নুজাৎ নীতি কথা বলে চলেছে। আর পর্দার এপাশে সারকান চার কাজী ও সওদাগরকে সঙ্গে নিয়ে গভীর আগ্রহে শুনছেন ঃ

ফতিমা বলে, তোমার সব কথাই আমি বুঝতে পেরেছি বেটা। যে কথা জানতে এসেছিলাম তার জবাব আমি পেয়ে গেছি। আর কিছু বলার নাই।

ফতিমা ফিরে গিয়ে বিত্তবানদের বললো, তোমাদের জন্মজন্মান্তরের ভাগ্য যে, খলিফা উমর ইবন আবিদ-অল-আজিজের মতো সুলতান পেয়েছ। সে যা বলে, মাথা পেতে নাও।

স্পষ্টবাদী উমর মৃত্যুকালে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়ে গেছেন ঃ দারিদ্র্য অভিপ্রেত নয়, কিন্তু দারিদ্র্যের স্পর্শ শোঁকার প্রয়োজন অপরিহার্য। আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে গেলে দারিদ্র্যের স্পর্শ অনুভব করতে হবে।

তাঁর শয্যাপার্শ্বে মসলামাহ ইবন আবদ অল মালিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, লোকে বলছে আপনি আপনার সন্তানদের সম্পত্তির এক কপর্দকও দিয়ে গেলেন না। অথচ ইচ্ছা করলেই বিত্তবান করে রেখে যেতে পারতেন।

খলিফা অবাক এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তুমি কি বলতে চাও মসলামাহ, সারা জীবন ধরে ন্যায় পথে চলে, শেষে মৃত্যুকালে এই জঘন্য মিথ্যাচার করে যাবো! তাহলে সারা জীবন ধরে যেটুকু পুণ্য সঞ্চয় করেছি—এক ফুৎকারে উবে গিয়ে আমার জন্যে দোজকের দরজা খুলে যাবে যে? ছোটবেলায়, মনে আছে, আমার এক পূর্বসুরীর শব যাত্রায় সামিল হয়েছিলাম। তিনি তার জীবদ্দশায়, অন্যায় অনাচার, অবিচারের চূড়ান্ত করেছিলেন। ফলে তার মৃত্যুতে লোকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলো। আল্লাহর কাছে নালিশ জানিয়েছিলো, তার যেন দোজক বাস হয়। সেইদিন থেকে আমি হলফ করেছিলাম, তার মতো অসৎ ব্যবহার আমি যেন মানুষের সঙ্গে না করি। আমি যদি খলিফা হই, আমার প্রজারা যেন বলতে না পারে, আমি কোনও অন্যায় অবিচার করেছি।

এই মসলামাহ অল মালিক একবার বলেছিলেন, একদিন এক ইচ্ছামৃত বৃদ্ধের শবদেহ সমাধিস্থ করে রাত্রে শুয়েছি—স্বপ্নে দেখলাম, সেই বৃদ্ধ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন।—শোনো, মসলামাহ, জীবনে এমন কিছু কাজ করে যাবে যার জন্যে পুরস্কার আশা করতে পারো।

তিনি একটা কিস্‌সাও বলেছিলেন ঃ উমর ইবন আবদ্ অল-আজিজের শাসনকালে এক যুবক তার এক রাখাল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। একপাল ছাগল ভেড়ার মাঝখানে ইয়া তাগড়াই এক জোড়া কুকুর দেখে অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দোস্ত, তোমার এই ছাগল ভেড়ার মধ্যে ঐরকম জাঁদরেল কুকুর দু'টো রেখেছো কেন?

রাখাল বন্ধু জবাব দেয়, উহুঁ, ওদু'টো আসলে কুকুর না।

—তবে?

—পোষ মানানো নেকড়ে।

—কী করে পোষ মানালে? ওরা ছাগল ভেড়া খেয়ে ফেলে না?

—মারের ভয় দেখিয়ে। ওরা জানে থাবা বাড়ালে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব আমি। আসল কথা কি জান দোস্ত, কাল্লা শক্ত থাকলে ধড়েও তাগদ থাকে।

একদিন খলিফা উমর ইবন আবিদ-অল-আজিজ মাটির তৈরি একটা সিংহাসনে বসে প্রজাদের উদ্দেশে বাণী দিলেন, আবদ্ অল মালিক মারা গেলেন, তারা বাবাও গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কি দুর্ভাগ্য, তাঁরা কোনও সুনাম রেখে যেতে পারেননি। আমিও তো ঐভাবেই একদিন মরে হারিয়ে যাবো। তাই আজ বিনোদনের সব উপকরণ এখন থেকে আমি পরিহার করে চলবো।

—কিন্তু তাই বলে, মসলামাহ বললেন, মাটির আসনে বসা আপনার শোভা পায় না। একখানা কুশন পেতেও বসুন, জাঁহাপনা।

খলিফা চটে উঠলেন, 'শেষ বিচারের দিন' ঐ কুশন যখন শিকল বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে আমার গলায়, তোমার খুব আনন্দ হবে, না?

এমন সময় রজনী প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন ছেষট্টিতম রজনীতে আবার যথাসময়ে কাহিনী শুরু হয়।

নুজাৎ বলছে আর চার কাজী ও সওদাগর সহ সুলতান সারকান শুনছে ঃ খলিফা আবিদ-অল-আজিজ একদিন বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে চিরজীবী করে পাঠাননি। যে কোন ধর্মাত্মার কাছে মৃত্যুই তাঁর সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

একদিন খলিফা হিসারাম এক তাঁবুতে তার পাত্রমিত্র পারিষদ পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় খলিদ ইবন সফবান এসে বললেন, ধর্মাবতার আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আজ আপনাকে নীতিগর্ভ কাহিনী শুনিয়ে যাবো।

এক সুলতান একদিন তার পারিষদদের বলেছিলেন, আমার মতো মহান উদার দয়ালু এবং বিত্তশালী বাদশাহ কি তোমরা কখনও দেখেছো?

তখন এক প্রবীণ বিজ্ঞ ধর্মানুরাগী পারিষদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জাঁহাপনা, আপনি খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন। যাই হোক, জবাব দেবার আগে সবিনয়ে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই—আপনি কি মনে করেন আপনার এই অতুল বৈভব চিরস্থায়ী হবে?

সুলতান জবাব দিলেন, ধনদৌলত কখনও চিরস্থায়ী হয় না।

পারিষদ বললেন, তাহলে আপনি অত গর্ব করে এরকম প্রশ্ন করছেন কেন?

খলিফা বললেন, তা হলে আমার কি করা উচিত, বলো।

—নিজেকে নির্মল পবিত্র রাখুন। পাপ-চিন্তা করবেন না। অহঙ্কার পরিত্যাগ করুন। অনাড়ম্বর জীবনযাপন করুন। আল্লাহর পায়ে নিজেকে সঁপে দিন।

সেই দিন থেকে খলিফা মাথার মুকুট খুলে নামিয়ে রাখলেন। বাদশাহী সাজপোশাক ফেলে দিয়ে দীন দরিত্র যে পোশাক পরে সেই মোটা জামা কাপড় পরলেন। একটি মাত্র কম্বল সম্বল করে মক্কার পথে যাত্রা করলেন।

এই সময় পর্দার ওপার থেকে চার কাজী আর সওদাগর তারিফ জানিয়ে বললেন, আহা-হা, কি কথাই শুনলাম। অমৃত সমান। শুনে জীবন সার্থক হয়ে গেলো।

নুজাৎ বলে, এই পর্যায়ে আরও অনেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু আজ এই আসরে সব শোনানো সম্ভব নয়। যদি সুযোগ হয়, আর একদিন শোনাবো।

এই বলে নুজাৎ চুপ করলো।

এই সময়ে প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ, গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন সাতষট্টিতম রজনী।

শাহরাজাদ গল্প শুরু করে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা, চার কাজী নুজাতের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। এ রমণী যুগের আলো। দেশের গৌরব। আমাদের সুলতান পরম ভাগ্যবান। তার মতো রূপে গুণে অনন্যা আর একটিও আমাদের চোখ পড়েনি।

এই বলে তারা সকলে সারকানকে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিলো।

সারকান তার দাসদাসীদের ডেকে হুকুম দিলো, জলদি শাদীর আসর সাজাও। শাহী খানা পাকাও। আজ রাতে আমি শাদী করবো।

মুহূর্তের মধ্যে সারা প্রাসাদে সাজো সাজো রব পড়ে গেলো। সন্ধ্যা না হতেই আলার মালায় সাজানো হলো প্রাসাদ। দামাসকাসের বাহারী ফুল এলো, আতর গোলাপজল, সুগন্ধী আগরবাতি এলো, এলো দামী দামী সরাব, মাংস, মিঠাই মণ্ডা। উৎসবে মেতে উঠলো সবাই। আমীর ওমরাহদের বিবিরা—যারা এসেছিলো, সবাইকে শাদী দেখার নিমন্ত্রণ জানালো সারকান। উপস্থিত অভ্যাগতদের এলাহী খানাপিনার ব্যবস্থা করা হলো। শহরের সম্ভ্রান্ত সওদাগর আমির ওমরাহরা এসে সারকানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলো।



হামাম থেকে গোসল সেরে শাদীর আসরে এসে বসলো শাহজাদা সারকান। মেয়েরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালো। কুমারী মেয়েরা নুজাৎকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসে বাসর কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়ে সারকানের সামনে দাঁড় করাতে লাগলো। প্রতিবার নতুন নতুন সাজে সজ্জিত করে পরপর সাতবার নুজাৎকে এইভাবে বাসর কক্ষ প্রদক্ষিণ করানো হলো। শাদীর এই চিরাচরিত প্রথা। সপ্তপদী শেষ হলে নুজাৎকে আবার তারা পাশের ঘরে নিয়ে যায়। এবার রীতি অনুযায়ী তাকে বিবস্ত্রা করা হয়। একজন বৃদ্ধ পরিচারিকা পাত্রীর সর্বাঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। পাত্রীর দেহ পাত্রের সঙ্গে সহবাসের উপযুক্ত হয়েছে কিনা—পরীক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্য তাই। বৃদ্ধা দেখলো পাত্রী একেবারে তৈরি। শুভেচ্ছা জানিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সারকান এবার নুজাতের পাশে বসে। ভাবতেও পারে না, পাত্রী তার নিজেরই বোন। শাদীর প্রথম রাতেই নুজাৎ অন্তঃসত্ত্বা হলো। মিলনের আনন্দে নুজাৎ সারকানের হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সারকান তার একান্ত সচিবকে ডেকে বললো, বাগদাদে খলিফা উমর অল নুমানকে চিঠি পাঠাতে হবে।

সচিব কাগজ কলম নিয়ে এলো। সারকান চিঠির বয়ান বলে যায় ঃ আমি এক পরমা সুন্দরী গুণবতী বাঁদীকে কিনে মুক্ত করে দিয়েছি। এবং পরে তাকে শাদী করে আমার বেগম করে নিয়েছি। প্রথম রাতেই আপনার পুত্রবধূ গর্ভবতী হয়েছে। আপনার আশীর্বাদ নেবার জন্য অতি শীঘ্র তাকে বাগদাদে পাঠাবো। সে তার ননদ নুজাৎ এবং দেবর দু-অল-মাকানকেও দেখে আসবে।

একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর হাতে চিঠিখানা পাঠানো হলো। আটদিন পরে সে জবাব নিয়ে ফিরে আসে।

এই সময়ে রজনী অতিক্রান্ত হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন আটষট্টিতম রাত্রে আবার সে গল্প শুরু করে।

সুলতান উমর অল নুমান-এর চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এইরকম ঃ

প্রাণাধিক পুত্র সারকানের প্রতি শোক দুঃখ জর্জরিত হতভাগ্য পিতা উমর-অল-নুমানের পত্র।

শোন বাবা, তুমি এখান থেকে যাওয়ার পরে নানাভাবে আমার ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়েছে। আমি আজ শোকে তাপে জর্জরিত। আমার প্রিয় পুত্র দু-অল-মাকান এবং নয়নের মণি নুজাৎ আর প্রাসাদ নাই। কাজের তাগিদে বাগদাদ ছেড়ে যেতে হয়েছিলো আমাকে। মাসাধিককাল পরে ফিরে এসে শুনলাম, তোমার ভাই মাকান আর বোন নুজাৎ তীর্থযাত্রীদের দলে ভিড়ে

মক্কায় চলে গেছে। মাকান আমার কাছে বায়না ধরেছিলো, সে মক্কা যাবে। কিন্তু তার এই নাবালক বয়স—এই বয়সে কি কেউ তীর্থধর্ম করতে যায়? আমি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। এও বলেছিলাম, সামনের বারে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। কিন্তু সে-কথা তার মনঃপুত হয়নি। আমাকে লুকিয়ে তার দিদির সঙ্গে সে পালিয়ে চলে গেছে। সেই থেকে অনেক সন্ধান করেছি, মক্কায় লোক পাঠিয়েছি, কিন্তু কোন হদিস করতে পারিনি। শোকে দুঃখে আমি বড় কাতর হয়ে পড়েছি। বিশেষ আর কি লিখি। আগামীতে তোমার কুশল জানাবে।

এর কিছুদিন পরে নুজাৎকে আসন্ন প্রসবা রেখেও সারকান বাগদাদে যেতে বাধ্য হয়। তার কারণ বাবার অসুস্থতা। বাবাকে দেখে সে যখন ফিরে আসে, নুজাৎ তার সাতদিন আগে একটি ফুটফুটে সুন্দর কন্যার জন্ম দিয়েছে।

নুজাৎ বললো, আজ সাতদিনের দিন মেয়ের নামকরণ করতে হয়।

সারকান মেয়েকে কোলে তুলে আদর করতে থাকে। মেয়ের গলার হারে একটা লকেটে তার চোখ আটকে যায়। একি। এতো সেই পাথর! সারকান চিৎকার করে ওঠে, তুমি এ পাথর পেলে কোথায়? এতো সেই তিন দৈব-পাথরের একখানা। হতভাগী ইরবিজা বাবাকে দিয়েছিলো? শিগগির বল্ বাঁদী, কোথায় পেলি তুই এ পাথর?

সারকানের মুখে এই 'বাঁদী' ডাক শুনে নুজাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।—মুখ সামলে কথা বলো। আমি তোমার শাদী করা বেগম। বাঁদী বলতে লজ্জা করলো না? তুমি আমাকে সওদাগরের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কিনেছিলে বলেই ভেবেছো আমি নাম গোত্রহীন একটা বেজন্মা মেয়েমানুষ। তবে শোনো, তুমি যেমন শাহজাদা, আমিও তেমনি শাহজাদী। এতদিন গোপন করে রেখেছিলাম, কিন্তু আজ আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আমার বাবা বাগদাদের উমর অল-নুমান। আমার আসল নাম নুজাৎ-অল-জামান।

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে নুজাৎ হাঁপাতে থাকে।

এই সময়ে রাতের অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামায়।

পরদিন ঊনসত্তরতম রাতে আবার সে শুরু করে।

নুজাতের কথা শুনে সারকান নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একি নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। তার নিজের বোন তার অঙ্কশায়িনী বেগম। ছি ছি ছি! লজ্জায় মাথা কাটা গেলো? হায় আল্লাহ, একি শাস্তি আমাকে দিলে! জীবনে এমন কি পাপ আমি করেছি!

অনুতাপ অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলো তার হৃদয়। সারকানের এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, এই সেই নুজাৎ—উমর-অল-নুমানের কন্যা। সারকান ঠিক ঠিক শুনেছে তো?

নুজাৎও কাঁদতে থাকে, হায় আল্লাহ, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি দিয়ে হবে?

সারকান বলে, না জেনে যা করেছি তার জন্যে আমরা কেন দায়ী হবো। যাই হোক, এখন যখন জানতে পারলাম, তোমার আমার এ সম্পর্ক আর থাকা উচিৎ না। আজই আমি আমার দরবারের এক পদস্থ সচিবের সঙ্গে তোমার শাদীর ব্যবস্থা করছি। আমি বললে সে 'না' করতে পারবে না। আমাদের মেয়েও তার কাছেই মানুষ হবে।

নুজাৎও সারকানের প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। বলে, সেই ভালো, যত তাড়াতাড়ি হয় ব্যবস্থা কর।

সেইদিনই অনাড়ম্বরভাবে নুজাতের শাদী হয়ে গেলো এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। বাচ্চাটার দেখাশুনা করার জন্য সারকান আয়া চাকরের ব্যবস্থা করে দিলো।

এর কয়েকদিন পরে বাগদাদ থেকে দূত এলো উমর-অল-নুমানের বার্তা নিয়ে। সুলতান উমর লিখেছে, এখনও নুজাৎ-মাকানের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সন্তান শোকে

সে মুহ্যমান। কনসতানতিনোপল থেকে এক বুড়ি এসেছে। সঙ্গে এনেছে পাঁচটি পরমাসুন্দরী যুবতী। বুড়ি বলেছে, শুধু রূপ নয় গুণেও নাকি তাদের জুড়ি মেলা ভার। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিদূষী। মেয়ে পাঁচটি উমরের কাছে সে বিক্রি করতে এসেছে। কিন্তু দাম হিসাবে নগদ অর্থ সে চায় না। এখানকার বাহারী জিনিসপত্রে দাম মিটিয়ে দিলেই সে খুশি হবে। বাগদাদের নামজাদা জিনিসপত্র সব জোগাড় করা হয়েছে। এখন সারকান যেন দামাসকাসের নামজাদা সামানপত্র পাঠিয়ে দেয় এখানে। সেই সঙ্গে তার সদ্য-বিবাহিত বিবিকেও পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছে সে। উমর শুনেছিলো, সারকানের স্ত্রী বিদূষী। বুড়ির ঐ মেয়ে পাঁচটিকে যাচাই করে নিতে গেলে পুত্রবধূকে নিতান্তই দরকার। তাই সারকান যেন আর বিলম্ব না করে জিনিসপত্রের সঙ্গে তাকেও সত্বর পাঠিয়ে দেয়।

উমর-অল-নুমানের চিঠিখানা পড়ে সারকান চিন্তিত হয়। কি করা উচিৎ কিছুই ঠিক করতে পারে না। নুজাৎকে ডেকে পাঠায়। সে লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

নুজাৎ এসে সব শুনে বলে, আমি আর কি বলবো, তুমিই এ ব্যাপারে ভালো বুঝবে। তবে আমার মনে হয়, আমাকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। গোড়া থেকে সব বৃত্তান্ত বাবাকে খুলে বলা দরকার। তুমি একটা চিঠিতে লিখে দাও, কিভাবে আমি বাদাবী সর্দারের হাতে গিয়ে পড়ি। তারপর সওদাগরের হাত ঘুরে তোমার হাতেই বা কি করে এলাম, সব লিখে দাও। তুমি আমাকে না জেনে শাদী করেছিলে, তাও লিখবে। শুধু লিখবে না, তুমি আমার সঙ্গে সহবাস করেছো। আমার পরিচয় জানার পর তুমি তোমার দরবারের এক পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আমার আবার শাদী করিয়ে দিয়েছ।

নুজাতের পরামর্শ সারকানের খুব পছন্দ হয়। দামাসকাসের বাজার থেকে দামী দামী বাহারী বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করে উটের পিঠে বোঝাই করা হলো। নুজাতের সঙ্গে বাগদাদে পাঠাবে। প্রতি বছরই বাগদাদে ভেট পাঠানো হয়। এবারে তার বহরটা কিছু বেশি। তার কারণ, স্বয়ং সুলতান নিজে থেকে খৎ পাঠিয়েছে। বাছাই করা দামী দামী জিনিসপত্র পাঠাতে হবে। পাঁচটি গ্রীক সুন্দরীর মূল্য হিসাবে এই সব বিলাস সামগ্রী বুড়িকে দিতে হবে। একটা উটের পিঠে দোলা বাঁধা হলো। এই দোলায় চেপে যাবে নুজাৎ। আর বাকী উটগুলোর পিঠে বাঁধা-ছাঁদা হতে লাগলো জিনিসপত্র। এই সব বাদশাহী ভেটের সামানপত্র দেখার জন্য শহরের কৌতূহলী মানুষ ভিড় করে এলো।



এই সময় দু-অল-মাকান আর তার সঙ্গী সেই বৃদ্ধ শহরের নানা পথ ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে দাঁড়ায়। একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে মাকান জানতে পারে, এই সব লাট-বহর যাবে বাগদাদে। সুলতান উমর-অল-নুমানের ভেট। মাকান-এর চোখ জলে ভরে আসে। বৃদ্ধকে বলে, সে-ও যাবে এদের সঙ্গে। কতদিন হলো বাগদাদ ছেড়ে এসেছে সে। এদের পিছনে পিছনে গেলে একদিন সে বাগদাদে পৌঁছে যাবে। এ সুযোগ সে হারাতে চায় না। বৃদ্ধ বলে, মাকানকে সে একা ছেড়ে দিতে পারে না। সে যদি একান্তই যেতে চায়, বৃদ্ধ তার সঙ্গে যাবে।

গাধাটার পিঠে মাকানকে চাপিয়ে সে বলে, চলতে চলতে তোমার যখন কোমর ধরে যাবে, তখন না হয়, নেমে একটু হেঁটে যেও। হাত পায়ের আড় ভাঙ্গবে। আমি সেই সময় গাধার পিঠে চাপবো।

তিন দিন চলার পর যাত্রীদল এক শহরের মুখে এসে থামে। এইখানে বিশ্রাম নেওয়া হবে। তিন দিন। পথের শ্রান্তি কাটিয়ে আবার তারা রওনা হবে। মাকানও গাধার পিঠ থেকে নামে। বৃদ্ধ গাধাকে দানাপানি খাওয়ায়। নিজেরাও খানাপিনা সারে। একটা সরাইখানায় শোবার জায়গা করে নেয়। চাঁদনী রাত। দক্ষিণা হাওয়া বইছে। দু-অল-মাকানের মন উদাস বাউল হয়ে ওঠে। গুণ গুণ করে গান ধরে। মাকানের গলা বড় মিষ্টি।

ওপাশে নুজাৎরা তাঁবু গেড়েছে। তার সদ্য-বিবাহিত স্বামী পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। অন্য তাঁবুগুলোতে সরকারী কর্মচারী, চাকর নফর দাস দাসীরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। পথশ্রমে ক্লান্ত উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চরগুলোও জিরিয়ে নিচ্ছে। শুধু জেগে আছে প্রহরীরা। আর জেগে আছে নুজাৎ। তার চোখে ঘুম আসে না। কতকাল পরে দেশে ফিরছে—অথচ একা। প্রাসাদ থেকে তারা দুই ভাইবোন একসঙ্গে পথে বেরিয়েছিলো। তারপর পথের মধ্যেই ভাইকে সে হারালো। এখন বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কি করে? কি জবাব-দিহি করবে তার কাছে? কি সান্ত্বনা তাকে দেবে? এই নিদারুণ পুত্রশোক কি করে সহ্য করবেন তিনি। নুজাতের দু' গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামে। হঠাৎ মিষ্টি একটা গানের কলি ভেসে আসে তার কানে। নির্জন নিশুতি রাত। মৃদু কণ্ঠের গাওয়া গানও পরিষ্কার শোনা যায় ঃ

কেমনে বলিবো তারে এ নিদারুণ কথা।
কেমনে জুড়াবো বলো, হৃদয়ের ব্যথা॥

নুজাৎ পিছন হাতড়াতে থাকে। এই গান, এই সুর, এই গলা—এ সবই তো তার চেনা চেনা। মাকানের গলাও ঠিক এমনি মিষ্টি মধুর ছিলো। তার এই গানের সুর—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ে—এই সুরে এই গান সে প্রায়ই গাইতো। দ্বাররক্ষী খোজাকে ডেকে বলে, দেখ তো, কে গান গায়?

খোজা ভাবে, গানের চিৎকারে মালকিন ঘুমোতে পারছে না। একটা বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে যায়। এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। কিন্তু সরাইখানার সামনে সেই বৃদ্ধ ছাড়া আর কাউকেই চোখে পড়ে না। বৃদ্ধের কাছে এসে খোজা কড়া মেজাজে জিজ্ঞেস করে—একটু আগে এখানে গান গাইছিলো কে?

সুলতানের শমন। বৃদ্ধ শঙ্কিত হয়।—কই না, কেউ তো গায়নি বাবা।

খোজা চটে ওঠে, গায়নি মানে? আলবৎ গেয়েছে। আমি নিজে কানে শুনেছি। গায়নি বললেই হলো? আর যদি কেউ না থাকে, তুমিই গেয়েছো।

বৃদ্ধ হাত জোড় করে।—বিশ্বাস করো বাবা, খোজা, আমি বুড়ো হাবড়া মানুষ। আল্লাহর নাম জপতপ করি। কিন্তু গলায় বোমা মারলেও সা বেরুবে না।

খোজা সন্দিগ্ধ চোখে বৃদ্ধের আপাদমস্তক দেখতে থাকে। হুম্, লোকটা নেহাত মিথ্যে বলেনি। চেহারাচরিত্র দেখে অবশ্য মনে হয় না গান-ফান জানে।

—যাই হোক শোনো, শেখ, আমাদের মালকিন-এর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। যেই গা'ক, গান বন্ধ করো। তা না হলে খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে খোজাটা আবার তাঁবুতে ফিরে যায়।

বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাকানের কাছে গিয়ে বলে, সব্বোনাশ হয়ে গেছে, বাবা।

মাকান ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে।—কি সর্বনাশ হলো, বাপ জান? চোর ডাকাত নাকি?

—আরে না। সুলতানের তাঁবু থেকে পেয়াদা এসেছিলো।

—কেন?

—তোমার গান শুনে আমিরের বিবি চটে গেছে। তার ঘুম নষ্ট হচ্ছে। তাই

তোমাকে পাকড়াও করতে এসেছিলো। তা আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। বলেছি, এখানে কে গান গাইবে? শোনো, বাবা, তুমি আর গান টান করো না। না হলে আবার ব্যাটা তেড়ে আসবে।

—আসুক। দেখি কে কি করতে পারে! আমি আমার গান গাইবো। গান গাই না গাই আমার খুশি। আমিরের বিবির ভয়ে আমি গান বন্ধ করবো? কেন?

বৃদ্ধ বলে, বিদেশ বিভুঁই জায়গা। এই সময়ে একটা কিছু বিপদ আপদ ঘটলে কে রক্ষা করবে?

—কেন মাথা কেটে নেবে নাকি? আমার যত খুশি গাইবো। কারো মানা শুনবো না।

বৃদ্ধ কাঁদো কাঁদো হয়ে দরজার সামনে গিয়ে বসে পড়ে।

মাকান আবার গান ধরে ঃ

কেমনে বলিবো তারে এ নিদারুণ কথা।
কেমনে জুড়াবো বলো, হৃদয়ের ব্যথা॥

খোজা গিয়ে বলেছিলো, মালকিন, আশে পাশে কাউকেই দেখলাম না। মনে হচ্ছে পথচলতি কোন মানুষ গাইতে গাইতে চলে গেছে।

নুজাৎ ভেবেছিলো, হতেও পারে। তারই হয়তো মনের ভুল। মাকানের কথাই সে অহরহ চিন্তা করছে। তাই হয়তো অন্য কোনও লোকের গান শুনে মাকানের গলা বলে ভুল হয়েছে। কিন্তু একটু পরে যখন আবার শুনতে পেলো সেই একই গান, নুজাৎ খোজাকে ডেকে বললো, তুমি বোধ হয় ভালো করে তলাশ করে দেখনি। ওই শোনো, আবার গাইছে সেই গান—আর দেরি করো না। যাও দেখে এসো, কে গায়। নিয়ে এসো তাকে।

বৃদ্ধ দেখলো, খোজাটা আবার হন হন করে ছুটে আসছে। মাকান তখন আবার গান থামিয়ে দিয়েছে। খোজাটা কাছে এসে বাজখাই গলায় হুঙ্কার দেয়, এই না বললে, এখানে কেউ গাইছে না। এই তো একটু আগে আবার শুনলাম সেই গান।

—তুমি ভুল শুনেছো, পেয়াদা সাহেব। এই নিশুতি রাতে এখানে কে গান গাইবে!

খোজা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ভুল শুনেছি। ন্যাকামী পেয়েছো? চলো, তোমাকেই ধরে নিয়ে যাবো।

—রক্ষা কর বাবা খোজা সাহেব, আমি কেন আমার চৌদ্দ পুরুষ কেউ গান জানে না।

—তাহলে যে গাইছে তাকে দেখিয়ে দাও।

—কে গাইছে, কাকে দেখিয়ে দেব? আমার মনে হচ্ছে কি জান? মরুভূমির মায়া।

—মরুভূমির মায়া।

বৃদ্ধ বলে, হ্যাঁ মরুভূমির মায়া। রাত্রিবেলায় মরুভূমিতে কত বিচিত্র কাণ্ডকারখানা ঘটে তা শোনোনি? কখনও মনে হয়, বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। আবার কখনও শুনবে কেউ গান গাইছে। আবার অনেকে বলে এইরকম চাঁদনী রাতে নাকি মরুভূমির মাটিতে নেমে আসে হুরী পরীর দল।

খোজাটা অবাক হয়ে শোনে।—তাহলে তুমি বলছো, এ-ও সেইরকম কিছু?

—আমার তো তাই মনে হয়।

খোজা ফিরে গিয়ে নুজাৎকে বলে, ও কিছু না, মালকিন, রেতের বেলা মরুভূমিতে এরকম অনেক কিছুই শোনা যায়। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

কিন্তু নুজাতের ঘুম আর আসে না। বার বারা মাকানের মুখ ভেসে ওঠে।

একটুখানি তন্দ্রা লেগে এসেছিলো। আবার সেই সুর কানে বাজতেই উঠে বসে নুজাৎ। খোজাটাকে ডেকে বলে, তুমি আবার যাও। আমার বিশ্বাস, এ কোনও মায়া নয়। নিশ্চয়ই কোন মানুষই গাইছে। যেমন করে পারো তাকে নিয়ে এসো আমার কাছে। এমনিতে না আসলে—এই নিয়ে যাও এক হাজার মোহর। টাকার লোভ দেখালে সে নিশ্চয়ই আসবে।

খোজার ভুল ভাঙ্গে। সে ভেবেছিলো মালকিনের ঘুম নষ্ট হচ্ছে বলে তাকে ধরে বেঁধে আনতে বলেছিলো। কিন্তু তা তো না। কিছুই বুঝতে পারে না সে। ভাবে—বড়লোকের খেয়াল।

খোজা এবার আর বেতের লাঠিটা সঙ্গে নেয় না। বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, ওগো, বুড়ো বাপজান, তোমার দু'টো পায়ে পড়ি, আমাকে বলে দাও, কে গান গাইছে। না হলে আমার নোকরী থাকবে না। মালকিন একবার শুধু তার সঙ্গে দু'টো কথা বলতে চায়, একটু চোখের দেখা দেখতে চায়। তার জন্যে যদি সে পয়সাকড়ি চায়, তাও দিতে পারি। কথা দিচ্ছি, কোন ভয় নাই। তার কোন ক্ষতি তিনি করবেন না।

বৃদ্ধ কিছুই বুঝতে পারে না। এ আবার কি নতুন চাল! এমন সময় মাকান উঠে আসে দরজার সামনে।

—কী? ব্যাপার কী?

খোজা মাকানের সুপুরুষ বলিষ্ঠ চেহারা দেখে সেলাম ঠুকে বলে, এখানে কে গান গাইছিলো, জনাব?

—কেন, আমি।

খোজা যেন হাতে স্বর্গ পায়।—মেহেরবানী করে আপনি যদি একবার তাঁবুতে আসেন—কোনও ভয় নাই আপনার। আমার মালকিন শুধু একটিবার আপনারসঙ্গে কথা বলতে চান।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন সত্তরতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে।

মাকান চটে ওঠে, কে তোমার মালকিন? আমার সঙ্গে তার কি দরকার? আমি কি তার কেনা বান্দা, সে ডাকলেই যেতে হবে!



খোজা বলে, আপনি গোঁসা করবেন না, হুজুর। আপনি কেন তার গোলাম হতে যাবেন। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, যে গান গাইছে তাকে যেভাবে পারি তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্যে টাকাপয়সা দিতেও তিনি রাজি।

মাকানের অবাক লাগে। এমন আজগুবি কথাও তো সে শোনেনি কখনও। তার গান শুনে পর্দানসীন আমিরের বিবি তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। আবার বলে কিনা টাকাপয়সা চাইলেও দিয়ে নিয়ে আসবে। মনে মনে অপমানিত বোধ করলেও মুখে প্রকাশ করে না। একটা অদম্য কৌতূহল মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। দেখাই যাক না, কি ব্যাপার। বলে, চলে যাবো।

বৃদ্ধ শিউড়ে ওঠে।—সে কি বাবা! ওর কথা তুমি বিশ্বাস করলে? তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে আটকে ফেলবে?

মাকান একটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কেন, আটকাবে কেন, আমি কি কারো পাকা ধানে মই দিয়েছি নাকি?

খোজাটা দু' হাত জোড় করে বলে, না, হুজুর, কোনও ভয় করবেন না। আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনার কোনও ক্ষতি হবে না।

মাকান বলে, হয় হোক, আমি পরোয়া করি না। চলো, যাবো তোমার মালকিনের কাছে।

খোজা তাঁবুর ভিতরে ঢুকে নুজাৎকে জানায়, সে এসেছে।

নুজাৎ বলে, তাকে আবার সেই গানটা গাইতে বলো। আর তার নাম ধাম জিজ্ঞেস কর।

খোজা বাইরে এসে বলে, জনাব, আমার মালকিন আপনার গান শুনতে চাইছেন। আর জানতে চাইছেন, আপনার নাম কি, দেশ কোথায়?

মাকান বলে, গান শোনাচ্ছি। কিন্তু নাম ধাম বলতে চাই না। ভাগ্যের ফেরে আজ আমি পথে পথে ঘুরি। নাম ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।

এই বলে মাকান আবার সেই গান ধরে ঃ

কেমনে বলিবো তারে এ নিদারুণ কথা।
কেমনে জুড়াবো বলো, হৃদয়ের ব্যথা॥

গান শুনে নুজাৎ উন্মাদের মতো ছুটে বেরিয়ে আসে। এতো মাকান—তার প্রাণের ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। মাকানকে দেখে চিৎকার করে ওঠে নুজাৎ, মাকান—মাকান।

আর কিছু বলতে পারে না। অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামায়।

পরদিন একাত্তরতম রাতে আবার শুরু করে ঃ

ছুটে তাঁবুর বাইরে এসে ভাইকে দেখে নুজাৎ, মাকান, মাকান বলে, চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

দু-অল-মাকান দেখে আমির-বিবি আর কেউ না—তার দিদি নুজাৎ। ছুটে গিয়ে নুজাৎকে টেনে তোলে। আনন্দে উত্তেজনায় মাকানও আত্মহারা হয়ে পড়ে। দুই ভাইবোন-এর এই কান্নাকাটি দেখে খোজা ব্যাচারী ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। নুজাৎ মাকানের সারা শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে।

সে রাতে তারা দু'জনে কেউই ঘুমুলো না। মাকান বলে, দিদি, তোমার কাহিনী শোনাও। সেই যে আমাকে জেরুজালেমের সরাইখানায় রেখে তুমি কাজের ধান্দায় বেরুলে, তারপর থেকে তো আমি কিছু জানি না।

নুজাৎ বলে, আমিও তো তোমার কোন কিছু জানি না, ভাই। আগে আমার কাহিনী শোনো। তারপর তোমার কাহিনী শুনবো।

নুজাৎ আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বলে। মাকানও বললো। তার কাহিনী। বললো, ঐ মেহেরবান বৃদ্ধের দয়াতেই সে তার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

মাঝ রাতে নুজাতের স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়। এই গভীর রাতে তার তাঁবুর মধ্যে এক অচেনা যুবককে নুজাতের পাশে দেখে অবাক হয়।

নুজাৎ হাসতে হাসতে বলে, কী? ভাবছো এই রাতে আমি আবার কার সঙ্গে বসে কথা বলছি? এ তো তোমার বড় কুটুম, গো। আমার সহোদর ভাই দু-অল-মাকান। সুলতান উমর-অল-নুমানের ছোট ছেলে।

এই প্রথম নুজাৎ তার স্বামীর কাছে আসল পরিচয় প্রকাশ করলো। স্বামী ব্যাচারী সুলতানের কর্মচারী। নুজাতের কথায় আকাশের চাঁদ হাতে পায়। আরব অধিপতি শাহেনশাহ উমর অল-নুমানের সে জামাতা। গর্বে বুক ভরে ওঠে। শ্বশুর নিশ্চয়ই কোন সুবাদার করে দেবে তাকে। চাকর নফরদের ডেকে হুকুম করলো, আর একটা তাঁবু খাটাও। আমার বড় কুটুমের আদর যত্নের যেন ত্রুটি না হয়।

নুজাৎ বলে, তার আর কি দরকার। আমরা কাল সকালেই তাঁবু উঠিয়ে বাগদাদে রওনা হয়ে যাবো। আজকের রাতটুকু ভাই আমার তাঁবুতেই থাক। এতকাল বাদে আমরা আবার মিলেছি, আজ সারা রাত দু'টো সুখ-দুঃখের কথা বলে কাটাবো।

নুজাতের স্বামী বলে, সেই ভালো, তোমরা ভাই বোন প্রাণের কথা বলো। আমি অন্য তাঁবুতে যাচ্ছি। আর মিঠাই মণ্ডা, ফলমূল, খানাপিনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাইকে আদর যত্ন করে খাওয়াও।

নুজাৎ তার স্বামীকে বললো, সকাল হলেই সেই বৃদ্ধকে এখানে নিয়ে আসবে। তার দয়াতেই ভাই আমার জানে বেঁচে আছে। তার জন্যে একটা ভালো দেখে ঘোড়া এনে দামী জীন লাগাম দিয়ে সাজাও। বাকী পথ সে আর হেঁটে যাবে না।

নুজাতের স্বামীর হুকুমে তখনই খোজা আরও কয়েকজন নফর চাকর সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধের খোঁজে চলে গেলো। বৃদ্ধ তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে গাধাটাকে নিয়ে একটা গাছের তলায় বসে থর থর করে কাঁপছে। খোজাকে দলবল নিয়ে আসতে দেখে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দাখিল। ভাবলো, এবার আর রক্ষা নাই। নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়াবে।

এমন সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

বাহাত্তরতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়।

খোজাটা দলবল নিয়ে বৃদ্ধের সামনে এগিয়ে এসে কপট হুঙ্কার দেয়, ওহে মিথ্যের জাসু, তুমি না বলেছিলে, কে গাইছে জানো না? সে তো বললো, সে তোমার সঙ্গের লোক। চলো, তোমাকে আর ছাড়া হবে না। মালকিনের হুকুম, তোমাকে বাগদাদে নিয়ে গিয়ে সমুচিত সাজা দেওয়া হবে। তোমার সঙ্গীর সঙ্গে তোমাকেও শূলে চাপানো হবে। বুঝেছো? এবার ওঠ, চলো আমাদের সঙ্গে।

বৃদ্ধ ভাবলো, নিয়তি এড়ানো যায় না। এইভাবে মৃত্যু লেখা ছিলো নসীবে। মরতেই হবে। কাঁদতে কাঁদতে খোজার সঙ্গে চললো।

নুজাতের স্বামী খোজাদের বললো, এই বৃদ্ধকে ঘোড়ায় চাপিয়ে বাগদাদে নিয়ে চলো। দেখবে তার যেন কোন অসুবিধে না হয়। সব সময় তোমরা তাকে ঘিরে থাকবে।

খোজা সেলাম ঠুকে বললে, যো হুকুম, জনাব।

চাকর নফররা বৃদ্ধকে ঘিরে নিয়ে চলে। বৃদ্ধ ভাবে, বাগদাদে পৌঁছতে যে ক'টা দিন বাকী, তার পরেই তার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। খোজাকে উদ্দেশ করে বলে, শুনছো কাপ্তেন সাহেব, যে ছেলেটা গান গেয়েছিলো সে কিন্তু আমার কোন আত্মীয়স্বজন কিছু না। জেরুজালেমে আমি একটা পানি গরম করার চাকরী করতাম। একদিন দেখি আমার কাঠগুদামের পাশে ছেলেটিকে আধমরা অবস্থায় কে বা কারা ফেলে গেছে। আমি তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর যত্ন করে বাঁচিয়েছি। তারপর থেকে এই দেড়খানা বছর সে আমার কাছেই আছে। আমি যা খাই সে-ও তাই খায়। আমি যখন যেভাবে থাকি সে-ও সেইভাবে থাকে। এর বেশি তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। তা তোমরা যদি তার সঙ্গে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চাও, কর। কি আর বলবো, বলো।

খোজা মজা করে বলে, ওসব কোনও অজুহাত শুনতে চাই না বুড়ো বাবা। তোমরা দু'জনেই আমার মালকিনের ঘুম নষ্ট করেছ। সাজা দু'জনকে সমান পেতে হবে।

চলার পথে যখনই খানাপিনার জন্যে থামে খোজা ভালো ভালো খানাপিনা এনে দেয় বৃদ্ধকে। বলে, যে ক'টা দিন বাঁচো, প্রাণ ভরে ভালো মন্দ খেয়ে নাও। যা খেতে ইচ্ছে, বলো। এনে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ বলে, সামনে খাঁড়া ঝুলিয়ে মিঠাই মণ্ডা দিচ্ছ? এসব কি আর গলা দিয়ে নামবে?

খোজা বলে কী আর হবে, অত ভেবে লাভ কি বলো? যতক্ষণ বেঁচে আছ, পিও, জীও।

কিন্তু এসব কোনও কথাই বৃদ্ধর ভালো লাগে না। নানারকম মনগড়া দুর্ভাবনায় মুষড়ে পড়ে সে।

এইভাবে বৃদ্ধের সঙ্গে মজা করতে করতে খোজারা পথে হাঁটার ক্লান্তি ভুলে যায়। চলতে চলতে একদিন তারা বাগদাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছয়। সেখান থেকে বাগদাদ মাত্র আর একদিনের পথ। নুজাৎ-মাকান চঞ্চল হয়ে ওঠে। কতদিন পরে তারা আবার দেশের মাটিতে পা দেবে। মা বাবাকে দেখতে পাবে। আবার হাসি আনন্দে ভরে উঠবে প্রাসাদ।

কিন্তু এমন সময় কালো আঁধার হয়ে এলো সামনের পথ। অশ্বখুরের শব্দে চকিত হয়ে উঠলো সকলে। নুজাতের স্বামী হুকুম জারি করলো, যে যেখানে আছো, দাঁড়িয়ে পড়। আর এক পাও এগোবে না।



কয়েক মুহূর্ত কাটার পর দেখা গেলো, এই বিশাল অশ্ববাহিনী তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে সুলতানের পতাকা। ক্রমশ আরও নিকটবর্তী হলো তারা। কাড়া নাকাড়ার শব্দে মুখরিত হতে থাকলো আকাশ বাতাস।

সেনাবাহিনীর পাঁচজন প্রধান এগিয়ে এসে বজ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে তোমরা? কোথা থেকে আসছো? কোথায় যাবে?

নুজাতের স্বামী এগিয়ে এসে বলে, আমি দামাসকাসের দরবারের সচিব। শাহজাদা সারকানের দূত হয়ে যাচ্ছি তার বাবার কাছে—বাগদাদে। আমার সঙ্গে আছে সুলতানের বাৎসরিক ভেট।

সেনাপতিরা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। নুজাতের স্বামী বুঝতে পারে কোনও গভীর দুঃসংবাদ আছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সেনাপতিদের প্রধান এগিয়ে এসে বলে, সুলতান উমর-অল-নুমান আর এ জগতে নাই। বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটেছে। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। উজির দানদান আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান। তিনি সঙ্গে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন, চলুন। তিনি আপনাকে বিস্তারিত সব বলবেন।

উজির দানদান গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বললো, সুলতান বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন। কিভাবে বিষক্রিয়া হলো, সেসব কাহিনী আপনাকে পরে বলবো। এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য বাগদাদের সুলতান নির্বাচন করা। আমি বাগদাদের চারজন কাজীর সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তাঁদের মতে শাহজাদা সারকানকেই সিংহাসনে বসানো উচিৎ। তাই আমি দলবল নিয়ে চলেছি দামাসকাসে। তাঁকে নিয়ে এসে সুলতান উমর-অল-নুমানের উত্তরাধিকারী হিসাবে বাগদাদের সিংহাসনে বসানই এখন আমার একমাত্র কাজ। অবশ্য বাগদাদের বেশিরভাগ মানুষেরই ইচ্ছা—দু-অল-মাকানকে সিংহাসনে বসানো হোক। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে—আজ প্রায় দেড় বৎসর কাল দু-অল-মাকান তার ভগ্নি নুজাতের সঙ্গে মক্কায় চলে গেছে। সেই থেকে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু কোনই হদিশ করা যায়নি।

উজির দানদানের উক্তি শুনে, সুলতানের শোকসংবাদ শোনা সত্ত্বেও নুজাতের স্বামীর প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। দেশের মানুষ যখন চায়, দু-অল-মাকানের সুলতান হতে কে আর আটকায়। আর মাকান যদি সুলতান হয় তারও বরাত খুলে যাবে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন তিয়াত্তরতম রাতে যথা সময়ে আবার গল্প শুরু হয়।

নুজাতের স্বামী দানদানকে বলে, শ্বশুর মশায়ের মৃত্যু-সংবাদ বুকে শেলের মতো হেনেছে। কিন্তু এই নিদারুণ শোকের মধ্যেও একটি সুখবর আপনাকে শোনাচ্ছি। নুজাৎ-অল-জামান এবং দু-অল-মাকানের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা দু'জনেই আমার দলবলের সঙ্গে বাগদাদে চলেছে। নুজাৎ আজ আমার বেগম।

দানদান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বাস করতে পারে না, মাকান, নুজাৎ ফিরে চলেছে বাগদাদে। নুজাতের স্বামী আদ্যোপান্ত সব কাহিনী দানদানকে বললো। কিভাবে তারা দু'জনে মক্কা মদিনা দেখে জেরুজালেমে আসে। মাকানের অসুস্থতা। অর্থাভাব। নুজাতের অর্থ ধান্দায় বেরুনো। বাদাবী ডাকাতের খপ্পরে পড়া। তারপর সওদাগরের হাত ঘুরে সারকানের হাতে আসা। তারপর শাদী। সব খুলে বললো সে। এদিকে মাকান কিভাবে এক বৃদ্ধের দয়ায় জীবনরক্ষা করতে পেরেছে সে কাহিনীও সবিস্তারে তাকে জানালো।

দানদান রুদ্ধশ্বাসে শুনলো সব। আনন্দে চিৎকার করে ডাকলো সেনাপতিদের।

—আল্লাহর দোয়ায় আমরা আবার সুলতানের হারানো ছেলেমেয়েদের ফিরে পেয়েছি। আপনারা আসুন। সবাই মিলে ঠিক করুন, সুলতান কে হবে।

সেই মাঠের মধ্যেই তাঁবু ফেলা হলো। দানদান সভা ডাকলো। সেনাবাহিনীর সেনাপতিরা ছাড়াও দরবারের বিশিষ্ট আমির ওমরাহরা তার সঙ্গে এসেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, সারকানকে সুলতান পদে অভিষিক্ত করে বাগদাদে নিয়ে আসবে কিন্তু পালের হাওয়া ঘুরে গেছে। দু-অল-মাকান ফিরে এসেছে। এ অবস্থায় নতুন করে চিন্তা করা দরকার। নতুন করে আলোচনায় বসা দরকার। কাকে তারা সুলতান করতে চায়, আজকের সভায় তা ঠিক করতে হবে।

অনেক আলাপ আলোচনার পর আমির ওমরাহ সেনাপতি কাজী একমত হলো, সুলতানের ছোট ছেলে দু-অল-মাকানকেই তারা বাগদাদের সিংহাসনে বসাবে। ঠিক হলো, সুলতান বিহীন সলতানিয়ৎ চলতে পারে না। আর বিলম্ব না করে এই মাঠের মধ্যেই দু-অল-মাকানের অভিষেক হবে।

নুজাতের স্বামী ফিরে আসে তার স্ত্রী আর শ্যালক দু-অল-মাকানের কাছে। বাবার মৃত্যু সংবাদে নুজাৎ, মাকান হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। সেই—দেশে তারা ফিরছে, অথচ বাবাকে দেখতে পাবে না। এ ব্যথা তারা কোথায় রাখবে?

নুজাতের স্বামী মাকানকে বললো, উজির আমির ওমরাহ কাজী সেনাপতি—সবাই মিলে একমত হয়েছে, তোমাকেই তারা বাগদাদের সিংহাসনে বসাবে। এ বিষয়ে তোমার কি অভিমত?

দু-অল-মাকান বলে, কিন্তু বড় ভাই থাকতে সেটা কি সঙ্গত হবে? তার মনে দুঃখ দিয়ে কিছু করতে চাই না।

ভগ্নিপতি পরামর্শ দেয়, এক কাজ কর। এখন যথারীতি অভিষেক হয়ে যাক। তুমিই সুলতান হও। তারপর সারকানকে ডেকে সলতানিয়ৎকে দু'টো ভাগে ভাগ করে একটা অংশ তুমি শাসন কর, আর একটা অংশ সারকানকে ছেড়ে দাও। এতে, আমার মনে হয় ভায়ে ভায়ে সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

দু-অল-মাকান বলে, ঠিক আছে, তাই হবে।

এরপর দু-অল-মাকানকে বাদশাহী সাজে সাজানো হলো। উজির দানদান এই অভিষেকের পোশাক-আশাক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। মাকানকে সুলতান বেশে সাজিয়ে অভিষেক-তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। সারা তাঁবুটা ফুলের মালায় সাজানো হয়েছিলো। সেনাবাহিনী জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে চলেছে। একে একে আমির ওমরাহরা এসে তাঁবুর

ভিতরে দরবার মহলে গিয়ে আসন গ্রহণ করলো। সব শেষে দু-অল-মাকানকে এনে বসানো হলো সিংহাসনে। উপস্থিত পারিষদরা উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানাতে থাকলো। দু-অল-মাকানের হাতে সোনার তলোয়ার—অভিষেকের সময় এই তলোয়ার বংশগত ভাবে উত্তরাধিকারীরা পেয়ে আসছে। আজ যেমন পেলো দু-অল-মাকান। তলোয়ারখানা মাথায় ঠেকিয়ে হলফনামা পড়তে হয়। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন—এই তার একমাত্র ন্যায় ধর্ম।

এরপর একে একে আমির ওমরাহরা সামনে এসে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে হলফ করলো, আজ থেকে আপনি আমাদের মহামান্য সুলতান। আপনার আদেশ শিরোধার্য করে নেবো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

[ঘন ঘন রাত্রি অবসানে গল্পের গতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় এখন থেকে প্রতিটি রজনীর অবসান পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ না করে মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হবে।]

অভিষেক শেষে নুজাতের স্বামী এক ভোজসভার আয়োজন করলো। দামাসকাস থেকে যে সব খানাপিনা সঙ্গে এসেছিলো সেনাদের মধ্যে সব বিতরণ করে দেওয়া হলো।

সুলতান দু-অল-মাকান আমির ওমরাহদের সঙ্গে বসে খানাপিনা সারলো। উজির দানদানকে নুজাৎ জিজ্ঞেস করে, কিভাবে আব্বাজানের মৃত্যু হলো, তার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে ইচ্ছে করে।

উজির দানদান বলে, নিশ্চয়ই বলবো, মা। এই ভোজ সভাতেই সে কাহিনী শোনাবো সকলকে।

দানদান বলতে শুরু করে ঃ

তোমরা চলে যাওয়ার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। মক্কা-মদিনা চষে বেড়ালাম। কিন্তু কেউই বলতে পারলো না, তোমরা কোন পথে গেছো। যাই হোক, তোমাদের শোকে তাপে সুলতান মুহ্যমান হয়ে প্রাসাদে থাকেন। কারো সঙ্গে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। নেহাৎ জরুরী কাজ না থাকলে দরবারেও নিয়মিত বসেন না। সুলতানের মনোবেদনা বুঝতে পেরে আমরাও তাকে ছোটখাটো কাজে বিব্রত করতাম না। এই সময় একদিন এক বৃদ্ধা রমণী এলো। সঙ্গে তার পাঁচটি অপরূপ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী তরুণী। সুলতানের দর্শনপ্রার্থী হয়ে আমাকে বললো, কনস্তানতিনোপল থেকে সে এসেছে। সুলতানের জন্যে এই পাঁচটি খুবসুরৎ মেয়ে নিয়ে এসেছে। শুধু রূপেই তারা দুনিয়ার সেরা নয়। তাদের তুল্য সর্বগুণান্বিতা মেয়ে তামামদুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

সুলতানকে জানালাম। তিনি বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠালেন। মেয়ে পাঁচটিকে দেখলেন। সত্যি কথা বলতে কি, গুণ কতটা আছে তখনও আমরা জানি না, অমন রূপসী রমণী আমি কখনও দেখিনি। স্বয়ং সুলতানও তারিফ করলেন। হ্যাঁ, সুন্দরী বটে।

বৃদ্ধা বললেন, জাঁহাপনা, আপনি ওদের যাচাই করে দেখুন। দুনিয়াতে এমন কোনও বিদ্যা, এমন কোনও শাস্ত্র নাই—যা তাদের অজানা। আচার আচরণ আদব কায়দায় দস্তুর মতো শাহী।

সুলতান সহাস্যে মেয়েদের দিকে তাকালেন, কি গো মেয়েরা, তোমাদের কর্ত্রী যা বলছে সব ঠিক-?

মেয়েগুলো অভিবাদন জানিয়ে ঘাড় নাড়ে—সব ঠিক।

এখন সুলতান বললেন, ঠিক আছে, কি বিদ্যা শিখেছো, তার কিছু নমুনা দেখাও।

একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বাদশাহী ঢং-এ কুর্নিশ জানিয়ে বলতে শুরু করে।

শুনুন, জাঁহাপনা মানুষ বেঁচে থাকে কেন? সে নিজের ওপর প্রভুত্ব দেখিয়ে যেতে চায়। এই বাসনা তার অন্তরে অঙ্কুরিত থাকে বলেই সে আল্লাহর দোয়ায় বেঁচে থাকতে চায়। বড় হতে চায়। নাম যশের অধিকারী হতে চায়।



আল্লাহ মানুষকে জীবন দান করে সংসারে পাঠান কেন? কারণ সে তার নিজেকে—সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও সুন্দর করে গড়ে তুলবে—এই তার ইচ্ছা।

সুলতানই প্রথম পুরুষ। তার পুণ্যতেই প্রজারা পুণ্যবান হয়। তাঁর সুখেই সুখী হয়। তাঁর দুঃখেই তারা দুঃখ পায়। সংস্কৃতিবান জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিনয়ী, মিতভাষী এবং ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকেন। প্রকৃত বন্ধুকে চিনে নিতে পারেন। শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। বন্ধুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন না। কারণ তিনি জানেন, দুনিয়াতে সব কিছুই সুলভ। একমাত্র প্রকৃত বন্ধুত্ব পাওয়াই কঠিন। বন্ধুর সঙ্গে বিবাহিত বিবির তুলনা চলে না। কারণ প্রয়োজন বোধে এক বিবি তালাক দিয়ে অন্য বিবি ঘরে আনা যায়। কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলে নতুন বন্ধু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বন্ধুত্বে একবার চিড় খেলে তার আর জোড়া দেওয়া যায় না।

পীর পয়গম্বরদের একটা বাণী শোনাচ্ছি ঃ এক কাজী ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর চোখে সবাই সমান ছিলো। নিরপেক্ষ বিচার করে উচিত রায় দিতেন। তিনি সব সময়ই চেষ্টা করতেন দুইপক্ষের সমঝোতা করিয়ে দিতে। এতে শান্তি অব্যাহত থাকে। যেখানে তা সম্ভব হতো না, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে দেখতেন, নানা সাক্ষী প্রমাণে নিঃসন্দেহ হতেন, তারপর রায় দিতেন। কিন্তু মনের কোণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সন্দেহ থাকলে রায়দান স্থগিত রেখে পুনরায় তা খতিয়ে দেখতেন। ন্যায় বিচার মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। অত্যাচার করে ভয় দেখিয়ে বা ক্ষুধার্ত রেখে কাউকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া কোনও বিচারকের কর্তব্য নয়। এর দ্বারা সুবিচার সম্ভব হয় না। অনেক সময়ই মানুষ অত্যাচারের ভয়ে বা ক্ষুধার তাড়নায় মিথ্যাকেই সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

সম্রাট আলেকজান্দার দেশ বিজয়ের সময় তিনজনকে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। একজন বিচক্ষণ বিচারক, একজন ভালো পাচক আর একজন শিক্ষক। তিনি বলতেন, অপরাধী সেনার বিচারের দায়িত্ব তিনি নিজে নিতে চান না। কারণ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিতে পারি। এর পরিণাম ভয়াবহ। সেই কারণে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য বিচক্ষণ বিচারক অপরিহার্য। আর ভালো পাচকের দরকার এই জন্য—সে আমার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক নজর রাখবে। আমার খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব আমার উপর থাকলে বেশিরভাগ দিন অনাহারেই কেটে যেত। শিক্ষকও নিতান্তই প্রয়োজনীয়। পুত্র কন্যার লেখাপড়া একটা প্রধান ব্যাপার। তার জন্যে চাই যোগ্য শিক্ষক। ভালো শিক্ষক ছাড়া ছেলেমেয়েকে উপযুক্ত করে মানুষ করা কঠিন। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের বুনিয়াদ মজবুৎ করতে হলে চাই ভালো শিক্ষক।

এই বলে মেয়েটি নাকাবে মুখ ঢেকে কুর্নিশ জানিয়ে পিছনে সরে যায়। এর পর আর একটি মেয়ে এগিয়ে এসে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে বলতে থাকে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা, লুকমান নামে এক দার্শনিক বলেছেন, বিশ্ব সংসারে তিনটি প্রধান সত্য পরীক্ষা করার তিনটি চমৎকার কষ্ঠিপাথর আছে। (১) কোন মানুষ কতটা সৎ এবং মহৎ তার একমাত্র প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে তার ক্রোধের সময়। ক্রোধ মানুষের প্রকৃত চেহারা খুলে ধরে। (২) মুখে যে বাঘ মারে তাকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত বীরের

পরিচয় শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই মিলতে পারে। (৩) কে তোমার প্রকৃত বন্ধু কি করে তা বুঝবে? অত্যন্ত বিপদের দিনে যে পাশে এসে দাঁড়ায়—সেই একমাত্র বন্ধু।

স্তাবকদের স্তুতি ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও উদ্ধত অত্যাচারী শাসক তার সমুচিত শিক্ষা পায়। এবং অত্যাচারিত একদিন তার সুবিচার পাবেই। যে যেমন কর্ম করে তাকে সেইরূপ ফল দান করাই সুশাসনের কর্তব্য। কে কি কাজে ফেঁসে গেলো তাই দিয়ে তার বিচার করা উচিৎ নয়। তার প্রকৃত মতলবটা জানার চেষ্টা করা বিধেয়। মানুষের দেহে হৃদয় নামক বস্তুটাই সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। একটা মানুষ খারাপ—তার কারণ তার হৃদয়টা খারাপ। এবং এই কারণেই সে মনুষ্য পদবাচ্য হতে পারে না।

ইজরায়েলে এক পরিবারে দুই ভাই ছিলো। এক ভাই অন্য ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আচ্ছা দাদা, এ যাবৎ যত কাজ তুমি করেছো বা দেখেছো তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ কি মনে হয়েছে?

দাদা জবাব দেয়, একদিন মুরগীর ঘরের কাছ দিয়ে যেতে একটা জাপটে ধরি। দেখলাম, তার মাথাটা বোঁ করে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আমার দিকে তাকালো। তারপর আবার সে উল্টো পাকে পাক ঘুরিয়ে মাথাটা সোজা করলো। আমি অবাক হলাম। একটা মুরগী অনায়াসে যা পারলো আমি মানুষ হয়ে শত চেষ্টা করেও তা করতে পারবো না। এবার বলো তোমার কাছে সব চেয়ে কঠিন কাজ কী মনে হয়েছে।

ছোট ভাই বললো, আমি একদিন ভাবলাম আল্লাহর কাছে কিছু চাইবো। নামাজের সময় আল্লাহকে ডাকলাম কিন্তু কিছুতেই আর কিছু চাইতে পারলাম না।

এই বলে দ্বিতীয় মেয়েটি বিদায় নিলে আর একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো।

আজ আমি সংক্ষেপে দু'টি মাত্র নীতিকথার উল্লেখ করে বিদায় নেবো।—মানুষের আত্মা যদি পরিশুদ্ধ থাকে, তবে সে বেহেস্তের দরজায় পৌঁছতে পারে।

সুফিয়া বলেছেন ঃ মানুষের মুখ তার অন্তরের আয়না।

এর পর চতুর্থ কন্যা আসে।

—শেখ ইব্রাহিম একটি গল্প বলেছিলেন, একদিন এক ভিখারী তার ভিক্ষে করে পাওয়া একটি তামার পয়সা রাস্তায় হারিয়ে ফেলে। আমি তাকে একটা রূপোর টাকা দিতে গেলাম। কিন্তু সে নিলো না। বললো, তামার পয়সা হারিয়েছি, রূপোর টাকা নিয়ে কি করবো আমি? পয়সাটা আমি নির্বিবাদে খরচা করে দিতে পারি। কিন্তু টাকা হাতে এসে গেলে প্রাণে ধরে ভাঙ্গাতে পারবো না।



মনসুর ইবন উমর এই কাহিনীটা বলেছিলেন ঃ

আমি একবার মক্কায় হজ করতে যাচ্ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি। কুফা শহরের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। এমন সময় কিছুটা দূরে একটি লোকের উচ্চকিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে বলছে, হে খোদা, আমি তোমার গোলাম। তোমার বাণী অগ্রাহ্য করবো—ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু কর্মদোষে আজ আমি পাপী। কিন্তু মনে প্রাণে এই পাপ আমি চাইনি। তোমার নির্দেশ আমি মাথা পেতে নেবো। তুমি আমাকে পাপমুক্ত করো।

এই প্রার্থনা জানাবার একটু পরে একটা প্রচণ্ড শব্দ করে কি যেন একটা নিচে পড়ে গেলো। অন্ধকার রাত। কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। আমি অনেক ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। আমি আমার ডেরায় চলে গেলাম। পরদিন সকালে দেখি একটা শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোরস্তানে। মিছিলে এক শোকাহত অশীতিপরা বৃদ্ধাকে দেখে জিজ্ঞেস

করলাম, কে মারা গেছে? বৃদ্ধ বললো, গতকাল আমার ছেলে নামাজের পর উপস্থিত সবাইকে আল্লাহর বাণী পড়ে শুনিয়েছিলো। তার এক জায়গায় ছিলো, "শোনো, তোমরা যারা আমার কথা বিশ্বাস কর, মান, তাদের প্রতি আমার নির্দেশ নিজের নিজের হৃদয় উন্মুক্ত কর।"

পবিত্র গ্রন্থের এই বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে একজন পথচারী নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে কলিজাটা টেনে বের করে ফেললো।

এর পর শেষ মেয়েটি এসে দাঁড়ালো।

—এক দার্শনিক বলেছেন, যে মানুষ তার প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের খবর রাখে না সে আল্লাহর করুণাও প্রত্যাশা করতে পারে না। একজন প্রতিবেশীর কাছে যত ঋণ জমা হয় নিজের ভাই-এর কাছেও তা হয় না।

একদিন ইবন আদহাম মক্কা থেকে ফেরার পথে তার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কিরকম জীবনযাপন করতে ভালোবাসেন?

বন্ধুর জবাব, আমি স্বল্পাহারী মানুষ, যেদিন জোটে খাই। যেদিন না জোটে প্রত্যাশা করে বসে থাকি। যদি জোটে খাবো, না হলে খাবো না।

ইবন আদম ঠোঁটকাটা মানুষ। বলেছিলাম, বাখ-এর কুকুরগুলোও কিন্তু তাই করে। আমার কথা বলো, আল্লাহ যেদিন জুটিয়ে দেন আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। তাঁর গুণগানে পঞ্চমুখ হই। আর যেদিন তিনি বঞ্চিত করেন, সেদিন শুধু তাকে ধন্যবাদ জানাই।

এরপর সে বিদায় নিয়ে সরে যায়। এবার এগিয়ে আসে তাদের কর্ত্রী—সেই বৃদ্ধা। সুলতানকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, ইমাম অল সফি বলেছেন ঃ একটা রাত্রিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে অধ্যয়ন দ্বিতীয় ভাগে নিদ্রা এবং তৃতীয় ভাগে প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জীবনের সায়াহ্নে সারারাতই তিনি জেগে কাটাতেন।

ইমাম আর এক সময় বলেছেন, আমি বিগত দশ বছর নামমাত্র যবের রুটি খেয়ে জীবনধারণ করে আছি। অতিরিক্ত আহারে দেহ ভারাক্রান্ত হয়। বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে আসে। ঘুমে এবং অবসাদে শরীর নেতিয়ে পড়ে। সব উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে যায়।

ইবন ফুয়াদ বলেছিলেন, একদিন আমি নামাজের জন্য রুজু করবো বলে নদীর ধারে ছুটে চলেছি। এক সাদা দাড়িগোঁফ ওয়ালা বৃদ্ধ পিছন থেকে বলে উঠলেন, নিষ্ঠা নিয়ে রুজু কর বাপু, অত তাড়াহুড়া করছো কেন? নিষ্ঠাবান না হলে নামাজ পড়ে কোন ফল পাবে না।

দেখলাম বৃদ্ধ এসে জলে নামলেন। পরিপাটি করে হাত মুখ প্রক্ষালন করলেন। তারপর উঠে মসজিদের দিকে রওনা হলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে চলতে থাকলাম। এক সময় তিনি পিছনে ফিরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবে?

আমি বলি, মেহেরবানী করে আমাকে যদি বাৎলে দেন, কিভাবে চললে, আল্লাহকে জানতে পারবো।

তিনি বললেন, আগে নিজেকে জানার চেষ্টা কর। যখন নিজেকে জানা সম্পূর্ণ হবে তখন আপনা থেকেই তাকে জানতে পারবে।

খলিফা আবু জাফর অল মনসুর ঘোষণা করলেন, আবু হানিফাকে তিনি বাৎসরিক দশ হাজার দিরহাম দক্ষিণা দিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করলেন। পরদিন সকালে সুলতানের দরবার থেকে অর্থসচিবকে পাঠানো হলো, আবু হানিফার গৃহে। অনাড়ম্বর সাদা মাঠা সাজপোশাকে সজ্জিতা হানিফা বেরিয়ে এলেন। অর্থসচিব সবিনয়ে দশ হাজার দিরহামের তোড়াটা তার সামনে রেখে সুলতানের ফরমান জানালো, তিনি এই দশ হাজার

দিরহাম আপনাকে এক বৎসরের বেতন হিসাবে অগ্রিম পাঠিয়েছেন। এবং বলে দিয়েছেন, এ অর্থ কোনও অসদুপায়ে অর্জিত নয়। হানিফা সাহেব যেন গ্রহণ করেন।

আবু হানিফা অর্থসচিবকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার সুলতানকে গিয়ে বলো, টাকাটা হয়তো সৎ উপায়ে অর্জিত—কিন্তু তোমার সুলতান নিজেই তো অসৎ, উদ্ধত, অত্যাচারী। এরকম লোকের দাসত্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর বৃদ্ধা বললো, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। এখনকার মতো বিদায় নিতে চাই। সুলতান যদি ইচ্ছা করেন, পরে আবার শোনাবো।

এই সময় একটুক্ষণের জন্য দানদান থামে। দু-অল-মাকান আর নুজাৎ অধীর আগ্রহেই শুনছিলো। মাকান জিজ্ঞেস করে, তারপর?

উজির আবার বলতে থাকে ঃ বৃদ্ধা আর তার পঞ্চকন্যার গুণে মুগ্ধ হয়ে সুলতান উমর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এমন সারগর্ভ নীতি কথা তিনি বহুকাল শোনেননি। উজিরকে বললেন, প্রাসাদে যে মহলে ইরবিজা থাকতো সেখানে এদের থাকার ব্যবস্থা করো। দেখবে, যেন আদর যত্নে কোনও ত্রুটি না হয়।

সুলতান প্রতিদিন নিজে এসে বৃদ্ধা আর পঞ্চকন্যার খোঁজখবর নিতে থাকলেন। আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন। আমরা অবশ্য তাদের কোনও অভাবই রাখিনি। আতিথেয়তার সব রকম বন্দোবস্তই নিখুঁতভাবে করা হয়েছিলো। বৃদ্ধা সারাদিন কোনও রকম আহার করতো না। শুধু রাত্রিবেলায় সামান্য একটু রুটি আর সরবৎ খেয়ে কাটিয়ে দিত। সারাদিন তার উপাসনার মধ্য দিয়ে কাটত। বৃদ্ধার এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখে সুলতান আরও মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর প্রাসাদ পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠছে—এই ভেবে তিনি পুলকিত হতে থাকেন। এইভাবে দশটা দিন কেটে গেলো। সুলতান আমাকে বললেন, এবার আসল কথাবার্তা হওয়া দরকার। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস কর, কি দাম সে নেবে।

বৃদ্ধা বললো, সোনাদানা যাই দিতে চান, কিছু নেবে না। তা সে যদি এক দিকে মেয়ে আর দিকে হীরে জহরৎ দিয়েও ওজন করে দিতে চান—আমি নেবো না।

—আমি শুধু একটা শর্তেই আপনার কাছে বিক্রি করতে পারি।

—কী শর্ত?

বৃদ্ধা বললো, দীর্ঘ এক মাসকাল ধরে আপনি উপবাস করবেন। এই উপবাসকালে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা ছাড়া মনে কোনও কামনা বাসনার প্রশ্রয় দেবেন না। এর ফলে আপনার দেহ মন কলুষমুক্ত পবিত্র হয়ে উঠবে। তারপর আপনি মেয়েদের গ্রহণ করবেন। তার আগে নয়। আমার এই শর্ত যদি পূরণ করতে পারেন, নগদ মূল্য হিসাবে কিছুই নেবো না। সে ক্ষেত্রে আপনার দেশের যা নাম করা জিনিস তার কিছু আমাকে উপহার দিতে পারেন।

বৃদ্ধার এই অভূতপূর্ব প্রস্তাব শুনে সুলতানের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। তখুনি সম্মতি দেন, আমি রাজি।

বৃদ্ধা বললো, আমিও প্রার্থনাদি করে আপনার উপবাসের সুফল পেতে সাহায্য করবো। এখন তামার ঝারি করে এক ঝারি পানি আনতে বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা তামার ঝারি পূর্ণ করে জল নিয়ে আসা হলো। ঝারিটা হাতে নিয়ে বৃদ্ধা বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়লো। তারপর এক টুকরো পাতলা কাপড় দিয়ে মুখটা বেঁধে দিয়ে বললো, উপবাসের দশদিন পরে এই পাত্রের জল পান করবেন। এতে আপনার শরীরের দুর্বলতা কেটে যাবে। ক্ষয় পূরণ হবে। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। ঠিক এগারো দিনের দিন আবার ফিরে আসবো।

এই বলে বৃদ্ধা কুর্নিশ করে বিদায় নিলো। জলের ঝারিটা সুলতান নিজে হাতে সিন্দুকে বন্ধ করে চাবিটা তার শেরওয়ানীর জেবে রেখে দিলেন।

সেই দিন থেকেই উপবাস শুরু হলো। তখন তার একটাই লক্ষ্য, বৃদ্ধার কথামতো দেহ-মন পবিত্র করতে হবে। তা হলেই সে ঐ পরমা সুন্দরী কুমারী তনয়াদের অঙ্কশায়িনী করার অধিকার পাবে।

এগারো দিনের দিন সকালবেলা পিপাসার্ত সুলতান এক নিঃশ্বাসে ঝারির জলটুকু সব পান করলেন। দশ দিনের অনাহারে দেহ নেতিয়ে পড়েছিলো। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো। জলটুকু পেটে পড়ায় ক্ষুধার তীব্রতা স্বভাবতই একটু কমে আসে। অবসাদও খানিকটা কেটে যায়। সুলতান ভাবলেন বৃদ্ধার কথা তো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো। এই মন্ত্রপুত জলে নিশ্চয়ই সে এমন কোন দৈবশক্তি রেখে গেছে যার দৌলতে তিনি মুহূর্তেই অবসাদ কাটাতে পারলেন।

জল পান করা শেষ হওয়ার একটুক্ষণ পরে কড়ানাড়ার শব্দ শুনে সুলতান দরজা খুলে দেন। ঘরে ঢুকলো বৃদ্ধা। হাতে তার কলার পাতায় মোড়া একটা মোড়ক। বললো, আপনার উপবাসের একুশ দিনের দিন এই মোড়ক খুলবেন। এতে খানিকটা আচার আছে। সেই দিন আপনি খাবেন।

সুলতান বৃদ্ধাকে সাদরে বসালেন। সশ্রদ্ধভাবে কলাপাতার মোড়কটা নিয়ে সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখলেন।

একুশ দিনের দিন সুলতান আচারটুকু বের করে খেলেন। একটু পরে সেই বৃদ্ধা এসে কড়া নাড়লো। সুলতান রুদ্ধদ্বার খুলে স্বাগত জানালেন। বৃদ্ধা বললো, আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কি শর্তে আপনার হাতে তাদের কন্যাদের তুলে দেব—জানিয়েছি। এবং আপনি যে আমার শর্ত পূরণ করতে উপবাস করে চলেছেন, তাও বলেছি। শুনে তারা খুশি হয়েছেন। সুলতান যখন তাদের পাওয়ার জন্য দুরূহ কর্তব্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন এতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয়, তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন ফাঁকি নাই। তাদের ধারণা, মেয়েরা আপনার কাছে সুখে থাকবে। শুধু একটি কথা বলেছেন, চিরদিনের মতো ছেড়ে দেবার আগে একটিবার তারা তাদের চোখের দেখা দেখতে চান। আজ আপনার উপবাসের একুশদিন চলছে। আমি আজ ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ফিরে আসবো তিরিশ দিনের দিন। সেই দিন আপনার উপবাসের শেষ দিন। এই দশটা দিন তারা তাদের মা-বাবার কাছে থাকবে। ভালোমন্দ খানাপিনা করবে। তারপর আমি আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

এ কথায় সুলতান সায় দিতে পারে না—সে কি করে হয়? যাদের পাবো বলে এত কৃচ্ছ্রসাধন করছি, তারাই আমার কব্জার বাইরে চলে যাবে!

বৃদ্ধা হাসেন, এতদিন আমাকে দেখছেন, এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আপনি তো জোর করে তাদের ধরে নিয়ে আসেননি। আমি নিজেই সেধে এসে প্রস্তাব দিয়েছি। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার আপত্তি হচ্ছে কেন? এটা তো বোঝেন, মা-বাপের সন্তান, চিরকালের মতো নাগালের বাইরে চলে যাবে। শেষবারের মতো একবার চোখের দেখার সাধ হয় না?



সুলতান ঘাড় নাড়লেন, তা ঠিক। বাবা-মাকে ছেড়ে সন্তান চলে গেলে কি যে ব্যথা বুকে বাজে তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ঠিক আছে, ওদের নিয়ে যাও। তবে দেরি করো না। তিরিশ দিনের দিনই যেন তারা প্রাসাদে ফিরে আসে।

বৃদ্ধা বলে, আপনি নিশ্চিত থাকুন, জাঁহাপনা, আমার

কথার কখনও নড়চড় হয় না। আর আপনার মনে যদি কোনও দ্বিধা থাকে তা হলে এক কাজ করুন, আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কোনও মহিলাকেই আমাদের সঙ্গে দিন। তার তত্ত্বাবধানেই এ-কদিন থাকবে মেয়েরা। ওদের মা-বাবা যদি দেরি করতে চায়, বুঝিয়ে বলতে পারবে, —সুলতানের হুকুম, নির্দিষ্ট দিনেই ফিরতে হবে।

সুলতান বললেন, ঠিক বলেছো, বুড়িমা। আমার নিজের লোক একজন সঙ্গে থাকা দরকার। সে বুঝিয়ে বলতে পারবে। দেরি করলে সুলতান গোঁসা করবেন। আমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী বাঁদী সফিয়া তোমাদের সঙ্গে যাবে। আমার দু'টি সন্তানের সে জননী। তার বাবা কনসতান্তিনোপল-এর সম্রাট আফ্রিদুন। আচারে ব্যবহারে খুব ভদ্র, শিক্ষিত। তোমার ভাইদের সঙ্গে সে কথা বলতে পারবে। বোঝাতে পারবে। কিন্তু তা তো হলো, তিরিশদিনের দিন আমি কি আহার করবো, তার ব্যবস্থা করে যাবে না?

বৃদ্ধা বলে, আমার সবদিকে নজর আছে। কিছু বলতে হবে না। যাবার আগে আপনার জন্যে এক গেলাস সরবৎ দিয়ে যাবো। সযত্নে রেখে দেবেন। তিরিশ দিনের দিন সকালে উঠে হামামে যাবেন। খুব ভালো করে গোসল করবেন। দেখবেন শরীরটা কেমন হাল্কা হয়ে গেছে। দেহের এবং মনের সব ক্লেশ কেটে গেছে। আল্লাহর নামাজ শেষ করে সরবৎটা খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবেন। ঘুম থেকে উঠে দেখবেন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ তাজা মানুষ হয়ে গেছেন।

এই বলে সুলতানকে এক গেলাস সরবৎ দিয়ে, পাঁচটি মেয়ে আর সফিয়াকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে। তিরিশদিনের দিন খুব ভোরবেলা তোমাদের বাবা সুলতান উমর-অল-নুমান হামামে গেলেন। গোসল সেরে এসে নামাজ পড়লেন। তারপর সিন্দুক খুলে ঢাকনা ঢাকা সরবতের গ্লাস বের করে দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, সরবৎ খেয়ে আমি বিশ্রাম করবো। তোমরা কেউ আমাকে ডাকবে না।

সারাটা দিন কেটে গেলো। আমরা সবাই সুলতানের কামরার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কখন তার ঘুম ভাঙ্গবে। কখন তিনি কাকে তলব করবেন। কিন্তু না, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি গভীর হতে থাকে। কিন্তু সুলতানের ঘুম আর ভাঙ্গে না। তখন কি জানি, সে ঘুম আর ভাঙ্গবার নয়। পরদিন দুপুরে অনেক ডাকাডাকির পর যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেলো না, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি সুলতানের মৃতদেহ পড়ে আছে শয্যায়।

দু'হাতে মুখ ঢেকে দানদান কাঁদতে থাকে। দু-অল-মাকান আর নুজাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাঁদতে থাকে দরবারের সকলে। নুজাতের স্বামী মাকানের হাত ধরে টেনে তোলে, ওঠ, কেঁদে আর কি করবে, বল। নিয়তির লিখন এড়াতে পারে না কেউ। বাবা কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। এখন শোকতাপ ভুলে নিজেকে শক্ত কর।

চোখের জল মুছে দানদান বলতে থাকে, সরবতের গেলাসটা পরীক্ষা করে দেখলাম। তার তলায় কাগজের একটা টুকরো পাওয়া গেলো। তাতে লেখা ছিলো ঃ শয়তানের জন্য শোক করো না। এ চিঠি তোমরা যারা পড়বে—জেনে রেখো, ব্যাভিচারের পরিণামে এই শাস্তিই পেতে হয়। একবার ভেবে দেখো, কত সম্রাটের আদরের দুলালীদের সর্বনাশ সে করেছে। তার নৃশংস অত্যাচারে কত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। এই শয়তানটা তার ছেলে সারকানকে পাঠিয়েছিল সিসারিয়ায়। ছলনায় সে ভুলিয়ে এনেছিলো সম্রাট হারদুবের প্রাণপ্রতিমা কন্যা ইরবিজাকে। তার সঙ্গে জানোয়ারের মতো আচরণ করেছিলো এই বদমাইশ সুলতান। তারপর এক নিগ্রোর হাতে তুলে দিয়েছিলো। নৃশংসভাবে তাকে সে হত্যা করে তার ধনরত্ন ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। সেই অত্যাচারী উদ্ধত সুলতান উমর অল-নুমানকে আজ আমি খতম করলাম। এজন্য ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করবেন। এবার আমার পরিচয় শোনো, আমি সেই হারদুবের দুর্গ কর্ত্রী—বাঁদী সরদারণী। সফিয়াকে আমি তার বাবা আফ্রিদুনের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তবে

এইখানেই শেষ নয়, এরপর আমরা সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করতে আসছি। এই পাপপুরী প্রাসাদ আমরা ধুলোয় মিশিয়ে দেব। সুলতানের বংশ নির্বংশ করে দেব। দুনিয়াতে মুসলমান সাম্রাজ্য বলে আর কিছু থাকবে না। বাগদাদের আকাশে উড়তে থাকবে খ্রীষ্ট ধর্মের বিজয় নিশান।

এক মাস ধরে শোকপালন করা হলো। দেশের লোক বলতে লাগলো, এবার বাগদাদের সিংহাসনে যোগ্য উত্তরাধিকারী বসানো হোক। তখন আমি কাজীদের ডেকে পরামর্শ করলাম। তাদের অভিমত দামাসকাস থেকে সারকানকে এনে সুলতান করা যেতে পারে। জনগণের দাবী—দু-অল-মাকানকে সিংহাসনে বসাতে হবে। কিন্তু দু-অল-মাকানকে আমরা কোথায় পাবো। দেশে দেশে তাদের সন্ধান করা হয়েছে—কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তাই কাজীদের উপদেশ মতো দামাসকাসেই যাচ্ছিলাম। শাহজাদা সারকানকে সুলতান পদে অভিষেক করে বাগদাদে নিয়ে আসবো—এই ছিলো উদ্দেশ্য। আল্লাহর অপার মহিমা—শাহজাদা দু-অল-মাকান আর শাহজাদী নুজাৎ দু'জনকে এক সঙ্গেই ফিরে পেলাম।

দু-অল-মাকান উজির দানদানকে বললো, আপনি বয়সে এবং জ্ঞানে বৃদ্ধ, আমার বাবার পুরনো উজির। এখন থেকে আপনি আমারও উজির হলেন। এখন আমার প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ আমার বাবা কি ধনদৌলত রেখে গেছেন তার একটা মোটামুটি হিসাব করা।

উজির দানদান একখানা লম্বা ফর্দ খুলে ধরলো, সুলতানের মৃত্যুর পর আমি তার বিষয় সম্পত্তির একটা খতিয়ান তৈরি করেছি।

মাকান বললো, আপনি এক কাজ করুন, দামাসকাস থেকে যে সব ধনরত্ন বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার সবটাই আপনি সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিন।

নুজাতের স্বামী বাক্সের তালা খুলে টাকাপয়সা সোনাদানা হীরে জহরৎ সব বের করলো। উজির দানদান সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুসারে ভাগ বাটোয়ারা করে দিলো সব ধনরত্ন।

সৈন্য সামন্তরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো। নতুন সুলতানের শতায়ু কামনা করতে থাকলো।

এরপর তাঁবু ওঠানো হলো। আর কোনও বিরতি নয়, সোজা বাগদাদ। শহরের প্রবেশ মুখে হাজার হাজার নরনারীর ভীড়। তাদের নতুন সুলতানকে বরণ করতে এসেছে তারা। সারা শহর আজ নতুন সাজে সেজেছে। আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সর্বত্র।

প্রাসাদে ফিরে এসে দু-অল-মাকান-এর প্রথম কাজ হলো, বড়ভাই সারকানকে চিঠি লেখা। সে লিখলো, দাদা যত সত্তর তোমার সাধ্যমতো সৈন্যবল নিয়ে বাগদাদে চলে এসো। সিসারিয়া সম্রাট হুমকি দিয়েছে, বাগদাদ আক্রমণ করবে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে উজির দানদানের হাতে দিয়ে দু-অল-মাকান বললো, আপনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। এই চিঠি আমি অন্য কারো হাতে পাঠাতে চাই না। আপনি যান। সমস্ত ঘটনা খুলে তাকে বলুন। সে যদি চায়, আমি বাগদাদের সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে দামাসকাসের সুবাদার হয়ে থাকবো। কিন্তু আজ এই বিপদের দিনে, আমরা ভাই-ভাই বিরোধ করবো না। আগে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। পরে নিজের স্বার্থ চিন্তা করবো।

উজির খুশি হয়ে বললো, তুমি অতি বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো, বাবা। বিপদের দিনে যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে সে-ই বিচক্ষণ ব্যক্তি।

দানদান বিদায় নিলো। এবার দু-অল-মাকান জেরুজালেমের সেই বৃদ্ধ বন্ধুকে ডেকে পাঠালো। তার বসবাসের জন্যে একটা প্রাসাদ বন্দোবস্ত করে দিলো সে। দাসদাসী চাকরনফর পরিবৃত্ত হয়ে বৃদ্ধ সুখে দিন কাটাতে থাকলো।

কয়েক দিন বাদে দানদান ফিরে এসে জানালো, সারকান অখুশি হয়নি। সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছে। এখন আমরা আমাদের বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবো। পথের মধ্যে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সিসারিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করতে হবে। সারকানের পরিকল্পনা এই রকম।

সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দু-অল-মাকান একদিনের পথ অতিক্রম করে তাঁবু গাড়লো। ওদিক থেকে সারকানও তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হলো। এই প্রথম দুই ভাই-এর মিলন ঘটলো। দু'জনে দু'জনের বুকে মাথা রেখে বাবার শোকে চোখের জল ফেলতে থাকলো।

বড়ভাইকে সসম্মানে বাগদাদে নিয়ে আসে দু-অল-মাকান। শহরের আশে পাশে ছাউনি ফেলা হলো। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তখন দু-ভাই একাত্মা হয়ে পড়েছে।

দিন কয়েকের মধ্যেই দুই ভাই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিসারিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আরবের অন্যান্য মুসলমান সুলতানরাও তাদের সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বাগদাদ সুলতানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

এক মাস চলার পর তারা শত্রু সীমান্তে পৌঁছয়। ভীত সন্ত্রস্ত কনসতান্তিনোপলবাসীরা সম্রাট আফ্রিদুনকে জানায়—বাগদাদ সৈন্য শিয়রে। আফ্রিদুন হারদুবের বাঁদী সর্দারণীকে খবর পাঠায়। সে আবার সিসারিয়ায় সম্রাট হারদুবকে জানায়।

হারদুব আর আফ্রিদুনের যুক্ত সৈন্যবাহিনী সীমান্ত ঘিরে রুখে দাঁড়ায়। একদিকে খ্রীষ্টান সৈন্য আর এক দিকে মুসলমান বাহিনী। বাঁদী সরদারণী হারদুবকে অভয় দেয়, আপনি কিছু ভাববেন না, সম্রাট, আমি ওদের সমুচিত শিক্ষা দেব। এটা জানবেন স্বয়ং যীশু আমাদের সহায় আছেন, শয়তানরা আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

বাঁদী সরদারণীর বুদ্ধিতে যুদ্ধের ফাঁদ তৈরি করা হতে থাকে।

—পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নৌকা বোঝাই করে পাহাড়ের নিচে পাঠিয়ে দিন। আর বাকী সৈন্যরা থাকবে এপারে। মুসলমানরা ছাউনি ফেলেছে পাহাড়ের পাদদেশে। সুতরাং তারা সামনেও এগোতে পারবে না পিছনেও পালতে পারবে না।



আফ্রিদুন বললো, চমৎকার ফন্দী। বাছাধনরা কচু কাটা হবে।

সম্রাট আফ্রিদুন এবং সম্রাট হারদুব তাদের সেনাপতিদের ডেকে বললেন, কাল খুব ভোরে তোমরা দু'টো ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিক থেকে সাঁড়াশী অভিযান চালাবে। নৌকা করে পাহাড়ের নিচে পাঠিয়ে দাও পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। আর বাকী সৈন্য থাকবে পাহাড়ের ওপরে। পাহাড়ের নিচেই ওরা ছাউনি ফেলেছে। ব্যাটারা এতে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবে। এ যুদ্ধে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। বুকে সাহস সঞ্চয় করে যীশুর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে—এই আমাদের একমাত্র পণ।

বাঁদী সরদারণী বললো, আমাদের এখন প্রধান লক্ষ্য হবে সারকান। সে এক মূর্তিমান শয়তান। তার বিক্রম অসাধারণ। একাই সে হাজার মানুষের সঙ্গে লড়তে পারে। এটা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব না। শয়তান তাকে ভর করে আছে। কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। ঈশ্বরের হাতে শয়তান-এর মৃত্যু ঘটে। আমরা ধর্মযোদ্ধা। ঈশ্বরের নির্দেশে খ্রীষ্টান ধর্ম বিশ্বাসীদের রক্ষার জন্যে ধর্মযুদ্ধে নামছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় আছেন, শয়তানের পতন অনিবার্য।

সুতরাং যেন-তেন-প্রকারেণ সারকানকে হত্যা করতে হবে। মুসলমানদের একমাত্র বলভরসা এই সারকান। সারকান নিহত—শোনামাত্র সমস্ত সৈন্যবাহিনী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকবে। কিন্তু আমাদের হাত থেকে একজন মুসলমানও রেহাই পাবে না। সবগুলোকে কেটে কচু-কাটা করবো।

বাঁদী সর্দারণীর এই রক্ত গরম-করা বক্তৃতায় সেনাপতিরা উৎসাহিত হয়। প্রতিজ্ঞা করে, যেভাবেই হোক, মুসলমানদের পরাজিত করবোই।

খ্রীষ্টানদের প্রধান সেনাপতি লুকা। তার মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সেই সময়ে সারা ইউরোপে আর দু'টি ছিলো না। দেখতে ছিলো ভাল্লুকের মতো। গায়ের রং পোড়া কয়লার মতো কালো। তলোয়ার হাতে সে যখন দাঁড়াত দেখে মনে হতো—সাক্ষাৎ যমদূত। এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে সে পরাজয় স্বীকার করেনি। তার নাম শুনলে সেনাপতিদের বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। সে লোহার বর্ম শিরস্ত্রাণ পরে যখন ঘোড়ায় চাপলো, আফ্রিদুন তাকে আশীর্বাদ করে বললো, জয় তোমার সুনিশ্চিত। সারকানকে হত্যা করাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য। যেভাবেই পারো, তাকে খতম করতেই হবে।

লুকা সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো। সোজা সারকানের ছাউনির সামনে। ঘোষক হাঁকতে থাকে, কই কোথায় আছ সারকান, মরার যদি সাধ থাকে বেরিয়ে এসো। তোমার যম সেনাপতি লুকা তোমার সামনে দাঁড়িয়েছে। যদি সাহস থাকে, তলোয়ার ধরো।

সারকান ধীর পায়ে এগিয়ে আসে। হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। বিকট একটা চিৎকার তুলে লুকা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারকান শরীরটাকে একটু কাত করে পাশ কাটিয়ে দেয়। তারপর শুরু হয় তলোয়ারের লড়াই। প্রথম প্রথম নির্বিকারচিত্তে লুকার মারগুলো ঠেকিয়ে যেতে থাকে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারকান বুঝতে পারে, যতগুলো প্যাঁচ জানা ছিলো সবই লুকা দেখিয়ে শেষ করে ফেলেছে। অথচ সারকানকে কাবু করতে পারছে না। তখন সে আবার সেই প্যাঁচগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালাতে থাকে। সারকান এবার নিশ্চিত হয়। বুঝতে পারে লুকার বিদ্যার দৌড়। এবার সারকান তার নিজের কৌশল প্রয়োগ করলো। এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লুকার ছিলো না। তলোয়ারের এক কোপেই ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ে গেলো। এই দৃশ্য দেখে লুকার সঙ্গী সাথীরা প্রাণ ভয়ে চিৎকার করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলো।

আফ্রিদুন এবং হারদুব মাথায় হাত দিয়ে বসে। ভাবতে পারে না লুকা নাই। সমগ্র খ্রীষ্টান রাজ্যে লুকা একটি জীবন্ত প্রবাদ। কথায় কথায় লোকে লুকার শৌর্য বীর্যের উপমা দেয়। মা বাবা সদ্যজাত শিশুর নামকরণ করে লুকা। বড় হয়ে ছেলে লুকার মতো বীর হবে, এই আশা। সেই লুকা সারকানের হাতে নিহত হলো? একথা আফ্রিদুন-হারদুব বিশ্বাস করলেও দেশের লোক বিশ্বাস করবে না। আফ্রিদুন বলে, আমার সাম্রাজ্যের আসল থামটাই ভেঙে পড়ে গেলো।

বাঁদী সর্দারনী অভয় দিয়ে বলে, বিপদের সময় অধীর হলে তো চলবে না, সম্রাট। বুঝতে পারছি শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে লড়াই করে আমরা জিততে পারবো না। কারণ লুকা যখন পারেনি তখন সমগ্র খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের কোন সেনাপতির পক্ষেই তাকে নিহত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

নিরাসক্ত ভাবে হারদুব বলে, কী করতে চাও? বাহুবলেই যদি হারাতে না পারো, হারাবে কিসে?

—হারাবো বুদ্ধি বলে। বুদ্ধির কাছে বাহুবল তুচ্ছ। আমি এমন ফাঁদ তৈরি করবো, সেখান থেকে সারকান বেরুতে পারবে না।

সম্রাট হারদুব প্রশ্ন করে, সেই ফাঁদটা কি, শুনি?

বাঁদী সর্দারনী বলে, আপনার সৈন্যদের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক সৈন্য বাছাই করে আমার সঙ্গে দিন। তারা সবাই ভালো আরবী বলতে পারবে, এবং আরবীয় আদব কায়দায় দস্তুরমতো শিক্ষিত হওয়া চাই।

হারদুব বললো, এ আর এমন শক্ত কি? আমার সেনাবাহিনীতে খাস আরবের লোকও অনেক আছে। তাদের মধ্য থেকে তোমার পছন্দমতো যে ক'জন দরকার বাছাই করে নাও। কিন্তু তাদের দিয়ে কি করাবে?

—সোজা পথে যখন কাজ হবে না, বাঁকা পথ ধরতেই হবে। আপনার ঐ পঞ্চাশজন সৈন্য এবং আমি আরব সওদাগরের ছদ্মবেশ ধরে তাদের সামনে হাজির হবো। এবং কান্নাকাটি করে বলবো, আমরা বহুকাল ধরে কনসতান্তিনোপল-এ ব্যবসা বাণিজ্য করি। আরব থেকে সওদা এনে খ্রীষ্টানদের কাছে বিক্রি করি। এখন খ্রীষ্টান আর মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধায় তারা আমাদের মারধোর করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। টাকা পয়সা সামান পত্র যা ছিলো সব কেড়ে কুড়ে নিয়েছে। এখন আমাদের দেশে ফিরে যাবার সঙ্গতিটুকু সঙ্গে নাই। তাই আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। দেখবেন, সম্রাট, এই চালে আমি বাজি মাৎ করে দেব। মুসলমানরা ভীষণ স্বজাতি-প্রিয়। এইভাবে তাদের করুণার পাত্র হয়ে সারকানের দলে ঢুকে পড়া আমার পক্ষে খুব একটা শক্ত কাজ হবে না। তারপর কি করে সিসারিয়ার মরণ ফাঁদে এনে ফেলতে হয় একবার দেখবেন।

বাঁদী সর্দারণীর ফন্দীটা ভালোই। কিন্তু কতটা কাজে ফলবে, কে জানে। আফ্রিদুন এবং হারদুব সম্মতি জানালো।—ঠিক আছে, দেখ চেষ্টা করে।

সারকান আর মাকান দুই ভায়ে নিজের তাঁবুতে বসে কনসতান্তিনোপল আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করছে। এমন সময় দ্বাররক্ষী এসে খবর দিলো, একদল আরব সওদাগর আপনাদের দর্শনপ্রার্থী।

দু-ভাই বেরিয়ে এসে দেখে, প্রায় জনা পঞ্চাশেক আরব সওদাগর এবং তাদের সঙ্গে এক নিষ্ঠাবতী ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পোশাক আশাক ছিন্নভিন্ন, দেহ রক্তাক্ত, চোখে মুখে সন্ত্রাসের ভাব। সারকান প্রশ্ন করে, কে তোমরা?

পাক্কা মুসলমানী কেতায় কুর্নিশ জানিয়ে তারা আরও একটু এগিয়ে আসে। বুড়িটা হাতের মালা ঘুরাতে ঘুরাতে বলে, আমরা ইস্পাহানের বাসিন্দা। আজ বিশ বছর ধরে কনসতান্তিনোপল-এ বাণিজ্য করে আসছি। আরব থেকে সামান পত্র এনে খ্রীষ্টানদের কাছে বিক্রি করাই একমাত্র কাজ। এতকাল কোনও অসুবিধে হয়নি। দিব্যি আরামে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ওদের দেশের পয়সা নিয়ে গিয়ে আমাদের বাল-বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছিলাম। কিন্তু এখন তারা অন্যরূপ ধরেছে। তারা খ্রীষ্টান, আমরা মুসলমান। ওদের যত আক্রোশ আমাদের উপর। কারণ আমরা মুসলমান। মুসলমানরাই তাদের দেশ আক্রমণ করেছে। এই অজুহাতে আমাদের ধরে নানাভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। এবং শেষে মেরে ধরে আমাদের টাকা পয়সা, সামান পত্র সব কেড়ে নিয়ে কনসতান্তিনোপল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের এমন কোন রেস্ত নাই যা নিয়ে দেশে ফিরতে পারি।

সারকান এবং মাকান ওদের কাহিনী শুনে ব্যথিত হয়। বলে, তোমরা আমার ছাউনিতে বিশ্রাম কর। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

সারকানের নির্দেশে বিরাট তাঁবু খাটানো হলো। সওদাগরের ছদ্মবেশে সিসারিয়ার পঞ্চাশজন সৈন্যের একটা বাহিনী মুসলমান ছাউনির ভিতরে আস্তানা গাড়লো। তাদের খানাপিনা আদর যত্নের কোনও ত্রুটি রাখলো না সারকান। মাঝে মাঝেই খোঁজ খবর নিতে থাকলো।

সারকানের কর্মচারীরা বললো, সওদাগররা সবাই খানাপিনা করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বুড়িমা খানাপিনা কিছুই করেনি। দিন-রাত সে শুধু নামাজ আর কোরান পড়ছে।

এ-কথা শুনে সারকান নিজে দেখাশুনা করতে গেলো। সওদাগররা বললো বুড়িমা আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙছেন, যাতে এ যুদ্ধে আমাদের জয় হয়। বুড়ি মা আমাদের ধর্মাত্মা সিদ্ধবাক। তাঁর উপর আল্লাহর 'ভর' হয়। সেই সময় তাকে যা প্রশ্ন করবেন সব জবাব দেবেন তিনি। সে-সবই আল্লাহর বাণী। তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় মাত্র।

শ্রদ্ধা ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে সারকান মাকানের। জিজ্ঞেস করে কবে মার উপর 'ভর' হবে।

সওদাগররা বলে, সে কিছুই বলা যায় না। হয়তো এখুনি হতে পারে। আবার দু'দিন নাও হতে পারে। তবে যতক্ষণ 'ভর' না হবে তার এই মৌনভাব কাটবে না। কারো দিকে তাকাবেন না, কারো সঙ্গে কথা বলবেন না।

সারকান জিজ্ঞেস করে কিন্তু তিনি মৌনব্রতী হয়ে এই উপাসনায় বসলেন কেন?

—বাঃ, সে কি বলেন, জাঁহাপনা। এতবড় ধর্মযুদ্ধ। এর জয়-পরাজয়ে মুসলমান ধর্ম, জাতির বাঁচামরা নির্ভর করছে। এ সময়ে উপাসনায় না বসলে বসবেন কবে? নিজের ছেলে মেয়ের সৌভাগ্য ফিরবে কি করে, বা কিভাবে কোথায় বাণিজ্য করলে নিজের ধনদৌলত আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে এই জন্যে তিনি উপাসনায় বসবেন? কক্‌খনো না। নিজের স্বার্থ চিন্তা তিনি কোনওদিনও করেন না। কি করে পরের উপকার হবে, দেশের দশের উপকার হবে সে-ই তার একমাত্র চিন্তা।

সারকান মাকান দু'ভাই অবাক হয়ে শোনে। মনে হয়, এই সংকটকালে আল্লাহই তাদের পাঠিয়েছেন।

পরদিন ভোরবেলা 'ভর' উঠলো। সারকান মাকান আভূমি আনত হয়ে সালাম করে জানতে চাইলো, এই ধর্মযুদ্ধে আমাদের জয় হবে, মা?

—অবশ্যই হবে বাবা। তবে শত্রুর গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধান না পেলে তাদের ঘায়েল করা যায় না। আমার সঙ্গে যারা এসেছে তারা সেই সব ঘাঁটির সন্ধান জানে। তাদের কথামতো তোমরা অগ্রসর হও। শত্রুকে নিধন করতে পারবে।

সারকান এবং মাকান সওদাগরদের দিকে তাকায়। ওদের একজন বলে, মা ঠিকই বলেছেন। আমরা আজ বিশ বৎসর যাবৎ কনসতান্তিনোপল আর সিসারিয়ার প্রতিটি প্রান্তে ঘুরেছি। সারা খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের পথ-ঘাট, আমাদের নখদর্পণে। কোথায় তাদের গুপ্ত ঘাঁটি। কোন পথে যাওয়া নিরাপদ হবে সব আমরা বলে দেব।



সারকান হাতে স্বর্গ পায়। এ যুদ্ধে তাদের জয় আর কেউ আটকাতে পারবে না। তামাম খ্রীষ্টান জাতটাকে সাবাড় করে দেবে।

ঠিক হলো, সৈন্যদের পঞ্চাশটাভাগে বিভক্ত করা হবে। এবং এই পঞ্চাশজন সওদাগর-এর এক-একজন এক একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে ঢুকে পড়বে। গুপ্ত পথের নিশানা দেখিয়ে দেবে সওদাগররা। এইভাবে খ্রীষ্টানদের পঞ্চাশটা গুপ্তঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হবে।

সারকান মাকানকে বললো, তুমি ছাউনিতেই থাক। উজিরও তোমার সঙ্গে থাকবেন। আমি যাবো স্বয়ং বুড়িমার সঙ্গে। তিনি আমাকে

সিসারিয়ার দুর্গে নিয়ে যাবেন। এখন শত্রুসৈন্য দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছে। এই সময় হারদুবের এই সুরক্ষিত দুর্গ প্রায় শূন্য। গুপ্ত পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাবো। একবার দুর্গটা অধিকার করতে পারলে আর কোনও অসুবিধেই হবে না। এরপর আমরা সহজেই কনসতান্তিনোপল দখল করে নিতে পারবো।

দাদাকে আলিঙ্গন করে বিদায় জানালো দু-অল-মাকান। বললে, ফিরে এসো, তোমাকে আমি নিজে হাতে সুলতানের মুকুট পরিয়ে দেব।

কিন্তু মুকুট আর তার পরা হলো না। শয়তানী বাদী সর্দারণীর ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণটা হারাতে হলো। সারকান তার সৈন্যবাহিনী সঙ্গে করে বুড়ির সঙ্গে সিসারিয়া দুর্গের ভিতরে ঢুকেছিলো। বুড়ি তাকে ধাপ্পা দিয়েছিলো, দুর্গ এখন শূন্য এই অবস্থায় অধিকার করে নাও। সারকান দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে সত্যিই দেখলো, কোন জনপ্রাণী নাই। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছিলো, এমন সময় এক আততায়ী পিছন দিক থেকে সারকানের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না সে। সারকান মাটিতে পড়ে গিয়ে তলোয়ার খুলে দাঁড়ায়। তখন তার সামনে প্রায় শ'খানেক খ্রীষ্টান সৈন্য। তলোয়ার উদ্যত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সারকানের এক এক কোপে একাধিক শত্রু সৈন্য ধরাশায়ী হতে থাকে। এইভাবে সেই আহত অবস্থাতেও প্রবল বিক্রমে সবকটা সৈন্য নিধন করে খিড়কীর পথ দিয়ে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ছাউনিতে ফিরে আসে। সারা দেহ রক্তাক্ত। তখনো ছুরিটা পিঠেই গাথা ছিলো। মাকান ছুটে এসে ছুরিটা টেনে বার করে। ধরাধরি করে দাদাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। এইবার সারকানের দেহ নেতিয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও রক্ত বন্ধ করা সম্ভব হয় না। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা সারকান দেহত্যাগ করে।

রাত্রি যত গভীর হয় সব দিক থেকেই দুঃসংবাদ আসতে থাকে। শয়তানরা তাদের পুরো সেনাবাহিনীটাই ফাঁদে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

উজির দানদান বললো, আর এখানে থাকা ঠিক নয়। এরপর শত্রুরা ছাউনি আক্রমণ করবে।

মাকানও ভাবলো, এবার ছাউনি গুটিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হওয়াই শ্রেয়।

যে যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনাই ষোল আনা—সেই যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে মাকানকে দেশে ফিরতে হলো। বাদশাহী মর্যাদায় সারকানের মৃতদেহ সমাহিত করে তার উপর এক শোক মঞ্জিল বানালো মাকান। তার গায়ে লেখা হলো সারকানের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা সুলতান উমর অল-নুমান, তার পুত্র সারকান, মাকান এবং কন্যা নুজাতের কাহিনী শুনলেন। এবার আপনাকে শোনাবো আজিজ এবং শাহজাদা তাজ অল মুলুকের কাহিনী।

পারস্যের ইসপাহান পর্বতমালার পিছনে সবুজ শহর। এখানকার সুলতান সুলেমান শাহ। সারাটা জীবন সে ধর্মকর্ম নিয়েই কাটাতো। তার মতো সৎ প্রজাবৎসল উদার সুলতান বড় একটা দেখা যায় না। সারা সলতানিয়তের কোণে কোণে সে ঘুরে বেড়াতো। উদ্দেশ্য—তার প্রজারা কে কিভাবে দিন গুজরান করছে তাই দেখা। তার নিরপেক্ষ উদারনীতির জয়গান করতো সকলে। ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ করতো না। তার চোখে সবাই সমান। সবাই প্রজা। এইভাবে প্রজাদের ভক্তি ভালোবাসা কুড়িয়ে তার জীবনের বেশীরভাগ সময়ই কেটে গেলো। শুধু একটা সাধই তার অপূর্ণ রয়ে গেলো। বেগম আর পুত্র কন্যা। যতই জীবনের সায়াহ্নকাল এগিয়ে আসে সুলতান সুলেমান ক্রমশই নিজেকে বড় একা—অসহায় মনে করতে থাকে। একদিন উজিরকে

ডেকে বললো, দেখ, আমার স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ছে। উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে আসছে। শরীরে কোনও বল পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, দিন শেষ হয়ে এলো। এখন এই বয়সে বুঝতে পারছি, কোন মানুষের একা থাকা উচিত নয়। সঙ্গীবিহীন জীবন মরুভূমির মতো। বিশেষ করে সুলতানের পক্ষে তো নয়ই। কারণ সিংহাসনের উত্তরাধিকার একটা বিরাট সমস্যা। তাছাড়া আমাদের পয়গম্বরও বলেছেন শাদী কর এবং সংখ্যা বাড়াও। এখন আমাকে সৎ পরামর্শ দাও, উজির—কি করা বিধেয়।

উজির চিন্তিতভাবে বলে, আপনি বড় কঠিন প্রশ্ন করেছেন হুজুর। এককথায় এর জবাব হয় না। আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। জানি না আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো কি না। এটাও অবশ্য অত্যন্ত দুঃখের হবে, যদি আপনি কোন অজ্ঞাতকুলশীল বাঁদীকে শাদী করেন। বাঁদীকে শাদী করায় আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে, তার বংশ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। হয়তো এমনও হতে পারে, যে বাঁদীকে আপনি শাদী করলেন তার বাবা একটা শয়তান বজ্জাৎ বা চোর ডাকাত ছিলো। বাবার রক্ত মেয়ের ধমণীতে প্রবাহিত হয়। আবার সেই রক্ত নাতির দেহে সঞ্চারিত হবে এ আর বিচিত্র কি? আপনার পুত্র যদি বড় হয়ে আপনার সৎ গুণের অধিকারী না হয়ে তার দাদুর স্বৈরাচারের দোষে দুষ্ট হয়, তাহলে? এই কারণে হুজুরের প্রতি বান্দার আর্জি তিনি যেন আমাকে কোন বাঁদী কিনে আনতে না হুকুম করেন। তা সে মেয়ে যদি দুনিয়ার সেরা সুন্দরী হয় তাতেও আমার সায় নাই। সন্তান উৎপাদনই যদি আপনার একমাত্র কাম্য হয়, আমি পরামর্শ দেব, কোনো সুলতান বাদশাহর মেয়েকে বেগম করে আনুন। আপনি চাইলে শাহবংশের সেরা সুন্দরীর অভাব হবে না।

সুলতান বললো, তা যদি পাওয়া যায়, তাই নিয়ে এসো। শাদী করবো শুধুমাত্র সন্তানের জন্য।

—পাত্রী আমার দেখাই আছে, জাঁহাপনা।

—তাই নাকি! কে, কার মেয়ে?

আমার বিবি বলেছে, সফেদ শহরের সুলতান জহর শাহর এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। তার রূপের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শুনেছি, ইদানীংকালে অমন রূপসী, নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে সারা আরবে নাই।

আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ে সুলতান, ইয়া আল্লাহ!

উজির বলে, আপনি আর বিলম্ব করবেন না হুজুর। দরবারের এক বিচক্ষণ আমিরকে পাঠিয়ে দিন। সুলতান জহর শাহকে সে শুধু এই সংবাদটা দেবে যে সবুজ শহরের সুলতান তার কন্যার পাণিপ্রার্থী। তারপর দেখবেন সুলতান জহর শাহ আপনার কাছে ছুটে আসবে। তার নাতি সবুজ শহরের সিংহাসনে বসবে—এ লোভ কি সে সম্বরণ করতে পারবে!

সুলতান বললো, কাকে পাঠানো যায় বলতো উজির। এমন লোককে পাঠাতে হব যে বেশ কায়দা করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারবে। অথচ আমার মান ইজ্জতটাও খোয়া যাবে না।



উজির ভেবে পায় না কাকে পাঠানো যায়। সুলতান বললো থাক, অত ভেবে কাজ নাই। এসব কাজ অন্য লোক দিয়ে হয় না। তুমি নিজেই যাও। তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করে ফিরে এসো। তুমি না ফেরা পর্যন্ত খুব চিন্তায় থাকবো।

খুব তাড়াহুড়া করে দরবারের জরুরী কাজকর্ম সমাধা করে উজির সফেদ শহরের সুলতান সকাশে যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলো। উট আর খচ্চরের পিঠে বোঝাই করা হলো নানা উপঢৌকন—হীরে, জহরৎ,

স্বর্ণালঙ্কার, রেশমের গালিচা, সূক্ষ্ম কারুকার্য করা শাল, সুগন্ধী আতর, গোলাপের নির্যাস এবং আরও ছোট ছোট বহু মূল্যবান বিলাসসামগ্রী। তার সঙ্গে নিলো দশটি তাগড়াই আরবের ঘোড়া, একশোটি খোজা, একশোটি নিগ্রো ক্রীতদাস এবং একশোটি দাসী বাঁদী। লাটবহর বোঝাই করে উজির রওনা হওয়ার আগে সুলতানের কাছে বিদায় নিতে এলো। সুলতান বললো, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে। এবং খালি হাতে আসবে না। পাত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

উজির বললো আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা, আমি যাবো আর আসবো। ওখানে দেরি করার কিছু নাই। পাত্রীকে নিয়েই চলে আসবো।

উজির তার দলবল নিয়ে রওনা হয়ে পড়ে। দুর্গম গিরি পর্বত ডিঙিয়ে, দুস্তর মরুপ্রান্তর পেরিয়ে এবং বিস্তর খাল বিল নদী অতিক্রম করে একদিন সফেদ শহরের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছয়। দ্রুতগামী এক অশ্বারোহীকে দূত করে সুলতান জহর শাহর দরবারে পাঠিয়ে দেয় উজির।

বিকালে সুলতান জহর শাহ মুক্ত বায়ু সেবন করতে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দূরাগত এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেয়ে উজিরকে জিজ্ঞেস করে, কে আসছে দেখতো উজির।

ইতিমধ্যে অশ্বারোহী আরও নিকটতর হলে বোঝা গেলো, কোনও বিদেশী দূত। একটু পরে সামনে এসে অভিবাদন জানিয়ে সে বললো, আমি সুলতান সুলেমান শাহর দূত। আপনার শহরের প্রান্ত সীমায় নদীর ওপারে আমাদের উজির তাঁবু গেড়েছেন।

সুলতান জহর আনন্দিত হয়ে বললো। তুমি এখন বিশ্রাম করো, খানাপিনা সারো। তারপর সব শুনবো।

একজন আমিরকে বললো, একে খুব খাতির করে খাওয়াও। দেখো, যেন বদনাম না হয়।

নদীর ওপারে তাঁবু গেড়ে উজির প্রত্যাশা করে বসে থাকে। তার দূত কখন ফিরে আসবে, কি সংবাদ বহন করে আনবে সে চিন্তায় অধীর হয়ে পথের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে রাত বাড়ে, দূত ফিরে আসে না। উজিরের চিন্তা ক্রমশ দুশ্চিন্তায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এমন সময় দেখা গেলো, সুলতান জহর শাহর উজির আমির ওমরাহদের নিয়ে তার সামনে এসে হাজির হলো।

যথাযোগ্য বাদশাহী কেতায় পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় পর্ব শেষ হলো। সুলতান শাহর উজির করজোড়ে আমন্ত্রণ জানালো, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের শহরে পায়ের ধুলো দেন, ধন্য হবো।

সুলতান সুলেমানের উজির বলে, চলুন, সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো বলেই তো এসেছি।

বিরাট একটা দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো তারা। দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে আমির ওমরাহরা উপবিষ্ট। ও প্রান্তের ঠিক মাঝখানে এক শ্বেতপাথরের সিংহাসনে সুলতান জহর শাহ। পিছনে সুলতানের দেহরক্ষী এবং প্রধান সেনাপতি। সারা দরবার কক্ষ পারস্য-গালিচায় মোড়া। মাথার উপরে ঝুলন্ত ঝাড়বাতি।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরবর্তী রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

সুলতান সুলেমানের উজিরকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসানো হলো। সুলতান জহর শাহ উজিরের সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করলো। নানারকম বাদশাহী খানাপিনায় আপ্যায়িত করা হলো তাকে।

এর পর দরবার থেকে সবাই একে একে বিদায় নিয়ে চলে যায়। শুধু সুলতান, তার উজির এবং সুলতান সুলেমানের উজির বসে রইলো।

সুলেমানের উজির উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আপনি মহানুভব সুলতান।

আপনার দরবারে আমার সুলতানের তরফ থেকে একটি আর্জি পেশ করছি। আমাদের সুলতান আপনার কন্যার পাণি প্রার্থী। আমি তাঁর কাছ থেকে যে সব উপহার উপঢৌকন নিয়ে এসেছি, আপনি গ্রহণ করে ধন্য করুন।

সুলতান জহর শাহ উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানালো। দরবারের সকলে অবাক! একি কাণ্ড, সুলতান স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানালেন সামান্য এক উজিরকে। সুলতান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললো, আপনি প্রবীণ প্রাজ্ঞ উজির। আপনার প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম। আমার কন্যা আপনার সুলতানের কেনা বাঁদী হয়ে থাকবে। আমি নিজেও তাঁর একান্ত অনুগত প্রজাতুল্য। আমার কন্যার পাণি প্রার্থনা করে যে প্রস্তাব তিনি পাঠিয়েছেন সে জন্য আমি তার কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম।

সুলতান কাজীদের ডেকে পাঠায়। কাজীরা এসে তার কন্যার সঙ্গে সুলতান সুলেমানের শাদীনামা তৈরি করে দিলো। সুলতান জহর কাগজখানা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সম্মান জানালো।

সুলতান উপস্থিত সকলকে মূল্যবান পোশাক এবং প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিয়ে খুশি করলো। কন্যার সহচরী হয়ে যাবে যারা, সেই সব দাসী-বাঁদী বাছাই করা হলো। দশটা খচ্চরের পিঠে উপহার সামগ্রী বোঝাই করে, পরদিন প্রত্যুষে সুলতান জহর শাদীর সাজে সাজিয়ে কন্যাকে নিয়ে রওনা হয়ে, তিন দিনের পথ অতিক্রম করার পর উজির এবং কন্যাকে বিদায় জানিয়ে আবার নিজের শহরে ফিরে এলো।

আরও তিনদিন চলার পর সবুজ শহরের এলাকায় পৌঁছে উজির এক অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে সুলতান সুলেমানকে খবর পাঠালো ঃ সংবাদ শুভ। পাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

সুলতান সুলেমান উত্তেজনায়, আনন্দে অধীর হয়ে নিজের গায়ের মহামূল্যবান শালখানাই দূতের হাতে তুলে দেয়।

সারা শহরে আনন্দের হিল্লোল জাগে। তাদের সুলতান শাদী করছেন। এবার সিংহাসনের নতুন উত্তরাধিকারীর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলো। শহরবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেরা এসে মনোহারী সাজে প্রাসাদ সাজাতে থাকে। আলোয় আলোয় ভরে ওঠে শহরের পথঘাট।

সেদিন রাতে সুলতান মধুযামিনী যাপন করে। প্রথম রাতেই বেগম অন্তঃসত্তা হয়। সুলতান নতুন জীবন ফিরে পায়! তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আসবে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

দশ মাস পরে বেগম এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলো। চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। আদর করে সুলতান তার নাম রাখে তাজ অল মুলুক।

ছেলের যখন সাত বছর বয়স সেই সময় থেকে তার লেখাপড়া শিক্ষা-দীক্ষার জন্য শহরের প্রাচীন জ্ঞানীগুণী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তাজ অল মুলুক লেখাপড়ায় বেশ মেধাবী। অল্পকালের মধ্যেই সে নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে দেহচর্চা। ঘোড়ায় চড়া এবং অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতাও বাড়তে থাকে। আঠারো বছর বয়সে তাজ অল মুলুক সর্বশাস্ত্র বিশারদ এক পরিপূর্ণ যুবক হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে। সে যখন ঘোড়ায় চেপে শিকারে বেরুতো রাস্তার দু-ধারে আবালবৃদ্ধবনিতা জড়ো হয়ে তার রূপের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো। শিকার তার বড় প্রিয় ছিলো। সঙ্গী সাথী নিয়ে মাঝে মাঝেই জঙ্গলে চলে যেত।

একদিন নদীর ধারে তাজ অল মুলুক পাখি শিকারে বেরিয়েছে। এমন সময় দেখলো একদল সওদাগর তাদের উট খচ্চরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নদীর ওপারে তাঁবু গেড়েছে। সওদাগররা নদীর জলে নেমে রুজু করছে। শাহজাদা তাজ অল মুলুক একজন নফরকে পাঠিয়ে ওদের খবরাখবর জেনে আসতে বলে।

চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করায় ওদের একজন বলে, আমরা বিদেশী বণিক। চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হয়ে এই নদীর ধারে তাঁবু গেড়েছি। এখানে দু'একদিন বিশ্রাম করে আবার রওনা হবো। এখানকার শস্যশ্যামল প্রান্তর আমাদের বড় ভালো লেগেছে।

চাকরটা প্রশ্ন করে, তোমরা যে এই অজানা অচেনা দেশে তাঁবু ফেলেছো, ভয় করে না? যদি চোর ডাকাত-এর উপদ্রব হয়?

ওরা বলে, আমরা জানি সুলতান সুলেমান শাহর দেশে চুরি রাহাজানি হয় না। এখানকার মানুষ সুলতানের মতোই সৎ এবং ধার্মিক। সুলতান সুলেমান শাহর সত্যনিষ্ঠার খ্যাতি সর্বত্র। আর তা ছাড়া, আমরা শাহজাদা তাজ অল মুলুকের কাছে ভেট নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভয় কী?

চাকরটা ফিরে এসে তাজ অল মুলুককে এ কথা জানাতেই সে ওদের কাছে এগিয়ে যায়। তার কাছেই ওরা যাচ্ছে। সঙ্গে উপহার সামগ্রী। তাজ অল মুলুক কিছুই বুঝতে পারে না।

শাহজাদাকে আসতে দেখে সওদাগররা এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যায়। নানারকম বাহারী জিনিসের সে কি বিচিত্র মেলা। তাজ অল মুলুক যা দেখে তাই পছন্দ করে বসে। এক এক করে অনেকগুলো সৌখিন জিনিস তার পছন্দ হয়। সওদাগররা সেগুলো একত্র করে বাঁধাছাঁদা করে শাহজাদার হাতে তুলে দেয়। তাজ অল মুলুক জিজ্ঞেস করে, কত দাম?

সওদাগররা নাক কান মলে জিভ কেটে বলে, ও কথা বলবেন না, হুজুর। আমরা আপনার গোলামের গোলাম। এই সামান্য ক'টা জিনিস পছন্দ করে নিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন। আমরা কি দাম নিতে পারি?

চাকরের হাতে জিনিসগুলো নিজের তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়ে সওদাগরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপতে যাবে, এমন সময় এক বিষাদ বিষণ্ণ যুবকের দিকে তাজ অল মুলুকের নজর পড়ে। ছেলেটি দেখতে বড় সুন্দর। কিন্তু কিসের যেন ব্যথা, কিসের যেন দুঃখ তাকে মুহ্যমান করে রেখেছে। তাজ অল মুলুক-এর আর চলে যাওয়া হয় না । ছেলেটির কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, তোমার চোখে জল কেন ভাই, কি নাম তোমার?

ছেলেটি শান্ত গলায় জবাব দেয়, আমার নাম আজিজ।

আর কিছু বলতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

তাজ অল মুলুক সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেঁদ না, বন্ধু চুপ কর। দুঃখ সকলের জীবনেই আসে। তাই বলে তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া ঠিক না। বলো, তোমার কি দুঃখ। আমি যদি কাটাতে পারি, কথা দিচ্ছি, প্রাণ দিয়েও তা করবো।

ছেলেটি শান্তভাবে বলে, সে কথা শুনে আপনার কি ফয়দা হবে? থাক।

তাজ রাগ করে, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে? কিন্তু সত্যি বলছি, তোমাকে দেখামাত্র আমার অন্তর কেঁদে উঠেছে। বলো বন্ধু, অসঙ্কোচে বলো, তোমার কাহিনী। তোমার দুঃখের কিছু ভাগ নিতে চাই।

ছেলেটি বলে, ঠিক আছে বলবো, চলুন আপনার তাঁবুতে গিয়েই বলবো। এখানে অনেক লোকের ভিড়।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তাজ তার তাঁবুতে ফিরে আসে। দু'জনে মিলে খানাপিনা করে। তারপর ছেলেটি বলতে থাকে ঃ আমি আমার বাবার একমাত্র সন্তান। ধনী সওদাগর হিসাবে বাবার বেশ নামডাক ছিলো। আমার কাকা মারা যাওয়ার সময় তাঁর একমাত্র মা-হারা মেয়েকে আমার বাবার হাতে তুলে দিয়ে যান। আমরা দুই ভাইবোন এক সঙ্গেই মানুষ হতে থাকি। ওঃ বলতে ভুলে গেছি, আমার নাম আজিজ আর আমার কাকার মেয়ের নাম আজিজা। আজিজার শাদির বয়স হলো। বাবা বললেন, ভাই মারা যাওয়ার সময় হাতে ধরে বলে গিয়েছিলো, আজিজের সঙ্গে আজিজার যেন শাদী দিই।

আজিজের মা বলে, তা তো বেশ ভালোই হবে। মানাবেও ভালো। তা ছাড়া ছোট থেকে ওরা এক সঙ্গে হেসে খেলে মানুষ হয়েছে, এখন মেয়েটা পরের ঘরে পাঠাবে নাকি?

একদিন রাতে খানা খেতে বসে বাবা বললেন, তোমাকে শাদী করতে হবে।

আমি তো আশমান থেকে পড়ি। হঠাৎ বলা নাই কওয়া নাই শাদী করতে হবে? আর তা ছাড়া পাত্রীই বা কোথায়? কাকে শাদী করবো! ঘরেই যে পাত্রী বাড়ছে সে কথা কিন্তু একবারও আমার মনে হয়নি। কিন্তু তা বলে আজিজা আর আমার মধ্যে ভালোবাসা যে কিছু কম ছিলো তা নয়। দু'জন দু'জনকে ছেড়ে একটা দিন কাটাতে পারতাম না। কোনও একটা ভালো জিনিস দেখলে সব আগে আজিজার কথাই আমার মনে পড়তো। তেমনি আজিজাও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। কোথাও কোনও ভালো খাবারদাবার পেলে আমার জন্যে তুলে রাখতো। বলতো, খাও, তুমি খেলেই আমার খাওয়া হবে।

এহেন যে সম্পর্ক—তা যে একদিন স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে যাবে তা কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি। বাবা একটু কর্কশভাবেই আবার বললেন, আগামী জুম্মাবার সন্ধ্যায় তোমাদের শাদীর দিন ঠিক করা হয়েছে। তোমার বন্ধুবান্ধবদের—যাদের ডাকতে চাও নিমন্ত্রণ করে এসো।

বাবার ওপরে কথা বলার সাহস আমার ছিলো না। মাথা গুঁজে খেয়ে দেয়ে উঠে পড়লাম।

শুক্রবার দিন নামাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবো হঠাৎ মনে পড়লো, এক বন্ধুকে এখনও বলা হয়নি। ওর বাড়ির দিকে হেঁটে চললাম। দুপুরের ঝাঁঝাঁ করা রোদ। একেবারে লু বইছে। চোখমুখ ঝলসে যাবার দাখিল। আমি আর চলতে পারি না। সামনেই একটা বাগিচা। ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটা গাছের ছায়ায় শান বাঁধানো চবুতরায় বসে একটু জিরিয়ে নেবো। তারপর রোদের ঝাঁঝটা একটু কমলে আবার বেরিয়ে পড়বো—এইরকম ইচ্ছা।

ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। একটা রুমাল বিছিয়ে চবুতরার উপরে শুয়ে পড়ি।

একটু বোধ হয় তন্দ্রা লেগেছিলো। হঠাৎ খট করে একটা শব্দ হতেই কেটে গেলো। চেয়ে দেখি একখানা লাল রঙের রুমালে কি যেন একটা বস্তু পড়ে আছে আমার কাছেই। তুলে নিয়ে খুলে দেখি, রুমালে বাঁধা এক টুকরো পাথর। এদিক ওদিক চাইলাম। দেখি, সামনের বাড়ির দোতলার একটি জানালা খোলা। তার পাশে বসে এক পরমা সুন্দরী কন্যা। বুঝলাম রুমালখানা সে-ই ছুঁড়েছে।



সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে কি যে ঘটে গেলো বোঝাতে পারবো না। মনে হলো, যাকে প্রণয় বলে, প্রেম বলে—তার প্রথম আস্বাদ পেলাম। নারী আমার শৈশবকালের সঙ্গী। কিন্তু এই উন্মাদনা সে আমার অন্তরে জাগাতে পারেনি।

রুমালখানার এক কোণে কয়েকটা কথা লেখা ছিলো ঃ পথিক, তুমি কি পথ হারাতে চাও না? যে পথে চলেছো তার বাইরে তো আরও অনেক অচেনা অজানা দুর্গম পথ আছে। সেই পথে পাড়ি দেবার মজা কি পেয়েছো কখনও?

সেই মুহূর্তে ভালোবেসে ফেললাম সেই অজানা অচেনা সুন্দরীকে। আমার চিত্ত বিহ্বল হলো। ভুলে গেলাম সেই দিন সন্ধ্যায় আমার শাদী।

মেয়েটি আমাকে অনেক রকম ইশারা করে কি সব বোঝাতে চাইলো। প্রথমে তর্জনী ঠোঁটে রাখলো। পরে দু'হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরলো। কিন্তু আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। একটু পরে জানালা বন্ধ করে দিলো।

আমি তবু ঠায় বসে থাকি। আশা, আবার যদি খোলে, আবার যদি কিছু বলে! আবার

যদি তার দেখা পাই। সেই আশায় একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সেই রুদ্ধ কপাট জানালার দিকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যাও কখন রাত্রির রূপ ধারণ করে। কিন্তু বসে থাকি সেই চবুতরায়। আশা, যদি আবার সে জানালা খোলে!

কিন্তু না, জানালা আর খুললো না, ব্যর্থ মনে ঘরে ফিরে চলি! বাবা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, এই তোমার আক্কেল। আজ তোমার শাদী, আর তুমি কিনা দুপুর রাতে বাড়ি ফিরলে। এমন যার দায়িত্ব বোধ তার হাতে মেয়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। এ শাদী হবে না। আমি বাতিল করে দিলাম।

মা কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু তিনি বাবাকে ভালো করেই জানতেন। বাবার রাগ বড় চণ্ডাল। একবার 'না' বললে 'হ্যাঁ' করানো শক্ত!

আজিজা এলো। আমার হাত দু'টো ধরে পাশে বসালে, কি হয়েছে বলতো ভাই। আমার কাছে লুকিয়ো না, খুলে বলো।

জীবনে কখনও কোনও কথা আজিজার কাছে আমি গোপন করিনি। আজও পারলাম না। সব বললাম।

—প্রথম দর্শনেই ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না আজিজা, কিন্তু আজ ঐ মেয়েটিকে দেখার পর থেকে সারা দেহমনে আমার ঝড় উঠেছে। কিছুতেই মন শান্ত করতে পারছি না। কিছুতেই তার মুখচ্ছবি মুছে ফেলতে পারছি না। তুমি বলতে পারো আজিজা, এমন কেন হলো! এর কি নাম?

আজিজা বলে, এরই নাম ভালোবাসা। তুমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছো।

আমি বাধা দিয়ে বলি, না না, আজিজা, সে কি করে হয়? আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।

—না আজিজ। তোমার আমার সম্পর্ক যে ভালোবাসার, এ ভালোবাসা সে ভালোবাসা নয়। একে বলে প্রেম।

আমি চমকে উঠি। প্রেম!

আজিজা আমাকে সোহাগ জানিয়ে বলে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না আজিজ, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি জীবনে সুখী হবে। তোমার মুখে হাসি দেখবো, এর চেয়ে বড় কিছু নেই আমার কাছে। তোমার জন্যে আমার বুকের কলিজাও ছিঁড়ে দিতে পারি। শুধু আমার একমাত্র কামনা তোমাকে খুশি করা। এখন বলো তো মেয়েটা তোমাকে কিছু বলেছে কিনা।

আমি বললাম, অত দূর থেকে কথা বলবে কি করে! এই রুমালখানা সে ছুঁড়ে দিয়েছে। আর হাতের ইশারা করে কি সব বোঝাতে চেয়েছে—আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

—কী ইশারা করেছে।

—প্রথমে হাতের একটা আঙুল ঠোঁটে রাখলো। পরে হাত দু'টো বুকে চেপে ধরলো।

আজিজা বলে, বুঝেছি, ও তোমাকে চুম্বন জানিয়েছে। আর তার হৃদয় তোমাকে সমর্পণ করতে চেয়েছে। তুমি নিশ্চিত থাক, আজিজ আমি তোমাদের দু'জনের মিলন ঘটিয়ে দেব। এখন দিন দুই তুমি বিশ্রাম করো। তারপর আবার তোমাকে আমি পাঠাবো সেখানে।

আজিজার কোলে মাথা রেখে আমি তার অনেক আদর সোহাগ খেলাম। নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে সে আমাকে আশ্বস্ত করতে থাকলো। দু'দিন পরে বিকেলে সে নিজে হাতে আমাকে সাজালো। দামী পোশাক পরলো। আতর ছড়ালো শরীরে।

বললো, যাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো।

বাগিচায় ঢুকে সেই চবুতরায় বসে অধীর আগ্রহে বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে থাকি। এক এক মুহূর্ত মনে হয় এক এক যুগ। একটু পরে জানালা খুলে যায়। সেই মৃগনয়না ষোড়শী। এক হাতে আয়না আর অন্য হাতে একখানা রুমাল। রুমালখানা তিনবার ভাঁজ করলো

আবার খুললো। রুমাল সুদ্ধ হাতখানা একবার উপরে একবার নিচে উঠাতে নামাতে থাকে। আয়না দিয়ে তিনবার আমার মুখে আলো ফেলে। এর পর গায়ের জামাটার আস্তিন গুটাতে গুটাতে ধবধবে ফর্সা বাহুমূল পর্যন্ত উন্মুক্ত করে দেখায়। সব শেষে ডান হাতের পাঁচটা আঙুল প্রসারিত করে বুকের ওপর চেপে ধরে। এর পর জানালা বন্ধ করে দেয়।

আমি কিছুই বুঝতে পারি না। ছুটে বাড়ি আসি। আজিজাকে সব ইশারাগুলো দেখাই।

আজিজা বললো, এর অর্থ হলো, পাঁচদিন পরে সে তোমাকে তার হৃদয়ের কথা বলবে। ওদের বাড়ির কাছাকাছি একটা কাপড় রং করার দোকান আছে, সেখানে তুমি অপেক্ষা করবে।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠি, তুমি ঠিকই বলেছ আজিজা। ওদের বাড়ির কাছেই একটা জহুরীর দোকান আছে। জামাকাপড় রং করে। কিন্তু আজিজা, পাঁচটা দিন তাকে না দেখে আমি বাঁচবো কি করে?

আজিজা বলে, ভালোবাসা বড় বিষম বস্তু। কোনও কোনও সময় বছরের পর বছর তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। তবে দেখা মেলে। তোমাকে মাত্র পাঁচটা দিন অপেক্ষা করতে হবে, পারবে না? মনটা একটু শক্ত কর, সোনা, অত অধৈর্য হলে কি চলে? ওঠ, একটু কিছু মুখে দাও। শরীরে বল পাবে।

কিন্তু আমার মুখে কিছু রুচে না। কিছুই খেতে পারি না। সারা রাত এক ফোঁটা ঘুমাতে পারি না। এই প্রথম অনুভব করতে থাকলাম ভালোবাসার কি বিষম জ্বালা।



এই পাঁচটা দিনের অসহনীয় প্রতিটি মুহূর্ত আমার পাশে পাশে থেকে আজিজা আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে। সে ঋণ আমি কোনওদিন ভুলবো না।

পাঁচদিন পরে সে আমাকে গরম জল করে দিলো, আমি হামামে গিয়ে ভালো করে গোসল করলাম। নিজে হাতে আমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো সে।

—যাও আর দেরি করো না। সে হয়তো এসে ফিরে যেতে পারে। তার চাঁদ মুখ দেখে নয়ন সার্থক করে এসো। রাতে ঘুমিয়ে তাকে স্বপ্ন দেখতে পারবে।

আমি হন হন করে হেঁটে চললাম। কিন্তু গিয়ে দেখি দোকানটা বন্ধ। খেয়াল হলো, আজ শনিবার—বন্ধের দিন। যাই হোক, বন্ধ দরজার সামনে রোয়াকের উপর বসে রইলাম। সন্ধ্যাবেলার নামাজের সময় হয়ে গেলো। কিন্তু তার দেখা নাই। একটু পরেই রাতের অন্ধকার নেমে আসবে। ভাবলাম, আর বিলম্ব করা সমীচীন হবে না। উঠে দাঁড়িয়ে মদ্যপ মাতালের মতো প্রায় টলতে টলতে ঘরে ফিরে আসি। আজিজাকে কোনরকমে বলতে পারি, আসেনি। দেখা হয়নি।

তারপর আমার আর চৈতন্য ছিলো না। পরদিন সকালে চোখ মেলে দেখলাম, আজিজার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সারা রাত তুমি ঘুমাওনি?

—কি করে আর ঘুমাই বলো! তুমি যা ভুল বকেছো, আমার তো ভয়ই লেগে গিয়েছিলো।

আমি বললাম, কিন্তু সে এলো না কেন আজিজা?

—এও ভালোবাসার একরকম পরীক্ষা। সত্যিই তুমি তাকে ভালোবাস কিনা।

এবং তার জন্যে কতটা ধৈর্য তোমার আছে সে পরীক্ষাও সে করে নিলো। যাই হোক, আজ বিকেলে আবার তুমি বাগিচায় গিয়ে বসো। দেখবে, নতুন কোনও ইশারা জানাবে।

বিকেলে যথারীতি আজিজা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রওনা করে দিলো। বাগিচার চবুতরায় এসে বসে রইলাম। একটু পরে জানালা খুলে গেলো। এবার দেখলাম তার এক হাতে একটা বটুয়া এবং একখানা আয়না অন্য হাতে একটা লণ্ঠন এবং একটা ফুলদানী।

প্রথমে আয়নাখানা বটুয়ায় ভরলো। বটুয়ার দড়িটা এঁটে বন্ধ করে পিছনের দিকে ছুঁড়ে দিলো। তারপর মাথার চুলগুলো খুলে আলুথালু করে মুখটা ঢেকে ফেললো। এরপর সে ফুলগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো লণ্ঠনটা। এর একটুক্ষণ পরেই জানালা বন্ধ করে দিলো।

আমি কিছুই বুঝলাম না। হাহাকার করা রিক্ত হৃদয় তুষানলে জ্বলতে থাকলো। বাড়ি ফিরে এসে আজিজাকে বললাম।

আজিজা ব্যাখ্যা করে জানালো, আয়নাটা বটুয়ার মধ্যে ভরে পিছনে ফেলে দেওয়ার অর্থ—দিন শেষ হলে যখন রাত্রি নেমে আসবে। কালো চুলগুলো এলোমেলো করে ফর্সা মুখটা ঢাকার অর্থও ঐ একই। সূর্যের আলো যখন অন্ধকারে ঢেকে যাবে। ফুল—অর্থাৎ ফুলবাগানে মানে ঐ বাগিচায় যাবে তুমি। আর লণ্ঠন দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, একটা আলো দেখতে পাবে। সেই আলো অনুসরণ করে গেলেই তুমি তোমার ভালোবাসার দেখা পাবে।

এবার আর আজিজার কথা আমার বিশ্বাস হয় না।—তোমার কথা মতো যাচ্ছি, কিন্তু দেখা তো হচ্ছে না।

আজিজা বললো, ধৈর্য ধরো, আবার যাও। দেখবে এবার তুমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে না।

সত্যিই সেদিন তার দেখা পাওয়া গেলো। সন্ধ্যার অন্ধকার সবে ঘনিয়ে এসেছে। বাহারী সাজে সেজেগুজে বাগিচার সামনে আসতেই দেখি সদর ফটকটা খোলা। ভিতরে ঢুকলাম। অদূরে একটা ঝাঁপড়া গাছের নিচে একটা চিরাগ জ্বলছিলো। আলোটা লক্ষ্য করে চলতে থাকি। আলোটাও চলতে থাকে। এইভাবে এক সময় এসে ঢুকলাম এক বিশাল জলসাঘরে।

দরজা জানালায় দামী রেশমী পর্দা। মেজেয় পারস্য গালিচা। উপর থেকে ঝুলছে বিরাট বিরাট ঝাড়বাতি। টেবিলে নানারকমের বাদশাহী খানাপিনা। একপাশে ফরাশের ওপর রাখা নানা দেশের নানা জাতের বাদ্য যন্ত্র। কিন্তু ঘরে কেউ নাই। একেবারে জনমানবশূন্য। ফাঁকা। শুধু আমি একা বসে রইলাম। ভাবছি, এই বুঝি সে আসবে, এই বুঝি তার পায়ের শব্দ শুনলাম। কিন্তু না। পুরো তিনঘণ্টা কেটে গেলো। খিদেয় পেট জ্বলছে। সামনে লোভনীয় খানাপিনা। আমার প্রিয় আঙুর। কিন্তু খাই কি করে। যার আমন্ত্রণে এসেছি, তারই দেখা নাই। কিন্তু কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়। পেটে ক্ষিদে আর সামনে খাবার রেখে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। খান কয়েক পিস্তার বরফী তুলে নিয়ে খেতে থাকলাম। ওফ, কি অপূর্ব স্বাদ! এমন জিনিস তো আগে কখনও খাইনি। কতগুলো খেয়ে ফেলেছিলাম বলতে পারবো না। এক সময় দেখলাম রেকাবীখানা খালি হয়ে গেছে। কিন্তু খিদে একটুও কমলো না। এর পর রসালো 'বাক্‌কালাবাহ' গুলো একে একে সব গলাধঃকরণ করে নিলাম। তখন আমাকে খাওয়ার নেশায় পেয়ে গেছে। সফেদ হালওয়ার রেকাবীও শূন্য হয়ে গেলো। এর পর আমি মোরগ-মোসল্লাম-এর দিকে নজর দিলাম। এক এক করে চারটেই সাবাড় করে ফেললাম। সবগুলো খাবারই অপূর্ব স্বাদের। যেখানে যা ছিলো সব চেটেপুটে খেয়ে পেটটা বেশ ভরে গেলো। ঝারি থেকে পেয়ালা পেয়ালা সরাব ঢেলে নিয়ে এক এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিতে থাকলাম। ধীরে ধীরে মাথাটা ভারি হয়ে আসতে থাকে। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে। জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুম আমাকে রেহাই দিলো না। কার্পেটের উপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এর পর আর বলতে পারবো না, সারা রাতে কিছু ঘটেছে কি না। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, দেখলাম জানালা দিয়ে সোনালী রোদ এসে পড়েছে আমার মুখে। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমি রিক্ত মেজের উপরে শুয়ে আছি। সারা মেজেয় নুন ছড়ানো। কাঁটার মতো বিঁধছে। কে যেন পেটের উপর রেখে গেছে এক রাশ কয়লায় গুঁড়ো। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক ভালো করে দেখলাম। নাঃ, কেউ কোথাও নাই। সারা শরীর রী রী করতে লাগলো। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজের হাত কামড়াতে লাগলাম। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ফিরে এসে আজিজার কাছে আছাড় খেয়ে পড়ি।

আমার ঐ কিম্ভুত কিমাকার চেহারা দেখে ভীতচকিত আজিজা আমাকে টেনে তোলে, কী সোনা, একি দশা হয়েছে তোমার! কেউ কী মারধোর করেছে?

—না।

—তবে?

—জানি না। আমি ঘুমিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি কে বা কারা আমার সর্বাঙ্গে কয়লার গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে গেছে।

আজিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা বলতে পারলো না?

—মেয়েটার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

—সে কি, তোমার ঘুম ভাঙ্গার আগেই কেটে পড়েছে?

আমি অধৈর্য হয়ে উঠি।—আসলে তো কেটে পড়বে। আদপেই সে আসেনি।

আজিজা আরও অবাক হয়। মেয়েটা এলো না। অথচ তুমি তার ঘরে গেলে কি করে?

আমি সব বললাম। আজিজা হতভম্ব হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে আজিজ। মেয়েটার হাতে তোমার অনেক দুঃখ আছে। নুনের অর্থ হলো—তোমার দেহের যৌবন অপুষ্ট। যে কারণে নারী সম্ভোগের কামনার চেয়ে আহার এবং নিদ্রাই তোমার কাছে প্রধান মনে হয়। আর কয়লার গুঁড়োর মানে হচ্ছে—তার চোখে তুমি অতি ঘৃণ্য। মেয়েটার ধারণা, তুমি সেখানে শুধু খাওয়া আর ঘুমানোর জন্যেই যাও। তার দেহ যৌবন বা ভালোবাসা তোমার কাছে তেমন কোনও লোভনীয় ব্যাপার নয়। সেই কারণে আমার মনে হয়, তোমার সেখানে আর না যাওয়াই উচিৎ।

আজিজার কথা শুনে আমি বুক চাপড়াতে লাগলাম। —ইয়া আল্লাহ, সব দোষ তো আমার। বুকে যদি ভালোবাসার আগুন জ্বলতে থাকে তবে কি আর নাওয়া খাওয়ার কথা মনে আসে। প্রেম এমনই বস্তু যা চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। কিন্তু আমি তো সেই তুচ্ছ রসনা তৃপ্ত করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এইভাবে প্রেমের অপমান করলে কোন প্রেমিকাই সহ্য করে না। সেদিক থেকে ওর তো কোনও দোষ দিতে পারি না। এখন আমার কী হবে আজিজা, সে যদি আমাকে প্রত্যাখান করে আমি বাঁচবো না। একটা কিছু উপায় বাৎলে দাও, সোনা।

আমার দুঃখ দেখে আজিজাও ব্যথিত হয়। এ জীবনে আমাকে ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। আমিই তার ধ্যান জ্ঞান। আমার সুখেই তার সুখ। আমার দুঃখে সে কাতর হয়। আমাকে কী ভাবে হাসি খুশি রাখবে তার চিন্তাতেই সে পাগল। তা না হলে কোনও মেয়ে তার ভালোবাসার ধন অন্য মেয়ের হাতে তুলে দিতে পারে? আমি বুঝতে পারি, আজিজার অন্তরে তুষের আগুন জ্বলছে। কিন্তু কী অসাধারণ চাপা মেয়ে, মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নাই।

—শোনো, আজিজ, আমার তরফে যতটা করা দরকার আমি করবো। কিন্তু তাতেই কী তুমি সুখী হবে? তাকে পাবে? তুমি তো জান সোনা, তোমার বাবা আমার চাচা আমার শাদীর জন্যে চেষ্টা করছেন। শুনেছি পাত্রও নাকি ঠিক করে ফেলেছেন। তাই এখন আমাকে

তারা ঘরের বাইরে বেরুতে দেবে না। তাছাড়া তোমাদের দু'জনের ভালোবাসার মধ্যে, আমি একটা ফালতু মেয়ে, আমার যাওয়াও ঠিক হবে না। আজ রাতে তুমি আবার যাও। কিন্তু সাবধান, ঘুমিয়ে পড়বে না। যদি খানাপিনার লোভ সামলাতে পারো তা হলে চোখের ঘুম ঠেকাতে পারবে। পেট ভরা থাকলে চোখে ঘুম আসেই। তাই বলছি, জিভ দিয়ে জল গড়ালেও খানাপিনা একদম ছোঁবে না। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যাও, আমার মনে হয়, আজ রাতে সে দেখা দেবে।

সারাটা দিন ছটফট করে কাটালাম। সূর্য যখন পাটে বসলো আমি ততক্ষণে সেজেগুজে তৈরি। আমার পোশাকে আতর ছড়িয়ে দিতে দিতে আজিজা বললো, আমার কথা মনে আছে তো?

—কি কথা?

—বাঃ রে, তোমাকে বলেছিলাম না, যখন তোমার 'ভালোবাসা' তোমায় সোহাগ করবে, তখন একটা প্রেমের গান শোনাবে তাকে—

আমার মনে পড়ে। আজিজা আমাকে একটা ভালোবাসার গান শিখিয়ে দিয়েছিলো।



ওগো আমার ভালোবাসা,
ওগো আমার প্রাণ,
আমার যাহা—সকল তোমায়
করেছি তো, দান।
(আর) দেবার মতো নেইকো কিছু—
রেখে গেলাম ঋণ,
তোমার আমার মিলন হবে
শেষ বিচারের দিন॥

আজিজা বলতো, গানের গলা নাকি আমার চমৎকার।

দেখলাম, ওর দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

—আজিজা তুমি কাঁদছো।

—না না, কই না তো।

ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো মুছে ফেলে বলে, ও কিছু না। চোখে একটা কুটো পড়েছে।

আমার তখন ভালোবাসার ভীমরতি ধরেছে। আজিজার অন্তরের ব্যথা তলিয়ে দেখার ফুরসৎ নাই।

আজিজা আমাকে বিদায় দিতে দিতে বলে, দেখে শুনে যেও। আর যা যা বলে দিয়েছি মনে থাকে যেন।

সেদিনও গিয়ে দেখি, সাজানো গোছানো আগের দিনের মতোই করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনও জন প্রাণী নাই। শূন্য ঘরে একা বসে রইলাম। প্রত্যাশা আজ সে আসবে। দেখা হবে। আমায় ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ এলো না। অনেক রাত অবধি একা একা বসে রইলাম। খুব খিদে পেয়ে গেলো। আর থাকতে পারলাম না। ভাবলাম খেয়ে নিই। ঘুম যদি আসে জোর করে জেগে থাকবো। এক এক করে সব খানা পিনা চেটে পুটে খেলাম। আজ আমি খুব হুঁশিয়ার আছি ঘুম এড়াতেই হবে। চোখ দু'টো বুজে আসতে চায়। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে, পায়চারী করে জেগে থাকার চেষ্টা করতে থাকলাম। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। কখন যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, বুঝতেই পারিনি। ঘুম ভাঙতে দেখি সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু একি! আমি তো জলসাঘরে ছিলাম, এই ঘোড়ার আস্তাবলে এলাম কি করে? সারা শরীর কাদা-চোনায় মাখামাখি হয়ে গেছে। আমার পেটের ওপর কতকগুলো মাংসের হাড় আর একটা

গোলাকৃতি বল। কিছু তরকারীর খোসা, কিছু শুকনো শুটি, দু'টো দিরহাম আর একখানা ছুরি। ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়ালাম। শুধু ছুরিখানা হাতে নিয়ে বাড়ির পথে ছুটে চললাম।

আমার সেই উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখে আজিজা বুঝলো, আজও কোনও অঘটন ঘটে গেছে।

—তোমাকে পই পই করে বারণ করলাম, তবু ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। কোন জবাব দিতে পারি না। আজিজা আমাকে অনেক করেই বলেছিলো, খানাপিনার লোভ করলে ঘুম এড়াতে পারবে না। আমার নিজের সর্বনাশ আমি নিজেই করছি। তার জন্যে কাকে দোষ দেব। আজিজা আমাকে ভালো পরামর্শই দিয়েছিলো। কিন্তু আমি তা মানিনি। তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তা-ই হয়েছে।

আজিজা আমার কাছে এসে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, তুমি ভীষণ বোকা। এখনও বুঝতে পারছো না মেয়েটা কি বোঝাতে চায়?

আজিজার প্রশ্নের জবাবে গতরাতের সবই খুলে বলতে হলো।

আজিজা শুনে কপাল চাপড়াতে থাকলো—তোমাকে তো আমি তোতাপাখির মতো পড়িয়ে দিলাম, সোনা, যত লোভই হোক, খানা খাবে না, মদ ছোঁবে না। তা আমার বারণ শুনলে না কেন?

আমি চিৎকার দিয়ে উঠি।—যা হবার তো হয়ে গেছে। এবার বলো, কি করবো? তাকে না পেলে আমি মরে যাবো।

আজিজা বলে, ঐ গোল বলটার মানে হচ্ছে—তোমার ভেতরটা ফাঁপা বেলুনের মতো, অন্তঃসারশূন্য। শুধু হাওয়া ভরা। না আছে কোনও কামনা, না আছে কোন বাসনা। ঐ শব্জীর খোসাগুলো তোমার অপদার্থতার প্রতীক। আর ঐ শুকনো শুটিগুলো দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে—তোমার প্রাণের সব রং রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভালোবাসার নাম গন্ধ নাই। আর ঐ মাংসের হাড়গুলো দেখে আমি ভয় পেয়েছি—বলতে আমার গা শিউড়ে উঠছে।

আমি অধৈর্য হয়ে চিৎকার করি, কিন্তু ঐ ছুরিটা। তার কথাতো বললে না? তাছাড়া ঐ দু'টো দিরহামই বা কী?

আজিজা এক মুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর বলে, শোনো, সোনা, ছুরিটার ইঙ্গিত বড় মারাত্মক। ঐ দু'টো রূপোর দিরহাম তার দু'টো চোখের প্রতীক। ওটা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, চোখের কসম খেয়ে সে বলছে ফের যদি তুমি ওখানে গিয়ে খানাপিনা করে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো তোমার গলা সে কেটে দেবে।

আজিজার কথা শুনে অঝোরে কাঁদতে থাকি।—আমার কোনও পথ নাই। কিন্তু তাকে না পেলে আমি বাঁচবো কি করে?

আজিজা বললো, যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নাই। এবার নিজেকে একটু শক্ত কর। যা বলি মন দিয়ে শোনো। আজ সারাটা দুপুর তুমি ঘুমাও। তারপর বিকালে উঠে গোসল করে খানাপিনা করে নেবে পেট ভরে। আমি নিজে হাতে খানা পাকাচ্ছি। তুমি যা যা খেতে ভালোবাসো সেই সব খানা তৈরি করবো। খেতে রুচি হবে। পেটভরে খেয়ে গেলে খিদেও পাবে না। আর পেটে খাবার না পড়লে ঘুম আসবে না। তাছাড়া দুপুরে যা ঘুমাবে তারপর বড় একটা ঘুম পাবেও না।

আজিজার কথায় অনেকটা ভরসা হলো। বললাম, আমার মাথার কসম খেয়ে বলছি, এবার আর কোনও নড়চড় হবে না। যা যা বলবে, দেখে নিও, অক্ষরে অক্ষরে মানবো।

সারাটা দুপুর খুব ঘুমালাম। আমার শিয়রে বসে আজিজা হাওয়া করতে থাকলো। মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আমি আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হতে থাকে। হামামে গিয়ে গোসল করে নিই। আজিজা নতুন সাজ-পোশাক এনে দেয়। এই পোশাক পরে আজিজার সঙ্গে আমার শাদী হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে বিয়ে ভেঙে গেছে।

আমি বললাম, এ পোশাক কেন আনলে আজিজা? এতো আমার শাদীর পোশাক?

—কিন্তু শাদী তো আর হ'লো না!

—হ'লো না মানে—আর কি হবে না?

আজিজা মাথা নত করে মৃদু কণ্ঠে বলে, হবে না কেন? কিন্তু তখন কি আর এই পোশাকের দরকার হবে? শাহজাদীর সঙ্গে শাদী হবে, সাজপোশাকও বাদশাহী বাহারী হতে হবে।

আমি বলি, কেন তোমার সঙ্গে হবে না?

—আমার শাদী অন্য পাত্রের সঙ্গে ঠিক করছেন চাচা। তোমার সঙ্গেই তো একবার ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু তুমি তো করছো না। চাচা আর কি করবেন। বাধ্য হয়েই অন্য পাত্রের সন্ধান করেছেন।

আমি আর কোনও জবাব দিতে পারি না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। আজিজা আমাকে আদর করে বলে, তাতে কি হয়েছে আজিজ। শাদী যার সঙ্গেই হোক, আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, তোমারই থাকবো। আর তুমিও যাকেই চাও আমার তাতে কিছু যায় আসে না। এ জীবনে তোমাকে না পেলেও শেষ বিচারের দিন মিলন আমাদের হবেই।

টস টস করে দু-ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। আজিজা বলতে থাকে, আজ তোমার পরম লগ্নের দিন। চোখের জল ফেলে তোমার অভিসারের পথ পিছল করে দেব না। যাও, আজ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। প্রিয়ার আদর সোহাগে ভরে যাবে তোমার দেহ-মন। এতদিনের সাধ তোমার পূর্ণ হবে আজ। কিন্তু আজিজ সেই ভালোবাসার গানটা তাকে শোনাতে ভুলো না। তোমার মতো গানের গলা ক'জনের হয়। দেখবে, গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে আরও কত আদর সোহাগ করবে তোমায়। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙছি, সোনা তোমরা যেন ক্রৌঞ্চ মিথুন হয়ে সারাজীবন এক হয়ে থাকতে পার।

আজিজার মতো প্রেমিকা এ সংসারে হয় না। নিজের ভালোবাসার পাত্রকে সাজিয়ে গুছিয়ে অন্য মেয়ের বাসরশয্যায় পাঠাতে পারে ক'টা মেয়ে? আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বললাম, মনে আছে আজিজা। আজ যদি তার দেখা পাই, যদি মিলন হয়, তবে শোনাবো তোমার সেই গান।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। বাগিচার সদর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো সেই আলো। নিশানা ধরে এগিয়ে যেতেই পৌঁছে গেলো সেই সাজানো গোছানো জলসা ঘরে। সেই একই দৃশ্য। খানাপিনা সব যথাযথ রাখা আছে। নাই শুধু কোন জনপ্রাণী। আজ আমি আটঘাট বেঁধে এসেছি। কিছুতেই খাবার-দাবার স্পর্শ করবো না। আর ঘুম আজ আমার ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারবে না।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি গভীর হতে থাকে। আমি ঠায় চুপচাপ বসে কড়ি কাঠ গুনছি। পাশের টেবিলে খানাপিনা সাজানো আছে। ভুলেও ওদিকে নজর দিচ্ছি না। যদিও আজ আমি খেয়েই এসেছি, পেট বেশ ভর্তিই আছে। তবু বলা যায় না, বাদশাহী খানাপিনা, লোভ যদি না সামলাতে পারি। ধীরে ধীরে চারদিক নিঝুম নিশুতি নিস্তব্ধ হয়ে আসে। আমি গুন গুন করে গান গাই। মাঝে মাঝে রাত জাগা পাখির কর্কশ আওয়াজে চমকে উঠি। বাগিচার কোথাও হয়তো কোনও জানোয়ার-এর পায়ের শব্দ কান পেতে শুনি।

এইভাবে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরও কেটে যায়। এবার ধীরে ধীরে হতাশা গ্রাস করতে

থাকে। না, সে বুঝি আর আসবে না। আমার এত তোড় জোড় এত আশা আকাঙ্ক্ষা সব বুঝি ভেস্তে গেলো। প্রিয়া আমার প্রতি বিরূপ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এই সময়ে কিছু নারী কণ্ঠের কলহাস্যে চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখি দশটি সুদর্শনা সখী পরিবৃতা হয়ে সে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হলো, দশটি উজ্জ্বল তারার মাঝখানে সে এক আসমানের চাঁদ। গাঢ় নীল রঙের রেশমী শাড়ি পরেছে। সারা অঙ্গ তার জহরতের গহনায় মোড়া। আরো কাছে এসে সে মুচকি হেসে বললো, বাঃ, চমৎকার। কিন্তু আজ তোমার ঘুম গেলো কোথায়, সাহেব। দিব্যি তো জেগে আছো দেখছি।

তোমার আগমনের খবর পেয়ে সে পালিয়েছে, সুন্দরী।

সখীদের ইশারা করতেই তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। সে আমার পাশে এসে বসলো। দু'হাতে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। গভীর আশ্লেষে চুম্বন করলাম তাকে। সেও প্রতিদান দিলো। তারপর কার্পেটের উপর শুয়ে পড়লাম দু'জনে। সারাটা রাত ধরে সে আমাকে আদর সোহাগ করতে থাকলো। আমার এত দিনের কামনা বাসনা আজ চরিতার্থ হলো। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে সুখ নিদ্রায় ডুবে গেলাম।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমি বললাম, আজ চলি।

সে বললো, দাঁড়াও দু'টো কথা বলি। সারা রাত তো মত্ত হয়েই কেটেছে। আলাপ পরিচয় কিছুই হয়নি। তা সাহেবের নাম কি?



—আমার নাম আজিজ। তোমার?

—আমার নাম দুনিয়া। আমার বাবা কর্পূর আর প্রবাল দ্বীপের সুলতান। আজ তোমাকে একটা জিনিস উপহার দেব। ভালো করে রেখো। আমাদের প্রথম মিলনের স্মৃতি চিহ্ন। আমি যখন তোমার কাছে থাকবো না, এই রুমালখানা আমার কথা মনে করিয়ে দেবে তোমায়। সূক্ষ্ম কাজ করা আছে এক কোণায়। আমার নিজের হাতের কাজ।

এই বলে সে একখানা রেশমী রুমাল আমার হাতে তুলে দিলো।

আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখি আজিজা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। আমাকে দেখে সে হাসলো।

—একি তোমার চেহারা হয়েছে, আজিজা।

—ও কিছু নয়, আজিজ। আমি বেশ আছি। তোমার খবর কি বলো?

গত রাতের সব ঘটনাই যথাযথ খুলে বললাম তাকে। রুমালখানা ওর হাতে দিয়ে বললাম, প্রথম মিলনের প্রীতি উপহার।

আজিজা উৎফুল্ল হলো না। কোন উপদেশ দিলো না। শুধু বলতে পারলো, তুমি সুখী হয়েছ আজিজ? তোমার মুখে হাসি দেখে যেতে পারলেই আমার অনেক পাওয়া হবে।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি, কোথায় যাবে, আজিজা?

—না মানে, চিরকালই তোমাদের এখানে থাকবো নাকি? বিয়ে শাদী করবো না? শ্বশুরঘর যাবো না?

—ওঃ, এই কথা।

—আমি হতাশ বলি, আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না, আজিজা?

—আমি যেখানে যাবো সেখানে কষ্ট বলে কিছু নাই।

আজিজার এই হেঁয়ালী ভরা কথার কোন অর্থ করতে পারলাম না। চেষ্টা করলাম না। কারণ তখন আমি সুখ, স্বপ্নে বিভোর।

আজিজা বললো, আমার সেই গানটা ওকে গেয়ে শুনিয়েছিলে?

—ও—ই—যাঃ! একদম ভুলে গেছি।

—ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, আজিজ। যাক, আজ যদি মনে থাকে, গেয়ে শুনিও। ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে গড়া ঐ গানখানা। শুনলে, সে গুণী মেয়ে, নিশ্চয়ই তারিফ করবে।

বুঝলাম আমার এই ভুলে যাওয়ায় আজিজা আহত হয়েছে। স্বাভাবিক ভালোবাসার পাত্র যদি কোনও অনুরোধ রাখতে ভুলে যায় তা অমার্জনীয় অপরাধ। আজিজার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তা তো ভালোবাসা ছাড়া আর কোনও নামেই ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি ওর হাত দুটো ধরে কাছে টেনে নিলাম। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমু খেয়ে বললাম, আমাকে মাফ করো সোনা, আজই তাকে শোনাবো তোমার গান।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় বাগিচায় ঢুকতেই দেখি দুনিয়া নিজে দাঁড়িয়ে আছে। আমার হাত ধরে জলসাঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। সেদিন রাতে আমরা একসঙ্গে বসে খানাপিনা করলাম। আদর সোহাগে আমার হৃদয় মন সে ভরিয়ে দিতে থাকলো। আমার জীবনে তখন যৌবনের ঢল নেমেছে। সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণে সব ভেসে একাকার হয়ে গেলো। সে রাতে আর আমরা ঘুমালাম না। একে অন্যের দেহ আশ্রয় করে সারাটা রাত মধুর করে কাটিয়ে দিলাম।

ভোরবেলা বিদায়ের পালা। হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজিজার সেই ছলছল চোখ। আমার গানটা তাকে শুনিও। আমি বললাম, বিদায় নেবার আগে তোমাকে একটা গান শোনাবো। এই আমার স্মৃতি উপহার। যদি কোনওদিন তোমার কাছে নাই থাকতে পারি, তবে কখনও বৃষ্টিঝরা দিনে বাতায়ন পাশে বসে আমার কথা ভেবো—আর আমার এই গানখানি গুণগুণ করে গেও, প্রিয়তমা।

ওগো আমার ভালোবাসা,
ওগো আমার প্রাণ,
আমার যাহা—সকল তোমায়
করেছি যে দান।
(আর) দেবার মতো নেইতো কিছু—
রেখে গেলাম ঋণ
তোমার আমার মিলন হবে
'শেষ বিচারের দিন॥'

গান শেষ হতে না হতেই দুনিয়া চিৎকার করে ওঠে, থামো। এ গান তুমি কোথায় পেলে? কে শিখিয়েছে তোমাকে?

আমি হতবাক। নিছকই একটা প্রেম-সঙ্গীত। তা শুনে দুনিয়া কেন এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললাম, গানটা আমার চাচার মেয়ে আজিজা আমাকে শিখিয়েছে।

—সে তোমাকে ভালোবাসে?

আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু সে আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে, বলো, চুপ করে থেক না।

আমি ঘাড় নাড়লাম।—হ্যাঁ সে আমাকে প্রাণাধিক ভালোবাসে।

—তবে আমার সঙ্গে ঢং করতে এসেছো কেন? একটা মেয়ের জীবন বরবাদ করে দিয়ে আর একটা মেয়েকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এসেছো?

—আমি ছিনিমিনি খেলতে আসিনি সোনা, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি।

—ছাই করেছো। সে-ও তোমাকে প্রাণ দিয়েই ভালোবাসে। তার জীবনটা নিয়েই বা এই রকম জুয়া খেললে কেন? বেচারী বোধ হয় আর এতক্ষণে বেঁচে নাই।

আমি শিউড়ে উঠি, বেঁচে নাই? কে বলেছে তোমাকে?

—কে আবার বলবে। আমি লিখে দিতে পারি সে আর জীবিত নাই। তুমি কি কিছুই বোঝ না, হাঁদা? গানটার মধ্যেই তো তা পরিষ্কার বলা আছে। যাও, বাড়ি যাও। দেখগে, সে আর এতক্ষণে এ জগতে নাই। ছিঃ ছিঃ আজিজ, একটা মেয়ের নিষ্পাপ ভালোবাসা পায়ে দলে কি করে পারলে তুমি আমার কাছে আসতে?

আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি। তুমি প্রেমের অযোগ্য পাত্র। তোমার সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নাই। তুমি নিজে হাতে তোমার প্রেমাস্পদকে খুন করেছো। প্রেমের যে মর্যাদা দিতে পারে না, তার কাছ থেকেই আমিই বা কি পাবো। তুমি যাও, বিদায় হও। তার কবরে একটা ফুলের তোড়া দিয়েও অন্তত তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর গে।

আমি ধীর বিষণ্ণ পায়ে বাড়ি ফিরি। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চমকে উঠি। একটু করুণ কান্নার রোল উঠেছে। অনেক লোকজন জড় হয়েছে।

দুনিয়া ঠিকই বলেছিলো। আজিজা আর ইহজগতে নাই। আজ ভোরেই সে মারা গেছে। জহর খেয়েছিলো।

আমার সারা শরীর অবশ অসাড় হয়ে আসে। কান্নায় মুখ ঢেকে বসে পড়ি। একি করলাম আমি। সব-সব আমার দোষ!

সারাটা বছর ধরে শুধু কাঁদলাম। সেই প্রথম অনুভব করলাম, আমিও আজিজাকে ভালোবাসতাম। সে-ভালোবাসার আগুনের শিখা কোনদিনই লেলিহান ছিলো না। মৃদু মিষ্টি মোমের আলোর মতো সে প্রেম ছিলো স্নিগ্ধ-সুরভিত। সে যতদিন ছিলো—তার অভাব অনুভব করতে পারিনি। আজ তার অভাবে বিশ্ব সংসার আমার কাছে বিষবৎ মনে হতে থাকে—জীবনের আর কোনও দাম নাই—বাঁচার আরও কোনও মানে নাই।

তবু বাঁচতে হয়। তাই আবার রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে পড়ি। দেশে দেশে ঘুরি। মন ভোলানো হরেক রকম বাহারী জিনিস ফিরি করে ফিরি। কিন্তু আমরা মন কিছুতে ভোলে না। অহরহ সেই এক চিন্তা—আজিজা। আমার নয়নের মণি—আমার কলিজা।

আজিজের কাহিনী শুনে তাজ অল মুলুক মুগ্ধ হয়ে বলে, দোস্ত আজিজ, দুনিয়াকে দেখার বড় বাসনা হচ্ছে। মেয়েটির রূপ যেমন বুদ্ধিও তেমনি অসাধারণ।

আজিজ বললো, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তাজ তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। আমি ভাবছি, যাবো সেই কর্পূর প্রবাল দ্বীপ। দেখবো সেই সুন্দরীর রূপ। আঁজলা ভরে পান করবো তার সুধা।

আজিজ বলে, খুব ভালো কথা। কিন্তু সে মেয়ে কি সহজে বশে আসবে?

—দেখা যাক। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা—তোমাকে আমি ছাড়বো না। আমার জিগরী দোস্ত। তোমার সঙ্গী সাথী সওদাগরদের বলে দাও, এখানেই তুমি আমার আশ্রয়ে থাকবে। ওরা যেন চলে যায়।

প্রাসাদে ফিরে এসে শাহজাদা তাজ অল মুলুক প্রথমে বন্ধু আজিজের বসবাসের জন্য একটি মনোরম প্রাসাদতুল্য ইমারতের বন্দোবস্ত করে দিলো। দরবারে তাকে একটা উঁচু পদে বহাল করে মোটা বেতনের ব্যবস্থা করলো। চাকর-নফর দাস-দাসী যা প্রয়োজন সব দেওয়া হলো তাকে।

এরপর তাজ এসে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে দেয়। সারা প্রাসাদে হৈচৈ পড়ে যায়। শাহজাদার গোঁসা হয়েছে। কেন, কেউ বলতে পারে না। তবে এটা ঠিক, রাগ করে দরজা বন্ধ করেছেন তিনি। এক সময়ে সুলতান সুলেমানের কানে গেলো, শাহজাদা নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছেন।

সুলেমান উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, কেন? কি চায় সে?

তাজ-এর ছোটবেলা থেকেই এই এক কায়দা। কোনও কিছু চাইতে হলে সোজাসুজি সে চাইবে না।

উজির বলে, সে জানিনা জাঁহাপনা, আপনি তো জানেন সে কারো সঙ্গে কোনও পরামর্শ করে না।

সুলতান বললো, ঠিক আছে, আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলবো।

সুলতান বুঝতে পারে পুত্র এক অদর্শনা নারী প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাকে আর কিছুতেই নিরস্ত করা যাবে না। তবু উজিরকে দিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখেন। উজির বলে, আমি শাহজাদাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি। সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশ কর্পূর—প্রবালদ্বীপ।

সুলতান প্রশ্ন করে, সে মেয়ের সন্ধান তাকে দিলো কে?

—এক বিদেশী সওদাগর। বয়সে সে নবীন, শাহজাদারই উমর হবে। সে তার মনে রং ধরিয়েছে। দুনিয়ার মতো সুন্দরী কন্যা নাকি দুনিয়ায় নাই। তার চোখ, তার নাক, মুখ-এর গড়ন নিখুঁত। দুধে-আলতা গায়ের রং।

সুলতান সুলেমান শাহ চিন্তিত হয়। —এমনি দূর দেশ থেকে পাত্রী না আনলে ছেলের পছন্দ হবে না? আমাদের আশেপাশের সুলতান বাদশাহের ঘরে কি পরমা সুন্দরী মেয়ে জন্মায় না?

—খুব জন্মায়, জাঁহাপনা। আপনি হুকুম করুন, এখুনি গণ্ডাখানেক এনে হাজির করছি। বাজিয়ে দেখে নেবেন। যদি কেউ খুঁত ধরতে পারে, নাকে খত দিয়ে চলে যাবো। কিন্তু ছেলের যদি দিল্ বাঁধা পড়ে থাকে অন্যখানে, তা সে যাকেই এনে দিন, মনে ধরবে না।

সুলতান তাজকে ডেকে বললো, মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ বাবা। মেয়ের কোনও অভাব নাই। যদি বলো, আমি পাঁচশো সুন্দরী বাঁদী এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। তার মধ্যে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী মেয়ে অনেক পাবে। তাও যদি পছন্দ না হয় আশেপাশের সুলতানদের ঘরে অনেক সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে। তাদের কাউকে পছন্দ কর।

কিন্তু তাজের সেই এক গোঁ। দুনিয়া ছাড়া দ্বিতীয় মেয়ে সে দেখবে না।

সুলতান ভাবে, বেশি পিড়াপিড়ি করলে ছেলে বিগড়ে যেতে পারে। উজিরকে বললো, আর ঘাঁটিয়ে লাভ নাই। তুমি কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে যাত্রা কর।

ছেলেকে বললো, তোমার আব্দার আমি কখনও অপূর্ণ রাখিনি, বাবা। তাই আজ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্পূর প্রবাল দ্বীপের সুলতানের কাছে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। সে যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তা আমি সহ্য করবো না। তার সলতানিয়ৎ গুঁড়ো করে দেব।

তাজ-এর বন্ধু আজিজকে ডেকে সুলতান জিজ্ঞেস করলো, কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে যাওয়ার পথ ঘাট তোমার জানা আছে?

আজিজ জানায়, সে সেখান থেকেই আসছে। পথ ঘাট সব তার নখ-দর্পণে।

সুলতান সুলেমান বললো, তাহলে তোমাকে বাবা, উজিরের সঙ্গে যেতে হবে।

আজিজ মাথা হেঁট করে সম্মতি জানায়, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

সুলতান উজিরকে বলে, আর দেরি করে লাভ নাই, উজির। চটপট রওনা হয়ে পড়। কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে পৌঁছাতেই অনেক দিন কেটে যাবে।

দু এক দিনের মধ্যে নানা সুন্দর সুন্দর মূল্যবান উপহার উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে উজির রওনা হয়ে যায়। সঙ্গে চললো আজিজ। অনেক খাল বিল নদ-নদী মরুপ্রান্তর পার হয়ে অবশেষে একদিন কর্পূর-প্রবাল দ্বীপের সীমানায় এসে তাঁবু গাড়লো। অশ্বারোহী দূত গেলো সুলতানের দরবারে। সুলতান সাদরে অভ্যর্থনা করে উজিরকে নিয়ে এলো প্রাসাদে।

উজির সুলতান সুলেমান শাহর উপহার সামগ্রী তুলে দেয় সুলতানের হাত।—সুলতানের তরফ থেকে আমি আপনাকে সুক্রিয়া জানাচ্ছি, জাঁহাপনা। আপনি গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

প্রচলিত রীতি অনুসারে শাহী মেহমানদের বিশ্রামের আয়োজন করা হলো। একটি বিলাস বহুল সুরম্য প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা হলো। খানা পিনা আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখলো না সুলতান। এইভাবে পাঁচ দিন বিশ্রাম নেবার পর আলাপ আলোচনা শুরু হয়। এই এখানকার নিয়ম।

ছয় দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে উজির হামামে গিয়ে ভালো করে গোসল সারলো। তারপর বাদশাহী উজিরের সাজ পোশাক পরে দরবারে এসে নিজের পরিচয় পত্র পেশ করে সুলতানের দর্শনপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো। ক্ষণকাল মধ্যে সুলতানের উজির নিজে এসে অভ্যর্থনা করে দরবার কক্ষে নিয়ে গেলো।

উজির যথারীতি কুর্নিশ জানিয়ে সুলতান সমীপে তার সুলতান সুলেমান শাহর প্রস্তাব পেশ করলো।

সুলতান ক্ষণকাল মৌন থেকে চিন্তা করলো। চোখে মুখে অজানা আতঙ্কের রেখা ফুটে উঠলো। কি জবাব দেওয়া যায় কিছুই ভাবতে পারে না। সুলতান সুলেমান সবুজ শহরের মহাপ্রতাপান্বিত বাদশাহ। তাকে অখুশি করার মতো কোনও কথা বলতে গেলে ভাবতে হবে বৈকি! সে তার মেয়েকে খুব ভালো করেই জানে। এর আগেও কয়েকবার তার শাদীর উদ্যোগ করা হয়েছিলো। কিন্তু মেয়ের সেই এক গোঁ, শাদী সে করবে না।

ভেবে কোনও কুল-কিনারা করতে পারে না। অবশেষে প্রধান খোজাকে ডেকে বললো, শাহজাদী দুনিয়াকে নিয়ে এসো।

খোজা কুর্নিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়। সুলতান বলে আমার কন্যা দুনিয়া বড় এক রোখা। তার জেদ কিছুতেই সে শাদী করবে না। আশে পাশের সুলতান বাদশাহের শাহজাদারা তার জন্যে পাগল। কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজি করানো যাচ্ছে না। সে আসুক, আপনার সামনেই আমি মহামান্য সুলতানের প্রস্তাব জানাবো। দেখুন, কি জবাব দেয়।

খোজা সেই গেলো তো গেলই। আর ফেরে না। খোজাকে খোঁজার জন্য আর একজন খোজা পাঠানো হলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো, জাঁহাপনা, আমাকে তাড়া করেছেন।

সুলতান বুঝতে পারে না, তাড়া করেছে? কে তাড়া করেছে?

—জী হুজুর, শাহজাদী।

—দুনিয়া?

—জী হুজুর।

—কেন?

খোজা বলে, আমি তাকে গিয়ে বললাম, সুলতান আপনাকে ডেকেছেন। তা তিনি আসছিলেন। সাজ গোজ সব হয়েই গিয়েছিলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, কেন ডেকেছে জানিস?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনার শাদীর লেগে সবুজ শহরের সুলতান উজির এসেছেন।

এই কথা শুনা মাত্র, কি বলবো, জাঁহাপনা, কোমর থেকে ইয়া বড় ছুরি বের করে আমাকে তেড়ে এলেন তিনি, বাঁদর আগে বলিসনি কেন? আমি তোর নাক কান সব কেটে নামিয়ে দেব। এই না শুনে, আমি চোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়েছি। শাহজাদী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন, আব্বাজানকে গিয়ে বল, ফের যদি আমার শাদীর কথা তোলেন তিনি, আমি আত্মঘাতী

হবো। আমার হুবু স্বামী আমার মুখের সুরৎ দেখতে পাবে না। আর তাতেও যদি বাধা দেন, পাহারা বসিয়ে রাখেন আমার চারপাশ, আমি বাসর ঘরে স্বামীকে খুন করবো। তারপর নিজের কলিজায় ছুরি বসাবো। বোরখা খুলে আমার চেহারা দেখার সুযোগ দেব না তাকে।

এই সময়ে রজনী অবসান হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একশো একত্রিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার কাহিনী শুরু হয়।

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা দরবারের সবাই খোজার সেই বর্ণনা শুনলো।

দুনিয়াজাদের পিতা সুলতান উজিরের উদ্দেশে বললো, আপনি নিজের কানেই সব শুনলেন। এবার বলুন আমার কি কর্তব্য?

উজির এর কি পরামর্শ দেবে? সুলতান বললো, আপনি মহানুভব সুলতান সুলেমান শাহকে আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিবেদন করুন, আমার কন্যার বড় এক রোখা স্বভাব। শাদীর কথা শুনলেই তার মাথায় খুন চেপে যায়। আমিও জোর জবরদস্তি করি না। আমার এক মাত্র সন্তান এই দুনিয়া। যে কোন কারণেই হোক, তাকে যদি হারাই, সে শোকতাপ আমি সহ্য করতে পারবো না। আল্লাহ আপনাদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন করুন, এই প্রার্থনা করি।

আর দেরি না করে আজিজকে নিয়ে উজির সবুজ শহরের পথে যাত্রা করলো।

সুলতান শুনে ক্রোধে কাঁপতে থাকে। এত বড় স্পর্ধা। আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। দরবারের সব আমির ওমরাহদের জরুরী তলব পাঠানো হলো।

সুলতান হুকুম জারি করলো কর্পূর-প্রবাল দ্বীপ আক্রমণ করতে হবে। আর তিল মাত্র দেরি না করে সেনাবাহিনী প্রস্তুত কর।

উজির উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সুলতানের দরবারে—আমার একটা আর্জি আছে জাঁহাপনা, কর্পূর-প্রবাল দ্বীপের সুলতানের কোন দোষই নাই। তিনি আমাদের আদর যত্নের কোন ত্রুটি রাখেননি। সুলতানের প্রস্তাবে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কিন্তু বাধ সেধেছে তাঁর অবাধ্য কন্যা শাহজাদী দুনিয়া। সুলতানকে হুমকি দিয়েছে, ফের যদি তার শাদীর ব্যবস্থা করা হয়, তবে সেই বরকেই সে খুন করবে, পরে নিজেও আত্মঘাতী হবে। তার বাবাও আপনার মতোই ক্রুদ্ধ হয়েছেন মেয়ের উপরে।

সুলতান সুলেমানের রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়। হুঁ, উজির যথার্থই বলেছে। দুনিয়ার পিতার সলতানিয়ৎ আক্রমণ করা সঙ্গত হবে না। কারণ সুলতানের কোনও দোষ নাই। আর দুনিয়ার প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্য যদি আক্রমণ চালানো হয়, ফল শুভ হবে না। দুনিয়া আত্মঘাতী হলে তাজ বিরূপ হবে।

সুলতান পুত্র তাজ অল মুলুককে ডেকে সব বললো। তাজ বললো, আমি কিন্তু আশা ছাড়তে পারছি না জাঁহাপনা। আপনি আমার ওপর সব ব্যাপারটা ছেড়ে দিন। আমি তাকে রাজি করাবোই।

সুলতান আঁতকে ওঠে, সে কি। তুমি যাবে নাকি সেখানে? শুনেছি সে পুরুষ বিদ্বেষী। তোমাকে দেখামাত্র হত্যা করবে।

তাজ বলে, যায় যদি প্রাণ যাবে তারই হাতে। সে মৃত্যুই আমার বেহেস্ত সমান। কিন্তু আমি বলছি, সেসব কিছুই হবে না।

সুলতান আতঙ্কিত হয়। তুমি আমার সবে ধন নীলমনি। তোমাকে হারালে আমি বাঁচবো কি করে? আর এই বিশাল সলতানিয়াতেরই বা কি হবে?

তাজ পিতাকে আশ্বস্ত করে বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জাঁহাপনা, নিজেকে রক্ষা করার মতো অস্ত্র বিদ্যা আমার রপ্ত করা আছে। আর তাছাড়া আমি তার কাছে শাহজাদার পরিচয় নিয়ে যাবো না।

সুলতান অবাক হয়ে বলে, তবে কি ভাবে যাবে?

—আমি এক সওদাগরের ছদ্মবেশ নেবো।

সুলতান বললো, যাই কর বাপু, উজির আর আজিজকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। বিদেশ বিভুঁই—একা একা তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার মন চায় না।

তাজের ইচ্ছায় আর সুলতানের হুকুমে প্রায় লক্ষাধিক দিনারের দামী দামী মনোহারী বিলাস সামগ্রী সাজ পোশাক আর রেশমী কাপড় কেনা হলো। সুলতান খাজাঞ্চীখানা থেকে নগদ একলক্ষ সোনার মোহর অনেক হীরে জহরৎ সঙ্গে দিলো। দিনক্ষণ দেখে উট, খচ্চরের পিঠে সওদা পত্র বোঝাই করে মার কাছে বিদায় নিতে যায়। মা আশীর্বাদ করে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলো। প্রাসাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা চোখের জলে ফেলতে থাকে। তাজ সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিলো।

উজির, আজিজ এবং তাজ অল মুলুক প্রায় একমাস চলার পর একদিন কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে এসে পৌঁছয়। আজিজের কথা মতো একটা সরাইখানায় ওরা আশ্রয় নেয়। তাজ-এর হৃদয় আনন্দে দুলে ওঠে। এই সেই কর্পূর-প্রবাল দ্বীপ—তার মানস প্রিয়া-বাসভূমি। সেই রাতটা সরাইখানায় কাটাবার পর পরদিন একটা বিরাট বাড়ি ভাড়া করা হলো। তার পর কাপড় পট্টির দোকানে দোকানে ঘুরে দোকানীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে থাকলো।

উজির বললো, দেখ বাপু, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

দুজনে সমস্বরে প্রশ্ন করে কী?

—দোকানে দোকানে ঘরে সওদা না বেচে বরং এক কাজ কর। শহরের মাঝখানে এক চৌরাস্তার মোড়ে এক বিরাট দোকানের সামনে বসবে। খদ্দের যারা আসবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। আর আজিজ থাকবে পিছনে। সে শুধু তোমার হুকুম মতো কাপড় চোপড় বের করে দেবে। আমার মনে হয়, তোমাদের দুজনের যা সুন্দর চেহারা, দু-একদিনের মধ্যে দোকানের পশার জমবে। শাহজাদা তাজ আর আজিজ দুজনেই তারিফ করে বলে, চমৎকার হবে।

তাজ আর আজিজ শহরের কাপড় পট্টির দোকানগুলো যখন ঘুরে দেখছিলো, সবাই ওদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। এমন সুন্দর চেহারার যুবক তারা কমই দেখেছে। একজন দোকানদার স্বাগত জানিয়ে বলে, দয়া করে একটু পায়ের ধুলো দিন।

উজির বলে, আমরা আপনার খদ্দের হতে আসিনি শেখ!

—তাতে কি হয়েছে। আসুন ভিতরে আসুন। আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে বিদেশী মুসাফির।

উজির ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিকই ধরেছেন। ছেলে দুটোর লেখাপড়া শেষ হয়েছে এখন ওদের একটা ব্যবসা বাণিজ্যে স্থিতি করে দেব বলে দেশ ভ্রমণে বেড়িয়েছি। অনেক দেশের অনেক শহর ঘুরেছি। শেষে আপনাদের শহরে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। ভাবছি যদি একটা মনমতো দোকান ঘর পাই, ভাড়া নিয়ে একটা কাপড়ের দোকান করে দেব। তা শেখ সাহেব, তেমন কোন দোকান ঘর এখানে মিলতে পারে? দিতে পারেন কোনও সন্ধান?

দোকানী বললো, সানন্দে। আপনারা বিদেশী। একটু সাহায্য না করলে যে মহাপাতক হবো। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, ঐ চৌমাথার মোড়ে একটা প্রকাণ্ড দোকান বিক্রি আছে। দোকানের মালিক বৃদ্ধ হয়েছেন। সন্তান বলতে একটি মাত্র কন্যা। তার শাদী হয়ে গেছে। জামাই খানদানী ঘরের ছেলে। দোকানে বসা তার ইজ্জতে বাধে। তাই বৃদ্ধ ঠিক করেছেন দোকান পাট বিক্রি করে দিয়ে মক্কা চলে যাবেন।

চৌমাথার দোকান ঘরটা বেশ বড়সড়। এক রকম সাজানো-গোছানই আছে। তার সামান পত্র এনে তুললে একেবারে জমজমাট হয়ে উঠবে। সেই দিনই দরদাম ঠিক হয়ে গেলো। বৃদ্ধ আর দেরি করতে চায় না। উজিরের হাতে চাবি তুলে দিয়ে বললো, আজ থেকে এ দোকান আপনার। আপনার ছেলেরা, আল্লাহর দোয়ায়, দোকানের চেহারা চরিত্র পালটে দিতে পারবেন।

পরদিন থেকে দোকান সাজাবার পালা শুরু হলো। বাহারী বাহারী নানা রঙের সাজ পোশাক সামনে এনে ঝুলিয়ে দিলো। কয়েক দিনের মধ্যে নতুন নতুন খদ্দেরে জমজমাট হয়ে উঠলো।

অল্প দিনের মধ্যেই দোকানের খ্যাতি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। খানদানী ঘরের নারী পুরুষরা এসে ভিড় জমাতে থাকে। দামী দামী বাহারী সাজ পোশাক কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু যার জন্য দোকান খুলে বসা,—সেই দুনিয়া এক দিনও এলো না।

তাজ অল-মুলুক দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ে। তবে কি এত উদ্যোগ আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? রাতে শুয়ে ঘুমাতে পারে না। খানা পিনা কিছুই ভালো লাগে না।

এমনি ভাবে দিন যায়। দোকানে বসে আজিজের কাছে মনের দুঃখ জানায় তাজ। মাঝে মাঝে খদ্দের আসে। আবার চুপ করে যায়।

একদিন দোকানে বসে, তখন খদ্দের ছিলো না, দুই বন্ধু প্রাণের কথা বলে চলেছে। এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা এসে ঢুকলেন। সাদর অভ্যর্থনা করে বসালো তাজ। বলুন, সাহেবা, আপনার জন্য কি করতে পারি?

বৃদ্ধা প্রশ্ন করে, আচ্ছা বেটা, তোমরা এদেশের মানুষ?



—জী না। আমরা বিদেশী। এর আগে কখনও এ দেশে আসিনি। এই প্রথম এসে, কিছুদিন হলো দোকান খুলেছি। ব্যবসা করাই বড় কথা নয়, আপনাদের দেশে এসে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করাই আসল উদ্দেশ্য।

বৃদ্ধা বলে, শুনে খুব খুশি হলাম বেটা। তা কি ধরনের সাজ পোশাক এনেছো। সবই তো তোমাদের নিজের মুলুক থেকে আনা? আমাকে দু' চারটে বাহারী কাপড়-এর থান দেখাও তো।

—জী হাঁ। সবই বাহারী। এ দোকানে সাধারণ মানুষের জন্যে কোন সাজপোশাক আমরা রাখিনি। সবই বাদশাহ, সুলতান, আমির ওমরাহদের বিবি কন্যাদের জন্যে।

বৃদ্ধা বেশ একটু অহঙ্কার নিয়েই বলে, আমিও কিনতে এসেছি শাহজাদী দুনিয়ার জন্যে। তার কয়েকটা সেমিজ কামিজ বানাতে হবে।

তাজ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। বৃদ্ধা যেন কার নাম করলো? —কি বললেন? শাহজাদী দুনিয়া?

—হ্যাঁ গো বাছা, সুলতান শাহরিমানের কন্যা দুনিয়া।

তাজ আজিজকে বলে, সব চেয়ে সেরা কাপড়ের থানগুলো বের করে দাও।

সবুজ শহরের তাঁতীদের খ্যাতি অনেক কালের। তাদের হাতে বোনা রেশমী কাপড় দেশ বিদেশে চালান যায়। সূক্ষ্ম কারুকর্ম অসাধারণ। চোখে না দেখলে বলে বোঝান অসম্ভব।

তাজ অব মুলুক একটার পর একটা থান খুলে মেলে ধরে। বৃদ্ধার চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। এমন বাহারী কাপড় অন্য কোন দোকানে সে দেখেনি।

বৃদ্ধা বলে, দেখে তো সবই নিতে ইচ্ছে করছে। সব গুলোই চমৎকার।

তাজ বলে, তা নিন না। যেটা যেটা পছন্দ, বলুন আমি বেঁধে দিচ্ছি।

—তাতো বুঝলাম বাছা, কোনটার কি দাম বলো, শুনি।

তাজ বলে, দামের জন্যে কেন চিন্তা করছেন। শাহজাদীর পছন্দ হয় কিনা দেখুন। তিনি যদি মেহেরবানী করে গ্রহণ করেন, আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

বৃদ্ধা বলে, পছন্দ না হওয়ার কিছু নাই বেটা। এমন রংদার বাহারী কাপড় সারা শহর খুঁজলে একটা মিলবে না। তাছাড়া আমি পছন্দ করে নিয়ে গেলে দুনিয়া না বলতে পারবে না। ওকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি।

তাজ বলে, দাম কিছু দিতে হবে না দাদীমা, আপনি আমার দোকানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাতেই সব পাওনা শোধ হয়ে গেছে।

—ওমা সে কি কথা গো। আমি বুড়ি থুড়ি মানুষ। কচি ডাগর ডাঁসা রূপসী সুন্দরী হলেও না হয় কথা ছিলো। এক কথায় এত দামের সওদা দিয়ে দেবে আমায়?

তাজ হাসে, আপনার কি ধারণা ডাগর ডাঁসা রূপসী মেয়ে দেখলেই আমরা ভুলে যাই।

—তা তোমাদের এই কাঁচা বয়েস এখন, ডবকা মেয়েদের দিকেই তো নজর থাকা স্বাভাবিক।

—না দাদীমা, অমন ছোট নজর আমার নয়। পথ চলতি অল্প বয়েসী মেয়েছেলে দেখলেই জান খলখল করে উঠবে সে বান্দা আমি নই। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।

খুশিতে ডগমগ করে ওঠে বৃদ্ধা। —বেটা তোমার কি নাম?

—আমার নাম তাজ-অল-মুলুক।

বৃদ্ধা অবাক হয়। —এ রকম নাম তো সুলতান বাদশাহর ঘরে ছাড়া হয় না।

কি বলবে তাজ ভেবে পায় না। আজিজ এগিয়ে এসে বলে, মানে—বাপ-মায়ের খুব আদরের দুলাল তো, শখ করে ঐ ধরনের শাহজাদাদের নাম রেখেছিলো। কানা ছেলের নাম কি পদ্মলোচন হয় না? সেই রকম আর কি—

আহা অমন কথা বলো না, বাছা। ষাট ষাট কানা হতে যাবে কেন। সুলতান বাদশাহ ঘরে না জন্মালে কি হবে, সুরৎখানা কিন্তু শাহী। এমন বনেদী চেহারা কিন্তু হাল ফিল উঠতি বড়লোকদের ঘরে জন্মায় না, বাবা। রক্তে বংশের ধারা থাকা চাই।

বৃদ্ধার পছন্দ করা কাপড়গুলো আজিজ বাণ্ডিল বেঁধ খচ্চরের পিঠে তুলে দিলো। বৃদ্ধা অনেক ধন্যবাদ জানাতে জানাতে চলে গেলো। বলে, আবার আসবে।

বৃদ্ধার হাতে বাণ্ডিল দেখে দুনিয়া ছুটে আসে। —দেখি দেখি, দাদীমা, কি আনলে?

দাদীমা বলে, সে ভারি রংদার কাপড় এনেছি। তোমার কতকগুলো সেমিজ কামিজ বানাতে হবে।

কাপড়গুলো দেখে দুনিয়া আনন্দে লাফিয়ে ওঠে বৃদ্ধাকে জাপটে ধরে বলে, কোথায় পেলে দাদীমা? এ তো আমাদের দেশের কাপড় না!

—তুমি ঠিকই ধরেছো, বাছা। এ কাপড় বিদেশী সওদাগরের ছেলেরা নিয়ে এসেছে। বাজারের ভিতরে কি প্রকাণ্ড দোকান সাজিয়ে বসেছে। দেখলে তাক লেগে যায়।

দুনিয়া বলে, কত দাম বলেছে?

—দামের কথা জিজ্ঞেস করতেই বাছা আমায় তেড়ে এলো। বলে কি—শাহজাদী পরবেন, তার আবার দাম নেব কি? তিনি যদি মেহেরবানী করে পরেন, তাই আমার অনেক পাওয়া হবে। শাহজাদী আমার দোকানের খদ্দের শুনলে, আমির ওমরাহদের বাড়ির বিবি-মেয়েরা ভিড় করে আসবে।

দুনিয়া রাগ করে। সে হয় না। দাদীমা! তুমি তাকে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে বলো, আমি বলে দেব, আব্বাজান তাকে ইনাম দিয়ে দেবে।

তা বাছা, মন্দ বলো নি, হিসেব করে দাম দিতে গেলে বেচারীকে ছোট করা হয়।

সুলতান যদি ইনাম দেন নেবে না কেন? দেখে মনে হলো খানদানী ঘরের ছেলে। যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি তার আদব কায়দা—

দুনিয়া থামিয়ে দিয়ে বলে, থাক থাক, আর অতো ব্যাখান করে কাজ নাই। মুখে যে প্রশংসা ধরে না। কী ব্যাপার লোকটা গুণ করেছে নাকি তোমাকে?

তোমার মুখে কোন রাখ-ঢাক নাই বাছা। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, বুড়ি হয়ে মরতে বসেছি, অমন চাঁদপনা নওজোওয়ান ছেলে আমাকে গুণ করতে যাবে কেন? তার রূপের জেল্লা দেখলে তোমাদের মতো কচি ডাঁসা মেয়েরাই তাকে ভোলাত চাইবে।

—দাদীমা? তোমার কি মাথা টাথা বিগড়ে গেছে? কি সব আবোল-তাবোল বকছো?

—মাথা আমার ঠিকই আছে, বাছা তাকে একবার দেখলে তোমার মাথাই ঠিক থাকবে না।

দুনিয়া ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ঠিক আছে, তুমি এখন যাও, লোকটাকে খবর দিয়ে এসো। সে যেন আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করে ইনাম নিয়ে যায়।

—সে আর বলতে, বাছা। আমি এখুনি যাচ্ছি তাকে খবর দিতে।

তাজ দেখলো, বৃদ্ধা আবার এসেছে। আজিজকে বললো, ভালো দেখে শরবৎ আর মিঠাই-এর ব্যবস্থা কর। বুড়িটাকে জপাতে হবে।

বৃদ্ধাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালো তাজ অল মুলুক। শরবৎ আর মিঠাই খেতে দিলো। বৃদ্ধা বলে, একটা সুখবর আছে, বেটা। শাহজাদী বলে পাঠিয়েছে, তুমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করবে। সুলতান তোমাকে ইনাম দেবেন।

তাজ ভাবে, বড়শির চারে মাছ লেগেছে। বৃদ্ধাকে বললো, আমি আপনার শাহজাদীকে একখানা খৎ লিখে দিচ্ছি। দয়া করে ওকে পৌঁছে দেবেন?

—কেন দেব না বাছা।

আজিজ কাগজ দোয়াত কলম এনে দেয়। তাজ লিখলো ঃ

আপনাকে চোখে দেখিনি। কিন্তু আপনার সুবাস আমি আঘ্রাণ করেছি। আপনার রূপের ছটায় আমার চোখ ঝলসায়নি, তবে দিল-এ বিজলি হেনেছে। আপনি আমার কল্পলোকের মানসী। আপনাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার হাজার বছরের পরিচয়। আপনাকে দেখেছি আমি প্রস্ফুটিত পদ্মের কোরকে। লাল গুলাবের পাপড়িতে। দূর আশমানের সিতারায়। অশান্ত সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে। আর দেখেছি বসন্ত মর্মরে হিল্লোলিত দ্রাক্ষাকুঞ্জের লতায় পাতায়। রক্তবর্ণ সূর্যাস্তের বিলুপ্ত শোভায়—

আজ এই পর্যন্ত

আপনার বান্দা তাজ-অল-মুলুক।

ভাঁজ করে আঠা দিতে মুখ এঁটে বৃদ্ধার হাতে তুলে দিলো তাজ। সেই সঙ্গে এক হাজার দিনারের একটা থলে।

বৃদ্ধা বিস্ফারিত চোখে মোহরগুলো দেখে বলে, এ গুলো কি হবে বাবা?

—এ আপনার সেলামী।

বৃদ্ধা ফিরে আসতেই দুনিয়া জিজ্ঞেস করে, তোমার সওদাগর ছেলে কি বললো, গো দাদীমা?

চিঠিখানা বাড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধা বলে, মুখে কিছু বলেনি। লিখে দিয়েছে। জানিনা কি লিখেছে, পড়ে দেখো।

ক্ষিপ্রহাতে ছোঁ মেরে চিঠিখানা তুলে নিয়ে দুনিয়া পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে চোয়ালের হাড় ফুলে ওঠে, ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। ঠোঁটে দাঁতের কামড় বসিয়ে ফুঁসে ওঠে, এত বড় স্পর্ধা!

বৃদ্ধা ভয় পায়। —কেন কি হয়েছে, বাছা।

—কি হয়েছে? কি হয়নি তাই বলো।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করে, কেন খুব চড়া দাম হেঁকে বসেছে বুঝি?

দুনিয়া চিৎকার করে ওঠে, দামের জন্যে দুনিয়া থোড়াই পরোয়া করে। খায় তো কাপড় বেচে—তা বামন হয়ে চাঁদে হাত? তোমার গুণধর সওদাগর নন্দন আমাকে প্রেম পত্র লিখেছেন।

—এ্যাঁ! বলো কি? এত বড় আস্পরদা। এতো ভালো কথা নয় মা। তুমি খুব কড়া করে জবাব লিখে দাও। আমি গিয়ে তুড়ে দিয়ে আসবো।

দুনিয়া বলে, চিঠির জবাব দিলে আরো লাই পেয়ে যাবে না?

—না না, চিঠিই লিখে ওকে বুঝিয়ে দাও, এ বড় শক্ত ঘাঁটি। অত সহজে ডাল গলবে না।

দুনিয়া লিখতে বসে ঃ

আহাম্মকরা নিজেকে পির পয়গম্বর ভাবে। মূর্খের অশেষ দোষ। তারা নিজের দাম কষতে জানে না। বাঁদরের হাতে কলাই শোভা পায়। গলায় মুক্তোর মালা পরালেও বাঁদর বাঁদরামীই করে।



অসভ্য জানোয়ার লোককে কি করে শায়েস্তা করতে হয়, আমার খুব ভালো করে তালিম নেওয়া আছে। শুধু একটা কথা বলে রাখি, আশমানের সিতারা আসমানেই থাকে—থাকবে। মুদিখানায় নেমে আসবে না। আগুনে হাত দিলে হাতখানা যাবে। ক্রুশে বিদ্ধ করে যাদের মারা হয় তারা সবাই যীশুর মতো নিষ্পাপ নয় এই কথাটা মনে রাখলে খুশি হবো।

চিঠিখানা নিয়ে বৃদ্ধা ছুটতে ছুটতে তাজ-এর দোকানে আসে। বলে, শাহজাদী জবাব দিয়েছেন।

তাজের হৃদয় দুলে ওঠে। কিন্তু পড়তে পড়তে মুখের চেহারা পাল্টে যায়। বিষাদে ভরে ওঠে মন।

—আমাকে ধাঁতানী দিয়েছে। ক্রুশে গেঁথে মারবে বলে শাসিয়েছে। তা মারুক। মরতে আমি ভয় পাই না। এই দুর্বিষহ জীবন রাখার চেয়ে মরা অনেক ভালো। তাতে চিরকালের মতো শান্তি আসবে। এ চিঠিরও জবাব দেব আমি। তাতে যা নসীবে আছে—হবে।

বৃদ্ধা বলে, তুমি ঘাবড়াবে না, বাছা। আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার যাতে না কোন ক্ষতি হয়, আমি দেখবো। লেখো, জবাব লিখে দাও।

আজিজকে ডেকে তাজ বলে, দাদীমাকে এক হাজার দিনারের একটা তোড়া দিয়ে দাও। আর আমাকে এনে দাও দোয়াত কলম। আমি জবাব লিখবো।

"তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়েছো, সুন্দরী। কিন্তু ও ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপে না। তুমি ভোগ বিলাসিনী নারী। তোমার বেঁচে থাকা আর সুখ সম্ভোগ করাই বড় কথা। কিন্তু আমি উদ্দাম, উচ্ছল। আমি নির্ভয়। প্রেমিক। মৃত্যুকেও পরোয়া করি না। তুমি যদি আমাকে ক্রুশে গেঁথেই মারো, তাতেও আমার চিত্ত বিচলিত হবে না। আমি যীশুর খ্যাতি চাই না। আমি হাসি মুখে মরবো। ভাববো, প্রেম অনেকের জীবনে নতুন বসন্ত আনে, আমার কাছে সে না হয় মৃত্যুর রূপ ধরেই এলো।"

চিঠিখানা ভাঁজ করে বৃদ্ধার হাতে দিতে দিতে তাজ বলে, আমার জন্যে আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? জানি আমার মৃত্যু অনিবার্য। তবু এর শেষ না দেখে আমি ছাড়বো না। মৃতু যদি আসে আসুক।

বৃদ্ধা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ওসব আজগুবি চিন্তা ছাড়ো তো। আমি আছি তোমার কোনও ভাবনা নাই, বেটা তোমার মতো ছেলে তার কি অপছন্দ হবে? চোখে দেখেনি তাই অমন তড়বড় করছে। একবার দেখলে ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে। আমি আজ চলি। শিগ্গিরই আবার আসবো। এবার আশা করছি শুভ সংবাদই নিয়ে আসতে পারবো।

দুনিয়ার ঘরে ঢোকার আগে বৃদ্ধা তার মাথার চুলের ভাঁজের নিচে চিঠিখানা লুকিয়ে রাখলো। দুনিয়া বলে, কি গো দাদীমা, তোমার চাঁদপনা সওদাগর দুলালের খবর কি?

—কি জানি বাছা, আমার কি দরকার, তোমার চিঠি আমি তার হাতে ফেলে দিয়ে এসেছি। তারপর কিছু জানিনা। তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝ গিয়ে।

দুনিয়া হাসতে থাকে। বাছাধনকে যা দাওয়াই দিয়েছি। তারপর আর রা কাড়তে হবে না।

বৃদ্ধা বলে, মাথায় বড় খুস্কি হয়েছে, বাছা। তোমার বাঁদীদের কাউকে ডাকো তো, মাথাটা একটু আঁচড়ে দিক।

বাঁদীর কি দরকার কি দাদীমা, আমিই দিচ্ছি, তুমি আমার চুল বেঁধে দিও।

দুনিয়া চিরুনী নিয়ে বৃদ্ধার চুল আঁচড়াতে বসে মাথায় চিরুনী দিতেই চিঠিখানা নিচে পড়ে যায়।

দুনিয়া চিঠিখানা তুলে নিতেই বৃদ্ধা হাঁ হাঁ করে ওঠে, ওটা আমাকে দিয়ে দাও বাছা। আমি যখন ছেলেটার দোকানে ঢুকেছিলাম তখন বোধহয় ওপর থেকে ওদের চিঠি আমার মাথায় ওপর এসে পড়ে থাকবে। পরের চিঠি খোলার দরকার নাই। দাও, ওদের জিনিস ওদের দিয়ে আসি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, দুনিয়া ততক্ষণে চিঠিখানা খুলে পড়তে শুরু করেছে।

—কি তোমার চালবাজী দাদীমা। তুমি ভারি দুষ্টু। এই শয়তান সওদাগরটি কে? কোন দেশের বাসিন্দা? আমাকে কি রকম বিদ্রুপ করেছে দেখো। বলে কিনা—আমি ভোগ বিলাসিনী নারী। এত বড় সাহস তার। আমার দেশে এসে আমাকেই অপমান। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম দাদীমা, জবাব দেওয়া ঠিক হবে না। লোকটা লাই পেয়ে যাবে। তা দেখলে তো।

বৃদ্ধা কপট ক্রোধে ফেটে পড়ে। —এত বড় শয়তান বেল্লিক তা কি করে জানবো, বেটী। আমি ভেবেছিলাম তোমার জবাব পেয়ে তার আক্কেল হবে। যাই হোক, এবার তুমি ওর পিণ্ডি চটকিয়ে একটা কড়া করে জবাব লেখো। আমি এখুনি নিয়ে যাবো। এরপর যদি তোমার কাছে ক্ষমা না চায়, দেখাবো মজা।

"শরতের ঝিকিমিকি রোদে দূর নীল গগনে এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা ওড়ে। তাদের সফেদ ডানা সূর্যের অলোয় রূপালী হয়। তারাও পাখি। আবার একটা ভাগাড়ে বুনো শেয়ালের পচা মৃতদেহ ঠুকরে ঠুকরে খায় যে শকুনগুলো—তারাও পাখি। সুতরাং মানুষের চামড়া গায়ে থাকলেই কি সব মানুষই সমান।"

চিঠিখানা বৃদ্ধার হাতে দিয়ে দুনিয়া বলে, যদি পেটে কিছু থাকে বুঝতে পারবে চিঠির মর্মকথা।

তাজ অল মুলুক চিঠির নির্মম নিষ্ঠুর ভাষায় ব্যথিত হয়। বুঝতে পারে, আর কোন আশা নাই। আজিজের দিকে চেয়ে বলে, এখন বলো, কি করা যায়। আমি আর জবাব দেবার উৎসাহ পাচ্ছি না। সব আশা ভরসার ইতি হয়ে গেছে।

আজিজ বলে, ঠিক আছে, আপনার হয়ে আমি জবাব লিখছি।

তাজ বলে, যা ভালো বোঝ কর।

"এখন আমার আল্লাহই একমাত্র ভরসা। তোমাকে যে ভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, সেই উদগ্র বাসনা নিয়ে যদি আল্লাহকে ডাকতাম, তিনি আমাকে কোলে তুলে নিতেন। কিন্তু

তুমি সামান্যা অবোধ নারী। তোমার কাছ থেকে আল্লাহ মহিমা কি করে আশা করতে পারি। একদিন, মা-বাবা আত্মীয় পরিজন, প্রিয় বাসভূমি ছেড়ে তোমার সন্ধানে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিলে। এর পর আমি যেখানে যাবো, সেখানে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেবেন না। সেখানে সবাইকেই একদিন যেতে হয়, কাউকেই তিনি বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেন না। তার কোলে অনেক জায়গা। দিলটা দরাজ।"

তাজ অল মুলুক পড়ে বাহবা দিলো, চমৎকার লিখেছো, দোস্ত!

দুনিয়া চিঠিখানা পড়ে বৃদ্ধার ওপর ক্রোধে ফেটে পড়ে। যত সব ফাজিল ফক্কর ডেঁপো ছোড়ার ন্যাকামী। তোমার জন্যেই, দাদীমা আমার জানটা কয়লা হয়ে গেলো। যত নষ্টের গোড়া তুমি। আমার সামনে থেকে দূর হও। আর তোমার মুখ দেখতে চাই নে আমি। তোমার যা বদ মতলব আমি বুঝতে পেরেছি, তাতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিত তোমার লাশ।



শাহজাদী ক্ষিপ্ত হলে তার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তখন সে করতে পারে না এমন কোন কাজ নাই। রাগের মাথায় মানুষও খুন করতে পারে। বৃদ্ধা দৌড়ে পালায়। ছুটতে ছুটতে চলে আসে তাজ অল মুলুকের দোকানে। তাজ তাকে আদর করে বসায়। জিজ্ঞেস করে, কি দাদীমা, কি হলো, অমন হাপাচ্ছেন কেন?

—তাড়া করেছে বাবা, তাড়া করেছে।

—কে?

—কে আবার, ঐ দুনিয়া। বেটি একেবারে রণমূর্তি ধরেছে। ক্ষেপলে আর মানুষ থাকে না। তোমার চিঠিখানা দেওয়া মাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। বলে কিনা—আমাকে কুকর দিয়ে খাওয়াবো।

তাজ প্রশ্ন করে, আসল ব্যাপারটা কি বলতো, দাদীমা? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও কারণ আছে। এরকম পুরুষ বিদ্বেষী নারীর কথা তো শুনিনি কোথাও। এ এক ধরনের মানসিক রোগ।

—রোগ না আতঙ্ক।

—তা আতঙ্কই এলো কি করে। কোন পুরুষের কাছে চোট ফোট খেয়েছে এর আগে?

—না বাবা, সে সব কিছু না। স্বপ্ন!

—স্বপ্ন?

বৃদ্ধা বলে, হ্যাঁ একদিন রাতে স্বপ্ন দেখার পর থেকেই ও ওই রকম হয়ে গেছে। কোনও পুরুষের নাম গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না।

তাজ কৌতূহলী হয়ে ওঠে, স্বপ্নটা কী? জানো? শুনেছো তার কাছে?

—আলবাৎ শুনেছি। তা হলে শোনো বলছি ঃ

একদিন রাতে দুনিয়া স্বপ্ন দেখছে, এক শিকারী একটা বাগানে ঢুকে গাছের তলায় পাখি ধরা জাল বিছিয়ে তার ওপর কিছু যবের দানা ছড়িয়ে রেখে গাছের আড়ালে ওৎ পেত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে এক ঝাঁক পাখি উড়তে উড়তে এসে বসলো বাগানের গাছের ডালে। তার মধ্যে দু'টি পায়রা নেমে আসে নিচে—জালের ওপর ছড়ানো যবের দানা খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে।

পুরুষ পাখিগুলোর ঢং রং কেমন যেন বাচালের মতো। তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এক সময়ে জালের ফাঁসে পুরুষ পাখিটার একটা পা আটকে যায়। অনেক টানা হ্যাচড়া করেও আর ছাড়াতে পারে না। এ দিকে মেয়ে পাখিটা ছটফট করতে থাকে। কি

করে তার সাথীকে ছাড়াবে? উন্মাদের মতো মাথা কুটতে থাকে। পুরুষ পাখিটার পাখার ঝাপটানির আওয়াজে গাছের অন্য পাখিরা চকিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে শিকারীর ফাঁদে পুরুষ পায়রার পা আটকে গেছে। আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে তারা ঝাঁক বেঁধে আবার উড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু মেয়ে পাখিটা তার সঙ্গীকে ছেড়ে গেলো না। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে জালের দড়ি কেটে ফেললো। ছাড়া পেয়ে শোঁ করে উড়ে গিয়ে বসলো গাছের ডালে। এ দিকে মেয়ে পাখিটার পায়ে ততক্ষণে ফাঁস আটকে গেছে। ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে ডানা ঝাপটে পা ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু আরও কষে এঁটে যায়। পুরুষ পাখিটা কিন্তু আর নেমে এসে তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করে না। এ দিকে শিকারী দেখলো, একটা পালিয়েছে, এটাও যদি পালিয়ে যায়। ছুটে এসে পাখিটাকে ধরে খাঁচায় পুরে ফেললো। পুরুষ পাখিটা ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে।

শাহজাদী দুনিয়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঐ রাতেই আমাকে ডেকে সে স্বপ্নের কাহিনী শোনালো। বললো, কি সাংঘাতিক এই পুরুষ জাতটা। পশু পাখিদের মধ্যেই যদি এই রকম হয়, না জানি পুরুষ মানুষগুলো বা কেমন। তারা আরও খারাপ আরও স্বার্থপর হবে নিশ্চয়ই।

সেই থেকে মেয়ের এক আতঙ্ক ঢুকেছে মনে। পুরুষ মানুষের ছায়া মাড়াতে চায় না। শাদীর কথা শুনলে ক্ষেপে ওঠে। সে বলে, জ্ঞান থাকতে কোন পুরুষের খপ্পরে পড়তে চাই না আমি।

—কিন্তু দাদীমা, তাজ অল মুলুক বলে, সব পুরুষই এক রকম—খারাপ স্বার্থপর? আর সব মেয়েই কি ভালো—একেবারে পরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে। তাকে একবার বলো, না—দুনিয়াতে কটা পুরুষ মানুষ দেখেছো, ভালো পুরুষেরও অভাব নেই।

কিন্তু বাবা, দাদীমা বলে, সে বুঝতে চাইবে না, তাকে বোঝাবো কি করে? সে তার গরবেই বাঁচে না।

তাজ বলে, যে ভাবেই হোক, একটি বার তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন দাদীমা। আমার বিশ্বাস, আমি তার এই খারাপ ধারণা পালটে দিতে পারবো। আপনার বুদ্ধির চাতুর্য আছে, আপনিই পারবেন।

—শোন সোনা মনি, প্রাসাদের সামনে একটা বাগান আছে,সেই বাগানের এক পাশে একটা জলসাঘর আছে। দুনিয়া ফি মাসে একবার করে সেখানে যায়। প্রাসাদ থেকে ঐ জলসাঘরে যাবার একটা গুপ্ত দরজা আছে। আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে তার যাওয়ার সময় হবে। তখন আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো সেখানে। তার সামনে হাজির করে দেব। তার পরের ব্যাপার তোমার। যদি তাকে ভোলাতে পারো সে তোমার হাতযশ। তবে আমার কি মনে হয় জানো, বাবা তোমাকে একবার সামনা সামনি দেখলে তার সব ধারণাই পালটে যাবে।

তাজ-এর কিছুটা ভরসা হয়। বৃদ্ধাকে বলে, দাদীমা চলো, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

দোকান-পাট বন্ধ করে তাজ বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে তাজ আর আজিজ বাসায় আসে। উজির দানদান সব শুনে বলে ঠিক আছে, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। চলো, আগে সেই বাগানে একবার যাই। আগে নিজের চোখে দেখা যাক তারপর কি করা যায় ভাবা যাবে।

বৃদ্ধাকে বাসায় রেখে ওরা তিনজন সুলতানের প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে গিয়ে হাজির হয়। বাগানের মালি পলিত-কেশ এক বৃদ্ধ। উজির তার হাতে একশো দিনারের একটা তোড়া গুঁজে দিয়ে বলে, আমরা বিদেশী মুসাফির। তোমার এই বাগানে পুকুরের ধারে বসে একটু বিশ্রাম করতে চাই, অনেক দূর দেশ থেকে আসছি, খানা পিনা হয়নি এখনও, ভাবছি এই পুকুরের ধারে বসে সেরে নেবো।

বৃদ্ধ মালী তো গদ গদ। অতগুলো মোহর এসে গেছে হাতে। বললে, এ আর বেশি

কথা কি জনাব। যতক্ষণ ইচ্ছে, বিশ্রাম করুন। খানা পিনা সারুন। যদি দরকার হয় বলুন দোকান থেকে খানা পিনা যা দরকার আমি এনে দিচ্ছি।

—না, চাচা, তার দরকার হবে না। খানা আমরা সঙ্গেই এনেছি। শুধু একটু আরাম করে তার পরে খাবো। তা চাচা যে বাগানের ও পাশে একটা বাড়ি দেখছি, ওটা কার?

মালী বলে, জানেন না বুঝি, কত্তা, ও হলো আমাদের শাহজাদী দুনিয়ার বিলাসমহল। ওখানে উনি মাসে একবার মাত্র আসেন। খেয়াল খুশি মতো দু চার দিন থাকেন।

উজির অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, শাহজাদীর বিলাস মহল বলছ, অথচ দেখছি আগাছা জঙ্গলে ভরে আছে সামনেটা। মনে হচ্ছে, কতকাল কলি ফিরানো হয়নি। চুন বালি খসে খসে পড়ছে, ব্যাপারটা কী?

মালী বললো, আমরা হুকুমের নফর, সাহেব। তিনি না বললে আমরা কি করতে পারি। অনেকবার বলেছি বিলাসমহলে মিস্ত্রি লাগানো দরকার। কিন্তু শাহজাদী সে কথায় কান দেন না। শুনেছি তিনি নাকি এখন অসুখে ভুগছেন। তাই মন মেজাজ ভালো নাই।

উজির বলে, তাই বলে শাহজাদীর বিলাস ভবন এইভাবে নষ্ট হবে? চাচা, তুমি আর দেরি করো না মিস্ত্রিটিস্ত্রি যা দরকার এখুনি নিয়ে এসে কাজে লাগাও। এই নাও, একশো দিনার রাখো, দরকার হলে আরও দেব।

মালি অবাক হয়। এ কোন দেশের সওদাগর বাদশাহ। কথায় কথায় খোলামকুচির মতো মোহর বের করে দিচ্ছে। মোহরের তোড়াটা নিয়ে সে সাতবার সেলাম ঠুকে বলে, আমি এক্ষুণি শহরের সেরা মিস্ত্রি এনে কাজে লাগাচ্ছি, হুজুর।

উজির বলে, দেওয়াল যারা রং করবে তারা যেন ভালো আঁকিয়ে লোক হয় চাচা।

—কেমন আঁকিয়ে চান হুজুর, ঘরের দেওয়ালে এমন ছবি এঁকে দেবে, দেখে ভিরমি খেয়ে যাবেন।

উজির মজা পায়, কেন? ভিরমি খাবো কেন?

মালি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বোঝাতে থাকে, মন সব বেহেস্তের পরীর মতো ডবকা ছুঁড়িদের ঠ্যাকারের ছবি এঁকে দেবে, দেখে জিভে জল এসে যাবে, কত্তা।

—আহা-হা-হা, ওরকম আঁকিয়ে আমার দরকার নাই, চাচা। ওসব বদখদ ছবি আঁকলে চলবে না। আমি চাই এমন আঁকিয়ে—যে আঁকতে পারবে, গাছপালা নদনদী সমুদ্র আকাশ লতাপাতা ফুল—

—হ, হ, বুঝেছি জনাব, পিরকিতির দিশ্য।

—ঠিক—ঠিক বুঝেছ, চাচা।

আপনি কিছু ভাববেন না। এমন ফুল বাগিচা এঁকে দেব, ঘরে ঢুকলে ফুলের বাসে দিল মাতোয়ারা হয়ে যাবে, হুজুর।

—সাবাস্। তোমাকে দিয়েই হবে, চাচা। তা তোমার সেই বিশ্বকর্মাদের একবার ডাকো। তাদের বলে যাই, কোথায় কি করতে হবে। কি ছবি আঁকতে হবে।

মালি বলে, আপনারা একটু জিরিয়ে নিতে থাকুন, হুজুর। এই আমি—ছুটে যাবো আর দৌঁড়ে আসবো।

কোথায় কোথায় মেরামত করতে হবে, কোথায় কি রং করতে হবে—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিস্ত্রিদের বুঝিয়ে দিলো উজির। বললো, রং টং সব হয়ে যাবার পর ঘরের দুই দেওয়ালে বিরাট ছবি আঁকতে হবে। দুটো ছবিই প্রায় একই রকম হবে। একটু শুধু তফাৎ হবে ঃ একটা বিরাট বাগান। বড় বড় সব গাছ। এক জায়গায় এক শিকারী পাখি ধরা জাল পেতে গাছের গুঁড়ির আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। জালের ফাঁসে একটা মেয়ে পায়রার পা আটকে

গেছে। সে শুধু ডানা ঝাপটাচ্ছে। আর পুরুষ পাখিটা তার চারপাশে বাঁই বাঁই করে পাক খাচ্ছে।

এই হবে এক দেওয়ালের ছবি। আর অন্য দেওয়ালের ছবিতে থাকবে ঃ পুরুষ পাখিটা ঠোঁট দিয়ে জালের দড়ি কেটে দিয়েছে। মেয়ে পাখিটা উড়ে পালাচ্ছে। আর পুরুষ পাখিটার পায়ে জালের ফাঁস আটকে গেছে। ছাড়াবার জন্যে সে আকুলি বিকুলি করছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে, কিন্তু ছাড়াতে পারছে না। গাছের আড়াল থেকে শিকারী বেরিয়ে এসে পুরুষ পাখিটাকে ধরতে যাচ্ছে।

মিস্ত্রি বললো, বহুত আচ্ছা সাহেব, খুব বঢ়িয়া করে এঁকে দেব। আপনি কাল এসে দেখবেন। দেখে আপনার কলিজা ফেটে যাবে।

উজির চমকে ওঠে, কলিজা ফেটে গেলে তো আর জানে বাঁচবো না, মিস্ত্রি। আর একটু নিরেস করে এঁকো, বাবা।

বাসায় ফিরে দাদীমাকে সব বলা হলো। দাদীমা উজিরের বুদ্ধির তারিফ করে বলে, ভারি চমৎকার ফন্দী আঁটা হয়েছে। এবারে এই এক চালেই শাহজাদী দুনিয়া মাৎ হয়ে যাবে।

কিন্তু তাজ-এর প্রত্যয় হয় না। দেওয়ালে আঁকা দুখানা ছবি দেখেই তার সব ধ্যান-ধারণা পলকে পালটে যাবে? যাইহোক, প্রত্যাশায় দিন গুণতে থাকলো। সাতদিন পরে শাহজাদী বাগিচা-বিহারে বেরুবে। সেই কটা দিন প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে। আর এই ফিকিরও যদি কাজে না আসে, তা হলে কি উপায় হবে? তাজ রাখবে কি করে এ জীবন?

সাতদিন পরের ঘটনা।

দুনিয়া ছটফট করতে থাকে। সারা প্রাসাদ খুঁজে দেখতে বলে, দেখো, দাদীমা কোথায়। দাসী বাঁদীরা এসে বলে, প্রাসাদে নাই, অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে।

শাহজাদী রেগে ওঠে, তাকে খুঁজে পেতে ডেকে আনতে বলেছি। কোথায় আছে না আছে—সে ফিরিস্তি আমাকে শোনাচ্ছিস কেন?

খুঁজতে খুঁজতে বাজারে এসে তাজ-এর দোকানে বৃদ্ধাকে পাওয়া গেলো। দুনিয়া তলব করেছে শুনে বৃদ্ধার হাসি আর ধরে না। ওই—ডাক পড়েছে। এবার বাগিচা বিহারে বেরুবে শাহজাদী। তা আমাকে সঙ্গে না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না। আমাকে না বলে কোনও একটা কাজ করবে না। আবার রেগে গেলে আমাকেই মারতে তাড়া করবে। একেবারে জ্ঞানগম্যি থাকে না—পাগল।

তাজ বলে, আপনাকে খুব ভালোবাসে কিনা—তাই।

—ভালোবাসে না ছাই। ভালোই যদি বাসবে বাছা, তবে এতদিন ধরে তোতাপাখির মতো পড়াচ্ছি, তা আমার কথা আমলই দিচ্ছে না। আবার কি বলে শাসায়—ফের যদি তোমার নাম উচ্চারণ করি, গলা আমার কেটে দেবে।

তাজ বললো, ও নিয়ে আপনি মন খারাপ করবেন না, দাদীমা। মা মরা মেয়ে, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। তাই রাগ, অভিমান, ভালোবাসা, আক্রোশ সবই আপনাকে ঘিরে।

—তা যা বলেছ, বাবা। আমি ছাড়া আর একদণ্ড চলে না। অথচ একটু এদিক হলে খাঁড়া নিয়ে তাড়া করবে। আমি যাচ্ছি। যা বলে গেলাম, মনে থাকে যেন। আজ বিকেলে সূর্য ডোবালো আগে বাগানে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। তারপর আমি যেমন ইশারা করবো, তেমনি তেমনি করবে। খুব বাহারী রংদার সাজে সেজে যাবে। চেহারাখানা তো শাহজাদার মতো আছেই, তারপর সেজে গুজে গেলে আর দেখতে হবে না।

তাজ-অল-মুলুক বাদশাহী সাজ পোশাকে সেজে যখন বাগানের ফটকে পৌঁছলো তখন বিকেলের পড়ন্ত রোদের তেজ ঝিমিয়ে এসেছে। মৃদু-মন্দ দখিনা বাতাসে বসন্তের আমেজ।

বৃদ্ধ মালি এসে দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়ালো, আসুন জনাব ভিতরে আসুন। এ আপনার নিজের বাগিচা বলে মনে করবেন। যখন ইচ্ছে হয় এসে যতক্ষণ থাকতে চান থাকবেন।

কিন্তু বৃদ্ধা জানে না, গুপ্ত দরজা দিয়ে ততক্ষণে শাহজাদী দুনিয়া বাগানের ভিতরে এসে গেছে। দাদীমা বলে গিয়েছিলো, বাগানের একধারে একটা কেয়াগাছের ঝোপ আছে। সেই ঝোপের আড়ালে তাকে সে দাঁড়াতে বলেছে।

তাজ মালিকে বলে, আমি একটু এদিকটায় আছি। তুমি তোমার নিজের কাজে যাও চাচা। দরকার হলে ডাকবো।

মালি বলে, হুকুম করলেই বান্দা হাজির হবে হুজুর।

মালি তার নিজের কাজে চলে গেলো। তাজ অপেক্ষা করতে থাকে। একটুক্ষণের মধ্যে দাসীবাঁদী পরিবৃতা হয়ে শাহজাদী দুনিয়া ফুল বাগিচার মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সেই বৃদ্ধা দাদীমা।

—বেটি, বৃদ্ধা বলে, তোমাকে দু-একটা কথা বলতে চাই—

দুনিয়া বলে, বলো না, কি বলবে?

—আগে তোমার দাসীবাঁদীদের বিদায় কর। তারপর বলবো।

দুনিয়ার ইশরায় সবাই চলে যায়। বৃদ্ধা দুনিয়াকে নিয়ে কেয়াঝোপের দিকে এগোতে থাকে। তাজ এবার দুনিয়াকে পরিষ্কার দেখতে পায়। এমন রূপের জৌলুস এমন নিখুঁত চেহারা আগে সে কখনও দেখেনি। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। বৃদ্ধা আর দুনিয়া কিন্তু দাঁড়ায় না। ধীর পায়ে চলতে চলতে বিলাস মহলের দরজার দিকে চলে যায়।

দুনিয়া খুশিতে উপছে পড়ে, বাঃ, বাহারী রং করেছে তো মালিটা। আমাকে অবশ্য আগে কয়েকবার বলেছিলো, কিন্তু আমি তেমন গা করিনি। কি হবে এসবে? আমি তো কোনও নাগর নিয়ে রসকলি করতে আসবো না এখানে!

বৃদ্ধা বলে, তাই বলে ইমারৎটা ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে থাকবে? সুলতান বাদশাহ বলে কথা—অমন চুনবালি খসা ইটের দাঁত-বের করা ছিরি দেখলে লোকে বলে কি!

দুজনে জলসাঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায়। অনেকদিন বাদে এখানে এলো দুনিয়া। সেই স্বপ্ন দেখার পর থেকে সে বড় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। নিজের মহল ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা যায়-ই না। আগে বাজার করার ভীষণ শখ ছিলো। কারণে অকারণে দাদীমাকে নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতো। সাজ পোশাক, শৌখিন জিনিসপত্র সবই সে নিজে দেখেশুনে পছন্দ করতো। কিন্তু ইদানিং হাটবাজারের নাম শুনতে পারে না। ওরেব্বাস, ওখানে তো শুধু পুরুষ মানুষ কিলবিল করে। কোনও পুরুষের ছায়া মাড়াবো না আমি।

এই জলসাঘরেও সেই কারণে সে আসে না। এখানে তো আর মেয়েতে মেয়েতে মাইফেল জমে না। পুরুষ আর নারীর কামনা বাসনা মেটাবার জায়গা এই জলসাঘর। কিন্তু দুনিয়ার জীবন থেকে সে পাট বিদায় নিয়েছে।

দু-পাশের দেয়ালে চোখ পড়তেই দুনিয়া আঁৎকে ওঠে, দাদীমা—



বৃদ্ধা অলক্ষ্যে হাসে।—কি হলো, বেটা। ভয় পেলে কিসে?

—একি দেখছি, দাদীমা? এ ছবি এখানে এলো কোথা থেকে, এ তো আমার সেই স্বপ্নের দৃশ্য। হুবহু। কিন্তু এখানে দেখছি পুরুষ পাখিটার পা ফাঁসে আটকে গেছে আর মেয়ে-পাখিটাই উড়ে পালাচ্ছে। আমার স্বপ্নে তো তা ছিলো না—

—তুমি ভুল করেছিলে, মা। স্বপ্নে যা দেখেছিলে, ঘুম ভাঙ্গার পর তা গুলিয়ে গিয়েছিলো। মেয়েকে পুরুষ আর পুরুষকে মেয়ে ভেবে নিয়েছিলে। ওরকম ভুল হামেশাই হয়। সবারই হয়।

দুনিয়া গুম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। স্মৃতি হাতড়াবার চেষ্টা করে। চোখ বন্ধ করে সেই স্বপ্নের দৃশ্যটি আর একবার দেখতে চায়। কিন্তু কেমন যেন

সব ঝাপসা মনে হয়। সবটা ভালো করে মনে করতেও পারে না। ভাবে, দাদীমা বোধহয় ঠিক কথাই বলছে। স্বপ্নের সবকিছু হুবহু মনে রাখা যায় না। হঠাৎ সে বৃদ্ধাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, দাদীমা, তুমি কি সুন্দর—তুমি ঠিক বলেছ, আমি স্বপ্নে যা দেখেছিলাম ঘুম ভাঙ্গার পরে মনে তার উল্টো ছাপই পড়েছিলো। আসলে পুরুষ পাখিটাই ফাঁদে আটকে পড়েছিলো; আর মেয়ে পাখিটা পালিয়েছিলো।

একটুক্ষণ থেমে আবার বলতে থাকে, এখন আমার কি উপায় হবে দাদীমা? আমি তো কত সুলতান বাদশাহের ছেলেকে ভাগিয়ে দিয়েছি। কোন মুখে আবার আব্বাজানকে বলবো, একটা নওজোয়ান পুরুষ না হলে আমার আর চলছে না।

বৃদ্ধা বলে, আহা অত অধৈর্য হলে চলে? আপসে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কিন্তু দাদীমা, এখন ছেলেরাই বা রাজি হবে কেন? আর আমাকে বিশ্বাসই বা করবে কি করে? সবাইকে ঢাক পিটিয়ে বলা হয়েছে, কোনও ছেলের সঙ্গে আমার শাদী দিলে, আগে পাত্রের গলা কাটবো, তারপর নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দেব। এখন যদি চাউর করেও দেওয়া হয়, শাহজাদী আবার শাদী করতে রাজি হয়েছে, জানের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসবে না। ভাববে এ আবার নতুন কোনও ফন্দী।

বৃদ্ধা দুনিয়ার মাথায় হাত রাখে, তুমি কিছু ভেবো না বাছা, সব ঠিক হয়ে যাবে। চলো, বাগিচায় চলো, ফুলের বাহার দেখলে মনটা খানিক হালকা হবে।

কেয়া ঝোপের আড়াল থেকে তাজ বৃদ্ধার চোখের দিকে তাকায়। বৃদ্ধা ইশারা করে, তাদের সামনে দিয়ে সে যেন নির্বিকার চিত্তে হেঁটে বাগিচার বাইরে বেরিয়ে চলে যায়।

তাজ অল-মুলুক স্বচ্ছন্দ ভাবে সোজা সদর ফটকের দিকে এগিয়ে চলে। এদিকে সে শাহজাদী তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখছে, সেদিকে সে লক্ষ্যই করে না। এমনভাব—বাগিচায় অন্য কেউ আছে তা যেন সে দেখেইনি।

দুনিয়া হাঁ করে চেয়ে থাকে। তাজ-এর প্রিয়দর্শন চেহারা তাকে মুগ্ধ করে। —দাদীমা, দেখছো?



—হুঁ। ভারি অন্যায়। মালিটার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। শাহজাদী বিহারে এসেছে, আর সে ব্যাটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। তুমি ওকে শূলে চাপাও, শাহজাদী। তবে ব্যাটার চৈতন্য হবে।

দুনিয়া বলে, আহা-হা আমি মালির কথা বলিনি, দাদীমা? বলি, দেখছো, কি সুন্দর নওজোয়ান।

বৃদ্ধা কপট ক্রোধে ফেটে পড়ে, সেই জন্যেই তো বলছি, মালিটাকে শূলে চাপাও। বাগানের দরজা হাট করে খুলে রাখে। আর সেইজন্যেই যখন তখন উটকো লোক ঢুকে পড়ছে।

দুনিয়া বলে, আহা, আস্তে বলো, সাহেব শুনতে পেলে কি ভাববে বলতো?

—ভাববে আবার কী? এতে ভাবাভাবি কি আছে। তুমি সবুর কর বাছা, আমি বাছাধনকে একটু আক্কেল দিয়ে আসি। যখন তখন শাহজাদীর বাগানে ঢোকার মজা আমি বুঝিয়ে দিয়ে আসছি।

দুনিয়া বাধা দিয়ে বলে, না, দাদীমা অমন করো না, দেখছো না কি খুবসুরৎ—মনে হয় কোনও শাহজাদা।

—শাহজাদা না হাতী। আজকালকার ফচকে ছোঁড়াগুলো বাপের ঘাড় ভেঙে কেতাদুরস্ত সাজ-পোশাক পরে নবাবী চালে রাস্তায় নামে—মেয়ে শিকার করতে।

দুনিয়ার সে কথা বিশ্বাস হয় না।—এ তুমি বাড়াবাড়ি করছো দাদীমা। আমি কি ওর সাজ-পোশাক দেখে ভুলে গেলাম—ভেবেছো। পয়সা খরচ করলে বাদশাহী সাজ-পোশাক না হয় জোগাড় করা যায় কিন্তু রূপ যৌবন? তাও কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? দেখছো, না, সুন্দর রূপবান পুরুষ। সারা শহর খুঁজলেও আর একটা যোগাড় করতে পারবে?

—বুঝেছি বাছা, বুঝেছি! পিরিতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম—

—এ তোমার ভারি অন্যায় দাদীমা। হাড়ি মুচির সঙ্গে তুলনা করলে তার?

বৃদ্ধা বিচিত্র মুখের ভঙ্গী করে বলে, আহা-হা, চুক চুক। আমি কি জানি, বাছা, পয়লা নজরেই প্রেমে পড়ে গেছ তার? তা বলো কি করতে হবে।

দুনিয়া বলে, ছুটে যাও। ফটক দিয়ে রাস্তায় নেমে গেলে আর ধরতে পারবে না। যেভাবেই হোক, ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। এমনিতে রাজি না হলে বলবে, অনেক টাকা দেব। যত চায়। ওকে না পেলে আমি আত্মহত্যা করবো।

—না না, বাছা, অমন কাজটি করো না। আমি এখুনি যাচ্ছি। যেভাবে পারি তাকে রাজি করাবোই। আত্মহত্যা করলে যে প্রাণে বাঁচবে না মা! তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে তোমার মহলে যাও। আমি দেখছি ছেলেটা কতদূর গেলো।

বৃদ্ধা আর দাঁড়ায় না। হন হন করে ফটকের বাইরে বেরিয়ে এলো। তাজ তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। বৃদ্ধা বললো, কেল্লা ফতে—তোমার সুরৎ দেখে শাহজাদী কাত। কাল তোমার বাসায় যাবো। কখন যাবো বলতে পারছি না। তবে তুমি তৈরি হয়ে থাকবে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

বৃদ্ধা আর অপেক্ষা করলো না। হন হন করে আবার প্রাসাদের দিকে চলে গেলো।

শাহজাদী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। বৃদ্ধা ঘরে ঢুকে বলে, দেখা পেয়েছি। কিন্তু রাজি হলো না, বাছা।

—রাজি হলো না? আমার কথা বলেছিলে?

—খুব বলেছি। সে বলে কি—আমার অনেক কাজ। মেয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করার ফুরসৎ নাই।

শাহজাদী একেবারে নিভে যায়, তবে? তবে কি হবে দাদীমা। আমি তো আর এ জীবন রাখবো না। আমাকে খানিক জহর এনে দাও।

বৃদ্ধা বলে, ঘাবড়াও মাৎ বেটি, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। আজকালকার ছোকরাগুলোর আর কিছু থাক না থাক, ডাঁট আর ফাটটা ষোলআনা আছে। তা আমার কাছে অত ডাঁট দেখিয়ে পার পাবে না বাছাধন। যে রোগের যা ওষুধ তা আমার ভালো করেই জানা আছে।

দুনিয়া ভেবে পায় না, বৃদ্ধা কি ভাবে তাকে রাজি করাতে পারবে। বলে, সে যদি না আসে তাকে তুমি কি পাকড়াও করে আনবে!

—দরকার হলে তাই করবো। তুমি কিছু চিন্তা করো না। ওসবের দরকার হবে না। যখন শুনবে তুমি সুলতান সারিমানের মেয়ে—কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে যাবে না? আমি তার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে এসেছি। কল সকালে যাবো। আজকের রাতটা কোনও রকমে কাটাও বাছা, কাল তোমার প্রেম-নাগরকে এনে মালা করে গলায় ঝুলিয়ে দেব। আর তা যদি না পারি তবে তাকে কড়ি কাঠে ঝুলাবো—এও বলে রাখলাম।

—না, দাদীমা, আর যাই কর, তাকে প্রাণে মেরো না। সে যদি না আসতে চায় নাই আসুক। আমার বুকের জ্বালায় আমি জ্বলে পুড়ে খাক হবো। কিন্তু ওর যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।

—হেই শোনো মেয়ের কথা। আমি কি তাকে সত্যি সত্যিই কড়িকাঠে ঝুলাবো নাকি? কামড়াবো না, তা বলে কি ফোঁস করতেও মানা—!

পরদিন সকালে তাজ-এর বাসায় গিয়ে হাজির হলো বৃদ্ধা। হাতে তার শালোয়ার কামিজ আর বোরখার একটা মোড়ক। তাজকে বলে, নাও চটপট এগুলো পরে ফেলো। জেনানা সাজিয়ে নিয়ে যাবো তোমাকে। তা না হলে প্রাসাদে ঢোকা যাবে না। বেটা খোজা কাফুর পাহারায় বসে আছে। ওকে এড়ানো বড় শক্ত।

তাজ-অল-মুলুক মেয়ে সাজলো। বৃদ্ধা দেখে অবাক হয়। তাজের যা রূপ—চাঁদপানা সুরৎ, মেয়ের সাজেও সুন্দর দেখায়। বৃদ্ধা বলে, মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মালে ছোড়াগুলো তোমাকে আর আস্ত রাখতো না। নাও, এই চটিটা পর। পথে যখন চলবে, দেখে যেন কেউ সন্দেহ না করে। মেয়েছেলের মতো কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটবে। ঠিক এই রকম—

বৃদ্ধা বিচিত্র ভঙ্গী করে কয়েক পা হেঁটে দেখিয়ে দিলো। তাজ আর হাসি চাপতে পারে না, ঠিক আছে দাদীমা, একেবারে নিখুঁত করে হাঁটবো, দেখে নিও।

প্রাসাদের অন্দর মহলে ঢোকার মুখেই বসেছিলো খোজার সর্দার। এই—রোখো।

বৃদ্ধা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কেন, 'রোখো' কেন?

খোজা বললো, আমি পরীক্ষা করে দেখবো, তারপর ঢুকবে। সুলতানের কড়া হুকুম আছে নতুন লোক হলে—সে যেই হোক, তল্লাসি না করে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।

—তা কি তল্লাসি করবে শুনি, খানদানি ঘরের জেনানা। গায়ে হাত দেবে নাকি।

—দরকার হলে, তাও দিতে পারি।

—ওরে আমার কে রে, গায়ে হাত দেবে। হাত ভেঙ্গে দেব না।

—সে যাই বলো, দাদীমা না দেখে ছাড়তে পারবো না।

—তাই বলে আমিরের ঘরের লেড়কী। তোমার সামনে বেহায়ার মতো বোরখা খুলে দাঁড়াবে? মান ইজ্জৎ বলে কি আর কিছু নাই।

খোজা বলে, বোরখা না খুললে হাত চালাবো। আমাকে তো বুঝতে হবে, আসলি মেয়েছেলে কিনা।

—আসলি না তো কি নকলি নাকি খোজা সর্দার। আচ্ছা তুমি কী? সারাটা জীবন আমার এই প্রাসাদে কেটে গেলো। মাথার চুল সব সফেদ হয়ে গেছে। এই বয়সে তোমার কাছে মিথ্যে বলে দোজকে যাবো?

খোজা জিজ্ঞেস করে, যাবে কোথা?

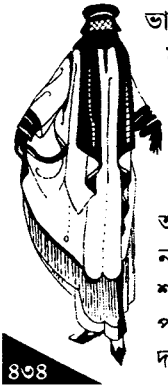

বৃদ্ধা কপালে হাত রাখে, ইয়া আল্লাহ, তাও জানো না। এক আমিরের বিবি খুব ভালো সূঁচের কাজ জানে শুনে সুলতান তাকে বলেছিলো, তার বিবি যেন মাঝে মাঝে এসে শাহজাদী দুনিয়াকে শিখিয়ে যায়। তাই তো আমি তাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম। নাও, পথ ছাড়। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। শাহজাদী বোধহয় এতক্ষণে ক্ষেপে বোম হয়ে আছে। তুমি কিছু মনে করো না মা, সর্দার আমার সঙ্গে একটু মসকরা করছে। এসো, আমার সঙ্গে এসো।

খোজা পথ ছেড়ে দেয়। বৃদ্ধা তাজকে নিয়ে হলঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। অদ্ভুত কায়দায় তাজ পাছা দোলাতে থাকে। সদরের যত খোজা সবাই লোলুপ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এমহল ওমহল পার হতে হতে এক সময় শাহজাদীর মহলের সামনে এসে হাজির হয়। বৃদ্ধা বলে, এই যে লাল রেশমী পর্দা দেওয়া দরজা দেখছো, এই রকম ছ'খানা দরজা পার হওয়ার পর যে দরজাটা পাবে, খেয়াল রেখো, সেই দরজাই দুনিয়ার। আমি এখানে দাঁড়ালাম।

তুমি দরজাগুলো গুণতে গুণতে চলে যাও। দুনিয়ার ঘরে ঢুকে দেখবে সে এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। তার পরের ব্যাপার যা করার তুমি করবে—আমি আর বলে দেব না।

তাজ গুণে গুণে ছ'খানা দরজা ছেড়ে দিয়ে পরে দরজার পর্দা তুলে দেখলো, পালঙ্কে মখমলের শয্যায় শাহজাদী ঘুমে বিভোর। কামিজের বোতাম খোলা, পায়ের ওপরে উঠে এসেছে শালোয়ার। এলোমেলো চুলের খুচরো দু'এক গাছি এসে পড়েছে চিবুকের পাশে। তাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। জাগাবে কি জাগাবে না—ঠিক করতে পারে না। একবার হাত দিয়ে মুখের চুলগুলো সরিয়ে দিতে যায় আবার কি ভেবে হাতখানা সরিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে ওর পাশে এসে বসে। চাঁদের শোভা দেখতে থাকে। অপলক নয়নে। আপনা থেকেই মুখটা আনত হয়ে আসে। কি সুন্দর পাকা আঙুরের মতো ঠোঁট। তাজ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে। আপনা থেকে হাত দু'খানা উঠে আসে ওর দেহে।

শাহজাদীর ঘুম ছুটে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না—স্বপ্ন না সত্যি। ঝটকা মেরে উঠ পড়তে চায়। কিন্তু তাজের বজ্রমুঠিতে বাঁধা আছে তার দেহ। দুনিয়া চিৎকার করতে চায়। কিন্তু ওর ঠোঁট চাপা আছে আর এক ঠোঁটে। তার পৌরুষের কাছে হার মানতে হয় তাকে। হার মানতে হয় সব নারীকেই।

দুনিয়া এতক্ষণে বুঝতে পারে। ওর চোখ হেসে কথা বলে, তুমি—তুমি এসেছো। আমি তো সারাটা রাত তোমার কথাই ভেবেছি প্রিয়। তোমার স্বপ্নেই এতক্ষণ আচ্ছন্ন ছিলাম। তুমি কখন এলে?

তাজও চোখেই কথা বলে, তুমি শুধু সারাটা রাত আমার কথা ভেবেছো? স্বপ্ন দেখেছ? আর আমি সারাটা বছর তোমার কথা ভেবে ভেবে সারা হয়েছি, প্রিয়া। তোমাকে পাবো বলে পাহাড় নদী প্রান্তর ডিঙিয়ে এসেছি এখানে।

দুনিয়া দু'হাত বাড়িয়ে তাজকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ওরা কামনার বন্যায় কোথায় যে ভেসে যায় তার বিশদ বিবরণ এখানে আর নাই বা দিলাম।

পুরো একটা মাস দুনিয়ার ঘরে তাজ রয়ে গেলো। সারাদিন ধরে খায় দায়, নাচ-গান হৈ-হল্লা করে কাটায়। তাজ-এর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। দুনিয়াও নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেয়। তাজ-আর দুনিয়া-দুই-এ মিলে এক সুখের নীড় রচনা করতে থাকলো।

এদিকে উজির আর আজিজ সারাটা রাত উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে। কিন্তু তাজ আর ফেরে না। একদিন দুদিন করে এক সপ্তাহ কেটে যায়। কিন্তু তাজ-এর কোন সন্ধান নাই। সেই বৃদ্ধাও আর আসে না। উজির ভাবলো, নিশ্চয়ই সে ধরা পড়েছে। এবং সুলতান তাকে কোতল করে ফেলেছে। ভাবতেও গা শিউড়ে ওঠে।

আজিজ বললো, একমাস বাদে আবার বিলাস মহলের ফটক খুলবে। শাহজাদী বিহারে আসবে। ততদিন পর্যন্ত কি অপেক্ষা করবেন?

অগত্যা তাই করতে হবে। না হলে এই অবস্থায় কি সংবাদ নিয়ে যাবো সবুজ শহরে কি বলবো সুলতান সুলেমানকে?

একটি মাস পুরো হয়ে গেলো একদিন। কিন্তু বিলাস ভবন-এর দরজা খুললো না। এবার উজির শঙ্কিত হলো। আর তো এখানে অপেক্ষা করা চলে না। আজিজকে বললো, চলো আজিজ, দেশে ফিরতে হবে। আর অপেক্ষা করে লাভ নাই। সুলতানের কাছে সব খুলে বলা ছাড়া গতি নাই।

আর দেরি না করে পরদিনই তারা যাত্রা করলো। কয়েক দিন পরে সবুজ শহরে পৌঁছে কাঁদতে কাঁদতে জানালো, তাজ অল মুলুক কর্পূর প্রবাল সুলতানের প্রাসাদে বন্দী হয়ে আছে। আজ প্রায় দু মাস তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সুলতান আর্তনাদ করে ওঠে। মনে হয় তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে।

কিন্তু বসে বসে কাঁদলে তো ছেলেকে ফেরৎ পাওয়া যাবে না। একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কর্পূর দ্বীপের সুলতান ভেবেছে কি? আমার হুঙ্কারে ইস্পাহান পাহাড় কেঁপে ওঠে। আর ওই সামান্য কর্পূর-সুলতান? ওকে আমি রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দেব।

উজির বললো, এখনি ব্যবস্থা কর। সেনাপতিদের খবর পাঠাও। কর্পূর দ্বীপ আক্রমণ করতে হবে। সারা শহরে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। ঢাল তরোয়াল, বর্শা, সড়কী নিয়ে বেরিয়ে এলো হাজার হাজার সৈন্য। আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে চললো।

এদিকে দুনিয়া আর তাজ সুখের সায়রে ভাসছে। একদিন তাজ দুনিয়াকে আদর করতে করতে বললে, সোনা, তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ, আমিও দিয়েছি সাধ্যমতো। কিন্তু একটা জায়গায় একটু খুঁত রয়ে গেছে। সেই জন্যেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

—কি সোনা? তুমি যা চাও যেভাবে আমাকে পেতে চাও আমি কি সেভাবে দিতে পারছি না।

তাজ ওকে বুকে টেনে নেয়। না, সোনা, ওসব কিছু না। ওদিক থেকে আমার কোন কিছুর অভাব নাই। তুমি আমাকে দু'হাত ভরে উজাড় করে দিয়েছো। আমিই তোমার কাছে খানিকটা চেপে গেছি।

দুনিয়া অবাক হয়, সে কী?

আমি আমার আসল পরিচয় তোমাকে দিইনি।

—মানে?

আমি শাহেনশাহ সুলেমান শাহর পুত্র তাজ-অল মুলুক। সবুজ শহর এবং ইস্পাহান পর্বতমালার অধিপতি আমার বাবা। তোমার কাছে সওদাগরের ছদ্মবেশে এসেছি। অনেকদিন ধরেই তোমাকে বলবো বলবো ভাবি, কিন্তু বলা আর হয় না।

দুনিয়ার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। তুমি সুলতান সুলেমানের ছেলে। তোমার উজিরই না আমার বাবার কাছে এসেছিলো শাদীর—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাজ বলে, শাদীর প্রস্তাব নিয়ে উজিরই এসেছিলো তোমার বাবার কাছে। তোমার বাবা দারুন খাতির যত্ন করেছিলেন, কিন্তু তুমিই বেঁকে দাঁড়িয়েছিলে। মনে আছে খোজাকে খাঁড়া নিয়ে তাড়া করেছিলে!

—হুঁ। খুব মনে আছে। তখন আমার মাথায় শয়তান ভর করেছিলো। পুরুষ মানুষের নাম শুনলে খুন চেপে যেত।

তাজ বললো, আজ ক'মাস হয়ে গেলো, উজির কোন খবর না পেয়ে কি যে ভাবছে, কি যে করছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমিও এমন নেশায় মত্ত হয়েছিলাম ওদের কথা মনেই ছিলো না। কিন্তু এত দিনে কি আর তারা এখানে আছে?

—নেই। আমি দাদীমার কাছে খবর পেয়েছি। দাদীমা গিয়েছিলো। তোমাদের দোকানও আর খোলা হয় না। বাড়িও তালা বন্ধ। বাড়িওলার কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আজ মাস-দুই তারা দেশে গেছে। বাড়ি ছাড়েনি। এক বছরের অগ্রিম ভাড়া জমা দিয়ে গেছে।

তাজ বলে, সর্বনাশ হয়েছে।

—কেন?

—যুদ্ধ অনিবার্য। উজির নিশ্চয়ই ভেবেছে তোমার বাবা আমাকে বন্দী করেছে অথবা মেরে ফেলেছে। সে দেশে গিয়ে বাবাকে বলা মানেই যুদ্ধ। আমাদের হাজার হাজার সৈন্য সামন্তের কাছে তোমার বাবা কি দাঁড়াতে পারবেন? একেবারে ছাতু ছাতু হয়ে যাবে সারা শহর।

দুনিয়া আঁৎকে ওঠে, তা হলে কি হবে?

তাজ বলে, আর দেরী নয়, সোনা, চলো আমরা সবুজ-শহরের পথে রওনা হই। আমাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত বাবাকে কেউ থামাতে পারবে না। রাগলে সে আর মানুষ থাকে না।

এই সব কথা বলতে বলতে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। দুনিয়া বলে, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। কালই আমরা রওনা হয়ে যাবো।

দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। এই ভাবে অনেক বেলা পর্যন্ত তারা সুখনিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে।

সেই দিন সকালে সুলতান সারিমানের দরবারে এক জহুরী এসে কুর্নিশ জানালো। জহুরীর হাতে একটা গহনার বাক্স। সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে বলে, পারস্য থেকে এক সওদাগর নিয়ে এসেছে, জাঁহাপনার যদি প্রয়োজনে লাগে এই ভেবে নিয়ে এসেছি।

সুলতান সারিমান দেখলো, মূল্যবান জড়োয়া গহনা। নানা রকম হীরা চুনী মুক্তো পান্না বসানো বাহারী কাজ করা। লক্ষাধিক মোহর দাম হতে পারে। সুলতান ভাবে, দুনিয়ার যদি পছন্দ হয় রেখে দেবে। খোজা সর্দারকে ডেকে বলে কাফুর, অন্দরমহলে শাহজাদীকে গহনাগুলো দেখিয়ে আয়, তার যা পছন্দ—সে যেন রেখে দেয়।

গহনার বাক্সটা হাতে নিয়ে কাফুর শাহজাদীর মহলে চলে আসে। বৃদ্ধা দাদীমা দুনিয়ার সামনে একটা গালিচা পেতে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। কাফুর তাকে ডিঙিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে কাফুরের চোখের সামনে সারা ঘরটা যেন দুলতে থাকে। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। চোখ দুটো হাত দিয়ে ডলে আবার দেখে, নাঃ, সে তো স্বপ্ন দেখছে না। সত্যি সত্যিই শাহজাদী উলঙ্গ হয়ে একটি ছোকরাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমে অচেতন।

এতক্ষণে কাফুরের সামনে সব খোলসা হয়ে যায়। এই জন্যেই শাহজাদী শাদীর নাম শুনলে ক্ষেপে যেত। এই জন্যেই তাকে সে একদিন ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলো। হুঁম্, এতদিনে বোঝা গেলো, রহস্যটা কোথায়। কাফুরের মনে প্রতিশোধ প্রবৃত্তি মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। আমাকে ছুরি নিয়ে তেড়ে এসেছিলে? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

বাক্সটা হাতে নিয়ে, ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে কাফুর। সুলতান জিজ্ঞেস করে, কি খবর কাফুর?

—এই নিন জাঁহাপনা, আপনার বাক্স।

—কী ব্যাপার, একটাও পছন্দ হলো না শাহজাদীর?

—আমকে মাফ করবেন জাঁহাপনা, এত লোকের সামনে ঘরের কথা বলতে পারবো না।

সুলতানের ইশারায় দরবার ফাঁকা হয়ে গেলো। কাফুর গলা খাটো করে বললো, শাহজাদীর ঘরে ঢুকে দেখি একটা খুবসুরৎ নওজোয়ানকে নিয়ে শুয়ে আছে। এর বেশি আর জিজ্ঞেস করবেন না, হুজুর।

সুলতান হুঙ্কার ছাড়ে, কী? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে আমার অন্দরমহলে ঢোকে। তোরাই বা সব কি করিস। বাইরের পুরুষ মানুষ অন্দরে ঢুকলো কি করে? তুই ঠিক দেখেছিস তো কাফুর?

—হুজুর, প্রথমে আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। ভাবলাম বুঝি খোয়াব দেখছি। তারপর আবার ভালো করে দেখলাম, শাহজাদীর শরীরে কোনও বস্ত্রর নাই, জাঁহাপনা?

—থাম্, সুলতান আর সহ্য করতে পারে না, একটা নিগ্রোকে ডাক। ওদের দু'জনকেই ধরে বেঁধে যেমন করে পারে আমার সামনে হাজির করুক। আমি নিজে চোখে দেখতে চাই বেতমিজ বদমাইশটাকে।

তাজ আর দুনিয়াকে এনে দাঁড় করানো হলো সুলতানের সামনে। সুলতান চিৎকার করে উঠলো, তা হলে কাফুরের কথা মিথ্যে নয়। তরে রে শয়তান—

এই বলে সুলতান নিজে হাতেই একখানা বর্শা ছুঁড়ে মারে। কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে

দুনিয়া তাজকে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, মারতে যদি হয় দু'জনকে এক সঙ্গেই মারুন জাঁহাপনা। দোষ তো ওর কিছু নাই। আমি একে আমার ঘরে না আনলে আসতে পারে কখনও?

সুলতান কৈফিয়ৎ তলব করে, কে তুমি, কি তোমার পরিচয়?

তাজ বিনীতভাবে বলে, আমার নাম তাজ অল-মুলুক। আমার বাবার নাম সুলতান সুলেমান শাহ—সবুজ শহর আর ইস্পাহান পর্বতমালার অধিপতি। আপনার যদি ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা করতে পারেন। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আপনার পরিণাম কি হবে একবার চিন্তা করে দেখুন। আমার বাবার বিক্রম আপনার অজানা নাই। এই কর্পূর দ্বীপ কর্পূরের মতোই উড়িয়ে দেবেন তিনি। সুতরাং আমাকে খতম করার আগে আপনার নিজের বাঁচার পথটা ঠিক করে রাখুন।

তাজের কথায় দিশাহারা হয়ে পড়ে সুলতান। কি করা উচিৎ কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। উজিরকে জিজ্ঞেস করে, কি করা যায় বলতো। ছেলেটা যা বলছে তা যদি ঠিক হয় তাহলে তো সমূহ বিপদ।

উজির বলে, লোকটা একেবারে ফেরেববাজ। ওর কথা বিলকুল বিশ্বাস করবেন না, হুজুর। ধাপ্পাবাজির আর জায়গা পায়নি। সুলতান সুলেমানের পুত্র। তার ছেলে এই রকম বেলেল্লাপনা করতে আসবে? আপনি ওর ওসব ভাঁওতায় ভুলবেন না, জাঁহাপনা, কোতল করে ফেলুন। শত্রুকে বেশিক্ষণ জিইয়ে রাখতে নাই।

—তুমি ঠিক বলেছ উজির, সুলতান সুলেমানের পুত্র এই রকম বেলেল্লা হতে পারে না। এই কুকুরের বাচ্চাটার মৃত্যুই একমাত্র সাজা।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার কাহিনী শুরু হয়।

সুলতান যখন বললো, এই কুকুরের বাচ্চাটার মৃত্যুই একমাত্র সাজা, ঠিক সেই সময় প্রহরী এসে খবর দিলো, সবুজ শহরের সুলতানের প্রতিনিধি এসেছেন সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে।

সুলতান উজিরকে বললো, ওদের সসম্মানে নিয়ে এসো।

উজির এবং আজিজ এসে কুর্নিশ জানিয় দাঁড়াতেই তাজ অল মুলুককে দেখে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, শাহজাদা—

তাজ-অল-মুলুক বলে, কে বললে আমি শাহজাদা। আমি তো একটা ধাপ্পাবাজ মিথ্যেবাদী, শয়তান।

সুলতান স্বয়ং সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে।—আমি উজিরের কথায় তোমার উপর অবিচার করেছি বাবা। অনেক কটু কথা বলেছি। তুমি কিছু মনে করো না। আমি ঐ উজিরটাকে শূলে চাপাবো। মাথা মোটা একটা হাঁদা কোথাকার। সারিমান ভাবে ভাগ্যে জল্লাদকে সে হুকুম দিতে দেরি করেছিলো। আর এক দণ্ড পরে যদি এঁরা আসতেন তা হলে তাজ-এর কাটা মুণ্ডু এতক্ষণে মাটিতে পড়ে থাকতো। উফ্ ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে সারিমানের। উজির জানায়, সুলতান সুলেমানের সেনাবাহিনী জোর কদমে এগিয়ে আসছে কর্পূর দ্বীপের দিকে। ওদের খবর পাঠাতে হবে। নইলে শহরের ভিতর ঢুকে সব ধুলোয় মিশিয়ে দেবে—এই রকম হুকুমই তাদের দেওয়া আছে। সুতরাং আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা করে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিতে হবে।

ভয়ে সুলতান সারিমানের হাত পা কাঁপতে থাকে। উজির বলে, আপনি আশ্বস্ত হোন জাঁহাপনা, আমি সব ব্যবস্থা করছি। আর আপনি আপনার বৃদ্ধ উজিরকে এর জন্যে কোন শাস্তি দেবেন না এই আমার আর্জি। কারণ সে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করতে চায়নি।

যা কিছু করেছে সুলতানের মঙ্গল চিন্তা করেই করেছে। হয়তো তার বিচারে ভুল হতে পারে। এর জন্য প্রাণদণ্ড হয় না।

সুলতান সারিমান তাজ-অল-মুলুকের দিকে তাকায়, তোমার কি মত বাবা?

আমিও সেই কথাই বলি, জাঁহাপনা, ওকে আপনি এযাত্রা রেহাই দিন। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়।

সুলতান সারিমান বলে, ঐ ব্যাটা খোজা কাফুর, সব নষ্টের গোড়া সে। ওকে আমি ক্রুশে গেঁথে মারবো।

তাজ বলে, সে আপনার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে লোকটার জন্যেই যে আমার গর্দান যেতে বসেছিলো, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

উজির এবং আজিজ দু'জনেই এগিয়ে এসে বলে, শুভকাজ সামনে। এখন আর নরহত্যা না হয় নাই করা হলো। এ যাত্রা ওকে ক্ষমাঘেন্না করে না হয় ছেড়েই দিলেন।

সুলতান সারিমান বললো, এ ব্যাপারে আপনারা যা বলবেন আমি তাই করবো। খোজাকে শূলে চাপাতে বলেন শূলে চাপাবো। ছেড়ে দিতে বলেন ছেড়ে দেব।

তাজ বলে, ঠিক আছে, এবারের মতা ওর বেয়াদপি মাফ করেই দিন।

সুলতান সারিমান বলে, আর বাবা, আমার গুনাহ্‌র কে বিচার করবে?

তাজ বলে, ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না জাঁহাপনা। এখন থেকে আপনি আমার দ্বিতীয় পিতা। পিতাপুত্রের সম্পর্ক তো বিচার-বিবেচনার সম্পদ নয়, জাঁহাপনা।

সারিমান তাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে। উজির আর আজিজ সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা করতে চলে যায়। আমির ওমরাহ এবং দরবারের সচিবরা তাজকে নিয়ে যায় হামামে। এদিকে কাজীদের খবর পাঠানো হয়। সারাপ্রাসাদে হৈচৈ পড়ে যায়। শাহজাদী দুনিয়ার শাদী।

সুলতান সারিমান এবার কন্যা দুনিয়ার ঘরে আসে। মেয়ে হয়তো মনে আঘাত পেয়েছে। দরবারে ডেকে উজিরের সামনে তাদের এইভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। অভিমানী মেয়ের মনে চোট লাগা স্বাভাবিক।

ঘরে ঢুকতেই চমকে ওঠে। শাহজাদী দুনিয়া একখানা ছুরি হাতে বাগিয়ে ধরেছে। আর এক



মুহূর্ত দেরি হলে নিজের বুকে বসিয়ে দিত। সুলতান ক্ষিপ্রহাতে ছুরিখানা ছিনিয়ে নিয়ে বলে, এ কি করছিলে, মা।

দুনিয়া কেঁদে ওঠে, এ জীবন আমি আর রাখবো না বাবা।

সুলতান সারিমান আকুল হয়ে বলে, ও কথা মুখে আনতে নাই মা। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। তুমি না থাকলে আমি বাঁচবো কি নিয়ে?

দুনিয়া বলে, তাজ ছাড়া আমার জীবনের কোনও মূল্য নাই। সে আমার জীবনের একমাত্র ভরসা ছিলো। তুমি তাকে হত্যা করেছ। আমি কি নিয়ে থাকবো?

—না মা, না। সে এখনও বেঁচে আছে। আমি ভুল করে তাকে সাজা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। সবুজ শহর থেকে সুলতান সুলেমানের উজির এসেছেন। তার কাছেই জানলাম, তাজ কোনও ধাপ্পা দেয়নি। ওঠ মা, ওঠ। আমি তোমাদের মিলন ঘটিয়ে দিচ্ছি।

তাজ-অল-মুলুক হামাম থেকে ফিরে আসে। সুলতান নিজে হাতে ধরে তাজকে নিয়ে এলো দুনিয়ার ঘরে।—এই দেখো, মা। তাজ বেঁচে আছে।

দুনিয়া ছুটে এসে তাজ-এর হাত ধরে, আনন্দে তার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। সুলতান ঘরে ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

তাজ দুনিয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।—ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিলো, সোনা। কিন্তু আমাদের ভালোবাসা আমাকে রক্ষা করেছে। চলো, আর দেরি করবো না। বাবা বড় দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। আজই আমরা সবুজ শহরের পথে রওনা হবো।

সেই দিনই তাজ, দুনিয়া, উজির, আজিজ এবং সুলতান সারিমান সবুজ শহরের পথে যাত্রা করে। কিছুদিন বাদে যখন তারা এসে পৌঁছয় সারা সবুজ শহর তখন আনন্দের বন্যায় ভেসে চলেছে। দূত এসে আগেই সুলতান সুলেমানকে খবর দিয়েছিলো, শাহজাদা তাজ-অল-মুলুক পাত্রী শাহজাদী দুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসছেন।

শহরের প্রবেশ মুখে বিরাট তোরণদ্বার তৈরি করা হয়েছিলো। হাজার হাজার নরনারী এসে সমবেত হয়েছে। তাদের ভাবী সুলতান আর তার ভাবী বেগমকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে সবুজ শহর আজ ভেঙে পড়েছে। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে চলেছে সেনাবাহিনী। রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার সেনা।

ফুলের মালায় সাজানো হয়েছে প্রাসাদ। সুলতানের হুকুমে জনে জনে দান করা হচ্ছে নতুন পোশাক, খানাপিনা, ফল ফুল, আতর, গোলাপজল।

তাজ প্রাসাদে ঢুকেই প্রথমে সুলতান সুলেমানকে জড়িয়ে ধরে।—আব্বাজান, আমার জন্যে বড় দুশ্চিন্তায় দিন কেটেছে আপনার। অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আমাকে ক্ষমা করুন।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে সুলতান বলে, আল্লাহ যখন যাকে যে ভাবে রাখেন তাই থাকতে হয় বাবা। ও নিয়ে আমার কোনও দুঃখ নাই। আজ যে আবার তোমাকে ফিরে পেয়েছি এজন্যেই তাকে আমার হাজার হাজার সালাম জানাই।

দুই সুলতান এবং তাজ একসঙ্গে বসে খানাপিনা করলো। কাজীরা এসে শাদীনামা তৈরি করে দি.. নানারকম সাজপোশাক এবং নগদ অর্থ উপহার নিয়ে বিদায় নিলো। সেনাবাহিনীর মধ্যে দুহাতে ধনদৌলত বিতরণ করা হতে থাকলো। নাচ গান বাজনা হৈ-হল্লায় মেতে উঠলো শহরবাসী। চল্লিশ দিনব্যাপী চলতে থাকলো এই আনন্দ উৎসব। দুনিয়া আর তাজ ভালোবাসার সায়রে গা ভাসিয়ে দিয়ে স্বর্গ-সুধা পান করতে লাগলো।

তাজ কিন্তু আজিজকে ভোলেনি। দামী দামী সাজপোশাক, মূল্যবান গালিচা পর্দা, খাটপালঙ্ক নানা রকম শৌখিন বিলাস সামগ্রী এবং প্রচুর ধনরত্ন সহ দাসদাসী নফরবাঁদী উট খচ্চর গাধা ঘোড়া সঙ্গে দিয়ে আজিজকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দিলো। আজ কতকাল তার মা ছেলেকে চোখে দেখেনি। হয়তো সে ব্যাচারী কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে।

সুলতান সুলেমানের মৃত্যুর পর তাজ-অল-মুলুক সুলতান হলো। আজিজকে করলো তার উজির। আর সেই বাগানের বৃদ্ধ মালির কথাও ভোলেনি তাজ। সবুজ শহরে এক বিরাট রেশমী কাপড়ের দোকান করে দিলো তাকে।

দু-অল-মাকানের পুত্র কান-মাকানা এবং নুজাতের কন্যা নসিবা ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে হেসেখেলে মানুষ হতে থাকে। তাদের স্বর্গীয় রূপের তুলনা মেলা ভার। নসিবার প্রকৃতি ধীরস্থির শান্ত শতদলের মতো। কিন্তু কান-মা-কানার স্বভাব চরিত্র ভিন্ন ধাঁচের। ঘোড়ায় চড়ে শিকার, ছুটোছুটি লাফাঝাঁপিতে সে ওস্তাদ। কখনও বা সে তীরধনুক নিয়ে চলে যায় গভীর জঙ্গলে। আবার কখনও সে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে—লড়াই করে সেনাপতির সঙ্গে। কুস্তি লড়ে নিগ্রোকে নিয়ে। এত সত্ত্বেও কিন্তু তার অন্তরে ভরা ছিলো কুসুমের কোমলতা। ফুলের শোভায় সে মাতাল হতো। কান পেতে শুনতো সে মধুপ গুঞ্জন। নসিবা কাছে এলে কান মা-কানার মনে হয়, ও যেন একটি গোলাপের কুঁড়ি। যখন দল মেলে ফুটবে, ওর খুসবুতে মদির হবে বাগিচা।

নসিবার বাবা নুজাতের স্বামী দু-অল-মাকানের কল্যাণে এখন প্রবল প্রতাপান্বিত। তার কথাতেই সবাই ওঠ-বোস করে। সেনাবাহিনীর একটা বিরাট অংশ এখন তার তাঁবে। অবশ্য এখনও সেনাবাহিনীর অনেকেই বৃদ্ধ উজির দানদানের অনুগত। তবু নসিবার বাবার দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে দানদান এখন বাগদাদ ছেড়ে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। পাশের একটা শহরে গিয়ে সে এখন সুদিনের অপেক্ষায় বসে আছে। কবে পিতৃহারা নাবালক পুত্র কান মা-কানা সাবালক হবে, কবে তাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নুজাতের স্বামীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবে—সেই দিনের প্রতীক্ষায় সে চুপ করে আছে।

নুজাতের স্বামীর ভয়ে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। তার কথার উপরে কারো কথা বলার জো নাই। সে এখন দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। কান মা-কানা আর তার মাকে গৃহে নজরবন্দী করে রাখলো। উদ্দেশ্য—তার কন্যা নসিবার সঙ্গে যাতে কান মা-কানা মেলামেশা না করতে পারে। মনের দুঃখে মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিজের প্রাসাদ বন্দী দশায় দিন কাটাতে থাকে। আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করি, এই অন্যায়ের সুবিচার কর খোদা। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ নাই।

বাবার কড়া প্রহরা সত্ত্বেও কান মা-কানা কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝে মাঝেই নসিবার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু এ ভাবেও বেশি দিন চললো না। নসিবার বাবা মেয়েকে এমনভাবে চোখে চোখে রাখতে লাগলো যে কান মা-কানা আর কিছুতেই তার দেখা পায় না। কি করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে সে নসিবাকে চিঠি লিখলো ঃ

"প্রিয়তমা নসিবা, তোমার অদর্শন আমি আর সইতে পারছি না। আমার আহার নিদ্রা ঘুচে গেছে। জানি না আবার কবে দেখা হবে। তোমাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। চলো, আমরা এই নরক থেকে পালিয়ে চলে যাই।"

চিঠিখানা এঁটে একটা খোজার হাতে দিয়ে বললো, খুব সাবধান, নসিবার হাতে দিবি। কেউ যেন টের না পায়।

খোজা বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, হুজুর। কাক-পক্ষী জানতে পারবে না।

কিন্তু খোজাটা চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে সোজা তুলে দেয় নসিবার বাবার হাতে। চিঠি পড়ে নসিবার বাবা ক্রোধে ফেটে পড়ে। এতবড় স্পর্ধা। উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে কান মা-কানাকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে নেয় সে। রাগে মাথা গরম করলে লাভ হবে না। কাউকে কিছু না বলে চিঠিখানা নিয়ে সে নুজাতের কাছে যায়।—দেখ, তোমার গুণধর ভাইপোর কাণ্ড দেখ।

নুজাৎ চিঠিখানা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কি বলবে, কি বলা উচিৎ কিছুই ভাবতে পারে না। স্বামী বলে, দেখ, নুজাৎ, মেয়ে বড় হচ্ছে। কান মা-কানার দেহে এখন যৌবন আসছে। এ-সময় নসিবার সঙ্গে তার আর মোলাকাৎ উচিৎ না। ঘি আগুন এক সঙ্গে থাকলে তার পরিণাম তো তোমার অজানা নয়, নুজাৎ। সুতরাং আজ থেকে নসিবাকে তুমি হারেমের মধ্যে চোখে চোখে রাখবে। সে যেন কোন মতলবেই বাইরে না বেরুতে পারে—লক্ষ্য রাখবে। এরপর অবাধ মেলা-মেশার ফল যে ভালো হবে না এতো বুঝতে পারছো। আমি ব্যবস্থা করছি যাতে কান মা-কানা আর নুজাতের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ না রাখতে পারে।

এই বলে নুজাতের স্বামী চলে গেলো। নুজাৎ বসে বসে চোখের জল ফেলতে থাকে। ভাইপো কান মা-কানাকে ডেকে বলে, নসিবার বাবা তোমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। তোমার চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে। এ অবস্থায়, আমার আশঙ্কা, সে তোমার অনিষ্ট করতে পারে, বাবা। আমি জানি, তুমি নসিবাকে ভালোবাসো। নসিবা আমার মেয়ে, তাকেও আমি বাজিয়ে দেখেছি, তুমি ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় চিন্তা নাই। তোমার জন্যে সে তার জীবন যৌবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। যদিও তুমিই সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী—আমাদের ভাবী সুলতান, তবু তুমি এখনও সাবালক হওনি, তোমার পিসেই এখন অছি। তার হুকুমেই হুকুমৎ চলছে। এখন যদি রাগের মাথায় সে একটা কিছু করেই বসে—পরে হাজার মাথা কুটলেও তার আর সুরাহা হবে না। তাই বলছি বাবা, একটু সাবধানে থাকবে। ধৈর্য ধরে আর ক'টা বছর কাটাও। তারপর নিজের সলতানিয়ৎ ফিরে পাবে। তুমিই হবে তখন আমাদের ভাগ্যবিধাতা। তখন তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

কান মা-কানা বলে, কিন্তু পিসি, এখন কি তার সঙ্গে একেবারেই দেখা হবে না?

—আমি বুঝতে পারি বাবা, ভালোবাসার অদর্শন সহ্য করা শক্ত।

কান মা-কানা নুজাতের এই কথায় তেমন কিছু ভরসা পায় না। বলে, এভাবে আমি এখানে থাকতে পারবো না পিসি। এই প্রাসাদ আমার কাছে কয়েদখানা মনে হচ্ছে। আমি অন্য কোথাও অন্য কোনও দেশে চলে যাবো, যেখানে সিংহাসনের মোহ নাই। আমি সিংহাসন চাই না, সলতানিয়ৎ চাই না, ধনদৌলত, নফর চাকর দাসদাসী আমার প্রয়োজন নাই। আমি চাই নসিবার ভালোবাসা। আপনি আমার সঙ্গে নসিবাকে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আমরা দু'জনে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবো। আর কোনদিন ফিরে আসবো না। পিসে সুলতান হয়ে বসুক সিংহাসনে। আমার কোনও আপত্তি নাই।

নুজাৎ বলে, তোমার আপত্তি না থাকলেও তোমার প্রজাদের ষোলআনা আপত্তি আছে। বাগদাদের পবিত্র সিংহাসন তার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছাড়া কেউই জবর দখল করে নিতে পারে না। প্রজাদের বিশ্বাস, এই ধর্ম-সিংহাসন জোর করে অধিকার করলে সে সবংশে নির্বংশ হবে। আর তুমি ঐ গৃহত্যাগের কথা ছাড়ো, বাবা। ওতে কোনও সুরাহা হবে না। নসিবাকে তোমার সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। ওকে পেতে গেলে তোমাকে কষ্ট করে এখানেই থাকতে হবে।

কান মা-কানা ব্যর্থ মনে ফিরে আসে। নুজাতের কোনও উপদেশই তাকে শান্ত করতে পারে না। সেই দিনই রাতের অন্ধকারে এক কালান্দার ফকিরের ছদ্মবেশে পথে বেরিয়ে পড়ে।

পুত্রের নিরুদ্দেশে কান মা-কানার মা কেঁদে কেঁদে সারা হয়। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ছেলের প্রতিক্ষায় ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। কোথায় গেলো তার নয়নের মণি, কবে সে ফিরে আসবে। এই ভেবে ভেবে অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। কাঁদে প্রাসাদের দাসদাসী নফর ভৃত্য। কাঁদে দরবারের উজির আমির ওমরাহ। কাঁদে সারা দেশবাসী। বাদশাহ উমর অল

নুমানের বংশে বাতি দিতে এই একমাত্র সলতে—সেও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। এখন এই ধর্ম সিংহাসনে, কার দুঃসাহস, কে বসতে পারবে!

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কান মা-কানা চলতে থাকে। কোথায় সে যাবে কিছুই জানে না। শুধু সারা দিন একটানা হেঁটে চলে। রাতের অন্ধকার নেমে এলে কখনও গাছতলায় কখন বা কারো বাড়ির দাওয়ায় ঘুমিয়ে রাত কাটায়। সকালে উঠে আবার চলতে থাকে। এইভাবে চারদিন পরে সন্ধ্যাবেলা সে এক নদীর ধারে সুন্দর শস্য শ্যামল প্রান্তরে এসে হাজির হয়। যেদিকে তাকায় সবুজের সমারোহ। ফলে ফুলে ভরা। গাছে গাছে দোয়েল ফিঙের নাচানাচি। নদীর জলে নেমে রুজু করে নামাজ পড়ে কান মা-কানা। সঙ্গের এক টুকরো বাসি রুটি খেয়ে গাছতলায় শুয়ে পড়ে।

অনেক রাতে এক সুমধুর সঙ্গীতের সুরে কান মা-কানার ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবাক হয়ে ভাবে, এই নির্জন প্রান্তরে এমন মিষ্টি গান কে গায়! উঠে দাঁড়িয়ে গানের আওয়াজ অনুধাবন করে এগিয়ে চলে। কিন্তু কোথাও কোনও জনমানবের দেখা পায় না। আরও খানিকটা এগোতে গানের কথাগুলো আরও স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে কানে বাজে। গায়ক কে—জানবার জন্যে তখন সে বনবাদাড় ভেঙ্গে এগিয়ে চলে। সামনে একটা পাহাড়। মনে হয়, পাহাড়ের ওপর বসে কেউ গাইছে এই গান। পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে আসে কান মা-কানা। গলা ছেড়ে ডাকতে থাকে, কই, কে আছো, কে গাইছো গান, সাড়া দাও।

উত্তর আসে, কে ডাকছো আমায়? কে তুমি? মানুষ না জিনি? তুমি যদি জিনি হও এগিয়ে এসো। আর যদি মানুষ হয়ও, আর এক পা এগিয়ো না। ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। রাতের অন্ধকারে কোথায় পা দিতে কোথায় পা দিয়ে হড়কে নিচে পড়ে যাবে। সকাল হোক তারপর দেখা হবে।

কান মা-কানা কিছুই বুঝতে পারে না। এই বিপদসঙ্কুল গিরি পর্বতের মাথায় বসে সে কেন এই সঙ্গীত গেয়ে চলেছে। নিশ্চয়ই তারও মনের দুঃখ ব্যথা কান মা-কানার মতোই অসীম। আর এক পাও না এগিয়ে সেখানেই বসে সে বাকী রাতটা কাটিয়ে দেয়।

এক সময় রাতের অন্ধকার কাটে। চারদিক ফর্সা হয়ে আসে। কান মা-কানা দেখলো, একটি লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। পরনে তার মরুভূমির বাদাবীদের মতো সাজপোশাক। কোমরে তলোয়ার, বাহুতে ঢাল। কাছে আসতে দু'জনে দু'জনকে স্বাগত জানায়। লোকটি প্রশ্ন করে, কে তুমি? কোথা থেকে আসছো? কী জাত? তোমার বাবা-মাই বা কে? এই বয়সে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে না নিয়ে এই ভয়ঙ্কর দুর্গম পাহাড়ে উঠেছ কোন সাহসে?

কান মা-কানা বলে, আমার নানা শাহেন শাহ উমর অল নুমান। বাগদাদের সুলতান ছিলেন তিনি। গত হয়েছেন। আমার বাবা সুলতান দু-অল-মাকান। তিনিও গত হয়েছেন। আমার নাম কান মা কানা। আমার পিসির মেয়ে নসিবার প্রেমের বিরহে আমি আজ বিবাগী হয়ে দেশে দেশে ঘুরছি।

বাদাবীর চোখে সন্দেহ।—তুমি যদি শাহজাদাই হবে তবে কেন তোমার এই ফকিরের বেশ? সঙ্গে কোন দেহরক্ষী না নিয়ে এই বিদেশ বিভুঁই-এ এসেছো, কোন সাহসে?



কান মা-কানা বলে, আমি কাউকে কিছু না বলে প্রাসাদ থেকে পালিয়েছি। সঙ্গে কাকে নেব? তা হলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে না? তুমি যদি চাও আমি যখন সুলতান হয়ে সিংহাসনে বসবো, তোমাকে আমার প্রধান দেহরক্ষী করতে পারি।

বাদাবী হো হো করে হেসে ওঠে।—তুমি এমনভাবে কথা বলছো, যেন মনে হচ্ছে দিগ্বিজয় করে ফিরছো কোনও বীরপুরুষ।

তোমার তলোয়ারের এক ঘায়ে বিশটা মাথা লুটিয়ে পড়ে—এমনি তোমার হাবভাব। কিন্তু ছোকরা, তুমি আমার বাহুবলের তো হদিশ জানো না। আমি যদি মনে করি, তোমাকে আমার গোলাম বানিয়ে রাখতে পারি। আর তোমার মা-বাবা যদি সত্যিই কোন শাহী পরিবারের কেউ হয়—অনেক ইনাম দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে।

বাদাবীর কথায় কান মা কানা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।—তার দরকার হবে না। আমার দাম আমি নিজেই শোধ করে দিতে পারি। তোমার মিষ্টি মধুর গান শুনে মনে হয়েছিলো, তোমার অন্তরটাও ঐরকম সুন্দর। কিন্তু এখন দেখছি লোকটা তুমি আদৌ সুবিধের না।

কান মা-কানার একটু শিশুসুলভ সারল্যে বাদাবী মজা পায়। বিশ্ব সংসারে কতরকম শয়তান শঠ, খল, ঠগ, প্রবঞ্চক আছে তার বিন্দু বিসর্গও খোঁজ রাখে না এই অপাপবিদ্ধ শিশু। সেই জন্যেই সেই গভীর রাতে চোর ডাকাতের আস্তানা এই দুর্গম পাহাড়ে নির্ভয়ে উঠে আসতে পেরেছে। বাদাবী ডাকাত কান মা কানাকে টুক করে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে থাকে। কান মা কানা হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে থাকে।—ছাড়ো ছাড়ো বলছি, বদমাইশ। আমাকে কেন কাঁধে তুললে? আমি তোমার কি করেছি?

বাদাবী বলে, আমি তোমাকে ঐ নদীর জলে ফেলে দেব। ঐ নদী গিয়ে মিশেছে টাইগ্রীস নদীতে। তুমি ভাসতে ভাসতে টাইগ্রীসে চলে যাবে। টাইগ্রীস তোমাকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে ইশা নদে। আর ইশা বয়ে নিয়ে যাবে ইউফ্রট নদীতে। এইভাবে একদিন তুমি তোমার দেশে পৌঁছে যাবে।

এই বলে, বাদাবী কান মা কানাকে মাথার উপর তুলে ধরে। যেন মনে হয়, এই মুহূর্তে সে নদীর অতল জলে ছুঁড়ে দেবে তাকে। কান মা কানা চিৎকার করে ওঠে, বাঁচাও—বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি। প্রাণে মেরো না।

বাদাবী হাসতে হাসতে ওকে নদীর ধারে মাটিতে নামিয়ে দেয়। আজ থেকে আমি তোমার বান্দা, শাহজাদা। তোমার ভালোবাসা নসিবার নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমার জন্যে আমি জান কবুল করবো।

কান মা কানা অবাক হয় বাদাবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। লোকটার আচার আচরণ কথাবার্তা কেমন যেন সব উল্টোপাল্টা। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। শুধু বলে, তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে?

দু'জনে নদীর পাড়ে বসে পড়ে। বাদাবী তার ঝোলা থেকে যবের রুটি আর নুন বের করে কান মা কানাকে খেতে দেয়। নিজেও একটু খায়। এইভাবে তাদের বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন হয়। কান মা কানা বলে, নাঃ, যতটা খারাপ মনে হয়েছিলো, মানুষটা তুমি ততোটা খারাপ নও। আচ্ছা এবার বলো, তুমি কে?

—আমার নাম সাব্বা ইবন রামাহ ইবন হুমাম। শাম মরুভূমিতে আমার ঘর। জাতে তাইস। আমার জীবনের কাহিনী শুনবে? সংক্ষেপে বলছি, শোনো ঃ

আমি যখন খুব ছোট সেই সময় আমার বাবা মারা যায়। আমার চাচা তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে মানুষ করতে থাকে। চাচার এক মেয়ে ছিলো—নাজমা। আমরা দু'জনে দু'জনকে খুব ভালোবাসতাম। যখন তার শাদীর বয়স হলো আমি তাকে শাদী করতে চাইলাম। কিন্তু আমার চাচা রাজি হলো না। রাজি না হওয়ার একমাত্র কারণ আমি গরীব। শাদী করে বিবিকে খাওয়াতে পারবো না এই-ই একমাত্র কারণ। আমাদের দলের প্রধান সর্দার চাচাকে বললো, শাদীর পরে খাওয়া পরার ব্যবস্থা দল থেকেই করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতেও চাচা রাজি হলো না। তখন সে নতুন বায়না ধরলো। শাদীর আগে তাকে পঞ্চাশটা ঘোড়া, পঞ্চাশটা উট, দশটা দাসদাসী, পঞ্চাশ বস্তা যব আর পঞ্চাশ বস্তা ভুট্টা যৌতুক দিতে হবে।

কিন্তু এত সব আমি কি করে দেব। তাই ঢাল তরোয়াল নিয়ে মরুভূমির পথে পথে তীর্থ-যাত্রীর-দলের উপর হানা দিতে লাগলাম। ছিনতাই, রাহাজানিই এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেন তেন প্রকারে চাচার দাবী মেটাতেই হবে। না হলে নাজমাকে আমি পাবো না। নাজমা আমার কলিজা। তাকে না পেলে বাঁচারও কোন অর্থ নাই আমার কাছে। সারা দিন রাহাজানি ছিনতাই করি আর রাতের বেলায় নাজমার বিরহে কাতর হয়ে মনের দুঃখে গান গাই। এই আমার জীবন।

কান মা কানা বলে, তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ একই। প্রেমই আমাদের পথে বের করে দিয়েছে।

এমন সময় ওরা দেখতে পায়, একজন ঘোড়সওয়ার এই দিকেই এগিয়ে আসছে। সাব্বা মুঠি করে তরোয়াল বাগিয়ে ধরে। কিন্তু না, লোকটা এক আহত আরব মুসলমান যোদ্ধা। দেহের সারা পোশাক রক্তে লাল হয়ে গেছে। কোনরকমে ঘোড়ার লাগামটা ধরে সে ধুঁকছে। কাছে আসতেই গোঙানির আওয়াজ শোনা গেলো, একটু পানি—পানি দাও।

কান মা কানা এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামায়। ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে মুখে একটু জল দেয়। কিন্তু ভালো করে খেতে পারে না। গাল বেয়ে পড়ে যায়। কান মা কানা জিজ্ঞেস করে, কে তুমি? কি করে এমন হলো?

লোকটা তার কামিজ খুলে দেখায়। পিঠের মাঝখানে একটা গর্ত হয়ে গেছে। হুড় হুড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। কান মা কানা শিউড়ে ওঠে। এ অবস্থায় কোনও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে?—কে তোমার এমন দশা করেছে বন্ধু?

এই ঘোড়াটাই আমার কাল হলো। এরকম ঘোড়া সারা আরবে আর দু'টি নাই। যে দেখে তারই লোভ হয়। এক সময়ে সে কনস্তান্তিনোপল-এর সম্রাট আফ্রিদুনের আস্তাবলে ছিলো। আমি ওকে চুরি করে নিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে সারা আরবে ঘোড়াটার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের সর্দার বললো, এরকম জানোয়ার আগলে রাখাও শক্ত। সকলেরই নজর পড়েছে। অন্য দলের ডাকাতরা সুযোগ পেলেই ছিনতাই করে নিয়ে যাবে। সুতরাং ঝামেলা এড়াবার জন্যেই সর্দার আমাকে বললো, আরব সীমানায় রক্ষী বাহিনীর কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে এসো।

তার কথা মতো আমি সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, তুমি যা গুণগান করছো, তার সত্যাসত্যের প্রমাণ কী? এত দাম দিয়ে কিনবো, পরে যদি দেখি একটা গাধার বাচ্চা?

সেনাপতির কথায় আমার রাগ হলো।—বেশ পরীক্ষা দিচ্ছি। আপনার আস্তাবলে সবচেয়ে তাড়তাগড়াই সেরা যে সব ঘোড়া আছে তাদের নিয়ে আসুন। আমি ছুটবো, আমাকে যদি তাদের কেউ ছুঁতে পারে, জান কবুল করে যাবো।

সেই আমার কাল হলো। আমাকে কেউ তারা ধরতে পারলো না। হাওয়ার আগে আগে উড়ে চলে আমার ঘোড়া। সৈন্যরা ক্রোধে ফেটে পড়লো। তাদের সেনাবাহিনীতে যা নাই তা এক ডাকাতের হাতে আছে। তীর বর্শা সড়কী ছুড়তে লাগলো। তারই কয়েকটা আমার পিঠে গেঁথে গিয়েছিলো। এ সত্ত্বেও হয়তো জানে বাঁচতাম। কিন্তু ঘোড়ার গতি আমি আর রুখতে পারলাম না। একটানা তিন দিন তিন রাত্রি সে উল্কার মতো ছুটে চললো। জানি না এত শক্তি সে কোথায় পেলো। একমাত্র দৈব ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব না।

বৃদ্ধ নেতিয়ে পড়ে।—আমার সময় শেষ হয়েছে বন্ধু। ইচ্ছা ছিলো, মরার আগে আমার দলের সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা হবে। কিন্তু তা আর হলো না। যাই হোক, আমার দেহটা তোমরা কবর দিয়ে দিও। আর এই ঘোড়াটা আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। এর নাম অল-কাতুল-অল মাজনুন।

এই বলে লোকটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। কান মা কানা এবং তার সঙ্গী সাব্বা তার মর দেহটা সমাধিস্থ করে আল্লাহর কাছে তার আত্মার শান্তি কামনা করলো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পর দিন রজনীতে শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে।

কবর দেওয়া শেষ হলে কান মা কানাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সাব্বা একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরের মতো পিছনে পিছনে চলতে লাগলো। চলতে চলতে এক সময়ে এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামে। বনের হরিণ শিকার করে পুড়িয়ে পেটের খিদে মেটায়। হঠাৎ কান মা কানা দেখলো অদূরে এক গাছতলায় কতকগুলো বান্দা বসে জটলা করছে। আর তাদের সামনে একপাল উট, ভেড়া, ছাগল আর ঘোড়া চরছে। সাব্বাকে বললো, তুমি দাঁড়াও, আমি জানোয়ার আর বান্দাগুলোকে ধরে নিয়ে আসি। ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে গিয়ে লোকগুলোর মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে কান মা কানা। বান্দাগুলো ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, কে আছো কোথাও বাঁচাও—বাঁচাও। ডাকাত পড়েছে—

তাদের চিৎকারে পাহাড়ের ওপরের ছাউনি থেকে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে এলো তিনজন সৈন্য। কান মা কানাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে ওঠে, এই সেই কাতুল—ব্যাটা চুরি করে পালিয়েছে। এত খুঁজেছি, কোথাও পাইনি। আজ বাছাধন যাবে কোথায়। এবার তোমার ঘোড়া চুরি করার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি।

কান মা কানা ফিস ফিস করে কাতুলের কানে কি একটা কথা বলতেই চিহিঁ হিঁ করে সামনের দুপা ঊর্ধ্বে তুলে লোকগুলোর দিকে ছুটে যায়। কান মা কানার তলোয়ারের এক কোপে একজনের ধড় মুণ্ডু আলাদা হয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে। বাকী থাকে দুজন। আর দুই ঘায়ে তারাও ধরাশায়ী হয়। এবার সে বান্দাগুলোর দিকে তেড়ে যায়। কিন্তু তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে করুণা ভিক্ষা করতে থাকে। কান মা কানা তখন বলে ওঠ—উঠে দাঁড়া সব। জানোয়ারগুলো খেদিয়ে নিয়ে চলো আমার সঙ্গে।

সাব্বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান মা কানার লড়াই দেখছিলো। কাছে আসতে বলে, সাবাস! এই না হলে বাদশাহর ছেলে।

কিছু দূর এগোতেই দেখলো, সামনের আকাশ বাতাস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বুঝতে পারলো কোনও ফৌজি বাহিনী এক্ষুণি এসে পড়বে। কান মা কানা সাব্বাকে বললো, দোস্ত, তুমি জানোয়ারগুলো আগলে রাখো। আমি দেখে আসি কী ব্যাপার?

সাব্বা বলে, কিন্তু ফৌজী বাহিনীর সামনে যাওয়া কি ঠিক হবে বন্ধু? ওরা দলে অনেক ভারি। আর তারা সবাই লড়াকু যোদ্ধা।

কান মা কানা বলে, হতে পারে তারা একশো। কিন্তু আমি সুলতান উমর অল নুমানের নাতি—আমি একাই একশো। হয় নেবো শত প্রাণ, নয় দেব এক প্রাণ—অত ডরালে চলে?

একটু এগিয়ে আসতে কান মা কানা দেখতে পায়, শ'খানেকের অশ্ব সেনার এক বাহিনী আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে আসছে। তাদের সাজপোশাক দেখে চিনতে অসুবিধে হয় না—খ্রীষ্টান আফ্রিদুনের সেনাবাহিনী। কান মা কানার সামনে এসে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ালো তারা। ওদের প্রধান এগিয়ে এসে বলে, কি গো সুন্দরী, ঘোড়ায় চড়ার শখ হয়েছে, বুঝি! তা যাবে কোথায়, খুকি!

কান মা কানা রাগে গরগর করতে থাকে। এখনও তার দাড়িগোঁফ ওঠেনি বলে

ব্যাটারা তাকে মেয়েছেলে বলে তামাশা করছে। দাঁড়াও তামাশা করা ওদের জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিচ্ছি। সেনাপতি মজা করে বলে, তা সুন্দরী তোমার গাল দুটো তো বেশ টুকটুকে লাল। ফুলের পাঁপড়ির মতো তুলতুলে নরম মনে হচ্ছে! আহা কি সুন্দর কাজল কালো হরিণীর মতো চোখ। আর সুন্দরী, তোমার ঐ পাকা আঙুরের মতো ঠোঁট দুটো দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারছিনে। ইচ্ছে করছে, চুষে রক্ত ঝরিয়ে দিই। আচ্ছা সুন্দরী, অমন রণ সাজে সেজেছো কেন? এ সাজ তোমার মানায় না। তার চেয়ে এসো, আমার ঘরে তোমাকে রানী বানিয়ে রাখবো।

কান মা কানা চিৎকার করে ওঠে, ওরে শূয়ারের বাচ্চা—শূয়ার, কি বলছিস তার মানে বুঝিস। তোদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তোদের যম। এবার প্রাণ ভরে তোদের ঈশ্বরকে ডেকে নে। জীবনে আর সুযোগ হবে না। আমার মুখে দাড়ি গোঁফ ওঠেনি বলে কি ভাবছিস কব্জীর জোর কিছু কমতি আছে। যখন এক এক কোপে এক একজনের মাথা লুটিয়ে পড়বে, তখন বুঝবি মেয়েছেলে—না মেয়েছেলের বাবা।

সেনাপতি বুঝলো, এ একেবারে বিছুটি। অত সহজে তাকে বশে আনা যাবে না। হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে খোকা? ঠিক ঠিক জবাব দেবে। না হলে একেবারে শেষ করে দেব।

সে তার দলের একজনকে লক্ষ্য করে হুকুম করলো, ইসকো বাঁধো।

কিন্তু তার সামনে পর্যন্ত এগোতেই পারলো না সে। কান মা কানার এক কোপে দুখণ্ড হয়ে গেলো তার দেহ। আর একজন তেড়ে আসে তার দিকে। তাকেও এক কোপে ধরাশায়ী করে দেয়। তারপর আরও একজন—আরও একজন। এইভাবে পর পর পাঁচজন যখন তার শাণিত তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারালো, সেনাপতির মনে শঙ্কা জাগে। ইশারায় বাকীদের এগোতে বারণ করে নিজেই কান মা কানার সামনে এসে দাঁড়ালো।

—তোমার অসাধারণ বীরত্ব দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। আমি কারদাস। সমগ্র রোমে আমার বীরগাথা মানুষের মুখে মুখে। এই বয়সে তোমার এই বীরত্ব দেখে আমি খুশি হয়ে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি যেতে পারো।

কান মা কানা চটে আগুন, ক্ষমা? আমি তোমার ক্ষমাপ্রার্থী? এত বড় স্পর্ধা তোমার। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষমার কোন স্থান নাই। তুমি কারদাস হও আর হরিদাসই হও আমার জানবার কোন প্রয়োজন নাই। তলোয়ারেই পরিচয় পাওয়া যাবে। আর আমার বংশ পরিচয় যদি শুনতে চাও তবে শোনো, আমার নানা সুলতান উমর অল নুমান, আমার বাবা সুলতান দু-অল-মাকান আর আমার নাম কান মা কানা। কারদাস বলে, আমি তোমার বাবার সঙ্গে অনেকবার সামনা সামনি লড়াই করেছি। তার মতো বীরের পুত্র তুমি—যোগ্য বাপের যোগ্য সন্তান। যাই হোক, তুমি তোমার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। আমার লোক কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।

কিন্তু লড়াই থেকে কাউকে ক্ষমা করে বা কারো ক্ষমা নিয়ে ফিরে যাওয়া তো আমাদের রীতি নয়। সুতরাং শত্রু যখন সামনে তাকে নিধন না করে, জিইয়ে রেখে তো আমি চলে যেতে পারি না। এবং তোমাকেও যেতে দিতে পারি না। খ্রীষ্টান বীর কারদাস মউৎ-এর জন্য প্রস্তুত হও।

কাতুল-এর কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলতেই টগবগিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেনাপতির ওপর। দুই বীরের সে কি প্রচণ্ড লড়াই। ভেড়া অথবা ষাড়ের লড়াই যারা দেখেছে তারা খানিকটা তার আঁচ করতে পারবে। পর পর কয়েকটা মারাত্মক প্যাঁচের মার কান মা কানা আশ্চর্য দক্ষতায় এড়িয়ে গেলো। কিন্তু তার পরেই একটা মোক্ষম কোপ বসিয়ে দিলো কারদাস। কান মা কানা এ প্যাঁচটা ধরতে পারেনি। কিন্তু সাবাস কাতুল। সে বুঝতে পেরেছিলো

তার মালিক মাৎ হয়ে পড়ছে। সেই মুহূর্তে সে আশ্চর্য কায়দায় অত বড় বিশাল বপুটা টুক করে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে যায়। কারদাসের তলোয়ার হাওয়া কেটে শাঁই করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই কান মা কানার কাহিনী এখানেই শেষ করতে হতো।

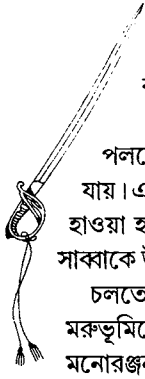

কাতুলের রণ-কৌশলে কারদাসের মোক্ষম মার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পলকের মধ্যে কান মা কানার এক প্রচণ্ড কোপে কারদাস দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই না দেখে কারদাসবাহিনীর বাকী সৈন্যরা সব ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেলো। মৃত সেনাপতির কামিজে তলোয়ারখানির রক্ত পুছে কোষে ভরে সাব্বাকে উদ্দেশ্য করে বললো, চলো, আজ রাতটা একটু ভালো করে মৌজ করতে হবে।

চলতে চলতে পথের মাঝে একটা নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। মেয়েটি মরুভূমিতে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি ঘুরে ঘুরে নানা বিচিত্র গল্প বলে মানুষের মনোরঞ্জন করে বেড়ায়। কান মা কানা বলে, চলো, আজ রাতটা আমাদের সঙ্গেই খাবেদাবে। আর মজার মজার গল্প বলবে।

পাহাড়ের নিচে একটা গাছের তলায় তাঁবু খাটিয়ে খানাপিনা সেরে নিলো তিনজন। তারপর কান মা কানা নিগ্রো মেয়েটাকে বললো, এবার তোমার কিস্‌সা বলো, শুনি।

নিগ্রো মেয়েটা বলতে থাকে ঃ

আজ এক চরস খোরের কাহিনী শোনাবো। লোকটার নেশা ছিলো কুমারী মেয়ের দেহ উপভোগ করা। অনেক পয়সা খরচ করে নিত্যি নতুন কুমারী মেয়ে জোগাড় করে আনতো সে। এইভাবে নারী দেহ ভোগ করতে করতে একদিন তার পয়সাও ফুরিয়ে যায় বিতৃষ্ণা আসে। কোনও ভালো জিনিসও বেশী খাওয়া ভালো না। তাতে পয়সারও অপচয় ঘটে। লালসাও বিকৃত হয়ে পড়ে।

যাই হোক, তখন তার অতি দীন দশা। জামা কাপড় কেনার পয়সা নাই—পরণে শতছিন্ন ময়লা পোশাক। খালি পা। ভিক্ষে করে খায়। একদিন বাজারের পথে পথে ঘুরে ভিক্ষে করছিলো, এমন সময় পায়ে একটা পেরেক ঢুকে যায়। অনেক রক্তপাত হতে থাকে। কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব হলো না। এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে বাঁধলো। কিন্তু রক্ত আর বন্ধ হয় না।

শহরে গরীবদের জন্য নিখরচায় স্নানের হামাম ঘর আছে। সেখানে গিয়ে বসার ঘরে ঢুকে বসে পড়লো। একটু বিশ্রাম কারর পর একটা কলের কাছে গিয়ে পাটা ধুয়ে সাফ করছে এমন সময় নজবে পড়লো, একটা লোক তার পাশে, যে লোকটা বসেছিলো, সে যেন কি একটা জিনিস চিবুচ্ছে। কেমন যেন কৌতূহল হলো। লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, কি চিবুচ্ছো গো?

লোকটি ফিসফিস করে বলে, হাসিস। যদি খাও তোমাকেও একটু দিতে পারি—খাবে?

সে বললো, দাও খাবো।

লোকটি তার চোয়াল থেকে এক টুকরো বের করে ওর হাতে দিয়ে বললো, খাও, দিল্‌-এর সব দুখ্‌ দরদ্‌ বেমালুম সাফ হয়ে যাবে।

আমাদের গল্পের নায়ক হাসিসের টুকরোটা নিয়ে মুখে পুরে চিবুতে থাকলো। কোনও দিন খাওয়ার অভ্যেস নাই, তাই সে একটু পরেই বিনা কারণে খিক্‌ খিক্‌ করে হাসতে লাগলো। উপস্থিত সবাই এ দৃশ্য দেখে অবাক। লোকটা পাগল নাকি। একটু পরেই শ্বেতপাথরের মেজেয় শুয়ে পড়ে প্রলাপ বকতে শুরু করলো। সেই প্রলাপোক্তি থেকে এই কাহিনীটুকু দাঁড় করানো হয়েছে।

একটা হামামে তাকে ন্যাংটো করে ফেলা হয়েছে। দুটো নিগ্রো তার হাত পা শক্ত করে চেপে ধরে আছে। আর একজন মাঝারদার বোঁধলের খোসা দিয়ে আগাপাছতলা ঘসে মেজে শরীরের ময়লা সাফ করছে। তাদের খেয়ালখুশি মতো তা যে দিকে ইচ্ছে ঘোরাচ্ছে ফিরাচ্ছে। তার কোনও ওজর আপত্তিই তারা শুনছে না। এমনভাবে তারা দলাই মলাই করছে—যেন হাড় মাংস আলাদা হয়ে যাবে। আড়াইমনি এক মক্কেল তার ভুঁড়িটার ওপর চেপে বসে জঙ্ঘার পাশের দাবনা দুখানা খাবলে খাচ্ছে।

এইভাবে স্নান সমাপন হলে বড় বড় তিনখানা তুর্কি তোয়ালে দিয়ে সারা শরীর ঢেকে ওরা বললো, সময় হয়ে গেছে, হুজুর। তাড়াতাড়ি করুন। এবার আপনার পাত্রীর ঘরে যেতে হবে।

—পাত্রী? পাত্রী কি বলছো? আমি তো শাদীই করিনি!

—হুজুরকে বোধ হয় কেউ হাসিস খাইয়ে দিয়েছে। তা না হলে এমন ভুল বকবেন কি করে? চলুন, আর দেরি করবেন না। আপনার পাত্রী অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন।

একটা কালো বোরখা পরিয়ে লোকটিকে নিগ্রো দুটো রাস্তায় বের করে নিয়ে আসে। একটু পরে তারা তাকে একটা বিরাট শয়নকক্ষে এনে বসায়। দামী দামী খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল আলমারীতে ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। একদিকে টেবিলের উপর একটা প্রকাণ্ড ফুলের ঝাঁপি। সারা ঘর ধূপ, গোলাপজল আর আতরের খুশবুতে ভরপুর। এ পাশের টেবিলে থরে থরে সাজানো নানা জাতের ফল, হালওয়া, পেস্তা, বাদাম, আখরোট মিঠাই মণ্ডা সরবৎ। নিগ্রো দুটো কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিলো।

একটু পরে ঢুকলো একটি খানসামা। ঘরে ঢুকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, হুকুম করুন জাঁহাপনা, বান্দা হাজির।

লোকটা ফিকফিক করে হাসে।—লোকগুলো সবাই হাসিস খেয়ে চুর হয়ে আছে নাকি? আমাকে বলে কিনা জাঁহাপনা। আরে—আমার চৌদ্দপুরুষের কেউ কখনও সুলতান বাদশাহর সুরৎ দেখেনি। এদিকে এসো বাবা, একটা তরমুজ কাটো, দেখি। আধখানা আমাকে দাও, আর বাকী আধখানা তুমি খাও, বুঝলে? তরমুজের মতো ফল হয় না। আপেল বলো আর আঙুরই বলো—তরমুজই ফলের বাদশাহ।

খানাসামাটা একটু পরে টইটম্বুর পাকা তরমুজ এনে সামনে ধরে।

—চমৎকার। কাটো। বেশ ফালা ফালা করে কাটো।

খানসামা তার কথা মতো সরু সরু ফালি করে কেটে রেকাবীতে সাজিয়ে দিলো।

লোকটার জিভে জল আসে।—বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এমন রসের জিনিস শুধু মুখে তো ভালো লাগবে না। তুমি এক কাজ কর। একেবারে আনকোরা—বুঝলে? মনে থাকে যেন—একেবারে আনকোরা—একটা ডবকা মেয়েছেলে নিয়ে এসো দিকিনি। তা না হলে এমন রসের জিনিস জমবে না।



খানসামা আজ্ঞাবহ দাস। হুকুম পাওয়া মাত্র সে একটা নবযৌবন উদ্ভিন্না কিশোরীকে নিয়ে এসে দাঁড় করালো। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর দোলাতে থাকে। লোকটা উত্তেজিত হয়ে মেয়েটিকে জাপটে ধরে কোলের ওপরে বসায়।

এই সময় পিঠে ঠাণ্ডা লাগছে বুঝতে পেরে সে শ্বেতপাথরের মেঝের উপর উঠে বসে। তার চারপাশ ঘিরে শ'খানেক লোক। সবাই তার এই মজার প্রলাপ বাণী শুনতে

শুনতে স্নানের কথা ভুলে গেছে। লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো। তারপর সামনের লোকগুলোর উদ্দেশে বললো, মেয়েটাকে তোমরা কোথায় সরিয়ে নিলে?

এবার হাসির রোল ওঠে। সেই বিশল কক্ষের প্রায় শ'খানেক লোক এক সঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে। লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। ব্যাপার কী? ওরা হাসে কেন? সবাই কি হাসিস খেয়েছে নাকি?

ঘরের লোকগুলো, হাসতে হাসতে বলে, ওহে চরসখোর এখনও তোমার শখ মিটলো না, খুব তো উজির বাদশাহ মারলে—ডবকা ছুড়ির সঙ্গে ফূর্তি লুটলে। এবার তোমার বচন একটু থামাও।

নিগ্রো মেয়েটার গল্প শুনতে শুনতে কান মা কানা হেসে গড়াগড়ি যায়। —তুমি বেড়ে মজাদার কিসসা বলতে পারো গো।

বুড়ি বলে, বাবা, এই আমার কাজ। দোরে দোরে ভিক্ষা করে খাই না। প্রাণখুলে কিসসা বলি, যদি কারো ভালো লাগে, ভালোবেসে কেউ যদি কিছু দেয়, হাত পেতে নিই।

কান মা কানা বলে, তোমাকে আমি খুশি করে দেব, বুড়ি মা। তুমি আর একটা মজাদার গল্প শোনাও।

নিগ্রো বুড়ি আর একটা কাহিনী শোনাবার তোড়াজোড় করছে এমন সময় তাঁবুর সামনে এক ঘোড়সওয়ার এসে দাঁড়ালো। কান মা কানা তলোয়ার খুলে বেরিয়ে আসে।

—কে? কি চাই।

—আমি বাগদাদ থেকে আসছি। উজির দানদানের দূত। আমার মতো আরও একশো ঘোড়সওয়ারকে তিনি আরবের নানা দেশে পাঠিয়েছেন। প্রতি গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে শহরে শহরে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কান মা কানা প্রশ্ন করে, কেন, কি কারণে?

উজির দানদান তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে আমাদের ভাবী সুলতান শাহাজাদা কান মা কানার পিসেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। এখন বাগদাদের সিংহাসন তিনি আগলে বসে আছেন। শাহজাদা কান মা কানা দেশত্যাগী হয়েছেন। জানি না তিনি কি ভাবে কোথায় খেয়ে না খেয়ে দিন গুজরান করছেন। উজির দানদান আমাদের পাঠিয়েছেন, যেভাবেই হোক, তাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে। তার প্রাপ্য সিংহাসন তার হাতে তুলে দিয়ে দানদান অবসর নিতে চান।

এখন আমরা জনেজনে জিজ্ঞেস করে ফিরছি, কেউ যদি তাঁকে দেখে থাকেন, তাঁর সন্ধান জেনে থাকেন মেহেরবানী করে জানাবেন এই আমার প্রার্থনা। আমরা আবার তাকে ফিরে পেতে চাই।

ঘোড়সওয়ার দূতের কথা শুনে কান মা কানা পুলকিত হয়। সাব্বাকে গিয়ে গলাখাটো করে কানে কানে বলে, সব ফসলই সময় হলে পাকে। চলো দোস্ত, এবার যাবার সময় বিহঙ্গের। বাগদাদে যেতে হবে।

ঘোড়সওয়ার কিন্তু শাহজাদার মৃদুকণ্ঠের কথাও সব শুনতে পায়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই যুবকই তাদের ভাবী সুলতান কান মা কানা। সঙ্গে সঙ্গে সে আভূতি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়। সেই নিগ্রো বুড়ি আর সাব্বাও তার দেখাদেখি কুর্নিশ জানালো। কান মা কানা সাব্বাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমার জিগরী দোস্ত। এখন কেন কুর্নিশ জানাচ্ছো। যখন সিংহাসনে বসবো, তখন সে-সব হবে।

নিগ্রো বুড়িটাকে বললো, বুড়ি মা, তুমিও বাগদাদে চলো। আমাকে নিত্যি নতুন মজাদার কাহিনী শুনাবে।

বুড়ি বলে, যাবো, হুজুর, নিশ্চয়ই যাবো।

দূতকে নানা ইনাম নিয়ে বাগদাদে রওনা করে দিলো। —উজির সাহেবকে জানাও আমি বহাল তবিয়তে আছি। আজই আমরা রওনা হচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাবো।

এরপর কাতুল-এর পিঠে চাপলো কান মা কানা। বুড়িকে চাপানো হলো একটা খচ্চরের পিঠে। উটের পিঠে বোঝাই করা হলো সামান পত্র। সাব্বা জানোয়ারগুলোকে গুছিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকলো।

সারা বাগদাদ শহর আলোর মালায় সাজানো হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোরণ তৈরি করা হয়েছে। শহরবাসী আনন্দে আত্মহারা। তাদের ভাবী সুলতান আসছে শহরে। উজির দানদানের নির্দেশে সারা প্রাসাদ অপরূপ সাজে সাজানো হয়েছে। নাচ-গান হৈ-হল্লা খানা-পিনার লহর ছুটেছে।

কাতুলে চেপে কান মা কানাকে আসতে দেখে শহর প্রান্তের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার নগরবাসী হর্ষধ্বনি করে ওঠে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ উজির দানদানও ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে যায়। কান মা কানাকে জড়িয়ে ধরে বুকে। দানদান অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে, তোমার প্রতীক্ষাতেই বসে আছি, ভাই। তোমার সিংহাসন তুমি বুঝে নাও।

প্রাসাদে এসে কান মা কানা সব আগে ছুটে যায় মায়ের ঘরে। কেঁদে কেঁদে মায়ের চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আদর করে। দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। মুখে কোনও কথা সরে না।

—মা—মাগো, কথা বলছো না কেন?

কান মা কানা আকুল হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে। মা উত্তর দেয়, কথা বলার ভাষা আজ হারিয়ে ফেলেছি বাবা। কতদিন দেখিনি তোকে। আজ একটু দু'চোখ ভরে শুধু দেখতে দে। তা বাবা, এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন রে। খাওদা দাওয়ার খুব কষ্ট গেছে।

কান মা কানা বলে, কই, রোগা তো হইনি মা। দিব্বি, দেখছো না, কেমন তাগড়াই চেহারাখানা হয়েছে। তুমি মা তো—তাই তোমার নজরে পড়ছে না।

মা হাসে। আনন্দ বেদনা মিশ্রিত সে হাসি। বড় মধুর। কান মা কানা জিজ্ঞেস করে, নসিবার খবর কি মা? সে কেমন আছে?

তুমি চলে যাওয়ার পর কারো মনেই আনন্দ নাই বাবা। নসিবা আর তা মা ঘরে থেকে আর বের হয় না। চলো, আমার সঙ্গে, ওদের কাছে নিয়ে যাই।

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নুজাতের ঘরে আসে। বিষণ্ণ বিষাদগ্রস্ত মা মেয়ে কান মা কানাকে দেখে আনন্দে দুলে ওঠে। কিন্তু ভয়, না জানি কান মা কানা কিভাবে তাদের গ্রহণ করবে।

—পিসি কেমন আছ?

নুজাৎ বলে তোমার পিসার ইন্তেকাল হওয়ার পর থেকে আমার আর ভালোমন্দ বলে কোনও বোধ নাই, বেটা। আর নসিবা—সে তো তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে কারো সঙ্গে হেসে কথা বলেনি। সময়মতো নাওয়া খাওয়া করে না। দেখো না, সুরৎখানার কি হাল হয়েছে।

নসিবা মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে চেয়ে থাকে। এতকালের চাপা অভিমান আজ যেন উথলে উঠতে চায়। যাবার আগে কান মা কানা তাকে একটা খবর পর্যন্ত দিয়ে যায়নি। এতকাল দূরে দূরে রইলো, একটিবার খোঁজও করেনি, সে বাঁচালো কি মরলো। দুচোখ জলে ভরে আসে তার। কিন্তু মা-মনির নজরে পড়ার লজ্জায় জানলার গরাদ ধরে বাইরে বাগিচার দিকে চেয়ে থাকে।

সে-রাতেই তাদের শাদী এবং মধুযামিনী হলো। কান মা কানা নসিবাকে বুকে টেনে নেয়, আমি যখন ছিলাম না, আমার কথা মনে পড়তো তোমার?

নসিবা ঠোঁট ওলটায়, আমার দায় পড়েছিলো—তোমার কথা ভাবতে যাবো কেন?

কান মা কানা বুঝতে পারে, দারুণ অভিমানের কথা। বলে, আমার কিন্তু সব সময় তোমার কথা মনে পড়তো।

—ছাই মনে পড়তো। পুরুষ মানুষের মন বলে কোনও পদার্থ আছে নাকি? হৈ-হল্লা করে নেচে বেড়িয়েছো। নতুন নতুন মেয়ে মানুষ নিয়ে ফূর্তি করেছো, আমার কথা তোমার মনে পড়বে কোন্ দুঃখে।

—ইয়া আল্লাহ! আমার সম্বন্ধে এই তোমার ধারণা? তুমি সাব্বাকে জিজ্ঞেস করো, সেই তোমাকে সব বলবে। যতদিন বিদেশে ছিলাম সেই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিলো।

—সাব্বা কে?

—ডাকাত! বাদাবী ডাকাত।

—ডাকাত? নসিবা আঁৎকে উঠে। ভয়ে জড়িয়ে ধরে কান মা কানাকে।

—তুমি ডাকাতের দলে ছিলে?

—দলে নয়, শুধু একজন ডাকাতের সঙ্গে। তার মতো ডাকাত হয় না নসিবা। ভালোবাসার জন্যে সে ডাকাত হয়েছে।

—ভালোবাসার জন্যে আবার কেউ ডাকাত হয় নাকি?

নসিবা অবিশ্বাস করে। কান মা কানা বলে, হয় হয়। সে কথা তোমাকে আর একদিন বলবো। আজ আমাদের প্রথম মিলন রাত্রি। আজ ওসব কথা থাক, নসিবা। অনেক রাত হলো, এবার এসো—

এই মধুযামিনী থেকেই তাদের মধুর জীবনের সুখপাত্র। তারপর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নসিবা কান মা কানা সুখের সায়রে গা ভাসিয়ে কাটিয়ে দিলো।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। শাহরাজাদ বললো, নসিবা কান মা কানার কাহিনী শুনলেন, জাঁহাপনা। এবার আপনাকে পশু-পাখির মজাদার কাহিনী শোনাবো। আজ আর সময় নাই। রাত্রি শেষ হয়ে এলো। এবার গল্প থামাচ্ছি।

একশো ছেচল্লিশতম রজনীর মধ্য যামে সুন্দর সুন্দর পশু-পাখিদের গল্প বলতে শুরু করে শাহরাজাদ। প্রথমে শুনুন রাজহাঁস ময়ূর আর ময়ূরীর উপাখ্যান ঃ

সে অনেককাল আগের কথা। এক সমুদ্রের তীরে বাস করতো এক ময়ূর দম্পতি। মনের আনন্দে দুজনে পুচ্ছ নাচিয়ে ঘুরে বেড়াতো বনে বনে। ঝরনার সৌন্দর্য দেখে আর পাখির কাকলি শুনে দিন কাটাতো। দিনের বেলায় বেরুতো আহারের অন্বেষণে। আর রাত্রিবেলা এক গাছের কোটরে এসে বিশ্রাম করতো। এইভাবে দিন কাটছিলো। একদিন ময়ূর ময়ূরীকে বললো, চলো, একটু দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসি। একই জায়গায় রোজই ঘোরাফেরা—বড় একঘেঁয়ে লাগছে। নতুন জায়গার গাছপালা ফুল পখি—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য ভালোই লাগবে।

ময়ূরী বলে, খুব ভালো হবে। চলো যাই।

সেই দিনই তারা উড়তে উড়তে চলে গেলো একটা সুন্দর দ্বীপে। যে দিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায়। গাছে গাছে বাহারী ফুল, থোকা থোকা নানা সুমিষ্ট ফল। আর নিরন্তর

নির্ঝর ঝরনার সে কি মনোহারী শোভা? একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় বসে নাম-না-জানা নানা জাতের মিষ্টি মিষ্টি ফল আর ঝরনার নির্মল জল খেয়ে খেয়ে খুশিতে নাচতে লাগলো তারা।

সারাদিন বেশ আনন্দ করে কাটিয়ে পড়ন্ত বিকেলে যখন তারা স্বগৃহে ফেরার উদ্যোগ করছে, এমন সময় সেখানে এক রাজহাঁস এসে হাজির হলো। চোখে মুখে আতঙ্ক। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এসে বললো, বাঁচাও বাঁচাও আমাকে।



ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। ময়ূর এগিয়ে এসে বললো, কোনও ভয় নাই। আমরা তো আছি। কী ব্যাপার, কেউ তাড়া করেছে বুঝি। যাই ঘটুক তোমার কোন চিন্তা নাই, বোন। এখন তুমি আমাদের মেহেমান—ঘরের লোক। তোমাকে রক্ষা করার সব দায়-দায়িত্ব আমাদের।

রাজহাঁস কাঁপতে কাঁপতে বলে, আদমকিন!

ময়ূর বলে, ভয় নাই, আল্লাহ রক্ষা করবেন। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপে আদমকিন এলো কি করে? চারদিকে জল, আদমকিন তো আর উড়তে পারে না। সাঁতার দিতেও জানে না। তুমি এখানে কতদিন আছো?

রাজহাঁস বললো, খুব ছোটবেলা থেকে আমি এই দ্বীপে বাস করছি। এতদিনের মধ্যে ভয়ের কোনও ব্যাপার হয়নি। দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম। গত রাতে আমি আমার ডেরায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছি—একটা স্বপ্ন দেখলাম। একটা আদমকিন এসে আমাকে বলছে, ওহে রাজহংস, তোমার শরীরটা বেশ নাদুস-নুদুস। আমার জিভে জল আসছে। আর খিদেও পেয়েছে বেজায়।

দেখলাম তার চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে। লম্বা লম্বা দাঁতগুলো দেখে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেলো। আদমকিনরা ভয়ঙ্কর বদমাইস। ওদের গায়ে ভীষণ জোর আর মগজে শয়তানী বুদ্ধি। বুনো হাতীর সঙ্গেও তারা পাঞ্জা লড়ে।

আমি ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চোঁ দৌড় দিলাম। আদমকিন আমার পিছনে পিছনে তাড়া করতে লাগলো। আমিও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি। ছুটতে ছুটতে অবশেষে এক পাহাড়ের গুহায় এসে লুকিয়ে পড়লাম। তখন আমার হাত পা অসাড় অবশ হয়ে গেছে। ভয়ে বুক ধড়াস ধড়াস করছে। সারাদিন না খেয়ে সেই গুহার মধ্যে পড়ে রইলাম। বাইরে বেরিয়ে যে খাবার-দাবারের সন্ধান করবো—সে সাহস নাই। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু গুহার ভিতরে জল কোথায় পাবো? হঠাৎ নজরে পড়লো, গুহার আর এক কোণে শুয়ে আছে এক পশুরাজ সিংহ। আমাকে সে অনেক আগেই দেখেছিলো—আমি তাকে এই প্রথম দেখলাম। শুয়ে শুয়ে আমাকে দেখে মৃদু মৃদু হাসছে। আমার বুকে ভরসা হয়। সে আমাকে মিষ্টি করে ডাকলো, কি বাছা, অমন ভয়ে জড়সড় হয়ে আছো কেন? এদিকে এসো, কি হয়েছে, বলো দেখি শুনি।

তার কথায় আমি খানিকটা আশ্বস্ত হই। গুটি গুটি তার দিকে এগিয়ে যাই। পশুরাজ জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি? কোন্ জাতের জানোয়ার তুমি?

আমি বলি, আমার নাম রাজহংস, জাতে আমি পাখি।

সিংহ মশায় বললো, দেখছি তুমি ভয়ে সিটকে গেলে। কী ব্যাপার?

আমি তাকে আমার স্বপ্নের কাহিনী বললাম।

সিংহ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো আশ্চর্য ব্যাপার

তো? দিন কয়েক আগে আমিও ঠিক এই রকম একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার বাবাকে বলতেই তিনি হুশিয়ার করে দিয়ে বললেন, খুব সাবধান, এই আদমকিনগুলো ভীষণ শয়তান হয়। ওদের বদমাইশী বুদ্ধির কোনও তুলনা নাই। কিভাবে কখন যে পিছন দিক থেকে এসে ঘায়েল করবে কেউ জানে না।

সিংহের কথা শুনে আবার আমি ভয়ে শিউড়ে উঠলাম। তাহলে উপায়? এই রকম একটা মারাত্মক জানোয়ার নিয়ে এই বনে বাস করবো কি করে? পশুরাজকে তোয়াজ করতে লাগলাম, তুমি এ বনের রাজা। এখানে এসে একটা সামান্য আদমকিন দাপট দেখাবে—তা কি সহ্য করবে তুমি? এ কথা শুনলে লোকে যে ছি-ছি করবে। তোমার যা অসীম বিক্রম—তুমি যদি একটা হুঙ্কার ছাড়ো—আদমকিন তো কোন্ ছার ওর বাবা সুদ্ধ কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে যাবে। ঐ শয়তান জানোয়ারটাকে যদি শায়েস্তা করতে পারো তা হলে আমাদের মতো চুনোপুটিরা দু'হাত তুলে তোমার জয়গান করবে। তুমি পশুরাজ—বনের অধিপতি, তোমার সাম্রাজ্যে এত বড় অনাচার তো চলতে দিতে পারো না। আমরা তোমার একান্ত অনুগত প্রজা। আমার ধন প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। তুমি এর একটা বিহিত কর সিংহরাজ। না হলে আমি তো যাবোই আমার মতো হাজার হাজার জন্তু জানোয়ার ওর শিকার হবে।

সিংহ গর্জে ওঠে, তুমি ঠিক বলেছ, রাজহংস। আমার বনে অন্য কেউ এসে মস্তানি করে যাবে এ তো সহ্য করা যায় না। চলো, এখনি ব্যাটার সাধ মিটিয়ে দিয়ে আসি।



এই বলে পশুরাজ সদর্পে গুহা থেকে বেরিয়ে বন বাদাড় ভেঙে চলতে থাকে। আমিও তার পিছনে পিছনে চলি। তার হুঙ্কার আর লেজের ঝাপটে সারা জঙ্গল কাঁপতে থাকে। তার পিছনে চলা আমার পক্ষে বেশ কষ্ট হয়ে উঠেছিলো। না জানি কখন ওর ওই লেজের চাবুকের বাড়ি এসে লাগে আমার গায়ে। তা হলে আর দেখতে হবে না। এক বাড়িতেই ছাতু ছাতু হয়ে যাবো।

যাই হোক, অনেকটা জঙ্গল পেরুবার পর এক সময় নজরে এলো, সামনেটা ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে। ক্রমশই ধুলোর ঝড়টা আরও কাছে আসতে থাকলো। এবার মোটামুটি বোঝা গেলো, একটা গাধা ছুটে আসছে। মাঝে মাঝে সে উল্টে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আবার উঠে ছুটছে। আমাদের সামনে আসতে সিংহরাজ ধমক দিয়ে ওঠে, এ্যাই—ও রকম বাঁদরের মতো লম্ফ ঝম্ফ করছো কেন? কে তুমি? কোন্ জাতের জানোয়ার?

গাধাটা কাঁপতে কাঁপতে বললো, হুজুর মহানুভব আমার নাম গাধা। আমরা জাতেও গাধা জানোয়ার। আদমকিনের ভয়ে আমি প্রাণরক্ষা করার জন্যে পালাচ্ছি।

সিংহ হো হো করে হেসে ওঠে, তোমার মতো দশাসই চেহারার জানোয়ার—সামান্য একটা আদমকিনের ভয়ে তুমি পালাচ্ছো? লজ্জা করে না।

গাধাটা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, আপনি জানেন না পশুরাজ, আদমকিন কি মারাত্মক জানোয়ার। তার অসাধ্য কিছুই নাই। এমন ছলচাতুরী করে সে আপনাকে ফাঁদে ফেলবে, বাঁচবার আর কোন পথ থাকবে না। সে যে আমাকে মেরে ফেলবে—এবং সেই ভয়ে আমি পালাচ্ছি তা ঠিক না। কিন্তু সে আমাকে বিস্তর নাস্তানাবুদ করতে পারে। করেছেও। সে আমার কাছে এসে বললো, আমি তোর পিঠে চাপবো। আমি দেখলাম 'না' বললে ঝামেলা করবে। বললাম, তা চাপতে চাও চাপো। সে এমন একটা বদখদ জিন লাগাম এনে জুড়লো যে, পিঠের ছাল চামড়া আমার উঠে গেছে, এই দেখুন।

আমরা দেখলাম, সত্যিই পিঠের কয়েকটা জায়গা ঘষা লেগে ছড়ে গেছে। রক্ত ঝরে না পড়লেও বেশ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। গাধাটা মুখখানা হাঁ করে দেখিয়ে বললো,

এমন একটা লাগাম লাগিয়েছিলো, এই দেখুন ধর্মাবতার, জং-ধরা লোহার আংটায় আমার জিভটা কেটে কি হয়েছে?

সত্যিই—জিভটা দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। গাধা বলতে থাকে, এমন চাবুক কষতে লাগলো যে, আমার দফা রফা। মারের চোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম। কিন্তু কাঁহাতক আর একটানা অত জোরে ছোটা যায়। যেই একটু ঢিলে দিয়েছি—আবার সপাসপ চাবুক পড়তে থাকে পিঠে। আর সে কি খিস্তি করে গালাগাল। আমার চৌদ্দ পুরুষের গুষ্টির তুষ্টি করে ছেড়েছে। আপনাকে আমি কসম খেয়ে বলছি, হুজুর আমি সাচ্চা গাধার বাচ্চা। আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ খারাপ ছিলো না। অথচ সে আমাকে কি গালাগালটাই দিলো, আমি নাকি খানকির ছেলে, আমার বাবা নাকি ছিলো জুয়াচোর, মেয়ে মানুষের দালাল। আরও অসভ্য সব কথা—যা মুখে আনা যায় না। রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগলো। তাকে তাকেই ছিলাম। একটা টিলার ওপরে উঠেছি—তাকিয়ে দেখলাম, নিচে একটা খাদ। এমন জোরে লাফিয়ে উঠে গা-ঝাড়া দিলাম, বাছাধন একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়লো খাদের নিচে। আর সেই মওকায় দে ছুট—দে ছুট। ছুটতে ছুটতে হাফ ধরে গেলো। পা জড়িয়ে আসতে লাগলো। বুড়ো হয়েছি, আগের মতো গায়ে কি অত জোর আছে। তাই মাঝে মাঝে উল্টে পড়ে গেলাম।



সিংহ মজা পায়, তা পালাবার কি আছে?

—আপনি জানেন না, হুজুর, শয়তানটা আমাকে ভিস্তিওয়ালার কাছে বিক্রি করে দেবে বলে ধমকাচ্ছিল। তা যদি সত্যি সত্যিই ভিস্তিওয়ালার কাছে বেচে দেয়, একেবারে মরে যাবো। এই বুড়ে হাড়ে ঐ রকম জলের জালা বইতে পারা কি সহজ? নির্ঘাৎ মরে যাবো। তখন আমার লাশটা ওরা জঙ্গলে ছুঁড়ে দেবে। আর শেয়াল শকুনে ফলার করে খাবে। এখন বলুন, ধর্মাবতার, আপনি এই বনের রাজা থাকতে আমাকে আদমকিনের হাতে এই রকম সাজা পেতে হবে? তার মতো সাংঘাতিক শয়তান জানোয়ার সারা দুনিয়ায় আর দু'টি নাই। আপনি এক একটা বিহিত করুন, এই আমার প্রার্থনা।

আমি বললাম, গাধার কথা শুনে আপনি আরও ভালো করে বুঝতে পারলেন, হুজুর, জানোয়ারটা কত বড় পাজি। গাধাকে সে জানে মারতে পারবে না—তবু কি নাজেহালটা না করেছে। আর আমাকে তো সে গিলেই খেয়ে ফেলতে পারে।



গাধাটা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই সিংহ বললো, এত তাড়া কিসের? কোথায় যাবে? না—ভয়ে পালাচ্ছো? দাঁড়াও সবুর কর। আমার সঙ্গে একবার চলো, জায়গাটা দেখিয়ে দেবে, কোন্ দিকে গেলে আদমকিনের দেখা পাবো।

—ওরে বাবা, দোহাই হুজুর, ঐ কথাটি বলবেন না। আমি ওই মহাশয়তানটার ধারে কাছে যেতে চাই না আর। ওর ফন্দী ফিকির বড় খারাপ। আমার এখন একমাত্র কাজ, ওর থেকে মাইলদশেক দূরে চলে যাওয়া। ও যে দিকে যাবে আমি ঠিক তার উল্টো দিকে যাবো। এমন একটা গুপ্ত ঘাঁটি খুঁজে বের করতে হবে, যাতে বদমাইশটা আমার আর হদিশ করতে না পারে।

এই সময়ে দেখা গেলো ধুলো উড়িয়ে আর একটা জানোয়ার আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। তার খটাখট খুরের শদে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে চারপাশ। জানোয়ারটা কাছে এসে পশুরাজকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে অভিবাদন জানায়। সিংহরাজ জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি?



—হুজুর আমি অশ্ব। অশ্ব জানোয়ার বলেই আমি পরিচিত। আদমকিনের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি পালাচ্ছি।

সিংহ বলে, এমন কথা তোমার মুখে সাজে না। তোমার যা শক্তি এবং বিক্রম তাতে ঐ রকম একটা জানোয়ারকে গ্রাহ্য করা কি তোমার উচিত। ভেবে দেখো, ব্যাপারটা কি লজ্জার। তোমার একটা লাথির ঝাপটায় সে অক্কা পেতে পারে। আর তাকেই তোমার এতো ভয়। আমার দিকে তাকাও, আমি তো তোমার মতো চেহারায় অতো জাঁদরেল নই। তবু এই রাজহংসকে কথা দিয়েছি, শয়তানটাকে আজ আমি শেষ করবোই। ফলার করে ওর মাংস খাবো। ওর হাড় দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো। বেচারা রাজহংস ওর ভয়ে কাল সারাটা রাত ঠকঠক করে কেঁপেছে। এখনও ওর আশঙ্কা, আদমকিন যদি মারা না পড়ে, তবে এ বনে সে বাস করবে কোন্ ভরসায়? ওকে আতঙ্ক থেকে মুক্ত করাই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য। আমি বনের রাজা, আমি যদি প্রজাদের রক্ষা না করতে পারি তারা এ বনে থাকবে কেন?

ঘোড়াটা করুণভাবে চাইলো, মহারাজ আপনার কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা, অমন কাজটি করতে যাবেন না। ওই হাড়ে-হারামজাদা শঠশয়তানটার মারপ্যাঁচ আপনি জানেন না। ও আপনাকে নাকানি চোবানি খাইয়ে নাজেহাল করে ছাড়বে। বছর দুই আগে নানা রকম ছলছুতো করে এই আদমকিনটা আমার কাছে এসেছিলো। তারপর কখন যে টুক করে আমার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিলো, বুঝতেই পারিনি। যখন জানতে পারলাম দেখি ফাঁসের দড়িটা মাথার উপরে গাছের ডালে বেঁধে সে ফিক ফিক করে হাসছে। তখন আমার কি দশা একবার ভাবুন। না-পারি চলতে, না-পারি বসতে। একভাবে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিলো শয়তানটা। তারপর আমার পিঠে জিন লাগাম চাপিয়ে উঠে বসে শঙ্করমাছের চাবুক দিয়ে সে বেধড়ক পেটাতে থাকে। সারা শরীর কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। কিন্তু মার আর কিছুতেই থামে না। রাতের বেলা ফাঁস পরিয়ে গাছের ডালে বেঁধে রাখে। আর, দিনের বেলায় সারা বন বাদাড়ে নিয়ে বেড়ায়। বয়স হয়েছে, অত দৌড়-ঝাঁপ এই বয়সে সইবে কেন? কিছুদিনের মধ্যেই অসুখে পড়লাম। সে আমাকে এক কলুর কাছে বিক্রি করে দিলো। কলু আমাকে দিয়ে ঘানি টানায়। জোয়াল কাঁধে নেওয়া আমাদের চৌদ্দপুরুষের কারো অভ্যাস নাই। দিন কয়েকের মধ্যে ঘাড়ে ঘা হয়ে গেলো। তখন সে আমাকে কষাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেয়। লোকটা আমাকে মেরে আমার চামড়া বিক্রি করবে—এই তার মৎলব। আমি দেখলাম, বাঁচবার আর পথ নাই। তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। এস্পার ওস্পার যা হয় হোক, একদিন তাক বুঝে কষাইটাকে বিরাশি সিক্কার একখানা লাথি ঝেড়ে দিলাম। ব্যাটা তো কুপোকাৎ। আর সেই ফাঁকে আমিও হাওয়া। এই হলো আমার অভিজ্ঞতা। সুতরাং ঐ হতচ্ছাড়া বদমাইশটার কাছ থেকে সব সময় শতহাত দূরে থাকবেন, হুজুর।

ঘোড়ার উপদেশে বিরক্ত হয় সিংহ। বলে কোন্ রোগের কি ওষুধ, আমার বেশ ভালোভাবেই জানা আছে। সুতরাং ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। কি করে তোমাদের আদমকিনকে খতম করতে হয় একবার দেখে নিও। এখন বলতো, শেষ তার সঙ্গে তোমার কখন দেখা হয়েছে?

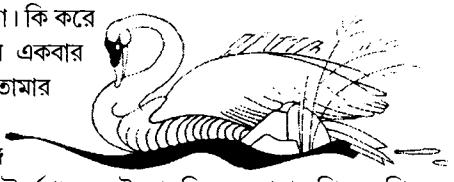

ঘোড়া বলে, আজ দুপুরে তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে। দেখা মাত্র আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি। সে আমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে আসছে।

ঘোড়ার কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেলো ধুলো উড়িয়ে একটা উট ছুটে আসছে। চোখে মুখে তার দারুণ আতঙ্ক। পাগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। উটের এই অবস্থা দেখে সিংহ ভাবে, ও নিশ্চয়ই সে শয়তান আদমকিনের বদমাইসির শিকার। সিংহ জিজ্ঞেস করে, তুমি এত কাঁপছো, কেন? কি হয়েছে?

উটটা বলে, আমার নাকটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, হুজুর। আদমকিন ফুটো করে দড়ি বেঁধে দিয়েছে। সে আমাকে যেখানে খুশি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আমার পিঠের দিকে তাকান, ব্যাটা আমার ওপর পাথরের চাঁই চাপিয়ে দিয়েছিলো। কেটেছড়ে একসা হয়ে গেছে। আর দেখুন আমার পাগুলোর কি দুর্দশা। পাহাড় পর্বতের দুর্গম পথে পথে আমাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে খোঁড়া করে ফেলেছে। আর এই শেষ না। সে আমাকে একটা কষাই-এর কাছে বেঁচে মোটা টাকা মুনাফা লুটেছে। লোকটাকে গুঁতিয়ে মেরে আমি জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সিংহ গর্জে ওঠে।—কোথায় আদমকিন, কোথায় আদমকিন, তাকে আমি জ্যান্ত গিলে ফেলবো।

এই বলে সে কেশর ফুলিয়ে হুঙ্কার দিতে থাকে। উটকে জিজ্ঞেস করে, তার সঙ্গে সব শেষ তোমার কোথায় দেখা হয়েছে।

উট বলে, সে একটু আগেই আমার পিছু ধাওয়া করেছে। মনে হয় এক্ষুণি এখানে এসে পড়বে। আপনি আমাকে অনুমতি করুন, হুজুর, আমি চলে যাই। ওই শয়তানটার খপ্পরে পড়লে এবার আর বাঁচবো না। এদেশ ছেড়ে আমি অন্য কোন দেশে পালিয়ে যেতে চাই।

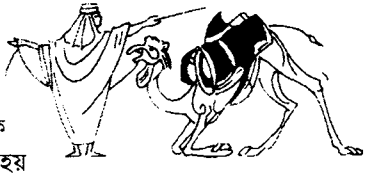

সিংহ বলে, একটুখানি দাঁড়াও উট, আমি তোমাকে আমার ভেল্কী দেখাচ্ছি। কি করে ব্যাটাকে জব্দ করতে হয় একবর নিজে চোখে দেখে যাও। ওকে আমি তুলে আছাড় দেব। ওর রক্ত চুষে খাবো। ওর হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলবো, ব্যাটা ভেবেছে কি?

সিংহের এই তর্জন গর্জন দেখে উট বেচারী তো ভয়ে কাঁপতে থাকে।

—দোহাই হুজুর আমাকে ছেড়ে দিন।

আভূমি আনত হয়ে উট সিংহকে কুর্নিশ জানিয়ে দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

উট চলে যেতেই এক থুরথুরে বুড়ো এসে হাজির হয়। তার মাথায় একটা বাক্স। হাতুড়ি, বাটালী, তুরপুণ প্রভৃতি নানা রকম ছুতোরের যন্ত্রপাতি। লোকটার কাঁধে খানকয়েক কাঠের বর্গা।

বুড়ো ছুতোর বলে, আপনি বনের অধিপতি, মহানুভব সম্রাট, আপনার গুণের সীমা নাই। আপনার মতো পুণ্যবান; মহৎ দানশীল পশুপতি তামাম দুনিয়ার কোথাও নাই। আমি দীনহীন এক ছুতোর। দিন আনি দিন খাই। আমাকে ঐ শয়তানটার হাত থেকে রক্ষা করুন, হুজুর।

সিংহ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কে তোমার অনিষ্ট করেছে? কে তোমাকে উত্যক্ত করেছে, বলো। আমি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেব। কি তোমার নাম আর পরিচয়?

বুড়ো বলে, আমার নাম সূত্রধর। আমরা জাতেও সূত্রধর। বনে বনে কাঠ কাটি। তা দিয়ে ঘরবাড়ি নানারকম আসবাবপত্র বানাই। এই আমার পেশা। আমি এই বনে এসে এক আদমকিনের খপ্পরে পড়েছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সে আমাকে দিয়ে কাঠ কাটায়। তার বদলে না দেয় খানা, না দেয় ইনাম। দিনে দিনে অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। আজ আমি বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছি। ঠিক করে ফেলেছি, যে-বনে আদমকিন থাকবে সে বনের ধারে কাছে আমি থাকবো না।

সিংহ শুনে দাঁত কড়মড় করতে থাকে। ওকে আমি ছিঁড়ে খাবো। কোথায় সে?

—অপেক্ষা করুন, হুজুর, এক্ষুণি সে এখানে এসে পড়বে। সে আমার পিছনে পিছনেই আসছে। আমাকে না হলে তার তো চলবে না। আমি ছাড়া কে ওর ঘরটা বানিয়ে দেবে? সুতরাং যে ভাবেই হোক, আমাকে আটকে রাখার চেষ্টা সে করবেই।

সিংহ জিজ্ঞেস করে, তা এখন মশায়ের যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ছুতোর বলে, আমি আপনার বাবার উজির চিতার কাছে যাবো। তিনি আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর জন্যে একটা দারুণ মজবুত কামরা বানিয়ে দিতে হবে। আদমকিনের অত্যাচারে নাকি তিনি রাতে ভালো করে ঘুমুতে পারছেন না। সেই জন্যেই আমি এই বর্গার কাঠগুলো আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ওখানে যাচ্ছি।

সিংহের মনে হিংসা হয়। বলে, আমার বাবার উজির চিতা আমাদের নোকর। রাজার ঘর বানাবার আগে তার ঘর বানাবে—এ হতে পারে না। তুমি তোমার কাঠ যন্ত্রপাতি সব নামাও। আগে সুন্দর করে আমার জন্যে একখানা ঘর বানাও, তারপর ওসব পরে হবে।

—কিন্তু হুজুর, আপনি চিতাবাঘের দাপট তো জানেন, সে আমাকে আস্ত রাখবে না। আজ বরং আমি তার ঘরটা বানিয়ে দিয়ে আসি। তারপর কাল আপনাকে ঘর কেন, প্রাসাদ বানিয়ে দেব।

এই বলে বুড়ো সামনে পা বাড়াতেই সিংহটা তার সামনের একটা পা তুলে বৃদ্ধের বুকের কাছে থাবা মেলে ধরে। থাবা মারার জন্যে থাবা সে তুলে ধরেনি। একটু ভয় দেখাবার জন্যেই এই 'হালুম' করা। কিন্তু বুড়ো ভয়ে পিছনে হটতে হটতে চিৎপাট হয়ে পড়ে গেলো। কাঠের বর্গা আর যন্ত্রপাতিগুলো ইত্যাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। দু-হাত জোড় করে



কাকুতি মিনতি করতে থাকে বুড়ো, দোহাই বাবা, সিংহরাজ, থাবা চালাবেন না।—একেবারে মরে যাবো। দিচ্ছি—আপনার ঘরটাই আগে বানিয়ে দিচ্ছি। তারপর চিতার কাছে যা হবার তা হবে।

—কি আবার হবে? কিচ্ছু হবে না। বলবে আমার হুকুমে তুমি আমার কামরা বানিয়ে দিয়েছ। তারপরও যদি সে তোমাকে কিছু মন্দ বলে আমাকে বলবে, ওর পিণ্ডি আমি চটকে শেষ করে দেব।

বুড়োটা উঠে এসে সিংহের মাপ নিলো। কতটা লম্বা চওড়া উঁচু—সব যথাযথ মেপে নিয়ে কাঠগুলো দিয়ে একটা কামরা বানালো। ঢোকার মুখটা ছাড়া বাকী সব দিকই বেশ ভালো করে এঁটে দিয়ে বললো, নিন, হুজুর একবার ঢুকে দেখুন তো ঠিক হলো কিনা।

সিংহ বললো, জী হুজুর। কাঠগুলো তো আপনার মাপে ছিলো না। চিতার কামরা বানাবো বলে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি শুনলেন না। যাই হোক, এখনকার মতো চালিয়ে নিন। দু-একদিন বাদে আপনার পছন্দসই একটা বিরাট মহল বানিয়ে দেব। নিন, এখন ঢুকে দেখুন, কেমন লাগে।

মাথা পিঠ নিচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সিংহ সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকলো। আর তৎক্ষণাৎ বুড়ো দরজাটা বন্ধ করে সারা খাঁচাটার চতুর্দিকে বড় বড় পেরেক ঠুকে দিলো। সিংহ আর নড়তে পারে না। চারপাশে পেরেকের আল্ গায়ে ফুটতে থাকে। সিংহ রাগে গর্জে ওঠে, এসবের মানে কি?

বুড়ো বলে, কি করবো হুজুর, মালিকের হুকুম, তামিল না করলে আমাকে যে আস্ত রাখতো না।

—কে তোমার মালিক?

—আদমকিন।

এমন সময় সিংহ দেখতে পেলো বুড়োর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেই ছোট্ট জানোয়ারটা—আদমকিন। দেখতে ভীষণ কুৎসিৎ, বেঢপ মোটা হোদল কুৎকুৎ চোখ, থ্যাবড়া নাক, সারা গায়ে লোমে ভরা। কামড়ে কামড়ে একটা আপেল খাচ্ছে। আর সিংহের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। —কী, খুব গায়ে জোর—না? তা খাটাও দেখি কত

আছে জোর? ঘটে নাই এক ফোঁটা বুদ্ধি—একেবারে হামবড়াই ফাট। এবার বাছাধন, আল্লাহর নাম কর। মৌৎ তোমার সামনে হাজির।

বুড়োকে কি যেন ফিসফিস করে বলতেই কতকগুলো, খড়বিচালি কুড়িয়ে এনে খাচাটার ওপরে ছড়িয়ে দিলো। চকমকিটা বের করতেই সিংহ চিৎকার করে ওঠে, আমাকে পুড়িয়ে মারবে নাকি?

আদমকিন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বলে, না না, তোমাকে ধূপ ধুনো দিয়ে পুজো করবো।

—দোহাই তোমার, সিংহ কাকুতি মিনতি জানাতে থাকে, আমাকে পুড়িয়ে মেরো না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, বুড়ো ততক্ষণে নুড়ো জ্বেলে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো খড়বিচালি। আর তখন সিংহর কি অবস্থা—সে দৃশ্য আমি বর্ণনা করতে পারবো না।

যাই হোক, আদমকিন তখন সিংহকে পোড়ানোর আনন্দে মশগুল। আমার দিকে কোন নজর ছিলো না। তাই টুক টুক করে ওখান থেকে কেটে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি তোমাদের কাছে। তোমরা আমাকে বাঁচাও। নইলে আমাকে একবার সামনে পেলে আর আস্ত রাখবে না।

ময়ূর বললো, কিচ্ছু ভয় নাই। কপালে যা লেখা আছে তা কেউই খণ্ডন করতে পারে না, বোন। ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করে কোন লাভ নাই। দেখাই যাক না, কি হয়।

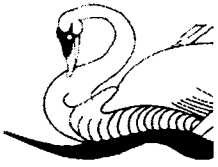

এমন সময় সামনের ঝোপে খসখস শব্দে চকিত হয়ে ওঠে রাজহাঁস। বলে, ওই—ওই তো আসছে। শুনতে পাচ্ছো না তার পায়ের শব্দ। ঝোপ জঙ্গল ভেঙে সে এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

রাজহাঁস আর অপেক্ষা করে না। ছুটে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে থাকে। ময়ূর চিৎকার করে ডাকে, আরে শোনো, বহিন শোনো। ও কিছু নয়। একটা কাঠবিড়ালী ছুটে বেড়াচ্ছে।

রাজহাঁসের ধড়ে প্রাণ আসে। গুটিগুটি করে আবার ওদের কাছে ফিরে এলো।

এরপর ঐ দ্বীপে একটা জাহাজ এসে ভিড়লো। নাবিকরা শিকারে বেরিয়ে পড়লো। ময়ূর-ময়ূরী টুক করে গাছের ডালে গিয়ে বসলো। কিন্তু রাজহাঁস পাখি হলেও তেমন উড়তে পারে না। ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। নাবিকরা অতি সহজেই রাজহাঁসটাকে ধরে গলা কেটে ফেলে।

ময়ূর-ময়ূরী গভীর দুঃখ পায়। কিন্তু কি করা—ভাগ্যের লেখা কে খণ্ডাতে পারে। এইভাবে নির্জন দ্বীপে মানুষের হাতে তার প্রাণ যাবে লেখা ছিলো—সেই নিয়তি সে এড়াবে কি করে?

কি আর করা যাবে। ময়ূর ময়ূরী নিরানন্দ মনে দেশে ফিরে গেলো।

একটুক্ষণের জন্য শাহরাজাদ থামে।

সুলতান শারিয়ার বলে জানোয়ারটার বুদ্ধি তো বড় জব্বর। এরকম আর কোনও মজার কিস্‌সা কি তোমার জানা আছে, শাহরাজাদ?

শাহরাজাদ বলে, এ আর এমন কি কাহিনী। এর চেয়ে আরও মজাদার কাহিনী আপনাকে শোনাতে পারি শাহজাদা।

—তা হলে আর দেরি কেন, শুরু করো।

শাহরাজাদ বলে, পশুপাখির গল্প বলার আগে আপনাকে ছোট্ট একটা অন্য কাহিনী শোনাই, জাঁহাপনা।

বাদশাহ শারিয়ার বলে, কি কাহিনী, শাহরাজাদ?

—এক মেষপালক রাখাল আর একটি মেয়ের কথা শুনুন।

আমাদের দেশের উত্তরে যে গিরিপর্বতমালা আছে তারই এক প্রান্তে এক মেষপালক বাস করতো। তার মতো ধার্মিক, সৎ এবং পরোপকারী মানুষ আর দু'টি হয় না। তার গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে শুধু মানুষই না, বনের হিংস্র পশুরাও তাকে খুব খাতির করতো। তার পাল থেকে একটা ভেড়াও কোন দিন খোয়া যেত না।

আল্লাহ একদিন ভাবলেন, লোকটার গুণগানে দেশের মানুষ তথা পশুপাখি সবাই পঞ্চমুখ। কি ব্যাপার। এমন সৎ ধর্মপ্রাণ মানুষ এখনকার দিনে হয় নাকি। আচ্ছা একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক। সুতরাং তিনি বেহেস্তের এক হুরীকে পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে।

মেষপালক তখন অসুস্থ হয়ে নিজের গুহায় শুয়ে শুয়ে আল্লাহর গুণগান করছিলো। এমন সময় সে দেখলো, একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজল-কালো চোখ, টুকটুকে গুলাবের মতো লাল দু'টি গাল। মুখে তার মিষ্টি মধুর হাসি—যেন মুক্তো ঝরে পড়ছে। গুহার ভিতর হঠাৎ আতরের খুশবুতে ভরে গেলো। মেয়েটির দেহের সুবাস। মেষপালকের মন চনমন করে ওঠে।





—হ্যাঁ গো, মেয়ে, এখানে তুমি কি করছো? কি তোমার নাম আর পরিচয়? আমি তো তোমাকে ডাকিনি, বা ডাকার কোন প্রয়োজনও বোধ করিনি—তবে কেন এসেছো এখানে?

মেয়েটি তার পাশে এসে বসলো। বললো, আমার দিকে ভালো করে তাকাও। আমি সবে ষোলয় পা দিয়েছি। আমার দেহে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করেছে। এবং এখনও আমি অপাপবিদ্ধকুমারী। আমি এসেছি তোমার কাছে আমার নিজের সুখের জন্য। তুমি আমাকে গ্রহণ করে আমাকে তৃপ্ত করো এই আমার একমাত্র কামনা। শুনেছি—তুমি খুব দয়ালু। কারো অভীপ্সাই অপূর্ণ রাখো না। তাই বড় আশা নিয়ে এসেছি, আমাকেও তুমি অখুশি করে ফেরাবে না।

মেষপালক বিছানায় উঠে বসে। রাগে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে।—বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাও; শয়তানী। দূর হও, আমার সামনে থেকে। তোমার মতো নষ্টচরিত্র মেয়েমানুষের মুখ দেখাও মহাপাপ। আর কক্‌খনো এপথ মাড়াবে না। যে ক'টা দিন বাঁচি একমাত্র তাঁর নামগান ছাড়া আমার আর অন্য কোনও কামনা বাসনা নাই।

মেয়েটি কিন্তু নড়ে না। বিলোল কটাক্ষ হেনে লাস্যময় ভঙ্গী করে আধো ভাষায় আশনাই করে বলে, কেন আমাকে তুমি নেবে না? আমি কি দেখতে এতই খারাপ? তুমি বুড়ো হয়েছ তাতে কি! আমি তোমার শরীরে এমন যাদু ঢুকিয়ে দেব, দেখবে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। এই যে আমার কাজল কালো হরিণীর মতো চোখ, আপেলের মতো গাল, আর পাকা আঙুরের মতো এই দু'টো ঠোঁট দেখে তোমার চিত্তে কি কোনও বিকারই ঘটছে না? দেখ, কি সুন্দর আমার বুক, কি সরু আমার কটি আর এই ভারি নিতম্ব দেখে তোমার মনে কি কোনও চাঞ্চল্যই জাগছে না?

আমাকে কাছে টেনে নাও। আদর করে দেখ, তোমার হারানো যৌবন আবার ফিরে পাবে।

মেষপালক গর্জে ওঠে, ওরে শয়তানী, নরকের কীট এখান থেকে দূর হ। এ সব কথা শোনাও আমার পাপ। আর যদি না যাস, ঐ দেখ আমার লাঠি—তোর পিঠে ভাঙবো। বেলেল্লাপনার আর জায়গা খুঁজে পেলে না। আমাকে এসেছে ভোলাতে?

মেয়েটি কিন্তু তার এই রাগের কথায় কোনও কর্ণপাত করলো না। দুম করে গিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে একটা চুম্বন করে বললো, আমি একটা ডাগর ডাসা ফল, টকটক মিষ্টি

মিষ্টি। চেখে দেখে যাও—দেখবে কি মজা। আমার কুমারীত্ব তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। যুঁই ফুলের মতো এর খুশবু তোমার হৃদয় ভরিয়ে দেবে।

মেষপালক ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে বলে, ইয়া আল্লাহ, আমার সারা দেহ মন অপবিত্র হয়ে গেলো। দূর দূর—বিদেয় হ।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু চলে গেলো না। ধীরে ধীরে সে তার সব সাজপোশাক খুলতে থাকলো। মেষপালক আর সহ্য করতে পারে না। মেয়েটার ঐ ফুটন্ত যৌবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে।—না না—না। এ কিছুতেই হতে পারে না।

দু' হাতে মুখ ঢাকে সে। তার নিজের উপরে দখল বুঝি সে হারিয়ে ফেলবে। আর সে কিছুতেই চোখ মেলে দেখবে না পদ্মকলির মতো তার দেহ বল্লরী—আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। ওরে শয়তানী মায়াবিনী দূর হ। যুগে যুগে কালে কালে তোদের জন্যেই দুনিয়ায় এত অশান্তি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে ভালো মানুষগুলোকে তোরাই টেনে নিয়ে গিয়েছিস জাহান্নমে। তোদের মোহে পড়ে পীর পয়গম্বর পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই বলে মেষপালক তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইলো।

মেয়েটি বললো, প্রাচীনকালোর মানুষের কথা বললে, তবে জেনে রাখ, পৃথিবীর সবচেয়ে গুণীজ্ঞানী মানুষদের কিন্তু আমকে না হলে চলে না। আমিই তাদের জীবনের প্রেরণার উৎস। আমার এই রূপ-যৌবন তাদের বিভ্রান্ত তো করেই নি, বরং নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

মেষপালক দু হাতে কান ঢেকে চিৎকার করে ওঠে—ওরে শয়তানী বেবুশ্যে এখনও বলছি ভাগ্। তোর ছলনায় আমি ভুলছি না। তোর লোকভোলানো মিষ্টি মিষ্টি কথায় আমাকে কাবু করতে পারবি না।

তখন সেই লাস্যময়ী রমণীর কণ্ঠ শোনা গেলো, ওগো ধর্মাত্মা, তুমি তোমার পথেই অবিচল থেকে আল্লাহর নামগান করো। আমি চললাম।

এই বলে সেই হুরী অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এই বলে শাহরাজাদ চুপ করলো। বাদশাহ শারিয়ার বলে শাহরাজাদ, তোমার কিস্সা শুনে এই সিংহাসনের মায়া মোহ ছেড়ে দিয়ে আমারও ইচ্ছে করছে কোনও এক পাহাড়ের কন্দরে গিয়ে মেষ চরাই আর তাদের দুধ খেয়ে গুহার মধ্যে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর নামগান করে জীবনটা কাটিয়ে দিই। কিন্তু তার আগে আরও কিছু জ্ঞানের কথা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।

পরদিন একশো ছেচল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়।

—এবার এক কচ্ছপ আর এক বকের কাহিনী শোনাবো ঃ

একদিন এক বক সমুদ্রের তীরে বসে বসে জলের শোভা দেখছিলো। এমন সময় দেখতে পেলো, একটা মৃতদেহ ভেসে আসছে। লাশটা ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেলো পাড়ের একটা বাঁকে। দেখলো, লোকটার মুণ্ডটা কাটা। পরনে ফৌজী পোশাক। বুঝতে কষ্ট হয় না, লড়াই হেরে গিয়ে তার এই দশা হয়েছে। যাই হোক, আনন্দে তার মন নেচে উঠলো। এমন শাঁসালো খানা সে অনেকদিন খায়নি। এমন সময় দেখলো, একটা কচ্ছপ সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে। বকটা মাথা তুলে তাকে স্বাগত জানায়। কচ্ছপটা বলে, কি গো, বক তীরে বসে বসে কী দেখছো?

বক বলে, মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার পথ চেয়েই বসেছিলাম, কখন তুমি আসবে। আজকাল এদিকটায় বড় নেকড়ের উৎপাত শুরু হয়েছে। সুখে শান্তিতে আর বসবাস করা যাবে না। আমি তো ভাবছি এদেশ ছেড়ে পালাবো। কচ্ছপ বলে, যদি যেতেই চাও বন্ধু আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। আমিও আর থাকতে চাই না পোড়া এই দেশে। এখানে আমাদের কেউ কদর বুঝলো না। কথায় আছে না, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

আমাদের হয়েছে সেই দশা। এখানে আমাদের কেউ কদর বুঝবে না। বিদেশে যেখানেই যাবো, দেখবে সবাই কত খাতির যত্ন করবে। একদিন তোমার সঙ্গে আমার পথের দেখা-আলাপের মতো ছিলো। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে।

বক খুব খুশি হয়। বলে, তোমার মতো এত সুন্দর ব্যবহার আমি আর কারো দেখিনি। তুমি যে আমাকে বন্ধুত্ব দিতে চাইছো এ আনন্দ রাখবার আমার জায়গা নাই। মন প্রাণ দিয়ে তা আমি গ্রহণ করলাম। তোমার এই দিল-খোলা মেজাজ আমাকে মুগ্ধ করেছে বন্ধু। জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন অপরিহার্য। বন্ধুহীন জীবন মৃত্যুরই সামিল। বন্ধুর কথা, বন্ধুর হাসি, গান জীবন মধুর করে তোলে। যে তার নিজের মনের মতো বন্ধু খুঁজে নিতে পারে সেই বুদ্ধিমান। আমাদের সমাজে সে-রকম একজনকেও এ যাবৎ আমি খুঁজে পাইনি। সব বকরাই ভীষণ স্বার্থপর আর হিংসুটে। তারা এমনই হাঁদা বোকা যে, কোন একটা ভালো কথার ধারে কাছে দিয়েও ঘেঁষে না। শুধু তাদের একমাত্র লক্ষ্য, কি করে ভালো ভালো মাছ ধরবে, আর বাচ্চা পয়দা করবে। তারা সবাই বড়্ডো বেশী আত্মকেন্দ্রিক। আল্লাহর নাম তারা ভুলেও কখনও মুখে নেয় না। শুধু ঠোঁট দু'টো চোখা করে ওৎ পেতে বসে থাকাই তাদের একমাত্র কাজ। আল্লাহ যে তাদের দু'খানা পাখাও দিয়েছে সে-কথা তাদের মনে থাকে না। দূর দিগন্তে নীল আকাশের নিঃসীম শূন্যে পাখা মেলে উড়ে বেড়াবার যে কি নির্মল আনন্দ তা তারা কোনও দিনই জানতে পারলো না। জানতে চাইলোও না।

কচ্ছপ এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ছিলো এবার সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না, তুমি এত সুন্দর সুন্দর কথা কি করে বলো, ভায়া। এসো, আমরা একটু আলিঙ্গন করি। বক নিচে নেমে আসে। ওরা দু'জনে গভীর আশ্লেষে কোলাকুলি করে। বলে, তোমার স্বজাতিদের মধ্যে তোমাকে শোভা পায় না। তাদের না আছে তোমার মতো জ্ঞানগরিমা—না জানে তারা তোমার মতো এইরকম বাদশাহী আদব-কায়দা। কি দরকার তোমার জাতিভাইদের মধ্যে গিয়ে নিজেকে কূপ-মণ্ডুক করে রাখার। তার চেয়ে চলো, কোথাও গিয়ে আমরা একটা ঘর বেঁধে বসবাস করিগে। সুন্দর একটা নদীর ধারে একটা গাছের কোটরে আমরা বাস করবো। খাবো দাবো আর মনের আনন্দে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াবো, কেমন?



বক বলে, খুব ভালো হবে, খুব চমৎকার হবে, বোন। কিন্তু আমার বৌ আর ছেলেমেয়েদের কি হবে?

কচ্ছপ বলে, সে-জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না ভায়া। আল্লাহর দোয়ায় সব দেখবে চলে আসবে। সবাই মিলে আমরা সুখের নীড় বানিয়ে তুলবো।

এই কথা শুনে বক বলে, আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ—তোমার মতো এমন একজন বন্ধু মিলিয়ে দিলেন তিনি।

এই সময়ে শাহরাজাদ থামলো। রাত্রি প্রায় শেষ হতে চলেছে। বাদশাহ শারিয়ার বলে, শাহরাজাদ তোমার সব গল্পগুলোই বড় মধুর। এসব কথা শুনতে থাকলে—হিংসা দ্বেষ মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো জেগে উঠতে থাকে। সেই জন্যে বলছি, তুমি কোনও ধূর্ত নেকড়ে বা কোনও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কাহিনী শোনাও।

—তাহলে, ওধরনের মজার মজার অনেক গল্প আমার জানা আছে।

শাহরাজাদ বললো, কিন্তু আজ তো রাত কাবার হয়ে গেছে। কাল রাতে শোনাবো জাঁহাপনা।

পরদিন একশো উনপঞ্চাশতম রজনী।

সে এক নেকড়ে আর খেঁক শিয়ালের কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

এক খেঁক শিয়াল তার মালিক নেকড়ের প্রতি নিয়ত দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাগে ফুঁসতে থাকে। গাছের কোটরে বসে বসে ভাবে, কি করে এই শয়তান নেকড়েটর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে নেকড়েটাকে খুঁজতে থাকে। অবশেষে তাকে দেখতে পেয়ে মনের রাগ চেপে মুখে কপট হাসি টেনে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বিনয়ে বিগলিত হয়ে দাঁড়ায়। নেকড়েটা অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, এই শয়তান কুকুরের বাচ্চা কুকুর, কিরে, ব্যাপার কী?

খেঁকশিয়ালটা ততোধিক বিনীত হয়ে বলে, মালিক, আমার মাথায় একটা জব্বর বুদ্ধি এসেছে। আপনি যদি ধৈর্য ধরে শোনেন—

নেকড়ে ধমক দিয়ে বলে, বাজে লম্বা ভনিতা ছেড়ে আসল কথাটা কি তাই বল্। তা না হলে মেরে হাড় ভেঙে দেব।

খেঁকশিয়াল বলে, আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি হুজুর, আদমকিনটা আমাদের সঙ্গে শয়তানী আরম্ভ করেছে। সারা জঙ্গলটায় সে এক বিরাট ফাঁদ পেতেছে। তার অত্যাচারে সবাই ভয়ে তটস্থ। সে যেন একটা জ্বলন্ত বিভীষিকা। আমরা যদি সবাই মিলে এক জোট হয়ে তাকে না শায়েস্তা করতে পারি তা হলে সমূহ বিপদ।



খেঁকশিয়ালের এই অযাচিত উপদেশে নেকড়ে তেলবেগুনে জ্বলে ওঠে।—ওরে গিধড়, তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে। ওসব আজগুবি উদ্ভট কল্পনা করে মগজটাকে নষ্ট করিস নে। ফের যদি শুনি এই মোড়লি কথাবার্তা—মেরে হাড়মাস আলাদা করে দেব।

এই শুনে খেঁকশিয়াল উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি টেনে হাত জোড় করে বলে, আমি যদি কিছু অন্যায় বলে থাকি, আমাকে মাফ করবেন মালিক। আমি নেহাতই বোকা-সোকা প্রাণী। কি বলতে কি বেফাঁস বলে ফেলেছি—আপনি মহানুভব প্রভু, নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

খেঁকশিয়ালের এই তোষামদে নেকড়ে কিছুটা নরম হয়।—ঠিক আছে, আজকের মতো ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু মনে থাকে যেন, ভবিষ্যতে আর কখনও, যা বুঝিস না সে-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবি না। যে কথা তোর মুখে সাজে সেইটুকুই শুধু বলবি। কোনও ফালতু কথা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

—যা বলেছেন হুজুর। পীর-পয়গম্বররা বলে গেছেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না? আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে গায়ে পড়ে কোনও উত্তর দেবে না। সব সময় নিজের চরকায় তেল দিয়ে যাবে। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক নাক গলাবে না।

খেঁকশিয়াল মনে মনে ভাবতে থাকে, ঠিক আছে রে, নেকড়ের বাচ্চা, দিন আমার আসবে, তখন তোমায় আমি দেখে নেবো। আমারও নাম খেঁকশিয়াল—। এখন আমার হাতে ক্ষমতা নাই, গায়ে জোর নাই বলে তোমার সব অপমান, সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি, কিন্তু মনে রেখ, নেকড়ে, চাকা একদিন ঘুরবেই।

—হুজুর, আপনি তো জানেন, খেঁকশিয়াল করজোড়ে নিবেদন করে, ন্যায় বিচারই পুণ্য। আর ক্ষমা উদারতা। আমার দোষ পর্বত প্রমাণ, আমি জানি। সেই সঙ্গে আমার অনুশোচনাও অসীম। আপনার চমৎকার লাথিটা আমাকে আহত করেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে আমার মনের অন্ধকার কেটে গেছে, আমি প্রভাত সূর্যের নতুন আলো প্রত্যক্ষ করছি।

নেকড়ে প্রীত হয়ে বলে, তোমার চৈতন্য হয়েছে দেখে খুশি হলাম। তোমাকে লাথি মেরে আমিও স্বস্তি পাইনি। যাই হোক, এর পর থেকে সমঝে চলবে, যাতে আমাকে ঐরকম রুষ্ট আচরণ আর না করতে হয়।

খেঁকশিয়াল দুই পা মাথায় ঠেকিয়ে প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ আপনাকে আরও ক্ষমতাবান করুন, এই প্রার্থনা করি। আপনার জয়জয়কারে আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছে—হবে।

নেকড়ে বলে, এখন এসো। আজ থেকে তুমি আমার বিশ্বস্ত অনুচর হলে। যদি কোনও দেবার মতো খবর পাও, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।

খেঁকশিয়াল বলে, যথা আজ্ঞা হুজুর।

এই বলে সে বনের মধ্যে চলে যায়। চলতে চলতে এক সময় সে এক দ্রাক্ষাকুঞ্জে এসে পড়ে। খেঁকশিয়াল জানতো এইখানে একটা মস্ত খাদ আছে। এই কারণে এ পথটা সে এড়িয়ে চলে। মহাপুরুষেরা বলেছেন, দেখে শুনে পথ চলো। না হলে পতন অনিবার্য। খেঁকশিয়াল ভাবে, আদমকিনের নানারকম ছদ্মবেশ এবং তার ছলচাতুরী আমার জানা হয়ে গেছে। যদি দেখি, এই দ্রাক্ষাবনে খেঁকশিয়ালের কোনও নকল মূর্তি রাখা আছে তা হলে আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াবো না। বুঝবো, এ আর কেউ নয়, সেই আদমকিনের নতুন কোনও ফাঁদ।

পা টিপে টিপে সে এগুতে থাকে। পিছনের দিকটা ভালো করে দেখে নেয়। এখানে ওখানে মাটি শুঁকে শুঁকে কি যেন অনুভব করার চেষ্টা করে। একটু কোনও আওয়াজ পেলেই কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। এইভবে সে ঐ বিপদসঙ্কুল পথটুকু অতিক্রম করে চলে আসে। একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। মনে হয় সামনে একটা গর্ত। কে বা কারা কিছু ডালপালা আর মাটি দিয়ে গর্তের মুখটা বন্ধ করে গেছে। এক অজানা আনন্দে নেচে ওঠে তার হৃদয়।

একটু পুরে নেকড়ের সঙ্গে দেখা করে সে বলে, একটা সুখবর আছে, জনাব। মনে হচ্ছে, সৌভাগ্যের দরজা এবার খুলে গেলো।



নেকড়ে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলে, কাব্যি রাখ, সাফ কথা কি—সোজা বাৎ বল দেখি বাপু।

খেঁকশিয়াল বলে দ্রাক্ষাবনে আজ আনন্দের লহর ছুটেছে। বনের মালিক দেহ রেখেছে। পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

—বেশ করেছ। তা এখানে হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? গতরখানা নড়াও না! যাও, সেখানে গিয়ে পাহারা দাও। আমি যাচ্ছি।

খেঁকশিয়াল আগে আগে চলতে থাকে। নেকড়ে তার পিছনে পিছনে যায়।

খেঁকশিয়াল বলে, এই সেই জায়গা হুজুর।

থোকা থোকা পাকা আঙুর দেখে নেকড়ে আর লোভ সামলাতে পারে না। প্রচণ্ড একটা লাফ দিয়ে আঙুরগুলো পাড়তে চায়। কিন্তু নিজের দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে আছাড় খেয়ে নিচে পড়ে যায়। আর পড়বি তো পড় একেবারে সেই ডালপালা চাপা দেওয়া গর্তটার মুখেই গিয়ে সে পড়ে। আসলে ঐ গর্তটা একটা ফাঁদ। নেকড়ের দেহের ভারে গর্তটার মুখ খুলে আলগা হয়ে পড়ে। আর পুরো দেহটা ঢুকে যায় গর্তের নিচে।

খেঁকশিয়াল আনন্দে লাফাতে থাকে। নেকড়ে তখন ওপরে ওঠার জন্যে নানারকম কায়দা কসরৎ করে চলেছে। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে সে।

খেঁকশিয়ালটাও ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। নেকড়ে মাথা তুলে বলে, বন্ধু এখন কি কান্নার সময়! একটা উপায় বের করো—যাতে আমি উপরে উঠতে পারি। জানি, এক সময়ে আমি তোমার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছি। কিন্তু সে-সব কথা এখন তো মনে করলে চলে না ভাই। তুমি আমার বউ বাল-বাচ্চাদের একটা খবর দাও। তারা এসে দেখুক, আমি কি বিপদে পড়েছি।

এরপর দ্বিতীয় খণ্ডে

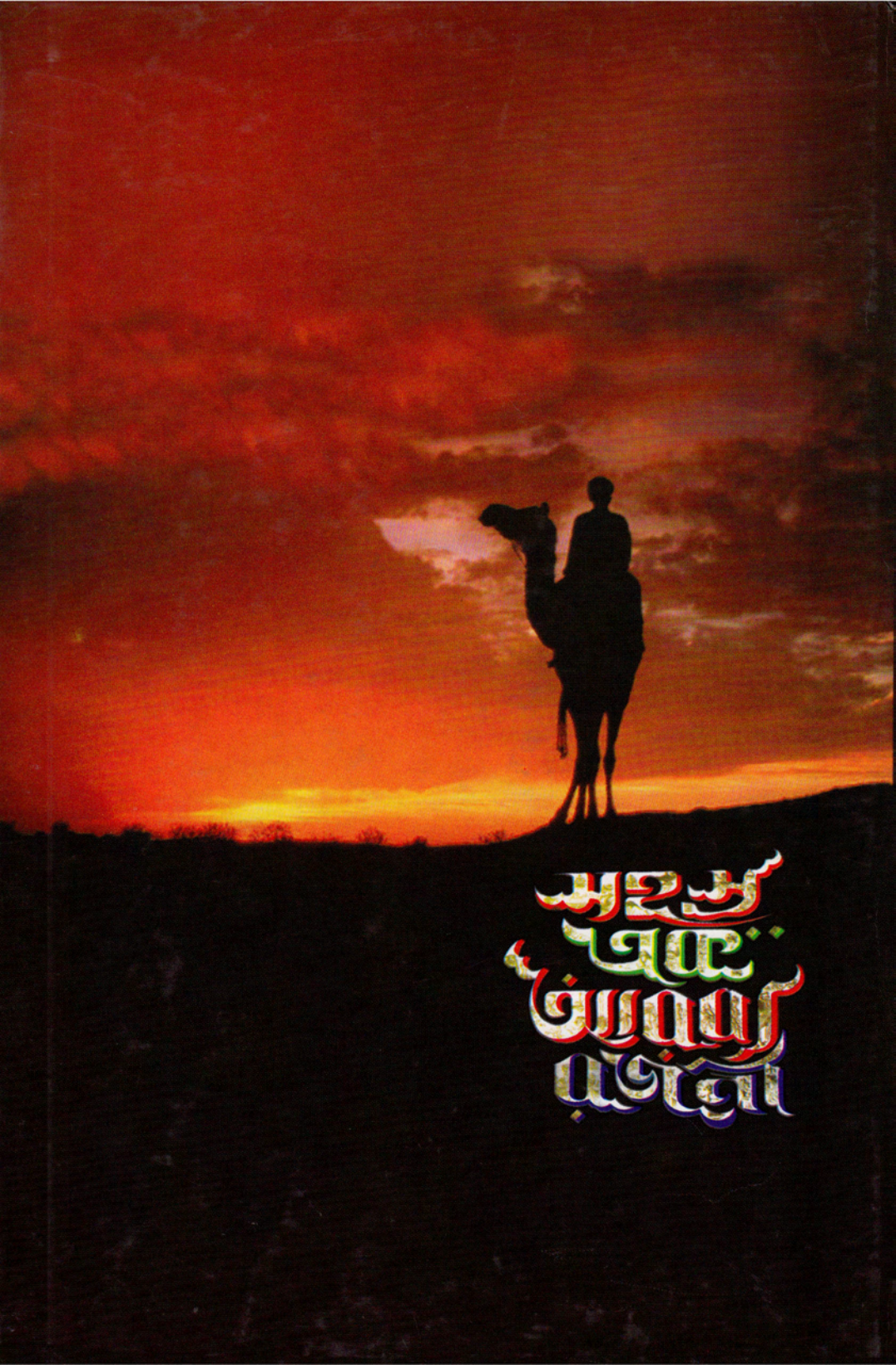
سرحد کے رنگیلے جوان